প্রশ্নোত্তরে–

তুহফাতুল বারী শরহে

নাসায়ী

[১ম খন্ড]

রচনা ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদ উল্লাহ ইবনে আব্দুস সাত্তার

ফাযেলে জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

সম্পাদনা ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান যশোরী

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

আল-আকসা লাইব্রেরী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রশ্নোত্তরে- তুহফাতুল বারী শরহে নাসায়ী [১ম খন্ড]

সংকলন : মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদ উল্লাহ ইবনে আব্দুস সাত্তার
ফাযিলে জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

সম্পাদনা: মাওলানা মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান যশোরী,
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।
আলাপনী : ০১৯১৭ ৮৮৯৩৯৩

প্রকাশক : মুহাম্মদ নাজমুস সাআদাত শিবলী।

প্রকাশকাল : মুহররম ১৪৩২ হিজরী
ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী।

বর্ণ বিন্যাস : আল-আকসা কম্পিউটার

মূল্য : ৬[illegible] টাকা মাত্র

কিতাবটির বৈশিষ্ট্য

* প্রতিটি হাদীসের প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণসহ সহজবোধ্য নির্ভুল অনুবাদ
* বেফাক বোর্ডের বিগত ৩০ বছরের প্রশ্নোত্তর সংযোজন
* পরীক্ষার্থীদের শতকরা ১০০ নম্বর প্রাপ্তি নিশ্চয়তার প্রতি বিশেষ লক্ষ দান
* ছাত্র/ছাত্রীদের সুবিধার্থে সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাবেরও প্রশ্নোত্তর সংযোজন
* হাদীসগুলোর ব্যাখ্যায় আধুনিক বিজ্ঞানীদের বক্তব্যের সাথে সমন্বয় সাধন
* ছাত্রদের জ্ঞানার্জনের সুবিধার লক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম প্রদান
* হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে জরুরী আলোচনা
* দূর্বল ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত সহজ সরলভাবে প্রশ্নোত্তর উপস্থাপন
* রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত
* হাদীস ও আনুসঙ্গিক বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা প্রভৃতি

লেখকের কথা

হযরাতে সলফে সালেহীন হাদীসের সংকলন ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন ইতিহাসে তা বর্ণনাতীত বিষয়। কিন্তু সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাব বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থের যেমন ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচিত হয়েছে, নাসায়ী শরীফের তেমনটি হয়নি, অথচ মর্যাদাগত দৃষ্টিকোণ থেকে নাসায়ী শরীফ তার থেকে কোন অংশে কম নয়। আর বাংলা ভাষায়ও এর কোন ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচিত হয়নি। তাই নাসায়ী শরীফের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন মনে করছিলাম অনেক দিন যাবৎ এবং এ ব্যাপারে কাজও শুরু করে দেই বেশ কিছু কাল পূর্বে। দীর্ঘ মেহনতের পর আজ সেটি প্রকাশ পেতে যাচ্ছে এজন্য আল্লাহ তাআলার অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি।

সভ্যতার ক্রমবিকাশ আর তথ্য প্রযুক্তির এ চরম উৎকর্ষের যুগে ইলম অর্জনের পাশাপাশি নিজেকে যোগ্য ও অগ্রসর ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা অপরিহার্য। সাথে সাথে ক্ষেত্র বিশেষ হাদীসে নববীর সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করাও একান্ত প্রয়োজন। তাই হাদীসের আলোচনা শেষে তৎসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য যে হাদীসে নববীর সাথে সাংঘর্ষিক নয় সেটাও তুলে ধরেছি। উপরন্তু হাদীসের ব্যাপারে অগাধ জ্ঞান অর্জন করার জন্য হাদীসের সনদ মতন ও রাবী সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছি।

বর্তমান যুগে সাধারণত সার্টিফিকেট-ই লেখা পড়ার মানদণ্ড বিবেচিত হয়, আর পরীক্ষায় উপযুক্ত ফলাফল ব্যক্তিকে দেয় শিক্ষিত নাগরিকের স্বীকৃতি, ত্বরান্বিত করে তার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি অগ্রগতিকে, সমাজে তাকে গণ্য করা হয় মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে, পৌঁছে দেয় তাকে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে, উপবিষ্ট করায় মর্যাদার কেদারায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষার গুরুত্বও অপরিসীম। তাই সকল স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রথমে হাদীস উল্লেখ করেছি। অতঃপর তার ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি। সর্বশেষ প্রশ্নোত্তর আকারে উক্ত হাদীসের সকল প্রশ্নের সমাধান দিয়েছি। প্রশ্নোত্তর লেখার সময় ফাতহুল বারী, উমদাতুল ক্বারী, বজলুল মাজহুদ, শরহে উর্দূ নাসায়ী, তুহফাতুল আহওয়াজী ইত্যাদি গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি।

হাদীসের ব্যাখ্যা লেখার সময় বিগত ত্রিশ বছরে যে সকল প্রশ্ন বোর্ড পরীক্ষায় এসেছে সেগুলোকে উল্লেখ করেছি এবং ছাত্রদের মেধাকে আরো শাণিত করার জন্য অতিরিক্ত প্রশ্ন সংযোজন করে মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় তার উত্তর উপস্থাপন করেছি। উল্লেখ্য যে, ব্যাখ্যা গ্রন্থটি নাসায়ী শরীফকে কেন্দ্র করে হলেও এর রচনা শৈলী এমন যে, এটি অধ্যায়ন করলে সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাবেও যথেষ্ট কাজে আসবে। এ বিষয়ে অধমের হিম্মত ও চেষ্টাকে অগ্রগামী করেছে জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ার শ্রদ্ধেয় আসাতিযায়ে কেরামের দোয়া এবং আমার সহপাঠিদের আবদার ও সহযোগিতা। আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমীন।

সর্বশেষে এ কথা না বললেই নয় যে, অধমের এ চেষ্টাকে পূর্ণতা দান এবং বইটি মানসম্পন্ন করার জন্য যার নিরলস চেষ্টার কাছে আমি চির ঋণী তিনি হলেন বিশিষ্ট আলিম, ধর্মীয় ও কওমী মাদরাসার নিসাবভুক্ত বহু গ্রন্থের অনুবাদক ও প্রণেতা, মুহতারাম উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান যশোরী মুদ্দা যিল্লুহু। তিনি অত্র কিতাবটি সম্পাদনা করত: নিজস্ব প্রকাশনী হতে প্রকাশ করে এ অধমকে এ পথে অগ্রসর হওয়ায় অনুপ্রাণিত করেছেন। আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

কিতাবটির গুণগত মান বৃদ্ধিসহ শিক্ষার্থীদের কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য করতে সচেতন শিক্ষার্থী ও সুধীজনের যে কোন গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে এবং সে মোতাবেক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট থাকব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে দয়াময়ের দরবারে বুকভরা আশা নিয়ে এ প্রার্থনা জানাই তিনি যেন দীনের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এ খেদমতটুকু কবুল করেন এবং পরকালে নাজাতের বানিয়ে দাও এবং এর পাঠকবৃন্দকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দাও আমীন।

মুহা ঃ ইমদাদুল্লাহ ইবনে আব্দুস সাত্তার
০১/১০/২০১১ ইং

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইলমে হাদীস সংক্রান্ত জরুরী আলোচণা	
ইমাম নাসায়ীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	
সুনানে নাসায়ী এর বৈশিষ্ট্যাবলী	
অধ্যায় ঃ পবিত্রতা	১৯
রাতে নামায আদায়ের জন্য উঠলে মিসওয়াক করা	৩৩
কিভাবে মিসওয়াক করতে হবে	৩৩
ইমাম তাঁর অধস্তনের সামনে মিসওয়াক করবেন কি?	৩৮
সিমওয়াকের প্রতি উৎসাহিত করা	৩৮
বারবার মিসওয়াক করা	৪৫
রোযাদারের জন্য বিকালে মিসওয়াক করার অনুমতি	৪৫
সর্বদা মিসওয়াক করা	
ফিতরাত প্রসঙ্গ ঃ খাতনা	৪৯
নখ কাটা	৪৯
বগলের পশম উপড়ে ফেলা	৫৪
নাভীর নিম্নাংশের লোম চাঁছা	৫৪
গোঁফ ছাটা	৫৪
উল্লেখিত কাজসমূহের জন্য সময় নির্ধারণ	৫৭
গোঁফ ছাটা ও দাড়ি লম্বা করা	৫৭
মল ত্যাগের জন্য দূরে গমন করা	৬০
দূরে না যাওয়ার অনুমতি	৬০
পায়খানা-পেশাবের স্থানে প্রবেশ করার সময় দোয়া পাঠ করা	৬৮
পায়খানা-পেশাবের সময় কিবলামুখী হওয়ার নিষেধাজ্ঞা	৭১
পায়খানা-পেশাবের সময় কিবলাকে পেছনে রেখে বসা নিষেধাজ্ঞা	৭১
প্রয়োজনবোধে পায়খানা-পেশাবের সময় পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসার অনুমতি	৮৫
ঘরের মধ্যে কিবলামুখী হয়ে বসার অনুমতি	৮৫
পেশাব করার সময় ডান হাত দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ করা নিষেধ	৮৭
ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে পেশাব করার অনুমতি	৯১
ঘরে নির্মিত পেশাবখানায় বসে পেশাব করা	৯৮
সুতরার দ্বারা আড়াল করে পেশাব করা	৯৮
পেশাবের ছিটা হতে বেঁচে থাকা	৯৯
পাত্রে পেশাব করা	১১১
তশ্‌তর বা বাটির মধ্যে পেশাব করা	১১১
গর্তে পেশাব করা মাকরূহ	১১৫
বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ	১১৫
গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ	১১৯
পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম করা	১১৯
উযূ করার পর সালামের জবাব দেয়া	১২৩
হাড় দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা নিষেধ	১২৩
গোবর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা নিষেধ	১২৮
পবিত্রতা অর্জনকালে তিনটির কম ঢিলা ব্যবহার করা নিষেধ	১৩২
দু'টি ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি	১৩৭
একটি ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার অনুমতি	১৪৩
শুধু কুলুখ দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যথেষ্ট	১৪৩
পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন	১৪৫
ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করা নিষিদ্ধ	১৪৯
ইস্তিঞ্জার পর হাত মাটিতে ঘষা	১৫৪
পানির ব্যাপারে পরিমাণ নির্ধারণ	১৫৭
পানির পরিমাণ নির্ধারণ না করা	১৭২
বদ্ধ পানির বর্ণনা	১৭৭
সমুদ্রের পানি প্রসঙ্গ	১৭৯
বরফ দ্বারা উযূ করা	১৮৭
বরফের পানি দ্বারা উযূ করা	১৮৯
কুকুরের উচ্ছিষ্টের বর্ণনা	১৯০
কুকুর কান পাত্রে মুখ দিলে পাত্রের জিনিষ ঢেলে ফেলে দেয়ার নির্দেশ	১৯৯
কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র মাটি দ্বারা মাজা	২০০
বিড়ালের উচ্ছিষ্ট	২০৭
গাধার উচ্ছিষ্ট	২০৭
হায়েজগ্রস্ত মহিলার উচ্ছিষ্ট	২১৪
নারী-পুরুষের একত্রে উযূ করা	২১৫
জুনুবী ব্যক্তির অবশিষ্ট পানি	২১৮
উযূর জন্য একজন পুরুষের জন্য কি পরিমান পানি যথেষ্ট?	২১৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
উযূ নিয়ত করা	২২২
পাত্র থেকে উযূ করা	২৩৮
উযূ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা	২৩৬
পুরুষের জন্য খাদেম কর্তৃক উযূর পানি ঢেলে দেয়া	২৪১
উযূর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করা	২৪৩
উযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা	২৪৩
উযূর বর্ণনা ঃ উভয় কব্জি ধৌত করা	২৪৪
কব্জি কতবার ধৌত করতে হবে?	২৪৬
কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা	২৪৮
কোন হাত দ্বারা কুলি করতে হবে	২৫৬
নাক পরিষ্কার	২৫৮
নাকে ভালভাবে পানি দেয়া	২৫৮
নাক ঝাড়ার নির্দেশ	২৫৮
ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর নাক ঝেড়ে ফেলার নির্দেশ	২৬০
কোন হাতে নাক ঝাড়াতে হবে?	২৬২
মুখমণ্ডল ধৌত করা	২৬৩
মুখমণ্ডল কতবার ধৌত করতে হবে?	২৬৪
উভয় হাত ধৌত করা	২৬৭
উযূর বর্ণনা	২৭০
হাত কত বার ধৌত করবে?	২৭২
ধৌত করার সীমা	২৭৩
মাথা মাসেহ করার পদ্ধতি	২৭৯
মাথা মাসেহ কত বার করতে হবে?	২৮১
মহিলাদের মাথা মাসেহ করা	২৮৭
কান মাসেহ করা	২৮৮
মাথার সাথে কান মাসেহ করার এবং যা দ্বারা উভয় কান মাথার অংশ প্রমাণ করা হয় তার বর্ণনা	২৯২
পাগড়ির উপর মাসেহ করা	২৯৭
কপালসহ পাগড়ির উপর মাসেহ করা	৩০৪
পাগড়ির উপর কিভাবে মাসেহ করতে হবে?	৩০৭
কোন পা প্রথমে ধৌত করতে হবে?	৩১৭
হাত দ্বারা পা ধৌত করা	৩১৭
আঙ্গুল খিলাল করার নির্দেশ	৩১৯
পা কতবার ধৌত করবে?	৩২০
হাত-পা ধৌত করার সীমা	৩২০
জুতা পরিহিত অবস্থায় উযূ করা	৩২১
মোজার উপর মাসেহ করা	৩২২
সফরে মোজার উপর মাসেহ করা	৩৩০
মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসহের সময় নির্ধারণ	৩৩৩
মুকিমের জন্য মোজার উপর মাসেহের সময় নির্ধারণ	৩৩৯
উযূ ভঙ্গ হওয়ার ছাড়াই উযূ করার বিবরণ	৩৪২
প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করা	৩৪৪
পানি ছিটানো	৩৪৯
উযূর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা উপকৃত হওয়া	৩৫১
উযূর ফরয	৩৫৩
উযূতে সীমালঙ্ঘন	৩৫৯
পূর্ণরূপে উযূ করার আদেশ	৩৬১
পূর্ণরূপে উযূ করার ফযীলত	৩৬২
নির্দেশ মুতাবিক উযূ করার সওয়াব	৩৬৬
উযূ শেষে যা বলতে হয়	৩৭০
উযূর জ্যোতি	৩৭২
মযী কখন উযূ নষ্ট করে এবং কখন করে না?	৩৮০
পেশাব-পায়খানার পর উযূ	৩৮৮
পায়খানার পর উযূ	৩৮৯
বায়ু নির্গমনে উযূ	৩৯০
নিদ্রার কারণে উযূ	৩৯১
তন্দ্রার বর্ণনা	৩৯৩
পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে উযূ	৩৯৪
পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার পর উযূ না করা	৩৯৯
কামভাব ব্যতীত কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে স্পর্শ করলে উযূ না করা	৪০০
চুম্বনের পরে উযূ না করা	৪০৬
আগুনে জ্বাল দেয়া বস্তু আহার করে উযূ করা	৪১১
আগুনে সিদ্ধ বস্তু খাওয়ার পর উযূ না করা	৪১৯
ছাতু খাওয়ার পর উযূ করা	৪২৩
দুধপান করার পর কুলি করা	৪২৪
মুসলমান হওয়ার জন্য কাফিরের আগে ভাগেই গোসল করা	৪২৫
মুশরিককে কবরস্থ করার পর গোসল করা	৪২৬
খাতনাস্থলদ্বয় পরস্পর মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব হওয়া	৪২৭
বীর্যপাতের দরুন গোসল	৪৩২
পুরুষের ন্যায় স্বপ্ন দেখলে তার গোসল	৪৩৮
যার স্বপ্নদোষ হয় অথচ বীর্য দেখে না	৪৪৩
পুরুষ এবং নারীর বীর্যের পার্থক্য	৪৪৪
হায়েযের পর গোসল	৪৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
হায়েয সম্পর্কিত বর্ণনা	৪৫৮
ইস্তেহাযা গ্রস্ত নারীর গোসল	৪৬৩
নিফাসের গোসল	৪৬৭
হায়েয ও ইস্তেহাযার রক্তের পার্থক্য	৪৬৯
বদ্ধ পানিতে জুনুবী ব্যক্তির গোসল না করা	৪৭৪
বদ্ধ পানিতে পেশাব এবং তাতে গোসল না করা	৪৭৪
রাতের প্রথমভাগে গোসল করা	৪৭৪
রাতের প্রথমাংশে ও শেষাংশে গোসল করা	৪৭৬
গোসলের সময় পর্দা করা	৪৭৭
পুরুষের গোসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ না থাকার বর্ণনা	৪৮২
এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ না থাকার বর্ণনা	৪৮২
স্বামী এবং স্ত্রীর একই পাত্রে থেকে গোসল করা	৪৮২
জুনুবী ব্যক্তির উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা গোসল করার নিষেধাজ্ঞা	৪৮৪
এ ব্যাপারে অনুমতি	৪৮৭
আটা-খামির করার পাত্রে গোসল করা	৪৮৮
জানাবাতের গোসলে নারীর মাথার খোপা না খোলা	৪৮৮
ইহরামের গোসলে ঋতুমতির জন্য খোপা খোলার আদেশ	৪৮৯
পাত্রে হাত ঢুকাবার পূর্বে জুনুব ব্যক্তির হাত ধৌত করা প্রসঙ্গ	৪৯০
পাত্রে হাত ঢুকাবার পূর্বে উভয় হাত কতবার ধৌত করতে হবে?	৪৯১
হাত ধোয়ার পর শরীর থেকে জুনুব ব্যক্তির নাপাকী দূর করা	৪৯১
গোসলের পূর্বে জুনুব ব্যক্তির উযূ করা	৪৯৩
জুনুব ব্যক্তির মাথা খেলাল করা	৪৯৪
হায়েযের গোসলে কি করতে হয়?	৪৯৫
গোসলের পর উযূ না করা	৪৯৭
গোসলের স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে পা ধৌত করা	৪৯৭
গোসলের পরে রুমাল ব্যবহার করা	৪৯৯
পানাহার করতে চাইলে জুনুবী ব্যক্তির জন্য উযূ করা	৫০০
জুনুবী ব্যক্তি আহার করতে ইচ্ছা করলে শুধু তার উভয় হাত ধৌত করা	৫০০
পানাহারের ইচ্ছা করলে জুনুবী ব্যক্তির শুধু উভয় হাত ধৌত করা	৫০১
ঘুমানোর ইচ্ছা করলে জুনুবী ব্যক্তির জন্য উযূ করা	৫০২
জুনুবী ব্যক্তি ঘুমাতে ইচ্ছা করলে উযূ করা এবং লজ্জাস্থান ধৌত করা	৫০৪
জুনুবী ব্যক্তি যদি উযূ না করে	৫০৫
জুনুব ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকা	৫০৭
জুনুব ব্যক্তিকে স্পর্শ করা ও তার সাথে বসা	৫০৯
ঋতুমতির চাটাই বিছানো	৫১৩
ঋতুমতি স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা	৫১৪
ঋতুমতি স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথা ধৌত করা	৫১৪
ঋতুমতির সঙ্গে খাওয়া এবং তার পানাহার শেষ পানীয় পান করা	৫১৬
ঋতুমতির ভুক্তাবশেষ আহার করা	৫১৭
ঋতুমতির সাথে শয়ন করা	৫১৭
ঋতুমতির শরীরের সাথে শরীর মিলানো	৫১৯
আল্লাহর বাণী- وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ -এর ব্যাখ্যা	৫২৪
হায়েয অবস্থায় যে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা জানা সত্ত্বেও সঙ্গম করে তার উপর কি ওয়াজিব হবে?	৫২৬
মুহরিম মহিলা ঋতুমতি হলে কি করবে?	৫২৮
ইহরামের সময় নিফাসগ্রস্তদের গোসল করা প্রসঙ্গে	৫২৯
হায়েযের রক্ত কাপড়ে লাগলে করণীয়	৫৩০
কাপড়ে যদি বীর্য লাগে	৫৩২
কাপড় থেকে বীর্য ধৌত করা	৫৩৫
কাপড় থেকে বীর্য রগড়িয়ে ফেলা	৫৩৬
খাদ্যগ্রহণ করেনি এমন শিশুর পেশাব	৫৩৯
কন্যা শিশুর পেশাব	৫৪২
হালাল পশুর পেশাব	৫৪৩
হালাল পশুর গোবর বা মল কাপড়ে লাগলে করণীয়	৫৫২
তায়াম্মুম আরম্ভ করা	৫৫৫
মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুম	৫৫৮
মুকীমের তায়াম্মুম	৫৫৯
সফরে তায়াম্মুম	৫৬২
তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ	৫৬৯
আরেক প্রকারের তায়াম্মুম এবং উভয় হাতে ফুঁক দেওয়া	৫৬৯
আরেক প্রকারের তায়াম্মুম	৫৭১
আরেক প্রকারের তায়াম্মুম	৫৭১
তায়াম্মুম-এর এক অন্য প্রকার	৫৭৩
জুনুবী ব্যক্তির তায়াম্মুম	৫৭৪
মাটি দ্বারা তায়াম্মুম	৫৭৬
এক তায়াম্মুমে কয়েক নামায আদায় করা	৫৭৮
যে ব্যক্তি পানি এবং মাটি কোনটায় না পায়	৫৭৯
অধ্যায় : পানির বিবরণ	৫৮১
বুযাআ নামক কূপ প্রসঙ্গে আলোচনা	৫৮২
পানির পরিমাণ নির্ণয়	৫৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
বদ্ধ পানিতে জুনুবী ব্যক্তির গোসল করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা	৫৮৪
সমুদ্রের পানি দ্বারা উযূ করা	৫৮৪
বরফ ও বৃষ্টির পানি দ্বারা উযূ করা	৫৮৫
কুকুরের উচ্ছিষ্ট	৫৮৫
কোন পাত্রে কুকুরের মুখ দেয়ার দরুন তা মাটি দ্বারা মাজা	৫৮৬
বিড়ালের উচ্ছিষ্ট	৫৮৭
স্ত্রীর উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারের অনুমতি	৫৮৮
একজন লোকের উযূ এবং গোসলের জন্য কতটুকু পানি যথেষ্ট	৫৮২
অধ্যায় ঃ হায়েয ও ইস্তিহাযা	৫৯০
ইস্তিহাযার বর্ণনা ঃ রক্ত আরম্ভ হওয়ার এবং তা বন্ধ হওয়া	৫৯১
যে নারীর প্রতি মাঝে হায়েযের দিন নির্দিষ্ট থাকে	৫৯২
হায়েযের সময় সীমার বর্ণনা	৫৯৪
হায়েয ও ইস্তিহাযার রক্তের পার্থক্য	৫৯৬
হলদে রং এবং মেটে রং	৫৯৭
হায়েযগ্রস্ত নারীর সাথে যা করা বৈধ এবং আল্লাহর তা'আলার বানী– وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ-এর ব্যাখ্যা	৫৯৭
আল্লাহর তা'আলার নিষেধাজ্ঞা জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে হায়েযে অবস্থায় সঙ্গম করে তার উপর আরোপিত শাস্তির বর্ণনা	৫৯৯
হায়েজগ্রস্ত নারীর সাথে তার হায়েজের বস্ত্রে একত্রে শয়ন	৫৯৯
একই কাপড়ের নিচে ঋতুমতি স্ত্রীর সাথে পুরুষের শয্যাগ্রহণ	৬০০
ঋতুমতি স্ত্রীর শরীরের সাথে শরীর মিলানো	৬০০
রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন স্ত্রী ঋতুমতি হতেন তখন তিনি তার সাথে কি করতেন	৬০১
ঋতুমতির সঙ্গে একত্রে খাদ্যগ্রহণ ও তার উচ্ছিষ্ট হতে পান করা	৬০২
ঋতুমতির ভুক্তাবশেষ ব্যবহার	৬০৩
ঋতুমতি স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে পুরুষের কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত	৬০৩
ঋতুমতি নারী থেকে নামায রহিত হওয়া	৬০৪
ঋতুমতি নারীর খেদমত গ্রহণ	৬০৫
ঋতুমতি নারীর মসজিদে চাদর বিছানো	৬০৫
ঋতুমতি স্ত্রীর মসজিদে ইতিকাফরত স্বামীর মাথা আঁচড়ানো	৬০৬
ঋতুমতি স্ত্রীর জন্য স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া	৬০৬
ঋতুমতি নারীদের ঈদে ও মুসলমানদের দাওয়াতে উপস্থিত হওয়া	৬০৭
যে নারী তাওয়াফে ইফরাদের পরে ঋতুমতি হয়	৬০৭
নিফাসগ্রস্ত মহিলা ইহরামের সময় কি করবে?	৬০৮
নিফাসগ্রস্ত মহিলার জানাযার নামায	৬০৮
ঋতুর রক্ত কাপড়ে লাগলে	৬০৯
অধ্যায় ঃ গোসল ও তায়াম্মুম	৬০৯
বদ্ধ পানিতে জুনুব ব্যক্তির গোসলের নিষেধাজ্ঞা	৬১০
হাম্মামে প্রবেশের অনুমতি	৬১১
বরফ এবং মেঘের পানিতে গোসল করা	৬১২
ঘুমানোর পূর্বে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করা	৬১৩
রাতের প্রথমভাগে গোসল করা	৬১৩
গোসল করার সময় আড়াল করা	৬১৪
গোসলের পানির কোন পরিমাণ নেই	৬১৫
স্বামী-স্ত্রী একই পাত্রে থেকে গোসল করা	৬১৬
এ ব্যাপারে অনুমতি	৬১৭
এমন পাত্রে গোসল করা যাতে আটার চিহ্ন বিদ্যমান	৬১৭
গোসলের সময় মহিলাদের মাথার চুলের বাঁধন না খোলা	৬১৭
সুগন্ধি ব্যবহার করে গোসল করলে এবং সুগন্ধির চিহ্ন অবশিষ্ট থাকলে	৬১৯
জুনুবী ব্যক্তির শরীরে পানি ঢালার আগে নাপাকি দূর করা	৬২০
গুপ্ত অঙ্গ ধৌত করার পর হাত মাটিতে মুছে ফেলা	৬২০
উযূ দ্বারা জানাবাতের গোসল আরম্ভ করা	৬২১
পবিত্রতা অর্জনের কাজে ডান দিক থেকে শুরু করা	৬২২
জানাবাতের উযূতে মাথা মাসেহ না করা	৬২২
জানাবাতের গোসলে সর্ব শরীরে পানি পৌছানো	৬২৪
জুনুবীর জন্য কতটকু পানি মাথায় ঢালা যথেষ্ট	৬২৪
হায়েযের গোসলে করণীয়	৬২৫
ইহরামের সময় নিফাসগ্রস্ত মহিলার গোসল	৬২৬
গোসলের পর উযূ না করা	৬২৬
এক গোসলে সকল স্ত্রীর নিকট গমন	৬২৭
মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা	৬২৭
যে ব্যক্তি নামাযের পর পানি পায় তার তায়াম্মুম	৬৩০
মযী নির্গত হলে উযূ করা	৬৩৩
নিদ্রার দরুন উযূ করার নির্দেশ	৬৩৫
পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার দরুন উযূ করা	৬৩৯

ইলমে হাদীস সংক্রান্ত জরুরী আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈলের মাধ্যমে মহানবী (স)-এর উপর যে ওহী নাযিল করেন তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ– "ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা" – (উমদাতুল ক্বারী. ১ খ. পৃঃ ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান– যা প্রত্যক্ষ ওহী (وَحْيِ مَتْلُو)-র মাধ্যমে প্রাপ্ত। এর নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর। রাসূলুল্লাহ (স) তা হুবহু আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান– যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষা এবং যা পরোক্ষ ওহী (وَحْيِ غَيْرِ مَتْلُوْ)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত। এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহর, কিন্তু নবী করীম (স) তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হত এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

নবী করীম(স) কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। বরং এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্যে রাসূলুল্লাহ (স) যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা-ই হচ্ছে হাদীস। হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এর প্রমাণ হল আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ الا وَحْيٌ يُوْحٰى .

"তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন তা সবই আল্লাহর ওহী।" (সূরা নাজমঃ ৩-৪)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ .

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমার নামে চালিয়ে দিতেন– তবে আমি অবশ্যই তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তাঁর কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম।" – (সূরা আল-হাক্কা ঃ ৪৪-৪৬)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে একথা ফুঁকে দিলেন– নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুস্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না" (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। " জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে অনুরূপ আরও একটি জিনিস।" – (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারিমী)।

হাদীসের পরিচয়

الحديث এর আভিধানিক অর্থ ঃ কালজয়ী আরবী অভিধান 'সিহাহ'-এ আল্লামা জাওয়ারী (র) লেখেন الحديث الكلام قليله وكثيره অর্থাৎ কম-বেশী সর্বপ্রকার কথাকে 'হাদীস' বলে। আল্লামা সাখাভী (র) লেখেন– الحديث لغة ضد القديم واستعمل في قليل الكلام وكثيره অর্থাৎ হাদীস শব্দটি অভিধানিক অর্থে قديم (প্রাচীন) এর বিপরীত শব্দ এবং এটা কম-বেশি কথা অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা ঃ

১. اَلنَّبَأُ (খবর, সংবাদ)। যেমন هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ (তোমার কাছে সৈন্যবাহিনীর সংবাদ পৌছেনি?)

২. الجديد (নতুন, আধুনিক)। যেমন هذا امر حديث (এটা নতুন বা আধুনিক বিষয়।)

৩. الرُّؤيا (স্বপ্ন)। যেমন– وَعَلَّمْتَنِيْ بِتَاوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ (আপনি আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন।)

৪. القِصَّة (কাহিনী)। যেমন– هل اتاك حديث موسى (তোমার কাছে মূসার কাহিনী পৌঁছেনি?) ইত্যাদি।

الحَدِيْث এর পারিভাষিক অর্থ ঃ

উলামায়ে কিরাম বিভিন্নভাবে এর সংজ্ঞা পেশ করেছেন। যথা ঃ

১. জুমহুর মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে হাদীসের সংজ্ঞা হলো–

الحديثُ ما اُضِيْفَ الى النبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قولٍ او فعلٍ اوتقريرٍ وكذالك يُطلَقُ على قولِ الصَّحابةِ والتَّابِعِيْن وفعْلِهم وتقْرِيْرِهم.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকে হাদীস বলে। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনদের প্রতি সম্বন্ধকৃত কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকেও হাদীস বলে।

২. হাফিয সাখাবী (র) ফতহুল মুগীস ফী শরহি আলফিয়াতিল হাদীস গ্রন্থে লেখেন–

الحديثُ مَا اُضِيْفَ الَى النبيّ صلى الله عليه وسلم قولًا لهٗ اوفعلًا اوتقريرًا اوصفةً حتّى الحَرَكاتِ والسَّكَنَاتِ فِى اليَقْظَةِ وَالمَنَامِ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্বন্ধকৃত উক্তি, কর্ম, সাহাবীদের কর্মের নীরব সমর্থন এবং তাঁর গুণাবলী এমনকি ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় তাঁর নড়াচড়া, নীরবতা সবকিছুই হাদীস। [ফতহুল মুগীস ঃ পৃ.-১২]

৩. ড. মাহমূদ আত তাহহান লিখেন–

الحديثُ مَا اُضِيْفَ اِلى النبىّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قولٍ او فعلٍ اوتقريرٍ اوصِفةٍ

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ মৌন সমর্থন ও যাবতীয় গুণাবলীকে হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ (سنة) , এর আভিধানিক অর্থ হল الطريق তথা চলার পথ, কর্মের রীতি-নীতি ও পদ্ধতি। রাসূল (স) স্বীয় জীবনে যে পন্থা বা রীতি-নীতি গ্রহণ করতেন তা-ই সুন্নাতে নববী হিসেবে বিবেচিত। অপর কথায় রাসূল (স) কর্তৃক প্রচারিত যে উচ্চতম আদর্শ আল্লাহর মর্জি ও মত প্রমাণ করে প্রকাশ করে তা-ই সুন্নাত। হাদীসকে আরবীতে خبر ও বলা হয়। তবে এটি হাদীস ও ইতিহাস উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এভাবে اثار শব্দটিও কখনো কখনো হাদীস অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে অনেকে হাদীস ও আছার এর মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীগণ থেকে শরীআত সম্পর্কে যা উদ্ধৃত হয়েছে তাকে আছার বলে তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীগণ নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ (স) এরই উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে قَالَ النَّبِيُّ صلعم (নবী করীম স. বলেছেন"এরূপ বলেন নি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এরূপ আছারকে "মাওকূফ হাদীস" বলা হয়।

হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের উপাধি

১. الراوى রাবী। বহুবচন رُوَاة , আভিধানিক অর্থ বর্ণনাকারী, কাহিনীকার, বিবরণদাতা।

পরিভাষায় রাবীর সংজ্ঞা নিম্নরূপে দেয়া হয়েছে–

الرَّاوِى هُو الَّذِى يَنْقُل الحديثَ بِاِسْنَادِهٖ سواءً كَانَ رجلًا ام امرأةً

অর্থাৎ রাবী ঐ ব্যক্তিকে বলে যিনি সনদ সহকারে হাদীস বর্ণনা করেন। চাই তিনি পুরুষ হোন বা নারী। (ড. সুবহী আসসালিহ রচিত উলূমুল হাদীস পৃষ্ঠা-১০৬)

কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে, রাবী ঐ ব্যক্তিকে বলে যিনি হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি অনুযায়ী হাদীস বর্ণনা করেন। চাই তিনি তাঁর বর্ণিত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হন বা না হন।

২. المسند (মুসনিদ)। আভিধানিক অর্থ সনদ বর্ণনাকারী। পরিভাষায় মুসনিদের সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

المُسْنِدُ هو مَن يَرْوِى الْحَدِيثَ بِسَنَدِهِ سواءً كانَ عنده عِلمٌ بِهِ أم لَيْسَ لَهُ إلا مُجَرَّدُ الرِّوايَةِ

অর্থাৎ যিনি সনদসহ হাদীস বর্ণনা করেন, তাকে মুসনিদ বলা হয়। তিনি হাদীস শাস্ত্রে বিজ্ঞ হতেও পারেন অথবা বর্ণনা করা ছাড়া অধিক কিছুতে বিজ্ঞ নাও হতে পারেন। (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃষ্ঠা-১৭)

৩. المحدث (মুহাদ্দিস) শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ণনাকারী, বক্তা ইত্যাদি। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় মুহাদ্দিস এর সংজ্ঞা নিরূপণে চারটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা–

২. আল্লামা তাহির জাযাইরী (র) এর মতে, যিনি সনদসহ হাদীস রিওয়ায়াত করেন এবং মতন (মূলপাঠ) সম্পর্কেও যাঁর সম্যক ধারণা রয়েছে তাঁকে মুহাদ্দিস বলে। (আননাহজুল হাদীস পৃষ্ঠা-২২)

৩. মুফতী আমীমুল ইহসান (রা) এর মতে, যিনি পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন উস্তাদ এবং যিনি সদা-সর্বদা হাদীস গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন। নিজের শায়খের নিকট থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করার অনুমতি লাভ করেছেন, হাদীসের নিগূঢ় অর্থ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং রিওয়ায়াত ও দিরায়াত সম্পর্কে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন; তাঁকে মুহাদ্দিস বলা হয়। (মীযানুল আখবার পৃষ্ঠা-৬৬।)

৪. ড. সুবহী আসসালিহ এর মতে, যিনি হাদীসের সনদ, মতন, সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি আসমাউর রিজাল, সনদে আলী–সনদে নাযিল প্রভৃতি সম্পর্কে অবগত। হাদীসের অধিকাংশ মতন মুখস্ত করেছেন এবং সিহাহ সিত্তাসহ, মুসনাদে আহমদ, সুনানুল বায়হাকী, মু'জামুত-তাবারানী এবং এর সাথে এক হাজার 'জুয' যার আয়ত্বে রয়েছে তিনি মুহাদ্দিস।

৪. الشيخ। এর আভিধানিক অর্থ বয়োবৃদ্ধ, ভদ্রলোক, সম্মানিত ব্যক্তি, উস্তাদ, অধ্যাপক ইত্যাদি। ইলমে হাদীসের পরিভাষায় মুহাদ্দিস সমপর্যায়ের হাদীস বিশেষজ্ঞকেই শায়খ বলা হয়। মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী লেখেন, হাদীস শিক্ষাদাতা রাবীকে তার শাগরিদদের তুলনায় শায়খ বলা হয়ে থাকে। (হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস পৃষ্ঠা-৪।)

৫. الحافظ। (আল হাফিয) এর আভিধানিক অর্থ হিফাযতকারী, রক্ষাকারী, কণ্ঠস্থকারী ইত্যাদি। ইলমুল হাদীসের পরিভাষায় 'হাফিয' এর সংজ্ঞা নিরূপণে হাদীস তত্ত্ববিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। পূর্ববর্তী হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ মনীষীগণের মতে হাফিয ও মুহাদ্দিস-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে পরবর্তী হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ মনীষীগণের মতে, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাদের মতে 'হাফিয' 'মুহাদ্দিস' এর তুলনায় উচুস্তরের।

৬. الحُجَّة। (আল-হুজ্জাত) এর আভিধানিক অর্থ হল দলিল, প্রমাণ। মোল্লা আলী কারী (র) এর সংজ্ঞায় বলেন–

الحُجَّةُ مَنْ أحاطَ عِلمُهُ بِثَلاثِ مِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ

অর্থাৎ হুজ্জাত বলা হয় যার তিন লাখ হাদীস মুখস্থ।

৭ الحاكم। (আল-হাকিম) এর আভিধানিক অর্থ হল বিধানদাতা, নির্দেশকারী। মোল্লা আলী কারী (র) এর সংজ্ঞায় বলেন–

الحَاكِمُ هُوَ الَّذِى أحاطَ عِلمُهُ بِجَمِيعِ الأحَادِيثِ مَتْنًا واسنادًا وجَرْحًا و تَعْدِيلًا وتارِيخًا ۔

অর্থাৎ হাকিম বলা হয় যার সমস্ত হাদীস সনদ, মতন জরাহ- তা'দীন ও ইতিহাসসহ মুখস্থ থাকে।

ভারত উপমহাদেশে হাদীস চর্চা

ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে (৭১২) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয়। এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতর হতে থাকে। ইসলামে প্রচারে নিবেদিত প্রাণ আল্লাহ বহু বান্দা উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র তথা অসংখ্য মাদরাসা গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ আবু তাওয়ামা (মৃ. ৭০০ হিঃ) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীসের চর্চার ব্যাপক

ব্যবস্থা করেন। তৎকালীন বঙ্গের রাজধানী হিসেবে এখানে অসংখ্য মুহাদ্দিসের সমাগম হয়। ফলে হাদীস চর্চায় এক অসাধারণ কেন্দ্ররূপে মুসলিম বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল এবং বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী (স)-এর হাদীস ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ

হাদীসের কিতাবসমূহকে পাঁচটি স্তর বা তবকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র)-ও তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন ঃ

প্রথম স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি ঃ 'মুওয়াত্তা ইমাম মালিক', 'বুখারী শরীফ' ও 'মুসলিম শরীফ'। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবূ দাউদ ও জামি তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনানে দারিমী, সুনানে ইবন মাজাহ এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মতে, মুসনাদে ইমাম আহমদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে।

এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মা'রূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদে আবূ ইয়া'লা, মুসনাদে আবদুর রাযযাক এবং ইমাম বায়হাকী, ইমাম তাহাবী ও ইমাম তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত। বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইবন হিব্বানের কিতাবুয যুআফা, ইবনুল আছীরের আল-কামিল এবং খতীব আল-বাগদাদী ও আবূ নুআয়তম-এর কিতাবসমূহ এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম স্তর ঃ উপরিউক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

হাদীস সংরক্ষণ ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম মহানবী (স)-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করেছেন ঃ

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِى فَحَفِظَهَا وَ وَعَاهَا وَاَدَّاهَا اِلٰى مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا .

"আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন – যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হেফাজত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌঁছে দিল, যে তার শুনতে পায়নি।" – (তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০)

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উল্লিখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী (স)-এর হাদীস সংরক্ষিত হয় ঃ

(১) উম্মতের নিয়মিত আমল,

(২) রাসূলুল্লাহ (স) লিখিত ফরমান, সাহাবীগণের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং

(৩) হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতিতে সঞ্চিত রাখা, এরপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণভাবে প্রখর ছিল। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী (স) যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, এরপর মুখস্থ করে নিতেন।

তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লক্ষ লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস মুখস্থ করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস মুখস্থ হত।" (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) যে নির্দেশই দিতেন সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী (স)-এর নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন– আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তর জন লোক উপস্থি থাকত বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম– তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সব কিছু মুখস্থ হয়ে যেত।" – (মাজমাউয-যাওয়াইদ ১খ. পৃ. ১৬১)

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নেই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস অধ্যয়ন করি।" – (দারিমী)

মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল– সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফফা) কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

লেখনীর মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রণয়ন

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। "হাদীস মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইনতিকালের শতাব্দীকাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে" বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, তার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে– কেবল এ আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন ঃ لَا تَكْتُبُوْا عَنِّىْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّىْ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحُهُ . "তোমরা আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার কিনট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে– তা যেন মুছে ফেলে।" – (মুসলিম)

কিন্তু যেখানে বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না– মহানবী (স) সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বললেন, আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার।" – (দারিমী)

হাদীসের সংখ্যা ঃ

হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এর সংকলিত 'মুসনাদ' গ্রন্থটি সুবৃহত। এতে ৭ শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুরুল্লেখ (তাকরার) সহ মোট ৪০ হাজার এবং তাকরার ব্যতিরেকে ৩০ হাজার হাদীস উল্লেখ রয়েছে। শায়খ আলী জৌনপুরীর 'মুনতাখাবু কানযিল উম্মাল' এ ৩০ হাজার এবং মূল 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থে তাকরার বাদে মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। বস্তুত এ কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইবনে আহমদ সমরকান্দির 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবে ১ লক্ষ হাদীস রয়েছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবেয়ীগণের আছার সহ লাখের অধিক নয় বলে মন্তব্য করা হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো কম। সিহাহ সিত্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি মুত্তাফাক আলাইহি। উল্লেখ্য যে, হাদীসের ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল বলে যে কথা বলা হয় তা মূলত হাদীসের সনদের ভিন্নতার কারণে। যেমন শুধু إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ হাদীসেরই ৭০০ এর মত সনদ রয়েছে। (তাদভীন- পৃ. ৫৪)

ইমাম নাসায়ী (র) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পরিচয় ঃ হাদীস সংকলন ও চর্চার ইতিহাসে যে সকল মনীষী বিশেষভাবে জগতের বুকে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন ইমাম নাসায়ী (র) তাঁদের অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম– আবূ আব্দির রহমান আহমদ ইবনে শুআয়ব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে দীনার নাসায়ী খুরাসানী। তাঁর উপাধি হল– শায়খুল ইসলাম, হাফিজ ও সাহিবুস সুনান।

জন্ম ও শৈশবঃ ইমাম নাসায়ী (র) ২১৫ হিজরী মুতাবিক ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে খুরাসানের 'নাসা' নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 'নাসা' এবং খুরাসানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তাঁকে যথাক্রমে নাসায়ী ও খুরাসানী বলা হয়। তিনি মূল নামের পরিবর্তে ইমাম নাসাঈ হিসাবেই জগতে প্রসিদ্ধ রয়েছেন।

ইমাম নাসায়ী-এর শৈশবকালীন লেখাপড়া সম্পর্কে তেমন কিছু বিস্তারিত জানা না গেলেও ধরে নেয়া যায় যে, তিনি নিজ শহর 'নাসা'তেই কুরআন, হাদীস, আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য, ফিকাহ, আকাইদ প্রভৃতি বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন।

উচ্চশিক্ষা লাভ ঃ মাত্র পনের বছর বয়সে ইমাম নাসায়ী (র) উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রসমূহের সফরে বেরিয়ে পড়েন। এ পর্যায়ে তিনি ইরাক, খুরাসান, হিজায, সিরিয়া, মিসর ও আল-জাযীরার শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের বহু খ্যাতনামা মুহাদ্দিসের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণ ঃ কুতায়বা ইবনে সাঈদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ, হিশাম ইবনে 'আম্মার, ঈসা ইবনে হাম্মাদ, হুসায়ন ইবনে মানসূর সুলামী নিশাপুরী, আমর ইবনে আলী, সুওয়ায়দ ইবনে নাসর, হান্নাদ ইবনে সারী, মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার, মাহমূদ ইবনে গায়লান, ইউনুস ইবনে আব্দুল আ'লা, আলী ইবনে হুজর, ইমরান ইবনে মূসা, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, হুমায়দ ইবনে মাসআদাহ, আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ সিজিস্তান ও হারিছ ইবনে মিসকীন (রহেমা হুমুল্লাহ) উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষকতা ঃ ইমাম নাসায়ী (র) মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রসমূহ পরিভ্রমণ করে অবশেষে মিসরে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই হাদীসের দরস দেয়া শুরু করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার জন্যে খুব শীঘ্রই দেশ-দেশান্তরে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থীরা তাঁর মজলিসে ভিড় জমাতে শুরু করেন।

তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রগণ ঃ আবূ বিশর দূলাবী, আবূ আলী হুসায়ন নিশাপুরী, হামযা ইবনে মুহাম্মদ কিনানী, আবূ বকর আহমদ ইবনে ইসহাক সররী, আবুল কাসিম সুলায়মান ইবনে আহমদ তাবারানী, আবূ জাফর তাহাবী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ হাদ্দাদ শাফিঈ, আব্দুল করীম ইবনে আবী আব্দুর রহমান নাসায়ী, মুহাম্মাদ ইবনে মূসা মামূনী, আবূ জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল নাহহাস।

মিসর ত্যাগ ও ইন্তিকাল ঃ দীর্ঘদিন মিসরে বসবাস করার পর প্রতিকূল অবস্থার দরুন তিনি ৩০২ হিজরী/ ৯১৪ খ্রিস্টাব্দে দামেশ্‌কে রওয়ানা হন। কিন্তু সেখানে বাস করাও তাঁর জন্য কষ্টকর হয়ে উঠে। তিনি দামিশক পৌছার পর দেখতে পেলেন যে, জনসাধারণের অধিকাংশই উমায়্যাপন্থী এবং আলী (রা)-এর বিরোধী। এ অবস্থায় তিনি জনসাধারণের মনোভাব পরিবর্তনের লক্ষ্যে হযরত আলী (রা)-এর প্রশংসায় 'কিতাবুল খাসায়িস ফী ফাদলি আলী ইবনে আবী তালিব' গ্রন্থটি সংকলন করেন। এরপর দামিশকের মসজিদে সমবেত জনসাধারণকে তিনি গ্রন্থটি পাঠ করে শুনান। এতে তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তারা ইমাম নাসায়ীর নিকট হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর মাহাত্ম্য জানতে চাইল। তিনি উত্তর দিলেন কিন্তু উত্তর তাদের মনঃপূত না হওয়ায় তারা হতাশ ও রাগান্বিত হয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করতে করতে মসজিদ থেকে বের করে দিলো।

এরপর নিগৃহীত ও অসুস্থ ইমামের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে মক্কা মুআজ্জমায় নিয়ে যওয়া হয়। এখানেই তিনি ৩০৩ হিজরী/ ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মতান্তরে তাঁকে ফিলিস্তিনের রমলা নামক শহরে পৌছে দেয়া হয়। পরে সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

তিনি ছিলেন খোদাভীরু ও সুন্নাহর প্রতি গভীর অনুরাগী। তিনি সওমে দাউদী পালন করতেন।

ইমাম নাসায়ী সম্পর্কে বিশ্ব বিখ্যাত আলিমগণের মন্তব্য

১. হাফিজ আলী ইবনে উমর বলেন, "হাদীসের বিদ্যায় যাঁরা পারদর্শী, ইমাম নাসায়ী তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন উলামা ও মুহাদ্দিস-এর নিকট অতি বিশ্বস্ত।" –(তাহযীবুল কামাল)

২. মুহাদ্দিস মামূন মিসরী বলেন ঃ "আমরা একদা ইমাম নাসায়ী-এর সংগে তরসূস শহরে গমন করি। তাঁর নাম শুনে সেখানে অনেক মাশায়েখ সমবেত হলেন, তাঁরা সকলেই ইমাম নাসায়ীকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীস হিসেবে মেনে নিলেন এবং লিখিত স্বীকৃতি প্রদান করলেন যে, ইমাম নাসায়ী যুগ শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীস।" –(তাহযীবুল কামাল)

৩. হাকিম আবূ আবদিল্লাহ নিশাপুরী (র) বলেন ঃ আমি আবূ আলী নিশাপুরীকে বলতে শুনেছি– "মুসলমানদের মধ্যে চারজন হাফিজ রয়েছেন। ইমাম নাসায়ী তাঁদের অন্যতম।" – (তাহযীবুল কামাল)

৪. ইবনুল হাদ্দাদ শাফিঈ বলেন ঃ "আল্লাহ ও আমার মধ্যে ইমাম নাসায়ীকে আমি মাধ্যম বানিয়েছি।" -(তাযকিরাতুল হুফফাজ)

৫. মানসূর ফকীহ ও আবূ জাফর তাহাবী (র) বলেন ঃ "নাসায়ী মুসলমানদের অন্যতম ইমাম।" - (তবকাতুশ শাফিয়্যাতিল কুবরা)

৬. হাদীসের বর্ণনাকারীদেরকে গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে ইমাম নাসায়ী-এর শর্ত ছিল অতি কঠিন। এ প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনে তাহির মাকদিসী (র) বলেন ঃ "একবার আমি সা'দ ইবনে 'আলী যানজানীর নিকট জনৈক রাবীর অবস্থা জানতে চাইলাম। উক্ত রাবী নির্ভরযোগ্য বলে তিনি মন্তব্য করলেন। আমি বললাম– ইমাম নাসায়ী তো সে রাবী যঈফ বলে মন্তব্য করেছেন। তখন তিনি বললেন ঃ বৎস! শুন, হাদীসের রাবীদের সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ-এর শর্ত এত কঠিন যে, এ বিষয়ে তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম অপেক্ষাও এক ধাপ আগে রয়েছেন। - (তাযকিরাতুল হুফফাজ, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা)

ইমাম নাসায়ী (র) প্রণীত গ্রন্থাবলী

ইমাম নাসায়ী (র) বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

১. আল-সুনানুল কুবরা, ২. আল-মুজতাবা (সুনানে নাসায়ী) ৩. কিতাবুল খাসাইস ফী ফাদলি আলী ইব্‌ন আবী তালিব ওয়া আহিলিল বায়ত, ৪. কিতাবুদ দুআফা ওয়াল মাতরূকীন, ৫. তাসমিয়াতু ফুকাহাইল আমসার মিন আসহাবি রসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আয়ায়হি ওয়াসাল্লাম ওয়ামান বা'দাহুম মিন আহলিল মাদীনা, ৬. ফাদাইলুস সাহাবা, ৭. তাফসীর, ৮. কিতাবু আ'মালিল ইয়াওমি ওয়াল লায়লা, ৯. তাসমিয়াতু মান লাম ইয়ারবি আনহু গায়রু রজুলিন ওয়াহিদিন।

সুনানে নাসায়ী প্রসঙ্গ

সুনানে নাসায়ীর পরিচয় ও গুরুত্ব

ইমাম নাসায়ী (র) প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নাসায়ী শরীফ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থের কারণেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি সমসাময়িক কালের অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। প্রথম তিনি আস-সুনানুল কুবরা নামে একখানি বৃহদায়তনের হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন যাতে সহীহ ও যঈফ সব রকমের হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আস-সুনানুল কুবরার কলেবর হ্রাস করে এবং শুধু সহীহ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করে আস-সুনানুল কুবরার সংক্ষিপ্তসার স্বরূপ তিনি আল-মুজতাবা (আস-সুনানুস সুগরা) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বর্তমানে প্রচলিত আস-সুনান গ্রন্থটিই হলো সেই আল-মুজতাবা।

সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থাবলীর মধ্যে সুনানে নাসায়ীর স্থান পঞ্চম এবং সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে তৃতীয়। অবশ্য মুহাম্মদ আবদুল আযীয খাওলী (র) তাঁর 'মিফতাহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে এর স্থান তৃতীয় বলে উল্লেখ করেছেন। সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে আলোচ্য বিষয় এবং হাদীসের সংখ্যার দিক দিয়ে সুনানে নাসাঈ অধিকতর বিশদ ও ব্যাপক। এ গ্রন্থে ৫৭৬১টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সুনানে নাসায়ীর বৈশিষ্ট্যাবলী

ইমাম নাসায়ী (র)-এর সুনান গ্রন্থটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ

১. ইমাম নাসায়ী (র) তাঁর এ সুনান গ্রন্থে জীবনের সকল দিক সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এমনকি রুকূ-সাজদার তাসবীহ, দু'আ ও অন্যান্য সর্ব প্রকারের দু'আ সম্পর্কিত বহু হাদীস এনেছেন।

২. ইমাম নাসায়ী (র) প্রচলিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নতুন প্রসঙ্গ ও শিরোনামকে 'কিতাব' বলে নামকরণ করেছেন। যথা-কিতাবুল তাহারাত, কিতাবুল জানাইয প্রভৃতি।

৩. মাসআলা প্রমাণের জন্য ইমাম বুখারী (র)-এর ন্যায় তিনি এ গ্রন্থে একই রেওয়ায়াতকে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন।

৪. এ গ্রন্থে ইমাম নাসায়ী হাদীসের সূত্রগুলোকে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন।

৫. এ গ্রন্থে রাবীগণের নাম, উপনাম ও উপাধির অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে।

৬. নাসায়ীর রচনা ও বিন্যাস পদ্ধতি খুবই সুন্দর। হাকিম নিশাপুরি বলেন ঃ " সুনানে নাসায়ী যে মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করবে সে এর অপূর্ব বাক সৌন্দর্যে অভিভূত হবে।" – (মিফতাহুস সা'আদাহ ও সিয়ারু আ'লামিন নুবালা)

৭. এ গ্রন্থে হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞানের ধারায় সনদ ও মতনের পর্যালোচনাপ করা হয়েছে।

৮. এ গ্রন্থে দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

৯. অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের তুলনায় ইমাম নাসায়ীর এ সুনান গ্রন্থে অনেক বেশি باب বা পরিচ্ছেদ রয়েছে। এ গ্রন্থের প্রতিটি كتاب বা অধ্যায়ের অধীনে বিপুল সংখ্যক বাব আনা হয়েছে এবং বাবগুলোও সূক্ষ্মভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

সুনানে নাসায়ীর শরাহ ও টীকাগ্রন্থ

হাদীসের বিশুদ্ধতা ও ক্রমবিন্নাসের দিক থেকে নাসায়ী শরীফ যে মর্যাদা ও মাহাত্মের অধিকারী সে অনুপাতে এর শরাহ ও টীকাগ্রন্থের সংখ্যা কমই বলতে হবে। এর প্রধান কারণ হল, এ গ্রন্থের বর্ণনাভঙ্গি খুবই সহজ-সরল। এর অর্থ স্পষ্ট, সনদ সূত্র পরিষ্কার এবং শিরোনাম অনেক। এতদ্সত্ত্বে এর যে সব শরাহ ও টীকাগ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুরোর মধ্যে নিম্নোল্লিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

১. যাহরুর রুবা আলাল মুজতাবা। এটা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. রচিত। এটা কায়রো, কানপুর ও দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২. উরফু যাহরির রুবা। এটা মরক্কোর ফকীহ আলী ইবনে সুলায়মান আদ-দামনাতী আল-বাজমাউবী (মৃ. ১৩০৬ হিঃ/১৮৮৯) কর্তৃক ইমাম সুয়ূতী এর শরাহ এর সংক্ষিপ্ত সার। ১৩৯৯ সনে এটা কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আবদিল হাদী আস-সিন্দী র. (মৃ. ১১৩৮/১৭২৬) সুনানে নাসায়ীর উপর টীকা লি-খেছেন। ১৩৫৫ হিজরীতে এটা কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

৪. আবূ আবদির রহমান পাঞ্জাবী ও মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ আস-সুয়ূতীর ভাষ্য ও সিন্দী র. এর টীকাসহ সুনানে নাসায়ী দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।

৫. মুহাম্মদ আতাউল্লাহ ভূজিয়ানী রচিত আত-তা'লীকাতুস সালাফিয়্যা সংযোজন করে সুনানে নাসায়ী লাহোর থেকে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৬. আবুল হাসান আলী ইবনে আবদিল্লাহ আল-আন্দুলূসী (মৃ. ৭৫৬ হিঃ) الإمعان في شرح سنن النسائي নামে এর একটি শরাহ বা ভাষ্যগ্রন্থ লিখেন।

৭. আল্লামা ইবনে মুলকিন (মৃ. ৮০৪ হিঃ) যাওয়াইদুন নাসায়ী নামে এর একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন।

৮. সিহাহ সিত্তার উর্দূ অনুবাদক মাওলানা নওয়াব ওয়াহিদুয যামান হায়দারাবাদী 'রাওদুর রুবা আন তারজিমাতিল মুজতাবা' নামে নাসায়ীর একটি উর্দূ অনুবাদ লিখেছেন। এটি লাহোর থেকে ১৮৮৬ খ. প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো ছাড়া আরো কয়েকটি টীকাগ্রন্থ রয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (২০০০ খৃ.) থেকে এর একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الرَّبَّانِيُّ الرِّحْلَةُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ الصَّمَدَانِيُّ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ النَّسَائِيُّ ـ

অনুবাদ ঃ আলিমে রব্বানী, আল-হাফিজ, আল হুজ্জাত, আস-সামাদানী ইমাম শায়খ আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবম শুআয়ব ইবন আলী ইবন বাহ্‌র আন-নাসায়ী (র) বলেন,

---

سوال ـ لِمَ افْتَتَحَ الْمُصَنِّفُ كِتَابَه بِبِسْمِ اللّٰهِ وَلَمْ يَقُلْ بِحَمْدِ اللّٰهِ بَيِّنْ وَجْهَهُ ـ

প্রশ্ন ঃ মুসান্নিফ (র) স্বীয় কিতাবকে কেন حَمْدُ اللّٰه কে বাদ দিয়ে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করলেন? এর কারণ বর্ণনা কর

উত্তর ঃ ১. ইমাম নাসায়ী (র) রাসূল (স) এর অনুসৃত বাণী ও হাদীস সম্ভারের গ্রহণযোগ্য কিতাব সংকলনের প্রারম্ভে ঐ সকল মুবারক চিঠির অনুসরন করেছেন যা, রাসূল (স) তাঁর রিসালাত ও নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন রাষ্টপ্রধান ও রাজা-বাদশাহগণের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। কেননা, ঐ সকল চিঠির শুরুতে بسم الله .... الخ উল্লেখ (থাকার কথা বর্ণিত) আছে।

২. অনুরূপভাবে হযরত সুলায়মান (আ) সাবা সম্প্রদায়ের নিকট যে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন তার শুরুতে بسم الله থাকা কুরআনের মাধ্যমে প্রমাণিত আছে। কাজেই কুরআনুল কারীমের অনুসরনার্থে স্বীয় কিতাবকে بسم الله দ্বারা শুরু করেছেন।

৩. অনুরূপভাবে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে–

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِبِسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ اَىْ قَلِيْلُ الْبَرَكَةِ .

এ হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। কোথাও بِحَمْدِ اللّٰه কোথাও بِذِكْرِ اللّٰه উল্লেখ রয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দিস এ হাদীসকে দ্বয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ এটাকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বর্ণনা ঐটাই যা শায়খ তাজুদ্দীন সুবকী طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرٰى গ্রন্থে হাফেজ ইবনুস সলাহ থেকে নকল করেছেন যে, তা হলো হাদীসটি حسن এর পর্যায়ভুক্ত যা সহীহ থেকে একটু নিম্নস্তরের এবং দ্বয়ীফ থেকে একটু উপরের স্তরের।

এ হাদীসের সনদে কুররা ইবনে আব্দুর রহমান রয়েছেন যার মুতাবা'আত করেছেন সাঈদ ইবনে আব্দুল আজীজ (ইমাম নাসায়ীর বর্ণনা মুতাবেক)।

অপর দিকে ফুকাহা ও মুহাদ্দেসীনে কিরামের আমল এটাই যে, তাঁরা তাঁদের গ্রন্থকে بسم الله দ্বারা শুরু করেন। মোটকথা হাদীস তো একটাই কিন্তু তার শব্দ বিভিন্ন ধরণের। সারকথা হলো বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ করতে হলে আল্লাহর নামের দ্বারাই শুরু করতে হয়। চাই সেটা বিসমিল্লাহ এর সুরতে হোক কিংবা হামদের সুরতে হোক অথবা এ দুটি ভিন্ন আল্লাহ তা'আলার অন্য কোন নামের মাধ্যমে হোক।

মুসান্নিফ (র) উল্লেখিত হাদীসের উপর দৃষ্টি রেখে তার উপর আমল করণার্থে স্বীয় কিতাবকে بسم الله দ্বারা শুরু করেছেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা একান্ত জরুরী। আর তা হলো অনেক লোক এ হাদীস সম্পর্কে এ ধারণাপোষণ করেন যে, উল্লেখিত হাদীসটি একটি হাদীস নয় বরং শব্দের ভিন্নতার কারণে একাধিক (হাদীস)।

তারা হাদীসগুলোর পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় করার লক্ষ্যে ابتداء কে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে কোন হাদীসকে হাকীকী শুরুর উপর, কোন হাদীসকে ইজাফীর উপর এবং কোন হাদীসকে উরফীর উপর প্রয়োগ করেছেন। বস্তুত এটা কৃত্রিমতামুক্ত নয়। বরং এটা হাদীস শাস্ত্র এবং তার কায়দা কানুন থেকে উদাসিনতার পরিচায়ক। তাদের এ সকল কিছু উদ্ভাবনের মূল ভিত্তি হলো এটাকে একাধিক হাদীস মনে করা। অথচ এটা একটা হাদীস মাত্র, যার শব্দ বিভিন্ন ধরনের, কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের কোন খবরই নেই। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) এমনটাই বলেছেন। (মাআরিফুস সুনান ঃ খণ্ড নং ১ পৃষ্ঠা নং ৩)

قوله : قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الخ

سوال ـ مَنْ قَائِلُ قَالَ؟

প্রশ্ন ঃ قال এর قائل কে?

উত্তর ঃ قال এর قائل হলেন আবু বকর ইবনে সুনী যিনি ইমাম নাসায়ী (র) এর শাগরেদ।

سوال ـ اَوْضِحْ مَعْنَى الشَّيخ وَالْإِمام والعَالِم والرِّحلَة والحُجَّة إيضاحًا تامًّا ـ

প্রশ্ন ঃ شيخ ـ امام ـ عالم ـ رحلة ـ حجة এর অর্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ঃ الشيخ এ শব্দটি অভিধানে شاب (যুবকের) শব্দের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। আহলে লোগাতের পরিভাষায় شيخ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার বয়স পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করে ৮০ বৎসর পর্যন্ত পৌঁছেছে। কেউ কেউ বলেন شيخ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার বয়স চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করেছে। চিকিৎসকদের পরিভাষায় شيخ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার দেহের গভীর উষ্ণতা দেহ থেকে লোপ পাওয়া শুরু হয়েছে।

মুহাদ্দেসীনের পরিভাষায় এটি তা'দীল প্রকাশক একটি শব্দ। সুতরাং যার জন্য আদালতের নিম্নস্তর প্রমাণিত হয়েছে তাদের পরিভাষায় তিনি শায়খ। আহলে আরবদের পরিভাষায় এ শব্দটি সম্মান প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মোল্লা আলী ক্বারী (র) বলেন, شيخ এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে ইলমে জাহেরী এবং ইলমে বাতেনীতে পূর্ণ পরিপক্কতা অর্জন করে। যদিও সে বয়সের দিক দিয়ে যুবক হয়। অনুরূপভাবে এ শব্দটি মুরশিদ ও কোন বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্যেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পরিভাষায় شيخ শব্দটি মুহাদ্দিসদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং উস্তাদের জন্যেও ব্যবহৃত হয়। আর আলোচ্য ইবারতে এই অর্থই উদ্দেশ্য।

قوله الامام ... الخ ঃ ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন ইমাম বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার অনুসরণ করা হয়। চাই তা মানুষ হোক কিংবা কিতাব হোক কিংবা অন্য কিছু হোক আর তা হক হোক কিংবা বাতিল। কিন্তু এখানে ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়ে যার অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

قوله الثقة ... الخ : ثقة শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো নির্ভরযোগ্য। পরিভাষায় এমন ব্যক্তিকে ثقة বলা হয় যিনি আদেল ও যাবেত।

قوله الربّاني ...الخ ঃ এ শব্দটি الربّ শব্দের দিকে সম্পর্কিত এটি মাসদার। অর্থ প্রতিপালন করা। কারো কারো মতে এটি আল্লাহ তাআলার নাম الرب এর দিকে সম্পর্কিত।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله العالم...الخ ঃ এ শব্দটি العِلْمُ মাসদার হতে اسم فاعل এর সীগা। অর্থ জানা। পরিভাষায় আলিম বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি ধর্মীয় জ্ঞানসমূহ যথাযথভাবে আহরণ করেছেন।

قوله الرِّحْلَةُ ... الخ ঃ এ শব্দটি যুগ প্রসিদ্ধ আলিমদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যার নিকট লোকেরা ভ্রমন করে

আসে। পরিভাষায় ঐ শায়খকে বুঝানোর জন্য اَلرِّحْلَةُ শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় যার নিকট লোকেরা হাদীস এবং দ্বীনি ইলম অন্বেষণের জন্য দূর দূরান্ত হতে দলে দলে ভ্রমণ করে আসে। الرحلة শব্দটি را এর উপর পেশ যোগে এবং ح এর উপর সাকিন সহকারেও পড়া যায় অর্থাৎ اَلرُّحْلَةُ , এর অর্থ হলো কামেল পুরুষ।

قوله الحُجَّة ... الخ ঃ الحُجَّة শব্দটির অর্থ দলীল। মুহাদ্দেসীনের পরিভাষায় হুজ্জত বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি রাবীদের অবস্থা সহকারে তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ব করেছেন।

سوال ـ اَلْعَالِمُ الرَّبَّانِيُّ مَنْ هُوَ؟

প্রশ্ন ঃ عالم ربّانى কে ? **বল।**

উত্তর ঃ ১. عالم ربّانى বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি নিজের ইলমকে প্রতিপালন করেন অথবা ঐ ব্যক্তিকে যিনি ইলমের মাধ্যমে নিজের সত্তাকে প্রতিপালন করেন। বাস্তবিক পক্ষে এ দুটি শব্দের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। বরং একটি অপরটির জন্য আবশ্যক। কেননা, যে ব্যক্তি ইলমের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিপালন করেন সে ইলমেরও প্রতিপালন করেন। কারণ তিনি তো বাস্তবে ইলমের বদৌলতেই নিজেকে শিক্ষিত ও প্রতিপালন করেছেন। কেউ কেউ বলেন যিনি তার ইলম অনুসারে আমল করেন এবং দোষণীয় কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন প্রশংসনীয় কাজ দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করেন তাকে আলেমে রাব্বানী বলা হয়।

১. কেউ কেউ বলেন– اَلْكَامِلُ الْجَامِعُ فِى الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الرَّافِعِ

৩. আলেমে রাব্বানী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি উপকারী ইলম এবং সৎ কর্মের মাধ্যমে পূর্ণতার চুড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী– وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ এর তাফসীর করা হয় উলামা ফুকাহা ও হুকামা দ্বারা।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলে – الرَّبَّانِى هُوَ الَّذِى يُرَبِّى النَّاسَ بِصِغَارِ العلمِ قبلَ كِبارِ

আল্লাহর পরিচয় লাভকারী ঐ ব্যক্তিকে রব্বানী বলা হয় যে, লোকদের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে উচ্চ পর্যায়ের ইলমের পূর্বে নিম্নস্তরের ইলম দ্বারা লোকদেরকে প্রতিপালন করে পূর্ণতার চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে দেন।

৫. কেউ কেউ বলেন, আলেমে রাব্বানী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো–

هو الَّذى لا يَمِيْلُ فِى الْاَحْوالِ كُلِّهَا الى الربِّ

যে ব্যক্তি সকল অবস্থায় আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো দিকে মনোনিবেশ করে না তাকে عالم ربانى বলা হয়।

قوله الحَافِظُ ... الخ

سوال ـ ما معنَى الْحافِظِ والحُجَّةِ والحَاكِمِ وما التحقيقُ فيْهَا؟

প্রশ্ন ঃ حَافظ ـ حُجّة ـ حَاكم **কাকে বলে** এবং এ ব্যাপারে গবেষণামূলক বক্তব্য কি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মোল্লা আলী ক্বারী (র) এ শব্দগুলোর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন–

الحافظ : هُوَ مَنْ اَحاطَ عِلْمُهُ بِمِائَةِ الفِ حديثٍ .

অর্থাৎ হাফেজ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যার এক লাখ হাদীস মুখস্থ থাকে।

والحجه : وهُوَ مَنْ اَحاطَ علمه بثَلاثِ مِائَةِ الفِ حديثٍ

হুজ্জত বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যার তিন লক্ষ হাদীস মুখস্ত থাকে।

والحاكم : وهُوَ الَّذى اَحاط عِلْمُهُ بِجَمِيْعِ الْاَحادِيثِ مَتْنًا وَاِسْنادًا وجَرحًا وتَعْدِيلًا وتَارِيخًا .

হাকেম বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যার সমস্ত হাদীস সনদ, মতন, জরাহ, তাদীল, ইতিহাসসহ মুখস্থ থাকে। মোল্লা আলী ক্বারী (র) পরিভাষা তিনটির যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে ভুল। নিম্নে সঠিক সমাধান দেয়া হলো–

নুজহাতুল আলবাব ফিল আলকাব গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৪৪ পৃষ্ঠায় الحَافِظُ। শব্দের তাহকীক সম্পর্কে বলা হয়েছে– لَقَبُ مَنْ مَهَرَ فِى مَعْرِفَةِ الحَدِيْثِ

অর্থাৎ হাফিজ হলো হাদীসশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উপাধি ও মুহাদ্দিসীনের একটি লকব বিশেষ যা কারো ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে প্রযোজ্য হয়। সুনির্দিষ্ট পরিমান হাদীস মুখস্থ করার সাথে এ শব্দের কোন সম্পর্ক নেই। শর্তগুলো নিম্নরূপ–

১. রাবী হাদীস অর্জন এবং মুহাদ্দিসগণের সরাসরি মুখ থেকে তা গ্রহণে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হবেন। কিতাব থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করবেন না।

২. রাবীদের তবকা ও স্তর জানবেন এবং জারাহ ও তাদীল সম্পর্কে অবহিত হবেন।

৩. সহীহ হাদীসকে দূর্বল হাদীস থেকে পৃথক করতে পারবেন।

৪. এমন কি এ সব বিষয় তার অধিকহারে মুখস্থ থাকবে, যখন ইচ্ছা তখন তা ব্যক্ত করতে পারবেন এবং হাদীসের মতনও বেশ সংখ্যক মুখস্থ থাকবে।

এ শর্তগুলো পাওয়া গেলে তাকে মুহাদ্দেসীনের পরিভাষায় حافظ বলা হয়।

এ ব্যাপারে মোল্লা আলী ক্বারী (র) এর সংজ্ঞা ভুল হওয়ার কারণ হলো, যুগে যুগে যাদেরকে হাফিজুল হাদীস বলা হয় যেমন– আল্লামা সুয়ূতী, হাফিজ যাহাবী, আবু হুরাইরা (রা) তাদের কারো এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকা তো দূরের কথা ১০,০০০ হাজার হাদীসও মুখস্থ ছিল না। কাজেই মোল্লা আলী ক্বারী (র) এর সংজ্ঞাটি ভুল।

حاكم শব্দটি মুহাদ্দিসগণের কোন লকব নয় বরং তা বিচারকার্য পরিচালানাকারীর উপাধি। কাজেই এ নামের সাথে হাদীস মুখস্থ ও বর্ণনা করার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই হাকেমের যে সংজ্ঞা দেয়া হয় তা সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং বাস্তবতার পরিপন্থী। অনুরূপভাবে الحجة। শব্দটিও মূলতঃ মুহাদ্দিসগণের একক কোন লকব নয় বরং তা অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হুজ্জত শব্দটি বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয় সমর্থন ও প্রত্যায়নের স্থলে। সুতরাং الحجة فى الرواية এর অর্থ ঐ ব্যক্তি যার রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায়। শব্দটি আবার অন্য লকবের মত লকবেও ব্যবহৃত হয়। আর এটা ঐ ব্যক্তির লকব যিনি তাসহীহ ও তাযঈফ ও জরাহ তাদীলের ব্যাপারে প্রমাণস্বরূপ হন। (শরহে নুখবা-১৬ পৃষ্ঠা)

قوله الصَّمَدَانِى ... الخ ঃ এ শব্দটি صمد থেকে গৃহীত, এখানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো–

هو السَيِّدُ الذى يُصْمَدُ اِلَيْهِ فِى الاُمُوْرِ

অর্থাৎ صَمَدَانِى ঐ সরদারকে বলা হয় প্রয়োজনীয় বিষয়বলীর ক্ষেত্রে যার নিকট রুজু করা হয়।

كتاب الطهارة

تاويلُ قوله عزّ وجلّ: اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ

١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهٖ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهٗ فِىْ وَضُوْئِهٖ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلٰثًا فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَايَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهٗ -

---

অধ্যায় ঃ পবিত্রতা

অনুবাদ ঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন তোমাদের নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে।" (৫ ঃ ৬)

আল্লাহ্ তা'আলা-এর এ বাণীর তাফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে,

১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন– তোমাদের কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে সে যেন তিনবার হাত ধোয়ার পূর্বে তার হাত পানিতে প্রবিষ্ট না করায়। কেননা, তোমাদের কারো জানা নেই যে, রাতে তার হাত কোথায় অবস্থান করেছিল।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله تاويلُ قوله عزّوجلّ ... الخ

سوال ـ ما معنىً لفظِ التَّاوِيْلِ؟ وما ارادَ المصنّفُ بِقَوْلِه : تَاوِيْلُ قَوْلِه عزّوجلّ .. الخ .

প্রশ্ন ঃ تاويل শব্দের অর্থ কি? গ্রন্থকার স্বীয় উক্তি تاويل قوله عزّ وجلّ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করেছেন?

উত্তর ঃ تاويل **শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ** تاويل শব্দটি باب تفعيل এর মাসদার اول শব্দ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ বিভিন্নভাবে দেয়া হয়েছে।

১. التَّشْرِيْحُ তথা স্বপ্নের পরিণাম যেমন- اِبْتِغَاءَ تَاوِيْلِه

২. عاقبة الرُّؤْيَا স্বপ্নের পরিণাম যেমন- تاويلُ الاَحَادِيْث

৩. التَّرْجِيْحُ তথা অগ্রাধিকার দেয়া।

تاويل -**এর পরিভাষিক অর্থ ঃ** আল্লামা জুরজানী বলেন–

التاويلُ فِى الشَّرْعِ صرفُ اللَّفْظِ عَنْ معناه الظَّاهِرِ اِلى معنىً يَحْتَمِلُه اِذا كان المُحْتَمَلُ الَّذى يَراه مُوَافِقًا بِالكتاب والسُّنَّة .

অর্থাৎ শব্দের প্রকাশ্য অর্থ থেকে তার সম্ভাবনাময় অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে পরিভাষায় تاويل বলে। যখন সম্ভাবনাময় অর্থ কুরআন ও হাদীসের অনুকূলে হয়।

মুফতী আমীমুল ইহসান (র) বলেন– التاويلُ فِى الشَّرْعِ صرفُ اللَّفْظِ مَعْناه الظاهرَ الى معنىً يَحْتَمِلُهُ

الخ ... تاويلُ قوله عزّ وجلّ - **গ্রন্থকারের এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ**

১. এ শিরোনামটি جنس এর পর্যায়ে। আর সামনের সমস্ত বাক্যগুলো فصل এর স্থপর্যায়ে কিতাবের প্রারম্ভে কুরআনে কারীমের আয়াতসমূহ থেকে এ আয়াতটি উপস্থাপন করে মুসান্নিফ (র) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, وضوء সম্পর্কিত كتابُ الطهارة এর মধ্যে যত আহকাম ও মাসআলা মাসায়িল বর্ণনা করা হবে তা সম্পূর্ণটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাফসীর। (শরহে নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ২০)

২. كتاب الطهارة এর মধ্যে উল্লিখিত সবগুলোর হাদীসের জন্য تاويلُ قوله عزّوجلّ إذا قمتم الخ শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তখন ইবারতের অর্থ হবে- আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী সকল হাদীস كتاب الطهارة এর অন্তর্ভুক্ত। অথবা আয়াতের মধ্যে যেহেতু পবিত্রতা অর্জনের বিস্তারিত আলোচনা নেই, সেহেতু আয়াতের উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার জন্য تاويلُ قوله عزوجل বলেছেন।

سوال ـ مَا المُنَاسبةُ بَيْنَ هٰذه الآيةِ وبَيْنَ الحَدِيثِ المَرْوِيِّ عَن اَبِي هُرَيرة؟

প্রশ্ন ঃ উল্লিখিত আয়াত ও আবূ হুরাইরা (রা) এর বর্ণিত হাদীসের মধ্যকার সম্পর্ক কি? লিখ

উত্তর ঃ আয়াত ও হাদীসের মাঝে যোগসূত্র ঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, আয়াত ও হাদীসের মাঝে তেমন কোন সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু গভীরভাবে তাকালে দেখা যায় উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন–

১. এ আয়াতে فَاغْسِلُوْا শব্দ উল্লেখ আছে। আর হাদীসে হাত ধোয়ার কথা বলা হয়েছে।

২. আয়াতে মৌলিক অঙ্গগুলো নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। আর হাদীসে অন্যান্য অঙ্গগুলো ধোয়ার কথা বলা হয়েছে।

৩. আয়াতে ও হাদীসে পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. নামাযের পূর্বে পবিত্রতা হাসিল করা ওয়াজিব; আয়াত ও হাদীস এটাই প্রমাণ করে-

৫. আয়াতটি নিশ্চিত নাপাকী অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়া বিষয়ক। আর হাদীসটি সন্দেহমূলক নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মাঝে যোগসূত্র পাওয়া গেল।

سوال ـ مَا ارادَ اللّٰهُ تعالىٰ بقوله اِذا قُمْتُمْ؟ هَلْ يَجِبُ الوُضوءُ اِذا قامَ الاِنسانُ لِلصّلٰوة اَوضِح وَجهَ اِختيار هٰذا اللفظ

প্রশ্ন ঃ اِذَا قُمْتُمْ উক্তি দ্বারা আল্লাহ তাআলা কি উদ্দেশ্য নিয়েছেন? মানুষ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন তার জন্য উযূ করা কি ওয়াজিব? এ শব্দটি গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ اِذا قُمْتُمْ الخ আয়াতের অর্থ ঃ প্রকাশ থাকে যে, সকল ইমামের ঐক্যমতে রাসূল (স) ও সাহাবিগণের আমল দ্বারা প্রমাণিত যে اِذَا قُمْتُمْ الخ এর অর্থ হলো- اَى اَرَدْتُمْ الْقِيَامَ لِلصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا الخ অর্থাৎ যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়ানোর ইচ্ছা করবে। এটাও সর্বজন বিদিত যে, ইচ্ছা দাঁড়ানোর পূর্বেই হয়ে থাকে, পরে হয় না। এর দলীল হলো আল্লাহ তাআলার অপর আয়াত . اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

এখানে কুরআন পড়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পড়ার ইচ্ছা করা। সংক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে اراده কে فعل দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এভাবে ব্যক্ত করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে, যে ব্যক্তি ইবাদতের ইচ্ছা করবে তার জন্য দ্রুত ইবাদত সম্পন্ন করা উচিৎ। অর্থাৎ ইচ্ছা ও ইবাদতের মধ্যে বেশী বিলম্ব না থাকা চাই।

اِذا قُمْتُمْ শব্দ গ্রহণের কারণ ঃ اِذا قُمْتُمْ শব্দটি গ্রহণের কারণ হলো নামাযে ফারায়েযের মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায পড়া একটি ফরয। যেমন– আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন– قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

জুমহুর মুফাসসিরদের অভিমত হলো– فَفِيْهِ اِشَارةٌ اِلىٰ اَنَّ الْقِيَامَ فِى الصَّلٰوة فرضٌ

এর দ্বারা নামাযের সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।।

اِذا قُمْتُمْ শব্দ দ্বারা নামাযের সময়ের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, নামাযের সময় হলেই নামায আদায় করতে হবে। কেননা اِذا অব্যয়টি সময়ের জন্যে তথা ظرف زمان হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আর কায়দা হলো। إذا হরফে শর্ত যখন فعل ماضى এর পূর্বে ব্যবহৃত হয় তখন مضارع এর অর্থ দেয় যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী- إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

سوال : أذكر الاختلاف في غسل الرجلين في الوضوء ومسحهما.

প্রশ্ন ঃ উযূতে উভয় পা ধৌত করা ও মাসেহ করার ব্যাপারে মতানৈক্য কি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ উযূতে উভয় পা ধৌত করতে হবে নাকি মাসেহ করতে হবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

১. শিয়াদের কতক ইমামদের নিকট উযূতে উভয় পা মাসেহ করা ওয়াজিব, অনুরূপভাবে রাওয়াফেজদেরও একই মত।

২. চার ইমাম এবং সমস্ত মুহাক্কিক আলিমদের নিকট উযূতে উভয় পা ধৌত করা ফরয।

শিয়া ইমামদের দলীল ঃ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

১. তারা বলেন, أَرْجُلَكُمْ শব্দটিকে নসবের সাথে এবং جر এর সাথে উভয়ভাবে পড়া যায় তবে رؤس এর উপর আতফ করে জরের সাথে পড়াটা আসল। আর وُجُوهَكُمْ এর মহলের উপর আতফ হিসেবে নসবের সাথে পড়া জায়েয আছে।

২. আলী (রা) এর এক হাদীসে এসেছে যে, তার কাছে পানি আনা হলো তিনি সে পানি দ্বারা চেহারা ও হাত মাসেহ করলেন। অতঃপর সে পানি দ্বারাই মাথা ও পা মাসেহ করলেন।

৩. ইবনে আব্বাস (রা) এর রেওয়ায়েতঃ তিনি বলেন, রাসূল (স) উযূ করলেন। তারপর হাত ভর্তি পানি নিয়ে তা উভয় পায়ের উপর ছিটিয়ে দিলেন।

৪. আব্বাদ ইবনে তামীম তার চাচা থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী করীম (স) উযূ করেছেন এবং উভয় পা মাসেহ করেছেন।

৫. হযরত ইবনে ওমর হতে বর্ণিত যে, তিনি একদা উযূ করলেন, এ সময়ে তার উভয় পায়ে জুতা ছিল। তিনি পায়ের উপরি ভাগের উপর মাসেহ করলেন।

আকলী দলীল ঃ যদি কোন ব্যক্তি পানি না পায়, সে তার চেহারা ও হাত তায়াম্মুম করে। সে কখনও তার মাথা ও পা তায়াম্মুম করে না। সুতরাং পানি না থাকা অবস্থায় যেহেতু পায়ের হুকুম মাথার ন্যায় হয়ে থাকে। তাই পানি থাকা অবস্থায়ও পা মাথার ন্যায় হুকুম দাবী করবে অর্থাৎ মাথা মাসেহ করার মত পা ও মাসেহ করতে হবে।

হকপন্থীগণের দলীল ঃ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ আয়াতটি নসবের সাথে পড়াটাই সমীচীন চেহারার উপর আতফ হিসেবে এবং নাহবীগণ جر পড়াকে মানেন না।

২. নবী করীম (স) এর সমস্ত বাণী ও فعل থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি ওযুর সময় পা ধৌত করতেন। যেমন আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি পা তিন তিনবার ধৌত করেছেন। এটিই ছিলো রাসূল (স) এর পবিত্রতা হাসিলের পদ্ধতি। অনুরূপ আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস যাতে উযূকারীর গোনাহ মাফ হওয়ার আলোচনা এসেছে সেখানেও পা ধৌত করার বিধান আলোচিত হয়েছে। আর তা হলো-

فِى اٰخره فَاِذا غَسَلَ رِجْلَيه خَرَجَ كلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْ اِلَيهَا رِجْلَاهُ.

যখন উযূকারী তার পা ধৌত করে তখন ঐ সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায় যা তার পা দ্বারা হয়েছে।

৪. যে সমস্ত হাদীসে পায়ে পরিপূর্ণ পানি না পৌছার উপর হুমকি এসেছে।

ما رُوِىَ عَن عبدِ اللّٰه بن عمرَ رض قال تَخَلَّفَ عَنَّا رسولُ اللّٰه صلّى اللّٰهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণনা করেন আমরা রাসূল (স) এর সাথে সফরে ছিলাম মাঝে আছরের ওয়াক্ত হলো। আমরা উযূ করলাম এবং পা মাসেহ করলাম। তখন শুনতে পেলাম যে, বেলাল (রা) উচ্চ আওয়াজে বলছেন- وَيلٌ لِلاَعقَابِ مِنَ النَّارِ শুকনা টাখনুসমূহের জন্য ধ্বংস। এ কথাটি তিনি দু'বার বা তিনবার বলেছেন, উযূতে পা ধৌত করা ফরয হওয়া সংক্রান্ত হাদীসের মাঝে تعارض রয়েছে। সুতরাং আমরা গোসলের হাদীসকে মাসেহ সংক্রান্ত হাদীসের জন্য রহিতকারী হিসেবে ধরে নিতে পারি।

বিপক্ষবাদীদের দলীলের জবাব

তারা দলীল হিসেবে হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, হাসান, ইকরামা ও শাবী (র) প্রমুখের রেওয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত দলীল। কেননা তারা সকলেই নবী (স) থেকে এর বিপরীত রেওয়ায়েত করেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে তার বিপরীতটাই ছিল তাদের আমল। সুতরাং তাদের দিকে এর নিসবত করা বাতিল।

অথবা এমনটা বলা যেতে পারে যে, তারা প্রথমত মাসেহ এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তারপর তা থেকে ফিরে ধৌত করার (সম্পর্কে) হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর দলীল হলো ইবনে ওমরের রেওয়ায়েত যে, মানুষেরা রাসূল (স) এর নিকট পা ধোয়ার হুকুম আসার পূর্বে পা মাসেহ করতো। তারপর যখন রাসূল (স) পরিপূর্ণভাবে ধৌত করার হুকুম আরোপ করলেন এবং ধৌত না করা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করে বললেন, শুকনো টাখনুসমূহের জন্য আগুনে ধ্বংসলীলা রয়েছে। তখন মানুষেরা মাসেহ করা বাদ দিয়ে পা ধৌত করা আরম্ভ করলো। এতে বুঝা যায় মাসেহ করার হুকুম বাতিল হয়ে গেছে। অথবা দুই হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে, মাসেহ দ্বারা ধৌত করা উদ্দেশ্য। কেননা, এক রেওয়ায়েতে আছে أَنَّهُ مَسَحَ وَجْهَهُ অর্থাৎ তিনি চেহারা মাসেহ করেছেন। এখানে মাসেহ দ্বারা সকলের নিকটেই ধৌত করা উদ্দেশ্য। সুতরাং পা মাসেহ করার ব্যাপারেও এই সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ পা মাসেহ করার অর্থ হলো পা ধৌত করা। অথবা মাসেহ এর রেওয়াত মোজা পরিহিত অবস্থায় , আর ধৌত করার বর্ণনা মোজাহীন অবস্থায় প্রযোজ্য হবে। (নাসায়ীর হাশিয়া ও শরাহ পৃষ্ঠা নং ২০)

سوال : مَا الْاِخْتِلَافُ فِى دُخُولِ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ فِى حُكْمِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَمَا وَجْهُ الْاِخْتِلَافِ .

প্রশ্ন ঃ مرفقين এবং كعبين ধৌত করার হুকুমের মধ্যে দাখিল হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণের ইখতেলাফ কি এবং ইখতেলাফের কারণ কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ مِرْفَقَيْنِ ও كَعْبَيْنِ তথা উভয় কনুই ও ঠাখনু ধোয়ার হুকুমে শাখিল হওয়া না হওয়া ও তার কারণের ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

১. ইমাম যুফার (র)-এর অভিমত

ইমাম যুফার এবং আবু দাউদ জাহেরী ও ইমাম মালেক (র) এর এক বর্ণনা মুতাবেক غاية টা مُغيا এর মধ্যে দাখেল নয়। কেননা, আয়াতে مرفقين এবং كعبين শব্দ দুটিকে غسل يدين এবং غسل رجلين এর غاية সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর উসূলে ফিকহ এর প্রসিদ্ধ কায়দা আছে– الغاية لاتدخل تحت المغيا

তথা غاية . مغيا এর বিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং এখানেও مرفق এবং كعب ধৌত করার ক্ষেত্রে يدين এবং رجلين (যা مغيا) এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যেহেতু ধৌত করার ক্ষেত্রে مرفق এবং كعب টা يد এবং رجل এর মধ্যে দাখিল নয়। সুতরাং উযূতেও ফরয না হওয়ার কারণে ধৌত করতে হবে না।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত

ইমাম আবূ হানীফা ও আইম্মায়ে ছালাছার ভাষ্য হলো مرفقين এবং كعبين ধৌত করার বিধানে يدين এবং رجلين এর অকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর কারণ হলো কায়দা আছে যে, غاية টি যদি এমন হয় যে, الى উল্লেখ না করলেও তার غاية مغيا কে শামেল করে। তাহলে الى উল্লেখ করার পরেও غاية তার مغيا কে অন্তর্ভুক্ত করবে। যেমন– فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ

আর যদি الى উল্লেখ না করলেও তার غاية مغيا কে শামিল করে তাহলে الى উল্লেখ করার পরেও غاية তার مغيا কে শামিল করবে না। যেমন– اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ

غاية এর ভিন্ন আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে যা প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেননি। আর তা হলো এই যে, غاية দুই প্রকার–

১. غاية إسقاط الحكم فيما ورائها তথা কোন জিনিসের ব্যাপক পরিধিকে একটি সীমানা পর্যন্ত নির্ধারিত করা। যেখানে صدر الكلام . غاية কে অন্তর্ভুক্ত করে সেখানে غاية তার مغيا এর থেকে হুকুমকে রহিত করে দেয়। সুতরাং ঐ স্থানে غاية তার مغيا এর হুকুমের মধ্যে দাখিল থাকবে। যেমন–

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

২. غاية لمد الحكم اليها তথা কোন জিনিসের পরিধি বা সীমা যার প্রতি পূর্বের বিধানকে আকর্ষণ করা হয় এবং যেখানে صدر الكلا . غاية এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। সেখানে হুকুমকে তার পর্যন্ত আকর্ষণ করার জন্য হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে غاية . مغيب হুকুম থেকে খারিজ হবে। যেমন– ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

اختلاف এর কারণ : مرفقين এবং كعبين . يدين এবং رجلين এর মধ্যে দাখিল হওয়া এবং না হওয়ার ব্যাপারে যে মতানৈক্য রয়েছে এর ভিত্তি বা কারণ হলো الى এর ما بعد . ماقبل এর মধ্যে দাখিল হবে কি না এই নিয়ে নাহবীদের ভিতরে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো চারটি মাযহাব। এই চারটি মাযহাবের উপর ভিত্তি করে উক্ত মতানৈক্যের সূত্রপাত ঘটেছে। যিনি যে মাযহাবকে গ্রহণ করেছেন তিনি সেই মাযহাব অনুযায়ী মাসআলা এস্তেম্বাত করেছেন। (উমদাতুর রে'আয়াহ)

سوال : ما معنى المرفق وكم قولًا للعلماء في معنى الكعب وما هي وما هو الأصح؟ بين مفصلًا.

প্রশ্ন : مرفق এর অর্থ কি كعب এর অর্থের ব্যাপারে আলিমগণের কতটি মতামত রয়েছে এবং সেগুলো কি কি ও বিশুদ্ধমত কোনটি? বর্ণনা কর।

উত্তর : مرفق এর অর্থ : مرفق শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো مرافق ,অর্থ কনুই। আর পরিভাষায়ও مرفق দ্বারা কনুইকেই বুঝানো হয়–

كعب -এর অর্থের ব্যাপারে আলিমগণের অভিমত : শরহে বেকায়া গ্রন্থকার তার প্রসিদ্ধ কিতাব শরহে বেকায়ায় كعب এর অর্থের ব্যাপারে আলিমগণের দুই ধরণের উক্তি উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো–

هشام عن محمد هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك.

ইমাম মুহাম্মদ থেকে হিশাম বর্ণনা করেন যে, كعب বলা হয় পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের হাড় বা ঐ জোড়াকে যেখানে জুতার ফিতা বাঁধা হয়। هُوَ عَظْمُ النَّاتِي الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ عَظْمُ السَّاقِ

كعب বলা হয় উপরের দিকে উত্থিত ঐ উঁচু হাড়কে যেখানে নলীর হাড় শেষ হয়েছে।

* كعب বলা হয় টাখনু তথা পায়ের গোড়ালীর উপর উভয় পার্শ্বের উঁচু উত্থিত যে দু'টি হাড় রয়েছে তাকে।

উপরোল্লিখিত দুটি উক্তির মধ্যে দ্বিতীয় উক্তিটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

দ্বিতীয় মতটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ হওয়ার দলীল

উসূলে প্রনয়নকারীদের প্রসিদ্ধ একটি নীতি হলো যদি বহুবচন এর মুকাবেলায় বহুবচন আসে তাহলে সেখানে انقسام الأحاد على الأحاد এর ফায়দা দেয় অর্থাৎ এ কথা বুঝাবে যে, দ্বিতীয় বহুবচনের افراد প্রথম বহুবচনের افراد এর উপর বিভক্ত হবে এবং প্রথম বহুবচনের প্রত্যেকটি فرد দ্বিতীয় বহুবচনের প্রত্যেকটি فرد এর মুকাবেলায় হবে। যদি বহুবচনের মুকাবেলায় تثنية তথা দ্বিবচন আসে তাহলে انقسام الاحاد على الأحاد এর ফায়দা দেবে না। বরং এর দ্বারা বহুবচনের প্রত্যেকটি فرد এর মুকাবেলায় تثنية তথা দুটি জিনিস থাকা বুঝাবে। সুতরাং কুরআনে কারীমের আয়াতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই إِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ এখানে বহুবচনের মুকাবেলায় تثنيه এসেছে। সুতরাং এটা انقسام الاحاد على الاحاد এর ফায়দা দেবে না। বরং বহুবচনের প্রত্যেকটি فرد এর মুকাবেলায় تثنية সম্পৃক্ত থাকা বুঝাবে। এখন আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হবে যে, প্রত্যেকটি رجل তথা পা এর মধ্যে দুটি করে كعب থাকবে, আর প্রত্যেকটি পায়ে দুটি كعب শুধুমাত্র দ্বিতীয় মাযহাব অনুযায়ী পাওয়া যায়। অতএব দ্বিতীয় মাযহাবটি اصح হলো। কারণ প্রথম قول এর সংজ্ঞানুপাতে পায়ে কোন كعب ই নেই। (عمدة الرعاية مع السعاية)

سوال : ما الحُكمُ فِى بيانِ حدِّ الأيدِى لِقولِه الى المرافقِ وعدمِ بيانِ الحدِّ فى الوُجوهِ ـ

প্রশ্ন ঃ আয়াতের মধ্যে চেহারার সীমা রেখা বর্ণনা না করে হাতের সীমারেখা কনুই পর্যন্ত বর্ণনা করার পেছনে হিকমত কি?

উত্তর ঃ হাতের সীমারেখা বর্ণনা করার কারণ ঃ উযূর বিধান ফরয। উযূ ফরয হওয়ার আয়াতে আল্লাহ তাআলা ৪টি অঙ্গ ধোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ

এখানে মুখমণ্ডল ধোয়া ও মাসেহ এর ব্যাপারে কোন সীমারেখা বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু পা ধোয়া ও হাত ধোয়ার জন্য সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে চেহারা ও হাত পাশাপাশি হওয়া সত্ত্বেও হাতের বিষয়ে কেন কনুই পর্যন্ত ধৌত করার কথা বিশেষভাবে বলা হলো? মুখমণ্ডল কান পর্যন্ত ধৌত করতে হবে তা বলা হয়নি এর কারণ কি? এর জবাবে বলা যায় মুখমণ্ডল দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমানাকেই বুঝায়। এতে কোন দ্বিমত নেই। মাথার চুল গজানোর স্থান ব্যতীত গলার উপরে এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত মুখমণ্ডলের সীমারেখা এ বিষয়টি স্পষ্ট। বিধায় মুখমণ্ডল ধৌত করার বিষয়ে কোন সীমা রেখা বর্ননা করা হয়নি।

অন্যদিকে হাতের পরিধি নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। অনেকে শুধু কবজি পর্যন্ত অংশকে হাত হিসেবে সাব্যস্ত করেন। অনেকে কনুই পর্যন্ত, আবার অনেকে স্কন্ধ পর্যন্ত পুরো অংশকেই হাত হিসেবে চিহ্নিত করেন। এজন্যে হাতের কতটুকু অংশ ধোয়া ফরয তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। অথবা বলা যায় যে মুখমণ্ডল সর্বদা খোলা থাকে বিধায় এর বিষয়টি স্পষ্ট। অন্য দিকে হাত অধিকাংশ সময় ঢাকা থাকে বিধায় কোন্ পর্যন্ত সীমানা হবে তা স্পষ্ট নয়। তাই এর সীমা বর্ণনার জন্য المرافق বলা হয়েছে। (سعاية)

سوال : الغايةُ تَدخُل تحتَ المُغيا اَمْ لاَ ومَا الاختلافُ فيه بَيْنَ الائمّةِ بَيِّنْ ـ

প্রশ্ন ঃ غاية ـ مغيا এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কিনা? এবং এ ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ غاية এর বিধান নিয়ে ইমামদের মাঝে দুটি মাযহাব রয়েছে।

১. ইমাম যুফার (র) বলেন, غاية ـ مغيا এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

২. জুমহুর উলামা ও ফুকাহা বলেন, غاية - مغيا এর মধ্যে কখনো দাখিল হয়, কখনো দাখিল হয় না।

ইমাম যুফার (র) এর বক্তব্য ও দলীল ঃ ইমাম যুফার, দাউদে জাহেরী ও ইমাম মালেক (র) এর এক বর্ণনা মুতাবেক غاية ـ مغيا এর মধ্যে শামিল হবে না। তিনি তার মতের স্বপক্ষে দুটি দলীল পেশ করেন- ১. প্রথম দলীল হলো উসূলে ফিকহ এর প্রসিদ্ধ কায়দা الغَايَةُ لاَتَدْخُلُ تَحْتَ المُغَيَا তথা غاية ـ مغيا এর মধ্যে দাখেল হয় না। কাজেই এখানে ও مرفق ও كعب যেটা غاية তা يد ও رجل মুগায়া এর মধ্যে দাখিল হবে না। আর যেহেতু দাখিল না, তাই উযূর ক্ষেত্রেও ধৌত করা ফরয না।

দ্বিতীয় দলীল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী- ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ

এখানে রাত রোযার মধ্যে শামিল নয় অতএব مِرْفَقَان ও كَعْبَان ও উযূর মধ্যে ধৌত করা ফরয নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) ও জুমহুর উলামার বক্তব্য ও দলীল

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ও আহমদ (র) এর মতে-

اِنْ كَانَتِ المُغَايَةُ وَالغَايَةُ مِن جنسٍ واحدٍ فتَدخُل الغايةُ فِى حكمِ المُغاية وإنْ كانتْ مُختَلِفى الأَجْنَاسِ فَلاَ ـ

অর্থাৎ غاية ও مغاية যদি একই জিন্‌সের হয় তাহলে غاية ـ مغاية এর মধ্যে শামিল হবে। আর যদি উভয়টা একই জিন্‌সের না হয়। তাহলে শামিল হবে না। যেমন- ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ আয়াতের মধ্যে صيام ও ليل এক জিন্‌সের নয়। বিধায় একটি অপরটির মধ্যে শামিল হবে না। আর اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ ও اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ এর মধ্যে কনুই ও হাত এবং গোড়ালি ও পা একজাতীয়। বিধায় কনুই ও টাখনু উভয়টি ধোয়র মধ্যে দাখিল হবে।

আরেকটা কায়দা আছে, যে, غاية যদি এমন হয় যে, শুধু مغيا কে উল্লেখ করলে غاية . مغيا কে শামেল করে না তাহলে غاية টা مغيا এর মধ্যে শামেল হবে না। যেমন– اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ আর যদি غاية টা এমন হয় যে, শুধু مغيا কে উল্লেখ করার দ্বারা غاية . مغيا কে শামিল করে তা হলে غاية টা مغيا এর মধ্যে দাখিল হবে। যেমন- فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ

বিপক্ষবাদীদের দলীলের জবাব

ইমাম যুফার (র) এর দলীলের জবাবে আহনাফ বলেন, তাদের দলীল ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ আয়াতে صياء ও ليل সমজাতীয় নয়। বিধায় এখানে একটি অপরটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কিন্তু وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ ও وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ এর মধ্যে কনুই ও হাত এবং গোড়ালী ও পা সমজাতীয়। বিধায় একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত হবে। দ্বিতীয়তঃ হুজুর (স) ও সাহাবাগণ সর্বদা এমনভাবে উযূ করতেন।

سوال : اذكر شرائطَ قبولِ الحديثِ عندَ الامام النّسائىّ

প্রশ্ন ঃ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম নাসায়ী (র) এর শর্তাবলী কি কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ হাফিজ আবুল ফজল ইবনে তাহের শুরুতুল আয়েম্মা নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নাসায়ী শরীফে তিন প্রকারের হাদীস আছে।

১. যে সকল হাদীস বুখারী ও মুসলিমের ইমাম সহীহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

২. ঐ সকল হাদীস যেগুলো বুখারী ও মুসলিমের ইমামগণের শর্ত অনুযায়ী হয়েছে।

৩. ঐ সকল হাদীসকে এনেছেন যে হাদীসকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হননি। যখন এই শর্তগুলো পাওয়া যাবে হাদীসটি মোত্তাসিল সনদ বিশিষ্ট হবে, মুনকাতে ও মুরসাল হবে না। সহীহাইনের কোন কোন রাবীর হাদীস তিনি আনেননি। এ জন্য কেউ কেউ বলেছেন, রাবীর ক্ষেত্রে ইমাম নাসায়ী বুখারী ও মুসলিমের তুলনাই অধিক কঠোর।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাপারে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা

বিজ্ঞানীগণ মুসলমানদের প্রতিদিন চার, পাঁচবার উযূ করতে দেখে বিস্ময় বোধ করত। কিন্তু গবেষণার পর এটা তাদের বোধগম্য হয়েছে যে, এটা শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপযোগী এবং বিজ্ঞান সম্মত। কারণ বিজ্ঞানের থিওরী আছে, বস্তু অধিক ঘর্ষণে চমৎকৃত হয়। অর্থাৎ কোন বস্তুকে যদি দিনে কয়েকবার ধুয়ে মুছে রাখা হয় তাহলে তার ঔজ্জ্বলতা বাড়তে থাকে এবং সকল ধরণের জীবাণু থেকে মুক্ত থাকে। আর ইসলামে উযূর বিধানটি ঠিক এ হুকুমের পর্যায়ভুক্ত। কেননা মানুষের এ অঙ্গগুলো সাধারণত অনাবৃত থাকে। ফলে এগুলো বিভিন্ন প্রকার জীবাণু দ্বারা সহজে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এগলোকে ধৌত করা হলো ঐ জীবাণুগুলো পরিস্কার হয়ে যায়। ফলে শরীরে আর কোন ক্ষতি করতে পারে না। অপরদিকে প্রতিদিন পাঁচবার উযু করার দ্বারা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাও অর্জিত হয় এবং শরীরও শীতল থাকে যা স্বাস্থ্য সম্মত।

হাদীস সম্পর্কিত আলোচনা

قوله : اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ .... الخ
سوال : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ مَعَ اِيْضَاحِ الْمَعْنٰى .

প্রশ্ন ঃ হাদীসের অনুবাদ ও তার ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ হাদীসের অনুবাদ তো পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদীসের উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা ঃ কেউ যদি তার হাত কিংবা অন্য কোনো অঙ্গ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে নাপাক থাকার ব্যাপারে সন্দীহান হয়। তবে সে ماء قليل অর্থাৎ স্বল্প পানিতে ঐ নাপাক অঙ্গ প্রবেশ করানোর পূর্বে তা ধুয়ে নেবে। সে যদি তা না করে পানিতে হাত প্রবেশ করায়। আর নিশ্চিতভাবে জানে যে, তার হাতে নাপাক ছিল, তবে সে পানি নাপাক হয়ে যাবে। নচেৎ নাপাক হবে না।

سوال : اَوْضِحْ سَبَبَ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ

প্রশ্ন ঃ হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণ বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ এ হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, হেজাযবাসীরা শুধুমাত্র পাথর দ্বারা এস্তেঞ্জা করত : পানি ব্যবহার করত না। অথচ তাদের দেশ ছিল উষ্ণ এবং ঘাম খুব বেশী বের হত। কাজেই কেউ ঘুমিয়ে পড়লে তার শরীর মারাত্মকভাবে ঘামতো এবং ঘামের কারণে পায়খানার রাস্তা হতে নাজাসাত আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ত। এমতাবস্থায় মলদ্বারে হাত পৌঁছানো সম্ভাবনা ছিল। তাই হুজুর (স) হাত না ধূয়ে স্বল্প পানিতে হাত প্রবেশ করানো হতে নিষেধ করেছেন। কারণ হাতে নাপাক থাকলে পানি নাপাক হয়ে যাবে।

سوال : ما اسْمُ ابى هريرةَ ومَا الاختلافُ فِيْه.

প্রশ্ন ঃ আবূ হুরাইরার নাম কি এবং এ ব্যাপারে মতানৈক্য কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আব্দুশ শামছ অথবা আবদে আমর। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম কি ছিল এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো তার নাম ছিল আব্দুর রহমান ইবনে সখর। এটাই বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুহাদ্দিস ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) এর মত। ইমাম নববী (র) বলেন, আমার মতেও এ ব্যাপারে অধিকতার শুদ্ধ মত হলো তার নাম ছিল আব্দুর রহমান ইবনে সখর।

سوال : بَيِّنْ نُبْذَةً مِّنْ حَيَاةِ ابى هريرةَ رض

প্রশ্ন ঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রা) এর জীবনী আলোচনা কর।

উত্তর ঃ রাবী পরিচিতি ঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রা) এর নাম সম্পর্কে অনেক অভিমত পাওয়া যায়, তবে প্রসিদ্ধ কথা হলো ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল আবদে শামস ও আবদে আমর। আর ইসলামী যুগে তাঁর নাম রাখা হয় আব্দুল্লাহ বা আব্দুর রহমান। পিতার নাম সখর। আর মায়ের নাম মাইমুনা। বিড়ালছানাকে অত্যাধিক ভালবাসতেন বিধায় রাসূল (স) তাকে ابوهريرة। উপনামে ডাকতেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রা) ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত সাহাবী তুফাইল ইবনে আমর আদদাওসীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ঃ ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি সকল যুদ্ধে রাসূল (স) এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনে কাছীর বলেন, فَشَهِدَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ الرَّسُوْلِ অর্থাৎ তিনি রাসূল (স) এর সাথে সকল যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

আসহাবে সুফফার সদস্য ঃ রাসূল (স) এর দরবারে এমন কিছু সাহাবী সার্বক্ষণিকভাবে পড়ে থাকতেন। যাঁদের খাওয়া পরার কোন চিন্তা ছিলনা। হাদীসের ইলম অর্জনই তাঁদের খাদ্যের ভূমিকা পালন করতো। রাসূল (স) এর দরবারে হাদীয়াস্বরূপ কোন খাদ্য এলে তা থেকে তারা আহার করতেন। তাদেরনকে আসহাবে সুফফা বলা হতো। সে সব সদস্যের মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) অন্যতম।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ঃ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী। কোন বর্ণনাকারীই হাদীস বর্ণনায় তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) এর মতে তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি, বুখারী ও মুসলিম শরীফে যৌথভাবে বর্ণিত হয়েছে ৩২৫টি। এককভাবে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেছেন ৭৯ টি, আর ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন ৯৩/৭৩ টি।

ইন্তেকাল ঃ হযরত ওয়ালীদ ইবনে উকবা ইবনে আবু সুফিয়ান তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাঁর জানাযায় শরীক হন তাকে মদীনায় জাতীয় কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়।

আলোচ্য হাদীসের رجال সম্পর্কিত আলোচণা

قوله أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ঃ কেউ কেউ বলেন, কুতাইবা হলো তার লকব। তার মূল নাম হলো ইয়াহইয়া, কেউ কেউ বলেন তার নাম হলো আলী।

قوله سفيان ঃ এখানে সুফিয়ান দ্বারা উদ্দেশ্য কুতাইবার উস্তাদ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, সুফিয়ান সাওরী নয়।

قوله زهرى ঃ তাঁর নাম নিম্নরূপ– محمد بنُ مسلمِ بنِ عبيدِ اللّهِ بْنِ عبد اللّهِ بنِ شِهاب زُهْرِى

قوله ابى سلمة ঃ এ ব্যক্তি হলেন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফের ছেলে। কেউ কেউ বলেন তার নাম আব্দুল্লাহ এবং কেউ কেউ বলেন, ইসমাঈল। কেউ কেউ বলেন তার নাম ও কুনিয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তার নামও আবু সালামা এবং তার কুনিয়াতও আবু সালামা। হযরত আনাস (র) বলেন, আহলে ইলমের মধ্য হতে আমার নিকট এমন কতক ব্যক্তি ছিল যাদের নাম و কুনিয়াত উভয়টা এক। তাদের মধ্য হতে একজন হলেন আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান। শায়খ অলীউদ্দিন ইরাকী বলেন, তিনি ফুকাহাদের সাত তবকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

سوال : ما حكمُ الماءِ إنْ أُدْخِلَ فِيه اليدُ قَبلَ غَسْلِها .

প্রশ্ন ঃ হাত ধৌত করার পূর্বে পানিতে হাত প্রবেশ করালে সে পানির হুকুম কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ পানিতে হাত প্রবেশ করালে সেই পানির হুকুম ঃ ঘুম থেকে উঠে হাত ধৌত করার পূর্বে উযূর পাত্রে হাত প্রবিষ্ট করালে সেই পানির হুকুম কি হবে? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মত পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

ক. আল্লামা নববী, হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইবনে জারীর ও দাউদে যাহেরী (র) এর অভিমত ঃ আল্লামা নববী, হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, দাউদে জাহেরী প্রমূখের মতে হাত ধৌত করার পূর্বে উযূর পাত্রে হাত প্রবিষ্ট করালে পানি নাপাক হয়ে যাবে।

তাদের দলীল ঃ حديثُ البابِ إذا استَيقَظ احدكم مِن نَوْمِه فَلْيغسل ...... الخ

খ. ইমাম শাফেয়ীসহ কিছুসংখ্যক আলিমদের অভিমত ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) সহ কিছু সংখ্যাক আলিমদের মতে, পানি নাপাক হবে না তবে এ ভাবে হাত প্রবিষ্ট করানো মাকরূহ।

গ. ইমাম মালেক (র) এর অভিমত ঃ ইমাম মালেক (র) বলেন, পানি আদৌ নাপাক হবে না।

ঘ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের অভিমত ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন এরূপ যদি রাতের বেলায় হয় তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি দিনের বেলায় হয় তাহলে নাপাক হবে না।

(স) ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত ঃ ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, যদি হাতে নাজাসাত লাগার ব্যাপারে নিশ্চিত হয় তাহলে এ অবস্থায় হাত প্রবিষ্ট করালে পানি নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি সন্দিহান হয় তাহলে হাত প্রবিষ্ট করালে পানি নাপাক হবে না। তারা সকলেই উল্লেখিত হাদীস থেকেই দলীল গ্রহণ করেছেন।

سوال : هل حكمُ غسلِ اليَدينِ مُختصٌّ بنومِ اللّيلِ ام لا بَيِّنْ اَقوالَ الائمّةِ فيه .

প্রশ্ন ঃ হাত ধৌত করার হুকুম রাতের ঘুমের সাথে নির্দিষ্ট কিনা? ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ হাত ধোয়ার হুকুম রাতের ঘুমের সাথে নির্দিষ্ট কিনা ঃ হাত ধৌত করার হুকুম শুধু রাতের ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথে খাস কি-না এ ব্যাপারে ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

৪. জুমহুর মুহাক্কিক ও আলিমগণের অভিমত ঃ জুমহুর মুহাক্কিক আলিমগণের মতে হাত ধৌত করার হুকুম শুধু রাতের ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথে খাস নয়। বরং এ ব্যাপারে রাতের ঘুম অথবা দিনের ঘুম যাই হোক যদি জাগ্রত হওয়ার পর হাতে নাজাসাত লেগেছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায় তাহলে হাত ধৌত করা ওয়াজিব।

দলীল ঃ নিদ্রাবস্থায় কৃতকর্ম সম্পর্কে মানুষ অবগত থাকে না। চাই তা রাতের ঘুম থেকে হোক বা দিনের ঘুম থেকে হোক এতে কোন পার্থক্য নেই।

খ. ইমাম আহমদ ও দাউদে যাহেরী (র) এর অভিমত ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও দাউদ যাহেরী (র) প্রমূখ এর মতে হাত ধৌত করার হুকুমটি শুধু রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথে খাস। তবে এ মতটি দুর্বল।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

প্রতিপক্ষের মতের উত্তরে জুমহুর উলামায়ে কিরাম বলেন, হাত ধৌত করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (র) বলেছেন– فان احدكم لايدرى اين باتت يده

সুতরাং এখানে النهار অথবা الليل এর কোন শর্ত বা বাধ্যবাধকতা নেই। অতএব কথা হলো নিদ্রিত অবস্থায় যদি হাতে নাজাসাত লেগে থাকে তাহলে জাগ্রত হয়ে হাত ধৌত করতে হবে। চাই রাতের ঘুম হোক বা দিনের ঘুমই হোক। এতে কোন পার্থক্য নেই।

سوال : اِنْ اَدْخَلَ يَدَه فِى الْاِنَاءِ قَبلَ الغَسلِ فَهَلْ يَتَنَجَّسُ الْمَاءُ اَم لاَ.

প্রশ্ন ঃ গোসলের পূর্বে পানির পাত্রে হাত প্রবিষ্ট করলে উক্ত পানি অপবিত্র হবে কি না?

উত্তর ঃ গোসলের পূর্বে পানির পাত্রে হাত প্রবিষ্ট করলে উক্ত পানির পবিত্রতার বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁদের অভিমত নিম্নরূপ–

১. হাসান বসরী (র) এর অভিমত ঃ হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, পানি অপবিত্র হয়ে যাবে।

২. ইমাম আহমদের অভিমত ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, পানি কম হলে নাপাক হবে, বেশি হলে নাপাক হবে না।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র) এর অভিমত ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, পানি মাকরূহ হয়ে যাবে।

৪. ইমাম আবূ হানীফা (র) এর অভিমত ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যদি হাতের মধ্যে নাপাকি থাকে তাহলে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। আর যদি হাতে নাপাকির ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তাহলে পানি মাকরূহ হয়ে যাবে। আর যদি কোন সন্দেহ না থাকে তাহলে পানি অপবিত্র হবে না।

سوال : ما حكمُ غَسلِ اليدين بعدَ الْاِستيقاظ مِن النَّوم؟ وما الاختلافُ فيه.

প্রশ্ন ঃ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে হস্তদ্বয় ধৌত করার বিধান কি? এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ কি?

উত্তর ঃ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে হাত ধৌত করার বিধান ঃ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দু'হাত ধৌত করার হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

ক. দাউদে জাহেরী, হাসান বসরী, আল্লামা নববী ও মুহাম্মদ ইবনে জারীর-এর অভিমত ঃ দাউদে জাহেরী আল্লামা নববী হাসান বসরী ও মুহাম্মদ ইবনে জারীর প্রমুখের মতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দু'হাত ধৌত করা ওয়াজিব। তাদের দলীল হচ্ছে রাসূল (স) এর বাণী–

اِذَا استَيقَظَ احدُكم مِنْ نَومِه فَلَايَغْمِسَنَّ يَدَه فِى الْاِنَاءِ حتّٰى يَغْسِلَها ثلاثًا فانَّه لايَدْرِى اينَ بَاتَتْ يَدُه .

খ. ইমাম শাফেয়ী (র) এর অভিমত ঃ ইমাম শাফেয়ী সহ কিছু সংখ্যক আলেমের মতে এ ক্ষেত্রে দুই হাত ধৌত করা সুন্নত। তাঁরা উল্লেখিত হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গিতে একে সুন্নত বলে মনে করেন, ওয়াজিব নয়। এটা ঐ সুরতে যখন নাজাসাত লাগার ব্যাপারে ইয়াকিন না হয়। ইয়াকিন হলে ওয়াজিব হবে।

গ. ইমাম মালেকের অভিমত ঃ ইমাম মালেক (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে দুই হাত ধৌত করা মুস্তাহাব যদি নাজাসাত লাগার ব্যাপারে ইয়াকিন না হয়। অন্যথায় ওয়াজিব।

ঘ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের অভিমত ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, যদি রাতের ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তবে দু'হাত ধৌত করা ওয়াজিব, অন্যথায় ওয়াজিব নয়।

ঙ. ইমাম আবু হানীফার অভিমত ঃ ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- যদি হাতে নাজাসাত লাগার ব্যাপারে নিশ্চিত হয় তাহলে ধৌত করা ফরয। আর যদি প্রবল ধারণা হয় তাহলে ধৌত করা ওয়াজিব। যদি ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত হয় তাহলে ধৌত করা সুন্নত। আর যদি সন্দেহ না থাকে তাহলে ধৌত করা মুস্তাহাব।

سوال: إلامَ أشارَ بقولِه لا يَدْرِى اينَ باتتْ يدُه وما اراد به؟ والظاهرُ أنَّ اليدَ تكونُ معَ النائم حيثُ يكونُ هو؟

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) এর উক্তি لايدرى اين باتت يده **দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করেছেন? অথচ বাস্তবিক পক্ষে ঘুমন্ত ব্যক্তির সাথেই তার হাত থাকে।**

فانّ احدكُم لايَدْرِى اينَ بَاتتْ يدُهُ **বলার কারণ ঃ** এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মানুষের হাত মানুষের সাথেই থাকে। তাহলে রাসূল (স) কিভাবে বললেন, فانّ احدكُم لايَدْرِى اينَ بَاتتْ يدُهُ অর্থাৎ নিদ্রিত ব্যক্তি তো জানে না তার হাত কোথায় রাত যাপন করেছে। এ অংশটি বৃদ্ধি করার কারণ হচ্ছে–

ক. ইমাম শাফেয়ী (র) ও অধিকাংশ ফকিহগণের মতে, আরবের লোকজন পানির অভাবে ঢিলা ব্যবহার করতো। ফলে নাপাকির যে প্রভাব অবশিষ্ট থাকে তা ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। আর ঘুমন্ত অবস্থায় তথায় হাত যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্যেই রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন لايَدْرِى اينَ باتتْ يدُه এ কথার দ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য না যে, তার হাত তার সাথে থাকে না।

খ. কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেন শরীরে অনেক সময় ক্ষত থাকে। নিদ্রা গেলে সে ক্ষতযুক্ত স্থানে হাত লাগতে পারে। এটা ঘুমন্ত ব্যক্তির জানার বাইরে থাকে। এ জন্য বলা হয়েছে– لايَدْرِى اينَ بَاتتْ يدُهُ এর অর্থ এই নয় যে, তার হাত তার নিকটে থাকে না।

سوال : ما الفائدةُ فى قوله "مِنْ نَوْمِه" لانّ الاستيقاظَ لايكونُ الاّ منَ النَّوم

প্রশ্ন ঃ জাগ্রত হওয়া ঘুম ছাড়া অন্য কিছু থেকে হয় না। তাহলে من نومه **বলার উপকারিতা কি?**

উত্তর ঃ مِنْ نَوْمِه **বলার উপকারিতা ঃ** মানুষ ঘুম থেকেই জাগ্রত হয়ে থাকে। সুতরাং اذا استَيقظَ احدُكُم বললেই তো হতো। তার পরেও مِن نَوْمِه শব্দ উল্লেখ করা হলো কেন? এ কয়েদের প্রয়োজন ছিল না। তার পরেও مِن نَوْمِه শব্দ উল্লেখ করা হলো কেন?

এর মধ্যে উপকারিতা হচ্ছে استيقاظ মোট তিন প্রকার যথা– ১. استيقاظ مِن النَّوم

২. استيقاظ مِنَ الغَفْلَة

৩. استيقاظ مِن الاغماء এই তিন ধরনের استيقاظ এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারে হাত ধৌত করার প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা এমতাবস্থায় নাজাসাতের স্থানে হাত লাগার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু প্রথম প্রকার استيقاظ ঘুম থেকে হয়। আর ঘুমন্ত অবস্থায় ব্যক্তির চেতনা থাকে না যে, তার হাত কোথায় গিয়েছে। তাই নাজাসাতের মধ্যে হাত লাগার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্য হাদীসে শুধুমাত্র استيقاظ এর কথা উল্লেখ করা হয়নি সাথে সাথে من نومه সংযোগ করা হয়েছে। যেন استيقاظ مِن الاغماء ও استيقاظ مِن الغفلة উক্ত নির্দেশ থেকে বাদ হয়ে যায়। দ্বিতীয়, কেউ কেউ বলেন, مِن نومه হচ্ছে قيد اتِّفاقى

سوال : قولُه سنّة لِلمُستَيقِظ غسلُ يَدَيه الى رُسْغيه ثلاثاً قبلَ ادخالِهما اُذكُر كيفيةَ غسل اليَدَين لِلمُستَيقِظ .

প্রশ্ন ঃ ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তির হাত ধৌত করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ যদি পানির পাত্র এমন ছোট হয় যে, তা হাত দ্বারা উত্তোলন করা সম্ভব। তাহলে مُستَيقِظ ব্যক্তি বাম হাত দ্বারা পাত্রটি উত্তোলন করে ডান হাত ধৌত করবে। এভাবে তিনবার ধৌত করবে। অতঃপর আবার ডান হাতে পাত্র নিয়ে এভাবে বাম হাত তিনবার ধৌত করবে। আর যদি পাত্রটি এমন বড় হয় যে, তা উত্তোলন করা সম্ভব নয়। তাহলে তার সাথে যদি ছোট কোন পাত্র থাকে। সেই ছোট পাত্র দ্বারা উল্লেখিত নিয়মে প্রথমে ডান হাত অতঃপর বাম হাত তিনবার ধৌত করবে। আর যদি সাথে ছোট পাত্র না থাকে তাহলে প্রথমে বাম হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর একত্র করে কব্জী ব্যতীত পাত্রের ভিতরে হাত ঢুকাবে এবং পানি তুলে ডান হাত তিনবার ধৌত করবে। অতঃপর ডান হাত যে পর্যন্ত ঢুকানো দরকার সে পরিমাণ হাত ঢুকিয়ে পানি উত্তোলন করে বাম হাত ধৌত করবে। এই সকল কাজ করা হবে ঐ সময় যখন হাতে নাপাকি না থাকে। আর যদি হাতে নাপাকি থাকে

তাহলে আশপাশে কোন ব্যক্তি আছে কিনা দেখতে হবে। যদি থাকে তাহলে তার মাধ্যমে পানি উঠিয়ে হাত ধুয়ে নিবে। আর যদি আশেপাশে কেউ না থাকে তাহলে কাপড় বা মুখের সাহায্যে পানি উঠিয়ে হাত ধুয়ে নিবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে। (সিকায়া ৪০/৪৪ পৃষ্ঠা)

سوال : ما معنى الطّهارة؟ وكم قِسْمًا لها حَرِّرْ.

প্রশ্ন ঃ طهارة এর অর্থ কি এবং তা কত প্রকার কি কি?

উত্তর ঃ طهارة শব্দটির আভিধানিক অর্থ ঃ طَهَارَة শব্দটি فَعَالَة এর ওযনে বাবে نصر এর মাসদার। শব্দটির ط বর্ণে হরকতের বিভিন্নতার কারণে অর্থেও ভিন্নতা আসে। যেমন-

১. الطَّهَارَة শব্দটির ط বর্ণ যবর যোগে পড়লে এটা মাসদার হবে। অর্থ হলো النظافة বা نَقِيٌّ مِّنَ النَّجَاسَةِ وَالدَّنَس পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বা ময়লা ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা।

২. ط বর্ণে যের হলে তখন অর্থ হবে مافيه اٰلةُ النَّظَافة তথা পবিত্রতা অর্জনের উপকরণের পাত্র।

৩. ط বর্ণে পেশ হলে তখন অর্থ হবে مايَتَطَهَّرُبه مِنَ المَاء، والتُّراب তথা এমন বস্তু যার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায় যেমন পানি, মাটি অথবা فَضْلَةُ المَاء، তথা অবশিষ্ট পানি।

طهارة এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ هُوَ حصولُ النَّظَافة مِن النَّجَاسَة الحَقِيقِيَّة والحُكْمِيَّة. অর্থাৎ নাজাসাতে হাকীকী ও নাজাসাতে হুকমী থেকে পবিত্রতা অর্জন করাকে তাহারাত বলা হয়।

طهارة এর প্রকারভেদ ঃ طهارة প্রথমত দুই প্রকার। যেমন-

১. الطهارة الظاهرة তথা বাহ্যিক পবিত্রতা। যেমন অযূ করা। এ ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ ... الخ

২. الطهارة البَاطِنِيَّة তথা আত্মিক পবিত্রতা; যেমন অন্তরকে শিরক ও কুফর ইত্যাদি থেকে পবিত্র রাখা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلّٰى.

ইমাম গাযালী (র) বলেন, পবিত্রতা চার প্রকার

১. الطهارةُ مِن النَّجَاسَةِ والوَسَخِ নাজাসাত ও ময়লা থেকে পবিত্র হওয়া।

২. طهارة الأعْضَاء عَنِ العِصْيَان অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নাফরমানী থেকে দূরে রাখা।

৩. طهارةُ القلبِ عَن سُوءِ الفِكْرِ কুচিন্তা থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা।

৪. طهارةُ القلبِ عَنِ الشِّرك শিরক থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা।

আলোচ্য হাদীসের ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মন্তব্য

জনৈক বিজ্ঞানী বলেন, আমি প্রথমে যখন ইসলাম ধর্মের এ বিধান দেখি তখন এটা আমার নিকট খুবই হাস্যকর মনে হয় যে, মানুষ ঘুম থেকে ওঠবে কিন্তু হাত ধৌত করবে কেন? এটা করার দরকার কি? আমি বিষয়টিকে নিয়ে ভাবতে থাকি, হঠাৎ আমার ঘুম এসে যায়। ঘুম থেকে উঠে আমি হাত ধোয়া ছাড়া ঠোঁটে হাত দিয়ে দেখি ঠোঁট হাল্কা জ্বলছে। অতঃপর হাত ধৌত করা ছাড়াই আমি খাদ্য ভক্ষণ করলাম, সাথে সাথে আমার পেটের মধ্যে হুড়মুড় শুরু করল। পরপরই ডায়রিয়া আরম্ভ হলো। আর ঠোঁট দুটিও ফুলে গেল। পরক্ষণে হাত পরীক্ষা করে দেখলাম আমার হাতে বিচ্ছুর বিশ লেগে রয়েছে। আমি ঘুমায়ে গেলে বিচ্ছুতে আমার হাত চাটার ফলে এ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমি যদি হাত ধৌত করার পর ঠোঁটে হাত দিতাম এবং খাবার খেতাম তাহলে এমনটি হত না। অপরদিকে আমি আরো ভেবে দেখলাম যে, মানুষ ঘুমালে হাত বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমন করে এবং তাতে নানা ধরণের জীবাণু ও ময়লা লাগার সম্ভাবনা থাকে যা মানুষের জীবনকে বিপন্ন করতে যথেষ্ট। তখনই ইসলামের এ মহান বিধানের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগলো এবং এ বিধান বিচক্ষণতার প্রতিও কৃতজ্ঞ হলোম। সত্যই ইসলাম এক অমিয় ধর্ম যা মানুষের জীবনের সুস্থতা ও শান্তি আনয়নের জন্য যথেষ্ট।

بَابُ السِّوَاكِ اذا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ ـ

بَابُ كَيْفَ يَسْتَاكُ

٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَسْتَنُّ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلٰى لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ عَاْعَاْ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ রাতে নামায আদায় করতে উঠলে মিস্ওয়াক করা

অনুবাদ ঃ ২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র)......হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) রাত্রিবেলা নামায আদায় করতে উঠলে মিসওয়াক দ্বারা আপন দাঁত মাজতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ মিসওয়াক কিভাবে করতে হবে?

৩. আহমদ ইব্ন আবদাহ্ (র)........আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলাম তখন তিনি মিসওয়াক করছিলেন। আর মিসওয়াকের এক পার্শ্ব তাঁর জিহ্বার উপর ছিল এবং 'আ' 'আ' করছিলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : ما معنى السِّواك لغةً وشرعًا؟ وما الاحوالُ التى يُسْتَحَبُّ فيها السواكُ ماعدا الوُضوءِ والصلٰوةِ .

প্রশ্ন ঃ سواك **এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কি? উযূ ও নামায ব্যতীত কোন কোন অবস্থায় কি মিসওয়াক করা মুস্তাহাব?**

سواك **এর আভিধানিক অর্থ ঃ** سواك **শব্দটি** باب نصر ينصر এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ- دَلْكُ الْاَسْنَانِ তথা দাঁত ঘষা-মাজা, বা فلان ساك الاسنان بعد تَصْفِيَةُ الْاَسْنَانِ তথা দাঁত পরিষ্কার করা যেমন বলা হয়- اَلْعُوْدُ الَّذِىْ يُسْتَاكُ بِ তথা যা দ্বারা মিসওয়াক করা হয়। ইবনে হাজার বলেন কখন এটা ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কাঠ দ্বারা ঘর্ষণ করা। আবার কখন কখন ইসমে আলার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থ ঐ বস্তু যার দ্বারা দাঁত মাজা হয়।

سواك **এর শরয়ী অর্থ ঃ শরীয়তের পরিভাষায়** سواك বলা হয়-

هو اِسْتِعمال عُوْدٍ او غيره فى الاَسْنَانِ وما حَوْلَها بنيَّة التقرُّب والرِّضا অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের আশায় দাঁত ও তার চতুর্দিক পরিষ্কার করার জন্যে কোন গাছের ডাল বা অন্য কিছু ব্যবহার করাকে মিসওয়াক বলা হয়।

উযূ ও নামায ব্যতীত মিসওয়াকের মুস্তাহাব অবস্থাসমূহ ঃ উযূ ও নামায ব্যতীত নিম্নবর্ণিত অবস্থায় মিসওয়াক করা মুস্তাহাব- ১. দাঁত হলদে ও ময়লাযুক্ত হলে। ২. মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হলে। ৩. নিদ্রা থেকে উঠার পর। যেমন হাদীস এসেছে- ان النبىَّ صلى الله عليه وسلم اذا قامَ مِنَ اللَّيل شَوصَ فاه بالسِّواك

৪. সফর থেকে আসার পর। যেমন বর্ণিত আছে- عن عائشة انَّ رسولَ ﷺ اذا دَخَلَ البيتَ بَدَءَ بالسِّواكِ

উপরক্ত অবস্থাগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে ফতহুল কাদীর গ্রন্থকার বলেন-

وَيُسْتَحَبُّ السِّوَاكُ فِى خَمْسَةِ مَوَاضِعَ اِصْفِرَارِ السِّنِّ وَتَغَيُّرِ الرَّائِحَةِ وَالْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ وَالْقِيَامِ اِلَى الصَّلٰوةِ وَعِنْدَ الْوُضُوْءِ.

৫. কুরআন তিলাওয়াতের প্রাক্কালে ৬. দীর্ঘ সময় চুপ থাকলে ৭. দীর্ঘ সময় কথা বললে ৮. খাওয়ার পর ৯. দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য ভক্ষণের পর।

سوال : ما معنى السِّوَاكِ لغةً واصطلاحًا وما قدرُه طُوْلاً وضخامةً وما الكيفيةُ المَسْنُونَةُ لِلْاِسْتِيَاكِ؟

প্রশ্ন ঃ ঃ سواك শব্দের আবিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? দৈর্ঘ্যে ও মোটার দিক দিয়ে তার পরিমান এবং মেসওয়াক করার সুন্নত পদ্ধতি কি লিখ।

উত্তর ঃ سواك এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ পূর্বের প্রশ্নে অতিবাহিত হয়েছে সেখানে দ্রষ্টব্য। বাকী উত্তর নিম্নরূপ– এটা লম্বায় এক বিঘাত পরিমাণ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ন্যায় মোটা হবে। মোল্লা আলীক্বারী বলেন, মেসওয়াক তিক্ত গাছ থেকে হওয়া এবং এক বিঘত 'পরিমাণ লম্বা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ন্যায় মোটা হওয়াই সমীচীন। মিসওয়াক লম্বার দিকে না করে পাশের দিকে করাই সমীচীন। আবার কেউ কেউ বলেন উভয় দিকেই করা উচিৎ। আর এক দিকে করতে চাইলে চওড়ার দিকে করবে। এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দরমত হলো দাঁতের মেসওয়াক পাশের দিকে করবে এবং জিহ্বার মেসওয়াক করবে লম্বা লম্বিভাবে ডান হাত দিয়ে বাম দিক থেকে শুরু করবে এবং ডান দিকে শেষ করবে। এভাবে তিনবার নতুন পানি দিয়ে ধৌত করবে।

سوال : السِّوَاكُ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوْءِ اَوْ مِنْ سُنَنِ الصَّلٰوةِ اَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا فَصِّلْ مَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَكَ.

প্রশ্ন ঃ মিসওয়াক করা কি উযূর সুন্নত না কি নামাযের সুন্নত, না অন্য কিছুর সুন্নত? তোমার নিকট গ্রহণযোগ্য অভিমতটি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মিসওয়াক করা কি উযূর সুন্নত, না নামাযের সুন্নত ঃ মিসওয়াক করা অযূর সুন্নত না নামাযের সুন্নত এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে তা বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

১. ইমাম শাফেয়ী (র) এবং আহলে জাহেরদের নিকট এটা নামাযের সুন্নত উযূর সুন্নত নয়।

২. হানাফীগণ বলেন এটা উযূর সুন্নত নামাযের সুন্নত নয়।

ইমাম শাফেয়ী এর অভিমত ও দলীল ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, মিসওয়াক নামাযের সুন্নত। তিনি এর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীগুলো পেশ করেন–

(١) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ . متفق عليه.

"আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করলে প্রত্যেক নামাযের সময় উযু করতে বলতাম।"

٢. عن جابرٍ كَانَ السِّوَاكُ مِنْ اُذُنِ النَّبِيِّ ﷺ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنَ الْكَاتِبِ (بيهقى)

٣. عن ابى هريرةَ (رض) كان اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ اَسْوِكَتُهُمْ فِى اٰذَانِهِمْ يَسْتَنُّوْنَ بِهَا لِكُلِّ صَلٰوةٍ.

হানাফী মাযহাবের দলীল ঃ ১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত নবী করীম (স) ইরশাদ করেন–

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوْءِ (مستدرك حاكم ج اص ١٤٦)

অর্থাৎ আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে তাদের উপর উযূর সাথে মিসওয়াক করাকে আবশ্যক করে দিতাম।

২. হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত নবী (স) ইরশাদ করেন–

لَوْلَا اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوْءِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ (اثار السنن ص ٢٩)

অর্থাৎ আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে প্রতি নামাযের ক্ষেত্রে উযূর সময় তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

৩. হযরত আলী হতে বর্ণিত মারফু হাদীস–

لَوْلَا اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ (مجمع الزوائد ج اص ٢٢١)

৪. **হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত**, নবী করীম (স) **ইরশাদ** করেন–

لولا ان أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء (ابن ماجه)

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, মিসওয়াক উযূর সুন্নত, নামাযের সুন্নত নয়।

আকলী দলীল : মিসওয়াক পবিত্রতা অর্জনের একটি মাধ্যম। এর সম্পর্ক উযূর সাথে নামাযের সাথে নয়। যেমন হযরত আয়েশা (রা) এর সনদে বর্ণিত আছে–

السواك مطهرة للفم ومرضات للرب (نسائي ج اص ٥ باب الترغيب في السواك بخاري اص ٢٠٩)

মিসওয়াক দ্বারা মুখকে পরিষ্কার করা উদ্দেশ্য। কাজেই এটা উযূর সময় হওয়াটাই সঙ্গত। নামাযের আগে মিসওয়াক করা হলে নির্গত ময়লাযুক্ত থুথু গিলে ফেলতে হবে যা স্বভাব এবং রুচি বিরোধী। অথবা বাইরে নিক্ষেপ করার জন্যে ছুটাছুটি করতে হবে তাতে নামাযের পরিবেশ বিনষ্ট হবে। অনেক সময় মিসওয়াক করলে দাঁত থেকে রক্ত বের হয় যা উযূ ভঙ্গকারী। এ অবস্থায় মুসল্লী কি করবে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধবে না উযূ করবে?

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

১. عند كل صلوة এর মধ্যে عند শব্দটির পর مضاف তথা وضوء শব্দ উহ্য আছে। মূল বাক্যটি হবে এরূপ عند وضوء كل صلوة অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের উযূর সময় মিসওয়াক করা সুন্নত যা হানাফীদের দলীলসমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট।

২. দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাপারে ইমাম বায়হাবী (র) বলেছেন এটা দুর্বল হাদীস। অন্যদিকে এখানে উল্লেখ আছে যে, মিসওয়াক রাসূল (স) এর কানে থাকতো। নামাযের সময় তিনি মিসওয়াক করতেন এ কথা তো উল্লেখ নেই।

৩. তৃতীয় হাদীস সম্পর্কেও বলা যায় যে, সেখানেও وضوء শব্দ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ يستنون بها لكل وضوء صلاة মোটকথা মিসওয়াক হচ্ছে উযূর সুন্নত।

৪. রেওয়ায়েত দ্বারা কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, রাসূল (স) নামাযে দাঁড়ানোর পূর্বেই মিসওয়াক করেছেন। নামাযের আগে মিসওয়াক করলে দাঁত দিয়ে রক্ত বের হতে পারে যা হানাফীদের নিকট উযূ ভঙ্গকারী। আর শাফেয়ীদের নিকট অপছন্দনীয় যা নামাযের একাগ্রতাকে বিনষ্ট করে। এ সকল কারণে বলা হয় যে, মিসওয়াক উযূর সুন্নত নামাযের সুন্নত নয়। (দরসে তিরমিযী খণ্ড নং ১ পৃষ্ঠা নং ২২৩-২২৪)

سوال : أكتب نبذة من حياة حذيفة رض.

প্রশ্ন : হযরত হুযাইফা (রা) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।

উত্তর : নাম ও বংশ : তিনি হলেন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ইবনে জাবির ইবনে আমর ইবনে রাবীয়া ইবনে জিরওয়া ইবনে হারিছ ইবনে মাযিন ইবনে কুতাইবা ইবনে আব্বাস (রা)। বস্তুতঃ তিনিই হলেন হুযাইফা ইবনে হিসল। ইয়ামান হলো হিসল ইবনে জাবিরের উপাধি।

ইয়ামান উপাধির কারণ : ইবনুল কালবী বলেছেন, ইয়ামান শব্দটি জিরওয়া ইবনুল হারিসের উপাধি। এই উপাধি তাকে দেয়ার কারণ হলো তিনি তার সম্প্রদায়ের এক লোককে হত্যা করেছিলেন। অতঃপর পালিয়ে মদীনায় এসে বনু আব্দুল আশহাল নামক আনসারী গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এজন্যই তার কওম তাকে ইয়ামান নাম দেন। কারণ আনছারীরা হলেন ইয়ামানী। আর তিনি ইয়ামানীদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেছিলেন। তার থেকে তার পুত্র আবু উবাইদা হাযিম, যায়েদ ইবনে ওহাব, আবু ওয়াইলি (র) প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হিজরত : তিনি হিজরত করে নবী করীম (স) এর কাছে এলে তিনি তাকে হিজরত ও নুসরতের এখতিয়ার দেন। তিনি নুসরত অবলম্বন করে প্রিয়নবী (স) এর সাথে উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এ যুদ্ধে শাহাদাৎ লাভ করেন।

মুনাফিকদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত : হযরত হুযাইফা (রা) ছিলেন মুনাফিকদের সম্পর্কে প্রিয় নবী (স) এর গোপন সংবাদ বিশেষজ্ঞ। তাদের নাম হুযাইফা (রা) ছাড়া আর কেউ জানতেন না। প্রিয় নবী (স) তাকে

মুনাফিকদের সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। এ জন্য উমর (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার গভর্ণরদের কেউ কি মুনাফিক আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলেন কে? বললেন, নাম বলবো না। হযরত হুযাইফা বলেন পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা) তাকে অপসারণ করেন যাকে হযরত হুযাইফা ইঙ্গিতে তাকে মুনাফিক হওয়া সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

হযরত উমর (রা) এর জানাযায় উপস্থিত ঃ কোন ব্যক্তি মারা গেলে হযরত উমর (রা) হুযাইফার কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি যদি সে মৃতের জানাযায় উপস্থিত থাকতেন তবে হযরত উমর (রা) তাঁর জানাযা নামায পড়তেন। আর যদি উপস্থিত না হতেন তবে হযরত উমর (রা) তার জানাযার নামায পড়তেন না। এমনকি সেখানে উপস্থিতও হতেন না।

যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ঃ হযরত হুযাইফা নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। সেনাপতি নো'মান ইবনে মুকরিন শাহাদাৎ লাভ করলে তিনি ঝাণ্ডা হাতে নেন। হামদান, রাই, দীনাওর তার হাতে বিজিত হয়। জাজিরা বিজয়ে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। নাসীবাইন নামক স্থানে তিনি অবস্থান করেন। সেখানে বিবাহশাদী করেন।

ওফাতকালীন অবস্থা ঃ লাইস ইবনে আবু সুলাইম বলেন, মৃত্যু শয্যায় শায়িত হলে হযরত হুযাইফা (র) ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েন এবং খুব কাঁদলেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি দুনিয়ার জন্য আফসোস করে কাঁদছিনা। বরং মৃত্যু আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। আমার কাঁদার কারণ হলো আমি জানিনা কিসের উপর সামনে অগ্রসর হচ্ছি। আল্লাহ আমার প্রতি সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট? কেউ কেউ বলেছেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি বললেন, এ হলো আমার দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত, আল্লাহ! তুমি জান আমি তোমাকে ভালবাসি। অতএব তোমার সাক্ষাতে আমাকে বরকত দাও। এর পরই তিনি ইন্তিকাল করেন।

ওফাত ঃ হযরত উসমান (রা) এর ওফাতের ৪০ দিন ৪০ রাত পর ৩৩ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন।
(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য উসদুল গাবাহ ১/৭০৬-৭০৭ ইত্যাদি।)

হাদীসদ্বয় সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা

قوله إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ... الخ ঃ সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ নবী কারীম (র) রাত্রে যখন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করতেন। কাজেই নাসায়ীর এই বর্ণনা দ্বারাও এই উদ্দেশ্য হবে।

قوله يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ الخ ঃ يَشُوصُ শব্দটি شوص থেকে গৃহীত, যএ অর্থ হলো আড়াআড়িভাবে মিসওয়াক করা। এর দ্বারা একথা প্রতীয়মান হলো যে, আড়াআড়িভাবে দাঁত পরিষ্কার করবে লম্বালম্বীভাবে নয়। নবী (স) ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মিসওয়াকের মাধ্যমে দাঁত পরিষ্কার করতেন এবং জিহ্বাকেও পরিষ্কার করতেন। কারণ রাত্রে পেটের ভিতরকার লালা মুখে এসে জমা হয়, যা অপ্রীতিকর। কাজেই নবী (স) ঐগুলোকে পরিষ্কার করতে বলেন যাতে নামাযের একাগ্রতা বিনেষ্ট না হয়।

قوله وطرفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ .. الخ ঃ হুজুর (স) এর এ অবস্থার দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, মিসওয়াকের কত গুরুত্ব যে, তিনি দাঁতকে মিসওয়াক দ্বারা পরিষ্কার করার সাথে সাথে জিহ্বাকেও মিসওয়াক দ্বারা পরিষ্কার করেছেন। তাই শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) বলেন, যখন কেউ মিসওয়াক করে তখন তার জন্য উচিৎ হলো কণ্ঠনালী পর্যন্ত মিসওয়াক করে সিনার কফগুলো বের করে ফেলা। এর দ্বারা আওয়াজ পরিষ্কার হবে এবং মুখও সুগন্ধিযুক্ত হবে।

قوله وهُوَ يقولُ عَأعَأ - الخ ঃ রাসূল (স) যখন জিহ্বার উপর মিসওয়াক করতেন তখন এক প্রকারের আওয়াজ হতো, কিন্তু সে আওয়াজের ধরন এক এক জন একেক ধরনের বলেছেন—

১. কেউ কেউ বলেন রাসূল (স) أَعْ أَعْ করতেন।

২. কেউ কেউ বলেন, রাসূল (স) اُعْ اُعْ করতেন। (الف। বর্ণটি পেশ যোগে)।

৩. কেউ কেউ বলেন, রাসূল (স) اَعْ اَعْ করতেন। (الف। শব্দটি যবর যোগে)।

মূলত উক্ত তিন বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরিত্ব নেই, কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণা ও গবেষণা মুতাবেক বর্ণনা করেছেন। কারণ প্রত্যেক মানুষ একেকটি চিন্তাধারা নিয়ে থাকে। অতঃপর যখন কোন কিছু শোনে তখন উক্ত চিন্তাধারা মুতাবেকই সেটাকে ব্যক্ত করে। যেমন কোন এক পাখির আওয়াজ শুনে একেক জন একেক ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছিল, যেমন কোন ব্যবসায়ী বলল পাখিটি বলেছে পিয়াজ, রসুন, আদরক। এক দর্জি বলল না সেতো বলেছে সুই সুতা টগরক। একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ বলল না বরং সে বলেছে রাম লক্ষণ দশরত। সেখানে একজন মুসলমান উপস্থিত ছিলেন তিনি বললেন, কখনই নয় বরং পাখিটি বলেছে– আল্লাহ রাসূল হযরত। মোটকথা প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তাধারা অনুযায়ী যেভাবে পাখির ডাকার ব্যাখ্যা দিয়েছে। ঠিক তদ্রূপ নবী (স) তো একটি নির্দিষ্ট শব্দ করতেন কিন্তু সাহাবারা প্রত্যেকে তাদের চিন্তাধারা মুতাবেক রাসূলের এ আওয়াজের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

سوال : اكتب نبذةً مِّن حَيَاةِ اَبِى مُوْسٰى اَشْعَرِىّ بالْإِيْجَاز.

প্রশ্ন ঃ সংক্ষেপে হযরত আবু মূসা আশয়ারী এর জীবনী লেখ।

উত্তর ঃ হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (র) এর জীবনী ঃ

পরিচিতি ঃ নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আবূ মূসা, পিতার নাম কাইস ইবনে সুলায়মান, মায়ের নাম তাইয়্যিবা। উপনামেই তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি ইয়ামানের আল আশয়ার গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্যে তাকে আল আশআরী বলা হয়।

ইসলাম গ্রহণ ঃ তিনি ইসলামের প্রথম যুগে ইয়ামান থেকে মক্কায় হিজরত করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরত ঃ কিছু দিন মক্কায় কাটানোর পর তিনি হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর اهل سفينة এর সাথে খায়বার বিজয়ের পর মদীনায় আগমন করেন।

জিহাদে অংশ গ্রহণ ঃ তিনি মক্কা বিজয় ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দেন।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ঃ রাসূল (স) তাঁকে জুবাইদ, আদন, ও সাহেলে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। হযরত ওমর (রা) তাঁকে বসরার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর তাকে কুফার গর্ভনর করে পাঠান। কিন্তু হযরত উসমান (রা) তাকে বরখাস্ত করেন।

হাদীস শাস্ত্রে অবদান ঃ তিনি সর্বমোট ৩৬০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে ৫০টি হাদীস বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে বর্ণনা করেন এবং এককভাবে ইমাম বুখারী (র) ৪৫টি, আর মুসলিম (র) ২৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি কুফা নগরীতে একটি দরসে হাদীসের কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন।

ইন্তিকাল ঃ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) এর মতে তিনি ৬৩ বৎসর বয়সে ৫৪ হিজরীতে মক্কা অথবা কুফা নগরীতে ইন্তিকাল করেন। তথায় তাকে দাফন করা হয়।

রাতে মিসওয়াক ও আধুনিক বিজ্ঞান

জনৈক ইঞ্জিনিয়ার বলেন, ওয়াশিংটন এর একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার একদা আমাকে বললেন, আপনি শয়নকালেও মিসওয়াক করবেন, আমি বললাম এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, গবেষণায় দেখা গেছে যে, মানুষ যা ভক্ষণ করে তার ময়লা কুলির দ্বারা পরিপূর্ণ পরিষ্কার হয় না, তিনি আরো বলেন যে, সাধারণত মানুষের দাঁত নষ্ট হয় শয়নকালে। আমি জিজ্ঞেস করলাম এর কারণ কি? তিনি বললেন, আপনি প্রত্যক্ষ করে থাকবেন যে, দিনের বেলায় মানুষ কখনো কথা বলছে, কখনো আহার করছে আবার কখনো পান করছে। তাই দিনের বেলায় মুখের গতিশীলতার কারণে রক্তরস বা রক্তলসিকা তার কাজ করার সুযোগ পায় না, কিন্তু রাতের বেলা যখন মুখ বন্ধ হয়ে যায় তখন তার সুযোগ এসে যায় কাজ করার। এ কারণেই দাঁত রাতের বেলায় অধিক খারাপ হয়। তিনি আরো বললেন, সকালে টুথ পেষ্ট করেন আর না করেন শোয়ার সময় অবশ্যই মিসওয়াক করে ঘুমাবেন। বিজ্ঞ ডাক্তার সাহেবের মুখে একথা শুনে আমি শুকরিয়া জ্ঞাপনস্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ পড়ে নিলাম, কেননা এটাইতো আমাদের নবী করীম (স) এর সুন্নত।

بابُ هَل يَسْتَاكُ الامامُ بِحَضْرةِ رَعِيَّتِه

٤. اخبرنا عمرُو بنُ علي حدّثنا يحيٰى وهو ابنُ سعيد قال حدّثنا قُرَّةُ بنُ خالد قال حدّثنا حميدُ ابنُ هلالٍ قال حَدّثَنِى اَبُو بُرْدَةَ عَن ابى مُوسٰى قالَ اَقْبلْتُ اِلى النّبىِّ ﷺ ومَعِى رَجُلانِ مِنَ الاَشْعَرِيّيْنَ احدُهُما عنْ يَمِيْنِى والاٰخرُ عنْ يَسارِى ورسولُ اللّه ﷺ يَسْتاكُ فكِلاَهُما يَسْأَلُ العمَلَ قلتُ والّذِى بَعَثَكَ نَبِيًّا بالحقِّ مَا اطّلعانِى ما فِى اَنْفُسِهما وماشَعُرْتُ اَنّهُما يَطلُبانِ العَمَلَ فكَاَنِّى انظُر اِلى سِواكِه تحتَ شَفَتِه قَلَصَتْ فقالَ اِنّا لا او لَنْ نَستعِينُ عَلَى العَمَلِ مَنْ ارادَه ولٰكن اذْهَبْ انتَ فبعَثَه علَى اليَمنِ ثم اَرْدَفَه معاذُ بنُ جبلٍ رضى اللّه عنْهما -

بابُ التّرغِيبِ فِى السّواك

٥. اخبرَنا احمدُ بنُ مسعدةَ ومحمدُ بنُ عبدِ الاعلٰى عن يزيدَ وهو ابنُ زُرَيعٍ قالَ حَدّثَنِى عبدُ الرحمنُ بْنُ ابى عَتيقٍ قال حدّثَنى اَبِى قال سمعتُ عائشةَ رضى اللّه تعالٰى عَنْها عنِ النبىِّ ﷺ قال السّواك مَطهرةٌ لِلفَمِ مَرضاةٌ للرّبِّ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম তাঁর অধস্তনের সামনে মিস্ওয়াক করবেন কি?

অনুবাদ ঃ ৪. আমর ইবনে আলী (র)........আবু মূসা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এলাম, আমার সঙ্গে ছিল আশ'আর গোত্রের দু'জন লোক। তাদের একজন ছিল আমার ডানদিকে আর অন্যজন ছিল আমার বাঁদিকে। রাসূলুল্লাহ (স) তখন মিসওয়াক করছিলেন। তারা উভয়ে তাঁর কাছে কাজ চাইল। আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! তাঁদের অন্তরে কি ছিল তা আমাকে অবগত করেনি আর আমিও বুঝতে পারিনি যে, তারা কাজ চাইবে। আমি তখন তাঁর ঠোঁটের নীচে রাখা মিসওয়াকের দিকে লক্ষ্য করছিলাম। তাঁর ঠোঁট তখন উঁচু ছিল। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কাজ চায় আমরা তাকে কাজ দিই না। তবে তুমি যাও, পরে আবু মূসাকে ইয়ামনে পাঠান, আর মুয়ায ইবনে জাবাল তাঁর অনুগামী হলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ মিস্ওয়াকের প্রতি উৎসাহিত করা

৫. হুমায়দ ইবনে মাসআদাহ্ ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র). .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ ও আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উপায়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : اَوْضِح المُناسَبَة بيْنَ الحديثِ وبيْنَ تَرجمةِ الباب ـ هَل يستاكُ الامامُ بحَضْرة رَعِيَّته؟

প্রশ্ন ঃ আলোচ্য হাদীস ও অনুচ্ছেদের শিরোনামের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। প্রজাদের সামনে ইমাম মিসওয়াক করবে কি?

উত্তর ঃ হাদীস ও শিরোনামের মধ্যকার যোগসূত্র ঃ তরজমাতুল বাব তথা শিরোনাম ও হাদীসের মাঝে পরিষ্কার সামঞ্জস্য দেখা যায়। কেননা তরজমাতুল বাব হচ্ছে هل يَسْتاكُ الامامُ بحَضْرة رَعِيّته অর্থাৎ প্রজাদের

সামনে ইমামের মিসওয়াক করা প্রসঙ্গে। আর হাদীসের মধ্যে আলোচনা এসেছে রাসূল (স) হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) ও দু' জন লোকের সামনে মিসওয়াক করেছিলেন। আবু মূসার উক্তি- فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ অতএব, তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য হয়ে গেল।

প্রজাদের উপস্থিতিতে ইমামের মিসওয়াক করার বিধান

ইমাম তাঁর প্রজাদের উপস্থিতিতে মিসওয়াক করতে পারবে কি না এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেন বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় প্রজাদের সামনে ইমামের মিসওয়াক করা বৈধ, কারণ রাসূল (স) এমন করেছেন। তবে এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে

ক. মিসওয়াকের দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু যদি তাকে অপবিত্র করে ফেলে তাহলে সে ক্ষেত্রে প্রজাদের সামনে মিসওয়াক করা জায়েয নেই।

খ. মিসওয়াক করার কারণে যদি প্রজাদের সামনে খাটো হতে হয় তাহলেও মিসওয়াক করা জায়েয নয়।

গ. অনুরূপভাবে মিসওয়াক করার দ্বারা যদি প্রজাদের সামাজিক অসুবিধা হয় তাহলেও এরূপ মিসওয়াক করা জায়েয নেই, অন্যথায় জায়েয।

سوال : اذكر سُنَنَ السِّوَاكِ وفضائله بضوء الأحاديث الواردة فيها مع ذكر دَرَجَةِ السِّوَاكِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

প্রশ্ন ঃ হাদীসের আলোকে মিসওয়াকের সুন্নত, উপকারিতা ও মিসওয়াকের শরয়ী মর্যাদা উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ মিসওয়াকের সুন্নত ঃ মিসওয়াক করার সুন্নত তরীকা হচ্ছে দন্তসমূহের উপর দিয়ে প্রস্থভাবে মিসওয়াক করা। যেমন হযরত আতা ইবনে আবু রবাহ বর্ণনা করেন-

قال رسولُ اللّٰه صلعم إذا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُوا مَصًّا وإذا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُوا عَرْضًا (تلخيص الحبير)

আর জিহ্বাকে লম্বাভাবে পরিষ্কার করা উত্তম। যেমন- হাদীসে এসেছে-

فِي حديثِ أبِي موسٰى وطرفُ السِّوَاكِ علٰى لِسانِه يَسْتَنُّ إلى فوقَ قال الرّاوي كأنّه يَسْتَنُّ طُولًا.

আর কমপক্ষে দাঁতকে তিনবার মিসওয়াক করতে হবে। اراك নামক বৃক্ষের কাণ্ড দ্বারা মিসওয়াক করা সুন্নত। যেমন- হাদীসেএসেছে- عن عبدِ اللّٰه بنِ مَسْعودٍ رض قال كنتُ أَجْتَنِي لِرَسُولِ اللّٰهِ صلعم سِوَاكًا مِّنْ أَرَاكٍ

যেহেতু এখন আর সেই গাছ নেই তাই যে কোন গাছের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করলেই চলবে। তবে এর পরিমাণ যেন এক বিঘাত এর কম না হয় এবং বেশীও না হয়। জিহ্বার তালু ও ঠোঁটের নিচে মিসওয়াক করা, ডান দিক থেকে বাম দিকের দাঁত মিসওয়াক করা এবং মিসওয়াককে তিনবার ধৌত করে তারপর মিসওয়াক করা।

মিসওয়াক করার উপকারীতা

১. মিসওয়াক করলে মুখের পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়।
২. খোদার সন্তুটি বৃদ্ধি পায়। যেমন হাদীস- السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ
৩. রোগ জীবানু দূরীভূত হয়।
৪. অপর ভাই মুখের দুর্গন্ধ দ্বারা কষ্ট পায় না।
৫. মেধা শক্তি বৃদ্ধি পায়। যেমন হযরত আলী (রা) বলেন-
ثَلٰثَةٌ يَزِدْنَ فِي الحِفْظِ ويُذْهِبْنَ البَلْغَمَ السِّوَاكُ والصومُ وقراءةُ القرآنِ .
৬. মিসওয়াক করে নামায পড়লে ৭০ গুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়।
৭. মৃত্যুকালে কালেমা নছিব হয়।
৮. দাঁত মজবুত হয়।
৯. দাঁতের মাড়ি শক্ত থাকে।
১০. দাঁত সুন্দর ও ঝকঝকে হয়
১১. চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়
১২. শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

১৩. মনে ফূর্তি থাকে।

১৪. ফেরেশতারা খুশি হয় ও দোয়া করে।

১৫. শয়তান বিতাড়িত হয়।

১৬. আল্লামা শামী লিখেছেন, মিসওয়াকের ৭০ এর অধিক উপকারীতা রয়েছে তন্মধ্যে নূন্যতম একটি হলো মুখের কষ্টদায়ক দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। আর সর্বোচ্চ হলো মৃত্যুর সময় কালেমা নছীব হয়।

মিসওয়াকের শরয়ী মর্যাদা

শরীয়তে মিসওয়াক করা ওয়াজিব নাকি সুন্নত এ ব্যাপারে দু'ধরণের মতামত পাওয়া যায়।

১. জুমহুরের মতে মিসওয়াক করা সুন্নত; ওয়াজিব নয়। আল্লামা নববী (র) মিসওয়াক সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

২. ইমাম ইসহাক ও দাউদে জাহেরী থেকে এ ব্যাপারে দু'ধরণের বর্ণনা রয়েছে।

ক. মিসওয়াক করা সুন্নত, খ. মিসওয়াক করা ওয়াজিব।

ইমাম ইসহাক ও দাউদে জাহেরী এর দলীল ঃ মিসওয়াক করা যে ওয়াজিব এ ব্যাপারে আল জামে উসসগীর গ্রন্থে রাফে ইবনে খাদীজ (র) এর একটি রেওয়ায়েত আছে যে,

السِّوَاكُ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থাৎ মিসওয়াক করা ও জুমআর গোসল করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব। এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে মেসওয়াক করা ওয়াজিব।

জুমহুরের দলীল ঃ আবূ হুরায়রা (রা) এর হাদীস–

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ

(بخاری ج اص ۱۲۲ السواك يوم الجمعة مسلم ج اص ۱۲۱ باب السواك. ترمذى ج ا ص ۱۲ باب فى السواك نسائى ج ا ص ٦ الرخصة فى السواك الخ ابن ماجة ص ۲۵)

অর্থাৎ রাসূল (স) বলেন, যদি আমি মুমিনদের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তবে তাদেরকে এশার নামায বিলম্বে রাত্রির এক তৃতীয়াংশের পর পড়তে ও প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম। বস্তুত রাসূল (স) কেবল নির্দেশ দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন, নির্দেশ দেননি। কাজেই এটা সুন্নত হবে, ওয়াজিব নয়।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

১. উল্লেখিত ইমামদ্বয়েরও প্রসিদ্ধ মত হলো মিসওয়াক সুন্নত। ২. ইজমার বিপরীতে মাত্র দু'মনীষীর মিসওয়াক ওয়াজিব উক্তিতে তেমন কিছু আসে যায় না। (দরসে তিরমিযী ১/২২২-২২৩)

৩. হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "তালখীসুল হাবীর" গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করার পর লিখেন اسناده واه অর্থাৎ এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। অতএব, এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা ঠিক নয়।

سوال : هَلْ تُؤَدِّى سُنَّةُ السِّوَاكِ بِاسْتِعْمَالِ فُرْشَةِ الْاِنْسَانِ وَخِرْقَةِ الثَّوْبِ وَالْاَصَابِعِ.

প্রশ্ন ঃ ব্রাশ, বস্ত্র খন্ড এবং আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করলে তা- কি আসল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে?

উত্তর ঃ আঙ্গুলের দ্বারা মিসওয়াকের বিধান ঃ আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করলে তা মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে কি-না এ ব্যাপারে আলিমদের রায় নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. একদল আলেমের মতে আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করলে তা মূল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে না। কেননা تطهير الفم মিসওয়াকের মূল উদ্দেশ্য। আঙ্গুল দ্বারা সাধারণত সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

২. **জুমহুর ফকীহগণের অভিমত ঃ** জুমহুর আলিম ও ফকীহগণ বলেন, মিসওয়াক থাকা অবস্থায় আঙ্গুল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে না। তবে মিসওয়াক পাওয়া না গেলে আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করলে সুন্নত আদায় হবে এবং মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে।

জুমহূরের দলীল

١. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَصَابِعُ تَجْرِى مَجْرَى السِّوَاكِ اِذَا لَمْ يَكُنْ سِوَاكٌ.

মিসওয়াকের অবর্তমানে আঙ্গুল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে।

٢. اِنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ دَعَا بِكُوزٍ مِّنْ مَاءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ فَاَدْخَلَ بَعْضَ اَصَابِعِهِ فِى فِيْهِ وَقَالَ هٰذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللّٰهِ.

এখানে আলী (রা) কতক আঙ্গুল মুখের ভিতর ঢুকিয়ে বললেন এই হলো রাসূল (স) এর উযূ। এ কারণেই হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُعَالِجُ بِالْاَصَابِعِ

ব্রাশ ও কাপড়ের টুকরার দ্বারা মিসওয়াকের বিধান

ব্রাশ, কাপড়ের টুকরা, মাজন বা অন্য কোন আধুনিক উপকরণ দ্বারা মিসওয়াক করলে সুন্নত আদায় হবে কিনা এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের সুচিন্তিত মতামত নিম্নে পেশ করা হলো।

১. একদল কট্টরপন্থী আলিমের অভিমত

একদল কট্টরপন্থী আলিমের মতে ব্রাশ বা এ জাতীয় কোন মাজনী দ্বারা মিসওয়াক করলে সুন্নত আদায় হবে না। গাছের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করলে সুন্নত আদায় হবে। তাদের দলীল হলো–

١. عَنْ اَبِى خَيْرَةَ الصَّبَاخَتِيِّ قَالَ كُنْتُ فِى الْوَفْدِ الَّذِيْنَ اَتَوا النَّبِيَّ صلعم فَزَوَّدَنَا الْاَرَاكَ نَسْتَاكُ بِهِ.

٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ اَجْتَنِى لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكًا مِنْ اَرَاكٍ.

২. মুতাআখখিরীন ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন আলিমদের অভিমত

ব্রাশ দ্বারা দাঁত মাজলে সুন্নত আদায় হবে কি না এ সম্পর্কে তাত্ত্বিক কথা হলো এখানে দুটি জিনিস আলাদা আলাদা রয়েছে– ১. মিসওয়াকের সুন্নত ২. মিসওয়াক সুন্নত হওয়ার রহস্য তথা দাঁত পরিস্কার হওয়া। ব্রাশের দ্বারা দাঁত পরিস্কার হওয়ার সুন্নত আদায় হয়। কিন্তু মিসওয়াক ব্যবহার করার সুন্নত আদায় হয় না। কিন্তু যদি বিষয়টি এমন হয় যে, মিসওয়াক পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে কাপড়, মাজন বা আঙ্গুলের দ্বারা যেমন মিসওয়াকের সুন্নত আদায় হয় ঠিক তদ্রুপ ব্রাশ দ্বারাও সুন্নত আদায় হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে গাছের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করা। মুতাআখখিরগণ আলোচ্য মাসআলাটিকে ইমাম দারাকুতনী, বায়হাকী এবং ইবনে আদী হযরত আনাস (রা)-এর মারফু রেওয়ায়েতটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন–

تُجْزِئُ مِنَ الْاَصَابِعِ - بيهقى ج ١ : ٤٠ باب استياك بالاصابع

এ হাদীসে যেমন আঙ্গুল দ্বারা সুন্নত আদায় হওয়া বুঝায় ঠিক তদ্রুপ ব্রাশ দ্বারাও সুন্নত আদায় হওয়া বুঝায়। তবে শর্ত হলো ব্রাশের রেশগুলো পাক হতে হবে। যে সব ব্রাশে শূকরের পশমের রেশ থাকবে সেগুলো ব্যবহার করা হারাম। তবে মাসনুন মিসওয়াক ব্যবহার করার ফযীলত শুধু যয়তুন, পিলু এবং নিমের মিসওয়াক দ্বারাই অর্জিত হয়। মাজন কিংবা ব্রাশ ব্যবহার করলে এ ফযীলত অর্জিত হতে পারে না।

سوال : مَتٰى جَاءَ اَبُو مُوسٰى الْاَشْعَرِيُّ رض اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بَيِّنْ قِصَّةَ مَجِيْئِهِ مِنَ الْيَمَنِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ.

প্রশ্ন ঃ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) কখন রাসূল (স) এর নিকট আসেন। তাঁর ইয়ামান থেকে মদীনায় আগমনের ঘটনা বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ আবু মূসা প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের দাওয়াত লাভের পর হিজরতের পূর্বে তিনি রাসূল (স) এর সান্নিধ্য পাবার আসায় ইয়ামান থেকে আসেন এবং রাসূল (স) এর পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। মক্কার আবদে শামস গোত্রের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

ইয়ামান থেকে মদীনায় আগমনের ঘটনা ঃ হযরত আবু মূসা ছিলেন প্রসিদ্ধ আল-আশয়ার গোত্রের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা। স্বদেশবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তিনি কিছুকাল মক্কায় অবস্থান করে পরে

ইবনেরায় ইয়ামানে ফিরে যান। লোকেরা খুব দ্রুত ব্যাপকভাবে তার দাওয়াতে সাড়া দেয়। প্রায় পঞ্চাশজন মুসলমানদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাসূল (স) এর কাছে যাওয়ার জন্যে ইয়ামান থেকে সুদূর মদীনার উদ্দেশ্যে সমুদ্র পথে রওয়ানা হন। সমুদ্রের প্রতিকূল আবহাওয়া এ দলটিকে হিজাযের হাবশায় ঠেলে নিয়ে যায়। অন্য দিকে হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রা) ও তাঁর সঙ্গী সাথীরাও মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আবু মূসা (রা) তার দলটিসহ এ কাফিলার সাথে মদীনার পথ ধরেন। অবশেষে তারা মদীনায় পৌছিলেন।

سوال : ما اَسْمَاءُ الرَّجُلَيْنِ الَّذَيْنِ كَانَا مَعَ ابى موسى رض؟ وما ذَا طَلَبَا عند رسولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ولِمَا اَنْكَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم -

প্রশ্ন ঃ হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) এর দুজন সঙ্গীর নাম কি? তারা রাসূল (স) এর নিকট কি দাবী করেছিল এবং নবী কারীম (স) কেন সেটা অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ সঙ্গীদ্বয়ের নাম ঃ হযরত আবু মূসা (র) এর দু'জন সঙ্গী ছিলেন আশয়ার গোত্রীয় দ'ব্যক্তি। তবে তাদের নাম সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায় না।

১. মোল্লা আলী কারী (র) গ্রন্থে লিখেছেন। لَمْ اَقِفْ عَلىٰ اِسْمِهِمَا আমি তাদের নাম অবগত হতে পারিনি।

২. নাসায়ীর এক শরাহ গ্রন্থে আছে যে, তারা দু'জন আবু মূসা আশয়ারী চাচাত ভাই ছিল।

৩. কারো কারো মতে তারা ইয়ামান থেকে আগত আশয়ার গোত্রের দু'জন নও মুসলিম ছিল তারা প্রসিদ্ধ কেউ না হওয়ার কারণে তাদের নাম জানা যায়নি।

রাসূলের নিকট যা চেয়েছিল ঃ তারা রাসূলের নিকট রাষ্ট্রীয় পদে চাকুরী দাবী করেছিল।

১. কারো কারো মতে তারা বিচার পদ কামনা করেছিল।

২. কারো কারো মতে তারা বায়তুল মালের অর্থ তথা যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তার পদ দাবী করেছিল।

৩. কারো মতে গভর্নর পদের আকাঙ্খা করেছিল।

রাসূলের অস্বীকৃতির কারণ

১. আল্লামা নববী বলেন তারা যেহেতু স্বয়ং রাসূলের নিকট এ পদ কামনা করেছিল। আর যে প্রার্থনার মাধ্যমে কোন পদে আরোহন করে আল্লাহর পক্ষ হতে তার নিকট কোন সাহায্য আসে না। এই কারণে রাসূল (স) অস্বীকৃতি জানালেন এবং তাদেরকে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত করেননি। এর প্রমাণ আব্দুর রহমান ইবনে সমুরার হাদীস–

قال قال لِىْ رسولُ اللّٰهِ صلى عليه وسلم لاتَسْئَلِ الْاِمَارَةَ ... الخ

২. যারা এমন পদ দাবী করে তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য না আসার কারণে তাদের দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি হয়। এ কারণে পদ দেননি।

৩. কোন পদের আকাংখি হওয়া এবং তার উপর লোভ করা এমন জিনিস যা মান সম্মান কামনা এবং রিপু পুজার উপর প্রমাণ বহন করে যার শেষফল হলো ধ্বংস। তাই অস্বীকৃতি জানান।

৪. তাদেরকে অযোগ্য বুঝে এ দায়িত্ব অর্পন করেননি।

৫. তাদেরকে পদ দিলে রাসূলের উপর লোভী ও প্রার্থী ব্যক্তিকে পদ দেয়ার একটি অপবাদের সুযোগ সৃষ্টি হত তাই তিনি পদ দেননি।

سوال : يُفْهَمُ مِنَ الحديثِ اَنَّهُ لاَيجوزُ طلبُ العملِ ويوسفُ نبيُّ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم طَلَبَ العملَ بِقَوْلِه : اِجْعَلْنِىْ عَلىٰ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَمَا هُوَ التَّوفِيْقُ؟

প্রশ্ন ঃ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় পদ চাওয়া জায়েয নেই অথচ আল্লাহ তাআলার নবী ইউসুফ (আ) পদ চেয়েছিলেন এই বলে যে, اِجْعَلْنِىْ عَلىٰ خَزَائِنِ الْاَرْضِ এ বৈপরীত্যের সমাধান কি?

উত্তর ঃ সামঞ্জস্য বিধান ঃ আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে এ কথা বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্রীয় পদের আবেদন করা জায়েয নেই। কেননা রাসূল (স) স্পষ্ট ভাষায় বলেদিয়েছেন। لَنْ نَسْتَعِيْنَ عَلىٰ الْعَمَلِ مَنْ ارادهُ

অর্থাৎ পদের জন্যে যে দাবী করে তাকে আমরা দায়িত্ব দিই না। অন্য দিকে হযরত ইউসুফ (আ) যখন জেলখানায় ছিলেন তখন তার নিকট স্বপ্নের তাবীর জানতে চাওয়া হয়। তখন তিনি বলেছিলেন, তোমরা আমাকে রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডারের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দাও। কেননা, আমি উত্তম সংরক্ষক ও জ্ঞানী। ফলে উভয় বর্ণনার মধ্যে স্পষ্ট বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এর সমাধান উল্লেখ করা হলো–

১. উলামায়ে কিরামের মতে হযরত ইউসুফ (আ) এর মাযহাব ছিল এক রকম। আর রাসূল (স) এর মাযহাব আরেক রকম। রাসূল (স) এর আগমনের পর আগেকার সকল মত বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

২. এটা ইউসুফ (আ) এর জন্য খাস ছিল। সুতরাং অন্যদের সাথে তার বিষয়টি মিলানো যাবে না।

৩. ইউসুফ (আ) নবী ছিলেন বিধায় তিনি আল্লাহর নির্দেশে তখনকার জন্যে পদের দাবী করেছিলেন।

৪. ইউসুফ (আ) এর বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। সুতরাং দু'মতের মধ্যে কোনরূপ বৈপরীত্য নেই

سوال : مَا اراد بِقَولِه : "ثُمَّ اَرْدَفَه" هَلْ كَانَ محلٌّ وِلايَتِهِمَا واحدًا ومَا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِبَعْثِهِمَا ؟

প্রশ্ন ঃ হাদীসের রাবী ثم اردفه দ্বারা কি উদ্দেশ করেছেন তাদের উভয়ের শাসনঅঞ্চল কি একই ছিল? এবং তাদের পাঠানোর সময় নবী (স) কি বলেছিলেন?

উত্তর ঃ হাদীসের রাবীর উক্তি ثم اردفه দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আবূ মুসা আশয়ারী (রা) কে ইয়ামেনের একাংশের গভর্ণর নিযুক্তির পর হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) কেও ইয়ামেনের অপর অংশের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং আবু মুসা আশআরী (রা) কে আগে প্রেরণ করেন। কিছু দিন পর মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) কেও প্রেরণ করেন।

তাদের উভয়ের শাসনাঞ্চল ঃ প্রাচীনকাল থেকেই ইয়ামেন দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। ১. উত্তর ইয়ামান ২. দক্ষিণ ইয়ামান। রাসূল (স) আবূ মুসা আশয়ারীকে উত্তর ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। আর মুয়াজ ইবনে জাবালকে দক্ষিণ ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। সুতরাং হযরত আবূ মূসা আশয়ারী ও মুয়াজ ইবনে জাবালের শাসনঞ্চল এক ছিল না। বরং একজন ছিল উত্তর ইয়ামানের, অপর জন ছিল দক্ষিণ ইয়ামানের। কেউ কেউ বলেন শাসনাঞ্চল একটাই ছিল। মুয়াযকে তার সহযোগী হিসাবে পাঠানো হয়।

তাদের উদ্দেশ্যে রাসূলের উপদেশ ঃ রাসূল (স) তাদেরকে পাঠানোর সময় তাদের উদ্দেশ্যে এ ভাষণ দেন–

بَشِّرَا وَلا تُعَسِّرَا وَبَشِّرا ولا تُنَفِّرا وتَطَاوَعَا ولاَ تَخْتَلِفَا

অর্থাৎ লোকদের সাথে সহজ ও আসানির মুয়ামেলা করবে, কাঠিন্যতায় নিক্ষেপ করবে না। তাদেরকে সুসংবাদ শুনাবে, আল্লাহ তাআলার আযাবের বেশী ভয় দেখাবে না। যাতে তারা আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ না হয়ে যায় এবং ঐক্যের কাজ করবে, মতানৈক্য করবে না।

سوال : حَقِّق كلمةً : الحقّ . قَلَصَتْ . اَرْدَفَه . مَا اطّلَعَانى . لاَاُوْلَنْ . مَرْضَاةٌ . مُطْهِرَةٌ

প্রশ্ন ঃ শব্দ বিশ্লেষণ কর ঃ مَطْهَرَةٌ . مَرْضَاةٌ . لا اَوْلَنْ . مَا اطّلَعَانِى . اَرْدَفَه . قَلَصَتْ . الحَقّ এবং

উত্তর ঃ শব্দ বিশ্লেষণ ঃ الحق শব্দটি একবচন বহুবচন হলো حُقُوقٌ মাদ্দা ق . ق . ح জিনসে مضاعف এটা حَقَّ الامرُ اذا ثَبَتَ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে ঃ

১. الصدق সত্য। যেমন اِنَّ الوَاقِعَةَ حَقٌّ ২. النصب অংশ। যেমন হাদীস اَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ ৩. অধিকার। যেমন هُوَ حَقُّه هذا ৪. এটা আল্লাহ তা'আলার নাম।

قَلَصَتْ ঃ সীগা واحدمؤنث غائب বহস ماضى معروف বাবে ضرب, মাসদার قلوص, জিনসে সহীহ অর্থ হচ্ছে اِنْضَمَّتْ তথা লাগিয়েছে ও মিশিয়েছে।

اَرْدَفَهُ : اَرْدَفَ সীগা واحد مذكر غائب বহস ماضى معروف বাব افعال মাসদার, اِرْدَاف, মাদ্দা ردف এর অর্থ হচ্ছে পেছনে প্রেরণ করলেন। আর "ه" সর্বনামটি ابو موسى الاشعرى এর প্রতি ফিরেছে শব্দটির প্রয়োগ কুরআনে আছে। যেমন- اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰۤئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ

مَا اطَّلَعَانِىْ : এটা تثنيه مذكر غائب এর সীগা, বহস ماضى معروف মাসদার اطلاع জিনসে সহীহ, অর্থ- আমাকে জানানো হয়নি ; এখানে نون وقاية টি نون আর يا টি মুতাকাল্লিমের যমীর।

لَاْاَوْلَنْ : হাদীসে বর্ণিত لَاْاَوْلَنْ শব্দটি মূলত: (شك راوى) বর্ণনাকারীর সন্দেহ অর্থাৎ রাসূলের (স) বক্তব্যটা لَانَسْتَعِيْنُ ছিল নাকি لَنْ نَسْتَعِيْنَ ছিল এ ব্যাপারে রাবীর সংশয় থাকায় لَا এবং لَنْ এর মধ্যস্থলে একটি او হরফে আতফ ব্যবহার করেছেন। এ ধরণের ব্যবহার হাদীসে বহুল প্রচলিত।

مَطْهَرَةٌ : শব্দটির ميم বর্ণে كسرة ও فتحة উভয় রকম পড়া যায় তবে كسره পড়াটাই অধিক প্রসিদ্ধ, অর্থ হলো পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হাসিলের উপকরণ অর্থাৎ মিসওয়াক যা মুখকে পবিত্র ও পরিষ্কার করার যন্ত্র স্বরূপ। যাইনুল আরব বলেন, ميم বর্ণে فتحة এর সাথে এটা মাসদার اسم فاعل এর অর্থে। অর্থ হলো مطهرة للفم মুখ পবিত্রকারী, অনুরূপভাবে مرضاة শব্দটির ও ميم বর্ণে فتحة হবে। এটা মাসদার, اسم فاعل এর অর্থে, مَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ তথা মিসওয়াক আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্টকারী তথা তার ব্যবহার আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে।

سوال : وَالَّذِى بَعَثَكَ نَبِيًّا بِالْحَقِّ مَا اطَّلَعَانِى عَلٰى مَا فِى اَنْفُسِهِمَا. مَنِ الْقَائِلُ لِهٰذَا الْقَوْلِ؟ وَلِمَ قَالَ ذالك ـ ثم اَوْضِحْ معنى " قَلَصَتْ"

প্রশ্ন ঃ وَالَّذِى بَعَثَكَ نَبِيًّا بِالْحَقِّ مَا اطَّلَعَانِى عَلٰى مَا فِى اَنْفُسِهِمَا **উক্তিটি কে করেছেন? এরূপ উক্তির কারণ কি? অতঃপর** قلصت **শব্দটির ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর ঃ উক্তিকারীর উদ্ধৃত উক্তি- وَالَّذِى بَعَثَكَ نَبِيًّا بِالْحَقِّ مَا اطَّلَعَانِى عَلٰى مَا فِى اَنْفُسِهِمَا

অর্থাৎ সে সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন। ঐ দুই ব্যক্তি তাদের মনে যে পরিকল্পনা ছিল তা কখনো আমাকে অবহিত করেনি। এ কথাটি অত্র হাদীসের রাবী হলেন হযরত আবু মূসা আশয়ারী (র)।

এরূপ উক্তি করার কারণ ঃ ইসলামী শরীয়তে কোন ব্যক্তির নিজেকে কোন পদের জন্য যোগ্য হিসেবে নির্বাচন করা জায়েয নয়। অর্থাৎ পদের প্রতি লোভ থাকা সমীচীন নয়। এতদসত্ত্বেও হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) এর সঙ্গীদ্বয় যখন রাসূল (স) এর নিকট রাষ্ট্রীয় পদ প্রার্থনা করেছিলেন তখন হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) লজ্জিত হয়ে একথা বলেছিলেন। কারো কারো মতে উল্লিখিত দু'ব্যক্তির মনে গোপন পরিকল্পনার ব্যাপারে হযরত আবু মূসা আশয়ারী যে, পূর্বে জানতেন না এ বিষয়টা স্পষ্ট করার এবং রাসূলের সম্ভাব্য আপত্তির কৈফিয়ত হিসেবে একথা বলেছিলেন।

قَلَصَتْ শব্দের ব্যাখ্যা ঃ قَلَصَتْ শব্দটি باب ضرب এর قلوصٌ মাসদার থেকে গৃহীত। অর্থ লাগিয়েছে বা মিশিয়েছে অর্থাৎ হুজুর (স) যখন মিসওয়াক করছিলেন তখন রাবী আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) এর মিসওয়াকের বর্ণনা দিতে গিয়ে উক্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (স) মিসওয়াক করার সময় তাঁর দুই ঠোঁটের মাঝে কোন ফাঁক ছিল না। তাঁর দাঁত দেখা যায়নি। তিনি মিসওয়াক করার সময় তাঁর দুই ঠোঁটকে মিলিত অবস্থায় রেখেছিলেন। আর এটাই মিসওয়াকের জন্য উত্তম নীতি যে, মিসওয়াকের সময় মুখ খোলা থাকবে না। বরং ঠোঁট মিলানো অবস্থায় থাকবে। এটাই সুন্নত পদ্ধতি।

الإكثَارُ فِى السِّوَاكِ

٦. أَخبَرَنَا حُمَيدُ بنُ مَسعَدَةَ وعِمرانُ بنُ موسٰى قالا حدّثنا عبدُ الوارثِ قال حدّثنا شعيبُ ابنُ الحَبحابِ عن انسِ بنِ مالكٍ قال قالَ رَسولُ اللّٰه ﷺ قَدْ اَكثَرتُ عَلَيكُم فِى السِّوَاكِ -

الرُّخصَةُ فِى السِّوَاكِ بِالعَشِيِّ لِلصَّائِم

٧. اخبرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعيدٍ عن مالكٍ عن اَبِى الزِّنَادِ عن الاَعرَجِ عن ابى هُرَيرَةَ رضى اللّٰه تعالىٰ عنه انّ رسولَ اللّٰهِ ﷺ قال لَولاَ اَنْ اَشُقَّ علٰى اُمَّتِى لَاَمَرتُهم بالسِّوَاكِ عِندَ كلِّ صلوةٍ -

السِّوَاكُ فِى كُلِّ حِينٍ

٨. اخبرنا علىُّ بنُ خَشرَمٍ قال حدّثنا عيسٰى وهو ابنُ يونسَ عن مِسعَرٍ عن المِقدام وهو ابنُ شُرَيحٍ عن ابيهِ قال قلتُ لِعائشةَ بايِّ شئٍ كان يَبدَأُ النبيُّ ﷺ اذا دَخَلَ بَيتَهٗ قالتْ بِالسِّواك -

---

বারবার মিসওয়াক করা

অনুবাদ ঃ ৬. হুমায়দ ইবনে মাসআদাহ ও ইমরান ইবনে মূসা (র)...... আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি মিসওয়াক করার ব্যাপারে তোমাদেরকে বারবার উৎসাহিত করেছি।

রোযাদারের জন্য অপরাহ্নে মিসওয়াক করার অনুমতি

৭. কুতায়বা ইবনে সা'ঈদ (র)....আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম তবে তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

৮. আলী ইবনে খাশরাম (র).... শুরায়াহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকটে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (স) ঘরে প্রবেশ করার পর প্রথমে কি করতেন? তিনি বলেন, মিসওয়াক করতেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

মিসওয়াক ও আধুনিক বিজ্ঞান ঃ মহামূল্যবান হীরার টুকরোকে ফেলে দিয়ে সামান্য এক টুকরো কাঁচ খণ্ড গ্রহণ করা যেমনিভাবে বুদ্ধিহীনতা ও বোকামীর কাজ ঠিক তেমনি মিসওয়াকের আমলটিকে পরিত্যাগ করাও অজ্ঞতার পরিচায়ক। মিসওয়াক সম্পর্কে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার পাণ্ডিত্যসুলভ উক্তি এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, যে দিন থেকে আমরা মিসওয়াক ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছি সেদিন থেকেই "ডেন্টাল সার্জন" এর সূত্রপাত হয়েছে।

سوال : اُكتُبْ مُنَاسَبَةَ الحديثِ بِتَرجَمَةِ البَابِ .

প্রশ্ন ঃ এ অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে হাদীসের যোগসূত্র কি লেখ।

উত্তর ঃ হুজুর (স) বলেছেন "অবশ্যই আমি প্রত্যেক নামাযের সাথে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম"এর দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রত্যেক নামাযের সময়ে মিসওয়াক করা জায়েয। সতুরাং এতে সন্ধ্যার সময়টাও অন্তর্ভূক্ত হবে। কারণ তা মাগরিবের নামাযের সময়। অতএব বুঝা গেল যে, সন্ধ্যার সময় মিসওয়াক করা জায়েয চাই সে রোযাদার হোক বা না হোক, এতে সন্ধার সময় রোযাদারদের জন্য মিসওয়াক করার অনুমতি প্রমাণিত হলো। আর এটাই হচ্ছে শিরোনাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) এরশাদ করেন, যদি এ আশংকা না থাকত যে, আমার উম্মতের জন্য প্রত্যক নামাযের সময় মিসওয়াক করা কষ্টদায়ক হয়ে পড়বে তাহলে প্রত্যেক নামাযের সময় তাদেরকে মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম ।

سوال : كَمْ قَوْلاً فِى حُكْمِ السِّوَاكِ وما هِىَ وما هُوَ الراجِحُ عِندك ـ

প্রশ্ন ঃ মিসওয়াকের হুকুমের ব্যাপারে কতটি মতামত পাওয়া যায় এবং সেগুলোর মধ্যে তোমার নিকট অগ্রগণ্য মত কোনটি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ কারো কারো বর্ণনানুসারে ইমাম ইসহাক, দাউদ যাহেরী প্রমুখের মতে মিসওয়াক করা ওয়াজিব। তাদের দলীল হলো রাফে ইবনে খাদিজের বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন প্রত্যেক মুসলমানের উপর মিসওয়াক করা এবং জুমআর দিন গোসল করা ওয়াজিব। জুমহুর আয়েম্মাদের মাযহাব হলো মিসওয়াক করা সুন্নত। তাদের দলীল হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, হুজুর (স) বলেছেন, আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর আশংকা না করতাম তবে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময়ে মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম।

প্রথম পক্ষের দলীলের উত্তরে ইবনে হাজার (র) বলেন, এ হাদীসের সনদ একেবারেই দুর্বল। ইমাম নববী (র) বলেন, ইসহাক এবং দাউদে জাহেরীর প্রসিদ্ধ মত হলো মিসওয়াক করা সুন্নত। এটাই অধিকতর শুদ্ধ। আবার উলামাদের মধ্যে এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে যে, মিসওয়াক করা নামাযের সুন্নত নাকি ওযুর সুন্নত? ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

سوال : السواكُ سنةُ الصّلٰوة ام سنةُ الوُضوءِ ومَا الاختلافُ فِيه بَيْنَ الائمّةِ؟ بَيِّنْ معَ الْاَدِلَّةِ ثم اذكُرْ ثَمْرَةَ الْاِختلافِ فِى هٰذه المَسْئلةِ -

প্রশ্ন ঃ মিসওয়াক করা কি অযুর সুন্নত নাকি নামাযের সুন্নত? এ ব্যাপারে মতানৈক্য কি দলীল সহকারে বর্ণনা কর এবং মাসআলায় ফলাফল উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ মিসওয়াক করা অযুর সুন্নত না কি নামাযের? মিসওয়াক করা কি অযুর সুন্নত নাকি নামাযের সুন্নত এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, মিসওয়াক নামাযের সুন্নত, এটা নামাযে দাঁড়ানোর পূর্বক্ষণে করতে হবে।

২. হানাফীগণ বলেন, মিসওয়াক করা অযুর সুন্নত নামাযের সুন্নত নয়। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ পিছনে আলোচনা করা হয়েছে।

মতানৈক্যের ফলাফল ঃ মতনৈক্যের ফলাফল এ দাঁড়াবে যে, যদি কোন ব্যক্তি উযূ এবং মিসওয়াক করে এক নামায আদায় করে এই উযূ দ্বারা অন্য নামায পড়তে চায় তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে নতুনভাবে মিসওয়াক করা মাসনূন হবে। আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে যেহেতু এটি উযূর সুন্নত, এ জন্য দ্বিতীয়বার মিসওয়াক করার প্রয়োজন হবে না।

سوال : هل يجوزُ السِّواك بالعَشِيِّ للصَّائِمِ؟

প্রশ্ন ঃ রোযাদারের জন্যে বিকেলে মিসওয়াক করা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ রোযার দিন বিকেলে রোযাদারের জন্যে মিসওয়াক করা জায়েয কি না এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও আবু ইউসুফ (র) এর অভিমত ঃ ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও আবু ইউসুফ এর মতে রোযাদারের জন্যে বিকেলে মিসওয়াক করা মাকরূহ।

২. ইমাম আবু হানীফা ও মালেক এর অভিমত ঃ ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র) এর মতে রোযাদারের জন্যে বিকেলে মিসওয়াক করা জায়েয। এতে কোন অসুবিধা নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল ঃ তাঁদের দলীল হলো রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট প্রিয়। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- ولَخلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطيبُ عِندَ اللّٰه مِن ريحِ المِسْكِ

আর দ্বিপ্রহরের পর পাকস্থলী খালী থাকে। সুতরাং তখন মিসওয়াক করলে দুর্গন্ধ চলে যায়। কাজেই এ সময় মিসওয়াক করা মাকরূহ।

হানাফীদের দলীল ঃ হানাফীদের দলীল হলো নিম্নোক্ত হাদীসগুলো–

١. عن عبد الله (رض) قال رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَالا أُحْصِى يَسْتَاكُ وهُو صائِمٌ

٢. عن عامِرِ بنِ رِبيعةَ (رض) قال لقَد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ فِى النّهارِ وهو صَائِمٌ.

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও আবু ইউসুফ (র) এর দলীলের উত্তরে বলা যায়, রোযাদারের মুখের ময়লা থেকে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় তা আল্লাহর নিকট প্রিয় নয়। বরং পাকস্থলী থেকে যে গন্ধ বের হয় তা প্রিয়।

سوال : اكتُب نبذًا مِّن حياةِ أنَسِ بْنِ مالِكٍ بِالْاِخْتِصار.

প্রশ্ন ঃ সংক্ষিপ্তভাবে হযরত আনাস (রা) এর জীবনী আলোচনা কর।

উত্তর ঃ হযরত আনাস (রা) এর জীবনী ঃ

নাম ও পরিচিতি ঃ তার নাম আনাস, উপনাম আবু হামজা, পিতার নাম মালেক ইবনে নযর, মাতার নাম উম্মে সুলাইম ইবনেতে মিলহান। তিনি খাযরাজ বংশোদ্ভূত লোক ছিলেন।

প্রিয় নবী (স) এর সেবায়ঃ একবার আনাস (রা) কে নিয়ে তাঁর আম্মা রাসূল (স) এর দরবারে হাজির হয়ে আনাস (রা) কে রাসূল (র) এর খেদমতের জন্য পেশ করেন এবং তাঁকে দোয়ার আবেদন করেন। তিনি তার জন্য হায়াত, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির দোয়া করেন। আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন। আল্লাহর নবী তার জন্য দোয়া করেছিলেন– اَللّٰهمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَهُ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তার সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করে দাও এবং তাকে যা দান করবে তাতে বরকত দিও। হযরত আনাস (রা) ছিলেন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও সহনশীল ব্যক্তিত্ব। হযরত আনাস (রা) রাসূল (স) এর খেদমতে এক টানা ১০ বছর কাটান। এ দীর্ঘ সময়ের সংস্পর্শে রাসূল (স) এর আচরণের একটি বর্ণনা তিনি এভাবে দিয়েছেন–

خدمتُ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم عشْرَ سِنِينَ فما قال لِى اُفّ ولا لِمَا صَنَعْتَ ولاَ الاَّ صَنَعْتَ

"আমি দশ বছর নবী করীম (স) এর খেদমতে ছিলাম। এ সময়ে তিনি আমাকে কষ্টদায়ক কোন কথা বলেননি এবং একথাও বলেননি যে, তুমি এ কাজ কেন করেছ? কিংবা ঐ কাজ কেন করনি?"

হাদীস বর্ণনা ঃ হযরত আনাস (রা) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তার বর্ণিত হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা ২২৮৬টি। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) সম্মিলিতভাবে ১৬৮ টি বর্ননা করেছেন। ইমাম বুখারী এককভাবে ৮৩ টি এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে ৯১ টি স্ব-স্ব কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সারা জীবন হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। বসরার মসজিদে তার দরসে হাদীস হলোত অব্যহত গতিতে।

ইসলামী আঈন শিক্ষাদান ঃ রাসূল (স) এর সান্নিধ্য থেকে হযরত আনাস (রা) এর রাসূল (স) এর অনেক কথা শোনার এবং জানার সুযোগ হয়েছে। ফলে তিনি ইলমে ফিকহের অসীম জ্ঞানার্জন করেন। এর ভিত্তিতেই হযরত ওমর (রা) এর খিলাফতের সময় তাকে বসরা নগরীতে ইলমে ফিকহ শিক্ষাদানের জন্য পাঠানো হয়।

গভর্ণর ও শিক্ষকরূপে ঃ তিনি হযরত আবু বকর (রা) এর খেলাফতকালে বসরার গভর্ণর ও শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ওফাত ঃ তিনি ১০৩ বছর বয়স লাভ করেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এর শাসনামলে ৯১ হিজরীতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনি সর্বশেষে বসরা নগরীতে ইনতেকাল করেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র) তাকে গোসল দেন এবং বসরা থেকে এক ক্রোশ দূরে স্বীয় বাসস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য:ইসাবা ১/৭১–৭২; উসদুল গাব্বা . ১/ ২৯৪ ইত্যাদি।)

قوله قالتُ بالسِّواكِ الخ ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন, মিসওয়াক শুধুমাত্র নামায ও অযুর সাথে খাস নয় বরং সর্বসময় মিসওয়াক করা যায়। কারণ রাসূল (স) সর্বসময় মিসওয়াক করতেন। বাহির থেকে ঘরে আসলে

মিসওয়াক করতেন। বেশী কথাবার্তা বলার পর মিসওয়াক করতেন। নফল নামাযের শুরুতে মিসওয়াক করতেন। স্ত্রীদের নিকট যাওয়ার পূর্বে মিসওয়াক করতেন। কাজেই সর্ব সময় মিসওয়াক করা চাই।

মিসওয়াক সম্পর্কিত হাদীস ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

অনেক বিজ্ঞানীগণ গাছের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন। জনৈক বিজ্ঞানী একটি নিমের ডাল পরীক্ষা করে দেখেন নিমের ডালের মধ্যে এমন পদার্থ রয়েছে যা মুখ ও দাঁতের জীবাণু নষ্ট করে এবং দাঁতের মাড়িকে শক্ত করে, মিসওয়াক ব্যবহার করলে চোখের জ্যোতি নষ্ট হয় না, এর দ্বারা স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং চিন্তার মধ্যে স্বচ্ছতা আসে। অথচ এ বিষয়গুলো আমাদের নবী (স) ১৪০০ বছর পূর্বে বলে গেছেন যা এখন তারা বুঝতে পারছেন।

১. নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করতে বলার হিকমত হলো, মিসওয়াক না করলে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে খাদ্যকণা আটকে থাকে যার দ্বারা নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ দ্বারা অন্য নামাযী কষ্ট পায়।

২. সুইজারল্যান্ডের এক ডাক্তারের মাড়িতে কঠিন রোগের সৃষ্টি হয়, যার চিকিৎসা তদানিন্তন ডাক্তারের নিকট ছিল দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তিনি মিসওয়াক করতে শুরু করলে সে রোগ থেকে মুক্তি পান।

৩. হেকিম এস, এম, ইকবাল "জাহান" নামক পত্রিকায় লিখেন যে, এক ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লিতে অনেক পূঁজ জমা হয়। অনেকবার চিকিৎসা ও অপারেশনের পরেও কোন ফল হয় না, পরে ডাক্তার তাকে পীলু বৃক্ষের মিসওয়াক ব্যবহার করতে বলেন এতে সে আরোগ্য পায় কারণ রোগটি ছিল তার দাঁতে।

৪. এক দন্ত চিকিৎসক বলেন ১০ হাজার দিরহাম খরচ করেও এক ব্যক্তি দাঁতের রোগ থেকে মুক্তি না পেয়ে আমার কাছে আসলে তাকে পীলু বৃক্ষের মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করতে বলি তার দ্বারা সে আরোগ্য পায়।

৬. জনৈক চিকিৎসক বলেন, এক টাকার পীলু বৃক্ষের মিসওয়াক হাজার টাকার ঔষধের চেয়ে অধিক ফলপ্রসু।

৭. ঘাড় ব্যথা, গলায় ব্যাথা ও জ্বালা-পোড়া, গলার স্বর হ্রাস পাওয়া, মস্তিষ্ক ও স্মরণ শক্তি হ্রাস পাওয়া, মাথা ঘুরানো ইত্যাদি রোগে মানুষ আক্রান্ত হয় "থাইরাইড গ্রেড" এর কারণে। আর এর প্রতিষেধক হলো মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজা ও মিসওয়াক পানিতে ফুটিয়ে তাদ্বারা কুলি করা। জেনারেল ফিজিশিয়ান বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভিমত।

৮. কাঁচা মিসওয়াক দ্বারা দাঁত মাজলে গালের ঘা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৯. মিসওয়াক দাঁতের হরিদ্রতা দূর করে।

১০. মিসওয়াক মুখের ভিতরকার জীবাণু ধ্বংস করে দেয়।

১১. মিসওয়াকের মধ্যে ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম জাতীয় পদার্থ থাকে, যা দাঁতের প্রধান খাদ্য থাকে তাই মিসওয়াক পাইওরিয়ার ন্যায় মারাত্মক রোগ ব্যাধির মহৌষধ।

১৩. অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধময় পুঁজযুক্ত দাঁত মস্তিষ্ক রোগের প্রধান কারণ। আর মিসওয়াকের দ্বারাই এর থেকে আরোগ্য পাওয়া যায়।

১৪. যাদের কানে ফোলা, পুঁজ, রক্তিমতা ব্যাথা আছে পরীক্ষা করে দেখা গেছে মিসওয়াকই তার আরোগ্য দিতে পারে।

১৫. চক্ষুরোগ, দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ও অন্ধত্বের মহা ঔষধ হলো মিসওয়াক।

১৬. বর্তমান বিশ্বে পাকস্থলীর রোগ এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এর মহৌষধ হলো মিসওয়াক।

১৭. স্থায়ী সর্দি কাশির রুগীর শ্লেষ্মা যদি জমাট বেঁধে থাকে, সেক্ষেত্রে মিসওয়াক ব্যবহার করলে শ্লেষ্মা ভিতর থেকে বের হয়ে মস্তিষ্ক হালকা হয়ে যায়। (ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ এর গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপে এখানে কিছু কথা উল্লেখ করা হলো। পৃষ্ঠা নং ৩৩-৪৩)

ذِكْرُ الْفِطْرَةِ الْاِخْتِتَانُ

٩. اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عليه وانا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وهبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب عنْ ابى هريرةَ رضى الله عنه عن رسولِ اللّٰه ﷺ قال الفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْاِخْتِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وقَصُّ الشَّارِب وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ -

تَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ

١٠. اَخْبَرَنَا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قال حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قال سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيرةَ رضى اللّٰهُ عنه قالَ قالَ رسولُ اللّٰه ﷺ خمسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وتَقْلِيْمُ الْاَظْفارِ وَالْاِسْتِحْدادُ والْخِتَانُ -

---

ফিতরাত প্রসঙ্গ ঃ খাতনা

অনুবাদ ঃ ৯. হারিস ইবনে মিসকীন (র)......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, পাঁচটি বিষয় মানুষের ফিতরাতের অন্তর্গত। খাতনা করা, নাভীর নিম্ন ভাগের লোম চেঁছে ফেলা, গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা।

নখ কাটা

১০. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র).........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পাঁচটি বিষয় মানুষের ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। গোঁফ ছাঁটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা, নাভীর নিম্নাংশের লোম চেঁছে ফেলা এবং খাতনা করা।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : ما معنى الْفِطْرَةِ وَمَا وَجْهُ تَسْمِيَتِهَا وَمَا الْمُرَادُ بِها هٰهُنَا ولَمْ عُدَّتْ هٰذه الخِصَالُ مِنَ الفِطْرَةِ؟

প্রশ্ন ঃ ফিতরতের অর্থ কি এবং তার নামকরণের কারণ কি? হাদীসে তার দ্বারা উদ্দেশ্য কি এবং এই অভ্যাসগুলোকে ফিতরতের মধ্যে কেন গণ্য করা হয়?

উত্তর ঃ فِطْرَةٌ এর আভিধানিক অর্থ ঃ فِطرة শব্দটি فِعْلَةٌ এর ওযনে ইসমে মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে স্বভাব প্রকৃতি। যেমন, هٰذا هُوَ فِطْرَتُه সৃজন। যেমন কুরআনের বাণী- فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

দ্বীন/জীবন ব্যবস্থা। যেমন- كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلٰى اَلْفِطْرَةِ

فطرة এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন-

هِىَ عِبَارَةٌ عَنْ جِبِلَّةٍ مُهَيَّئَةٍ لِقَبُولِ الْاِسْلام

অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করার যোগ্যতাকে ফিতরাত বলা হয়। ইমাম নববী বলেন, ফিতরত দ্বারা সুন্নত উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন- الفِطْرةُ هِىَ العَقْلُ السَّلِيْمُ والفَهْمُ الْمُسْتَقِيْمُ

অর্থাৎ শুভবুদ্ধি ও সঠিক বুঝকে ফিতরত বলা হয়।

নামকরণের কারণ ঃ যেহেতু এটা মানুষের স্বভাবজাত স্বকীয় প্রবণতা যা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সৃষ্টিগতভাবে বিদ্যমান। এবং এটা এমন আভ্যন্তরীণ যোগ্যতা যার দ্বারা সে ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। যেহেতু

এগুলো মানুষের স্বভাব জাত বিষয়। আর ফিতরতের অর্থও স্বভাব। এ কারণে এগুলোকে فطرة বলে নামকরণ করা হয়েছে।

আলোচ্য হাদীসে ফিতরত দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ এ হাদীসে ফিতরত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল প্রাচীন সুন্নত যেগুলোকে আম্বিয়ায়ে কিরাম গ্রহণ করেছেন এবং পূর্ববর্তী সকল শরীয়তে এ বিষয়গুলো ছিল। ইমাম নববী (র) বলেন ফিতরত দ্বারা এখানে সুন্নত উদ্দেশ্য।

এগুলোকে ফিতরতের মধ্যে শামিল করার কারণ ঃ এই স্বভাব তথা خصلت গুলোকে فطرة এর মধ্যে গণ্য করার কারণ হলো এগুলো করার দ্বারা মানুষ ঐ সমস্ত স্বভাবে গুনান্বিত হয় যেগুলোর উপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অথবা এ কারণে যে, এগুলো মানুষের স্বভাবগত বা প্রকৃতিগত বিষয়ের মত।

سوال : فى حديثٍ أخر عَشَرٌ مِنَ الفِطْرَة وفِى هٰذا الحديثِ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ فَمَا التَّوْفِيْقُ؟

প্রশ্ন ঃ এ হাদীসে ৫টি ফিতরতের কথা বলা হয়েছে। আর অপর হাদীসে ১০টি ফিতরতের কথা উল্লেখ আছে। হাদীসের বর্ণনার মধ্যে মত পার্থক্যের সমাধান কি?

উত্তর ঃ হযরত আবু হুরায়রার হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ফিতরত মোট ৫টি। আর আয়েশা (রা) এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ফিতরত মোট ১০টি। কাজেই উভয় হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্ব দেখা যাচ্ছে। এ বৈপরীত্যের সমাধান হলো–

১. عدد قليل কখনো عدد كثير এর منافى নয়। কেননা দশের মধ্যে পাঁচও শামিল রয়েছে।

২. অথবা বলা যায় যে, প্রথমে পাঁচটির ওহী এসেছে, অতঃপর দশটির ওহী এসেছে। কাজেই কোন বৈপরীত্ব থাকলো না।

৩. পাঁচ ও দশ দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় বরং আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য।

৪. আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীস আয়েশা (রা) এর হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। কারণ-

لِاَنَّ الْمُثْبِتَ اَوْلٰى مِنَ النَّافِى

৫. অথবা বলা যায় ফিতরতের সংখ্যা অনেক। উপস্থিত লোকদের মধ্যে যে গুলোর অভাব আছে আল্লাহর রাসূল তা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেন। তাই কখনো পাঁচটি বলেছেন, আবার কখনো ১০টি বলেছেন।

سوال : ما حكمُ أُمُورِ الفِطْرَةِ بيِّنْ .

প্রশ্ন ঃ স্বভাবজাত বিষয়গুলোর বিধান কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ স্বভাবজাত বিষয়গুলোর বিধান ঃ

১. ইমাম নববী বলেন অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে এগুলো ওয়াজিব নয়। বরং কোনটি সুন্নত কোনটি ওয়াজিব এবং কোন কোনটি ওয়াজিব ও সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন খাতনা করা।

২. ইমাম আরাবী শরহে মুয়াত্তায় বলেন, আমার মতে আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি স্বভাবজাত বিষয় ওয়াজিব। কারণ এগুলো অবলম্বন না করলে মানুষের সুরতই অবশিষ্ট থাকে না।

৩. আল্লামা আবু আ'লা বলেন, যে সব জিনিস দ্বারা উদ্দেশ্য পরিছন্নতা ও রূপ সংশোধন সেখানে ওয়াজিব সূচক নির্দেশের প্রয়োজন নেই বরং শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে এ দিকে মনযোগ আকর্ষণই যথেষ্ট।

سوال: حَرِّرْ حكمَ الْخِتَانِ قَبْلَ البلُوغِ وبَعْدَهُ مَعَ بَيانِ إِخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ .

প্রশ্ন ঃ বালেগ হওয়ার পূর্বে ও পরে খাতনা করার বিধান কি? ইমামদের ইখতেলাফ সহকারে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ খাতনা করার বিধান নিয়ে ইমামদের মতামত ঃ

১. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, খাতনা করা ওয়াজিব।

২. উলামাদের কারো কারো মতে খাতনা করা ফরয।

৩. আহনাফের মতে খাতনা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ

ইমাম শাফেয়ী (র) এর প্রথম দলীল ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) এর প্রথম দলীল হলো ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হাদীস– قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ لَمْ يَخْتَتِنْ لَاتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلَا أُضْحِيَّتُهُ.

অর্থাৎ যার খাতনা করা হয়নি তার সাক্ষ্য ও তার নামায গ্রহণযোগ্য নয় এবং তার জবাইও কবুল হবে না। এ হাদীস দ্বারা খাতনার বিধান ও গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দ্বিতীয় দলীল ঃ

١. لِأَنَّهُ شِعَارُ الدِّينِ .

এটা ইসলামের প্রতীকের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই এটা ওয়াজিব হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

٢. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.

এ আয়াত দ্বারাও এর গুরুত্ব বুঝে আসে। কাজেই এটা ওয়াজিব হবে।

কতক ফকীহ এর দলীল ঃ একদল উলামার মতে খাতনা করা ফরয। তাদের ভাষায়–

الْخِتَانُ فَرضٌ لِأَنَّهُ شِعَارُ الدِّينِ لِكَلِمَةٍ وَبِهِ يُمَيَّزُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ .

ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র) এর দলীল ঃ ১

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ .

মোঁচ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখকাটা নাভির নিচের পশম মুণ্ডান এবং খাতনা করা এগুলো ফিতরাতের অন্তর্ভূক্ত। আর এখানে ফিতরাত দ্বারা সুন্নত উদ্দেশ্য। সুতরাং এটা সুন্নত হবে।

দ্বিতীয় দলীল ঃ রাসূলের হাদীস–

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

খাতনা করা পুরুষের জন্য সুন্নত ও মহিলাদের জন্য সম্মানস্বরূপ। এর দ্বারা বুঝা যায় খাতনা করা সুন্নত।

প্রথম দলীলের জবাব ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর হাদীস দ্বারা কঠোরতা প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য অথবা এ কথা তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা এটাকে অবজ্ঞা করে। অথবা এটা বলা যেতে পারে যে, এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) এর উপর মওকুফ। পক্ষান্তরে আহনাফের পেশকৃত হাদীসটি হলো মারফু। তাই এটা প্রাধান্য পাবে।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব ঃ ইসলামের شعار হওয়াই ওয়াজিবের কারণ হতে পারে না। বরং সুন্নত ও কখনো شعار হয়। যেমন– পাগড়ী।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এ নির্দেশ বালেগ হওয়ার পূর্বেপ্রযোজ্য। কাজেই প্রাপ্তবয়স্ক হলে আর খাতনা করা জায়েয নেই। কারণ এর জন্যে লজ্জাস্থান খুলতে হবে যা ইসলামে হারাম। তবে তার স্ত্রী বা দাসী দ্বারা করালে ভিন্ন কথা। অতএব প্রাপ্ত বয়স্ক কোন লোক ইসলাম কবুল করলে আবু হানীফা (র) এর মতে তার খাতনা করা জরুরী নয়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে তার খাতনা করা ওয়াজিব।

سوال : ما الحكمة فى مشروعية الاختتان؟

প্রশ্ন ঃ খাতনার বিধানে শরয়ী হিকমত কি?

উত্তর ঃ খাতনা করার শরয়ী হিকমত ঃ ইসলামের যে কোন বিধান প্রবর্তনের পেছনে কোন না কোন রহস্য ও উপকারিতা নিহিত থাকে। এ হিসাবে খাতনার মধ্যেও বিশেষ উপকারিতা ও রহস্য নিহিত রয়েছে। যেমন–

১. খাতনা করলে স্বামী স্ত্রী মিলনের মধ্যে স্বাদ বেশী পাওয়া যায়।

২. সম্ভোগের সময় কষ্ট হয় না।

৩. খাতনা করা না হলে চামড়ার ভেতরে প্রস্রাব বা বীর্য থেকে যাওয়ার আশংকা থাকে।

৪. খাতনা না করলে বিভিন্ন ধুলা-বালি, ময়লা জমে লিঙ্গের চামড়ায় রোগ হতে পারে।

৫. চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে খাতনাকারীর চেয়ে খাতনা না করা ব্যক্তির যৌন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

৬. খাতনা নবীদের একটি ফিতরত।

৭. যাদের খাতনা করা হয় তারা লজ্জাস্থানের ক্যান্সার থেকে নিরাপদ থাকে।

৮. যদি খাতনা না করা হয় তাহলে প্রস্রাবে বাধা ও মূত্রথলীতে পাথরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৯. খাতনা না করলে সিফিলিস, গনোরিয়া এবং মারাত্মক এলার্জি রোগে আক্রমণ করে।

سوال : ما هو ترتيبُ الْأَصَابِعِ فِيْ تَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ؟

প্রশ্ন ঃ নখ কাটার ধারাবাহিকতা বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ নখ কাটার ধারাবাহিকতা

নখ কাটার কোন ধারাবাহিকতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। কাজেই যে কোনভাবে কাটলেই সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। তবে কেউ কেউ এভাবে কাটাকে উত্তম বলে থাকেন। প্রথমে ডান হাতের আঙ্গুল কাটতে হবে। ডান হাতের আঙ্গুলের নখসমূহ আবার নিম্নে বর্ণিত ক্রম অনুযায়ী কাটতে হবে। ১. অনামিকা আঙ্গুলের নখ ২. মধ্যমা আঙ্গুলের নখ ৩. তর্জনী আঙ্গুলের নখ ৪. বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ ৫. কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ। এরপর বাম হাতের আঙ্গুলের নখ কাটতে হবে। বাম হাতের আঙ্গুলের নখসমূহ আবার কাটতে হবে নিম্নে বর্ণিত ক্রম অনুযায়ী ১. কনিষ্ঠাঙ্গুলের নখ ২. অনামিকা আঙ্গুলের নখ ৩. মধ্যমা আঙ্গুলের নখ ৪. তর্জনী আঙ্গুলের নখ ৫. বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ।

আর পায়ের ক্ষেত্রে ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলের থেকে শুরু করে বৃদ্ধা আঙ্গুল পর্যন্ত নখ কাটবে। সর্বশেষ বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুল থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত নখ কাটবে।

سوال : أَوْضِحْ مَعنى الْخِتَانِ وَالْاِسْتِحْدَادِ

প্রশ্ন ঃ الخِتَان ـ اِسْتِحْدَار ـ تَقْلِيْم এর ব্যাখ্যা লিখ।

উত্তর ঃ اَلْاِخْتِتَان / الخِتَان শব্দটি باب افتعال এর মাসদার ختن মূলধাতু হতে নিষ্পন্ন। অর্থ হচ্ছে قطع القُلْفَة। তথা লিঙ্গের উপরিভাগের চামড়া কেটে ফেলা। একে আমরা খাতনা করা বলে থাকি। কামুসুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন, পুরুষের খাতনা হলো লিঙ্গের উপরিভাগের চামড়া কেটে ফেলা, যাতে লিঙ্গের মাথা প্রকাশ পায়। আর নারীর খাতনা হচ্ছে যৌনাঙ্গের উপর ছোট যে চামড়া থাকে তা কেটে ফেলা।

الاِسْتِحْداد ঃ শব্দটি বাবে استفعال এর মাসদার। حد মূলধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। আধিানিক অর্থ হচ্ছে إِحْدَادُ السِّكِّين ছুরি ধারানো। اختلاف بِآلَةٍ حَادَّةٍ তথা ধারালো যন্ত্র দ্বারা মুণ্ডানো। এখানে অর্থ হচ্ছে নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা। বা নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করার জন্য লোহা ব্যবহার করা।

التَّقليم ঃ تقليم শব্দটি বাবে تفعيل এর মাসদার। قلم মূলধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে اَلْقَطْعُ কর্তন করা।

سوال : اكتُبْ كَيْفِيَّةَ تَقْلِيْمِ الْأُظْفَارِ

প্রশ্ন ঃ নখ কাটার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ যে কোন ভাবেই নখ কাটা হোক সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। কেননা নখ কাটার তারতীব রাসূল (স) এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় তবে এটা ডান দিক হতে শুরু করা উচিত। কারণ হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীস এদিকেই পথ নির্দেশনা দেয়– كانَ يُعْجِبُه التَّيَمُّن فِى طُهُوره وتَرَجُّلِه وفِى شَانِه كُلِّه

রাসূল (স) এর নিকট পছন্দনীয় ছিল ডান দিক হতে কাজ শুরু করা। এমন কি পবিত্রতা অর্জন ও জুতা পায় দেয়ার ক্ষেত্রেও। কিন্তু যেহেতু শাহাদাৎ আঙ্গুলটা হলো মুসাববিহা, এর দ্বারা শয়তানের উপর মারাত্মকভাবে

আঘাত হানা হয়। এ জন্য এ আঙ্গুলগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম আঙ্গুল এটাই ; তাই এটাকে আগে কাটা চায়। মোটকথা, এভাবে কাটা উত্তম, তবে এটাকে সুন্নত মনে করবে না এবং সর্ব সময় এ নিয়মে কাটা জরুরী নয়। আর তা হলো ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ডান দিক কেটে কনিষ্ঠাঙ্গুলে শেষ করবে এবং পরিশেষে বৃদ্ধাঙ্গুলী কাটবে। অতঃপর বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে শাহাদাত আঙ্গুলে শেষ করবে এবং পরিশেষে বৃদ্ধাঙ্গুলী কাটবে।

পায়ের আঙ্গুলের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে প্রথমে ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে শুরু করে বাম পায়ের কনিষ্ঠতে শেষ করবে। প্রতিদিন নখ কাটা সুন্নত তা না হলে পনের দিন, বেশীর চেয়ে বেশী ৪০ দিন। এর বেশী সময় যেন অতিক্রম না করে।

سوال : لِأَيِّ سَبَبٍ يُقَلَّمُ الأَظْفَارُ؟

প্রশ্ন ঃ কি কারণে নখ কাটতে হবে? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ নখ কাটার দ্বারা মানবাকৃতিতে সৌন্দর্য প্রকাশ পায় যা প্রশংসনীয় বিষয়। আর যদি নখ স্বাভাবিক অবস্থা হতে বৃদ্ধি পায় তাহলে বদ আকৃতি দেখা যায়। লম্বা লম্বা নখ রাখা ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী। কাজেই এটা করা হতে বিরত থাকা চায়। অপরদিকে নখের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ময়লা কাদা মাটি জমা হয়। কাজেই এটা সুস্থ্যরুচি সম্পন্ন লোকাদের রুচির পরিপন্থীও বটে। আর বড় নখ রাখা শরীয়তের পরিপন্থী এবং তাতে ময়লা আবর্জনা জমে থাকায় ভালোভাবে পবিত্রতা হাসিল হয় না। কারণ ময়লার নিচে পানি পৌছে না। এ সকল বিবিধ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে ইসলাম নখকাটার হুকুম দিয়েছে।

খতনা করা ও নখ কাটার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

বৈজ্ঞানিকগণের আগে ধারণা ছিল খাতনা করলে যৌন শক্তি কমে যায়। ফলে বিভিন্নভাবে তারা মুসলমানদেরকে আক্রমণাত্মক কথা বলত কিন্তু অনেক গবেষণা করে আধুনিক যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এটা নিরুপন করতে সক্ষম হয়েছেন যে, খাতনাহীন ব্যক্তির চেয়ে খাতনাকারী ব্যক্তির যৌনশক্তি বেশী। দ্বিতীয়ত: যৌনাঙ্গের অধিকাংশ রোগ এর থেকে সৃষ্টি হয়। কারণ চামড়ার ভিতরে বীর্য ও ময়লা জমে থাকে যা পর্যায়ক্রমে মারাত্মক আকার ধারণ করে। অপরদিকে খাতনা করলে সহবাসের মধ্যে স্বাদও বেশী পাওয়া যায়। এই বিভিন্ন উপকারীতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানীকগণ ইসলামের এ বিধানকে বিজ্ঞানসম্মত বলে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি এখন অধিকাংশ বড় বড় শিক্ষিত হিন্দু, বড় বড় ডাক্তাররা অপারেশন করার নাম দিয়ে খাতনা করে থাকেন এবং গোপনে এ বিষয়ে লোকদেরকে উৎসাহিত করে থাকেন। কিন্তু এটা ব্যাপকভাবে করে না ইসলামের شعار হওয়ার কারণে।

নখ নিয়ে গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নখ কাটা শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী বস্তু। কারণ তারা পরীক্ষা করে দেখেছেন নখ না কাটলে শরীরের শক্তি কমে যায়। মনের ভিতরে পশুপাখির মত হিংস্রতা বিরাজ করে। অপর দিকে মানুষ অনেক তৈলাক্ত বস্তু খেয়ে থাকে যার কিছু অংশ ঐ নখের মধ্যে গিয়ে জমা হয় যা ধোয়া ব্যতীত ও মাটি দ্বারা পরিষ্কার করা ব্যতীত পরিষ্কার হয় না। ফলে দেখা যায় ঐ ময়লা আজর্বনা নিয়ে খানা খেতে হয় যার ফলশ্রুতিতে পেট খারাপ হয়। বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে দেখেছেন পেটের অধিকাংশ রোগ নখের কারণেই সৃষ্টি হয়। কাজেই নখ রাখা সুস্থ্য রুচি সম্পন্ন কোন ব্যক্তিদের কাজ হতে পারে না। তাই বিধর্মীদের বড় বড় জ্ঞানীগণ যারা এ বিষয়টি অবগত তারা নখ কাটার প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখেন এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও রুগীদেরকে নখ কেটে ফেলতে বলেন এটা রোগ উৎপাদনের কেন্দ্র বিন্দু হওয়ার কারণে।

نَتْفُ الْاِبِطِ

١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يزيدَ قال حَدَّثنا سفيانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابى هُرَيرةَ رضى الله عنه عن النبيِّ ﷺ قال خمسٌ مِّنَ الفِطْرَةِ الخِتَانُ وحَلْقُ العَانَةِ ونتفُ الاِبِطِ وتقليمُ الاَظْفَارِ واَخْذُ الشَّارِبِ -

حَلْقُ العَانَةِ

١٢. اَخْبَرَنَا الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عليه واَنا اسمعُ عَنْ ابنِ وهبٍ عن حَنْظَلَةَ بْنِ ابى سفيانَ عَنْ نافعٍ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى اللّٰهُ عنهما اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلّم قال الفِطْرَةُ قَصُّ الاَظْفَارِ واَخْذُ الشَّارِبِ وحَلْقُ العَانَةِ -

قَصُّ الشَّارِبِ

١٣. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قال اَخْبَرَنا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يوسفَ بنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَن زيدِ بْنِ اَرْقَمَ قال قال رسولُ الله ﷺ مَن لَّمْ يَاْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا -

বগলের পশম উপড়ে ফেলা

অনুবাদ ঃ ১১. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযীদ (র).........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পাঁচটি বিষয় মানুষের ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। খাতনা করা, নাভীর নিম্নাংশের লোম চেঁছে ফেলা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা এবং গোঁফ ছাঁটা।

নাভীর নিম্নাংশের লোম চাঁছা

১২. হারিস ইবনে মিসকীন (র)....... আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মানুষের ফিতরাত হলো নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা এবং নাভীর নিম্নভাগের লোম চেঁছে ফেলা।

গোঁফ ছাঁটা

১৩. আলী ইবনে হুজ্‌র (র)...... যায়দ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গোঁফ না ছাঁটে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : قال نتفُ الاِبِط وحَلْقُ العَانَةِ وَلَمْ يَقُلْ حَلْقُ الاِبِط ونتفُ العَانَةِ؟ ما الحكمةُ فيه؟ اَوْضِحْ حَقَّ الاِيْضاح.

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) কেন বগলের লোম উপড়ানোর জন্যে এবং নাভীর নিচের লোম মুণ্ডানোর জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ তার বিপরীত নির্দেশ দিলেন না। যথার্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ঃ রাসূলের বাণী نتفُ الابط وحلقُ العانةِ **এর মর্মার্থ ঃ** نتف অর্থ হলো উপড়ানো, আর حلق শব্দের অর্থ মুণ্ডানো। রাসূল (স) বগলের লোম উপড়ানো এবং নাভির তলদেশের লোম মুণ্ডানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে নিম্নোক্ত হিকমত ও রহস্য নিহিত রয়েছে।

১. বগল হচ্ছে দুটি অঙ্গের সঙ্গমস্থল তা সমতল নয়। তাই তা মুণ্ডাতে গেলে কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে নাভীর তলদেশ মোটামুটি সমতল। তাই তার লোম মুণ্ডানোয় অসুবিধা হয় না। এ জন্য نتفُ الابط وحلقُ العانة বলেছেন. حلقُ الابط ونتفُ العانة বলেননি

২. বগলের পশম সাধারণত দেখতে কষ্ট হয়। তাই তা মুণ্ডানো কষ্ট কর। তবে নাভির নিচের পশম পরিষ্কার দেখা যায়। তাই তা মুণ্ডানো সহজ।

৩. نتف দ্বারা কামভাব হ্রাস পায়, আর حلق দ্বারা কামভাব বৃদ্ধি পায়। এ জন্যে نَتْفُ الْعَانَةِ বলেননি حلق العانة বলেছেন।

৪. বগলের পশম না উপড়ালে বগলের নিচে বেশী দুর্গন্ধ হয়, আর উপড়ে ফেললে দুর্গন্ধ কম হয়ে থাকে।

৫. বগলের পশম অনায়াসে উপড়ানো যায়। কিন্তু নাভির নিচের পশম সহজে উপড়ানো যায় না।

سوال : هَلْ نَتْفُ الْإِبِطِ اَفْضَلُ اَمْ حَلْقُهُ؟ مَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ.

প্রশ্ন ঃ বগলের নিচের লোম উপড়ানো উত্তম নাকি মুণ্ডানো উত্তম, এ ব্যাপারে আলেমদের মতানৈক্য কি?

উত্তর ঃ বগলের নিচের লোম উপড়ানো উত্তম না কি মুণ্ডানো উত্তম এবং বগলের পশম উপড়ানো উত্তম নাকি মুণ্ডানো উত্তম? এ বিষয়ে ৪টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র) এর অভিমত ঃ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী ও (র) এর অভিমত হচ্ছে- حلق الابط افضل তাদের যুক্তি হলো বগলের পশম উপড়ায়ে ফেলার চেয়ে মুণ্ডানোর মধ্যে বেশী সাবধানতা বিদ্যমান।

২. সাহেবাইন, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক (র) এর অভিমত ঃ সাহেবাইন, ইমাম আহমদ ও মালেক (র) এর মতে نتف الابط افضل

দলীল হলো হাদীসের বাণী–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض انه قال كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْتِفُ الإِبِطَ فِى كُلِّ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا.

৩. কাযী ইয়াজ ও আবু বকর মক্কী (র) এর অভিমত ঃ ইবনে হাজার ও ইমাম নববী বলেন যার উৎপাটনের অভ্যাস নেই তার জন্য حلق উত্তম। কেননা, উৎপাটনে কষ্ট হয়ে থাকে।

৪. ইবনে হাজার ও ইমাম নববীর অভিমত : ইবনে হাজার ও ইমাম নববী (র) বলেন, যার উৎপাটনের অভ্যাস নেই তার জন্য حلقউত্তম, কেননা উৎপাটনে কষ্ট হয়ে থাকে।

আনুসাঙ্গিক আলোচনা ঃ

قوله حلق العانة الخ ঃ নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করা– عانة শব্দের ব্যাখ্যায় তিনটি উক্তি রয়েছে। যথা–

১. নাভির নিচের পশম ২. সেই অংশ যাতে পশম ওঠে ৩. ইবনে আব্বাস, ইবনে সুরাইজ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এটা দ্বারা উদ্দেশ্য সেই পশম যা গুহ্যদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে ওঠে তবে এই উক্তিটি নগন্য। অবশ্য উত্তম এটাই যে অণ্ডকোষ ও গুহ্যদ্বারের পশম নাভির নিচের পশম মুণ্ডানো উচিত, কোন কোন আলিম বলেছেন মহিলাদের জন্য মুণ্ডানোর চেয়ে নাভির নিচের পশম উপড়ানোই উত্তম।

سوال : اكْتُبْ نبذةً مِّنْ حَيَاةِ ابْنِ عُمَرَ بِالْاِيْجَازِ.

প্রশ্ন ঃ সংক্ষিপ্তরূপে ইবনে উমর (রা) এর জীবনী লেখ।

উত্তর ঃ ইবনে উমরের জীবনী ঃ

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আব্দুর রহমান, পিতার নাম উমর ইবনে খাত্তাব, মাতার নাম যয়নব ইবনেতে মাজঊন। তিনি রাসূল (স) এর নবুওয়াতের এক বছর পূর্বে অথবা নবুওয়াতের দ্বিতীয় বছরে মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ হযরত উমর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। তখন তিনি মাতা পিতার সাথে ইসলাম কবুল করেন এবং সে সময় হতে তিনি দ্বীনি পরিবেশে বড় হন। হযরত ইবনে উমর (রা) ও অন্যান্য সাহাবীর সাথে ১১ বছর বয়সে মদীনায় হিজরত করেন।

জিহাদ ঃ বয়স কম থাকায় তিনি বদর ও ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। সর্বপ্রথম তিনি খন্দকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া পরবর্তী সকল যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রেখে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হাদীস রেওয়ায়েত ঃ তিনি প্রথম স্তরের একজন রাবী ছিলেন। সর্বমোট ১৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ১৭টি হাদীস বুখারী ও মুসলিমে সম্মিলিতভাবে রয়েছে। এককভাবে বুখারীতে ৮১টি ও মুসলিমে ৩১টি বর্ণিত আছে। তার নিকট থেকে হযরত সালিম উবায়দুল্লাহ হামজা, নাফি প্রমূখ হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ওফাত ঃ তিনি ৭৩ কিংবা ৭৪ হিজরীতে ৮৩/৮৪ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। ইসলামের এই মহান খাদেমকে মাকবারায়ে তুয়ায় অথবা কাখ নামক স্থানে দাফন করা হয়। (ইসাবা ২/ ৩৪৭-৩৫০ ইকমাল ৬০৪-৬০৫)

যা জানা থাকা জরুরী ঃ আলিমগণ বলেন, নখ, বগলের পশম, নাভির নিচের পশম ইত্যাদি যেখানে সেখানে না ফেলা উচিৎ। বরং পুতে রাখা মুস্তাহাব কিন্তু এ বিষয়ে লোকদের মাঝে অলসতা দেখা যায়। তারা এই গুলোকে পায়খানা ও পিশাবখানায় ফেলে দেয় যা মাকরূহ। কারণ বণী আদমের প্রতিটি অংশ সম্মানিত। আর উলামায়ে কিরাম কেঁচি দ্বারা নাভির নিচের পশম কাটতে নিষেধ করেন। কারণ এটা দারিদ্রতা বয়ে আনে।

নাভির নিচের ও বগলের পশমের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভঙ্গি

জনৈক বিজ্ঞানী এ বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে এ মন্তব্য করেন যে, ইসলামে এ বিধান বাস্তবায়নে মনে ফুর্তি আনয়ন করে ও যৌন শক্তি বৃদ্ধি পায়। নাভির নিচের পশম পরিষ্কার না করার কারণে চর্মরোগের উৎপত্তি হয় এবং ঐ স্থানটাও কদাকার ঘৃণিত অবস্থায় থাকে। আর বগলের পশম ঠিকমত পরিষ্কার না করলে সেখানে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় এবং মানসিক অবস্থা থাকে অস্বচ্ছ।

سوال : قَصُّ الشَّارِبِ اَفْضَلُ اَمْ حَلْقُ الشَّارِبِ عِنْدَ الْاَئِمَّةِ؟

প্রশ্ন ঃ ইমামদের নিকট গোঁফ ছেঁটে ফেলা উত্তম নাকি মুণ্ডন করা উত্তম?

উত্তর ঃ গোঁফ খাটো করা উত্তম নাকি মুণ্ডানো উত্তম ঃ গোঁফ খাটো করা উত্তম নাকি সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডানো উত্তম এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ উল্লেখ করা হলো–

১. ইমাম ত্বহাবী, আবু হানীফা, সাহেবাইনের মতে গোঁফ মুণ্ডানো উত্তম। কেননা-

ক. গোঁফ সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা রয়েছে। যথা-

اِحْفَاءُ الشَّارِبِ - قَصُّ الشَّارِبِ - نَهْكُ الشَّارِبِ - جَزُّ الشَّارِبِ -

এ শব্দগুলোর মধ্যে একটির তুলনায় অপরটির মধ্যে মুবালাগা বেশী। আর খাটো করার সর্বনিম্ন সীমা হলো حلق - কাজেই হলোক করা উত্তম।

খ. قصر এর তুলনায় حلق এর মধ্যে সতর্কতা বেশী। কাজেই মুণ্ডন করাই উত্তম। ২. ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র) এর মতে গোঁফ খাটো করাই সর্বোত্তম। এমনভাবে খাটো করবে যাতে ঠোঁটদ্বয় প্রকাশ পায়। পানাহার করতে অসুবিধা না হয়। কেননা, হাদীসে قص الشارب শব্দ এসেছে। একেবারে মূল উৎপাটন করবে না।

৩. ইমাম নববী ও মালেক (র) ভীষণভাবে মোঁচ মূলোৎপাটন করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এমন করার দ্বারা বিকৃতি সাধন হয়। কেউ এমন করলে তিনি তাকে পিটাতে বলেন। তিনি বলেন, মোঁচ মুণ্ডন করা বেদআত।

৪. ইমাম আহমদের মতে মোঁচ ভালো করে কেটে ফেলতে হবে। কেউ কেউ তার কথায় অতিরঞ্জন করতে গিয়ে বলেন মোঁচ হলোক করে ফেলাই উচিত।

৫. কাজী আয়াযের অভিমত। কাজী আয়ায বলেন– اَلْحَلْقُ وَالْقَصْرُ كِلَاهُمَا سُنِّيَانِ

হলক ও কসর উভয়টি সমান। কেননা, সলফে সালেহীন উভয়টার উপর আমল করেছেন।

التَّوْقِيْتُ فِى ذٰلِكَ

١٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِى قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرٰى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً -

إِحْفَاءُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللُّحٰى

١٥. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللُّحٰى -

---

উল্লেখিত কাজসমূহের জন্য সময় নির্ধারণ

অনুবাদ ঃ ১৪. কুতায়বা (র) ....আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের জন্য গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা, নাভীর নিম্নভাগের লোম চেঁছে ফেলার ও বগলের পশম উপড়ে ফেলার সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমরা যেন এ কাজগুলো চল্লিশ দিনের বেশি সময় পর্যন্ত গড়িয়ে না রাখি। রাবী বলেন, আরেকবার চল্লিশ রাতের কথাও বলেছেন।

গোঁফ ছাঁটা ও দাড়ি বর্ধিত করা

১৫. উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)........আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা গোঁফ খাট কর এবং দাড়ি লম্বা কর।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

رجال সম্পর্কিত কিঞ্চিত আলোচনা ঃ হাফেজ ইবনে আব্দুল বার মালেকী বলেন আবু ইমরান জু'ফীর সাগরেদদের মধ্য হতে জাফর ইবনে সুলাইমান ছাড়া কেউ এ হাদীসকে বর্ণনা করেননি। তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জীবনের শেষ দিকে তার স্মরণ-শক্তি ও মেধা খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং ভুলের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইমাম নববী ও মুতাকাদ্দিমসহ বহু উলামা তার توثيق করেছেন। বিশেষ করে তার নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, ইমাম মুসলিম তার বর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। আর অন্যান্য রাবীগণও তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। কাজেই তার হাদীসের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকে না।

سوال : هَلِ التَّوْقِيْتُ فِى نَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ بَيِّنْ؟

প্রশ্ন ঃ বগলের লোম উপড়ানো এবং নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করা ইত্যাদি ব্যাপারে কি কোন সময় নির্ধারিত আছে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ বগল ইত্যাদি পশম পরিষ্কারের ব্যাপারে সময় নির্ধারণ ঃ নাভির নিচের পশম, নখ, বগলের পশম চল্লিশ দিনের বেশি না রাখা চাই। কেননা, ইমাম নাসায়ী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হযরত আনাস এর হাদীসে চল্লিশ দিনের বেশী সময় তা রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, ৪০ দিনের কথা বলে এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সময় বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু উত্তম হলো প্রতি সপ্তাহে বগলের চুল, মোচ, নাভির নিচের চুল, নখ কর্তন করে পবিত্রতা অর্জন করা। এটা জুম্মার দিন জুমার নামাযের পূর্বে করা চায়। ইবনেরায় গোসল করে নামায আদায় করা চায়। যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে পনের দিন পর পর এটা করবে, সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনের বেশি অবকাশ নেই। কেউ যদি চল্লিশ দিন অতিক্রম করা সত্ত্বেও এটা না পরিষ্কার করে তাহলে সে গুনাহগার হবে। (রদ্দুল মুহতার খণ্ড নং ৫ পৃষ্ঠা নং ২১)

سوال : هَل يَجُوزُ قَصُّ اللِّحْيَةِ او حَلْقُهَا ؟ بَيِّنْ بِالتَّفصِيلِ؟

প্রশ্ন ঃ দাঁড়ি ছাটা কিংবা মুণ্ডন করা জায়েয কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ দাড়ি ছাটাও মুণ্ডানোর বিধান ঃ দাড়ি মুণ্ডানো সকল সুফী সাধক, ফুকাহা ও ইমামদের ঐক্যমতে হারাম। তবে দাড়ি ছাটার ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. কতিপয় আলিমের বক্তব্য ঃ কতিপয় আলিম বলেন দাড়ি রাখা সুন্নত এবং এক মুষ্টির কম হলেও তা জায়েয আছে। বরং দাড়ি আছে বলে বুঝা যায় এমন পরিমাণ রাখলেও সুন্নত আদায় হবে। যেমন– আবুল আলা মওদুদী ও তার অনুসারী এবং এ মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠির লোক বলে থাকেন।

২. জুমহুর উলামা ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের বক্তব্য ঃ জুমহুর উলামাও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের বক্তব্য হলো দাড়ি একমুষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব। এরচেয়ে কম করা হারাম বা মুণ্ডানো হারাম। তবে একমুষ্ঠির অতিরিক্ত অংশ ছাঁটা জায়েয আছে।

দলীল ঃ দাড়ি একমুষ্ঠির কম করা বা মুণ্ডানো হারাম হওয়ার দলীল নিম্নরূপ–

ক. রাসূল (স) এর বাণী– اَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللُّحٰى অর্থাৎ গোঁফ ছেটে নাও এবং দাড়ি ছেড়ে দাও অর্থাৎ একমুষ্ঠি লম্বা করো।

খ. রাসূল (স) এর সাহাবা কেরাম তাবেয়ীন যে দাড়ি মুণ্ডাতেন এর কোন প্রমাণ নেই।

গ. দাড়ি ইসলামের অন্যতম شعار এ জন্য দাড়ি রাখা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলার বাণী–

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে তবে এ সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক পরিশুদ্ধতার পরিচায়ক।

ঘ. দাড়ি ছাঁটলে বা মুণ্ডন করলে অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। আর রাসূল (স) অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য রাখতে নিষেধ করেছেন। যেমন রাসূলের বাণী– مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

ঙ. কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ

অর্থাৎ শয়তান বলেছিল আমি তোমার বান্দাদিগকে ফাসেদ আমল শিক্ষা দিবো যার ফলশ্রুতিতে তারা আল্লাহ তাআলার গড়া আকৃতিকে বিকৃতি করবে, আর দাড়ি মুণ্ডানোও ফাসেদ আকলসমূহের মধ্য হতে একটি। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডালো সে শয়তানের কাজের অনুসরণ করল এবং আল্লাহর সৃষ্টিকৃত আকৃতির বিকৃতি সাধন করল। কিন্তু যদি কেউ এটা করার পর খালেস দিলে তাওবা করে এবং শরীয়ত সম্মতভাবে দাড়ি রাখে তাহলে সে ভর্ৎসনার পাত্র হবে না।

চ. অপরদিকে রাসূলের বাণী– خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ ... الخ

তোমরা মুশরিকদের মুখলাফাত কর। আর দাড়ি না রাখা দাড়ি মুণ্ডানো এটা বিধর্মীদের شعار - অনুরূপভাবে মোঁচ রাখাটাও বিধর্মীদের شعار - কাজেই তার মুখলাফাত করতে হবে। এটা রাসূলের আদেশ। অন্যথায় রাসূলের ভাষ্যের অনুকরণে তাদের সাথে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে।

ছ. রাসূল (স) পুরুষদেরকে মহিলার এবং মহিলাদেরকে পুরুষের বেশ ধারণ করতে নিষেধ করেছেন এবং এ প্রেক্ষিতে জাহান্নামেরও ধমকি এসেছে। কাজেই আমাদের জন্য রাসূল (স) এর এ আদেশের কারণে দাড়িকে এক মুষ্টির চেয়ে বড় রাখা ওয়াজিব।

জ. দাড়ি না রাখলে বাচ্চাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। আর দাড়ি রাখলে উভয়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

ঞ. শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র) বলেন, দাড়ি পুরুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং তার রূপ ও সৌন্দর্যের পরিপুরকও বটে। এ দিকে লক্ষ্য করেও দাড়ি রাখা জরুরী। আল্লাহ তাআলা পুরুষ জাতিকে সিংহের জাতি হিসাবে তৈরী করেছেন এবং তাদেরকে শান শওকত ও দিয়েছেন। কিন্তু তারা দাড়ি মুণ্ডন করে দুর্বল মেয়েদের বেশ ধারণ করে।

এ সকল নস এবং ফুকাহায়ে কিরামের বক্তব্য একথার উপর প্রমাণ বহন করে যে দাড়ি রাখা ওয়াজিব।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ তারা দাড়ি রাখাকে সুন্নত সাব্যস্ত করেছে, আসলে এটা সুন্নত নয় বরং এটা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এটা বলেছেন। যেমন ঈদের নামায ওয়াজিব কিন্তু এটাকে সুন্নত বলা হয় এ কারণে যে, সেটা সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, ঠিক তদ্রূপ দাড়ি রাখার বিষয়টি সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে কিন্তু এটা ওয়াজিব।

একমুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটার বিধান

এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি লম্বা হলে তা কাটা বৈধ। যেমন হাদীস–

انّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَاخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا

নবী করীম (স) দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সব দিকে (এক মুষ্টির অতিরিক্ত অংশ) কেটে ফেলতেন। অনুরূপভাবে ইবনে ওমর (রা) এর একটি হাদীস আছে। আর তা হলো একমুষ্টির বেশি অংশ কেটে ফেলা বৈধ। ইবনে মিলক বলেন একমুষ্টির অতিরিক্ত অংশ দাড়ি চুলের ন্যায় কাটা যাবে। অনুরূপভাবে তাবেয়ীগণের এক জামাআতের আমলও ছিল এমন। অধিকাংশ মুতাকাদ্দীমিন ও মুতাআখখিরীন উলামার মতও এটা যে, এক মুষ্টির বেশি দাড়ি কাটা বৈধ। আর যুক্তিরও দাবীও এটাই। কেননা ইসলাম হলো পরিচ্ছন্ন প্রিয় ধর্ম। আর মাত্রারিক্ত দাড়ির দ্বারা চেহারার বিকৃতি ঘটে। এতে হাসির পাত্রও হতে হয়। এর ফলশ্রুতিতে রাসূলের দাড়ির মর্যাদাহানী ঘটারও আশংকা দেখা দেয়। কাজেই একমুষ্টির অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলা শ্রেয়। আর রসূলের দাড়ি যেহেতু দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান থাকত, অপরদিকে অতিরিক্ত অংশ কাটার বৈধতার ব্যাপারে প্রায় উম্মতের ইজমাও রয়েছে। কাজেই একমুষ্টির পরিমাণ দাড়ি রাখা ও অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলা উত্তমই বটে।

سوال : الاشياءُ مِنَ الْفِطْرَةِ مَا هِىَ؟ بَيِّنْ.

প্রশ্ন ঃ ফিতরাত বা প্রকৃতিগত কাজসমূহ কি কি বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ ফিতরাতগত বিষয়সমূহ ঃ ফিতরাত বা প্রকৃতিগত কাজগুলো হলো নিম্নরূপ–

১. قَصُّ الشَّارِب গোঁফ খাটো করা। ২. إِعْفَاءُ اللِّحْيَة দাড়ি লম্বা রাখা।
৩. السواك মিসওয়াক করা। ৪. نَتْفُ الْإِبِط বগলের নিচের লোম উপড়িয়ে ফেলা।
৫. حَلْقُ الْعَانَة নাভির নিচের যৌন কেশ মুণ্ডন করা। ৬. الْإِخْتِتَان খাতনা করা
৭. تَقْلِيمُ الْأَظْفَار নখ কাটা।

উল্লেখ্য ফিতরতসমূহ পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সামনে যে তিনটি ফিতরত এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে তা হলো নিম্নরূপ।

৮. غَسْلُ الْبَرَاجِم উযূর সময় হাত পায়ের গ্রন্থিসমূহ ধৌত করা। ৯. الْاِسْتِنْشَاق নাক পরিষ্কার করা।
১০. الْمَضْمَضَة কুলি করা।

দাড়ি ও বিজ্ঞানীদের তথ্য

কতিপয় বিজ্ঞানী গবেষণা করে দেখেছেন যে, ইসলামের কোন বিধান আধুনিক বিজ্ঞানীদের থিউরীর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং প্রতিটি বিধানে রয়েছে বিশেষ গূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য যা মানবিক জীবনের সাথে সামঞ্জস্যশীল। বিজ্ঞানীগণ যখন দাড়ি নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন দেখলেন যে, বারং বার ক্ষুরের মাধ্যমে দাড়ি সেপ করার দ্বারা চোখের জ্যোতি লোপ পায়, মুখের ত্বক নষ্ট হয়, লাবন্যতা কমে যায়, ব্রণের উপদ্রব দেখা দেয়। মানসিকভাবেও কিছুটা হীন থাকতে হয়। এ সকল বিধি ও ফায়দার প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা এখন ক্ষুর দ্বারা দাড়ি সেপ করে না ক কেঁচি দ্বারা ছোট ছোট করে রাখে এবং বলে সত্যাই ইসলামের বিধান মানুষের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেছে এবং তা মানুষের শরীর স্বাস্থ্যের অনুকূলেও বটে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, বিধর্মীরা এটা অনুধাবন করতে পারলেও মুসলমানরা এ থেকে উদাসীন।

الْإِبْعَادُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَاجَةِ

١٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ وَعُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْخَلَاءِ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ -

١٧. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ قَالَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ ائْتِنِي بِوَضُوءٍ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ - قَالَ الشَّيْخُ إِسْمٰعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَارِي -

الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ ذٰلِكَ

١٨. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسٰى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَهٰى إِلٰى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَدَعَانِي وَكُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ -

---

মল ত্যাগের জন্য দূরে গমন করা

অনুবাদ ঃ ১৬. আমর ইবনে আলী (রা)........আবদুর রহমান ইবনে আবু কুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ময়দানের দিকে বের হলাম। যখন তিনি পায়খানা-পেশাব করার ইচ্ছা করতেন তখন (লোকালয় হতে) দূরে গমন করতেন।

১৭. আলী ইবনে হুজর (র).......মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) যখন পায়খানা-পেশাবের স্থানের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন (লোকালয় হতে) দূরে চলে যেতেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর কোন এক সফরে পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে (লোকালয় হতে) দূরে গিয়েছিলেন। আর (এসে) বললেন, আমার জন্য উযুর পানি আন। আমি তাঁর জন্য উযূর পানি আনলাম। তিনি উযূ করলেন এবং মোজার উপর মাসেহ করলেন।

দূরে না যাওয়ার অনুমতি

১৮. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র).........হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে হাঁটছিলাম। তিনি লোকজনের আবর্জনা ফেলার স্থান পর্যন্ত গেলেন এবং (সেখানে) দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর নিকট হতে দূরে সরে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি আমাকে ডাকলেন, আমি তাঁর পেছনে (নিকটেই) ছিলাম। এমনিভাবে তিনি পেশাবের কাজ সমাধা করলেন। এরপর তিনি উযূ করলেন এবং মোজার উপর মাসেহ করলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : كَيْفَ رَأَى ابو مُوسٰى رض رسولَ اللّٰه عليه وسلم يَبُوْلُ وقَدْ رُوِىَ عَنْ عبدِ الرحمٰن بْنِ ابى قُرادٍ رضى الله عنه فِى حَدِيْثِه وكَانَ (النبىّ صلى الله عليه وسلم) إذا ارادَ الحاجَةَ أبْعَدَ.

প্রশ্ন ঃ আবু মূসা (র) কিভাবে রাসূল (স) কে পেশাব করা অবস্থায় দেখলেন? অথচ আব্দুর রহমানের হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যখন তাঁর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জরুরত হত তখন তিনি দূরে চলে যেতেন।

উত্তর ঃ উল্লেখিত হাদীসে আবু মূসা (র) ও আব্দুর রহমানের হাদীসের মাঝে মূলত: কোন বৈপরীত্য দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, আব্দুর রহমানের হাদীস পায়খানা করার ব্যাপারে। তিনি বলেন, যখনই তিনি পায়খানা করার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন দূরে চলে যেতেন। আর আবু মূসার হাদীস পেশাব সম্পর্কে, তিনি রাসূলকে পেশাব করতে দেখেছেন।

২. অথবা আব্দুর রহমানের হাদীসটি রাসূলের বেশির ভাগ সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, তিনি অধিকাংশ সময় দূরে গিয়ে এস্তেঞ্জা করতেন। সুতরাং আর কোন বৈপরীত্য থাকলো না।

سوال : مَا الحِكْمَةُ فِى اِبْعَادِ عِنْدَ اِرادَةِ الحَاجَةِ بَيِّنْ وَاضِحًا

প্রশ্ন ঃ পেশাব-পায়খানার সময় দূরে যাওয়ার হিকমত কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ নবী (স) এর অভ্যাস ছিল যখন তাঁর পেশাব-পায়খানার বেগ হত তখন তিনি দূরবর্তী কোন স্থানে চলে যেতেন। তাবরাণী শরীফে আছে তিনি মুগমিছ নামক স্থানে চলে যেতেন যা মক্কা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত এবং তিনি সর্ব প্রকার উপযোগী জায়গায় তাঁর হাজত সারতেন। যেমন তিনি আড়ালদায়ক জায়গায় বসতেন, হাওয়া অভিমুখে বসতেন না বরং হাওয়ার প্রতিমুখে বসতেন এবং জায়গাটা নরম দেখে বসতেন।

দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার হিকমত

১. প্রথমত এর হিকমত হলো এর দ্বারা উম্মতের পায়খনা ও পেশাবের আদব শিক্ষা দেয়া।

২. মানুষের সতর বা গুপ্তাঙ্গ যেন কারো নজরে না পড়ে, তার জন্যে দূরে যেতেন।

৩. পায়খানার সময় অপ্রীতিকর আওয়াজ বের হয়ে থাকে যা লোকদের রুচি বহির্ভূত। তাই দূরে যেতেন।

৪. পায়খানা ও পেশাবের গন্ধে মানুষ যেন কষ্ট না পায়। এ কারণে দূরে যেতেন।

৫. আল্লাহর অভিশাপের পাত্র যেন মানুষ না হয় এ জন্য দূরে যেতেন।

سوال : ما مَعْنَى المَسْح وكيفَ يَثْبُتُ المسحُ على الخُفَّيْن بهٰذِه الرِّوَاية مَعَ انَّه لا يجوزُ نسخُ القرانِ بالخَبرِ؟

প্রশ্ন ঃ মাসেহ কাকে বলে? অত্র হাদীস দ্বারা মোযার উপর মাসেহ কিভাবে সাব্যাস্ত হয় অথচ হাদীস দ্বারা কুরআনকে রহিত করা জায়েয নয়।

উত্তর ঃ مسح এর আভিধানিক অর্থ ঃ মাসেহ শব্দটি باب فتح এর মাসদার, আভিধানিক অর্থ اِمرارُ اليَدِ عَلى الشَئِ **তথা কোন বস্তুর উপর হাত বুলান এর থেকে আধুনিক আরবীতে ডাক্তারকে مساح বলা হয়।**

مسح এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ اِصابَةُ البَلَّةِ لِخُفِّ مخصوصٍ فِى زمنٍ مَخْصوصٍ

নির্দিষ্ট সময়ে মোজার উপর আদ্রতা পৌছানোকে মাসেহ বলে। উযূর ফরয হিসেবে পা ধৌত করার নির্দেশ প্রদান করেছে। এরশাদ হয়েছে–

فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ.

কিন্তু হাদীসে মোজার উপর মাসেহর অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ফলে বুঝা যায় হাদীস দ্বারা কুরআনের বিধানকে রহিত করা যায়। অথচ খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কুরআনের বিধানকে রহিত করা যায় না। তাহলে আহলে সন্নত ওয়াল জামাত মাসেহ করার বিধানকে কিভাবে গ্রহণ করলেন? এর উত্তর নিম্নরূপ–

১. خبر واحد দ্বারা কুরআনের বিধানকে রহিত করা যায় না। কিন্তু خبر مشهور ও خبر متواتر দ্বারা কুরআনের বিধানকে রহিত করা যায়। আর মোজার উপর মাসেহ সংক্রান্ত হাদীসটি হলো خبر متواتر এর পর্যায়ের। হাসান বসরী বলেন, আমি ৭০ জন এমন সাহাবীকে পেয়েছি যারা মোজার উপর মাসেহ করার প্রবক্তা।

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন- اِنْ كَانَ خَبرُ الواحدِ مُحققًا بِالقُرآنِ لِيُفِيْدُ اليَقِيْنَ

অর্থাৎ خبر واحد যদি বিভিন্ন বাচনভঙ্গি দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে তা ইয়াকীনের ফায়দা দেবে। আর মাসেহ সম্পর্কিত হাদীসটি বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হওয়ায় তার মধ্যে দৃঢ়তা এসে গেছে। কাজেই এর দ্বারা কুরআনের আয়াতকে রহিত করা যাবে। যেমন- تحويل قبلة এর হাদীস।

৩. মাসেহ দ্বারা মূলত আয়াতের হুকুমকে রহিত করা হয়নি। বরং তখন কুরআনের আয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে যখন মোজা না থাকে। আর যদি মোজা পায়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে মাসেহ সংক্রান্ত হাদীস প্রযোজ্য হবে।

৪. ইমাম জাসসাস বলেন ارجلكم। এর মাঝে দু'ধরণের ক্বিরাত রয়েছে। কাজেই যদি ارجلكم। কে ফাতাহ এর সাথে পড়া হয় তাহলে তা মোজাবিহীন অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর যদি কাসরা এর সাথে পড়া হয় তাহলে তা মোজা পরিহিত অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

سوال : ما معنى الخُفِّ والجَوْرَبِ لغةً وشرعًا ما الفرقُ بَيْنَ الخفِّ والجَورب؟ اكتُبْ معَ بيانِ حكمِ المسحِ علَى الجُوْرُبِ مُوَضِّحًا؟

প্রশ্ন ঃ الخف ও الجورب এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনা কর। خف ও جورب এর মধ্যকার পার্থক্য কি? جورب এর উপর মাসেহ করার হুকুম সহকারে লেখ।

উত্তর ঃ خف এর আভিধানিক অর্থ ঃ خف শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো اخفاف - خفاف এটা خفة থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ হলো মোজা। মোজাকে خف এজন্য বলা হয়, যে, এটা জুতা থেকে হালকা হয়। অথবা এটাকে হালকা চামড়া দ্বারা তৈরী করা হয় এজন্য এটাকে خف বলে।

خف এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ পরিভাষায় خف এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

هُوَ ما يُلْبَسُ فِى الرِّجْلِ مِن جلدٍ رقيقٍ

অর্থাৎ হালকা পাতলা চামড়ার তৈরী যে আবরণ পায়ে পরিধান করা হয় তাকে خف বলে।

جورب এর আভিধানিক অর্থ ঃ جورب শব্দটা একবচন, বহুবচন হলো جوارب -এর আভিধানিক অর্থ হলো الجَوارِبُ لِباسُ الرِّجْلِ অর্থাৎ جورب হল পায়ের আট সাট পোষাক। পাতলা মোজা যা জুতার ভেতরে পায়ে পরিধান করা হয়।

جورب এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ কতিপয় আলিমের মতে এটা মোজার বিকল্প যার তলদেশে চামড়া লাগানো থাকে না। তবে তা পরিধান কারলে পায়ের চামড়া দেখা যায় না। আল্লামা আমীমুল ইহসান (র) বলেন এটা এক প্রকার মোজা যা সাধারণত পশম, পাতলা চামড়া বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে তৈরী করা হয়।

خف ও جورب এর মধ্যে পার্থক্য ঃ خف এমন মোজাকে বলা হয় যা সম্পূর্ণ চামড়ার তৈরী অর্থাৎ তাতে পশম তুলা ইত্যাদির কোন মিশ্রণ থাকে না। আর এটা বাঁধা ছাড়াই পায়ের সঙ্গে লেগে থাকে। তাতে পানিও প্রবেশ করতে পারে না। এটা টাখনু পর্যন্ত লম্বা হয়। আর جورب এমন মোজাকে বলা হয়, যা সুতা অথবা উলের দ্বারা তৈরী। আর তা পায়ে পরিধান করা হয় শীত ইত্যাদি থেকে হেফাজতের জন্য।

হুকুমের দিক দিয়ে পার্থক্য ঃ خف এর উপর মাসেহ করার বিধান এত্তেফাকী পক্ষান্তরে جورب এর উপর মাসেহ করার বিষয়টা ইখতেলাফী। সম্পূর্ণ মোজা যদি চামড়ার হয় তাহলে তাকে خف বলে। আর যদি দুদিক থেকে চামড়া লাগানো থাকে তাহলে তাকে جورب مُجَلَّد বলে। আর যদি শুধু নিচের অংশে চামড়া থাকে তাহলে সেটাকে جورب منعّل বলে।

جورب এর প্রকার ও তার বিধান ঃ جوربين যদি مُجَلَّدين অথবা منعلين হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর মাসেহ করা বৈধ। আর جوربين যদি مجلدين বা منعّلين না হয় বরং পাতলা কাপড় দ্বারা তৈরী করা হয়

তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর মাসেহ করা বৈধ নয়। অবশ্য جوربين যদি مُنَعَّلَيْن ও مُجَلَّدَيْن না হয় বরং মোটা কাপড় দ্বারা তৈরী করা হয় তাহলে তার উপর মাসেহ বৈধ হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য আছে। ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও জুমহুর আলিমগণের মত হলো মোটা جورب এর উপর তিন শর্ত সাপেক্ষে মাসেহ বৈধ।

১. তার উপর পানি ঢাললে যদি তা পা পর্যন্ত না পৌঁছে।

২. বাঁধা ব্যতীত যদি পায়ে লেগে থাকে।

৩. স্বাভাবিকভাবে হলো৷ ফেরা করার দ্বারা যদি না ফেটে যায়। বরং তা পরে চলাচল করা সম্ভব হয়। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এমন মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ নয়। কিন্তু পরবর্তীতে আবু হানীফা (র) সাহেবাইনের মাযহাবের প্রতি রুজু করেছেন। সুতরাং এমন মোজার উপর সর্বসম্মতিক্রমে মাসেহ করা বৈধ।

سوال : مَنْ اَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وما اَدِلَّتُهُمْ وَمَا الْجَوَابُ عَنْهَا.

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর মাসেহ করাকে কারা অস্বীকার করেন? এবং তাদের দলীল কি? এবং তাদের দলীলের জবাব কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ কি এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. আহলে জাওয়াহের, খারেজী, রাফেজীদের মতে মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ নয়।

২. জুমহুর উলামায়ে কেরাম ও সকল উলামাদের ঐক্যমতে মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ।

৩. ইমাম আহমদ (র) এর ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি নাকি মোজার উপর মাসেহকে অস্বীকার করেন বস্তুত এটা ভুল কথা, তার বিশুদ্ধ মত হলো মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ। তবে তা মাকরূহ।

খারেজী, রাফেজী ও আহলে জাওয়াহের এর দলীল ঃ ১. তাদের দলীল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ.

এখানে পা ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। কাজেই সাহাবায়ে কিরাম ও রাসূল (স) থেকে মাসেহ সম্পর্কিত যত হাদীস বর্ণিত আছে সব এ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কাজেই মোজার উপর মাসেহ বৈধ নয়।

২. হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীস-

عن ابن عبّاس اَنَّهٗ قَالَ لايجوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ নয়। এর দ্বারা ও প্রমাণিত হয় যে, মোজার উপর মাসেহ করা যাবে না।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের দলীল ঃ

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের দলীল হলো মাসেহ সম্পর্কিত মুতাওয়াতের রেওয়ায়েতসমূহ। ১. প্রথম দলীল হলো ইবনে মাসউদের বর্ণনা-

عن عبدِ اللّٰه بْنِ مسعودٍ رض قال كنتُ جالِسًا عندَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم فجَاءَ رجلٌ مِنْ مُرادٍ يُقَالُ لَهٗ صَفْوانُ بنُ عَسَّالٍ فقال يا رسولَ اللّٰه صلى الله عليه وسلم اِنِّىْ اُسَافِرُ بيـنَ مَكَّةَ والمدينـةَ فَاَفْتِنِيْ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخفَّيْنِ فقال ثلاثةَ ايّامٍ لِلْمُسَافِرِ ويومٌ وليلةٌ للمُقيمِ.

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি হুজুর (স) এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময়ে ছফওয়ান ইবনে আছছাল নামক এক ব্যক্তি এসে হুজুর (স) কে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মক্কা এবং মদীনায় সফর করি। কাজেই আমাকে মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে ফতোয়া দিন। রাসূল (স) বলেন, মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত, আর মুকীমের জন্য একদিন একরাত।

٢. عن صفوانَ بْنِ عسّالٍ قال بَعَثَنِيْ النبىُّ صلى الله عليه وسلم فِى سَرِيَّةٍ فقالَ لِلْمُسافِرِ ثلثٌ ولِلْمُقيمِ يومٌ وليلةٌ مَسْحًا عَلَى الْخُفَّيْنِ .

হযরত ছাফওয়ান ইবনে আচ্ছাল বলেন, হুজুর (স) আমাকে একটি সারিয়ায় প্রেরণ করে বললেন, মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহ তিন দিন এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত।

٣. عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ شعبة قال اَتَى النبيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فبالَ قائمًا فَتَوَضَّأَ ومَسَحَ على النَّاصِيَةِ وخُفَّيْهِ

মুগীরা ইবনে শুবা (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী (স) এক গোত্রের আস্তাকুড়ের নিকটে আসলেন অতঃপর দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন, তারপর উযূ করলেন এবং মাথার অগ্রভাগ ও মোজার উপর মাসেহ করলেন।

٤. عن عليٍّ رض قال رأيتُ رسولَ ﷺ يَمْسَحُ ظُهْرَ خُفَّيْهِ.

হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (স) কে মোজার উপরের অংশে মাসেহ করতে দেখেছি।

٥. قال بلالٌ ذهبَ النبيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثمّ تَوَضَّأَ فغَسَلَ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ ومَسَحَ بِرَأْسِهِ ومَسَحَ علَى الخُفَّيْنِ ثم صَلّى -

বেলাল (রা) বলেন, নবী করীম (স) কাযায়ে হাজাতের জন্য গেলেন, অতঃপর অযূ করলেন তারপর মুখ ও হাত ধৌত করলেন এবং মাথা ও পা মাসেহ করে নামায আদায় করলেন।

٦. قال الحسنُ البصريُّ ادركتُ سَبْعِيْنَ بدريًّا مِنَ الصَّحابةِ كُلُّهم يَرَوْنَ المَسْحَ علَى الخُفَّيْنِ.

অন্যত্র হাসান বসরী (র) বলেন, আমি সত্তর জন সাহাবী থেকে শ্রবণ করেছি যে, হুজুর (স) মোজার উপর মাসেহ করেছেন। তাদের মধ্যে আশারায়ে মুবাশশারাও রয়েছেন।

হাসান বসরী (র) বলেন, আমি সত্তর জন বদরী সাহাবীকে পেয়েছি,তারা প্রত্যেকেই মোজার উপর মাসেহ করার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

٧. قال حافظُ بنُ عبدِ البَرِّ مسحَ على الخُفَّيْن سَائِرِ اهلِ البدرِ والحُدَيْبِيَّةِ مِن المُهاجِرِيْنَ والْاَنْصَارِ وسائرِ الصَّحابةِ والتابِعِيْن وسَائِرِ اهلِ العِلْمِ.

হাফেজ ইবনে আব্দুল বার বলেন আহলে বদর ও আহলে হুদায়বিয়ার সকল আনসার-মুহাজির এবং সমস্ত সাহাবী, তাবেঈ এবং আহলে ইলমগণ মোজার উপর মাসেহ করেছেন।

٨. قال الامامُ الاعظمُ اِنَّ مِنْ شَرائطِ اهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ تفضِيلٌ وقالَ فِي موضعٍ اٰخَرَ ماقلتُ بالمَسْحِ حتّى جاءَ فِيْهِ مثلُ ضَوْءِ النَّهارِ.

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের শর্তাবলীর মধ্য হতে একটি হলো মোজার উপর মাসেহ করাকে বৈধ মনে করা। ইমাম আবু হানীফা (র) অন্যত্র বলেন, দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হওয়ার পরই আমি মোজার উপর মাসেহ করার কথা বলেছি।

٩. قال الكَرْخِيُّ اَخافُ الكُفْرَ علَى مَنْ لَايَرَى المَسْحَ.

অর্থাৎ যে মোজার উপর মাসেহ করার বিধান মানে না আমি তার কাফের হওয়ার আশংকা করি। এ সকল দলীল দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় যে,মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

জুমহুর উলামায়ে কিরাম বলেন, হযরত জারীর (রা) সূরায়ে মায়েদা নাযিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অথচ তার থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হুজুর (স) কে মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছেন। অনুরূপভাবে মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, হুজুর (স) মক্কা বিজয়ের দিন ও তাবুক যুদ্ধের সময় মোজার উপর মাসেহ করেছেন। আর সূরা মায়েদা নাযিল হয়েছে গাজওয়ায়ে মুরাইসির সময়। যা মক্কা বিজয় ও তাবুক যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, সূরা মায়েদা নাযিল হওয়ার পরে হুজুর মোজার উপর মাসেহ করছেন। কাজেই মোজার উপর মাসেহ করার বিধান প্রমাণিত হয়ে গেলে সাথে সাথে মোজার উপর মাসেহ করা যাবে না এ কথাও খণ্ডিত হয়ে গেল।

দ্বিতীয়মত ঃ হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর যেয়াদাতী তথা অতিরঞ্জন প্রমাণ করা বৈধ। আর মাসেহ সম্পর্কিত হাদীস মাশহুর ও মুতাওয়াতিরও বটে। আবু বকর জাসসাস বলেন, اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْن এর বৈধতা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। কেননা, উযূর আয়াতে اَرْجُلَكُم শব্দটিতে দুটি কিরাত আছে। নসবের ক্বিরাতে পা ধৌত করার অর্থ প্রদান করে, আর জরের ক্বিরাতে পা মাসেহ করার অর্থ প্রদান করে। আর এ ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ مسح على الْخُفَّيْن এর বৈধতা প্রমাণ করে।

سوال : لِمَ فَرَّقَ الائمّةُ فِى حكم مسح العمامةِ ومسح عَلى الْخُفَّيْنِ مَعَ اَنَّهُمَا وَرَدَا فِى حديثٍ واحدٍ هل يجوزُ المسحُ على القَلَنْسُوَةِ والخِمَارِ للمَرْأةِ؟

প্রশ্ন ঃ পাগড়ীর উপর মাসেহ ও মোজার উপর মাসেহ একই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও ইমামগণ এ দু'টি বিধানের ক্ষেত্রে পার্থক্য করেন কেন? টুপি এবং ওড়নার উপর মাসেহ করা বৈধ কি না? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মোজা ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করার বিধানের মধ্যে পার্থক্য করার কারণ

পাগড়ী ও মোজার উপর মাসেহ এর বিধান একই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও ইমামগণ পাগড়ীর উপর মাসেহকে জায়েয বলেননি, এর কারণগুলো নিম্নরূপ–

১. মোজার উপর মাসেহ করার হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায়ের কিন্তু পাগড়ির উপর মাসেহ করার হাদীসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ের নয়।

২. মোজা চামড়ার হয়ে থাকে কিন্তু পাগড়ী চামড়ার তৈরী হয় না। তাই পাগড়ীর উপর মাসেহ করা বৈধ নয়।

৩. সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে এ পর্যন্ত মনীষীগণ মোজা মাসাহের উপর ইজমা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পাগড়ীর উপর মাসেহ এর ব্যাপারে এমন কোন তথ্য নেই।

৪. মোজা বার বার খোলা বিশেষত শীতকালে খোলা খুবই কষ্টকর। কিন্তু পাগড়ীর বিষয়টি এমন নয়। তাই দুটির বিধান ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে।

৫. হযরত আনাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, পাগড়ির উপর মাসেহ করা বৈধ নয়। যেমন–

عن انسٍ (رض) رأيتُ رسولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وعليهِ عِمامةٌ قِطْرِيَّةٌ فادخلَ يدَهُ تحتَ العِمامةِ فمَسَحَ مُقَدَّمَ رأسِهِ ولم يَنْقُضِ العِمامَةَ.

উল্লেখিত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, পাগড়ীর উপর মাসেহ করা বৈধ নয়।

قلنسوة ও خمار এর উপর মাসেহের বিধান ঃ টুপি অথবা মেয়েদের উড়নার উপর মাসেহ করা জায়েয আছে কি না এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের অভিমত নিম্নরূপ–

পুরুষের টুপি আর মহিলাদের ওড়নার বিধান পাগড়ীর বিধানের অন্তর্ভূক্ত এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত দুটি মত রয়েছে।

১. ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আবু হানীফা (র) এর অভিমত ঃ এ ইমামত্রয় ও তাঁদের অনুসারীরা বলেন যে, শুধু পাগড়ীর উপর দিয়ে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করলে যেমন মাসেহ বিশুদ্ধ হয় না। ঠিক তেমনী শুধু টুপি ও ওড়নার উপর দিয়ে পূর্ণ মাথা মাসেহ করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। তবে একগুচ্ছ চুল পরিমাণ মাথা মাসেহ করার পর পাগড়ী, টুপি ও ওড়নার উপর দিয়ে মাথার সর্বাংশে মাসেহ করলে মাসেহ এর ফরজিয়্যাত ও সুন্নত উভয় আদায় হবে। কারণ কুরআনের নির্দেশ হলো মাথা মাসেহ করা। কাজেই মাথার কিছু অংশ থাকতেই হবে।

২. ইমাম আহমদ ও তাঁর অনুসারীদের অভিমত ঃ ইমাম আহমদ ও তাঁর অনুসারীরা বলেন, মাথা মাসেহকে শুধু পাগড়ীর উপর সীমাবদ্ধ রাখলে মাসেহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, হাদীসে এসেছে–

عن بلالٍ أنَّ رسولَ صلَّى اللّٰهُ عليه وسلّم مَسَحَ عَلى الخُفَّيْنِ والخِمارِ وفى روايةٍ عَلى العِمامةِ فالقَلَنْسُوَةُ فِى حكمِ العِمامةِ.

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এগুলোর উপর মাসেহ করা বৈধ।

سوال : ما هِى الحكمة فِى مَشْروعيَّةِ المَسْحِ على الخُفَّيْنِ.

প্রশ্ন ঃ ইসলামী শরীয়তে মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ হওয়ার হিকমত কি?

উত্তর ঃ মাসেহ এর বিধান প্রণয়নের হিকমত

মোজার উপর মাসেহ অনুমোদিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। যথা–

১. জটিল ক্ষেত্রে বান্দার কাজ সহজ করণের উদ্দেশ্যে এর বিধান দেয়া হয়েছে। কারণ মোজা বারবার পরা ও খোলা কষ্টকর। বিশেষত শীতকালে শীতপ্রধান দেশগুলোতে এটা খুবই কষ্টকর। আল্লাহর বাণী রয়েছে–

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَايُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ الاية.

২. মোজার উপর মাসেহ করার দ্বারা পানির সাশ্রয় হয়। পানি দুষ্প্রাপ্য অঞ্চলে এটা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতস্বরূপ।

৩. প্রত্যেকবার পা ধুয়ে মোজা পরলে পায়ের চামড়ার ক্ষতি হতে পারে, দুর্গন্ধও হয়ে যেতে পারে।

৪. শীত প্রধান দেশগুলোতে ঠাণ্ডার ক্ষতিকর প্রভাব থেকেও শরীরকে রক্ষা করা যায়।

৫. অনেক সময় সময়ের অপচয় রোধ করা যায়। প্রবাদ আছে– فِعلُ الْحَكِيمِ لَايَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ

ইসলাম সর্বাধুনিক। ইসলামের প্রতিটি বিধান বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং মানুষের দৈনন্দীন জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে তার কাজ-কর্ম, আচরণ ও কথাবার্তা কেমন হবে ইসলাম তা বলে দিয়েছে। এমনকি সে সকল বিধানাবলীর কথাও বলে দিয়েছে যেগুলো পালন করা মানুষের জন্য অত্যন্ত সহজ ও শরীর স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী। বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল ইসলামের বিধান মানুষকে সময় অপচয় করতে শেখায়। কিন্তু এ বিধান নিয়ে যখন তারা গবেষণা শুরু করেছেন তখন বাধ্য হয়ে তাদের বলতে হয়েছে যে, ইসলাম সময়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং বস্তুর যথার্থ ব্যবহার এবং তার অপচয় রোধের ব্যাপারে ইসলামের বিধানের কোন তুলনা হয় না। সত্যই ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ জীবন বিধান।

سوال : قوله قال الشيخُ لِمَنْ هٰذاالقولُ و مَنِ المُرادُبِها ومَا مُراده بِه ومَا أُرِيْدَ بِاسْمَاعِيْلَ.

প্রশ্ন ঃ এটা কার কথা এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য কে? ইসমাঈল দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ এর প্রবক্তা হলেন ইবনুস সুন্নী এবং শায়খ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইমাম নাসায়ী অর্থাৎ তিনি বলেছেন সনদের মধ্যে যে ইসমাঈল রয়েছে, এ (রাবী) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসমাঈল ইবনে জাফর ইবনে আবী কাছীর কা'বী।

দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কিত কিছু কথা

الرخصة فى ترك ذالك শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য। ইমাম নাসায়ী (র) এর এ শিরোনাম কায়েম করার দ্বার উদ্দেশ্য হলো যে সকল বর্ণনায় কাযায়ে হাজত এর সময় রাসূল (স) এর দূরে যাওয়ার কথা উল্লেখ আছে তার সম্পর্ক হলো পায়খানার সাথে এটা স্পষ্ট করা। কেননা, পায়খানার সময় সামনে ও পেছনে উভয় দিকে পর্দার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু পেশাবের অবস্থাটা এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এ ক্ষেত্রে একদিকে আড়াল হলেই যথেষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এটা লোকজনের উপস্থিতিতেই করা যায়। তাই হুযাইফার হাদীসটি পেশাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

سوال : كَيْفَ بَالَ النبيُّ صلّى اللّٰهُ عليه وسلّمَ فِى ارضٍ مَعَ اَنَّهَا لِغَيْرِهِ وهُوَ لاَيَسْتَأذِنُ مِنْهُ؟

প্রশ্ন ঃ নবী (স) অন্যের ভূমিতে কিভাবে পেশাব করলেন অথচ তিনি তার অনুমতি নেননি?

উত্তর ঃ নবী (স) অন্যের মালিকানাভূক্ত ভূমিতে কিভাবে পেশাব করলেন তার অনুমতি নেয়া ছাড়া এর বিভিন্ন সমাধান মুহাদ্দেসীনে কিরাম উল্লেখ করেছেন। নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করা হলো–

১. আল্লামা সিনদী (র) বলেন, ভূমিটি ঐ সম্প্রদায়ের মালিকানাভূক্ত ছিল এবং তিনি মালিকের অনুমতি নিয়েই পেশাব করেছেন। অথবা ইঙ্গিতার্থকভাবে সেখানে পেশাব করার অনুমতি আছে। কেননা, সেটা হলো ময়লার স্তুপ। আর পেশাবও এক ধরণের ময়লা। আর ময়লা ফেলার জন্যই সেটাকে নির্ধারণ করা হয়েছে। কাজেই সেখানে পেশাব করার জন্যে মালিকের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। বরং কেমন যেন মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতি রয়েছে।

২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, سُبَاطَة এর ইযাফত قوم এর দিকে যে করা হয়েছে এটা اضافت ملكية - اضافت اختصاصية নয়। কেননা সেটা অনাবাদী ভূমি ছিল। কেউ তার মালিক নয়। কাজেই সকলে সেখানে ময়লা ফেলত, কিন্তু সেটা কওমের নিকটে থাকার কারণে তার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে কাজেই সেখানে পেশাব করা অন্যের মালিকানা ভূমিতে পেশাব করা হলো না।

৩. নবী (স) যেহেতু মুসলমানদের কল্যাণের বিষয়ে মশগুল ছিলেন এবং জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এ দিকে পেশাবের প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। কাজেই মজলিস দির্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় দ্রুত উঠে নিকটবর্তী একটি ভূমিতে মালিকের অনুমতি ছাড়া পেশাব করেন। কাজেই এখন আর কোন প্রশ্ন থাকে না।

سوال : كيف بال النبيّ صلى الله عليه وسلم قائمًا وهو نَهىٰ عَنْهُ؟ بيّنْ وُجُوْهَهُ.

প্রশ্ন ঃ কিভাবে নবী (স) দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন অথচ তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন এর কারণ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ নবী (স) এর দাঁড়িয়ে পেশাব করার কারণসমূহ

নবী করীম (স) দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও কিভাবে তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন, এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করা হলো–

১. আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেন, ঐ স্থানে বসে পেশাব করার কোন পরিবেশ ছিল না। কাজেই তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। কারণ, জায়গাটা ছিল উচুঁ। সুতরাং পেশাব করলে তা নিজের দিকে গড়িয়ে আসার সম্ভাবনা ছিল, তাই দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।

২. আল্লামা মাওয়ারদী ও কাযী ইয়াজ বলেন নবী (স) তার অভ্যাসের পরিপন্থী দাঁড়িয়ে পেশাব করেন এ কারণে যে, ঐ জায়গাটা গোত্রের নিকটবর্তী ছিল। কাজেই বসে পেশাব করলে অপ্রিতিকর আওয়াজে গোত্রের লোকদের কষ্ট হতে পারে বা ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে। কাজেই তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, যাতে করে আওয়াজ না হয়।

৩. কেউ কেউ বলেন রাসূল (স) দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন জায়েয বুঝানোর জন্যে। লোকেরা যেন এটাকে হারাম মনে না করে। আর شارع এর জন্য জায়েয বর্ণনা করতে গিয়ে অনুত্তম কাজ করা বৈধ।

৪. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন হুজুর (স) এর কোমরে ব্যাথা থাকার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।

৫. আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) এর হাটুতে ব্যাথা থাকার করণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।

৭. প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পেশাব করা বৈধ এটাকে বুঝানো হয়েছে।

৮. নাপাকী লাগার থেকে বাঁচার জন্য দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। কেননা, হুজুর (স) যেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন উক্ত স্থানটি আস্তাকুড়ে ছিল। সেখানে বসার সুযোগ ছিল না, তাই দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।

اَلْقَوْلُ عِنْدَ دُخُوْلِ الْخَلَاءِ

١٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ -

পায়খানা-পেশাবের স্থানে প্রবেশ করার সময় দোয়া পাঠ করা

অনুবাদ ঃ ১৯. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)..... আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন পায়খানা-পেশাবের ইচ্ছা করতেন তখন পড়তেন اللهم انى اعوذبك من الخبث والخبائث "হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি পুরুষ শয়তান ও নারী শয়তান থেকে।"

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : اكْتُبْ حَلَّ لُغَاتِ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ وَبَيِّنْ مُرَادَهُمَا؟

প্রশ্ন ঃ خَبَائِث ও خُبُث এর তাহকীক লেখ এবং তার উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ خُبُثٌ **এর তাহকীক ঃ** خُبْثٌ خُبُثٌ শব্দটির "ب" এর উপর পেশ এবং জযম উভয়টা হতে পারে ।যদি সুকুনের সহিত পড়া হয়, তাহলে এটা মাসদার হবে। তার অর্থ হবে অপছন্দনীয় কাজ করা। আর যদি "ب" অক্ষরকে পেশ যোগে পড়া হয় তবে এটা خبيث এর বহুবচন হবে যা طيب এর বিপরীত। আরবী ভাষায় এটা অপছন্দনীয় বিষয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। خبيث শব্দটি বাক্যের মাঝে شتم অর্থাৎ গালি-গালাজ অর্থে ব্যবহৃত হয়, ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে কুফরের অর্থ হয়। খাদ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে এটা হারাম অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং পানীয় দ্রব্যের ক্ষতিকারক অর্থে ব্যবহৃত হয় বলে ইমাম খাত্তাবী উল্লেখ করেছেন।

خبائث **এর তাহকীক ঃ** خبائث শব্দটি خبيثة এর বহুবচন। অর্থ হলো খারাপ কাজ, কু-কর্ম, দুষ্কর্ম, অপবিত্র জিনিস। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্ত্রী জিন ও শয়তানসমূহ হতে কষ্ট অনুভব করা। কেউ কেউ বলেন নর ও স্ত্রী শয়তানের পক্ষ হতে কষ্ট পাওয়া।

خبائث ও خبث **দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ**

১. প্রথমটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নর শয়তান, আর দ্বিতীয়টি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নারী শয়তান।

২. প্রথমটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অনিষ্টসমূহ, আর দ্বিতীয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গুণাহসমূহ

৩. প্রথমটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শয়তানসমূহ আর দ্বিতীয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পবিত্রসমূহ।

سوال : مَتٰى يُسْتَعَاذُ بِهٰذَا الدُّعَاءِ؟ اُذْكُرْ اِخْتِلَافَ الْاَئِمَّةِ فِيْهِ مُدَلَّلًا مُرَجِّحًا.

প্রশ্ন ঃ এই দোয়া (দ্বারা কখন আশ্রয় কামনা করবে বা) কোন সময় পড়বে? এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য কি দলীল প্রমাণ সহকারে বর্ণনা কর। (এবং আপন মাযহাবের) অগ্রগণ্যতা প্রমাণ কর।

উত্তর ঃ শৌচাগারে প্রবেশের ইচ্ছা করার পূর্বে এ দোয়াটি পড়া সুন্নত–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

দোয়াটি কখন পড়া সুন্নত ঃ দোয়াটি কোন সময় পড়া সুন্নত এ প্রসঙ্গে উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য রয়েছে।

১. কেউ কেউ বলেন যখন কেউ শৌচাগারে প্রবেশের ইচ্ছা করবে তখন এ দুয়াটি পড়বে।

২. তবে এ ব্যাপারে জুমহুর উলামায়ে কিরামের মত হলো যদি জঙ্গলে বা খোলা ময়দানে থাকে তাহলে সতর খোলার পূর্বে এ দোয়া পড়ে নেবে। আর যদি ঘরে থাকে তাহলে শৌচাগারে প্রবেশের পূর্বে পড়বে।

শুরুতে দোয়া পড়তে ভুলে গেলে তার বিধান

কেউ যদি শৌচাগারে প্রবেশ করার পূর্বে দোয়া পড়তে ভুলে যায় এবং দোয়া পড়া ব্যতীত বাথরুমে প্রবেশ করে, অতঃপর দোয়ার কথা স্মরণ হয়, তবে সে ঐ অবস্থায় দোয়া পড়বে কি না এ ব্যাপারে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। ১. ইমাম মালেক (র) বলেন যদি সতর খোলার পূর্বে স্মরণ হয় তবে পড়ে নেবে। আর যদি সতর খোলার পর স্মরণ হয় তবে পড়বে না।

২. এ ক্ষেত্রে জুমহুরের মত হলো যদি প্রবেশ করে ফেলে এবং পূর্বে দোয়া না পড়ে তবে মৌখিকভাবে দোয়া পড়বে না বরং মনে মনে স্মরণ করবে।

ইমাম মালেক (র) এর দলীল ঃ

ইমাম মালেক (র) হযরত আনাস (র) এর এবর্ণিত এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلَّم اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

আলোচ্য হাদীসে اذا دخل الخلاء শব্দ এসেছে, যদ্বারা বুঝা যায় যে, শৌচাগারে প্রবেশ করার পরও মৌখিকভাবে দোয়া পড়ে নেয়া উত্তম।

ইমাম মালেক (র) এর দলীল ঃ

ইমাম মালেক (র) এর দলীল হলো হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস–

عَنْ عائشةَ رضي الله عنها كَانَ رسولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وجَلَّ علىٰ كُلِّ اَحْيَانِه.

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকতেন। সুতরাং এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বায়তুল খালাতে প্রবেশ করার পরেও দুয়া পড়া উচিৎ।

জুমহুরের দলীল ঃ

এ বিষয়ের উপর অধিকাংশ উলামার ইজমা রয়েছে যে, অপবিত্রস্থানে আল্লাহ তাআলার জিকির করা নিষিদ্ধ। বাকী হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ এর উত্তর কি? জুমহুর বলেন, এই হাদীসটির অর্থ হলো যখন শৌচাগারে প্রবেশের ইচ্ছা করবে তখন এই দোয়া পড়বে। এর দলীল হলো ইমাম বুখারী (র) এর উক্তি যা তিনি আল আদাবুল মুফরাদ নামক কিতাবে লিখেছেন।

عن انسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اللّٰهُ عليه وسلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ ...... قَالَ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ –

অর্থাৎ যখন তিনি বায়তুল খালায় প্রবেশের ইচ্ছা করতেন তখন আল্লাহুম্মা ইন্নী..... এই দোয়াটি পাঠ করতেন। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যখন কোন আদিষ্ট বিষয়কে اذا এর সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয় তখন তার তিনটি পদ্ধতি হয়। ১. আদিষ্ট বিষয়টি আদায় করা اذا এর প্রবিষ্ট বিষয়ের পূর্বে ওয়াজিব হবে। যেমন –

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ اى اِذَا اَرَدْتُمُ الْقِيَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ.

যখন তোমরা নামায আদায়ের ইচ্ছা করবে.....।

২. আদিষ্ট বিষয়টি আদায় করা اذا এর প্রবিষ্ট বিষয়ের সাথে সাথে ওয়াজিব হবে। যেমন–

اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ.

অথবা اِذَا قَرَأْتَ فَتَرَسَّلْ যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হবে, তখন তা মানোযোগসহকারে শুন, অথবা যখন তেলাওয়াত কর, তখন ধীরে ধীরে,ওয়াকৃফ করে পড়।

৩. আদিষ্ট বিষয়টির আদায় اذا এর প্রবিষ্ট বিষয়ের পরে হবে। যেমন– اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا যখন তোমরা ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাও তখন শিকার কর। জুমহুর উলামা এখানে প্রথম অর্থ গ্রহণ করেন এবং ইমাম

মালেক (র) তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করেন। প্রথম অর্থটি প্রাধান্যের কারণ হলো, শৌচাগার ময়লা ও নাপাকীর স্থান। সেখানে প্রবেশ করে দুআ, যিকির ও আশ্রয় প্রার্থনা করা আদবের পরিপন্থী।

বাকী রইল হযরত আয়েশা (রা) এর রেওয়ায়েত। যদি হাদীসের জাহিরের উপর আমল করার দ্বারা ইস্তেঞ্জার অবস্থায়ও জিকিররত থাকা অনিবার্য হয়। অথচ এটা সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। কাজেই এ প্রমাণটি খুবই দুর্বল, কারণ যদি এ হাদীসের জাহিরের উপর আমল করা হয়, তাহলে সতর খোলার পরেও দোয়া পড়া জায়েয হওয়া উচিৎ; অথচ ইমাম মালেক (র) এর প্রবক্তা নন। এতে বুঝা গেল এই রেওয়ায়েতটি স্বীয় বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং হাদীসের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

১. ذکر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ذکر القلب অন্তরের জিকির।

২. অথবা অধিকাংশ অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সে মতে অর্থ হবে প্রিয় নবী (স) রাত দিন বিভিন্ন কাজে মশগুল হওয়ার সময় কোন না কোন যিকির অবশ্যই করতেন এবং অধিকাংশ সময় তিনি যিকিরে মশগুল থাকতেন।

سوال : لِمَا اسْتَعَاذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلّم مَعَ اَنَّهٗ مَامُوْنٌ وَمَعْصُوْمٌ؟

প্রশ্ন ঃ নবী (স) কেন ইস্তেগফার করলেন? অথচ তিনি ছিলেন শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত, নিরাপদ এবং পাপমুক্ত।

উত্তর ঃ ১. হযরত নবী করীম (স) বায়তুলখালায় প্রবেশ এর পূর্বে تعوذ পাঠ করেছেন উম্মতদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে।

২. বাথরুম হলো ময়লা ও অপবিত্রতার স্থান। সেখানে শয়তান বাস করে। সুতরাং এটা তাদের আস্তানা। কাজেই বাথরুমে প্রবেশের পর তারা মানুষকে ক্ষতি করতে পারে। তাই এস্তেগফার করতেন।

৩. রাসূল (স) সর্বসময় যিকিরে মশগুল থাকতেন কিন্তু হাযত পুরা করার সময় যিকিরে ত্রুটি সৃষ্টি হত, তাই তিনি এস্তেগফার করেছেন।

৪. প্রতিটি মুহূর্তে রাসূলের মর্যাদা বাড়তে থাকে। কাজেই প্রতিটি পূর্ব মুহূর্ত থেকে পরবর্তী মুহূর্ত রাসূলের নিকট উত্তম। কিন্তু কাযায়ে হাযত এর সময় এর মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তাই তিনি এস্তেগফার করেছেন।

৫. শৌচাগারে প্রবেশ করার সময় শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কারণ হলো যে, এই ধরনের ময়লা স্থানগুলোতে শয়তানের কেন্দ্র হয়ে থাকে। এগুলো প্রস্রাব-পায়খানার সময় মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে। কোন রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায়, সতর খোলার সময় শয়তান মানুষের অণ্ডকোষ তথা লজ্জাস্থান নিয়ে খেলতে আরম্ভ করে। হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (র) এর মৃত্যু ঘটেছিল এভাবে যে, তিনি প্রস্রাব-পায়খানার কাজে টয়লেটে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সেখানেই তাঁর লাশ পাওয়া যায়। তখন একটি রহস্যজনক আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, যেন কেউ এ ছন্দটি পাঠ করছে–

قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ × رَمَيْنَاهُ سَهْمَيْنِ فَلَمْ نُخْطِ فُؤَادَهٗ

سوال : كم مرّةً ظهر الشّيطانُ بَيْنَ يدَيِ النبيِّ صلى اللّٰه عليه وسلّم وكيف دفعه.

প্রশ্ন ঃ শয়তান কতবার রাসূলের (স) সামনে প্রকাশ পায় এবং তিনি কিভাবে তেকে প্রতিহত করেন।

উত্তর ঃ দুইবার রাসূল (স) কে ধোকা দেয়ার জন্য শয়তান প্রকাশিত হয়।

১. রাসূলের নামায ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে শয়তান একদা রাসূল (স) এর নামাযরত অবস্থায় তার সামনে প্রকাশিত হয়। কিন্তু রাসূল (স) তাকে ধরে ফেলেন এবং মসজিদের এক স্তম্ভে তাকে বেঁধে রাখেন, যাতে করে লোকেরা তাকে দেখতে পায়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁর হযরত সুলায়মান (আ) এর দোয়ার কথা স্মরণ হয়ে যায়–

رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا ...الخ - কাজেই আমি তাকে অপমানকর অবস্থায় ছেড়ে দেই।

২. দ্বিতীয়বার মেরাজের রাত্রে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু নবী (স) استعاذہ এর মাধ্যমে তাকে প্রতিহত করেন।

ইবনে আরাবী বলেন নিঃসন্দেহে রাসূল (স) শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত ছিলেন।

النَّهْيُ عَنْ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

٢٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ اسْحٰقَ اِنَّهُ سَمِعَ عَنْ ابى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رضى الله عنه وَهُوَ بِمِصْرَ يَقُولُ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ كَيْفَ اَصْنَعُ بِهٰذِهِ الْكَرَايِيْسِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا ذَهَبَ احدُكم الى الْغَائِطِ او الْبَوْلِ فلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا -

النهىُ عنِ اسْتدبارِ القِبلةِ عندَ الحاجَةِ

٢١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ منصورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ ابى اَيُّوْبَ الانصاريِّ رضى اللّٰهُ عنه اَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ لَاتَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوْهَا لِغَائِطٍ او بَوْلٍ ولٰكن شَرِّقُوا او غَرِّبُوا -

---

পায়খানা-পেশাবের সময় কিবলামুখী হওয়ার নিষেধাজ্ঞা

অনুবাদ ঃ ২০. মুহাম্মদ ইবনে সালামা ও হারিছ ইবনে মিসকীন (র)..........রাফি' ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু আইয়ূব আনসারী (রা)-এর মিসর অবস্থানকালে তাঁকে বলতে শুনেছেন- আল্লাহর শপথ! আমি জানি না কিভাবে (মিসরের) এই শৌচাগারগুলো ব্যবহার করবো। অথচ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পেশাব ও পায়খানার উদ্দেশ্যে গমন করবে, তখন সে যেন কিবলামুখী হয়ে ও কিবলাকে পেছনে রেখে না বসে।

পায়খানা-পেশাবের সময় কিবলাকে পেছনে রেখে বসার নিষেধাজ্ঞা

২১. মুহাম্মদ ইবনে মানসুর (রা).......... আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, পেশাব ও পায়খানার জন্য তোমরা কিবলামুখী হয়ে এবং কিবলাকে পেছনে রেখে বসবে না। বরং পূর্বদিক ও পশ্চিম দিক ফিরে বসবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : اَيَّةُ حَدِيْثِ الْبَابِ مُعَارِضٌ لِرِوَايَةِ الصَّحِيْحَيْنِ" فَقَدِمْنَا الشَّامَ " فكيفَ التوفيقُ بَيْنَهُمَا ؟

প্রশ্ন ঃ আলোচ্য হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতের বিপরীত। কারণ আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে তিনি মিসরে ছিলেন অথচ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় সিরিয়ার কথা রয়েছে। সুতরাং উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য কি?

উত্তর ঃ বিপরীত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন ঃ ইমাম নাসায়ী (র) এর উল্লেখিত হাদীসে দেখা যায় হযরত আবু আইয়ুব আনছারী (র) মিসরে অবস্থান করছিলেন। অথচ ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাঁদের বর্ণনায় বলেছেন তিনি একদল লোকের সাথে শাম দেশ তথা সিরিয়া থেকে আসছিলেন। তখন কেবলা পরিবর্তন হয়ে যায়। একই হাদীসে বিপরীতমুখী এ বর্ণনার কারণে বৈপরীত্য দৃষ্টিগোচর হয়। এর সমাধান কি? এর উত্তরে শায়খ ওয়ালিউদ্দিন ইরাকী বলেন, বিপরীত দু'টি দেশের বর্ণনার কারণে তার মধ্যে কোন সমস্যা নেই। কেননা, তিনি

সফর থেকে আসার সময় দুটি দেশ ঘুরে এসেছিলেন। ফলে এক হাদীসে শামের কথা অন্য হাদীসে মিসরের কথা বলা হয়েছে। কাজেই উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

২. এ ঘটনা একই সফরে উভয় শহরের হয়েছে এবং তিনি উভয় জায়গায় শৌচাগারকে কেবলামুখী তৈরী করা দেখেছেন। কাজেই কোন দ্বন্দ্ব নেই।

سوال : بَيِّن حلَّ لُغاتِ غَائِطٍ ومَرَا حِيْضَ والقِبْلَةِ ومِصْرَ ومقدّسٍ وكَرَابِيْسَ . هل مِصْرُ وكرابيسُ مُنْصَرِفَانِ او غيرُ مُنْصَرِفَيْنِ بَيِّن واضِحًا.

প্রশ্ন ঃ كرابيس ও مصر শব্দ দুটি مُقَدّس . مِصْر . قِبْلَة . مَرَاحِيْض . غَائِط . كَرَابِيس এর তাহীকী কর মুনছারিফ নাকি গাইরে মুনছারিফ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ غائط এর আভিধানিক অর্থ ঃ الغائط শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো غُوُطٌ ও غِيَاطٌ -শব্দটির মূল অর্থ হলো ১. নিম্নভূমি ২. প্রশস্ত ভূমি ৩. সমতল ভূমি।

غائط এর পারিভাষিক অর্থ ঃ পরিভাষায় غائط বলা হয় সেই স্থানকে যেখানে পেশাব পায়খানা করা হয়। কেননা, সে যুগে সমতল নিম্নভূমিতে পায়খানা করা সর্বজন গ্রাহ্য ছিল। যেহেতু আরবে পায়খানা নিম্নভূমিতে ছিল সেহেতু একে كناية হিসাবে পায়খানা অর্থে ব্যবহার করা হয়। কেননা, আহলে আরবগণ সাধারণত নিচু ভূমিতে ইস্তেঞ্জা করত, যেন তাদেরকে কেউ না দেখে।

مَرَاحِيض এর তাহকীক ঃ مَرَاحِيض শব্দটি رَحْضٌ থেকে নির্গত اسم اله এর সীগা। শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হলো مِرْحَاضٌ এর অর্থ হচ্ছে ধৌত করা। এজন্য কোন কোন সময় এটি গোসলখানার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। পরিভাষায় এটাকে বাইতুলখালা বলে।

القِبْلَة এর তাহকীক ঃ قِبْلَة শব্দটির "ق" বর্ণে কাছরা এর সাথে অর্থ হলো কাবা এবং كُلَّ مَا يُسْتَقْبَلُ مِن شيءٍ প্রত্যেক অগ্রবর্তী বস্তুকে কেবলা বলা হয়।

পরিভাষায় কেবলা বলা হয়–

مَا يُصَلّٰى الٰى نَحْوِهَا مِنَ الْاَرْضِ السَّابِعَةِ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. مِمَّا يُحَاذِى الْكَعْبَةَ او جِهَتِهَا.

সপ্ত আসমান এবং সপ্ত জমিনের মধ্যবর্তী কাবার বরাবর যে দিকে ফিরে নামায আদায় করা হয় তাকে কেবলা বলা হয়। আর যার কেবলা জানা নেই তার কেবলা হলো جِهَةُ التَحَرّى -

আর যদি "ق" বর্ণে পেশ পড়া হয় তাহলে অর্থ হবে চুমু দেয়া, স্পর্শ করা।

مصر এর তাহকীক ঃ مصر শব্দটি একবচন ইসমে মাসদার এর বহুবচন হলো مُصُوْرٌ - আভিধানিক অর্থ হলো দুটি বস্তু কিংবা ভূমির মাঝে প্রতিবন্ধকতা। যেমন বলা হয়। اِشْتَرى الدَّارَ مُصُوْرُهَا যখন কোন ব্যক্তি এমন ঘর খরিদ করে যা দুটি অংশে বিভক্ত। অথবা مصر অর্থ মিশর (দেশ) বা مصر একবচন বহুবচন হলো اَمْصَارٌ । অর্থ শহর, নগর, দেশ, সীমান্ত।

مُقَدَّسٌ শব্দের তাহকীক ঃ مقدّس শব্দটি মাসদার অথবা ইসমে যরফ হতে পারে। তখন অর্থ হবে পবিত্র করা বা পবিত্রস্থল অথবা مقدّس শব্দটি تَقْدِيس মাসদার থেকে اسم مفعول এর সীগা, অর্থ হলো পবিত্রতম স্থান বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম কেবলা। এটা ফিলিস্তিনে অবস্থিত। এটাকে মসজিদে আকসাও বলা হয়। এ ঘরটি সর্ব প্রথম আদম (আ) বাইতুল্লাহ নির্মাণের ৪০ বছর পরে তৈরী করেন। পরবর্তীতে হযরত সুলায়মান (আ) জিনদের দ্বারা পুণঃনির্মাণ করেন।

كَرَابِيْس এর তাহকীক ঃ كَرَابِيْس শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হলো– كِرْيَاسٌ -আভিধানিক অর্থ হলো ১. ইস্তিঞ্জা করার স্থান ২. নাসায়ী শরীফের ব্যাখ্যাতা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ كَرَابِيْس শব্দের ব্যাখ্যা হিসেবে বাইতুলখালা, ব্যবহার করেছেন যার অর্থ পায়খানাগার।

مِصْر ও كَرَابِيْس শব্দটি দুটি মুনছারিফ না গাইরে মুনছারিফ ঃ যদি مصر শব্দ দ্বারা কোন শহর বা জনপদকে বুঝানো হয় তাহলে মুনছারিফ হবে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী। اِهْبِطُوا مِصْرًا পক্ষান্তরে যদি শুধু মিসর দেশকে বুঝানো হয়– তাহলে غير منصرف হবে। আর كرابيس শব্দটি جمع مُنْتَهٰى الْجُمُوْعِ হওয়া হিসাবে غير منصرف হবে।

سوال : حَرِّرِ اخْتِلَافَ الائمَّةِ الكرامِ فِى الْاِسْتِقْبَالِ وَالْاِسْتِدْبَارِ مُدَلَّلًا مُرَجِّحًا.

প্রশ্ন ঃ ইস্তেঞ্জার সময় কেবলাকে সামনে রাখা বা পেছনে রাখার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য কি? দলীল প্রমাণসহকারে বর্ণনা কর এবং অগ্রগণ্য মাযহাবটির প্রাধান্য দাও। অথবা–

سوال : اُذْكُرْ اَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِى اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَاسْتِدْبَارِهَا.

প্রশ্ন ঃ কিবলামুখী হয়ে বা কিবলা পেছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করার ব্যাপারে আলিমগণের মতামত উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ কিবলামুখী হয়ে বা কিবলা পেছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করার ব্যাপারে ইমামগণের মতামত

মলমূত্র ত্যাগের সময় কিবলার দিকে মুখ করা বা না করা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের ৮টি মাযহাব রয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে তা বর্ণনা করা হলো–

১. ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত ঃ ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মদ, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবরাহীম নাখয়ী, আওযায়ী, মুজাহিদ, সুরাকা ইবনে মালেক আবু আইউব আনসারী, ইবনে মাসউদ ও আবু হুরাইরা প্রমুখের মতে কিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ করে এস্তেঞ্জা করা জায়েয নেই, চাই তা খোলা ময়দানেই হোক।

২. আহলে জাওয়াহেরের অভিমত ঃ কিবলার দিকে মুখ করে ও পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করা জায়েয আছে, চাই এটা ঘরে হোক কিংবা ময়দানে। এ মাযহাবের প্রবক্তা হলেন, হযরত আয়েশা (রা), উরওয়া ইবনে যুবায়ের, ইমাম মালেক (র) এর উস্তাদ রবীআতুর রাঈ ও দাউদে জাহেরী।

৩. ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) এর অভিমত ঃ ঘরের মধ্যে কিবলার দিকে মুখ করা বা পিঠ করা উভয়টি জায়েয। তবে খোলা ময়দানে কিবলার দিকে মুখ করে ইস্তিঞ্জা করা বা পিঠ করে ইস্তিঞ্জা করা উভয়টি নাজায়েয। এ মাযহাবের প্রবক্তা হলেন, হযরত ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আমীর শাবীর (র), ইমাম মালেক (র), ইমাম শাফেয়ী (র) এবং ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ (র) প্রমূখ। ইমাম আহমদ (র) এর একটি রেওয়ায়েতও অনুরূপ।

৪. ইমাম আহমদ (র) এর অভিমত ঃ ঘরের মধ্যে হোক কিংবা ময়দানে, উভয় অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ করা নাজায়েয, তবে উভয় অবস্থায় কিবলার দিকে পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করা জায়েয। এটি ইমাম আহমদ (র) এর একটি রেওয়ায়াত। এর প্রবক্তা হলেন কোন কোন আহলে জাওয়াহের। ইমাম আবু হানীফা (র) এর একটি রেওয়ায়েতও অনুরূপ।

৫. ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর অভিমত ঃ কিবলার দিকে মুখ করে ইস্তিঞ্জা করা ঘরে ও ময়দানে সর্বাবস্থায় নাজায়েয। আর কিবলার দিকে পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করা ঘরের মধ্যে জায়েয তবে ময়দানে নাজায়েয। এর প্রবক্তা হলেন ইমাম আবু ইউসুফ (র) এবং ইমাম আযম (র) এর একটি রেওয়ায়েত এর অনুরূপ।

৬. ইবরাহীম নাখয়ী (র) এর অভিমত ঃ ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন, কাবাকে সামনে করে ইস্তেঞ্জা করা এবং বাইতুল মুকাদ্দাসকেও সামনে বা পেছনে রেখে ইস্তেঞ্জা করা হারাম। এর প্রবক্তা হলেন মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র) ও ইব্রাহীম নাখয়ী।

৭. আবু আওয়ানা (র) এর অভিমত ঃ কিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করার নিষিদ্ধতা শুধু মদীনাবাসীর সাথেই খাস। অন্যদের জন্য কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে ইস্তিঞ্জা করা জায়েয আছে। এর প্রবক্তা হলেন আবু আওয়ানা (র)।

৮. শাহওয়ালিউল্লাহ (র) এর অভিমত ঃ তিনি বলেন কিবলার দিকে মুখ করে এবং পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করা মাকরূহে তানযীহি। এটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর একটি রেওয়ায়েত। আল্লামা শাওকানী এটা গ্রহণ করেছেন। এই ইখতেলাফটি মূলতঃ রেওয়ায়েতের বিভিন্নতার উপর নির্ভরশীল।

আহলে জাওয়াহের এর দলীল ঃ তাঁরা রাসূলের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন—

عَنْ جابر (رض) قَالَ نَهَانَا النبيُّ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلّم اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبلةَ وَنَسْتَدْبِرَهَا بِبَوْلٍ ثُمّ رأيتُه قبْلَ اَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا.

অর্থাৎ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (র) এর বর্ণনা। তিনি বলেন, হুজুর (স) কিবলাকে সামনে নিয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর রাসূল (স) এর ইন্তেকালের এক বৎসর পূর্বে আমি রাসূল (স) কে কেবলামুখী হয়ে পেশাব করতে দেখেছি। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেলো কেবলামুখী হয়ে পেশাব করা জায়েয। যখন কিবলামুখী হয়ে পেশাব পায়খানা করা জায়েয হলো, তাহলে কিবলাকে পেছনে রেখে ইস্তেঞ্জা করা উত্তমরূপে জায়েয হবে।

আহলে জাওয়াহের এর দ্বিতীয় দলীল ঃ

عَنْ عِراكٍ عَنْ عَائشةَ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رسولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلّم قومٌ يَكْرَهُوْنَ اَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبلةَ فقال اَوَ قد فَعَلُوا ذٰلكَ؟ حَوِّلُوا مَقْعَدَتِى اِلى القِبْلَةِ.

অর্থাৎ ইরাক আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন আয়েশা (রা) বলেন, এমন এক সম্প্রদায়ের কথা রাসূলের নিকট ব্যক্ত করা হলো, যারা তাদের লজ্জা স্থানকে কেবলার দিকে করে ইস্তিঞ্জা করতে অপছন্দ করে। রাসূল (স) বললেন, তারা কি এমনটাই করে? তোমরা আমার নিতম্বকে কেবলা দিকে ফিরায়ে দাও। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিবলার দিকে মুখ ও পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করার বিধান রহিত হয়েগেছে।

ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র) এর দলীল ঃ

তাদের দলীল হলো ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণিত হাদীস—

عَن ابْنِ عمرَ قال لقدْ اِرْتَقَيْتُ يومًا علىٰ ظهرِ بيتِ حفصةَ فرأيتُ النبيَّ صلى اللّٰه عليه وسلّم علىٰ (لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ المقدّس لِحَاجَتِه) حَاجَتِه مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ.

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এর বর্ণনা তিনি বলেন, একদা আমি হাফসা (র) এর ঘরের উপর (আমার কোন এক প্রয়োজনে) উঠেছিলাম। তখন দেখলাম রাসূল (স) কেবলাকে পিছনে আর শামদেশকে সামনে রেখে ইস্তেঞ্জা করছেন, (দুটি কাঁচা ইটের উপর বসে বাইতুল মুকাদ্দাসকে সামনে রেখে)। (আবু দাউদ খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩, বুখারী খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২৬, তিরমিযী খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৯, নাসায়ী খণ্ড ১ পৃষ্ঠা নং ১০, ইবনে মাজা পৃষ্ঠা ২৮)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, এই নিষেধাজ্ঞা খোলা মাঠের ব্যাপারে প্রযোজ্য। যদি তোমার এবং কিবলার মধ্যে এমন কোন বস্তু থাকে যা তোমাকে আড়াল করে রাখে তাহলে কোন অন্যায় হবে না। (আবু দাউদ খণ্ড নং ১ পৃষ্ঠা ৩)

٣ ـ عن حسن بن ذكوان عن مروان الاصغر قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها ـ

অর্থাৎ হাসান ইবনে যাকওয়ান মারওয়ান আল আসগার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কে দেখেছি। তিনি তার সোওয়ারিকে কিবলামুখী করে বসিয়ে কেবলার দিক মুখ করে বসে পেশাব করেছেন। সুতরাং এ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইস্তেকবালে কেবলা ও ইস্তেদবারে কিবলা ঘরের মধ্যে জায়েয আছে।

ইমাম আহমদ (র) এর দলীল ঃ তিনিও ইবনে ওমর (রা) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন–

عن ابن عمر قال لقد ارتقيت على ظهر البيت فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته (مستدبر الكعبة) (ابو داود ج اص ٣ بخارى ج اص ٢٦ باب التبرز فى البيوت ترمذى ج اص ٩ نسائى ج اص ١٠ ـ ١١ الرخصة فى ذالك فى البيوت ابن ماجه ـ ص ٢٨)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি ঘরের ছাদে উঠে দেখলাম যে, রাসূল (স) দুটি কাঁচা ইটের উপর বসে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, মদীনায় বসে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করলে বায়তুল্লাহ স্বাভাবিকভাবেই পিছনে পড়বে।

ইমাম আহমদ বলেন উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবী (স) কেবলাকে পিছনে রেখে ইস্তেঞ্জা করেছেন। এতে এটাও বুঝা গেল যে, ঘরে বা বাইরে সব স্থানে কেবলাকে পিছনে রেখে ইস্তেঞ্জা করা জায়েয।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর দলীল ঃ উপরোল্লিখিত ইবনে ওমরের বর্ণিত হাদীসই তার দলীল। তিনি ইজতেহাদ করে বলেন, মুতলাকভাবে কিবলাকে পেছনে রেখে ইস্তেঞ্জা করা বৈধ, বিষয়টি এমন নয়। বরং উক্ত হাদীসে কিবলার দিকে যে, পিঠ ফিরানোর কথা বলা হয়েছে তা ছিল লোকালয়ে। সুতরাং ময়দানে তা জায়েয নয়।

ইমাম নাখয়ী (র) এর দলীল ঃ

عن معقل الاسدى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ببول او غائط (ابوداود ج اص ٣ بخارى ج اص ٢٦ باب تبرز على لبنتين ابن ماجه ص ٢٧)

অর্থাৎ মা'কাল ইবনে আবী মা'কাল আল আসাদী থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) আমাদেরকে উভয় কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। উল্লেখিত হাদীসে যেহেতু উভয় কেবলার কথা বলা হয়েছে। তাই উভয় ক্ষেত্রেই হারাম হবে।

আবু আওয়ানা (র) এর দলীল ঃ তাঁর দলীল হচ্ছে রাসূল (স) এর বাণী– ولكن شرقوا او غربوا

এই সম্বোধন সাধারণভাবে সবার জন্য নয়, বরং শুধুই মদীনাবাসীদের জন্য। কেননা, মদীনাবাসীদের কেবলা ছিল দক্ষিণ দিকে। কাজেই পেশাব পায়খানার সময় তাঁদের পূর্ব পশ্চিমমুখী হয়ে বসতে হবে।

আবু হানীফা (র) এর দলীল ঃ

আবু হানীফা (র) এর প্রথম দলীল হলো আবু আইউব আনসারী (র) থেকে বর্ণিত হাদীস।

اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ـ (بخارى ج اص ٢٦ ترمذى ج اص ١٠-١١ ابن ماجة ٢٧)

এ হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে এ অধ্যায়ের মধ্যে বিশুদ্ধতম। এর দ্বারা হানাফীগণ এবং প্রথম মাযহাবের সমস্ত উলামায়ে কেরাম আমভাবে নিষিদ্ধতার উপর প্রমাণ পেশ করেন। কারণ এতে ময়দানে ও ঘরের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ এ হাদীস দ্বারা যখন কেবলাকে সামনে রেখে মল-মূত্র ত্যাগ করা নিষেধ প্রতীয়মান হলো, তাহলে কেবলাকে পেছনে রাখা, সামনে রাখার চেয়ে আরও অধিক গর্হিত কাজ হবে। তাই উভয়টাই নিষিদ্ধ।

২য় দলীল ঃ

رُوِىَ عَنْ سلمانَ الفارسِىِّ قال نَهَانَا رسولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغائطٍ اَوْبَوْلٍ

অর্থাৎ সালমান ফারেসী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে কেবলার দিকে মুখ করে পায়খানা-পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

৩য় দলীল ঃ

عنْ ابى هريرةَ (رض) مرفوعًا اِنَّما اَنا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الوالدِ اُعَلِّمُكُمْ فَاِذا اَتى اَحَدُكُمُ الْغائطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ولا يَسْتَدْبِرُها (ابو داود ج اص ١٦، ابن ماجة ٢٧)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স) এর ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের পিতৃতুল্য, আমি তোমাদেরকে দ্বীনের বিষয়সমূহ শিক্ষা দিয়ে থাকি। অতএব, তোমাদেরকে কারো যখন পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন হয়। কেউ যেন কেবলাকে সম্মুখে ও পেছনে রেখে না বসে। অত্র হাদীসে সুস্পষ্টভাবে মল-মূত্র ত্যাগের সময় কেবলাকে সামনে ও পেছনে রাখতে নিষেধ করেছেন। (দরসে তিরমিযী পৃষ্ঠা নং ১৮৫-১৮৭)

৪নং দলীল ঃ

عَنْ مَعْقَل بن اَبِىْ مَعْقَل الاَسَدِىِّ قال نَهى رسولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلّم اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ وغائِطٍ.

অর্থাৎ হযরত মা'কাল ইবনে আবু মা'কাল আসাদী (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (স) পেশাব পায়খানা কালে কেবলাদ্বয়ের দিকে মুখ করে বসতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ খণ্ড নং ১ পৃষ্ঠা নং ৩)

৫ নং দলীল ঃ

عنْ عَبْدِ اللّٰه بن حارثِ بْنِ جزءٍ عَنِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم قالَ لايَبُوْلَنَّ احدُكم مُسْتقبلَ القِبلةِ.

নবী (স) বলেন, তোমরা কেবলার দিকে ফিরে পেশাব কর না। এ সকল সহীহ ও মারফু রেওয়ায়েত কিবলার দিকে মুখ ও পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করাকে অবৈধ সাব্যস্ত করে এবং এক্ষেত্রে ঘর ও ময়দানের কোন পার্থক্য নেই।

আহনাফেদের পক্ষ হতে প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

আহলে যাহেরীদের দলীলের জবাব ঃ তারা জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, সেটি দ্বীয়ীফ। কেননা, উক্ত হাদীসের সনদে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এবং আবান ইবনে সালেহ নামক দু'জন রাবী আছেন যারা উন্নত নন। (অর্থাৎ তারা সমালোচিত।)

আর হানাফীদের পক্ষে প্রদত্ত আবু আইউব আনসারীর হাদীসটি এর চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। কেউ কেউ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাককে মিথ্যুক এবং দাজ্জাল বলতেও দ্বিধাবোধ করেননি। অতএব, যার সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করা হয়েছে তার হাদীস মারফু হাদীসের মুকাবেলায় গ্রহণযোগ্য হয় কিভাবে? সুতরাং কেবলার দিকের নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীসকে দুর্বল হাদীস দ্বারা রহিত করার দাবী অযৌক্তিক। কেননা কেবলাকে এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো বিশুদ্ধ। তাই দুর্বল হাদীস দ্বারা সহীহ হাদীসকে রহিত করা যাবে না। আর যদি আমরা তাদের হাদীসদ্বয়কে বিশুদ্ধও মেনে নেই তাহলে আমরা বলব যে, রাসূল (স) ওযরের কারণে কিবলামুখী হয়ে ইস্তেঞ্জা করেছেন। অথবা রাসূল (স) এর জন্য এটা খাস ছিল। কেননা, নাপাকী পশ্চিম দিকে নিক্ষেপ করা মাকরূহ। আর রাসূল (স) এর পেশাব পায়খানা কোনটি নাপাক নয়। এটা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই হুজুর (স) এর কেবলামুখী হয়ে ইস্তেঞ্জা করা তার জন্য মাকরূহ নয়। তাছাড়া ইবনে হাজার আসকালানী বলেন এটা হয়ত ঘটনাচক্রে কোন এক সময় সংঘটিত হয়েও থাকতে পারে কিন্তু এটা নবী (স) এর সাধারণ আমল ছিল না।

হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জবাব

উক্ত হাদীসের সনদের ব্যাপারে বিভিন্নরূপ মন্তব্য রয়েছে। কেননা, তার বর্ণনাকারী হলেন খালিদ ইবনে আবু সালদা তিনি মুনকার এবং মাজহুল, তথা সনদে তার নাম উল্লেখ নেই। এছাড়াও খালেদ নামক রাবী সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র) বলেন, তিনি মুনকাতে। কেননা, খালেদ عراك থেকে শোনেননি। আর عراك ও হযরত আয়েশা (রা) হতে এ হাদীসটি শোনেননি। কাজেই হাদীসটি সহীহ নয়। আর যদি বলা হয় যে, এ হাদীস বিশুদ্ধ তাহলে আমরা (হানাফীগণ) বলব– বসার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নিতম্বকে পশ্চিম দিকে রেখে বসা। হুজুর (স) এর স্বাভাবিক অবস্থা ছিল। পেশাব পায়খানার ক্ষেত্রে নয়। হুযুর (স) বলেন, এ ক্ষেত্রে কিছু সম্প্রদায় বাড়াবাড়ি করেছে। এমনকি তারা কেবলাকে সামনে রেখে খাওয়া ও নিদ্রা যাওয়াকেও মাকরূহ মনে করে থাকে। তাই আমি তাদের বাড়াবাড়িকে খণ্ডন করার জন্যে কেবলাকে পেছনে রেখেছি।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র) এর দলীলের জবাব

১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালেক ও আবু ইউসুফ (র) কেবলাকে পেছনে রেখে ইস্তেঞ্জা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ইবনে ওমর (র) এর যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন তা আমাদের বর্ণিত রেওয়ায়েত সমূহের বিপরীতে দলীল হতে পারে না। কেননা, ইবনে উমর (রা) হুজুর (স) এর শরীরের উপরাংশ দেখেছেন। উপরের অংশের ভিত্তিতে তিনি অনুমান করেছেন যে, রাসূল (স) কেবলাকে সম্মুখে রেখে ইস্তেঞ্জা করেছেন অথচ কথাটি সন্দেহজনক। আর সন্দেহজনক কথা দ্বারা ইয়াকীনী কথাকে রদ করা যায় না। তাই আমরা হানাফীগণ বলি যে, উক্ত হাদীস দলীল হওয়ার যোগ্য নয়।

২. ইমাম ত্বহাবী (র) বলেন, ইবনে উমর (রা) হুজুর (স) এর মাথা মুবারক দেখেছেন। তিনি রাসূল (স) এর নিম্নাংশ দেখেননি, আর যেহেতু কেবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে ইস্তেঞ্জা করাটা নিম্নাঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই উক্ত হাদীস দ্বারা কেবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে ইস্তেঞ্জা করা জায়েয হওয়ার স্বপক্ষে দলীল হতে পারে না।

৩. একথা তো স্পষ্ট যে, ইবনে উমর (রা) এর দেখাটা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে, ইচ্ছা করে তিনি দেখেননি। আচমকা দেখে তার নজরকে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং এতে ভুল দেখারও সম্ভাবনা রয়েছে। এমনও হতে পারে যে, তিনি দেখেছেন কিবলার দিকে পিঠ করে বসা অবস্থায়, আর বাস্তবে এর বিপরীত ছিল।

৪. তিনি পুরোপুরিভাবে পিঠ দেননি। বরং কাবা থেকে সামান্য সরে গিয়েছিলেন। হযরত ইবনে উমর (রা) দূর থেকে এ সাধারণ সরে যাওয়ার বিষয়টি অনুভব করতে পারেননি।

৫. আর যদি আমরা মেনেও নিই যে, হুজুর (স) কিবলাকে পিছনে রেখে ইস্তেঞ্জা করেছেন তাহলে আমরা বলব যে, এটি হুজুর (স) এর জন্য খাছ ছিল। এর প্রবক্তা হলেন আল্লামা শামী ও ইবনে হাজার আসকালানী (র)। তাঁরা বলেন রাসূল (স) এর মল-মূত্র পবিত্র।

৬. এখন বাকী রইল ইবনে উমর (রা) এর হাদীস যে, তিনি সওয়ারিকে কেবলার দিকে মুখ করে বসিয়ে কেবলার দিকে ফিরে ইস্তেঞ্জা করেছেন। এর জবাব হচ্ছে এ হাদীসটি মাউকুফ অর্থাৎ এ হাদীসটির বর্ণনায় বর্ণনাকারীই সর্বশেষ ব্যক্তি। তার পরে এর সনদ হুজুর (স) পর্যন্ত পৌছেনি। ফলে এ হাদীসটি হাদীসে মারফু এর বিপক্ষে দলীল হতে পারে না। এ ছাড়াও এ হাদীসের এক রাবীকে অধিকাংশ উলামা দুর্বল হিসাবে গণ্য করেছেন। আব্দুর রহমান মাহদী বলেন, এই হাদীস দলীল হতে পারে না। ইবনে মুঈন (র) বলেন, তিনি মুনকারুল হাদীস। এ ছাড়াও ইবনে উমরের হাদীসটিতে সূক্ষ্ম দোষ রয়েছে। আর যদি তিনি কাজটি করেই থাকেন তাহলে তো ময়দানে কেবলাকে সামনে রেখে ইস্তেঞ্জা করা বৈধ হয়ে যাবে। কেননা, সেখানে অনেক গাছ-গাছালী এবং পাহাড়ও ছিল যা তার মাঝে ও কাবার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং ইবনে উমরের উক্ত কাজ দ্বারা দলীল দেওয়া যায় না।

৭. মারওয়ান আসফার থেকে বর্ণিত ইবনে উমরের হাদীসের অর্থ হলো এটি ইবনে উমর (রা) এর নিজস্ব

আমল ও ইজতিহাদ। মারফু হাদীসগুলোতে এ পার্থক্যের কোন ভিত্তি বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া সাহাবীদের ইজতেহাদ প্রমাণ নয়। বিশেষতঃ যখন এর বিপরীতে অন্যান্য সাহাবীর আছার বিদ্যমান থাকে, আর এখানে তা রয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র) এর দলীলের জবাব

১. মা'কাল ইবনে মা'কালের হাদীসে আবু যায়েদ নামক একজন রাবী রয়েছেন যার ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, তিনি অজ্ঞাত।

২. বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে মল-মূত্র ত্যাগ করার হুকুম মাকরূহে তানযীহী। বায়তুল্লাহর মত হারাম নয়।

৩. এ হুকুম তখন দেয়া হয়েছিল। যখন বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের কিবলা ছিল। অতঃপর কিবলার হুকুম মানসূখ হয়ে গেলে নিষেধের হুকুম ও মানসূখ হযে যায়।

৪. তাছাড়া বায়তুল মুকাদ্দাস উত্তর দিকে এবং কা'বা শরীফ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। অতএব যদি মদীনা শরীফে ও বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করা বা পিঠ ফিরানোর অনুমতি দেয়া হত, তাহলে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করা বা পিঠ ফিরানো আবশ্যক হত। আর আসল উদ্দেশ্য এটাই।

আবু আওয়ানা (র) এর দলীলের জবাব

যেহেতু উক্ত সম্বোধন সরাসরি মদীনাবাসীদেরকে করেছিলেন। তাই তিনি وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا অর্থাৎ বরং তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে পেশাব পায়খানা করবে। নতুবা শরীয়তের হুকুম তো বিশ্ববাসীর জন্য। কারণ তিনি ছিলেন বিশ্বনবী, সমস্ত উম্মতের নবী। তাছাড়া এর উদ্দেশ্য যেহেতু কা'বা শরীফকে সম্মান দেখানো। সুতরাং এটা মদীনাবাসীসহ বিশ্বের প্রত্যেকটি মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। চাই সে চার দেয়ালের ভিতরে হোক বা খোলা ময়দানে হোক, চাই সে এশিয়া মহাদেশে থাকুক অথবা আফ্রিকায় থাকুক। (দরসে মেশকাত ১/ ১৪৯-১৫০)

سوال : بَيِّنْ وجُوْهَ ترجيحِ مَذْهَبِكَ واضِحًا.

প্রশ্ন ঃ তোমার মাযহাব অগ্রগণ্য হওয়ার কারণগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ হানাফী মাযহাব প্রাধান্য হওয়ার কারণসমূহ ঃ

১. আবু হানীফা (র) এর দলীলগুলো হচ্ছে হারাম হওয়ার ব্যাপারে। আর বিপক্ষদের দলীলগুলো হচ্ছে হালাল হওয়ার ব্যাপারে। আর এমন تعارض এর ক্ষেত্রে নাজায়েয এর দিকটি প্রাধান্য পায়।

২. আবু হানীফা (র) যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন সবগুলো হাদীস মারফূ" এবং তার দাবীর স্বপক্ষে স্পষ্ট দালালত করে। পক্ষান্তরে এর পরিপন্থী হাদীসগুলোতে বিভিন্ন ধরণের সম্ভাবনা রয়েছে। যার কারণ সেগুলো তাদের মতের পক্ষে স্পষ্টভাবে প্রমাণবহন করে না।

৩. আবু হানীফা (র) এর রেওয়ায়েতকৃত হাদীসগুলো হচ্ছে পরিপূর্ণ ও ব্যাপকতাবোধক এবং কওলী। পক্ষান্তরে বিপক্ষের হাদীসগুলো হচ্ছে فِعلى - আর قَولى হাদীস فِعلى হাদীসের উপর প্রাধান্য পায়। কাজেই এখানেও এটা প্রাধান্য পাবে।

৪. আবু হানীফা (র) এর মতের সাথে অধিকাংশ ছালাফে সালিহীন একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। যেমন ইবনুল আরাবী বলেন, নিশ্চয় আবু হানীফার কথাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।ইবনুল কাইয়ুম বলেন আবু হানীফার মতটিই অধিক প্রাধান্য প্রাপ্ত।

৫. আহনাফের মতটি কুরআনের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন আল্লাহর বাণী–

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ.

যে আল্লাহ তাআলার নির্দেশনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তা তার আত্মিক পরহেযগারিতার পরিচায়ক।

سوال : قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور إنما أنا لكم بمنزلة الوالد واخرج الامام احمد في مسنده عن النبي صلى الله وسلم قال أعبدوا ربكم واكرموا أخاكم وحديثان متعارضان فما جوابكم.

প্রশ্ন ঃ উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ের একটি দ্বারা আল্লাহর রাসূল (স) উম্মতের পিতা ও অন্যটি দ্বারা তিনি বড় ভ্রাতা হওয়া প্রতীয়মান হয়। আর একইজন উম্মতের পিতাও হবেন, আবার ভ্রাতাও হবেন তা হতে পারে না। অতএব এ দ্বন্দ্বের সমাধান দাও।

উত্তর ঃ প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যত تعارض বা দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। কারণ প্রথম হাদীসে রাসূল (স) নিজেকে উম্মতের পিতা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় হাদীসে واكرموا أخاكم এর দ্বারা রাসূল (স) নিজেকে উম্মতের ভ্রাতা বলে প্রকাশ করেছেন। এ দ্বন্দ্বের উত্তর নিম্নে প্রদান করা হলো–

১. রাসূলে করীম (স) প্রকৃতপক্ষে উম্মতের প্রকৃত পিতা বা ভ্রাতা নন। যেমন এরশাদ হয়েছে–

ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين

আয়াতে যে, মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন, তিনি তো আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। বস্তুত হাদীসদ্বয়ের মূল উদ্দেশ্য এ কথা বুঝানো যে, তিনি সবার পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। সাধারণত মানুষ স্বীয় পিতা বা বড় ভ্রাতাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে থাকে, তাদের সামান্যতম বে-আদবী ও আদেশ লঙ্ঘনকে সমাজে অপরিসীম অপরাধ ও অন্যায় বিবেচিত হয়ে থাকে। আর এ পিছনে বিশেষ কারণ হলো সন্তানের উপর পিতার কিংবা পিতার অবর্তমানে ছোট ভায়ের উপর বড় ভায়ের অকৃতিম ভালবাসা, স্নেহ ও দয়া এবং অপ্রতুল অনুগ্রহ থাকে। পিতা বা বড় ভ্রাতা নিজ আরাম আয়েস, সুখ শান্তি বর্জন করে সন্তান কিংবা ছোট ভাইদের সুখ-শান্তি ও আরাম আয়েসের চিন্তা ফিকিরে নিয়োজিত থাকে। তাদের শান্তিতে তারা শান্তি পায়, আর তাদের অশান্তিতে তারা চরম ব্যথিত ও ক্লিষ্ট হয়। এ বিচারে লক্ষ্য করলে মহানবী (স) এর স্বীয় উম্মতের প্রতি যে অবর্ণনীয় ভালবাসা, দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উম্মতের চিন্তাই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। উম্মতের দরদে দরদী হয়ে কতই না কষ্ট-ক্লেশ তিনি সংবরন করেছেন। কতই না নির্যাতন ভোগ করেছেন! যারা তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য ছিল সদা উদগ্রীব, তাঁকে শহীদ করে দেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করতে কসূর করে নি যারা কখনো, অথচ তাদেরই জন্য তিনি দোয়া করেছেন- হে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তারা আমাকে চিনেনি!

মোটকথা উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের উদ্দেশ্য যেহেতু প্রকৃত পিতা বা ভ্রাতা হওয়া নয় রবং পরম শদ্ধা ও মাননীয় বরনীয় হওয়াই উদ্দেশ্য। কাজেই এ বিচারে হাদীসদ্বয়েরে মধ্যে কোন تعارض বা সাংঘর্ষিকতা থাকল না।

২. খোদ প্রথম হাদীসের শব্দ أنا لكم بمنزلة الوالد এ কথার প্রতি লক্ষ্য করলেও কোন সাংঘর্ষিকতা পাওয়া যায় না। কেননা এতে তিনি উম্মতের জন্য পিতার পর্যায়ে বলা হয়েছে। তিনি প্রকৃত পিতা এ কথা বলা হয় নি।

سوال : قوله فننحرف عنها ونستغفر الله إلى مايرجع الضمير في عنها وما وجه الإستغفار؟

প্রশ্ন ঃ বাক্যের মাঝে عنها এর যমীর কোন দিকে ফিরেছে এবং ইস্তেগফারের কারণ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ আলোচ্য ইবারতে عنها এর যমীর কেবলার দিকে ফিরেছে অর্থাৎ আমরা ইস্তেঞ্জা করতাম ঐ সকল পায়খানাগুলোতে কিন্তু সেগুলোতে আমরা কেবলার দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে বসতাম। তবে পরিপূর্ণভাবে চেহারা ফিরানো সম্ভব হতো না। ফলে আমরা এস্তেগফার করতাম। কেউ কেউ বলেছেন عنها এর যমীরটি المراحيض। এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ সে সব কেবলার দিকে করে তৈরী পায়খানাগুলো থেকে আমরা বিরত থাকতাম। এগুলোর পরিবর্তে অন্যত্র মল-মূত্র ত্যাগ করতাম এবং এগুলো নির্মাতার জন্য এস্তেগফার করতাম। কেউ কেউ বলেছেন হাদীসের অর্থ হলো আমরা শুরুতে এ সব পায়খানাগুলোতে ইস্তেঞ্জা করতাম। তখন আমরা জানতাম না যে, এগুলো কেবলার দিক করে বানানো হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন অবগত হলোম তখন মুখ পরিবর্তন করে বসতাম এবং প্রথম দিকে যে, কেবলামুখী হয়ে বসতাম এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।

سوال : لِمَا صَنَعَ ابو ايوبَ وغيرُهمْ فِى قضاءِ حَاجتهم بِهٰذِهِ الكَرَابِيْسِ؟

প্রশ্ন ঃ হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) এবং অন্যরা ইস্তিঞ্জা করার জন্যে এ ধরণের বাথরুম কেন নির্মাণ করে ছিলেন?

উত্তর ঃ এ ধরনের বাথরুম তৈরী করার কারণ ঃ

রাসূল (স) মদীনায় গমনের পর সালাত আদায়ের জন্যে বাইতুল্লাহ তথা কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না। বরং তখন মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। তখন কেবলা ছিল উত্তর দিকে। মক্কা থেকে উত্তর দিকে কেবলা অবস্থিত বিধায় তারা তাদের পেশাব-পায়খানার জন্যে সেভাবে দিক নির্ণয় করেছিলেন। অর্থাৎ কাবার দিকটা ততো চিন্তা করেননি। কিন্তু কেবলা পরিবর্তনের পর কা'বা শরীফ যথাযথ মর্যাদায় অভিষিক্ত হলো। অন্য দিকে রাসূল (স) কা'বা শরীফকে মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্যে নির্দেশ দান করেন। ফলে তারা নির্দেশ পাওয়ার পর সেটি পালনের জন্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সুতরাং বিলামুখী বা কেবলাকে পশ্চাতে রেখে যে বাথরুম তৈরী করা হয়েছিল তা রাসূল (সা.) এর আদেশের পূর্বে ছিল। পরে তারা তা পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

سوال : بَيِّنْ وجهَ المَنْعِ عَنْ اِسْتِقبالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبارِها عندَ قضاءِ الحَاجَةِ.

প্রশ্ন ঃ মল-মূত্র ত্যাগ কালে কেবলাকে সামনে ও পেছনে রাখতে নিষেধের কারণ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মল-মূত্র ত্যাগকালে কেবলাকে সামনে ও পেছনে রাখতে নিষেধের কারণ ঃ রাসূল (স) কেবলাকে পায়খানা ও পেশাবের সময় সামনে ও পেছনে রাখতে নিষেধ করেছেন। যেমন-

لاَتَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ ولاَ تَسْتَدْبِرُوْهُ এ নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো-

১. কা'বা হলো ইসলামের অন্যতম شعار. কাজেই তাকে সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য। যেমন, কুরআনের বাণী- وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوى القُلُوْبِ

২. এ ঘর আল্লাহর ইবাদতের জন্যে নির্মিত পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম ঘর। তাই মল-মূত্র ত্যাগের সময় একে সামনে পিছনে রাখলে তার অবমাননা হয়। অন্য দিকে তা হলো হিদায়াতের কেন্দ্রস্থল এবং মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আ) কর্তৃক নির্মিত। এ জন্যে তাকে সামনে ও পেছনে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

৪. আল্লাহ তাআলার বাণী- جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ ... الخ

এখানে কা'বাকে বাইতুল হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা সুগরা সাব্যস্ত হলো, এর কুবরা হলো আল্লাহ তাআলার বাণী-

١. وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ .... الخ

٢. وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ ...... الخ

এ আয়াতদ্বয়ের দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, কা'বাকে সম্মান করা আবশ্যক।এ ব্যাপারে রাসূল (স) এর বাণী-

١. مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ القِبلَةِ جاءَ يومَ القِيٰمَةِ وَتَفَلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

আলোচ্য হাদীসে কেবলার দিকে থুথু ফেলার ক্ষেত্রে এ ধমকি বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কেবলার দিকে থুথু ফেলবে কিয়ামতের দিন থুথুর ঐ অংশ তার ললাটে রেখে দেয়া হবে। এর দ্বারাও কা'বার মর্যাদা বুঝা যায়।

٢. حَقٌّ عَلى كلِّ مسلمٍ ان يُكرِمَ قبلةَ اللّٰهِ .... الخ

প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তাআলার কেবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক।

سوال : ما حكمُ بَسْطِ الرِّجْلَيْنِ الى القِبلةِ والإسْتِدبارِ اليها فِى القِيامِ والقُعُودِ؟

প্রশ্ন ঃ কেবলার প্রতি পা সম্প্রসারণ করা ও তার দিকে পিছ ফিরিয়ে বসার বিধান কি? বর্ণনা কর

উত্তর ঃ কেবলার দিকে পা প্রসারিত করার বিধান ঃ দাঁড়ানো বা বসা অবস্থায় যে কোন সময় পদদ্বয়কে কেবলার দিকে প্রসারিত করা অথবা কেবলার পশ্চাৎদিকে প্রসারিত করা প্রসংগে উলামায়ে কিরামের মতামতসমূহ নিম্নরূপ–

প্রথমতঃ দাঁড়ানো অবস্থায় বা বসা অবস্থায় কেবলার দিকে পা প্রসারিত করার বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সালাতের সময় পা কেবলামুখী হয়ে থাকবে যাতে ব্যক্তির সমস্ত দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেবলামুখী হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। তবে সাধারণ অবস্থায় পদদ্বয়কে কেবলার দিকে প্রসারিত করার বিধান সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. **জুমহুর উলামার অভিমত ঃ** অধিকাংশ আলিমের মতে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির পক্ষে কেবলার দিকে পদদ্বয়কে প্রসারিত বা ছড়িয়ে দেয়া ঠিক নয়।

২. **কতক আলিমের অভিমত ঃ** কতিপয় আলিমের মতে শুধু মসজিদে এমন করা যাবে না, অন্যান্য সময় এমন করা বৈধ।

তাদের দলীল ঃ তাদের দলীল এই যে, এরূপ বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করলে দুনিয়ার কার্যাদি পালন করা কষ্টকর হয়ে যাবে। অথচ হাদীসের বাণী রয়েছে– الدين يسر لاعسر فيه.

জুমহুর উলামার দলীল ঃ তাদের দলীল হচ্ছে পায়খানার সময় কেবলাকে সামনে বা পেছনে রাখা যেমন নিষিদ্ধ তেমন অন্যান্য সময় কেবলার দিকে পা ছড়িয়ে দেয়া বৈধ নয়।

عن ابى هُرَيرةَ رض قالَ قالَ النبىُّ صلَّى اللّٰه عليه وسلّم إذا أتيتُمُ الغَائِطَ فَلا تَستَقبِلُوا القِبلَةَ ولا تَستَدبِرُوهَا.

যখন তোমরা শৌচাগারে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করবে না।

٢- عَنْ سلمانَ (رض) قال نهانا رسولُ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليه وسلّم أنْ تَستَقبِلَ القِبلَةَ بِغائطٍ او بَولٍ.

হযরত সালমান ফারেসী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসূল (স) কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। এগুলো যেহেতু নিষিদ্ধ কাজেই ঐ দিকে পা ছড়িয়ে দেওয়াও নিষিদ্ধ হবে।

سوال : حديثُ سلمانَ فارسىّ (رض) مُعارِضٌ لِحَديثِ ابنِ عُمَرَ (رض) فكيفَ التّوفيقُ بينَهُما.

প্রশ্ন ঃ সালমান ফারেসী (রা.) এর হাদীস ও ইবনে উমর (রা) এর হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। এ দুটির মধ্যকার বৈপরীত্বের সমাধান কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ দুই হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্বে সমাধান ঃ হযরত সালমান ফারেসী (রা) এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ইস্তেঞ্জার সময় কেবলা দিকে মুখ ও পিঠ দেয়া হারাম। আর ইবনে উমরের হাদীস দ্বারা বুঝা যায় রাসূল (স) নিজেই কেবলাকে পেছনে রেখে প্রকৃতির কাজ সেরেছেন। যার দ্বারা استقبال ও استدبار বৈধ মনে হয়। ইবনে হাজার আসকালানী ও আল্লামা আইনী (র) এর সমাধান নিম্নরূপ ভাবে প্রদান করেছেন–

১. ইবনে উমরের হাদীসটি نهى এর আগের।

২. অথবা ইবনে উমরের হাদীস আবু আইউব আনছারীর হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

৩. উসূলে ফিকহর এর নিয়ম হচ্ছে– إذا تَعارضَ المُحَرِّمُ والمُبِيحُ يُتَرجَّحُ المُحَرِّمُ فَحَديثُ سلمانَ راجِحٌ

যখন হালাল ও হারামের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায় তখন হারাম হালালের উপর অগ্রগামী হয়। সুতরাং এখানে সালমান ফারেসীর হাদীস প্রাধান্য পাবে।

৪. হযরত সালমান ফারেসী (রা.) এর হাদীসটি قولى আর ইবনে উমরের হাদীসটি فعلى, আর এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো- وَاذا تَعَارض القَولِيُّ والفِعْلِيُّ فالقَولِيُّ راجِحٌ.

অর্থাৎ قولى হাদীস এবং فعلى হাদীসের মধ্যে যদি বৈপরীত্ব দেখা দেয় তাহলে সে ক্ষেত্রে قولى হাদীস فعلى হাদীসের উপর প্রাধান্য পায় ঠিক, তদ্রূপ এখানেও প্রাধান্য পাবে।

৫. ইবনে উমর ভালো করে দেখতে পারেননি রাসূল (স) কিভাবে হাযত পূর্ণ করেছেন।

৬. এটা রাসূল (স) এর সাথে খাস।

سوال : لِما قالَ رسولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلّم شَرِّقُوا اَوْ غَرِّبُوا؟ اوضح.

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) এর شَرِّقُوا اَوْ غَرِّبُوا **বলার কারণ কি? ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর ঃ রাসূল (স) এর شرقوا او غربوا **বলার কারণ ঃ** তোমরা কেবলাকে সামনে ও পেছনে রেখো না বরং পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ করে মল-মূত্র ত্যাগ কর। মদীনাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে রাসূল (স) এর এটা বলার কারণ হলো মক্কা নগরী মদীনার দক্ষিণে অবস্থিত। তাদের জন্য উত্তরে কিংবা দক্ষিণ দিকে মল ত্যাগ করা ঠিক নয়। বরং পূর্ব পশ্চিমে মল ত্যাগ করা যথার্থ হবে। কারণ এক্ষেত্রে استقبال ও استدبار হয় না। পক্ষান্তরে আমরা যেহেতু মক্কার পূর্বে অবস্থান করছি। সেহেতু আমাদের জন্য شرقوا او غربوا এর বিধান প্রযোজ্য হবে না। কারণ এটা করলে استقبال ও استدبار হয়ে যায়। কাজেই আমাদের জন্য جنبوا او شملوا এর নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। যার কেবলা যে দিক হবে সে ঐ হিসাবে استقبال ও استدبار করা থেকে ইস্তেঞ্জার সময় বিরত থাকবে।

سوال : كيفَ رَأى الرّاوى الرسولَ صلّى اللّٰهُ عليه وسلّم عندَ قضاءِ الحَاجةِ وهُوَ مُنَافٍ لِلسَّتْرِ؟ فَما هُوَ الجواب؟

প্রশ্ন ঃ বর্ণনাকারী কিভাবে রাসূল (স) কে ইস্তিঞ্জার সময় দেখেছিলেন। অথচ এটা সতরের পরীপন্থী? এর সঠিক জবাব কি?

উত্তর ঃ ইবনে উমর (রা) বলেন আমি রাসূল (স) কে কাঁচা ইটের উপর বসা দেখেছি? অথচ এটাতো সতরের পরিপন্থী। এর উত্তর নিম্নরূপ-

১. রাসূল (স) তখন পায়খানা করতে বসেননি। বরং পেশাব করতে বসেছেন। পেশাব করার সময় সামনের দিকে ঢেকে রাখা আবশ্যক। আর রাসূল (স)ও তাই করেছেন। ইবনে উমর (রা) রাসূল (স) কে পেছন থেকে দেখেছেন। তাই এটা সতরের বিপরীত হয়নি।

২. অথবা বলা যায় বর্ণনাকারী ছাদের উপর উঠার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে দেখে ফেলেছেন।

৩. কাযী আয়ায (র.) বলেন, হযরত ইবনে উমর (রা) রাসূল (স) এর অধিক অনুসারী ছিলেন। রাসূল (স) কিভাবে হাজত পূরণ করেন, তা দেখে আমল করার জন্যে লক্ষ্য করেছেন।

سوال : لم مُنِعَ استقبالَ القِبْلةِ واستِدْبارِها عندَ قضاءِ الحَاجَةِ؟

প্রশ্ন ঃ ইস্তিঞ্জার সময় কেবলাকে সামনে অথবা পেছনে রাখতে নিষেধ করার কারণ কি?

উত্তর ঃ শৌচকার্যের সময় কেবলাকে সামনে বা পেছনে রাখতে নিষেধ করার কারণ ঃ পেশাব ও পায়খানা করার সময় কেবলাকে সামনে অথবা পেছনে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন রাসূল (স) এর বাণী-

لَاتَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَاتَسْتَدْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْغَرِّبُوْا

এর কারণ নিম্নরূপ-

১. কা'বা ইসলামের অন্যতম شعار , মানবিক প্রয়োজন পূরণ করার সময় তাকে সামনে বা পেছনে রাখলে তার অবমাননা হয়। অথচ شعار اسلام কে সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য। যেমন আল কুরআনের বাণী-

١. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا.

সারা বিশ্বের মানুষের ইবাদতের জন্য আল্লাহ তাআলা সর্ব প্রথম মক্কায় বরকতময় এই গৃহকে নির্মাণ করেন।

٢. وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ.

যে আল্লাহ তাআলার شعائر কে সম্মান করে তার এ সম্মান করাটা অন্তরের তাকওয়ার পরিচায়ক।

٣. وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ.

২. দ্বিতীয়তঃ এ ঘরটি সর্বপ্রথম আল্লাহর ইবাদতের জন্যে তৈরী করা হয়েছে।

এ ঘরকে সামনে রেখে সারা বিশ্বের মুসলমানগণ নামায আদায় করে থাকে এবং তথায় সমবেত হয়ে হজ্জ কার্য সম্পাদন করে থাকে। তাই একে সম্মান করা ঈমানের অনিবার্য দাবী। এজন্য পায়খানা ও প্রস্রাব করার সময় কেবলাকে সামনে বা পেছনে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

৩. তৃতীয়তঃ কা'বা যেহেতু হিদায়াতের কেন্দ্রবিন্দু, সেহেতু পায়খানা ও পেশাবের সময় استقبال ও استدبار করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৪. কোন কারণ ব্যতীতই শুধু কা'বার সম্মানার্থে সম্মান প্রদর্শনের জন্যে এ নিষেধ করাটা বিধিসম্মত। কেননা, আমরা দুনিয়ায় অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের ব্যাপারেও আরো সতর্কতা অবলম্বন করি। আর বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘর বাইতুল্লাহর সম্মানের জন্যে সে দিকে ফিরে পেশাব -পায়খানা না করাই উত্তম।

سوال : هل يجوز رَدُّ السَّلَامِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ.

প্রশ্ন ঃ ইস্তিঞ্জার সময় সালামের জবাব দেয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের সময় সালামের জবাব দেয়ার বিধান ঃ

প্রাকৃতিক প্রয়োজন যেমন- পায়খানা-পেশাব করার সময় সালাম দেয়া ও তার জবাব প্রদান করা কোনটাই বৈধ নয়। যেমন- হাদীসে আছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قال مَرَّ رجلٌ عَلَى النبيِّ وهُوَ يبولُ فسَلَّمَ عليه فلم يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

অর্থাৎ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (স) এর নিকট দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রম করছিল এমতাবস্থায় যে, নবী (স) পেশাব করছিলেন। লোকটি নবীকে সালাম দিল কিন্তু নবী (স) তার কোন উত্তর দিলেন না। এর দ্বারা বুঝা যায় যে পেশাব করা অবস্থায় সালাম দেয়া যাবে না। তবে কেউ যদি قضاء حاجة এর সময় সালাম দেয় তাহলে হাজত শেষ করে সালামের জবাব প্রদান করবে। এ ব্যাপারে রাসূলের হাদীস রয়েছে-

عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ اَنَّهٗ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه وسلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فلم يَرُدَّ حَتّٰى تَوَضَّأَ. فلمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ (نسائى)

অর্থাৎ মুহাজির ইবনে কুনফুয হতে বর্ণিত তিনি নবী (স) কে প্রস্রাব করা অবস্থায় সালাম দিলেন, কিন্তু নবী (স) তার সালামের জবাব প্রদান করলেন না। অতঃপর তিনি উযূ করে তার সালামের জবাব দিলেন। ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, ইস্তেঞ্জার সময় সালাম বা তার জবাব প্রদান কোনটাই জায়েয নেই। বরং তা আদবের খেলাফ। আবার কেউ কেউ বলেন সালামের উত্তর দেয়া যেহেতু ওয়াজিব সেহেতু তা রাসূল (স) এর জন্যে জায়েয।

দলীল ঃ

عن عائشة (رض) قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل احيانه.

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) সব সময় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করতেন। এর দ্বারা বুঝা যায় রাসূল (স) এর জন্য এটা জায়েয।

سوال : أذكر اسم أبي أيوب الأنصاري ثم اكتب نبذا من سيرته.

প্রশ্ন ঃ আবু আইয়ুব (রা) এর নাম কি? তার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখ।

উত্তর ঃ আইয়ুব আনসারী (রা) **এর জীবন পরিচিতিঃ** নাম খালিদ, উপনাম আবূ আইয়ূব। এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধতা লাভ করেন। পিতার নাম যায়েদ ইবনে কালিব, মায়ের নাম হিন্দ বিনতে সাঈদ। তিনি খাযরাজ গোত্রীয় লোক ছিলেন।

জন্ম ঃ হিজরতের ৩১ বছর পূর্বে মদীনার খাযরাজ গোত্রের নাজা বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম পূর্ব জীবন বৃত্তান্ত অজ্ঞাত।

বন্ধুত্ব স্থাপন ঃ রাসূল (স) এর মুহাজির সাহাবী মুসয়া'ব ইবনে উমায়েরের সাথে তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ তিনি ৬২১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম আকাবার কিছু দিন পর মদীনা থেকে মক্কায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (স) মদীনায় আগমন করে সর্ব প্রথম তার গৃহে অবস্থান করেন।

জিহাদে যোগদান ঃ তিনি রাসূল (স) এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বিদায় হজ্জের সময় তিনি রাসূল (স) এর সাথী ছিলেন। খিলাফতের দীর্ঘ ৩০ বছরে সংঘঠিত বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি বীরোচিত ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য হিজরী ২১ সালে মিসর অভিযানেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

সরকারি দায়িত্ব পালন ঃ হযরত আলী (রা) তাঁকে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। ৩৮ হিজরীতে খারেজী বিদ্রোহ দমনে নাহরাওয়ান অভিযানে তিনি হযরত আলী (রা) এর সাথে ছিলেন। সিফফীন ও উষ্ট্রের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন কি-না এর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

হাদীস শাস্ত্রে অবদান ঃ তিনি পবিত্র কুরআনের হাফেয ছিলেন। হাদীসের শিক্ষা ও প্রচারে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ঃ তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যায় মতভেদ রয়েছে যেমন জিলালুল কুলূব গ্রন্থকার বলেছেন ২১০টি, মুসনদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে ১৫৫টি। কারো মতে ১৫০টি, তন্মধ্যে متفق عليه হাদীস হলো ১৩টি অন্যমতে ৭টি।

যোগ্যতা ঃ হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল।

ইন্তিকাল ঃ রাসূল (স) যখন কন্সটান্সিনোপল বিজয়ের সুসংবাদ দেন। তখন থেকেই তাঁর কন্সটান্টিনোপল অভিযানে যাওয়ার বাসনা জাগে। অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সে তিনি এ অভিযানে যাত্রা করেন। অতঃপর হিজরী ৫১ মতান্তরে ৫২ সালে কন্সটান্টিনোপল অভিযানে অংশ গ্রহণকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী কন্সটান্টিনোপল এর প্রাচীর সংলগ্ন এক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

اَلْاَمْرُ بِاسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

٢٢. اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ اَبِى اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلٰكِنْ لِيُشَرِّقْ اَوْ لِيُغَرِّبْ -

الرُّخْصَةُ فِى ذٰلِكَ فِى الْبُيُوتِ

٢٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ اِرْتَقَيْتُ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَاَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ -

প্রয়োজনবোধে পায়খানা-পেশাবের সময় পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসার নির্দেশ

অনুবাদ ঃ ২২. ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)........আবু আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন (পায়খানার জন্য) ঢালু জমির দিকে যাবে তখন সে যেন কেবলামুখী হয়ে না বসে বরং সে যেন পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ করে বসে।

ঘরের মধ্যে কেবলামুখী হয়ে বসার অনুমতি

২৩. কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)........আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একদিন) আমাদের ঘরের ছাদে উঠেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে দু'টি ইটের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় দেখেছি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : قَالَ سَيِّدُنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ " ارْتَقَيْتُ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتِنَا " مُعَارِضٌ لِرِوَايَةٍ لَهُ اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ بِقَوْلِهِ " عَلٰى ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ: فَكَيْفَ التَّوْفِيقُ؟

প্রশ্ন ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন- আমি আমাদের বাড়ীর ছাদে উঠেছিলাম বর্ণনাটি ইমাম মুসলিমের বর্ণনার বিপরীত। কেননা, এতে বলা হয়েছে আমি হযরত হাফসা (রা) এর বাড়ীর ছাদে উঠেছিলাম। উভয় বর্ণনার বৈপরীত্যের সমাধান কি?

উত্তর ঃ দুই হাদীসের মধ্যকার বৈপরীত্যের সমাধান ঃ

ইবনে উমর (রা) এর এক বর্ণনায় নিজের বাড়ীর কথা বলেছেন এবং অপর বর্ণনায় হাফসার বাড়ীর কথা বলেছেন। বাহ্যত এ দুটি বর্ণনার মাঝে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। মুহাদ্দিসগণের মতে এর সমাধান নিম্নরূপ–

১. ইবনে উমর যে, হাফসার ঘরকে আমার ঘর বলেছেন এটা রূপকভাবে। কারণ বাস্তবিক পক্ষে ঘরটি হাফসার। আর হাফসা হলো ইবনে উমর (রা) এর বোন। ভাই বোনের বাড়ীকে রূপকভাবে নিজের বাড়ী হিসেবে অবিহিত করেছেন।

২. দ্বিতীয়তঃ এক বর্ণনায় বাড়ীর সম্বন্ধ হযরত হাফসার দিকে করা হয়েছে এবং অপর বর্ণনায় নিজের দিকে করা হয়েছে, আর উভয়টা রূপকভাবে। কেননা মূলতঃ বাড়ীটি হলো নবী (স) এর। আর হাফসা (রা) যেহেতু তাঁর স্ত্রী। এ কারণে রূপকভাবে তার ঘর বলা হয়েছে। আর ইবনে উমর যেহেতু রাসূলের শ্যালক। এ কারণে তিনিও রূপকভাবে ঘরের নিসবত নিজের দিকে করেছেন।

হাদীস দুটি সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله اِذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ الخ : استقبال ও استدبار সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। অতএব এখানে আর আলোচনা করা হচ্ছে না। তবে একটি কথা হলো এখানে যেমন কেবলার দিকে মুখ করে ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং কেবলার দিকে পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করার বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। ঠিক তদ্রুপ এমন বহু রেওয়ায়েত আছে যেখানে استدبار এর কথা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু সকল বর্ণনায় استقبال এর কথা বলা হয়েছে। তাই কেবলার দিকে পিঠ করার চেয়ে মুখ করে ইস্তেঞ্জা করা মারাত্মক ধরনের মাকরূহ। কাজেই ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে একটি অপ্রসিদ্ধ মত আছে যে, কেবলার দিকে পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করা বৈধ। তবে তার প্রসিদ্ধ মত হলো استقبال ও استدبار উভয়টা মাকরূহে তাহরীমী। এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক আলোচনা হলো পেশাব পায়খানার সময় তো استقبال ও استدبار নাজায়েয। কিন্তু পাথর বা ঢিলা দ্বারা যে পবিত্রতা অর্জন করা হয় বা পানি দ্বারা যে পবিত্রতা হাসিল করা হয়, সে সময়ও কি استقبال ও استدبار নাজায়েয?

১. ইমাম মালেক (র) এর নিকট এ সময় استقبال ও استدبار মাকরূহ, হারাম নয়।

২. আমাদের নিকট এ সময়ও استقبال ও استدبار হারাম।

৩. আহলে জাহের এর নিকট এ সময় استقبال ও استدبار বৈধ। তারা বলেন কেবলার সম্মানার্থে استقبال কে হারাম করা হয়েছে। আর এটা পেশাব পায়খানা করার সময় প্রযোজ্য, ঢিলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নয়।

এ হাদীস থেকে ইমাম গাযালী (র) এর ইস্তেম্বাতকৃত একটি মাসআলা

قوله ولكن شَرِّقُوْا اَوْغَرِّبُوْا الخ : ইমাম গাযালী (র) এখান থেকে একটি মাসআলা ইস্তেম্বাত করেছেন। আর তা হলো নামাযের মধ্যে عين قبلة এর দিকে মুখ করা জরুরী নয়। বরং جهة قبلة এর দিকে মুখ করে নামায আদায় করলেই যথেষ্ট হবে তবে এটা দূরবর্তী এলাকার জন্যে।

আলোচ্য মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম নাসায়ীর অভিমত

আলোচ্য মাসআলায় ইমাম নাসায়ী (র) শাফেয়ী এর মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। তাই তিনি সর্ব প্রথম النَّهيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عندَ الحَاجَةِ এই শিরোনাম কায়েম করেছেন। অতঃপর কিছু দূর গিয়ে الرخصة فِى ذٰلِكَ فِى الْبُيُوْتِ এর শিরোনাম কায়েম করেছেন একথা বুঝানোর জন্যে যে, কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করা বৈধ।

আলোচ্য হাদীসের ক্ষেত্রে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) এর গবেষণালব্ধ একটি কথা

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) বলেন, দীর্ঘ এক যুগ পরে আমার এ বিষয়ে একটি ইলম হাসিল হয়েছে। আর তা হলো মূলতঃ হযরত ইবনে উমর (রা) তার বর্ণিত হাদীসটি দ্বারা ঐ সকল লোকদের ধ্যান-ধারণাকে খণ্ডন করার ইচ্ছা করেছেন যারা বাইতুল্লাহ এর ন্যায় বাইতুল মুকাদ্দাস এর দিকেও মুখ বা পিঠ করে পেশাব পায়খানা করাকে হারাম মনে করে এবং উভয়টাকে সমমর্যাদায় রাখে। এর দলীল হলো মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনা। তা হলো মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া স্বীয় চাচা ওয়াসি ইবনে হিব্বান সূত্রে বলেন, আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম এমতাবস্থায় যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কেবলার দিকে পিঠ করে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমি নামায শেষ করে তার নিকট আসলে তিনি বলেন, কতক লোক ইস্তেঞ্জার সময় কেবলা ও বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসতে নিষেধ করে। অথচ আমি একটি ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে দেখি রাসূল (স) দুটি কাঁচা ইটের উপর বসে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে ইস্তেঞ্জা করছেন। ইবনে উমরের একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল লোকদের ধারণাকে খণ্ডন করা যারা বাইতুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাকে সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করে উভয়টার দিকে ফিরে ইস্তেঞ্জা করাকে নিষিদ্ধ মনে করে অথচ এ দুটি সমমর্যাদার নয়। বাইতুল্লাহ এর হুকুমের মধ্যে বাইতুল মুকাদ্দাস দিকে মুখ বা পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করে ইস্তেঞ্জা করার নিষেধাজ্ঞার বিধান অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলোচ্য বর্ণনা বাইতুল মুকাদ্দাসের বিষয় মানসূখ করে দেয়। (والله اعلم بالصواب)

باب النهى عن مس الذكر باليمين عند الحاجة

٢٤. اخبرنا يحيى بن درست قال اخبرنا ابو اسمعيل وهو القناد قال حدثنى يحيى بن ابى كثير ان عبد الله بن ابى قتادة حدثه عن ابيه ان رسول الله ﷺ قال اذا بال احدكم فلا ياخذ ذكره بيمينه -

٢٥. اخبرنا هناد بن السرى عن وكيع عن هشام عن يحيى هو ابن ابى كثير عن عبد الله بن ابى قتادة عن ابيه قال قال رسول الله ﷺ اذا دخل احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه -

পেশাব করার সময় ডান হাত দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ করা নিষেধ

অনুবাদঃ ২৪. ইয়াহয়া ইবনে দুরুস্ত (র)....আবু কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পেশাব করবে তখন সে যেন ডান হাত দ্বারা তার লিঙ্গ স্পর্শ না করে।

২৫. হান্নাদ ইবনে সারী (র)....... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পায়খানা বা পেশাবখানায় প্রবেশ করবে তখন সে যেন ডান হাত দ্বারা তার লিঙ্গ স্পর্শ না করে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : اكتب اختلاف العلماء فى مسئلة الوضوء بمس الذكر مدللا مع الجواب عن ادلة المخالفين.

প্রশ্ন ঃ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযূ ভঙ্গ হবে কি না। এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য কি? দলীলসহকারে বর্ণনা কর প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব দান কর।

উত্তর ঃ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করায় উযূ ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ

হাত ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অঙ্গের সাথে যদি পুরুষাঙ্গের স্পর্শ হয় তাহলে অযূ ভঙ্গ হবে না এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। কিন্তু কেউ যদি পুরুষাঙ্গকে হাত দ্বারা স্পর্শ করে তাহলে উযূ ভঙ্গ হবে কি না এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র) এর মতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযূ ভেঙ্গে যাবে। ইসহাক, আওযায়ী, যুহরী ও মুজাহিদ (র) এর অভিমতও অনুরূপ তবে এ ব্যাপারে তিন ইমামের মাঝে কিছুটা এখতেলাফ রয়েছে।

ক. ইমাম মালেক (র) বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পশ নিঃশর্তে উযূ ভঙ্গকারী।

খ. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যদি খোলা হাতের তালুতে লজ্জা স্থান স্পর্শ করে তবে তা উযূ ভঙ্গকারী হবে। আর যদি হাতের পিঠ দ্বারা স্পর্শ করা হয় তাহলে উযূ ভঙ্গ হবে না। তাঁর মতে মহিলাদের লজ্জাস্থান স্পর্শ করার হুকুমও তাই। ইমাম শাফেয়ী (র) কিতাবুল উম্মে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, পায়ু পথ স্পর্শ করা ও উযূ ভঙ্গের কারণ।

গ. ইমাম মালেক (র) বলেন, তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ উযূ ভঙ্গকারী হবে।

১. হাতের তালু দ্বারা স্পর্শ করা ২. কোন পর্দাছাড়া সরাসরি স্পর্শ করা।

৩. যৌনসুখ উপভোগের উদ্দেশ্য স্পর্শ করা।

২. ইমাম আবু হানীফা, সাহেবাইন, ইবনে মুবারাক, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখয়ী ও হাসান বসরী (র) এর মতে পুরুষ ও মহিলার লজ্জাস্থান ও পায়ূপথ স্পর্শ করা উযূ ভঙ্গকারী নয়। ইমাম মালেক (র) এর এক রেওয়ায়েতও এমনই।

ইমামত্রয়ের দলীল

١. عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صفوانَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رسولَ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليه وسلّم مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (ترمذى ج اص ٢٥ بابُ الوضوء من مس الذكر نسائى ج اص ٣٨ باب الوضوء من مس الذكر، ابن ماجة ص ٣٧)

অর্থাৎ বুসরা বিনতে সাফওয়ান হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (স) কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে, সে যেন অবশ্যই উযূ করে নেয়।

٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رسول اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليه وسلم قال اذا اَفْضٰى اَحَدُكُمْ بِيَدِهٖ الى ذَكَرِهٖ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْئٌ فَلْيَتَوَضَّأْ.

অর্থাৎ আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত তিনি নবী (স) হতে বর্ণনা করেন নবী (স) বলেছেন যখন তোমাদের কেউ স্বীয় হস্তকে পুরুষাঙ্গ পর্যন্ত পৌছায় অর্থাৎ স্পর্শ করে এমতাবস্থায় যে, তার হাত ও পুরুষাঙ্গের মধ্যে কোন আবরণ নেই তাহলে সে যেন উযূ করে নেয়।

٣. اِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ.

অর্থাৎ নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় লিঙ্গ স্পর্শ করে সে যেন উযূ করা ব্যতীত নামায না পড়ে।

٤. عن مُصْعَبِ بْنِ سعدِ بْنِ ابى وَقَّاصٍ قال كنتُ اُمْسِكُ الْمُصْحَفَ علىٰ اَبِىْ فَمَسَسْتُ فَرْجِىْ فَامَرَنِىْ اَنْ اَتَوَضَّأَ.

٥. ان النبىّ صلى الله عليه وسلم قال مَنْ اَفْضٰى بِيَدِهٖ الى ذَكَرِهٖ لَيْسَ دُوْنَهُ سِتْرٌ فقد وَجَبَ عليه الوُضُوْءُ.

অর্থাৎ নবী (স) বলেন আবরণ ব্যতিরেকে যার হাত তার লিঙ্গ পর্যন্ত পৌছে তার উপর উযূ করা ওয়াজিব। এ সকল হাদীস দ্বারা একথা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযূ ভেঙ্গে যাবে।

আহনাফের দলীল

١. عن قيس بْنِ طَلْقٍ عن ابيه قال قَدِمْنَا علىٰ نبىّ اللّٰه صلى اللّٰهُ عليه وسلّم فجاءَ رجلٌ كَانَّهُ بَدَوِىٌّ فقالَ يا نَبِىَّ اللّٰهِ ما تَرٰى فِى مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بعدَ مَا يَتَوَضَّأُ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَلْ هُوَ اِلَّا مضغةٌ مِنْه او بُضْعَةٌ مِنْه (ابوداؤد ج ص ٢٤ باب الرخصة فى ذلك، ترمذى ج اص ٢٥ باب ترك الوضوٴ من مس الذكر، نسائى ج اص ٣٨ ابن ماجة ص ٣٧)

অর্থাৎ...কায়েস ইবনে তালাক থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, একদা আমরা নবী করীম (স) এর নিকট গমন করি। এমন সময় সেখানে একজন গ্রাম্য লোক আগমন করে মহানবী (স) কে জিজ্ঞাসা করে- হে আল্লাহর নবী! উযূ করার পর যদি কোন ব্যক্তি নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তবে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? রাসূল (স) বললেন পুরুষাঙ্গ তো তার দেহের গোশতের একটি টুকরা ব্যতীত কিছুই নয়। উক্ত হাদীসে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ করার কারণে যেমন উযূ নষ্ট হয় না। অনুরূপ পুরুষাঙ্গ ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় একটি অঙ্গ মাত্র। তাই এটিকে স্পর্শ করলে উযূ ভঙ্গ হবে না।

٢. ما اُبَالِى ذَكَرِىْ مَسَسْتُ فِى الصّلٰوة او اُذُنِىْ او اَنْفِىْ (طحاوى ج اص ٤٧)

দ্বিতীয় দলীল হলো হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, হুযাইফা ও আলী (রা) এর আছার। তারা প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে বলেন আমি নামাযে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলাম, নাকি আমার কান বা নাক স্পর্শ করলাম, তা নিয়ে আমার কোন ভাবনা নেই।

٣. عن بُسْرَةَ بنتِ صَفْوانَ قالتْ سَمِعْتُ رسولَ اللّٰه صلى الله عليه وسلم يقولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ او اُنْثَيَيْهِ او رُفْغَيْهِ (اى اصول فخذيه) فليتوضأ للصلوة (مجمع الزوائد ج اص ٢٤٥)

অর্থাৎ বুসরা বিনতে সাফওয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (স) কে বলতে শুনেছি, যে তার পুরুষাঙ্গ বা অণ্ডকোষ অথবা উরুর মূল অংশ স্পর্শ করবে, সে যেন নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করে। উক্ত হাদীসে পুরুষাঙ্গের সাথে অণ্ডকোষ ও উরুর মূল অংশ স্পর্শ করার কারণে উযূ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। অথচ অণ্ডকোষ ও উরুদ্বয়ের মূল অংশ স্পর্শ করার কারণে কেউই উযূ ভঙ্গের কথা বলেন না।

আকলী বা যৌক্তিক দলীল-১ ঃ কেউ যদি হাতের পিঠ কিংবা কনুই দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে উযূ নষ্ট হয় না এবং উযূ কর ওয়াজিব নয়। সুতরাং এ হুকুমের উপর কিয়াস করে আমরা বলবো হাতের তালু দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলেও উযূ ভঙ্গ হবে না, এটা ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) এর বিপক্ষে দলীল।

আকলী দলীল -২ ঃ মানুষের রান সতরের অন্তর্ভুক্ত। এখন যদি এ রানের সাথে পুরুষাঙ্গের স্পর্শ লাগে (যেমনটা সচারাচার হয়ে থাকে) তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে উযূ নষ্ট হয় না। তাহলে হাত, যা সতরের অন্তর্ভুক্ত না তার সাথে পুরুষাঙ্গের স্পর্শ লাগার দ্বারা আরো উত্তমরূপে উযূ নষ্ট না হওয়া চাই, এটা ইমাম আহমদ (র) এর বিপক্ষে দলীল।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ

১. ইমাম তাহাবী (র) বলেন হযরত ত্বল্ক (র) এর হাদীস বুসরার হাদীস হতে অধিক নির্ভরযোগ্য।

২. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (র) বলেছেন তিনটি হাদীস বিশুদ্ধ নয়। ১. সকল নেশা কারক বস্তুই মদ। ২. যে নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তাকে উযূ করতে হবে ৩. অভিভাবকের আদেশ ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (ত্বহাবী)

৩. হযরত বুসরা (র) এর হাদীসে একজন বর্ণনাকারীর নাম মারওয়ান, যিনি হযরত বুসরা (র) ও হযরত উরওয়াহ (র) এর মধ্যে যোগসূত্র, উপরোক্ত মারওয়ান হাদীসবিদগণ এর নিকট নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন। অতএব হযরত বুসরা (র) এর বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল।

৪. হযরত বুসরা (র) এর হাদীস মুরসাল। আর হযরত ত্বল্ক (র) এর হাদীস মারফু। ইমাম শাফেয়ী (র) এর মাযহাবের অনুসারীদের মতে মুরসাল হাদীস মাযহাব সাব্যস্ত করার ব্যাপারে দলীল হতে পারে না। একারণে হাদীসটি মারফু হাদীসের মোকাবেলায় দুর্বল।

৫. হযরত বুসরা (র) এর হাদীস অযৌক্তিক। কেননা এ হাদীসটির বর্ণনা মুতাবিক শরীরের অন্য কোনো অংশ স্পর্শ করলে উযূ ভঙ্গ হয় না। শুধু পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলেই উযূ নষ্ট হয়ে যায়। অথচ পুরুষাঙ্গও শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় গোশতের অংশ।

৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসও হযরত ত্বল্ক (র) ও অন্যান্য সাহাবীদের হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

৭. অথবা তাঁদের বর্ণিত হাদীসে উযূ দ্বারা মোস্তাহাব উযূ উদ্দেশ্য, ওয়াজিব নয়।

৮. সাধারণ জ্ঞানেও এটা অনুমিত হয় যে, পুরুষাঙ্গ শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় একটি অংশ মাত্র, তা স্পর্শ করলে উযূ ভঙ্গ হওয়ার কোন কারণ নেই।

৯. ফুকাহায়ে কেরাম উযূ ভঙ্গের ৮টি কারণ লিখেছেন। তন্মধ্যে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযূ ভঙ্গ হবে এমন কোনো কারণের উল্লেখ নেই।

১০. আহনাফের হাদীস বর্ণনাকারী হযরত ত্বলক হলেন একজন পুরুষ। পক্ষান্তরে তিন ইমামের হাদীসের রাবী বুসরা বিনতে সাফওয়ান হলেন একজন মহিলা। আর এ ক্ষেত্রে মহিলার চেয়ে পুরুষের বর্ণিত হাদীস অধিক শক্তিশালী। কেননা, একথা তো সর্বজন বিদিত যে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য দু'জন মহিলার সাক্ষ্যের সমান। অতএব, ত্বলকের হাদীস অধিক গ্রহণযোগ্য। (দরসে মেশকাত খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৪২)

১১. বুসরার হাদীসে মারওয়ান নামক এক রাবী রয়েছেন, যিনি খলীফা হওয়ার পূর্বে নির্ভরযোগ্য ছিলেন। কিন্তু খলীফা হওয়ার পর বিভিন্ন কারণে তিনি অনির্ভরযোগ্য হয়ে যান। তাছাড়া তিনি বুসরার নিকট এক পুলিশ পাঠিয়ে উক্ত হাদীস জেনে নেন। আর উক্ত পুলিশ অজ্ঞাত (مجهول)। সুতরাং তা দলীলযোগ্য নয়। (ত্বহাবী ১/ ৪৩)

১২. এর দ্বারা আভিধানিক উযূ বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ শুধু হাত ধৌত করা, যেমন হাদীসে এসেছে الْوُضُوْءُ قَبْلَ الطَّعَامِ অর্থাৎ খাবার পূর্বে উযূ কর। (তিরমিযী খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৬, তানযীম খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৩৩)

১৩. বুসরা (র) হতে এর বিপরীত একটি রেওয়ায়েত রয়েছে আর কায়দা আছে اِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا

১৪. হাদীসগুলোর মাঝে পারস্পরিক বিরোধের সময় কিয়াসের শরণাপন্ন হতে হয়, কিয়াস দ্বারা হানাফীদের মাযহাবের সহায়তা হয়। কারণ মল-মূত্র ইত্যাদি যেগুলো সরাসরি নাপাক, সেগুলো স্পর্শ করলে যেহেতু কারো

মতেই উযূ ভঙ্গ হয় না। তাই সুনির্দিষ্টভাবে যে সব অঙ্গের পবিত্রতা সর্বসম্মত সেগুলো স্পর্শ করলে তো উযূ ভঙ্গ না হওয়ারই কথা। (দরসে তিরমিযী ১ম খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩০৯)

سوال : ما المرادُ عَنْ ابيه "اكتُب نبذاً مِّن حَياتِه؟

প্রশ্ন ঃ عَنْ اَبِيْهِ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? তার সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ হযরত কাতাদা (র), তিনি সুলামী বংশের আনছারী সাহাবী ছিলেন এবং ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে তিনি ব্যতীত অন্য কারো কুনিয়াত আবু কাতাদা ছিল না। তিনি যেহেতু রাসূল (স) এর দক্ষ আরোহী ছিলেন এবং তিরন্দাজী ও পারদর্শী ছিলেন। একারণে তাকে فارسٌ رسولِ اللّٰه صلى الله عليه وسلم বলা হত। তার মূল নাম হলো হারেছ ইবনে রবয়ী। তিনি বদরের যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এ মহান সাহাবী ৭০ বৎসর বয়সে ৫৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

আলোচ্য হাদীসের তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : القيد " بيَمِيْنه " فى هٰذا الحديث قيدٌ اِحترازىٌ ام قيدٌ اِتّفاقىٌ بَيِّنْ مُوَضحًا مع بَيانِ اٰراءِ العُلَماءِ.

প্রশ্ন : আলোচ্য হাদীসের মধ্যে যে بيمينه এর কয়েদ বৃদ্ধি করা হয়েছে এটা احترازى নাকি اتفاقى এ ব্যাপারে উলামাদের মতামত কি বর্ননা কর।

উত্তর ঃ আলোচ্য হাদীসের মধ্যে যে بيمينه এর কয়েদ বৃদ্ধি করা হয়েছে এটা احترازى নয়, কাজেই যদি কেউ এটা মনে করে যে, এখানে ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার যে কথা বলা হয়েছে, এটা ইস্তেঞ্জা করার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং পেশাব-পায়খানা ব্যতীত অন্যান্য সময় ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা যাবে, এমন ধারণা করা সহীহ-নয়, কারণ এটা قيد احترازى নয়।

উলামায়ে কেরামের মতামত

১. আল্লামা সিন্দী (র) বলেন, مفهوم مخالف এর কোন ধর্তব্য নেই। কাজেই এখানে مفهوم مخالف এর ভিত্তিতে ইস্তেঞ্জা ব্যতীত অন্যান্য সময় হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা বৈধ হওয়ার কথা বলা বিশুদ্ধ নয়। তবে আলোচ্য বর্ণনায় بيمينه এর কয়েদ এ কারণে বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, পেশাব-পায়খানা করার সময় পুরুষাঙ্গ ধরার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর প্রয়োজন থাকা সত্বেও যখন ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই অপ্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে, হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা যাবে না এটা অনায়াসে বুঝা যায়। মোটকথা আল্লামা সিন্দী (র) এর মূল বক্তব্য হলো ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা পেশাব-পায়খানার সময় যেমন মাকরূহ, ঠিক তদ্রুপ পেশাব পায়খানা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও মাকরূহ।

২. ইমাম আবু দাউদ (র) এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা) এর একটি রেওয়ায়েত নকল করেছেন–

قالت كانتْ يَدُ رسولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اليُمْنٰى لِطُهُورِه وطَعامِه وكانتْ يدُه اليُسْرٰى لِخَلائِه وَمَا كانَ مِن أذىً.

অর্থাৎ রাসূল (স) উযূ করা ও খানা-পিনার ক্ষেত্রে ডান হাত ব্যবহার করতেন। আর পেশাব-পায়খানা ও অপছন্দনীয় কাজে বাম হাত ব্যবহার করতেন। এর দ্বারা বোধগম্য হয় যে, আল্লাহ তাআলা বাম হাতের উপর ডান মর্যাদা দান করেছেন। আর এ মর্যাদা প্রদানের অর্থই হলো তাকে ভালো কাজে ব্যবহার করা। যেমন খাওয়া-দাওয়া ও কোন বস্তু গ্রহণ করা। আর বাম হাতকে অপছন্দনীয় কাজে ব্যবহার করা যেমন পেশাব-পায়খানা ও নাক পরিষ্কার করা।

৩. মোল্লা আলী ক্বারী (র) বলেন, ছাত্রদের একটি বিষয় দেখে আমার খুব আশ্চর্য লাগে। আর তা হলো জুতা ইত্যাদি ডান হাত দ্বারা বহন করে। আর কিতাবাদী বাম হাত দ্বারা বহন করে। তারা শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতার কারণেই এমন করে থাকে।

৪. জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এটা মাকরূহে তানযীহী।

٢٤. بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْبَوْلِ فِى الصَّحْرَآءِ قَآئِمًا

٢٦. اَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا -

٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ اَنَّ حُذَيْفَةَ رضى الله عنه قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا -

٢٨. اخبرنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنْبَاَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَشٰى اِلٰى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا قَالَ سُلَيْمَانُ فِى حَدِيْثِهٖ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْصُوْرٌ الْمَسْحَ -

---

ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে পেশাব করার অনুমতি

অনুবাদ ঃ ২৬. মুআম্মাল ইবনে হিশাম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) লোকদের আবর্জনা ফেলার স্থানে এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।

২৭. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার.........হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) লোকদের আবর্জনা ফেলার স্থানে আসেন এবং (সেখানে) দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।

২৮. সুলায়মান ইবনে উবায়দুল্লাহ (র)..........হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) আবর্জনা ফেলবার স্থানে গমন করলেন এবং দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : ما الفرقُ بَيْنَ حدّثنا واَخْبَرَنَا والعَنْعَنَةِ بَيِّنْ مُوضِحًا؟

প্রশ্ন ঃ حَدَّثَنَا ـ اَخْبَرَنَا ও عَنْعَنَة **এর মধ্যে পার্থক্য কি? সুস্পষ্ট ভাষায় লেখ।**

উত্তর ঃ اَخْبَرَنَا ـ حَدَّثَنَا ও عَنْعَنَة **এর মধ্যকার পার্থক্য ঃ**

ক. উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, এ দুটি শব্দ আভিধানিকভাবে সমার্থক তথা এ দুটি আভিধানিকভাবে একই অর্থ দেয়। তবে পারিভাষিক অর্থের মধ্যে কিছু মতবিরোধ রয়েছে।

১. পারিভাষিক অর্থেও কেউ কেউ উভয়টির মাঝে কোন পার্থক্য করেন না। যেমন- ইমাম যুহরী ইবনে উয়াইনা, ইয়াহইয়া ইবনুল কাত্তান, হেজাজ ও কুফার অধিকাংশ উলামা, ইবনে হাজেব ও হাকেম বলেন, চার ইমামের রায়ও এটা এবং পাশ্চাত্যের আলিমগণ এর উপরেই আমল করে থাকেন।

২. তবে কেউ কেউ উস্তাদ ছাত্রের সামনে পড়া বা ছাত্র উস্তাদের সামনে পড়া হিসাবে পার্থক্য করেন, তারা বলেন, উস্তাদ যখন হাদীস পড়েন আর ছাত্র শুনে তখন حدثنا শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর ছাত্র যখন উস্তাদের সামনে পড়ে তখন রেওয়ায়েতকালে اَنْبَانَا বা اَخْبَرَنَا বলে. এ মতের প্রবক্তা হলেন ইবনে জুরাইজ, আওযায়ী, শাফেয়ী ও প্রাচ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরাম।

খ. عَنْعَنَة বলা হয় عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা। অর্থাৎ একথা অস্পষ্ট রাখা যে, সে কি তার থেকে শুনেছে না কি উস্তাদ পড়েছে আর সে শুনেছে বা সে পড়েছে না উস্তাদ শুনেছে।

حديث مُعَنْعَنَة এর রাবী যদি مُدَلِّس হয় এবং অন্য কোন রেওয়ায়েত দ্বারা তার সমর্থন না পাওয়া যায় তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। আর حَدَّثَنَا ও اَخْبَرَنَا দ্বারা রেওয়ায়েতকৃত বর্ণনা সর্বসময় গ্রহণযোগ্য।

سوال : حديثُ عائشةَ مُعارِضٌ لِحديثِ حُذيفةَ فكَيْفَ التَّوفيقُ بَيْنَهُمَا ؟

প্রশ্ন ঃ আয়েশা (রা) এর রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় প্রিয়নবী (স) কখনো দাঁড়ায়ে পেশাব করেননি। অপর দিকে হুযাইফা (র) এর হাদীসে তাঁর দাঁড়িয়ে পেশাব করার কথা রয়েছে। কাজেই এ দুটির মধ্যে বৈপরীত্ব পরিলক্ষিত হয় এর সমাধান কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ উভয় হাদীসের মধ্যকার বৈপীরত্যের সমাধান ঃ এ হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার বৈপরীতের সমাধান নিম্নরূপ–

১. হযরত আয়েশা (রা) সাধারণ অভ্যাসের বিবরণ দিয়েছেন। আর হযরত হুযাইফা (রা) একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।

২. হযরত আয়েশার বাড়িতে তার দেখা ও জানা অনুপাতে কখনো রাসূলকে এভাবে পেশাব করতে দেখেননি সেই বিবরণ দিয়েছেন। আর হযরত হুযাইফা (রা) বাড়ির বাহিরের একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।

৩. অথবা হযরত আয়েশা (রা) এ ঘটনা জানেননি।

৪. এখানে নাহী দ্বারা মাকরূহে তানযীহী উদ্দেশ্য বা রাসূল (স) হাঁটুর ব্যাথা বা কোমরের ব্যাথার কারণে বা উম্মতের শিক্ষা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।

৫. আয়েশা (রা) নিজের ইলম অনুযায়ী বলেছেন যা ছিল নবী (স) এর বাড়িতে অবস্থানকালীন আমল। কিন্তু সফর অবস্থা সম্পর্কে তার জানা ছিল না। কেননা তিনি তো সব সময় নবী করীম (স) এর সফরসঙ্গী হতেন না। আর হুযাইফা (রা) এর হাদীসটি ছিল নবী (স) এর সফরের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। অতএব, কোন দ্বন্দ্ব নেই। (আরফুশ শাযী পৃষ্ঠা নং ৪৫)

سوال : ماحكمُ البَولِ قائمًا عِندَ الائمَّةِ الكِرامِ؟ اُذْكُرْ مفصَّلًا.

প্রশ্ন ঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার হুকুমের ব্যাপারে ইমামদের মতানৈক্য কি? বিস্তারিত লেখ।

উত্তর ঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের বিধানের ব্যাপারে ইমামদের মতামতঃ

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার বিধানের ব্যাপারে ইমামদের মাঝে সামান্য মতানৈক্য রয়েছে। যথা–

১. ইমাম আহমদ, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, উরওয়া, মুহাম্মদ ইবনে সীরিন, ইবরাহীম নাখঈ ও শা'বী (র) এর মতে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা শর্তহীনভাবে জায়েয। (তানযীমুল আশতাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৪৫)

২. কোন কোন আহলে জাহের এর বিপরীত বলেন, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা হারাম।

৩. ইমাম মালেক (র) এর মতে প্রস্রাবের ছিঁটা উড়ে আসার আশংকা না থাকলে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েয, অন্যথায় মাকরূহ। (দরসে তিরমিযী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৮)

৪. ইমাম আবু হানীফা (র), শাফেয়ী (র), জুমহুর ফুকাহা ও মুহাদ্দেসীগণ বলেন, ওযর ছাড়া দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা মাকরূহে তানযীহী, হারাম নয়। হ্যাঁ কঠোর মাকরূহ হবে আসবাবের আধিক্যের কারণে। যেমন সে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে থাকে আর কাপড় নাপাক হয়ে যায়, বা কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য হয় বা সতরের ক্ষতি সাধিত হয় তখন তা মাকরূহে তাহরিমী হয়ে যাবে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) এমনটাই বলেছেন, তবে তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থকার এটাকে অস্বীকার করেছেন। (বজলুল মাজহুদ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৮)

ইমাম আহমদ (র) এর দলীল ঃ তিনি হুযাইফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

عن حذيفةَ قال اتى رسولُ اللّٰه صلى عليه وسلم سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائمًا ثم دعا بماءٍ فمسَحَ على خُفَّيْه.

(بخارى ج اص ٣٥ باب البول قائما وقاعدا، ترمذى ج اص ٩ باب الرخصة فى ذلك ، نسائى ج اص ١١ الرخصة فى البول فى الصحراء قائما، ابن ماجه ص ٢٦)

অর্থাৎ হযরত হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (স) ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থানের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। অতঃপর তিনি পানি চেয়ে নেন এবং মোজার উপর মাসেহ

করেন। এখানে যেহেতু রাসূল থেকে দাঁড়িয়ে পেশাব করার আমল পাওয়া গেছে। তাই দাঁড়িয়ে পেশাব করা শর্তহীনভাবে জায়েয হবে। ইমাম মালেক (র) এর দলীলও এটা। তবে তিনি পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচার শর্ত লাগান।

আহলে জাহের এর দলীল

١. عَنْ عُمَرَ قَالَ رَآنِىْ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلّم اَبُولُ قَائِمًا فقَالَ يا عمرُ لاتَبُلْ قائمًا (ترمذى ج اص ٩ باب النهى عن البول قائما)

অর্থাৎ হযরত উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বললেন, উমর! তুমি দাঁড়িয়ে পেশাব করো না।

٢. عن عائشةَ قالتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ النبىَّ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلّم كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا فلاتُصَدِّقُوه مَاكانَ يبولُ اِلاَّ قاعِدًا (ترمذى ج اص ٩ ، نسائى ج اص ١١، ابن ماجه ص ٢٦)

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে তোমাদের নিকট বর্ণনা করবে যে, নবী করীম (স) দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন। তোমরা তার কথা বিশ্বাস করো না। তিনি কেবল বসেই পেশাব করতেন। উল্লেখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা দাঁড়িয়ে পেশাব করা সুস্পষ্ট হারাম মনে হয়। তাই দাঁড়িয়ে পেশাব করা হারাম।

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল

١. عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عمرُ رضى الله عنهما عن ابيهِ قال مابُلْتُ قائمًا مُنْذُ اَسْلَمْتُ.

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহনের পর আমি কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।

٢. عن عمرَ بنِ الخطّابِ رضى الله عند قال رَآنِى النبىُّ صلى الله عليه وسلم وانا ابولُ قائِمًا فقالَ يا عمرُ لاتَبُلْ قائمًا فقال مابُلْتُ قائِمًا بَعْدُ

অর্থাৎ হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন হুজুর (স) একবার আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখলেন অতঃপর তিনি বললেন, হে উমর (রা)! দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। এরপর কখনো আমি দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।

٣. عن عائشةَ رضى الله عنها قالتْ مَن حَدَّثكم اَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قائمًا فلاَ تُصَدِّقُوهُ ما كانَ يبولُ اِلاَّ قَاعِدًا.

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যে তোমাদেরকে বলে যে, হুজুর (স) দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন তাকে বিশ্বাস করো না। তিনি শুধুমাত্র বসেই পেশাব করতেন। উল্লেখিত হাদীসগুলো দ্বারা দাঁড়িয়ে পেশাব করা হারাম বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু হুযাইফা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা যেহেতু নবী করীম (স) এর পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে পেশাবের প্রমাণ মিলে। তাই উভয় হাদীস একত্র করলে মাকরূহ তানযীহী সাব্যস্ত হয়।

ইমাম আহমদ (র) এর দলীলের জবাব ঃ আহনাফের পক্ষ থেকে ইমাম আহমদ (র) এর দলীলের জবাব এই যে, হুজাইফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ভায্য যে, রাসূল (স) এক বার দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন এটাকে আমরাও স্বীকার করি, তবে তা ছিল ওযরবশত। সুতরাং এর দ্বারা ওযর ছাড়া ঢালাওভাবে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। যদি ব্যাপক আকারে জায়েযই হত, তাহলে তিনি উমর (রা) কে সরাসরি নিষেধ করতেন না যে, হে উমর! তুমি দাঁড়িয়ে পেশাব করো না।

আহলে জাহেরের দলীলের জবাব ঃ তারা শুধু নেতিবাচক হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অথচ নবী (স) থেকে তো দাঁড়িয়ে পেশাব করারও দলীল পাওয়া যায়। সুতরাং যদি ব্যাপক আকারে হারাম হতো তাহলে নবী করীম (স) এমনটি কোনক্রমেই করতেন না।

ইমাম মালেক (র) এর অভিমতের জবাব : আসলে পেশাবের ছিটা উড়ে আসার সাথে দাঁড়িয়ে পেশাব করার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা শক্ত জায়গায় বসে পেশাব করলেও ছিটা উড়ে আসার সম্ভাবনা থাকে। ছিটা উড়ে আসার মাসআলা ও দাঁড়িয়ে পেশাব করার মাসআলা এক নয় বরং ভিন্ন। দাঁড়িয়ে পেশাব করা প্রসঙ্গে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) এর সুচিন্তিত অভিমত হলো বর্তমানে যেহেতু দাঁড়িয়ে পেশাব করা অমুসলিম ও কাফের মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য এর খারাপ দিকটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আর যে মাকরূহ তানযীহী কাফিরদের বৈশিষ্ট্য হয়ে যায় এর মন্দত্ব বেড়ে যায়। কারণ নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (ابو داود ج اص ٥٥٩ كتاب للباس)

অর্থাৎ যে যে জাতির সামঞ্জস্য অবলম্বন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং বর্তমানে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয নয়। আর এর উপরই ফতওয়া।

سوال : كيف بالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فِى اصلِ الجِدَارِ معَ انَّ البَوْلَ يَرْمِى الجِدَارَ ويُضَيِّعُهُ.

প্রশ্ন : নবী (স) প্রাচীরের গোড়ায় কিভাবে পেশাব করলেন অথচ পেশাব প্রাচীরকে নষ্ট করে দেয়?

উত্তর : উল্লেখিত এ প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব হতে পারে। নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করা হলো–

১. নবী করীম (স) মূলত: দেয়ালের গোড়ায় পেশাব করেননি। বরং তার কাছে পেশাব করেছেন এবং পেশাব দেয়াল পর্যন্ত গিয়ে পৌছেনি।

২. তাছাড়া নবী করীম (স) এর পেশাব পবিত্র ছিল যা দেয়ালের জন্য ক্ষতিকারক নয়। কাজেই পেশাবের দ্বারা দেয়ালের ক্ষতি করা হলো না।

৩. দেয়ালটি পূর্ব থেকে নষ্ট ছিল। কাজেই তাঁর পেশাবের কারণে নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

سوال : كيفَ اسْتَعْمَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمِ المَمْلُوكَةَ بلا اِجَازَةٍ؟

প্রশ্ন : নবী (স) কিভাবে লোকজনের মালিকানাধীন ভূমিতে অনুমতি ব্যতীত পেশাব করলেন?

উত্তর : ঐ ময়লার স্থানটি কোন না কোন লোকের মালিকানাধীন ছিল। সেহেতু অনুমতি ছাড়া পেশাব করায় কোন কোন আলেম আপত্তি উত্থাপন করেছেন। এর জবাব হলো নিম্নরূপ–

১. আলোচ্য হাদীসে سباطة قوم এর মধ্যে اضافت টা মালিকানা বুঝানোর জন্যে নয়। বরং তাদের সাথে সাধারণ সংশ্লিষ্টতার কারণে اضافت করা হয়েছে। এর প্রমাণ হলো ময়লা ফেলার স্থানগুলো সাধারণত; কোন ব্যক্তি মালিকানা হয় না। বরং জনকল্যাণমূলক হয়ে থাকে।

২. আর যদি মেনেও নেয়া হয় যে, এটা কারো মালিকানাধীন ছিল তাহলেও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার হয়েছে এটা বলা যায় না। কারণ ওরফে এরূপ স্থানে যথেষ্ট অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে। তাই কেমন যেন অনুমতি নেয়া হয়েছে। এর থেকে ফুকাহায়ে কেরাম একটি মাসআলা বের করেছেন যে, ক্ষেতে পড়ে থাকা ফল ইত্যাদিতেও ওরফে অনুমতি থাকে। কাজেই তা ব্যবহার করা যাবে।

৩. হুজুর (স) হয়তোবা ঐ স্থানে পৌছার পর মালিকের অনুমতিক্রমেই পেশাব করেছেন।

سوال : ما وَجْهُ بَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قائِمًا؟

প্রশ্ন : নবী (স) এর দাঁড়িয়ে পেশাব করার কারণ কি?

উত্তর : নবী করীম (স) নিজের অভ্যাসের বিপরীত দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন, এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে উলামায়ে কেরাম একাধিক জবাব দিয়েছেন।

১. নবী করীম (স) দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন জায়েয বর্ণনা করার জন্যে। আর এটা উম্মতকে জানিয়ে দেয়া ছিল তার দায়িত্ব যাতে উম্মত বুঝে নেয় যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পেশাব করা দোষণীয় নয়।

২. ঐ স্থানটিতে নাপাকী ছিল, বসলে নাপাকী লেগে যাওয়ার আশংকা ছিল বা বসা অসম্ভব ছিল।

৩. কেউ কেউ বলেছেন ডাক্তারদের মতে কখনও কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আরবে বিশেষত: এ বিষয়টি অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। একারণে নবী (স) দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।

৪. নবী করীম (স) এর হাঁটুতে ব্যাথ্যা ছিল যার ফলে তিনি বসতে পারছিলেন না।

৫. প্রাথমিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয ছিল, পরে রহিত হয়ে যায়। (ইবনে মাজা, দরসে মেশকাত ১ম খণ্ড)

৬. নবী (স) এর হাঁটুতে ব্যথা ছিল। যার ফলে তিনি বসতে পারছিলেন না। ফলে তিনি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়।

৭. হুজুর (স) কোমরে ব্যাথার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।

৮. নবী (স) বৈধতা বুঝানোর জন্যে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন।

سوال : كَيْفَ رَأَى أَبُو مُوسَى رسولَ اللّٰه صلى الله عليه وسلم يبولُ وقد رُوِيَ عَنْ جابِرِ بْنِ عبدِ اللّٰهِ قال إِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ اذا ارادَ البَرازَ انْطَلَقَ حتّٰى لا يَراهُ اَحَدٌ؟

প্রশ্ন ঃ হযরত জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে রাসূল (স) পেশাব-পায়খানার সময় দূরে চলে যেতেন, যাতে কেউ না দেখে। আর আবূ মূসা (রা) এর বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় তিনি রাসূল (স) কে পেশাব-পায়খানা করতে দেখেছেন।

উত্তর ঃ বৈপরীত্যের সমাধান ঃ আবু মূসা (রা) এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় রাসূল (স) নিকটে পেশাব পায়খানা করতেন। আর জাবের (রা) এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় হুজুর (স) দূরবর্তী স্থানে পেশাব পায়খানা করতেন। কাজেই দুই বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় এর সমাধান নিম্নরূপ।

১. আবু মূসা ও জাবের (রা) এর মাঝে মূলত : কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা হযরত জাবের (রা) এর হাদীস পায়খানা করার ব্যাপারে। তিনি বলেন রাসূল (স) যখনই পায়খানা করার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন এতদূরে যেতেন যে, তাকে কেউ দেখতে পেত না। আর আবূ মূসার হাদীসটি পেশাব করা সম্পর্কে। তিনি রাসূল (স) কে পেশাব করতে দেখেছেন।

২. অথবা আমরা বলবো যে, জাবের (রা) এর হাদীসটি রাসূল (স)-এর বেশীর ভাগ সময়ের ক্ষেত্রে তিনি যে দূরে গিয়ে ইস্তেঞ্জা করতেন তা বুঝানোর জন্য। সুতরাং উভয় হাদীসের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই।

৩. প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইলম অনুযায়ী বলেছেন।

سوال : الحديثُ المذكورُ مخلوطٌ مِنْ حديثِ حُذَيْفَةَ ومُغِيْرَةَ رض فَمَا الْجَوَابُ ؟

প্রশ্ন ঃ উল্লেখিত হাদীসে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা ও হুযাইফা (রা) এর রেওয়ায়েতদ্বয়ের মাঝে সংমিশ্রন করে গুলিয়ে ফেলেছেন এর সমাধান কি?

উত্তর ঃ উল্লেখ্য, দাঁড়িয়ে পেশাব করার রেওয়ায়েতটি ইমাম কুদূরী (র)ও স্বীয় মুখতাসারে উল্লেখ করেছেন। এর উপর হযরত আলা উদ্দীন মারদীনী (র) প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, ইমাম কুদূরী (র) হযরত হুযাইফা এবং হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) এর রেওয়ায়েতদ্বয়ের মাঝে সংমিশ্রণ করে ফেলেছেন। তিনি এ রেওয়ায়েত হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) এর বরাতে উল্লেখ করেছেন এবং তাতে দাঁড়িয়ে পেশাব ও কপালে মাসেহ এদুটি বিষয় আলোচনা করেছেন। অথচ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) হতে যে রেওয়ায়েতটি বর্ণিত আছে তাতে শুধু মাথার অংশে মাসেহ করার কথা রয়েছে। দাঁড়িয়ে পেশাব করার কথা নেই, যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে। হযরত হুযাইফা (রা) এর রেওয়ায়েতে দাঁড়িয়ে পেশাব করার কথা রয়েছে কিন্তু কপালের অংশে মাসেহ করার কথা নেই। যেমন– ইমাম তিরমিযী (র) এর মতে এখানে রয়েছে। যেন ইমাম কুদুরী (র) সংমিশ্রন ঘটিয়ে হযরত হুযাইফা

(রা) এর হাদীসের কিছু শব্দ এবং হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) এর হাদীসের কিছু শব্দ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হাফেজ যায়লাঈ (র) নসবুর রায়াহ গ্রন্থে এর উত্তর দিয়েছেন যে, ইবনে মাজাহ এবং ইমাম আহমদ (র) হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) এর যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন তাতে দাঁড়িয়ে পেশাব ও কপালের উপর মাসেহ করার কথা উভয়টি আলোচনা করেছেন। অতএব হাফেজ মারদীনী (র) এর প্রশ্ন সঠিক নয়।

سوال : مَنِ الْمُرَادُ بِبَعْضِ الْقَوْمِ؟ مؤمنٌ او كافرٌ؟

প্রশ্ন ঃ بعض قوم দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ

উত্তর ঃ ১. কেউ কেউ বলেন, بعض قوم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুনাফিক।

২. কেউ কেউ বলেন بعض قوم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আব্দুর রহমান ইবনে হাসান এবং আমার ইবনুল আস। এরা উভয়ই নব মুসলিম ছিলেন এবং এরা যথেষ্ট ইলমের অধিকারী ছিলেন না। আহলে আরবদের ধারণা ছিল বসে পেশাব করাটা পুরুষদের জন্য মানহানিকর। কারণ বসে পেশাব করা মেয়েদের অভ্যাস। তাই হুযুর (স) কে বসে পেশাব করতে দেখে তারা আশ্চর্যান্বিত হলো।

৩. এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন তারা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি।

سوال : أَوْضِحْ قَوْلَهُ يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْأَةُ؟

প্রশ্ন ঃ يبولُ كما تبولُ المرأةُ এর ব্যাখ্যা কর

উত্তর ঃ আহলে আরবদের ধারণা ছিল বসে পেশাব করার সময় আড়াল গ্রহণ করা মেয়েদের অভ্যাস। তাই যখন তারা হুজুর (স) কে এরূপ করতে দেখল তখন বলল তিনি মেয়েদের মত পেশাব করেন। এখানে বসে পেশাব করা এবং এ সময়ে আড়াল গ্রহণ করার ব্যাপারে মহিলাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

سوال : مَنْ فَاعِل قُلْنَا؟ هَل هُم مُسْلِمُوْن ام لا؟ إنْ كَانَ الاولُ فَكَيْفَ صَدَرَ عَنْهُمْ قَوْلُهُمْ اُنْظُرُوْا الخ

প্রশ্ন ঃ قلنا এর فاعل কে? তারা মুসলমান কি না? যদি মুসলমান হয় তাহলে তাদের থেকে انظروا الخ কিভাবে প্রকাশ পেল?

উত্তর ঃ قُلْنَا এর فاعل ঃ قلنا এর فاعل হলো আব্দুল রহমান ইবনে হাসান ও আমর ইবনুল আস (রা)।

১. কেউ কেউ বলেছেন তারা উভয় জন ঐ সময় কাফের ছিলেন।

২. তবে বিশুদ্ধমত হলো তারা দু'জনই ঐ সময় মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তারা তা বলেছেন এই জন্য যে, যেহেতু তারা নতুন মুসলমান ছিলেন এবং তাদের ইলমও কম ছিল। তাই তারা রাসূল (স)-এর পেশাব করার সময় পর্দা করে বসায় আশ্চর্যবোধ করেছেন। কেননা জাহেলী যুগে পুরুষরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করত এবং সেটা তাদের জন্য গর্বের বিষয়ও ছিল। (বজলুল মাজহুদ)

سوال : ماوجهُ الشَّبْهِ فِي قَوْلِهِم يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْأَةُ؟

প্রশ্ন ঃ তাদের বক্তব্য يبولُ كما تبولُ المرأةُ এর মধ্যে وجهِ شبه কি বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ ১. তারা রাসূল (স) এর পেশাব করার সময় বসাকে মহিলাদের পেশাব করার সময় বসার সাথে তাশবীহ দিয়েছেন। কেননা নবী (স) মহিলাদের মত বসে পেশাব করতেন। আর তাদের ধারণা ছিলো বসে পেশাব করা মহিলাদেরই কাজ। পুরুষরা এক্ষেত্রে তার বিপরীত হবে। সুতরাং وجه شبه হলো বসা।

২. ইমাম নববী (র) বলেন এখানে وجه شبه হলো পর্দা তথা নবী (স) পর্দা করে পেশাব করায় তাঁকে মহিলাদের সাথে তাশবীহ দিয়েছে। কেননা, তিনি পেশাব করার সময় সতর ঢাকতেন যেমন মহিলারা তাদের সতর ঢাকে।

سوال : مَنِ الْمُرَادُ بِصَاحِبِ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَمَا ذَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ أَلَمْ تَعْلَمُوا مَالَقِيَ ... الخ

প্রশ্ন ঃ صاحب بَنِى إِسْرَائِيل **দ্বারা উদ্দেশ্য কি এবং নবী (স)** أَلَمْ تَعْلَمُوا مَالَقِيَ الخ **দ্বারা নবী (স) কি উদ্দেশ্য করেছেন?**

উত্তর ঃ صاحب بنى اسرائيل দ্বারা মূসা (আ) উদ্দেশ্য অথবা বনি ইস্রাঈলের অন্য কেউ উদ্দেশ্য। হুজুর (স) এ বাক্য দ্বারা তাদেরকে ভয় দেখিয়েছেন। যাতে তারা বসে পেশাব করায় ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করে। কারণ তারা এ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করলে তাদের অবস্থা বনি ইস্রাইলের ন্যায় হবে। তাই তিনি সতর্ক করেছেন।

سوال : أَوْضِحْ مِصْدَاقَ مَا فِى قَوْلِهِ قطعوا اما أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُم

প্রশ্ন ঃ রাসূলের বাণী قَطَعُوا ما أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُم **এর মধ্যকার** ما **এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর ঃ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ **এর মধ্যকার** ما **এর মেসদাক বা উদ্দেশ্য ঃ**

قطعوا ما اصابه এ বাক্যের ما শব্দের মেসদাক হচ্ছে ঐ সকল কাপড় যাতে পেশাব লেগেছে তা কেটে ফেলেছে। অন্য রেওয়ায়েতে ثوب এর স্থানে جلد শব্দ রয়েছে। এতে হাদীসটিতে বৈপরীত্ব পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবে এতে কোন বৈপরীত্ব নেই। কেননা তাদের কাপড় ছিল চামড়ার তৈরী। কেউ বলেছেন চামড়া দ্বারা শরীরের চামড়াই উদ্দেশ্য। বজলুল মাজহুদের গ্রন্থকার হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র) এর ব্যাখ্যায় বলেন, কাপড়ের যে অংশে নাজাসাত লাগে সে অংশটুকু কেটে ফেলবে শরীরে চামড়া কাটা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং বুঝা গেলো এখানে একটি مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- إذا أَصَابَهُم اى إذا أَصَابَ ثَوْبَهُم

এখানে শরীরের গোশত কাটা উদ্দেশ্য নয়। কারণ এ নির্দেশ দেয়া হলে আস্তে আস্তে শরীরের সকল অংশ কাটা পড়ে যেত। আর দয়াময় প্রভূ এমন হুকুমের মুকাল্লাফ কাউকে বানাননি। والله اعلم بالصواب

قوله فقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ

জ্ঞাতব্যঃ নবী করীম (স)-এর উক্ত বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উম্মতকে সতর্ক করা যে, দেখো! বনী ইস্রাইলকে নজাসাতযুক্ত কাপড়ের অংশকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এটা যদিও তাদের শরীয়তে পছন্দনীয় বিধান ছিল কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা আকল (বা যুক্তির) পরিপন্থী মনে হয়। কেননা এর দ্বারা সম্পদ বিনষ্ট হয়। তা সত্বেও এটা অমান্য করার কারণে তাদের কবরে শাস্তি অবধারিত হয়েছে। কাজেই বসে আড়ালে পেশাব করা যা যুক্তি ও শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং এটাকে যদি অমান্য করা হয় বা এটা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা হয় তাহলে আরো উত্তমরূপে শাস্তি অবধারিত হবে। কাজেই এমন কাজ থেকে বিরত থাক।

বিশুদ্ধমত অনুযায়ী بعض القوم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুমিন। কাজেই আল্লামা আইনী (র) উমদাতুল কারীতে বলেন, انظروا اليه বাক্য দ্বারা ঠাট্টা, বিদ্রুপ ও তিরস্কার করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা তারা দু'জন নিঃসন্দেহে সাহাবী ছিলেন। আর সাহাবীগণ এগুলো থেকে মুক্ত। কাজেই ইনসাফের কথা এটাই যে, এ কথা তার থেকে অসতর্কতা বশত; প্রকাশ পেয়েছে, অথবা এর উপর তারা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, অথবা হুজুর থেকে বিষয়টির বিশ্লেষণ জানার জন্য ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা সিন্ধী বলেন, এটা তারা অজ্ঞতাবশত বলেছেন। বজলুল মাজহুদে আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র) এমনটাই বলেছেন।

سوال : اكْتُبْ نُبْذًا مِّنْ حَيَاةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ؟

প্রশ্ন ঃ আব্দুর রহমান ইবনে হাসানার জীবনী লেখ।

উত্তর ঃ তাঁর নাম হলো আব্দুর রহমান এবং মাতার নাম হাসানা। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুতা'আ ইবনে আব্দুল্লাহ গাতরিফ। তিনি সাহাবী ছিলেন এবং শুরাহবিল ইবনে হাসানা তার ভাই ছিল। কিন্তু আল্লামা আসকারী ইবনে খুসাইমার অনুকরণ করতঃ আব্দুর রহমানের ভাই শুরাহবিল হওয়াকে অস্বীকার করেন।

اَلْبَوْلُ فِى الْبَيْتِ جَالِسًا

٢٩. اخبرنا على بن حجر قال اخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت من حدثكم ان رسول الله ﷺ بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا -

اَلْبَوْلُ اِلٰى سُتْرَةٍ يَسْتَتِرُ بِهَا

٣٠. اخبرنا هناد بن السرى عن ابى معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضى الله عنه قال خرج علينا رسول الله ﷺ وفى يده كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال اليها فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المراة فسمعه فقال او ما علمت ما اصاب صاحب بنى اسرائيل كانوا اذا اصابهم شئ من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب فى قبره -

اَلتَّنَزُّهُ عَنِ الْبَوْلِ

٣١. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللّٰه عنهما قَالَ مَرَّ رسولُ اللّٰه ﷺ على قَبْرَيْنِ فقال اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ومَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيْرٍ اَمَّا هٰذا فكانَ لايَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ وَاَمَّا هٰذا فانّه كانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ ثم دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ على هٰذا واحدًا وعلى هذا واحدًا ثم قال لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مالَمْ يَيْبَسَا خَالَفَهُ منصورٌ رواه عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر طاوسا -

---

ঘরে নির্মিত পেশাবখানায় বসে পেশাব করা

অনুবাদ ঃ ২৯. আলী ইবনে হুজর (র).........আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেণ, যে ব্যক্তি তোমাদের বলে যে, রাসূলুল্লাহ (স) দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন তোমরা তার কথা বিশ্বাস করবে না। কেননা, তিনি বসেই পেশাব করতেন।

সুত্রার দ্বারা আড়াল করে পেশাব করা

৩০. হান্নাদ ইবনে সারী (র).......আবদুর রহমান ইবনে হাসানা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদা আমাদের কাছে আগমন করলেন। তাঁর হাতে চামড়ার তৈরী একটি ঢালের মত বস্তু ছিল। তিনি তা স্থাপন করলেন। এরপর তার পেছনে বসলেন এবং সেদিকে ফিরে পেশাব করলেন। জনৈক ব্যক্তি বললো, দেখ। তিনি মেয়েলোকের ন্যায় পেশাব করছেন। তিনি লোকটির কথা শুনে ফেললেন এবং বললেন, তুমি কি জান না যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কি শাস্তি হয়েছে? তাদের যদি পেশাবের কোন ফোটা শরীরে লাগত তাহলে কাঁচি দিয়ে সে অংশ তারা কেটে ফেলত। তাদের এক ব্যক্তি তাদেরকে এরূপ কেটে ফেলতে নিষেধ করে। এজন্য তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়।

পেশাবের ছিঁটা হতে বেঁচে থাকা

৩১. হান্নাদ (র).......ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) দু'টি কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। (এমনি সময়) তিনি বললেন, এ দু'টি কবরের লোককে আযাব দেওয়া হচ্ছে। (অবশ্য) কোন কবীরা গুনাহ্র কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে না। (এরপর তিনি কবর দু'টির দিকে ইংগিত করে বললেন) এ কবরের অধিবাসী তার পেশাবের (ফোঁটা) থেকে সতর্ক থাকত না। আর এ কবরের অধিবাসী সে একজনের কথা অপর জনের কাছে বলে বেড়াত। তারপর তিনি একটি খেজুরের তাজা শাখা আনতে বললেন। (শাখা আনা হলে) তিনি তা দু'ভাগে বিভক্ত করলেন এবং উভয় কবরের উপর একটি করে শাখা পুঁতে দিলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা হয়ত শাখাগুলো না শুকানো পর্যন্ত এদের আযাব হালকা করে দেবেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

দাঁড়িয়ে পেশাব করা সম্পর্কিত হাদীস ও বিজ্ঞানীদের অভিমত

অনেকের মতে পেশাব করা পুরুষের জন' অহংকার। পুরুষ মহিলাদের মধ্যে পার্থক্যের রেখা। দ্রুত পেশাব বের হওয়ার সহায়ক এবং রোগ নিরময়ের মহৌষধ। কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্তি ইত্যাদি বিবিধ কারণে বিজ্ঞানীগণও দাঁড়িয়ে পেশাব করাটাকেই পুরুষের জন্য উচিত মনে করেন। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে গবেষণা চালালে দেখলেন তাদের এতদিনের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও অবাস্তব। বরং ইসলাম যা বলেছে সেটাই যথাপোযুক্ত ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের থিউরীর অনুকুলে এবং সুস্বাস্থ্যের জন্যও এটা সহায়ক। বিজ্ঞানের থিউরী হলো "প্রত্যেক গতিশীল ক্রিয়ার সমান বা বিপরীত একটি প্রতিক্রিয়া আছে"।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ এই থিউরীকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পেশাব করার বিষয়টি তাদের মাথায় আসে। তারা এ বিষয়ে গবেষণা করে বলেন যে, প্রত্যেক গতিশীল ক্রিয়ার বিপরীত বা সমান একটি প্রতিক্রিয়া আছে। সুতরাং দাঁড়িয়ে পেশাব করার সময় পেশাবটা যত স্প্রীডে সামনের দিকে ছুটে তার বিপরীত একটি প্রতিক্রিয়া পেছনের দিকেও ছুটে। তারা দেখলেন, এই বিপরীত গতিটা সরাসরি কিডনিতে গিয়ে আঘাত হানে। আর যে সর্বদা দাঁড়িয়ে পেশাব করে দেখা যায় যে, বারংবার বিপরীত আঘাত কিডনিতে লাগার ফলে কিডনি নষ্ট হয় যায়। ফলে অতি অল্প বয়সেই সে প্রাণ হারায়।

এ বিষয়টিকে নিয়ে আরো গভীর গবেষণা করায় আরো একটি তথ্য বের হয়ে এলো যে, পেশাবের বিপরীত গতির প্রতিক্রিয়ার ফলে পেশাবের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ ধাতু নির্গত হয়। যার ফলে শরীরের অনেক শক্তি ক্ষয় হয় এবং শরীর দূর্বল হয়ে যায়। যার কারণে অল্প বয়সেই চুল-দাড়ী ও মোঁচ পাকতে শুরু করে, চোখের দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় এবং শরীরের মধ্যেও নানাবিধ রোগের সূত্রপাত ঘটে, যৌনশক্তি দুর্বল হয়ে যায়, ফলে মানুষ সুস্থতা ও স্বাস্থ্য হারায়। আর বসে পেশাব করলে এ ধরনের কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, দাঁড়িয়ে পেশাব করা স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর।

অপর দিকে এর বাহ্যিক বিষয় নিয়ে ভাবলেও দেখে যায় দুনিয়ার সকল চতুস্পদ জন্তু দাঁড়িয়ে পেশাব করে। এতে তাদের সাথেও সামঞ্জস্য হয়ে যায়, উপরন্ত এটা লজ্জা ও হায়ার চাহিদারও পরিপন্থী। অতএব এ দৃষ্টিকোণেও এটা বর্জনীয়।

سوال : المَقبُورَانِ كَانَا مُسْلِمَيْنِ ام كَافِرَيْنِ؟ وعلى الثَّانِي كيف يُمْكِنُ التَّخْفِيْفُ وقد قال فِي شَانِ الكُفَّارِ "فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العَذَابُ؟

প্রশ্ন ঃ কবরবাসীদ্বয় মুসলমান ছিল নাকি কাফির? যদি কাফির হয় তবে কিভাবে তাদের আযাব হালকা হবে? অথচ আল্লাহ তাআলার কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলেছেন- فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العَذَابُ

উত্তর ঃ কবরদ্বয়ের মধ্যকার ব্যক্তিদের ব্যাপারে আলেমদের অভিমত ঃ কবরের মধ্যে যে দু'ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হচ্ছিল তারা কি মুসলমান ছিল নাকি কাফের ছিল এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

১. একদল আলেম এবং আবূ মুসা মাদীনী (র) এর নিশ্চিত রায় হলো তারা কাফির ছিল। এর দলীল হলো-

١. لِاَنَّهُ جَاءَ فِي حديثِ جابرٍ كَانَ القَبرانِ قَدِيْمَيْنِ

অর্থাৎ জাবের (র) এর হাদীসে আসছে যে, কবর দু'টি পুরাতন ছিল। আর পুরাতন থাকাই একথার প্রমাণ যে, অনেক আগে তারা মারা গেছে। কাজেই তারা কাফির হওয়াটাই স্বাভাবিক।

٢. عَن جابرٍ رض قال مَرَّ النبيُّ صلى اللّٰه عليه وسلّم على قَبْرَيْنِ مِن نَجَّارٍ هَلَكَا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَسَمِعَ هُمَا يُعَذَّبَانِ فِي البَوْلِ والنَّمِيْمَةِ.

অর্থাৎ হযরত জাবের (রা) বলেন, নবী (স) বনী নাজ্জার গোত্রের দুটি কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে যারা জাহেলী যুগে মৃত্যুবরণ করেছিল। অতঃপর নবী (স) উক্ত কবরদ্বয় থেকে শাস্তির আওয়াজ শুনতে পান। যা পেশাব ও চোগলখোরীর কারণ হলো। তখনকার মূল উদ্দেশ্য হলো কবর দুটি জাহেলী যুগের ছিল। আর জাহেলী যুগের মৃত লোকেরা কাফের। সুতরাং বুঝা গেলো তারা কাফির ছিল।

২. জুমহুর মুহাদ্দিসগণ বলেন, কবরদ্বয়ের দু'ব্যক্তি মুসলমান ছিল। এটাই ইবনুল আদরাসের রায়। ইবনে আত্তার (র)ও শরহে উমদা এর মধ্যে পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে লিখেছেন যে, তারা মুসলমান ছিল। আর ইমাম কুরতুবী (র) এটাকেই অধিক স্পষ্ট সহীহ এবং অগ্রগামী সাব্যস্ত করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, তারা মুসলমান ছিল এটা বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়।

জুমহুরের দলীল

ক. কবরদ্বয়ের দু'ব্যক্তি যে মুসলমান ছিল তার দলীল নিম্নরূপ-

٢. مَرَّ النبيُّ صلى اللّٰه عليه وسلّم بِقَبْرَيْنِ جَدِيْدَيْنِ .

অর্থাৎ নবী (স) নতুন দুটি কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। আর নতুন কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করা একথার প্রমাণ যে, তারা অল্প কয়েক দিন আগে মৃত্যু বরণ করেছে। আর অল্প কয়েকদিন আগে মৃত্যুবরণ করাই একথার প্রমাণ যে, তারা মুসলমান ছিল।

٢. عَنْ أُمَامَةَ رض قال اِنَّهُ صلى الله عليه وسلمَ مَرَّ بالبَقِيْعِ فقالَ مَن دَفَنْتُمُ اليَوْمَ هٰهُنَا.

খ. অর্থাৎ হযরত উসামা (রা) বলেন, রাসূল (স) জান্নাতুল বাকী দিয়ে অতিক্রম করেন। অতঃপর তিনি বললেন, এখানে আজ তোমরা এ দু'ব্যক্তিকে দাফন করেছ? আর এ কথা সকলের নিকট পরিষ্কার যে, জান্নাতুল বাকীতে কোন কাফিরের কবর নেই। এটাই একথার প্রমাণ যে, তারা মুসলমান ছিল।

গ. কাফির হলে রাসূল (স) তাদের আযাব মুক্তি কামনা করতেন না এবং لعل অব্যয় দ্বারা তাদের মুক্তির আশা করতেন না। যেমন- তিনি (স) বলেছেন- لَعَلَّهُ اَن يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا

অর্থাৎ তিনি খেজুরের শাখা গেড়ে দিয়ে বলেন, হয়ত আল্লাহ তাআলা শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত তাদের আযাবকে হালকা করবেন।

ঘ. আবু বকর (রা) এর হাদীসে আছে- وَمَا يُعَذَّبَانِ اِلَّا فِي الغِيْبَةِ والبَوْلِ

অর্থাৎ তাদেরকে পেশাব এবং গীবতের কারণেই শাস্তি দেয়া হচ্ছে। আলোচ্য হাদীসে গীবত এবং পেশাবের মধ্যে সীমাবদ্ধকরণ দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা মুসলমান ছিলেন।

৩. আল্লামা আইনী (র) ও সংখ্যা গরিষ্ঠ মুহাদ্দিসের মতে তারা মুসলমান এবং মুশরিক উভয়টি ছিলেন। কারণ রাসূলে আকরাম (স) এর এ আমল দুটি আলাদা আলাদা স্থানে হয়েছিল। একটি ছিল সফর অবস্থায়, অপরটি ঘটেছিল মদীনা মুনাওয়ারায় জান্নাতুল বাকীতে। প্রথম ঘটনার বিবরণদাতা হযরত জাবের (রা)। সেখানে উভয় কবরবাসী ছিল কাফির। দ্বিতীয় ঘটনার বিবরণ দাতা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সহ একাধিক সাহাবী। আর এ ঘটনা ঘটেছে জান্নাতুল বাকীতে। এখানে দু'জন সাহাবীকে দাফন করা হয়েছিল। রাসূল (স) এর সুপারিশে গুণাহের ফলে তাদের উপর যে আযাব হচ্ছিল তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এর সমর্থন হয় এর দ্বারা যে, হযরত জাবির (রা) এর রেওয়ায়েত আযাবের কারণ তথা পেশাব ও গীবতের কথা উল্লেখ নেই। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখের রেওয়ায়েতে শাস্তির কারণ সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

কাফিরদের আযাবমুক্তি কামনা করার বিধান

প্রশ্ন ঃ ক. কাফিরের জন্যে আযাবমুক্তির কামনা করা জায়েয নেই। তাহলে রাসূল (স) কিভাবে তাদের জন্য কামনা করলেন?

খ. لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ দ্বারা বুঝা যায় তাদের আযাব হালকা করা হবে না। তাহলে নবী (স) কিভাবে তাদের জন্য আযাব হালকা হওয়ার আশা ব্যক্ত করলেন? এর সমাধান নিম্নরূপ–

উত্তর ঃ ১. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ **অর্থ হচ্ছে** বিচার দিবসের পরে তাদের আযাব হালকা করা হবে না। তবে বিচারের আগে কাফিরদের আযাব হাল্কা করার স্বীকৃতি আছে। যেমন– রাসূল (স) বলেছেন আমার কারণে আবু তালেবের শাস্তি কম হবে।

২. অথবা সাময়িকের জন্য আল্লাহর রাসূল এমন কামনা করেছেন।

৩. অথবা তিনি ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামীন। এ কারণে আযাব হালকা হওয়ার কামনা করেছেন।

৪. নিষেধাজ্ঞা আসার আগে আযাব হালকা হওয়ার কামনা করেছেন।

৫. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে এস্তেগফার করেছেন।

৬. কবরবাসীদ্বয় কাফির ছিল তা রাসূলের জানা ছিল না। বিধায় মুক্তি কামনা করেছেন।

سوال : حديثُ الْبَابِ يُخَالِفُ حديثَ الْمُسْلِمِ فكيف التفصِّي عَنْ هٰذا التَّعَارُضِ؟

প্রশ্ন ঃ উল্লিখিত হাদীসটি মুসলিমের হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। এর সমাধান কি?

উত্তর ঃ হযরত ইবনে আব্বাস ও জাবির (রা) উভয় থেকে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) এর রেওয়ায়েতে একথা স্পষ্ট রয়েছে যে, এদুটি কবর জান্নাতুল বাকীতে ছিল। আর হযরত জাবের (রা) এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় এ ঘটনা সফরকালীন সময়ে সংঘটিত হয়েছে। এ বৈপরীত্যের সমাধান নিম্নরূপ।

১. আল্লামা আইনী (র) এ বিরোধ অবসান করতে গিয়ে বলেন এদুটি আলাদা আলাদা ঘটনা।

২. নাসায়ী শরীফে যে রেওয়ায়েত রয়েছে সেটা মদীনায় সংঘটিত হয়েছে। আর জাবের (রা) এর কর্তৃত বর্ণিত ঘটনা সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেহেতু দুটি ভিন্ন ঘটনা তাই কোন বিরোধ নেই।

৩. নাসায়ী শরীফ্ রাবীদের বর্ণনায় বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, কোন্ কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু মুসলিমের বর্ণনার এটা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি।

৪. নাসায়ী শরীফে বলা হয়েছে যে, নবী (স) একটি ডালকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। অতঃপর দুই ব্যক্তির কবরে উক্ত দুটি অংশকে গেড়ে দেন।

৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর বর্ণনায় নবী (স) এর সাথে সাহাবা কেরামের একটি জামাত রয়েছেন কিন্তু জাবের (রা) এর বর্ণনায় শুধুমাত্র জাবের (রা) রাসূলের সাথে থাকেন। এ সকল আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় দু'জন পৃথক দুটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, একটি নয়। কাজেই কোন বৈপরীত্য থাকলো না।

سوال : حديثُ البابِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ يُخَالِفُ حديثَ البُخَارِيِّ (وما يُعَذَّبَانِ فِى كبيرٍ قال بَلٰى وإنّهما لَكَبِيْرٌ) فكَيْفَ التَفَصِّى عَن هٰذا التعارُضِ؟ او -

سوال : كيفَ قال رسولُ اللّٰه وما يُعَذَّبَانِ فى كَبِيرٍ مَعَ اَنَّهما مِن الكَبائِرِ؟ بَيِّن حَقَّ البَيَانِ

প্রশ্ন : আলোচ্য হাদীসের বর্ণনা এবং বুখারীর হাদীসের বর্ণনার মধ্যে যে, বৈপরীত্য রয়েছে এর সমাধান কি বর্ণনা কর।

অথবা - প্রশ্ন : আলোচ্য গোণাহ্ দুটি কবীরা হওয়া সত্ত্বেও নবী করীম (স) কিভাবে বললেন, وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ **এর যথার্থ ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : وَمَا يُعَذَّبَانِ এর মর্মার্থ ও বৈপরীত্যের সমাধান

চোগলখুরী করা ও পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন না করা কবীরা গোনাহ, তাহলে রাসূল (স) কিভাবে বললেন وما يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ তাদের কে কবীরা গোনাহ এর কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। অথবা নাসায়ী শরীফের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, কবীরা গোণাহ এর কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। অথচ বুখারীর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এ দুটি কবীরা গোণাহ ছিল যার কারণে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এখানে যে اثبات ও نفى এর মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে এর সমাধানে আল্লামা সুয়ূতী বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করা হলো–

১. আব্দুল মালিক বাওনী (র) বলেন, হুজুর (স) কবরবাসীদের প্রতি ধারণা করে বলেছেন যে, তাদেরকে কবীরা গোণাহ এর কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না। ফলে তিনি বললেন, وما يُعَذَّبان فى كبير পরক্ষণেই যখন ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, তাদেরকে কবীরা গোণাহ এর কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তখন তিনি বলেন بلٰى إنّهما لكبيرٌ

২. দাউদী এবং ইবনে আরাবী বলেন–

وما يُعَذَّبان فى كبير এখানে যে কবীরা গোণাহ এর নফী করা হয়েছে তা হলো اكبر الكبائر। তথা কবীরা গোনাহ এর মধ্য হতে যেগুলো বড় সেগুলোর কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না বরং ছোট কবীরা গোনাহ এর কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

৩. وما يُعَذَّبانِ فى كَبِيرٍ عِنْدَكُم وهُوَ كبيرٌ عِنْدَ اللّٰهِ

গোণাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের ধারণা ও শ্রোতাদের ধারণার দিকে লক্ষ্য করে রাসূল (স) বলেছেন وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كبير এগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে কবীরা গোণাহ নয়। কিন্তু যেহেতু এটা আল্লাহ তাআলার নিকট বড় ধরণের গোণাহ হিসাবে বিবেচিত। কাজেই নবী করীম (স) বলেছেন– إنّهُمَا لَكَبِيْرٌ তবে এটা আল্লাহ তাআলার নিকট কবীরা গোণাহ।

৪. ইমাম বগভী (র) বলেন, এগুলো কবীরা গোণাহ হলেও এগুলো থেকে বাঁচা সহজ বিধায় কবীরা গোনাহ নয় বলা হয়েছে। আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ এবং আলিমদের একটি জামাত এটাকেই গ্রহণ করেছেন।

৫. আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, এগুলো প্রকৃত কবীরা গোণাহ নয়। তবে إصْرار على الصَّغائر তথা বারংবার করা এবং এতে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে এ দু'টিকে কবীরা গোনাহ বলা হয়েছে। আর বাক্যে অগ্র-পশ্চাৎ দ্বারা এটাই বুঝে আসে যে, এটা কবীরা গোণাহ; সগীরা গোণাহ নয়।

৬. কেউ কেউ বলেন, এগুলো কবীরা গোণাহ ঠিকই কিন্তু তাদের ধারণায় এগুলো কবীরা গোনাহ নয়।

৭. অথবা, এগুলো سَبْعِ مُهْلِكَات তথা সাতটি ধ্বংসকারী কবীরা গুণাহের মধ্যে গণ্য নয় বিধায় وما يُعَذَّبَانِ فى كبير বলা হয়েছে। মোটকথা, পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করা ও চোগলখুরী করা কবীরা গোনাহ। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য। আর উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এর মধ্যে কোন বৈপরীত্য থাকে না।

سوال : عرِّفِ الصَّغيرةَ والكبيرةَ واذكُر أقوالَ العلماءِ فيهما؟

প্রশ্ন ঃ صغيرة **এবং** كبيرة **গোণাহের সংজ্ঞা দাও অতঃপর এ ব্যাপারে আলিমদের মতামত বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ সগীরা গোনাহের পরিচয় ঃ

صغيرة শব্দটি সিফাতের সীগা, صغر মাসদার থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থ হলো القليل ছোট। সুতরাং এর অর্থ হচ্ছে ছোট গোনাহ, এর বহুবচন হলো صغائر পরিভাষায় সগীরা গোনাহ হচ্ছে- هُوَ مَا الذنبُ الصَّغِيرُ يُغْفَرُ بِالحَسَنَاتِ ومَا أوْعَدَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِالنَّارِ صَرَاحَةً

অর্থাৎ এমন গোনাহ যা নেক কাজ দ্বারা ক্ষমা হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলা সরাসরি জাহান্নামের ভয় দেখাননি। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- ١. إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّأتِكُم اى صَغَائِرَكُمْ

٢. إنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ اى الصَّغَائِرَ.

কবীরা গোনাহের পরিচয় ঃ كبيرة শব্দটি اسم فاعل এর সীগা, كبر থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে العظيم তথা বড়। অতএব ذنب كبير এর অর্থ বড় গোনাহ। শরীয়তের পরিষাভায় কবীরা গোনাহ এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

১. কবীরা গোনাহর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আল্লামা আয়াজ (র) বলেন- الكبيرةُ هِي كلُّ شيءٍ ما نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ

যে সকল কাজ থেকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন সেগুলোই কবীরা গোণাহ।

২. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- كلُّ مَا فِيهِ وعيدٌ شديدٌ بِنَصٍّ مِّنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ

অর্থাৎ যে গুনাহের উপর কিতাব ও সুন্নাহর নস দ্বারা তীব্র ধমকী এসেছে তাই কবীরা গোণাহ।

৩. আল্লামা আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, هُوَ كلُّ مَا أوْجَبَ حَدًّا فِي الدُّنْيَا وَوَعِيْدًا فِي الْآخِرَةِ

অর্থাৎ যার জন্যে পার্থিব জগতে শাস্তি নির্ধারিত এবং পরকালের জন্যে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

৪. কবীরা গোনাহ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনুল মুনীর বলেন-

الكَبَائِرُ هُوَ ما أوْعَدَ اللّٰهُ عليه بالنَّارِ صَرَاحَةً. অর্থাৎ কবীরা গোনাহ হচ্ছে যে গোনাহ এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন।

৫. কেউ কেউ বলেন, هو مَا لا يُغْفَرُ إلاَّ بِالتَّوْبَةِ অর্থাৎ যে অপরাধ তওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হয় না ।

৬. কোন কোন আলেম বলেন- هو مَا يُكَفِّرُ مُسْتَحِلُّهُ

سوال : اينَ كانَ القَبْرانِ؟

প্রশ্ন ঃ কবর দু'টি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর ঃ কবরদ্বয়ের অবস্থান ঃ কবরদ্বয় কোথায় অবস্থিত এ ব্যাপারে আলিমগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. জুমহুর উলামায়ে কেরামের মত হলো কবর দুটি মদীনার জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত। এর প্রমাণ হলো হাদীসের বাণী- انّه صلى اللّٰه عليه وسلم مَرَّ بالبَقِيعِ فقَالَ مَنْ دَفَنْتُمُ اليَوْمَ هٰهُنَا

নবী (স) বাকী নামক স্থান দিয়ে অতিক্রম করেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কবর দুটি মদীনার জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত।

২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ও আল্লামা আইনী (র) বলেন, স্বতঃসিদ্ধ কথা এটাই যে, কবর দুটি জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত এবং এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত।

৩. কেউ কেউ বলেন, কবর দুটি মক্কায় অবস্থিত।

৪. কেউ কেউ বলেন, কবর দুটি মদীনার বাইরে একটি বাগানের পার্শ্বে অবস্থিত। যেমন- হাদীসের বাণী-

مَرَّ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بِحَائِطٍ مِّنْ حِيْطَانِ المَدِيْنَةِ او مَكَّةَ فَسَمِعَ صوتَ إنْسَانَيْنِ.

سوال : مَا الحِكمةُ فِى غَرْزِ الجَرِيْدَةِ ؟

প্রশ্ন ঃ কবরের উপর কাঁচা ডাল পুতে রাখার রহস্য কি?

উত্তর ঃ কবরের উপরে কাঁচা ডাল পুতে রাখার রহস্য

কবরের উপর কাঁচা ডাল পুতে রাখার নিম্নোক্ত রহস্যগুলো থাকতে পারে।

১. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, সজীব বৃক্ষ ও ডাল আল্লাহ তাআলার তাসবীহ আদায় করে। যেমন– আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– وَاِنْ مِنْ شَيْئٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِن لاَّتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

তাই রাসূল (স) চিন্তা করলেন, যতক্ষণ ডাল আল্লাহর যিকির করবে, ততক্ষণ আযাব কিছুটা হাল্কা থাকবে।

২. ইমাম নববী (র) বলেছেন কবরবাসীদ্বয়ের কষ্ট দেখে রাসূল (স) তাদের আযাব থেকে মুক্তি কামনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা এ মর্মে তার মনবাঞ্ছা পুরণ করেছেন যে, দুটি ডাল পুঁতে দিন তা শুকানো পর্যন্ত আপনার মনবাঞ্ছা পূরণ হবে। لِاَجلِ ذَالِكَ غَرَسَ الرسولُ الجَرِيدةَ عَلٰى قَبْرَيْهِمَا

৩. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, ডাল পুঁতে রাখা বাহ্যিক নির্দশন মাত্র। মূলত: রাসূল (স) এর হাতের বরকতে তাদের শাস্তি কিছুটা লাঘব হয়েছে।

৪. কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, সর্বযুগে সর্বকালে এরূপ করা হয়ে আসছে। তাই এটা রাসূল (স) এর উপর খাস নয় বরং এরূপ যে কেউ করলে কবরবাসী তার ফল পাবে। لاَنّهُ عَمِلَ بِهِ كَثِيرٌ مِّنَ العُلَمَاءِ والمَشَائِخِ

৫. আল্লামা মুযানী (র) বলেন, হতে পারে নবী (স) কে ওহীর মাধ্যমে অবগত করানো হয়েছে যে, এ সময় পর্যন্ত তাদের শাস্তি হাল্কা রাখা হবে। তাই নবী (স) শাস্তি হাল্কা হওয়ার জন্য খেজুরের ডাল পুঁতে দিয়েছেন।

৬. ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, নবী (স) এ পরিমাণ সময়ের জন্য সুপারিশ করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেছেন। ফলে শাস্তি হাল্কা হওয়ার জন্য খেজুরের ডাল পুঁতে দেন।

৭. কারো কারো মতে কবর দুটিকে চিহ্নিত করার জন্যে খেজুরের ডাল পুঁতে দিয়েছেন।

سوال : هَل فى العَسِيبِ الرَّطْبِ معنًى لَيْسَ فِى اليَابِسِ؟ والاَّ فَلِمَ قالَ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم "لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا" وهل يَجوزُ لَنَا مِثْلَ هٰذا العَمَلِ اِسْتِدلالاً بِهٰذا الحَدِيْثِ؟

প্রশ্ন ঃ সতেজ ডালে কি এমন কিছু রহস্য আছে যা শুকনো ডালে নেই? নতুবা রাসূল (স) কেন বললেন যে, সম্ভবত এর দরুণ আযাব কিছু লাঘব হবে? আর আমাদের জন্য কি এরূপ করা জায়েয হবে?

উত্তর ঃ কাঁচা ডাল পুতে রাখার রহস্য ঃ কাঁচা খেজুরের ডাল কবরের উপর পুঁতে রাখার পেছনে নিম্নোক্ত রহস্য থাকতে পারে যা শুকনো ডাল দ্বারা অর্জিত হবে না।

১. ইমাম নববী (র) বলেন, কবরবাসীদের কষ্ট দেখে রাসূল (স) তাদের আযাব থেকে মুক্তির উপায় চিন্তা করেছেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা এ মর্মে রাসূলের অন্তরে ভাবোদয় করেছেন যে, দুটি ডাল পুঁতে দিন। তা শুকানো পর্যন্ত আপনার মনোবাঞ্ছা পুরণ হবে। এ জন্যে শুকনো ডাল না পুঁতে কাঁচা ডাল পুঁতে দিয়েছেন।

২. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, সজীব বৃক্ষ ও ডাল আল্লাহ তাআলার তাসবীহ বর্ণনা করে যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَاِنْ مِنْ شَيْئٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِن لاَّتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ.

রাসূল (স) চিন্তা করলেন যতক্ষণ ডাল আল্লাহর যিকির করবে ততক্ষণ আযাব কিছুটা হাল্কা হবে। এ মর্মে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন– لَعَلَّه اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا

৩. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন ডাল পুঁতে রাখা বাহ্যিক নিদর্শন মাত্র। মূলতঃ রাসূল (স) এর হাতের বরকতেই তাদের শাস্তি কিছুটা লাঘব হয়েছে।

৪. কতিপয় আলেমের মতে, কবর দুটি চিহ্নিত করে রাখার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কাঁচা খেজুরের ডাল পুঁতে দিয়েছিলেন।

৫. অথবা অহীর মাধ্যমে আদিষ্ট হয়ে এরূপ করেছেন।

কবরে গাছের ডাল পুঁতে রাখার বিধান ঃ এ হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে আমাদের জন্য কবরে ডাল পুঁতে দেয়া জায়েয হবে কি-না এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, কবরে ডাল পুঁতে রাখা বিদআত। এটা রাসূল (স) এর সাথে খাস। বস্তুত রাসূল (স) এর হাতের বরকতেই তাদের আযাব হাল্কা হয়েছে। কবর দুটিকে চিহ্নিত করার জন্যে তিনি ডাল পুঁতেছেন।

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, এটা আমাদের জন্যে জায়েয।

وَقَدْ أَوْصٰى بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيُّ الصَّحَابِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِيْ قَبْرِهٖ جَرِيْدَتَانِ .

৩. তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন প্রণেতা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বলেন, যেহেতু রাসূল (স) এরূপ করেছেন। তাই সময়ে সময়ে গাছের ডাল পুঁতে রাখা জায়েয। তবে- سنة مستقلة ও عادت جارية এর বিষয় নয়।

৪. কেউ কেউ বলেন, এটা মুস্তাহাব।

سوال : ما هُوَ سببُ اختيار الرَّطْبِ؟ إنْ كان مُنْشَاهُ التَّسْبِيْحُ فكُلُّ شَيْئٍ يُسَبِّحُ كَمَا قال اللّٰهُ تَعالٰى وَاِنْ مِّنْ شَيْئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ اَوْضِحْ حيثُ يُرفعُ الْإِشْكَالُ.

প্রশ্ন ঃ কাঁচা খেজুরের ডাল গ্রহণ করার কারণ কি? যদি এতে ডালের তাসবীহ করা উদ্দেশ্য হয় তবে প্রতিটি জিনিসই তো আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وان من شئى الا يسبح بحمده এর সঠিক উত্তর দাও যাতে প্রশ্ন দূরীভূত হয়।

উত্তর ঃ খেজুরের কাঁচা ডাল গ্রহণ করার কারণ ঃ রাসূল (স) আযাবে লিপ্ত কবরদ্বয়ের উপর দুটি কাঁচা খেজুরের ডাল পুঁতে দিয়েছিলেন এ জন্যে যে, খেজুরের ডালের তাসবীহ আযাব লাঘব করার অসিলা হবে। কিন্তু কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে যে সতেজ হোক বা শুকনো হোক প্রতিটি জিনিসই সার্বক্ষণিক আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করে যার প্রমাণ কুরআনের বাণী- وَاِنْ مِّنْ شَيْئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

অর্থাৎ স্বর্গ মর্তে এমন কোন বস্তু নেই যা প্রশংসাবাদের সাথে আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করে না। তবে তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না। রাসূল (স) গাছের শুকনো ডাল গ্রহণ না করে খেজুরের সতেজ ডাল গ্রহণ করার রহস্য সম্পর্কে আমাদের মনীষীগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন। যেমন-

১. সে সময়ে খেজুর গাছের সংখ্যা অধিক ছিল, আর সব জায়গায় সব ধরণের গাছ পাওয়া যেত না। হয়তো কবর দুটির নিকট খেজুর গাছ ব্যতীত অন্য কোন গাছ ছিল না। তাই তিনি(স) খেজুরের কাঁচা ডাল নিয়েছেন।

২. অথবা, তৎসময়ে যে কোন কাজে খেজুরের ডাল ব্যবহার করার বহুল প্রচলন ছিল।

৩. অথবা, মরু অঞ্চলে খেজুরের ডাল দীর্ঘদিন সতেজ থাকে।

৪. খেজুর গাছ বরকতময়, এ হিসেবে তার ডাল অধিকহারে আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করে।

৫. রাসূল (স) ওহীর মাধ্যমে আদিষ্ট হয়ে খেজুরের ডাল দুটি পুঁতে দিয়েছেন।

৬. সর্বোপরি কাঁচা ডাল শুকনো ডালের চাইতে অধিক তাসবীহ পাঠ করে থাকে।

سوال : ما هُوَ الحكمُ فِيْ غرسِ العَسِيْبِ علَى الْقَبْرِ؟ وهلْ يجوزُ وَضْعُ الْأَزْهَارِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ الْمُرَوَّجُ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ؟ اكْتُبْ مُدَلَّلًا.

প্রশ্ন ঃ কবরের উপর খেজুরের কাঁচা ডাল পুঁতে রাখার বিধান কি? বর্তমান যুগে প্রচলিত নিয়মের মতো কবরে ফুল ছিটিয়ে রাখা কি জায়েয আছে? দলীলসহ লিখ।

উত্তর ঃ কবরে কাঁচা ডাল পুঁতে রাখার বিধান ঃ এ হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে এরূপ ফতোয়া দেয়া যাবে কি না যে, কবরে ডাল রোপন করা ও পুষ্পমালা অর্পণ করা জায়েয? নিম্নে এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতামত পেশ করা হলো।

১. **বিদ'য়াতীদের অভিমত ঃ** বিদআতীগণ বলেন উভয়টি জায়েয বরং মুস্তাহাব।

২. **ইমাম বুখারীর অভিমত ঃ** ইমাম বুখারী, ইবনে বাত্তাল ও আল্লামা মাযিনী প্রমুখের মতে কবরে ডাল রোপন

ও পুষ্প অর্পন কোনটাই জায়েয নেই। কেননা, এটা রাসূল (স) এর বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর নিকট এ মর্মে ওহী এসেছিল। অথবা আযাব রাসূল (স) এর পবিত্র হাতের স্পর্শে হাল্কা হয়েছে।

৩. ইমাম নববী ও ইবনে হাজারের অভিমত : ইমাম নববী ও আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) এর মতে কবরে ডাল পুঁতে রাখা জায়েয।

وَقَدْ اَوْصٰى بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ الاَسْلَمِىُّ الصَّحَابِىُّ اَنْ يُّجْعَلَ فِىْ قَبْرِهٖ جَرِيْدَتَانِ ـ

৪. আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, এটা হারা। মাআরিফুল কুরআন প্রণেতা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বলেন, যেহেতু রাসূল এরূপ করেছেন। তাই কখনো কখনো গাছের ডাল পুঁতে রাখা জায়েয। তবে এটা سنة مستقلة ও عادت جارية এর বস্তু নয়। কবরে ফুল দেয়া, আতর-লোবান ছিটানো ও বাতি দেয়া এগুলো সম্পূর্ণ হারাম।

فَالْحَقُّ اَنْ يُّعْطٰى كُلَّ شَيْئٍ حَقَّهٗ وَلَا يُجَاوِزُ عَنْ حَدِّهٖ وَهُوَ الْفِقْهُ فِى الدِّيْنِ ـ

কবরে ফুল দেয়ার বিধান : ইমাম খাত্তাবী ও ইবনে বাত্তাল প্রমুখের মতে, কবরে ডাল প্রথিত করা ও পুষ্প অর্পন কোনটাই জায়েয নেই। কেননা, এটা রাসূল (র) এর জন্যে খাস। আর আযাব হাল্কা হওয়া মূলত রাসূল (স) এর হাতের বরকতে হয়েছে। এটা ছিল তার মুজিযা। বর্তমান যুগে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাদের কবরের উপর বা অনেক সময় বুযুগগণের কবরের উপর পুষ্পার্পণ করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে বিদআত ও হারাম। কেননা, রাসূল (স), তাঁর সাহাবা ও তাবেয়ীদের যুগে এর কোন প্রমাণ নেই। এছাড়া এটা মুশরিকদের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা, তারা ফুল দ্বারা দেবদেবীর পুঁজা করে থাকে। কাজেই এটা হারাম।

سوال : مَاذَا اَرَادَ النَّسَائِىُّ بِقَوْلِهٖ خَالَفَهٗ مَنْصُوْرٌ وَاِلٰى مَنْ يَّرْجِعُ الضَّمِيْرُ فِىْ قَوْلِهٖ خَالَفَهٗ؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন : ইমাম নাসায়ী (র) خالفه منصور **বলে কি বুঝাতে চেয়েছেন?** خالفه **এর যমীর দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে? বর্ণনা কর।**

উত্তর : خالفه **এর "ه" যমীরের** مرجع

১. কেউ কেউ বলেন, "ه" যমীরের مرجع হল এ বিষয় যে, لَعَلَّهٗ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا অর্থাৎ এ অংশটুকুর ব্যাপারে মানসুর মতবিরোধ করেছেন।

২. কেউ বলেন, "ه" যমীরের مرجع হল اعمش। অর্থাৎ আ'মাশ ও মানসুর উভয়ে হযরত মুজাহিদের শিষ্য। তারা উভয়ে স্বীয় উস্তাদ থেকে বর্ণনা করার দিক দিয়ে পরস্পরে শরীক। কিন্তু মানসুর "তাউসকে" উল্লেখ না করে আ'মাশ এর বিরোধিতা করেছেন, তথা মানসুর তাউসকে উল্লেখ করা ছাড়া ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আ'মাশ তাউস এর মাধ্যম রেখে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

سوال : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ النَّمِيْمَةِ وَالْغِيْبَةِ؟ وَمَا اَرَادَ بِقَوْلِهٖ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهٖ؟

প্রশ্ন : পরনিন্দা ও চোগলখুরীর মধ্যকার পার্থক্য কি? রাসূল (স) لا يستتر من بوله **বলে কি বুঝাতে চেয়েছেন?**

উত্তর : গীবত ও চোগলখুরীর মধ্যকার পার্থক্য : غيبة এবং نميمة শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে পরনিন্দা করা চোগলখুরি করা। পশ্চাতে সমালোচনাকারী ও কুৎসা রটনাকারী ব্যক্তিকে مُغْتَاب ও نمّام বলা হয়। উভয়টি মানসিক ব্যাধি। শরীয়ত এ ধরণের হীন কাজ করা থেকে নিষেধ করেছেন। যেমন কুরআন ও হাদীসের বাণী–

١. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ـ

অর্থাৎ তোমরা পরস্পরে একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি স্বীয় মৃত ভায়ের গোশত খেতে পছন্দ করে?

٢. وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ـ

অর্থাৎ গীবত যিনা থেকে মারাত্মক।

٣. وقال رسولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلَّمَ لايَدْخُلُ الجنةَ نمَّامٌ.

অর্থাৎ চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

১. ফয়জুল বারী গ্রন্থে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) গীবত ও নামীমার মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন–

اِنَّ الغِيْبَةَ ذِكْرُهٗ فِى غَيْبَتِهٖ بِمَا يَكْرَهُ والنَّمِيْمَةُ نَقْلُ حَالِ الشَّخْصِ لِغَيْرِهٖ عَلٰى جِهَةِ الْاِفْسَادِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ.

অর্থাৎ কারো পেছনে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে তাকেই গীবত বলে। আর গণ্ডগোল সৃষ্টি ও ক্ষতির নিয়তে একজনের অবস্থা অন্যজনের নিকট বর্ণনা করাকে نميمة বলা হয়।

২. মু'জামুল ওয়াসিত গ্রন্থে এ শব্দদ্বয়ের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন-

الغيبةُ أنْ تذكُرَ اخاكَ مِنْ وَّرائِهٖ بمَا فيهِ مِن عيُوبٍ يَسْتُرُهَا ويَسُوْءُ ذِكْرُهَا.

অর্থাৎ তোমার ভাইয়ের পিছনে তার গোপন দোষণীয় কথা বর্ণনা করা যা সে অপছন্দ করে তাকে গীবত বলে।

النَّمِيْمَةُ هِىَ سَعْىٌ بِالحَدِيثِ لِيُوقِعَ بَيْنَ النَّاسِ.

অর্থাৎ কারো পিছনে এমন কথা বলা যা দ্বারা মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি হয় তাকে নামীমা বলে।

রাসূলের বাণী – قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم النميمَةُ نَقْلُ كلامِ الْغَيْرِ بِقَصْدِ الْاِضْرَارِ

৩. গীবত শুধুমাত্র নিন্দা করার উদ্দেশ্যে হয়, পক্ষান্তরে নামীমা দু'জনের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে হয়।

৪. গীবতের মধ্যে গণ্ডগোল ও ক্ষতির ইচ্ছা থাকে না যদিও অনেক সময় ক্ষতি হয়। আর নমীমা এর মধ্যে ক্ষতি ও ফিতনা সৃষ্টি করার ইচ্ছা থাকে।

৫. গীবতের তুলনায় নামীমা বেশী ভংকর।

৬. গীবত হচ্ছে কবীরা গোনাহ, আর নামীমা হচ্ছে اشدُّ الكَبَائِرِ তথা মারাত্মক ধরণের কবীরা গোণাহ।

لايَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهٖ এর মর্মার্থ ঃ لايَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهٖ অর্থাৎ সে পেশাব করার সময় সতর ঢাকতো না। অন্য রেওয়ায়েতে আছে لايَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهٖ তথা পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না। কাজেইশরীরে বা কাপড়ে পেশাব লাগার ফলে নামায শুদ্ধ হত না। অন্য হাদীস দ্বারা এর সমর্থন বুঝা যায়–

١. اِسْتَنْزِهُوا عَنِ البَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ (بخارى)

তোমরা পেশাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকো।

٢. اِتَّقُوا بِالْبَوْلِ فَاِنَّهٗ اوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ فِى الْقَبْرِ (طبرانى)

অর্থাৎ তোমরা পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। কেননা কবরে বান্দা থেকে সর্ব প্রথম এ বিষয়ে হিসাব নেয়া হবে। কেউ কেউ বলেন লোকটি পশুর পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না।

سوال : مَا الاختلافُ بَيْنَ الائمَةِ فى حكمِ بَولِ الكبيرِ وبولِ الصغيرِ وطريقُ التَّطهيرِ عنهما؟ اوضِحِ المَسْئَلَةَ.

প্রশ্ন ঃ শিশুদের পেশাব এবং বড়দের পেশাব থেকে পবিত্রতার বিধান নিয়ে ইমামদের মাঝে কি মত পার্থক্য রয়েছে? ব্যাখ্যাসহ মাসআলাটি লেখ।

উত্তর ঃ বড়দের পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিধান ঃ শিশু খাদ্য-দ্রব্য আহার করলেই তাকে বড় হিসাবে গণ্য করা হয়। বড়দের পেশাব নাজাসাতে গলীজা। এটি ভাল করে ধৌত করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। কেননা, রাসূল (স) বলেছেন–

١. اِتَّقُوا بِالْبَوْلِ فَاِنَّهٗ اوَّلُ مَايُحَاسَبُ بِهِ العبدُ فِى قَبْرِهٖ.

অর্থাৎ পেশাব থেকে বাঁচো। কেননা, বান্দা থেকে কবরে সর্ব প্রথম পেশাবের হিসাব নেয়া হবে।

٢. اِسْتَنْزِهُوا عَنِ البَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذابِ القَبْرِ مِنْهُ.

অর্থাৎ তোমরা পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচো কেননা কবরে এরকারণেই সাধরণত শাস্তি দেয়া হয়।

৩. اِنَّمَا يُغْسَلُ ثَوْبُكَ مِنَ الْبَوْلِ .

অর্থাৎ তোমরা পেশাব থেকে কাপড় ধৌত কর।

শিশুদের পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিধান ঃ যে শিশু দুধ ছাড়া অন্য কোন খাদ্য খায় না, তাকে صغير হিসাবে গণ্য করা হয়। ছোট শিশুর পেশাব থেকে পবিত্রতার্জন নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত ঃ ইমাম শাফেয়ী আহমদ, ইসহাক ও হাসান বসরী (র) এর মতে বালক ও বালিকার পেশাবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তা হচ্ছে– বালিকার পেশাব ধৌত করতে হবে এবং বালকের পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিলে পবিত্রতা হাসিল হয়ে যাবে। তাদের দলীল নিম্নরূপ–

১. عن امّ سلمةَ (رض) اَنَّهُ صلعم قال بولُ الغُلامِ يُنْضَحُ وبولُ الجارِيةِ يُغْسَلُ (ابن ماجه)

অর্থাৎ উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত নবী (স) নবী (স) বলেন– বালকের পেশাবের ক্ষেত্রে পানি ছিটা দিলেই পবিত্রতা হাসেল হবে। আর বালিকার পেশাব ধৌত করতে হবে।

২ . عن لُبَابَة بنتِ الحارثِ اَنَّه صلعم قالَ اِنَّمَا يُغْسَلُ مِن بَولِ الاُنْثٰى يُنْضَحُ مِنْ بَولِ الذَّكَرِ (ابوداود)

অর্থাৎ লুবাবা বিনতে হারেস থেকে বর্ণিত নবী (স) বলেন, বালিকার পেশাব থেকে পবিত্রতা হাসিল করার পদ্ধতি হল ধৌত করা। আর বালকের পেশাব থেকে পবিত্রতা হাসিল করার পদ্ধতি হল পানি ছিটিয়ে দেয়া।

৩. وفى روايةٍ اِنَّه صلعم قال يُغْسَلُ مِنْ بَولِ الجَارِيَةِ ويُرَشُّ مِن بَولِ الغُلَامِ (نسائى)

অর্থাৎ নবী (স) বলেন বালিকার পেশাব ধৌত করতে হবে আর বালকের পেশাবে পানি ছিটাতে হবে।

২. ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র) এর অভিমত ঃ ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র) বলেন, শিশুটি ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাদের পেশাবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের পেশাব ধৌত করা আবশ্যক। তাঁদের দলিল নিম্নরূপ–

১. اِسْتَنْزِهُوا عَنِ البَوْلِ فَاِنَّ عامَّةَ عَذابِ القَبْرِ مِنْهُ

অর্থাৎ তোমরা পেশাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকে। কেননা, অনেক কবরের আযাব এর কারণেই হয়ে থাকে।

২ . وفِى حديث عَمَّارٍ اِنَّمَا يُغْسَلُ ثَوبُكَ مِنَ البَوْلِ .

আম্মার (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে আছে– তুমি কাপড়কে পেশাব থেকে ধৌত কর।

৩. عن عائشةَ (رض) قالت كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُؤتى بالصِّبيانِ فَاُتِىَ بِصَبِىٍّ مَرَّةً فبالَ عَلَيْه فقال صُبُّوا عَلَيْه بِالْماءِ صَبًّا (طحاوى)

আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) পেশাব লাগার কারণে তাকে পবিত্রতা করার জন্যে পানি দ্বারা ধৌত করতে বলেছেন। আর এখানে ছেলে ও মেয়ের কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাই বুঝা গেল পেশাবযুক্ত কাপড় পবিত্র করার জন্যে ধৌত করা আবশ্যক।

৩. কেউ কেউ বলেন উভয়ের পেশাব পবিত্র করণের জন্যে نضح তথা পানি ছিটানোই যথেষ্ট।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র) এর দলীলের জবাব হল–

১. হাদীসে نضح দ্বারা غسل উদ্দেশ্য। যেমন–

اِنَّه صلى الله عليه وسلم قال اذا وَجَدَ اَحَدُكُم المَذِىَّ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ اى يَغْسِلُ

এখানে نضح শব্দটি غسل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. তৃতীয় হাদীসে رش দ্বারা غسل উদ্দেশ্য। যেমন– তিরমিযী শরীফে আছে– حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ ثُمَّ رُشِّيهِ وصلى فيه . এখানে رش শব্দটি غسل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই বুঝা গেল ধৌত করা ছাড়া পেশাবযুক্ত কাপড় পবিত্র হবে না।

سوال : بَيِّنْ اَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِى بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مَعَ دَلَائِلِهِمْ

প্রশ্ন ঃ যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া বৈধ সে সবের পেশাবের বিধান সম্পর্কে আলিমদের মতামত ও দলিলসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ হালাল প্রাণীর পেশাব সংক্রান্ত বিধান ঃ হালাল প্রাণীর পেশাব হালাল কিনা এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তা বর্ণনা করা হল–

১. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ও যুফার (র) এর মতে হালাল প্রাণীর পেশাব পবিত্র। তাঁরা তাদের মতের স্বপক্ষে নিম্নক্ত দলীলগুলো পেশ করেন–

١. قال رسولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم اشْرَبُوا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا.

নবী (স) বলেন, তোমরা উটের পেশাব এবং দুধ পান কর।

٢. صَلُّوا فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

তোমরা ছাগলের আস্তাবলে নামায পড়।

٣. انّه صلى الله عليه وسلم قال لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

যে সব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল তার পেশাব লাগলে কোন সমস্যা নেই। (কারণ তার পেশাব পবিত্র।)

২. আসহাবে জাওয়াহের বলেন, সকল প্রাণীর পেশাব পবিত্র তবে কুকুর, শূকর ও মানুষের কথা ভিন্ন।

৩. ইমাম শাফেয়ী, আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) বলেন, সকল প্রাণীর পেশাব হারাম চাই তার গোশত খাওয়া হালাল হোক কিংবা হারাম হোক।

দলীল ঃ

١. اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.

٢. قال رسولُ صلى الله عليه وسلم عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَتَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ.

٣. اِتَّقُوا الْبَوْلَ فانه اولُ مايُحَاسَبُ بِهِ العبدُ فِى قبره.

এমনিভাবে কুরআনের আয়াত দ্বারাও এটা বুঝা যায়। কুরআনের আয়াত–

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِى بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِيْنَ

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, দুধ ছাড়া পেটে যা রয়েছে সব হারাম ও অপবিত্র।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ

১. উরাইনা গোত্রকে রাসূল (স) ওষুধ স্বরূপ উটের পেশাব পান করার অনুমতি দিয়েছেন।

২. তাদের হাদীস রহিত হয়ে গেছে। আর তা হল– اِسْتَنْزِهُوا عَنِ البَوْلِ فانّ عامّةَ عذابِ القبرِ منه

سوال : هل يجوزُ التَّدَاوِى بالمُحَرَّمَاتِ؟ ما الاختلافُ فِيْهِ.

প্রশ্ন ঃ হারাম বস্তু দ্বারা ওষুধ গ্রহণ কি জায়েয? এ বিষয়ে কি মতপার্থক্য রয়েছে?

উত্তর ঃ হারাম বস্তু দ্বারা ওষুধ গ্রহণঃ হারাম বস্তু দ্বারা ওষুধ গ্রহণ বৈধ কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হল–

১. ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার (র) বলেন, হারাম বস্তু দ্বারা ওষুধ গ্রহণ বিনা শর্তে জায়েয।

দলিল ঃ ১. اِشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا নবী করীম (স) যেহেতু পেশাব খেতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটা ছিল তাদের শারিরীক সুস্থতায় ওষুধস্বরূপ। কাজেই হারাম বস্তু দ্বারা ওষুধ গ্রহণ করা বৈধ।

২. ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, যে কোন মাদকদ্রব্য দ্বারা ওষুধ গ্রহণ হারাম। আর যাতে মাদকতা নেই তা হারাম হলেও তাকে ওষুধ হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ।

৩. ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আবু ইউসুফ (র) এর মতে হারাম বস্তু দ্বারা ওষুধ গ্রহণ করা জায়েয নেই। তাঁদের দলীল নিম্নরূপ–

١. قال رسول الله صلعم في الخمر لكنها داء ٢. نهى النبى صلعم عن الغواء الخبيث

٣. عن ام سلمة قالت النبى صلعم ان الله لا يجعل شفاء امتى فيما حرم عليها.

তবে জীবন নাশের সম্ভাবনা দেখা দিলে এবং হারাম বস্তু ছাড়া অন্য কোন ওষুধ না থাকলে সুদক্ষ চিকিৎসকের ব্যবস্থা অনুযায়ী হারাম বস্তু ব্যবহার করা যাবে। কেননা ইরশাদ হয়েছে–

١. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم ... الخ

٢. قال الحكماء والاصوليون الضرورات تبيح المحذورات.

এজন্য আল্লামা আইনী (র) বলেছেন– واما في حالة الاضطرار فلا يكون حراما كالميتة للمضطر

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ

১. ইমাম ইবনুল হুমাম বলেন এ হুকুম ইসলামের প্রথম যুগে ছিল, পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে।

২. এটা উরায়নাবাসীদের সাথে খাস ছিল।

سوال : اكتب نبذا من حياة عبد الله بن عباس (رض) بالايجاز؟

প্রশ্ন ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।

উত্তর ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এর জীবনচরিত ঃ

পরিচিতি ঃ নাম আব্দুল্লাহ। উপনাম আবুল আব্বাস, পিতার নাম আব্বাস। মায়ের নাম লুবাবা বিনতে হারেস, ইবনে আব্বাস রাসূল (স) এর চাচাত ভাই ছিলেন।

জন্ম গ্রহণ ঃ নবুওয়াতের ১০ম বর্ষে তিনি মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। হিজরতের সময় তার বয়স ছিল তিন বছর। তার মা লুবাবা হিজরত করতে পারেননি। রাসূলের ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল ১৩ বছর।

ইসলাম গ্রহণ ঃ তার মাতা লুবাবা বিনতে হারিস হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বিধায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে আশৈশব মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়।

অন্যান্য তথ্য ঃ গভীর জ্ঞানের অধিকারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কে সকলে খুবই আদর করতেন। তাঁর কাছ থেকে হযরত ওমর (রা) ও ওসমান (রা) পরামর্শ নিতেন, তিনি হযরত ওমরের শাসনামলে যৌবনে পদাপর্ণ করেন। হযরত আলী (রা) এর শাসনামলে তিনি বসরার গভর্ণর ছিলেন। ৩৭ ও ৩৮ হিজরীতে সংঘঠিত যথাক্রমে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীন তিনি আলী (রা) এর পক্ষে এক অংশের সেনাপতি ছিলেন এবং সিফফীনের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন।

বৈশিষ্টাবলী ঃ তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। তাফসীর ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। রাসূল (স) তার জন্যে দুআ করে বলেছেন– اللهم علمه الحكمة وعلمه التاويل।

রাসূল (স) এর দুয়ার ফলে তিনি তাফসীর শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাই হযরত ওমর (রা) তাঁকে পরামর্শ সভার সদস্য হিসেবে নিয়োগ করেন।

হাদীস বর্ণনা ঃ তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের একজন ছিলেন। তিনি সর্বমোট **১৬৬০টি** হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার নিকট থেকে অসংখ্য সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তিকাল ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর এর খিলাফতকালে ৭১ বছর বয়সে ৬৮ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন, তাকে তায়েফে দাফন করা হয়।

بَابُ الْبَوْلِ فِى الْإِنَاءِ

٣٢. اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدِنِ الْوَزَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَتْنِى حُكَيْمَةُ بِنْتِ اُمَيْمَةَ عَنْ اُمِّهَا اُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِىِّ ﷺ قَدَحٌ مِنْ عِيْدَانٍ يَبُوْلُ فِيْهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيْرِ -

الْبَوْلُ فِى الطَّسْتِ

٣٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَزْهَرُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَوْصٰى اِلٰى عَلِىٍّ لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُوْلَ فِيْهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا اَشْعُرُ فَاِلٰى مَنْ اَوْصٰى -

অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রে পেশাব করা

অনুবাদ ঃ ৩২. আইয়ূব ইবনে মুহাম্মদ আল ওয়ায্‌যান (র).........উমাইয়া বিনতে রুকায়কা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য আইদান কাষ্ঠ নির্মিত একটি পেয়ালা ছিল। তিনি তাতে (রাত্রে) পেশাব করতেন এবং তা খাটের নিচে রেখে দিতেন।

তস্ত-এর মধ্যে পেশাব করা

৩৩. আমর ইবনে আলী (র)...........আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলে যে, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে ওসিয়ত করেছেন। (অথচ তিনি তাঁর অন্তিমকালে) পেশাব করার জন্য একটি তস্ত আনতে বলেন, আমি তার দেহ মোবারককে একটু বাঁকিয়ে ধরে রেখেছিলাম। আর আমি জানি না তিনি কাকে ওসিয়ত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : مَتٰى يَبُوْلُ النَّبِىُّ فِى الْقَدَحِ؟ وَمَا الْحِكْمَةُ فِيْهَا بَيِّنْ مُوَضِّحًا.

প্রশ্ন ঃ নবী (স) পাত্রে কখন পেশাব করতেন? এবং তাতে পেশাব করার হিকমত কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ পাত্রে নবী (স) এর পেশাব করার সময়কাল ঃ নবী (স) পাত্রের মধ্যে কখন পেশাব করতেন এটা নাসায়ী শরীফের বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই তবে আবু দাউদের বর্ণনায় يبول فيه এর পরে بالليل শব্দ অতিরিক্ত রয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী (স) এর পাত্রে পেশাব করার ঘটনা ছিল রাত্রে অর্থাৎ নবী (স) এর যখন রাতে পেশাবের বেগ হত তখন তিনি পাত্রে পেশাব করে খাটের নীচে রেখে দিতেন।

পাত্রে পেশাব করার রহস্য ঃ ১.শীতকালে পেশাব করার জন্যে বাহিরে বের হওয়া অনেক সময় কষ্টকর হয়ে যায়। তাছাড়া শারীরিক অসুস্থতা বা বিশেষ কোন ওজরও থাকতে পারে।

২. উম্মতের শিক্ষা দেয়ার জন্য এমনটা করেছেন যে, ঘরে থাকা পাত্রে পেশাব করা বৈধ।

৩. শয়তানের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য এমন করতেন। কেননা, এ সময়ে তারা বেশি ক্ষতি করে।

৪. উম্মতের উপর আসান করার জন্যে এবং তাদের প্রতি স্নেহের দৃষ্টি রেখে এ বিধান শিখায়েছেন।

سوال : بَيِّنْ غَرَضَ الْحَدِيْثِ.

প্রশ্ন ঃ আলোচ্য হাদীসের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ আলোচ্য হাদীসের উদ্দেশ্য ঃ গভীর রাতে যদি কারো পেশাবের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে বাথরুমে গিয়েই পেশাবের প্রয়োজন পূর্ণ করাটাকে কেউ যেন আবশ্যক মনে না করে বরং কোন প্রয়োজন বা ওজরের কারণে ঘরের ভেতরে কোন পাত্রে পেশাব করাতে কোন অসুবিধে নেই। এটা বর্ণনা করাই আলোচ্য হাদীসের উদ্দেশ্য।

سوال : حديثُ الباب (كانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدَحٌ مِن عِيدانٍ يبولُ فيه) مخالفٌ لِحديثِ ابنِ عمرَ وغيرِه (لاتدخلُ الملائكةُ بَيْتًا فيه بولٌ) فكيف التوفيقُ بينَهُما بَيِّن موضحا ۔

প্রশ্ন : আলোচ্য হাদীস তথা নবী (স) পাত্রে পেশাব করতেন এটা ইবনে উমর ও অন্যান্যদের হাদীসের পরিপন্থী। কেননা, তাতে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করে না যেখানে পেশাব থাকে। এ বৈপরীত্যের সমাধান কি বর্ণনা কর।

উত্তর : তাবারানী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত আছে যে,

لا ينفع بولٌ فِى طستٍ فى البيتِ فانّ الملائكةَ لاتدخلُ بيتًا فيهِ بولٌ مُنْتَقَعٌ .

অনুরূপভাবে ইবনে উমর (রা) হতেও বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যে ঘরে পেশাব থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। অপর দিকে حديث الباب দ্বারা বুঝা যায় নবী (স) ঘরে পাত্রের মধ্যে পেশাব করতেন। হাদীসদ্বয়ের বৈপরীত্বের সমাধান কি? ইমাম সুয়ুতী (র) এর সমাধান এভাবে বর্ণনা করেছেন–

১. ইবনে উমর ও আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, যে ঘরে পেশাব থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে ঘরে পেশাব দীর্ঘক্ষণ জমা থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আর রাসূলের পেশাব দীর্ঘ সময় জমা থাকতো না। কাজেই এটা পূর্বের হাদীসের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

২. ফেরেশতারা ঐ পেশাবযুক্ত ঘরে প্রবেশ করে না পেশাবের কারণে যেখানে নাপাকী, দূর্গন্ধ ও নাজাসাত বৃদ্ধি পায়। আর রাসূলের পেশাবের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা নবী (স) পাত্রে পেশাব করতেন যার ফলে এর দ্বারা অন্য জায়গা নাপাক হতো না এবং দূর্গন্ধও ছড়াতো না। কাজেই এটা ফেরেশতা প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।

৩. বজলুল মাজহুদে এর সমাধান এভাবে দেয়া হয়েছে যে, রাসূল (স) ইসলামের শুরু জামানাই পেয়ালার মধ্যে পেশাব করতেন। অতঃপর যখন জানতে পারলেন যে, যে ঘরে পেশাব থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। তখন তিনি উক্ত আমল ছেড়ে দেন। আর রাসূল এর শেষ বয়সে পেয়ালায় পেশাব করেছেন বলে প্রমাণিত নেই।

৪. রাসূল (স) এর পেশাব ছিল পবিত্র যা ফেরেশতা প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। পক্ষান্তরে অন্যান্যদের পেশাব এমন নয়। আর ইবনে উমরেরর হাদীস রাসূল (স) ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

سوال : هل اَوْصَى النبيُّ الله عليه وسلم الى علىٍ الاِمارةَ اَمْ لا وانْ كان الثانى فما جوابُ قولِ شيعةٍ بَيِّن مُدَلَّلاً عقلا ونقلاً.

প্রশ্ন নবী (স) আলী (রা) কে খেলাফতের অসিয়ত করেছিলেন কি না? যদিএর উত্তর না সূচক হয় তাহলে শিয়ামতালম্বীদের বক্তব্যের জবাব কি? আকলী ও নকলী প্রমাণের মাধ্যমে এর জবাব দাও।

উত্তর : নবী করীম (স) আলী (রা) এর জন্যে খিলাফতের বিষয়ে কোন অসিয়ত করে যাননি। অথচ শিয়াগণ বলেন যে, নবী (স) হযরত আলী (রা) এর জন্য খিলাফতের অসীয়ত করে গিয়েছিলেন। কাজেই তিনিই খিলাফতের একচ্ছত্র অধিকারী ও যোগ্য ছিলেন। এটাকে প্রমাণিত করার জন্য তারা অনেক মনগড়া হাদীস তৈরী করেছে। অথচ এ সবের কোন ভিত্তিই নেই। কারণ স্বয়ং সাহাবা ও তাবেয়ীগণ এটাকে শক্তভাবে খণ্ডণ করেছেন।

দলিল : হযরত আয়েশা (রা) এর নিকট যখন এ বিষয়টি পেশ করা হল যে, হযরত আলী (রা) নাকি রাসূল (স) এর "ওসী"? তখন তিনি কঠিনভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমি জানি না যে, খিলাফতের বিষয়ে রাসূল (স) কাউকে অসিয়ত করেছেন। বুখারী শরীফের বর্ণনায় আরেকটু অতিরিক্ত রয়েছ, আর তা হল–

متى وَصّى اليه وقد كنتُ مستندتَه اِلى صَدْرِى اوقالتْ حِجْرِى .. الخ

নবী (স) অন্তিমকালে আমার ঘরে ছিলেন এবং আমার ঘাড় ও সিনার সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় তিনি ইহজগত ত্যাগ করেছেন। এত নিকটবর্তী থাকা সত্ত্বেও খিলাফতের বিষয়ে কাউকে অসিয়ত করে গেছেন বলে আমার জানা নেই। মোটকথা, হযরত আয়েশা (রা) খিলাফতের বিষয়ে অসিয়ত করার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

আকলী দলিল ঃ বনু সায়েদা গোত্রে খলিফা নির্বাচন করার ব্যাপারে যখন মতানৈক্য দেখা দিল। তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন, হযরত ওমর (রা) ও আবু উবায়দা (রা) এরা দু'জন খলীফা হওয়ার যোগ্য। কাজেই এ দু'জনের মধ্য হতে কাউকে নির্বাচিত করে নাও। যাকে নির্বাচিত করা হবে সেই খলিফা হবে। এ সময়ে সাহাবাদের কেউ অসিয়তের কথা উল্লেখ করেননি। স্বয়ং হযরত আলী (রা)ও এ অসিয়তের কথা উল্লেখ করেননি এবং খলিফা হওয়ার দাবীও করেননি। যদি বাস্তবে নবী (স) অসিয়ত করে যেতেন যেমনটা শিয়া সম্প্রদায় বলে থাকে তাহলে কেউ না কেউ বিষয়টি উল্লেখ করতেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শিয়া সম্প্রদায়ের দাবী অমূলক ও ভ্রান্ত।

আলোচ্য মাসআলার সমর্থনে বিভিন্ন মনীষীর রেওয়ায়েত ঃ ১. ইমাম আহমদ (র) মুসনাদে আহমদে এবং ইমাম বায়হাকী (র) "দালায়েল" কিতাবে হযরত আলী এর বর্ণনা নকল করেছেন যে, উষ্ট্রের যুদ্ধে বিজয় হওয়ার পর আলী (রা) বলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ رسولَ اللّٰه عليه وسلم لمْ يَعْهَدْ اِلَيْنَا فِى هٰذه الِامارة شيئًا.

২. অনুরূপভাবে মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাজাহ এর মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা) হতে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তা হল–

امر النبى صلى الله عليه وسلم فى مرضه ابابكر ان يصلى بالناس এবং এ হাদীসের শেষে রয়েছে-

مَاتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولمْ يُوْصِ.

৩. অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (র) ترجمة الوفاة النبوية এর অধীনে হযরত উমর (রা) হতে একটি বর্ণনা এনেছেন। তা হল– مَاتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمْ يَسْتَخْلِفْ

এ সকল হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, নবী (স) কাউকে খিলাফতের অসিয়ত করে যাননি। এমনকি স্বয়ং আলী (রা) বললেন, لم يَعْهَدْ اِلَيْنَا فى هٰذهِ الِامارةُ شيئًا এতদসত্ত্বে শীয়া সম্প্রদায় কিভাবে বলেন যে, রাসূল (স) আলী (রা) এর খলীফা হওয়ার ওসিয়ত করে গেছেন?

سوال : ما معنَى طستٍ وما اصلُه وما رَاىُ ابنِ حجرٍ فِيْهَا .

প্রশ্ন طست শব্দটির অর্থ কি? এটা মূলত কি ছিল এবং আলোচ্য রেওয়ায়েতের ব্যাপারে ইবনে হাজারে মতামত কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ طست শব্দটি মূলত طس ছিল, দ্বিতীয় س কে "ت" দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে . ফলে طست হয়েছে। শব্দটির অর্থ হলো তামার পাত্র।

আলোচ্য বর্ণনার ব্যাপারে ইবনে হাজারের অভিমত ঃ আলোচ্য হাদীসটি সহীহ বুখারী এর باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته এবং كتاب الوصايا এর মধ্যে উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে শুধুমাত্র فدعا بالطست শব্দ উল্লেখ রয়েছে, ليبول শব্দ নেই। কাজেই ইবনে হাজার বলেন, নবী (স) এর যে পেয়ালাটি ছিল সেটা পেশাব করার জন্য নয় বরং থুথু ফেলার জন্যে ছিল। তবে যেহেতু হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ليبول শব্দ স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তাই ইবনে হাজার (র) ليتفل শব্দ কেন বৃদ্ধি করেছেন يبول শব্দ পরিত্যাগ করে এটা জানা নেই। মোটকথা, আলোচ্য হাদীসের মধ্যে রাসূল (স) এর যে আমল পাওয়া গেল, এর দ্বারা উম্মতের জন্যও কোন ওজরের কারণে পাত্রে পেশাব করা বৈধ, এটা বুঝা আসে।

প্রথম হাদীসের রাবী সম্পর্কে আলোচনা

قوله عن اُمِّهَا اُمَيْمة بنتِ رُقَيْقَةَ الخ ঃ হাফেজ জামালুদ্দীন মাযানী। "তাহযীব" নামক গ্রন্থে বলেন, عبد الله بن بجاد بن عمير التيمى - اميمة بنت رقيقة এর মেয়ে যিনি প্রসিদ্ধ সাহারিয়া এবং خويلد - رقيقة এর কন্যা, যিনি উম্মুল মুমিনিন খাদীজা (রা) এর বোন ছিলেন। হাফেজ জাহবী (র) বলেন حكيمة শুধুমাত্র স্বীয় মাতা থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে জুরাইজ ব্যতীত অন্য কারো থেকে বর্ণনা করেননি। ইবনে হিব্বানও (র) حكيمه ইবনে জুরাইজ ব্যতীত অন্য কারো থেকে বর্ণনা করেননি। ইবনে হিব্বান (র) তাকে সিকা সাব্যস্ত করেছেন।

سوال : اكتب نبذة من حياة ام المؤمنين السيدة عائشة الصديقة ـ

প্রশ্ন ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) এর জীবনী লেখ?

উত্তর ঃ হযরত আয়েশা (রা) এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ নাম আয়েশা, উপাধি হোমায়রা ও সিদ্দীকা। উপনাম উম্মে আব্দুল্লাহ। তার খেতাব হচ্ছে উম্মুল মু'মিনীন। তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ও উম্মে রুমানের কন্যা, নবুয়াতের ৪র্থ কিংবা ৫ম সালে মক্কা মুয়াজ্জামায় জন্মগ্রহণ করেন। তাই জন্মলগ্ন হতেই তিনি ইসলামী পরিবারে লালিত পালিত হয়েছেন।

প্রিয় নবী (স) এর সাথে বিবাহ বন্ধন ঃ নবুওয়াতের ১০ম বছরের ২৫ই শাওয়াল মক্কায় নবীজী (স) এর সাথে তার বিয়ে হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছ' বছর। বদর যুদ্ধের পর মদীনায় ৯ বছর বয়সে তার বাসর হয়। হযরত আয়েশা (রা) কে বিয়ে করার আগে প্রিয় নবী (স) তাঁকে দু'বার স্বপ্নে দেখেছেন। যেমন হাদীসে আছে-

عن عائشة رض قالتْ قالَ رسولُ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليه وسلّم اُرِيْتُكِ فِى المَنامِ مَرَّتَيْنِ ـ اذ رَجُل يَحْمِلُكِ فِى سرقةِ جريرٍ فيقولُ هٰذه امراتُكِ فَاكشفُها فاذا هِى انتِ فاقولُ ان يكنْ هٰذا مِن عندِ اللّٰه يُمْضِه (بخارى)

উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে তিনিই একমাত্র কুমারী ছিলেন।

গুণাবলী ঃ তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাঁর স্মৃতি শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। ইলমে ফিকহে ছিলেন বিশেষজ্ঞ। ভাষা জ্ঞানে তিনি ছিলেন পারদর্শী। প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবী কাব্য সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। সর্ব বিষয়ে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ এবং রাসূল (স) এর নিকট ছিলেন অত্যাধিক প্রিয়।

আল কুরআনে পবিত্রতার বিবরণ ঃ তাঁর বিরুদ্ধে ইফকের যে মিথ্যা ঘটনা রটানো হয়েছিল তা কুরআনের আয়াত দ্বারা খণ্ডন করে তার পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়।

মাসআলা প্রবর্তন ঃ হযরত আয়েশা (রা) কে কেন্দ্র করে ইসলামী শরীয়তের কয়েকটি মাসআলার প্রবর্তন হয়েছে। যেমন, ক. তায়াম্মুমের বিধান খ. অপবাদের শাস্তির বিধান, গ. ব্যভিচারের শাস্তির বিধান।

হাদীস বর্ণনা ঃ সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছ'জন ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে তাঁর থেকে ১৭৫টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে এবং বুখারীতে এককভাবে ৫৪টি ও ইমাম মুসলিম ৬৮টি হাদীস স্ব-স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ২২১০টি।

প্রিয় নবী (স) এর ভাষায় তাঁর প্রশংসা ঃ হাদীসের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা এর বহু সম্মান ও ফযীলতের কথা বিদ্যমান রয়েছে। মহানবী (স) এর অন্যতম ইরশাদ হচ্ছে–

فَضلُ عائِشةَ عَلَى النِّسَاءِ كفضلِ الثَّرِيدِ على سَائرِ الطَّعَامِ

অর্থাৎ মহিলাদের উপর আয়েশা (রা) এর মর্যাদা এমন যেমন ছারীদের উপর অন্য সকল সকল খাদ্যের মর্যাদা। হযরত উরওয়াহ বলেন, হযরত আয়েশা (রা) হতে অধিক হাদীস মুখস্থকারী আরবের বুকে আর কাউকে দেখিনি। মহিলা সংক্রান্ত ও মহানবী (স) এর ইবাদত সম্বন্ধীয় অধিকাংশ হাদীস তাঁর সূত্রে বর্ণিত।

ওফাত ঃ তিনি ৬৬/ ৬৭ বছর বয়সে ৫৭ বা ৫৮ হিজরীর ১৭ই রমযানের রাতে ওফাত লাভ করেন। তাঁর নামাযে জানাযায় হযরত আবু হুরায়রা (রা) ইমামতি করেন। তিনি অসিয়ত করেছিলেন যে, তাঁকে যেন রাতে দাফন করা হয়। সে মতে তাঁকে রাতে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ৪/ ৩৫৯-৩৬১ ইকমাল; ৬১২ ইত্যাদি।

كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِى الْجُحْرِ

٣٤. اَخْبَرَنَا عبيدُ اللّٰهِ بنُ سعيدٍ قال حدّثنا معاذُ بنُ هشامٍ قال حدّثنى اَبِىْ عَنْ قتادةَ عن عبدِ اللّٰه بنِ سَرْجِسَ اَنَّ نبىَّ اللّٰهِ ﷺ قال لايَبُولَنَّ احدُكم فِى جُحْرٍ قالوا لِقتادةَ ومَا يُكْرَهُ مِن البَوْلِ فِى الجُحْرِ قال يُقالُ اِنّها مَساكِنُ الجِنِّ -

النهىُ عنِ البَوْلِ فى الماءِ الرّاكِدِ

٣٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قالَ حدّثنا اللَّيْثُ عن اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جابرٍ رضى الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنِ البَوْلِ فِى المَاءِ الرَّاكِدِ -

---

গর্তে পেশাব করা মাকরূহ

৩৪. উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)....... আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন গর্তে পেশাব না করে। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, গর্তে পেশাব করা দোষণীয় কেন? তিনি জবাব দেন যে, বলা হয়ে থাকে, গর্ত হল জ্বিনের বাসস্থান।

বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ

৩৫. কুতায়বা (র)...... জাবির (রা) কর্তৃক রাসূল থেকে বর্ণিতআচে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : ما الحِكْمَةُ فِى منعِ البَوْلِ فِى الجُحْرِ.

প্রশ্ন ঃ গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করার রহস্য কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করাটা মূলত পেশাব করার একটি আদব স্বরূপ। গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করার হিকমত বা রহস্য নিম্নরূপ–

১. গর্তে সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি বাস করে, যা বের হয়ে দংশন করার সম্ভাবনা থাকে। ২. গর্তে বিভিন্ন কীট পতঙ্গ বসবাস করে। সুতরাং গর্তে পেশাব প্রবেশ করলে উক্ত প্রাণীগুলো মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ৩. কেউ কেউ বলেন গর্তে জিন-শয়তান বসবাস করে। কাজেই তাতে পেশাব করলে তাদের অবস্থানের ক্ষতি হবে ফলশ্রুতিতে সে পেশাবকারীকে হত্যা বা ক্ষতি করতে পারে। যেমন– এ ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, হযরত সাদ ইবনে উবাদা খাযরাজী "হাওবান" নামক স্থানের এক গর্তে পেশাব করেন। তখন ঐ গর্তে অবস্থানরত জিন তাকে হত্যা করে নিম্নোক্ত পংক্তি পড়তে পড়তে পলায়ন করে–

قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ + وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نُخْطِ فُؤَادَهُ

سوال : قوله قَتَلْنَا قال يُقال اِنّها ..... بَيِّنْ مَرجِعَ ضميرِ "قَالَ" ما الوجهُ بِذِكْرِ ضميرِ المُؤَنَّثِ هٰهُنَا - ومَا الحِكْمَةُ فِى منعِ البَوْلِ فِى جُحْرٍ ومَا المُراد " بلفظِ الجِنِّ

প্রশ্ন ঃ قال যমীরের مرجع কি এবং مؤنث এর যমীর ব্যবহার করার কারণ কি? গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করার হিকমত কি? এবং জিন শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ قال এর মধ্যে যে উহ্য যমীর রয়েছে তা হযরত কাতাদা এর দিকে ফিরেছে। যখন লোকেরা হযরত কাতাদার নিকট গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করার কারণ জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি এর কারণ বর্ণনা করেন যে, অনেক সময় গর্তে জ্বিনরা বসবাস করে।

جن **শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ** جن শব্দ দ্বারা এখানে শুধুমাত্র জিন জাতি উদ্দেশ্য নয়। বরং মানব চক্ষুর অন্তরালে যেসব প্রাণী থাকে সে সব প্রাণীই উদ্দেশ্য। যেমন কীট-পতঙ্গ, বিষধর সাপ-বিচ্ছু ও জিন জাতি ইত্যাদি।

ها **যমীর আনার কারণ ঃ** এখানে "ه" যমীর না এনে "ها" যমীর ব্যবহার করা হয়েছে খবরের প্রতি লক্ষ্য করে

নিষেধ করার কারণ ঃ গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করার কারণ হলো -১. গর্ত জিন জাতির বাসস্থান। কাজেই গর্তে পেশাব করলে তারা ক্ষতি করতে পারে।

২. গর্তে বিষধর সাপ ইত্যাদি থাকে। তারা দংশন করতে পারে। এ কারণে নিষেধ করেছেন।

৩. গর্তে দূর্বল কোন প্রাণী বসবাস করতে পারে, যা পেশাব করার কারণে মৃত্যুবরণ করার আশংকা থাকে।

৪. কেউ কেউ বলেন, গর্তকে পেশাবের জন্য নির্দিষ্ট করা হলে তাতে পেশাব করতে কোন দোষ নেই।

আলোচ্য হাদীসের রাবীদের সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা

قوله عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ سَرْجِسَ الخ ঃ سَرْجِس শব্দের س বর্ণ যবর যোগে ر বর্ণ سكون এর সাথে এবং ج বর্ণ যের যোগে পড়তে হবে। سرجس শব্দটি غير منصرف – علميت ও عجمه দুটি সবাব একত্রে পাওয়া যাওয়ার কারণে। তিনি মাযানী এবং বনু মাখযূম গোত্রের সাতে সম্পৃতি চুক্তিবদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। বসরা শহরে বসবাস করতেন। হযরত কাতাদা (রা) এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে। তার থেকে হাদীসও শ্রবণ করেছেন। এমতের প্রবক্তা হলেন শায়খ ওলীউদ্দীন ও অন্যান্য আলিমগণ। যদিও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) আবু কাতাদার শ্রবণকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু আবু যুরআ ও আবু হাতিম তার শ্রবণ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা সুয়ুতী (র) এটাকে নাসায়ীর টীকায় বর্ণনা করেছেন।

سوال : وقوعُ البولِ فى الماءِ الرَّاكِدِ تَنْجِسُ الماءَ ام لا بَيِّنْ مُوضِحًا

প্রশ্ন ঃ স্থির বা বদ্ধ পানিতে পেশাব পতিত হলে পানি নাপাক হবে কি না স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ স্থির বা বদ্ধ পানিতে পেশাব পড়লে তার বিধান ঃ বদ্ধপানিতে পেশাব পতিত হলে তা নাপাক হবে কিনা এ ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হল–

১. আহলে জাহের বলেন, স্থির পানিতে যদি পেশাব পতিত হয় তাহলে কোন অবস্থাতেই পানি নাপাক হবে না।

২. ইমাম মালেক (র) বলেন বদ্ধ বা স্থির পানিতে পেশাব বা অন্যকোন নাপাক পড়লে পানির তিনটি গুণের কোন একটি গুণ পরিবর্তন হওয়া ছাড়া পানি অপবিত্র হবে না। তিনটি গুণের কোনটি পরিবর্তন হলে পানি নাপাক হয়ে যাবে।

৩. জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন বদ্ধ অল্প পানিতে পেশাব বা অন্য কোন নাপাক পড়ার দ্বারা পানি অপবিত্র হয়ে যায়। তার দ্বারা উযূ,গোসল কিছুই বৈধ নয়। আর যদি পানি বেশী হয় তাহলে তাতে পেশাব বা নাপাক পড়ার দ্বারা পানি অপবিত্র হবে না যতক্ষণ না পানির তিনটি গুণের কোন একটিতে পরিবর্তন আসে। তবে জুমহুর উলামার মাঝে পানির কম ও বেশীর পরিমান নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

আহলে জাহেরের দলিল ঃ তারা এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন– إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

নবী (স) বলেছেন, ماء طهور পবিত্র পানি নাপাকী পতিত হওয়ার দ্বারা অপবিত্র হয় না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আকাশ থেকে ماء طهور (পবিত্র পানি) অবতীর্ণ করেছি। আর পূর্ববর্তী হাদীসে বলা হয়েছে ماء طهور এর নাপাকি পড়লে তা নাপাক হয় না। আর ماء طهور বলা হয় যা বারংবার পবিত্র করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং বুঝা গেলো নাপাক পতিত হলে পানি নাপাক হয় না। আর পেশাব ও যেহেতু নাপাক তাই তা বদ্ধ পানিতে পতিত হওয়ার দ্বারা পানি নাপাক হবে না।

ইমাম মালেকের দলিল ঃ ইমাম মালেক (র)ও রাসূলের বাণী দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন–

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مَالَمْ يَتَغَيَّرْ اَحَدُ اَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ (ابن ماجة)

পানির তিনটি গুণের কোন একটি পরিবর্তন হওয়া ব্যতীত তাতে নাপাক পড়লে পানি অপবিত্র হয় না। আর পেশাবও যেহেতু নাপাক, আর তার দ্বারা পানির তিনটি গুণের কোনটি পরিবর্তন হয় না। তাই সে পানি পবিত্র থাকবে।

কারণ আলোচ্য হাদীসে পানি অপবিত্র হওয়ার জন্য তিনটি গুণের কোন একটি পরিবর্তন হওয়ার শর্ত লাগানো হয়েছে। কাজেই রং পরিবর্তন না হলে পানি নাপাক হবে না।

জুমহুরের দলিল ঃ তারা রাসূলের বাণী দ্বারা দলীল পেশ করেন–

১. إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا

তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠলে হাত ধৌত করা ব্যতীত যেন সে পাত্রে হাত না ডুবায়। যখন রাসূল (স) সম্ভাবনাময় নাপাকের কারণে পানিতে হাত ডুবাতে নিষেধ করেছেন। তাহলে একথা সহজেই অনুমেয় যে, পানিতে নাপাক পড়লে পানি অবশ্যই নাপাক হবে। তাই বদ্ধ পানিতে পেশাব পড়ার দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যাবে।

২. রাসূল (স) ইরশাদ করেন– لَا يَبُولَنَّ احدُكم فِي الماءِ الدَّائِمِ ولا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ

তথা তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে এবং তাতে জানাবাতের গোসল না করে (বুখারী মুসলিম)। এ হাদীস দ্বারাও একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পানিতে নাপাক পড়ার দ্বারা পানি অপবিত্র হয়ে যায়। কারণ এটা যদি না হতো তাহলে রাসূল (স) পানিতে পেশাব ও জানাবাতের গোসল করতে নিষেধ করতেন না।

৩. عن جابرٍ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه نَهٰى عَنِ البولِ فى الماءِ الرَّاكِدِ

নবী (স) স্থির বা বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পানিতে নাপাক পড়লে তা অপবিত্র হয়ে যায়।

سوال : ما الحِكَمُ فِى مَنْعِ البولِ فِى ماءٍ راكدٍ

প্রশ্ন ঃ স্থির বা বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করার হিকমত কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ স্থির বা বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করার হিকমতসমূহ নিম্নরূপ–

১. স্থির পানিতে পেশাব করলে পানি নাপাক হয়ে যায়, যার ফলে তার দ্বারা উযু ও গোসল কোনটাই সহীহ হয় না। এ কারণে নিষেধ করা হয়েছে।

২. কাউকে পানিতে পেশাব করতে দেখলে তার দেখাদেখি পর্যায়ক্রমে একাধিক মানুষ পেশাব করবে এবং এটা মানুষের অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ফলে পানি দূর্গন্ধ ও বিকৃত হয়ে যেতে পারে। তাই এই পথকে রূদ্ধ করার জন্য পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৩. পানিতেও ফেরেশতা থাকে। কাজেই পানিতে পেশাব করলে তাদের কষ্ট হয়। এ কারণে পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৪. পানিতে পেশাব করলে ঐ পানি ব্যবহার করতে ঘৃণার উদ্রেক হবে। যার ফলে মানুষ কষ্ট পাবে। আর মানুষকে কষ্ট দেওয়া হারাম। তাই পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৫. সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা দেখতে অপ্রীতিকর মনে হয়। তাই রাসূল (স) স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করে পেশাব করার আদব শিক্ষা দিয়েছেন।

سوال : اذكر آدابَ البَولِ والبَرازِ فى ضَوْءِ الْأَحاديثِ الوَارِدةِ فيها ـ

প্রশ্ন ঃ হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী পেশাব-পায়খানা করার শরয়ী পদ্ধতি লিখ।

উত্তর ঃ পেশাব-পায়খানা করার শরয়ী পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ–

১. পেশাব-পায়খানা করতে হলে এমন দূরে চলে যেতে হবে, যেখানে মানুষের নজর না পড়ে এবং কেউ দুর্গন্ধে কষ্ট না পায়। যেমন এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়– كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجةَ اَبْعَدَ

২. প্রবেশের সময় নিম্নের দুআ পড়বে– اللّٰهم اِنّى اعوذُبك مِنَ الخُبُثِ والخَبائِثِ

৪. ডান হাত দ্বারা পুংলিঙ্গ স্পর্শ না করা চাই। যেমন– انه صلعم قال إذا بالَ احدُكم فلا يأخذ ذكرهٗ بِيَمِينِهٖ

৫. পেশাবের সময় সতর ঢেকে রাখা

৬. পেশাবের ছিটা যেন শরীরে না লাগে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

৭. গর্তে পেশাব না করা। যেমন– রাসূল (স) বলেছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى جُحْرٍ فَاِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.

৮. পায়খানা ও পেশাব করা অবস্থায় সালাম দেয়া ও নেয়া জায়েয নেই। যেমন– হাদীস শরীফে আছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هو يبول فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ.

৯. পেশাবের সময় একটি এবং পায়খানার সময় তিনটি কুলুখ ব্যবহার করা।

১০. বদ্ধ পানিতে ও গোসলখানায় পেশাব না করা।

১১. পানি দ্বারা শৌচকার্য করা। যেমন–

عن انس بن مالكٍ يقولُ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اذا دَخَلَ الخلاءَ اَحْمِلُ انا وغلامٌ مَعِى نَحْوِى اِداوةً مِن ماءٍ فَيَسْتَنْجِى بالماءِ.

১২. পেশাব পায়খানা শেষে নিম্নোক্ত দোয়া পড়া। যেমন– الحمدُ لله الذى اَذْهَبَ عَنِّى الاَذٰى وعَافَانِىْ

سوال : اذكر نبذةً مِّن حياةِ سَيِّدِنا جابرِ بْنِ عبدِ اللّٰه رض

প্রশ্ন ঃ হযরত জাবের (রা) এর জীবনী লেখ।

উত্তর ঃ হযরত জাবের (রা) এর জীবনী

নাম ও পরিচয় ঃ তাঁর নাম জাবির, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ ও আবু আব্দুর রহমান। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এবং মাতার নাম নাসীবাহ। তিনি খাযরাজ গোত্রের সুলাম শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা আমর একজন প্রভাবশালী গোত্রপতি ছিলেন।

জন্ম ঃ এ মহান সাহাবী প্রিয়নবী (স) এর মদীনায় হিজরতের পূর্বেই জন্ম করেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত জাবির (রা) এর বয়স যখন ১৮ বছর তখন তিনি তাঁর পিতার সাথে মক্কায় আগমন করে আকাবার দ্বিতীয় বায়আতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার কারো কারো মতে, প্রথম আকাবায় ৭ জন আগন্তুকের মধ্যে তিনিও ছিলেন এবং সে সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

জিহাদে অংশ গ্রহণ ঃ হযরত জাবির (রা) বয়সের স্বল্পতার কারণে বদর এবং উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর পিতা উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত অর্জন করার পর তিনি প্রায় সকল যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ১৭টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত আবু যুবাইর সূত্রে ইবনুল আসীর বর্ণনা করেন–

انه سَمِعَ جابرًا رض يقولُ غزوتُ معَ رسولِ اللّٰه صلى الله عليه وسلم سبعَ عَشْرَةَ غزوةً.

বিশেষ গুণাবলী ঃ হযরত জাবির (রা) খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূল (স) ও সাহাবীগণকে আহারের জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি হযরত আলী ও মুয়াবিয়া (রা) এর বিরোধকালে হযরত আলী (রা) এর পক্ষ সমর্থন করেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ নামায দেরীতে পড়লে তিনি তার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। মসজিদে নববী থেকে তাঁর বাসা এক মাইল দূর হওয়া সত্ত্বেও তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতে আদায় করতেন। রাসূল (স) এর সাথে হযরত জাবির (রা) এর যথেষ্ট মিল ছিল। রাসূল (স) তাঁর জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করতেন।

হাদীসের খেদমত ঃ তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর থেকে সর্বমোট ১৫৪০টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে متفق عليه ৬০টি এবং এককভাবে বুখারী ও মুসলিমে ২৬টি করে বর্ণনা রয়েছে। হযরত জাবির (রা) দীর্ঘ দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে হাদীস শিক্ষাদানকার্যে লিপ্ত ছিলেন। বহু লোক তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওফাত ঃ হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি ৯৪ বছর বয়সে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিকের আমলে ৭৪ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। (ইকমাল ৫৮৯, ইসাবা ১/২১৩ ইত্যাদি।)

كراهية البول فى المستحم

٣٦. اخبرنا على بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الاشعث بن عبد الملك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال لا يبولن احدكم فى مستحمه فان عامة الوسواس منه -

السلام على من يبول

٣٧. اخبرنا محمود بن غيلان حدثنا زيد بن الحباب وقبيصة قالا حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال مر رجل على النبى ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام -

---

গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ

অনুবাদ ঃ ৩৬. আলী ইবনে হুজর (র) ...... আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব না করে। কেননা, এর কারণেই অধিকাংশ সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া

৩৭. মাহমুদ ইবনে গায়লান (র)........ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) পেশাব করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। লোকটি তাঁকে সালাম দিল। কিন্তু তিনি (স) তার সালামের জবাব দিলেন না।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : لما منع النبى صلعم عن البول فى المستحم ؟ هذا الحكم لكل وقت ام لا بين مفصلا .

প্রশ্ন ঃ নবী (স) গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করলেন কেন? এই হুকুম সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য না বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করার কারণ ঃ নবী (স) গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করার কারণসমূহ নিম্নরূপ–

১. গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করার কারণ হল এর দ্বারা উযূ-গোসলে আত্মতৃপ্তি আসে না বরং সংশয় থেকে যায় যে, হয় তো বা আমার কাপড়ে বা শরীরে নাপাকের ছিটা লেগেছে। ফলে নামাযের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এ কারণে নিষেধ করেছেন।

২. উযূ ও গোসলের স্থানে পেশাব করলে ওয়াসওয়াসা রোগ সৃষ্টি হয়। এ কারণে নিষেধ করেছেন।

৩. বাথরুম হল শয়তানের বাসস্থান। কিন্তু গোসলখানার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কাজেই নবী (স) গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। যাতে করে শয়তানের বাসস্থান না হতে পারে।

এ হুকুম প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্র ঃ ১. আওনুল মা'বুদ গ্রন্থকার বলেন, গোসলখানায় পেশাব করা সর্বক্ষেত্রে না জায়েয। কিন্তু তাঁর এ বক্তব্য সঠিক নয়।

২. আল্লামা শাওকানী (র) বলেন, যদি গোসলখানা পাকা হয় এবং পানি বের হওয়ার জন্য ছিদ্র থাকে তাহলে সেখানে পেশাব করা জায়েয, মাকরূহ নয়। আর যদি গোসলখানা কাঁচা হয় এবং ছিদ্র না থাকে তাহলে সেখানে পেশাব করা মাকরূহ।

৩. কেউ কেউ বলেন, এখানে যে নিষেধ করা হয়েছে এর দ্বারা নাহীয়ে তানযীহী উদ্দেশ্য।

৪. মোল্লা আলী ক্বারী (র) বলেন, এখানকার নাহী ঐ গোসলখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে পেশাব ও পায়খানা উভয়টা থাকে এবং সেখানে অযূ ও গোসল করা হয়। সুতরাং কোন গোসলখানা যদি এমন হয় যে, ক. সেখানে পেশাব করা হয় না। তাহলে সেখানে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

খ. অথবা, কেউ গোসলখানায় পেশাব করেছে কিন্তু সেখানে অযূ বা গোসল করেনি।

গ. অথবা, সে গোসলখানায় অযূ গোসল করলো কিন্তু পেশাব করল না। এ সকল ক্ষেত্রে রাসূল (স) এর হাদীস لا يبولن احدكم এর নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

৫. ইবনে সীরীন বলেন, গোলখানায় পেশাব করা শর্তবিহীনভাবে জায়েয।

৬. এ নিষেধাজ্ঞা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং যদি গোসলখানা এমন হয় যে, সেখানে পেশাব করলে পেশাবের ছিটা এসে শরীরে লাগে না এবং ঐ গোসলখানায় কোন ছিদ্র থাকে যা দিয়ে পেশাব বাইরে বের হয়ে যায়। তাহলে সেখানে পেশাব করা নিষেধ নয়, অন্যথায় নিষেধ।

৭. আলী ইবনে মুহাম্মদ তনাফাসী বলেন, পেশাব করার পর উযূ গোসল করলে যে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছে এটা ঐ সূরতে প্রযোজ্য যেখানকার ভূমি কাঁচা এবং নরম। যেখানকার পানি বাইরে বের হওয়ার কোন পথ থাকে না বরং তা গোসলখানায় আটকে থাকে অথবা গোসলখানার ভূমি উক্ত পেশাব চুষে নেয়। এসব ক্ষেত্রে পেশাবের পর উযূ গোসল করলে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হতেপারে। তাই রাসূল (স) এর এ হুকুম সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বর্তমানে গোসলখানা যেহেতু স্বভাবত এমন হয় না। সেখানে পেশাব জমা থাকে না এবং শরীরেও তার ছিটা লাগে না। তাই এক্ষেত্রে পেশাব করা বৈধ, নিষেধ নয়। তবে কথা হল পেশাব করার পর পানি প্রবাহিত করে তা ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর উযূ ও গোসল করবে।

سوال : بَيِّنْ معنَى الْمُسْتَحَمِّ ثم أَوْضِحْ هٰذه العِبارَةَ لا يبولَنَّ احدُكم فِي الْمُسْتَحَمِّ موضحًا ومفصّلًا.

প্রশ্ন ঃ مستحم এর অর্থ বর্ণনা কর। অতঃপর لايبولن احدكم فى المستحم এর ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ **الْمُسْتَحَمِّ এর তাহকীক ঃ** مستحم শব্দটির ح বর্ণে ফাতাহ এবং ميم বর্ণে তাশদীদ হবে। অভিধানে مستحم ঐ স্থানকে বলা হয় যেখানে গরম পানি দ্বারা গোসল করা হয়। পরবর্তীতে সকল গোসলখানার ক্ষেত্রে مستحم শব্দ ব্যবহৃত হয়।

لا يَبولَنَّ احدُكم فى الْمُسْتَحَمِّ এর ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, তোমাদের কেউ যেন গোসলখায় পেশাব না করে। মুসনাদে আহমদে এ অংশের পরে উযূর কথা বলা হয়েছে। আর হাসান বসরীর রেওয়ায়েতে গোসলের কথা বলা হয়েছে। তাই মোল্লা আলী ক্বারী (র) বলেন, যে গোসলখানায় উযূ, গোসল ও পেশাব করা হয় সেখানে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এখন যদি কেউ গোসলখানায় পেশাব করে কিন্তু উযূ গোসল না করে অথবা সেখানে গোসল করল কিন্তু পেশাব করল না। তাহলে এ সূরতদ্বয় لايبولن احدكم এর মধ্যে দাখিল নয়। অতএব আলোচ্য সূরতদ্বয় বৈধ।

আলোচ্য হাদীসের নিষেধাজ্ঞা সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্যযেখানে প্রথমে পেশাব করে তারপর সেখানে উযূ বা গোসল করা হয়। কেননা এমন করলে পেশাবের ছিটা লাগার সম্ভাবনা থাকে। যার ফলে অন্তরে ওয়াসওয়াসার রোগ সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণে নবী (স) সেখানে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

হ্যাঁ, যদি গোসলখানা এমন হয় যে, তাতে পানি নিষ্কাষনের জন্যছিদ্র আছে যা দিয়ে সমস্ত পেশাব বাইরে বের হয়ে যায় এবং পেশাবের ছিটা শরীরে লাগার সম্ভাবনা থাকে না। তাহলে এ ক্ষেত্রে উক্ত গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয় না। আর দ্বিতীয়তঃ পেশাব করার পর পানি দ্বারা ধৌত করলে তা পাক হয়ে যায়।

আলী ইবনে মুহাম্মদ তনাফাসী বলেন, যদি জমিন কাঁচা এবং নরম হয় এবং তাতে পানি বের হওয়ার কোন রাস্তা না থাকে, যার ফলে সেখানে পেশাব জমা থাকে, এমন জায়গায় পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এ

ক্ষেত্রেও ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয়। আর বর্তমান জামানার গোসলখানাগুলো যেহেতু পাকা। তাই সেখানে পেশাব করা নিষেধ নয়।

ইমাম ইবনুল মুবারক (র) বলেন, যদি গোসলখানার ফ্লোর পাকা হয় এবং পেশাব বের হওয়ার রাস্তা থাকে তাহলে সেখানে পেশাব করা মাকরূহ নয়, বরং বৈধ।

আউনুল মা'বুদ গ্রন্থকার বলেন, এখানে কাঁচা পাকার কোন কয়েদ নেই বরং গোসলখানায় সর্বাবস্থায় পেশাব করা নিষেধ। কিন্তু এমতটি বিশুদ্ধ নয়।

আল্লামা শাওকানী (র) বলেন, সালফে সালেহীনদের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় গোসলখানায় যদি পেশাব বের হওয়ার ছিদ্র থাকে যা দ্বারা পেশাব বাইরে বের হয়ে যায় তাহলে সেখানে পেশাব করা মাকরূহ নয়। আর যদি গোসলখানার ফ্লোর কাঁচা হয় এবং নরম হয় তাহলে সে এখানে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য হল নাহীয়ে তানযীহী ; তাহরীমী নয়।

আলোচ্য হাদীসের রাবী সম্পর্কে আলোচনা

قوله عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ .. الخ ঃ ইমাম নাসায়ী (র) ইমাম হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণনাকারী রাবীর নাম বলেছেন, اشعث بن عبد الملك এখানে রাবীর পিতার যে নাম বলা হয়েছে তা সঠিক নয়, কাতিবের ভুলের কারণে এখানে ভুল নাম উঠে গেছে। "মীযান" নামক গ্রন্থে হাফেজ জাহাবীর বক্তব্য এর প্রমাণ। এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বর্ণনা হল আল্লামা সুয়ূতী (র) এর। তিনি লিখেছেন যে, তাঁর রাবীর নাম হল- اشعث بن عبد الله بن جابر الحدانى الازدى البصرى

ইমাম নাসায়ী (র) এটাকে সমর্থন করেছেন। আশআস তার উস্তাদ হাসান বসরী থেকে হাদীস শুনেছেন কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আব্দুল হক বলেন, আশআস হাসান বসরী থেকে হাদীস শুনেননি, তবে শায়খ ওলীউদ্দীন ইরাকী বলেন, এ কথা সহীহ নয়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, হযরত হাসান বসরী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল থেকে হাদীস শুনেছেন।

سوال : هل يجوزُ رَدُّ السَّلام عندَ قضاءِ الحَاجَةِ؟

প্রশ্ন ঃ ইস্তিঞ্জার সময় সালামের জবাব দেয়া কি জায়েয?

উত্তর ঃ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের সময় সালামের জবাব দেয়ার বিধানঃ

১. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে যেমন পেশাব-পায়খানা করার সময় সালাম দেয়া এবং জবাব প্রদান করা কোনটাই জায়েয নয়। যেমন হাদীসে আছে-

عن ابنِ عمرَ(رض) قال مرَّ رجلٌ علَى النبيِّ صلعم وهُو يبولُ فسلّم عليه فلم يَرُدَّ عليه السَّلام .

২. কেউ কেউ বলেন পেশাব-পায়খানার সময় যদি কেউ সালাম দেয় তাহলে হাজত শেষে তার সালামের জবাব প্রদান করবে। এ ব্যাপারে নাসায়ী শরীফের বর্ণনা লক্ষ্যণীয়-

عن المُهاجرِ بنِ قُنْفُذٍ انه سلّم على النبيِّ صلعم وهو يبولُ فلَم يَرُدَّ حتّى تَوضَّأ فلمّا تَوضَّأ ردَّ عليه

৩. আবার কেউ কেউ বলেন, সালামের উত্তর দেয়া যেহেতু ওয়াজিব সেহেতু তা রাসূলের জন্য জায়েয।

দলীল ঃ عن عائشةَ (رض) قالت كان رسولُ الله صلعم يَذْكُرُ اللهَ عزَّ وجلّ على كلِّ أَحْيَانِه .

৪. কেউ কেউ বলেন, সালামের জবাব দেয়া মাকরূহ।

৫. ইমাম কুরতুবী বলেন, পেশাব পায়খানার সময় সালামের আদান প্রদান কোনটা বৈধ নয়। বরং তা আদবের খেলাপও বটে।

৬. আবু হানীফা (র) বলেন, পেশাব করা অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরূহ।

سوال : اوضح قوله عليه السّلام فلم يردّ عليه السّلام ... الخ.

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) এর উক্ত বাণীর ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ فلم يرد عليه السلام **এর ব্যাখ্যা ঃ** নবী (স) পেশাব করা অবস্থায় কেউ সালাম দিলে তিনি তার জবাব দিতেন না। কারণ সালাম প্রদানকারী জওয়াবের উপযুক্ত নয়।

এ হাদীসের আলোকে হানাফী ফকীহগণ পেশাবরত ব্যক্তির উপর সালাম প্রদানকে মাকরূহ বলেন এবং তার উত্তর দেয়াকেও মাকরূহ বলেন।

আল্লামা শামী (র) এরূপ ১৭টি স্থানের কথা লিখেছেন যেসব স্থানে সালাম দেয়া মাকরূহ। অবশ্য হানাফীদের মতে নাপাক অবস্থায় সালাম লেন-দেন মাকরূহ নয়। প্রথমে মাকরূহ ছিল, পরবর্তীতে এর অনুমতি দেয়া হয়েছে হযরত মুহাজির ইবনে কুনফুয (র) এর রেওয়ায়েতে আছে যে, প্রিয় নবী (স) উযূ করে তার উত্তর দিয়েছেন। এটা মুস্তাহাব হিসেবে প্রযোজ্য।

পেশাবকারীর উপর সালাম দেয়া মাকরূহ হওয়ার দলিল ঃ পেশাব করা অবস্থায় সালাম প্রদান মাকরূহ হওয়ার দলিল হল ইবনে মাজাহ এর রেওয়ায়েত– নবী (স) পেশাব করছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি সালাম দিল। নবী (স) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

اذا رأيتني هذه الحالة فلا تسلّم عليّ فانّك ان فعلت ذالك لم ارد عليك.

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পেশাব করা অবস্থায় কাউকে সালাম প্রদান করা যাবে না। অনুরূপভাবে এ অবস্থায় সালামের জবাব দেয়াও মাকরূহ। এর দলিল হল–

১. আবু সাঈদ খুদরী (র) এর রেওয়ায়েত যা আবু দাউদে বর্ণিত আছে।

২. দ্বিতীয়ত এ অবস্থায় সতর খোলা থাকে। আর এ অবস্থায় কথা বলা মাকরূহ। যখন সতর খোলা অবস্থায় কথা বলাই মাকরূহ। কাজেই ঐ সময় ذكر الله তথা সালামের জবাব দেয়া আরো উত্তমরূপে মাকরূহ হবে।

سوال : حديث ابن عمر معارض لحديث عائشة فكيف التوفيق بينهما بيّن موضحا.

প্রশ্ন ঃ ইবনে উমর (রা) এর হাদীস হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং দু'বর্ণনার মধ্যে যে বৈপরীত্ব দেখা যাচ্ছে তার সমাধান কি? বর্ণনা কর।

(কারণ ইবনে উমরের হাদীস দ্বারা বুঝা যায় রাসূল (স) "সালামের উত্তর" আল্লাহ তাআলার যিকির হওয়ার কারণে দেননি। অপর দিকে আয়েশা (রা) এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায়– يذكر الله عزّوجلّ على كلّ احيانه তিনি সর্ব সময় আল্লাহ তাআলার যিকির করতেন।)

উত্তর ঃ উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ঃ

১. "নবী (স) সর্ব সময় যিকির করতেন" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অযূ অবস্থায় এবং অযূহীন অবস্থায় সব সময় যিকির করতেন। কিন্তু সতর খোলা অবস্থায় নয়। কাজেই على كلّ احيانه থেকে সতর খোলা অবস্থার বিধান বাদ পড়ে গেল।

২. অথবা, রাসূল (স) কোন সময় আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল থাকতেন না। এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, নবী (স) পেশাব পায়খানা করা অবস্থায়ও আল্লাহর যিকির করতেন।

৩. অথবা, হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীস আন্তরিক যিকিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোন অবস্থায় তিনি আল্লাহকে ভুলতেন না।

৪. অথবা, আয়েশা (রা) এর হাদীসে অধিকাংশ সময় যিকির করাকে সর্বসময় দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কাজেই উক্ত হাদীস থেকে পেশাব পায়খানার অবস্থা বের হয়ে যাবে।

৫. আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন যে, দেরী করে সালামের জবাব দিয়ে তাকে আদব শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য।

رَدُّ السَّلامِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

٣٨. اخبرنا محمدُ بنُ بشّارٍ قال حدّثنا معاذُ بنُ معاذٍ قال حدّثنا سعيدٌ عنْ قتادةَ عنِ الحَسَنِ عنْ حُضَيْنِ أبِى سَاسَانَ - عنِ المُهاجرِ بنِ قُنفُذٍ انّه سلّم على النبيّ ﷺ وهو يبولُ فلم يَرُدَّ عليه السّلامَ حتّى توضّأ فلمّا توضّأ رَدَّ عليه -

النَّهْيُ عَنِ الْاِسْتِطَابَةِ بِالعَظْمِ

٣٩. اَخْبَرَنا احمدُ بْنُ عمرو بنِ السَّرْحِ قال اَنْبَانا ابنُ وَهْبٍ قال اَخْبَرَنِى يونسُ عنِ ابنِ شهابٍ عَنْ اَبِى عُثْمانَ بْنِ سَنَّةَ الخُزاعِيِّ عنْ عبدِ اللّٰه بنِ مسعودٍ رضى اللّٰه عنه انّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَسْتَطِيْبَ احدُكم بعَظْمٍ اوْ رَوْثٍ -

---

উযু করার পর সালামের জবাব দেয়া

অনুবাদ ঃ ৩৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার (র) .... মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) পেশাব করছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাঁকে সালাম দেন। কিন্তু নবী (স) উযু করার পূর্বে সালামের জবাব দেননি, উযু করার পর সালামের জবাব দেন।

হাড় দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা নিষিদ্ধ

৩৯. আহমদ ইবনে আমর ইবনে সারহ (র)...........আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) নিষেধ করেছেন যেন হাড় ও শুষ্ক গোবর দ্বারা যেন তোমাদের কেউ পবিত্রতা অর্জন না করে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : النبيّ صلى الله عليه وسلم لِاَيِّ وجهٍ لم يَرُدَّ السَّلامَ بَيِّنْ واضحا .

প্রশ্ন ঃ নবী (স) সালামের জবাব কেন দিলেন না? এর কারণ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ সালামের উত্তর না দেয়ার কারণ ঃ

১. মুহাজির ইবনে কুনফুয যখন সালাম প্রদান করলেন তখন নবী (স) পেশাবরত অবস্থায় ছিলেন। আর সালামের জবাবের মধ্যে السلام শব্দ আছে যা আল্লাহ তাআলার নাম। এটা মারফু হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। কাজেই উযূ বিহীন অবস্থায় আল্লাহর নাম উল্লেখ করা থেকে নবী (স) বিরত থাকেন পরে উযূ করে তার জবাব দেন। যেমন আবু দাউদ শরীফে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে- ثُمَّ اعْتَذَرَ اليه قال اِنِّى كرهتُ اَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ اِلاَّ عَلٰى طُهْرٍ

নবী (স) এই ওযর পেশ করলেন যে, আমি উযূহীন অবস্থায় আল্লাহর নাম উল্লেখ করাকে অপছন্দ করি।

২. এ হাদীস দ্বারা নবী (স) উম্মতকে শিক্ষা দিলেন যে, কেউ যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহলে তখন তার উত্তর দিলেও পরবর্তীতে উত্তর দিয়ে দেবে এটা মুস্তাহাব। কারণ উত্তর প্রদান না করলে অন্তরে অহংকার প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

سوال : حديثُ مهاجرِ بْنِ قنفذٍ وحديثُ ابو جُهيم متّحدٌ ام مُختلِفٌ بيِّنْ واضحا .

প্রশ্ন ঃ মুহাজির ইবনে কুনফুয এর ঘটনা এবং আবু জুহাইম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের (ঘটনা) এক কিনা স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ১. ইযাহুল বুখারীর মধ্যে আল্লামা ফখরুদ্দীন ইবনে আহমদ বলেন, এ দুটি ঘটনা এক নয় বরং ভিন্ন

ভিন্ন। কাজেই আবু জুহাইমের হাদীসকে باب التيمم في الحضر এর অধীনে আনা হয়েছে এবং মুহাজির ইবনে কুনফুয এর হাদীসকে ردّ السلام بعد الوضوء এর অধীনে আনা হয়েছে।

২. আল্লামা বিননূরী (র)ও মাআরিফুস সুনানে বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি রেওয়ায়েত ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে। এক ঘটনা নয়।

৩. উমদাতুল ক্বারীর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬৮-১৬৭ পৃষ্ঠায় বলেন, মুহাজির ইবনে কুনফুয আবু জুহাইম এবং ইবনে উমরের ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন; এক নয়।

سوال : رواية النسائى (وهو يبول) مُعَارِضٌ لِرِوايةِ مُسْنَدِ احمدَ وابنِ ماجةَ (وهو يتوضأ) فكيفَ التَفَصِّى عنهُ بَيِّن موضحا .

প্রশ্ন ঃ নাসায়ী, মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল (স) কে পেশাব করা অবস্থায় সালাম প্রদান করে অথচ মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ ও ত্বহাবী শরীফে বর্ণিত আছে যে, লোকটি রাসূল (স) কে সালাম প্রদান করে, উযু করা অবস্থায়। কাজেই দুই বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধান কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ রাসূল (স) কে পেশাব করা অবস্থায় সালাম প্রদান করেছে নাকি পেশাবের পর উযূ করা অবস্থায় সালাম দিয়েছে? এ ব্যাপারে হাদীসের কিতাবে উভয় ধরণের রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। এর ব্যাপরে যে মতানৈক্য রয়েছে তার সমাধান নিম্নরূপ–

১. পেশাব করা অবস্থায় সালাম প্রদান করেছেন বলে যে রেওয়ায়েতটি বর্ণিত রয়েছে সেটাই প্রাধান্য যোগ্য বা راجح আর ইবনে মাজাহ এর মধ্যে যেটা বর্ণিত আছে সেটা তার নিম্ন মানের বা مرجوح

২. কেউ কেউ বলেন, এদুটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা। কাজেই উভয়টির প্রয়োগ ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন; এক নয়। কেননা, কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় রাসূল উযূ করার পর সালামের উত্তর প্রদান করেছেন। আর কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তায়াম্মুম করার পর সালামের উত্তর দিয়েছেন। اماني الاحبار গ্রন্থকার এটাকেই উন্নত সাব্যস্থ করেছেন।

৩. আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, وهو يبول কে وهو يتوضأ এর উপর প্রয়োগ করতে হবে। কারণ পেশাব উযূর ভূমিকাস্বরূপ তথা পেশাব করার পরেই উযূ করতে হয়।

৪. শায়খ আব্দুল গণী (র) ইনজাহুন নাজাহ এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, যে এখানে استعارة এর ভিত্তিতে توضى (তথা উযূ করা) দ্বারা بول (প্রশ্রাব) উদ্দেশ্য। আর استعارة উদ্দেশ্য নিতে হলে সবাব ও মুসাব্বাব এর মধ্যে যোগসূত্র থাকা চাই। এখানে যোগসূত্র স্পষ্ট। কাজেই উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্ব রইলো না।

سوال : حديثُ البابِ (رواية ابو داود قال النبىّ صلعم اِنّى كَرِهْتُ اَنْ اذكرَ اللّٰهَ اِلاّ على طُهْرٍ) مُعَارِضٌ لحديثِ عائشةَ وانسٍ (اذا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ يقولُ غُفْرَانَكَ) فكيفَ التَفَصّى عنه بيِّن موضحا .

প্রশ্ন ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় নবী (স) অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহর নাম স্মরণ করাকে অপছন্দ করতেন। ফলে তিনি উযূ করে সালামের উত্তর দিতেন। কিন্তু আয়েশা (রা) ও আনাস এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি অপবিত্র অবস্থায়ও আল্লাহকে স্মরণ করতেন। কাজেই দু'বর্ণনার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। এর সমাধান বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ হাদীসদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় নবী (স) অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ তাআলার নাম স্মরণ করাকে অপছন্দ করতেন। অথচ আনাস ও আয়েশা (রা) এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় নবী (স) বাথরুম থেকে বের হয়ে নিম্নোক্ত দুয়াটি পড়তেন–

اذا خرج من الخلاء يقول غفرانك/ اذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى ـ

এই দোয়াটি পড়াকালিন তিনি অপবিত্র থাকতেন। কারণ তখন ইস্তেঞ্জা থেকে বের হতেন। অথচ এটা আল্লাহ তাআলার যিকির। কাজেই উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্ব পরিলক্ষিত হল। এর সমাধান নিম্নরূপ–

আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র) বজলুল মাজহুদ এর মধ্যে উক্ত দ্বন্দ্বের নিম্নরূপ সমাধান দিয়েছেন–

তিনি বলেন, যিকির দু'প্রকার, ১. مختص بالوقت তথা কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে খাস। ২. غير مختص بالوقت তথা এমন যিকির যা কোন সময়ের সাথে খাস নয়। যে যিকির কোন সময়ের সাথে খাস তা নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করাই মুস্তাহাব চাই তখন সে পবিত্র অবস্থায় থাকুক কিংবা অপবিত্র অবস্থায়। এখন নবী (স) এর ঐ আমল যা হযরত আয়েশা ও হযরত আনাস (রা) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (স) পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় উযূ ছাড়াই বলতেন غُفْرَانَكَ الحمدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَذْهَبَ الخ এটা مختص بالوقت - বা সময়ের সাথেখাস। কাজেই অপবিত্র অবস্থায় পড়াই উত্তম। এটা উযূ বা তায়াম্মুমের উপর মাওকুফ নয়। কিন্তু সালামের জবাবটা এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এটা غير مختص بِالوَقْتِ কাজেই তাৎক্ষণিক তার জবাব দেয়া জরুরী নয়। বরং উযূ ও তায়াম্মুম পর্যন্ত দেরী করা জায়েয তবে এ দিকে খেয়াল রাখা চাই যাতে সালামের জবাব না ছুটে যায়। হ্যাঁ, যদি সালামের উত্তর ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়। যেমন- সালামদাতা চলে যাচ্ছে তো এক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন ছাড়াই সালামের উত্তর দিতে হবে. যাতে সালামের ঋণ বাকী না থেকে যায়। তবে যদি জবাব ছুটে যাওয়ার কোন আশংকা না থাকে তাহলে পবিত্র হয়েই সালামের উত্তর দিবে। কাজেই দু' হাদীসের মধ্যে এখন আর কোন বৈপরীত্ব রইল না।

سوال : لاىّ وجهٍ نهي النبىّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْاِسْتِطَابَةِ بِالْعَظْمِ بيّن مُوضِحا مفصّلاً ـ

প্রশ্ন ঃ নবী (স) হাড় দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতে কেন নিষেধ করলেন? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ নবী (স) হাড় দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন এর কারণ নিম্নরূপ–

১. হাড় দ্বারা পেশাব পায়খানা পরিস্কার করলে পরিস্কার হয় না। বরং ময়লা ছড়ায়ে বেশী জায়গায় লেগে যায়। ফলে পরিস্কার করার উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়।

২. হাড় হলো জিন জাতীর খাদ্য। কাজেই হাড় দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা হলে অন্যের রিযিক নষ্ট করা সাব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর রিযিক নষ্ট করা তো কখনই সমীচীন নয়। কাজেই রাসূল (স) হাড় দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন।

৩. মানুষের হাড় হল সম্মানিত বস্তু। আর শূকরের হাড় হল নিকৃষ্ট বস্তু। কাজেই এ দুটি দ্বারা তো ইস্তেঞ্জা করা বৈধ না। কারণ সেগুলো মূল্যবান বস্তু। তার দ্বারা বোতাম ইত্যাদি তৈরী করা হয়।

মুহাক্কিকগণ লেখেন যে, এখানে হাড় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাজা হাড়। কাজেই কেউ যদি অনেক পুরাতন কোন হাড় দ্বারা ইস্তেঞ্জা করে তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। এটাই ইবনে জারীর ও তাবরানীর রেওয়ায়েত।

سوال : بَيِّنْ مَعَانِى هٰذه الكَلِمَاتِ اَلْاِسْتِطَابَةُ اَلْاِسْتِنْجَاء والْاِسْتِنْزاه والْاِسْتِبْرَاء ـ

প্রশ্ন اِسْتِبْرَاء ـ اِسْتِنْزَاه ـ اِسْتِنْجَاء ـ اِسْتِطَابَة **এর তাহকীক কর।**

উত্তর ঃ اِسْتِطَابَةٌ : শব্দটি বাবে استفعال এর মাসদার। শব্দটি طيب মূলধাতু থেকে গৃহীত। اجوف يائى শাব্দিক অর্থ হল– ক. الاستبراء من القذر তথা ময়লা আজর্বনা থেকে পবিত্র হওয়া। খ. شُرْبُ الطَّابَةِ তথা উত্তম পানীয় পান করা। اِسْتِنْجَاء ঃ اِسْتِنْجَاء শব্দটি বাবে استفعال এর মাসদার। এটা نَجْو মূল ধাতু হতে গৃহীত। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ১. মুক্তি পাওয়া, লাভ করা। ২. القطع তথা কর্তন করা। ৩. الجنى তথা ফল সংগ্রহণ করা ৪. السرعة তথা দ্রুত চলা। ৫. الانهزام তথা পরাজিত হওয়া।

শরীয়তের পরিভাষায় ইস্তেঞ্জা বলা হয় هو التطهر بالماء وغيره অর্থাৎ মল-মূত্র ত্যাগ করার পর পানি বা অন্য কিছু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে ইস্তেঞ্জা বলা হয়। মু'জামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন, هو طلب نَجْوَةٍ لِاخْرَاجِ الْأَذَى

اِسْتِنْزَاه : শব্দটি বাবে استفعال এর মাসদার। نزه মূলধাতু থেকে নির্গত। অর্থ হলো–

ক. اَلْبُعْدُ عَنِ الشَّيْ তথা কোন জিনিস থেকে দূরে থাকা। খ. سير وتفريح তথা আনন্দ ভ্রমণ করা। এখানে اِسْتِنْزَاه দ্বারা প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

قوله الا ستبراء :

اِسْتِبْرَاء শব্দটি বাবে استفعال এর মাসদার। এটা بر ء মূলধাতু থেকে নির্গত, অর্থ হচ্ছে–

১. الاِسْتِنْقَاءُ مِنَ النَّجَسِ তথা অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা।

২. طلبُ البَرَاءَةِ مِنَ الذَّنْبِ وَالدَّيْنِ তথা ঋণ ও গোনাহ থেকে মুক্তি চাওয়া।

سوال : لِماذا نهى النبيُّ صلّى اللّهُ عليه وسلّم عن العَظْمِ والرَّوْثِ

প্রশ্ন ঃ নবী (স) হাড় ও গোবর দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন কেন?

উত্তর ঃ গোবর ও হাড় দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করার কারণ ঃ নবী (স) গোবর ও হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন হাদীসে আছে– يَنْهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ -এর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। যথা–

১. গোবর নিজেই অপবিত্র বস্তু। কাজেই তার দ্বারা কিভাবে নাপাকী দূর হবে বরং এর দ্বারা আরো নাপাকি বৃদ্ধি পাবে; যেমন নবী (স) গোবরের ব্যাপারে কখনো বলেন, رِجْسٌ কখনো বলেন, رِكْسٌ

২. হাড়ে অনেক সময় রোগ-জীবাণু থাকে। কাজেই হাড় ব্যবহার করার দ্বারা অনুরূপভাবে গোবরের মধ্যেও নানা ধরণের পোকা মাকড় ও রোগ জীবানু থাকতে পারে। এ দিকে লক্ষ্য করেই নবী (স) হাড় ও গোবর দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতে নিধেধ করেছেন।

৩. হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে আঘাত লাগার বা শরীর জখম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা কেঁটে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। অনুরূপভাবে গোবরও অনেক সময় ধারযুক্ত হয়। কাজেই তার দ্বারা জখম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৪. হাড়ও জিন জাতির খাদ্য। আর গোবর জিন জাতির পশুর খাদ্য। কাজেই নবী (স) এ দু'টি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এর দ্বারা একটি জাতীর খাদ্য নষ্ট করা আবশ্যাক হয়ে পড়ে। আর এটা সমীচীন নয়।

৫. যেহেতু হাড় জিন জাতির খাদ্য, আর গোবর জিন জাতির পশুর খাদ্য। কাজেই এটা সম্মানিত বস্তু। আর এর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে তার সম্মানের হানি ঘটে। এ কারণে নবী (স) হাড় ও গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। বুখারীর বর্ণনা রয়েছে–

فَسَأَلُوْنِىْ الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللّٰهَ لَهُمْ ان لَّا يَمُرُّوْا بِعَظْمٍ ولا بِرَوْثَةٍ اِلَّا وَجَدُوْا عَلَيْهَا طَعَامًا .

তবে হাড় যদি অনেক পুরাতন হয়ে যায় তাহলে তার দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে সমস্যা নেই। যেমন ইবনে জারীর তাবারীতে আছে– ان عمرَبْنَ الخطاب كانَ لهُ عظمٌ يَسْتَنْجِى به ثمّ يَتَوضّأ ويُصَلِّىْ

অনুরূপভাবে গোবর যদি শুকায়ে পুরাতন হয়ে যায় তাহলে তার দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা যাবে। ১. ইমাম শাফেয়ী আহমদ (র) এর মতে সর্বাবস্থায় গোবর ও হাড় ব্যবহার করা না জায়েয। ২. আর আবু হানীফার মতে মাকরূহ এর সাথে এগুলো দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা জায়েয।

বিঃ দ্রঃ ماكول اللحم প্রাণী যাকে আল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে তা মুসলমান জিনদের খাদ্য। এটা মুসলিমের বর্ণনা। আর غير ماكول اللحم প্রাণীর হাড় মুশরিক জিন বা বিধর্মী জিনদের খাদ্য।

سوال : حديثُ المُسْلِم معارضٌ لِحَديثِ ترمذى فكيفَ التفصّى عنه بَيِّنْ مُوضِحًا .

প্রশ্ন ঃ ان العظم زاد اخوانكم من الجن **অর্থাৎ** হাড় তোমাদের জিন ভাইদের খাদ্য এর পরে মুসলিম শরীফের মধ্যে এ জবাইকৃত প্রাণীর কয়েদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনা এর ব্যতিক্রম কেননা, সেখানে বলা হয়েছে– كُلُّ عظمٍ لَمْ يُذْكَرِ اسمُ اللّٰه عليه يَقَعُ فِى اَيْدِيكُم اَوْفَرَ مَا كَانَ لَحْمًا

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত প্রাণীর হাড়েও গোশত হয় যেমন– পূর্বে ছিল। কাজেই দুই বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিল। এর সমাধান কি?

উত্তর ঃ মুসলিমের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধু মাত্র জবাইকৃত প্রাণীর হাড়ে গোশত সৃষ্টি হয়। আর তিরমিযীর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় মৃত্যু প্রাণীর হাড়েও গোশত সৃষ্টি হয় যে পরিমাণ পূর্বে ছিল। এ বৈপরীত্বের সমাধান নিম্নরূপ–

১. সীরাতে হালবিয়া গ্রন্থকার উক্ত বৈপরীত্যের স মাধান দিতে গিয়ে বলেন, মুসলিম শরীফে যে জবাইকৃত প্রাণীর হাড়ে গোশত সৃষ্টি হয় বলা হয়েছে এটা মুসলমান জিনের খাদ্য। আর তিরমিযী শরীফের মধ্যে যে বলা হয়েছে মৃত্যু প্রাণীর হাড়েও গোশত সৃষ্টি হবে যে পরিমাণ পূর্বে ছিল এটা কাফের জিনদের জন্য।

২. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র) বলেন, মুসলিম শরীফের বর্ণনাটি শক্তিশালী হওয়ার কারণে এটা راجح তথা অগ্রগণ্য। আর তিরমিযী শরীফের বর্ণনা মারজুহ বা নিম্নমানের।

৩. মুহাদ্দিসগণ একটি মূলনীতির মাধ্যমে উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। আর তা হলো–

حفظُ كلِّ مالمْ يَحْفَظْه الاٰخرُ

অর্থাৎ অনেক সময় এমন হয় যে, রাসূল (স) দুটি কথা একত্রে বলেছেন। আর শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন একটিকে আয়ত্ব করেছে এবং অপর জন অপরটিকে আয়ত্ব করেছে এভাবে দু'জন দু'টিকে দু'ভাবে বর্ণনা করেছে। বাস্তাবিক পক্ষে উভয়টি আপন স্থানে বিশুদ্ধ। এখানেও তেমনটি হয়েছে। তথা নবী (স) বলেছেন, হাড়ের উপর আল্লাহ তাআলার নাম নেয়া হোক কিংবা না হোক (জবাইকৃত হোক বা না হোক) সবই জিন জাতির খাদ্য কিন্তু রাবীগণ কেউ কেউ প্রথম কথাটিকে স্মরণ করে রেখেছে এবং সেটাকে বর্ণনা করেছেন। আর কোন রাবী অপর বর্ণনাকে মুখস্ত করে সেটাকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্ব নেই। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) তাঁর গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে অনেক জায়গায় দুই হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে এই মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। (মা'আরেফুস সুনান প্রথম খণ্ড পৃঃ নং ১২৬)

قوله : عن حُضَيْنِ اَبِىْ ... الخ

জ্ঞাতব্য ঃ প্রথম হাদীসের রাবী সম্পর্কে আলোচনা

রাবীর নাম হাজীম, পিতার নাম মুঞ্জির ইবনে হাছের আর রুকাশী। রুকাশী বিনতে কায়েস ইবনে সা'লাবা এর দিকে সম্বন্ধ করে তাকে রুকাশী বলা হয়। আবু সাসান হল তাঁর লকব এবং আবু মুহাম্মদ হলো তার কুনিয়াত। বসরায় সিফফিনের যুদ্ধে আলী (রা) তাঁর হাতে পতাকা দিয়ে ছিলেন। একশত হিজরীর শুরুতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। ইমাম নাসায়ী (র) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ তাকে নির্ভরযোগ্য রাবী সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে খাবাস ও ইবনে হিব্বান তাকে সত্যবাদী ও সিকাহ সাব্যস্ত করেছেন।

قوله : عن المُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ .. الخ কুনফুজ শব্দের ق ও ف বর্ণে পেশ হবে। কুনফুজ হল عمير بن جدعان بن عمرِ التيمىّ القرشى মুহাজির এর পিতার নাম হল কুনফুজ। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, মুহাজির ও কুনফুজ উভয়টা লকব। তার মূল নাম হল আমর। আল্লামা আসকারী (র) হাসান বসরী (র) এর সূত্রে বলেন যখন তিনি হিজরত করেন, পথিমধ্যে মুশরিকরা তাকে গ্রেফতার করে এবং একটি উটের উপর তাকে মজবুত করে বাঁধে। অতঃপর একবার তাকে এবং অপর বার উটকে চাবুক দ্বারা আঘাত করতে থাকে। মোটকথা, যে কোনভাবে তিনি তাদের থেকে মুক্ত হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হন। তখন নবী (স) বলেন, هٰذا المُهَاجِرُ حقًّا ইবনে সা'দ বলেন, হযরত উসমান (রা)-এর শাসনামলে তিনি মুহাজির ইবনে কুনফুজকে পুলিশ বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاِسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ

٤٠. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ اَخْبَرَنِى الْقَعْقَاعُ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلَ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْخَلاَءِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِيْنِهِ وَكَانَ يَاْمُرُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ وَيَنْهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ -

গোবর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন নিষিদ্ধ

অনুবাদ ঃ ৪০. ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন। আমি তোমাদের জন্য পিতৃতুল্য। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পেশাব-পায়খানার স্থানে যাবে তখন সে যেন কিবলার দিকে ফিরে অথবা কিবলাকে পেছনে রেখে না বসে। আর ডান হাতে যেন পবিত্রতা অর্জন না করে। নবী (স) তিনটি পাথর (ঢেলা) ব্যবহার করতে হুকুম করতেন এবং গোবর ও হাড়কে ঢেলা হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : مَا حُكْمُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ؟

প্রশ্ন ঃ ডান হাত দ্বারা শৌচকার্জ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার বিধান ঃ ইস্তিঞ্জার আদব হলো, বাম হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা এবং ডান হাত দ্বারা না করা। কেননা, হাদীসে আছে– وان لانستنجى باليمين এখানে রাসূল (স) ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। তবে ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ কি-না। এ ব্যাপারে আলিমগণের মতামত নিম্নরূপ–

১. আহলে জাহেরদের মতে ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহে তাহরিমী।

২. জুমহুর এর মতে, পেশাব-পায়খানায় ডান হাত দ্বারা শৌচকার্য করা মাকরূহে তানযীহী। বাম হাত দ্বারা শৌচকার্য করা মুস্তাহাব। পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে ডান হাত দ্বারা পানি ঢালবে এবং বাম হাত দ্বারা মর্দন করবে। ইমাম নববী (র) বলেন, النَّهْىُ عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ تَنْبِيْهًا عَلٰى اِكْرَامِهَا وَصِيَانَتِهَا عَنِ الْاَقْذَارِ وَنَحْوِهَا

ডান হাতে মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। কাজেই এ হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা স্বাভাবিক রুচিরও পরিপন্থী।

سوال : لِمَاذَا قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ تَعْلِيْمِهِ هذه الاشياء اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلَ الْوَالِدِ.

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) ইস্তিঞ্জার আদব শিক্ষা দেয়ার পূর্বে বললেন কেন– আমি তোমাদের পিতৃ সমতুল্য?

উত্তর ঃ রাসূল (স) কর্তৃক আমি তোমাদের পিতৃ সমতুল্য বলার কারণ ঃ হাদীসে উল্লেখিতবিষয়সমূহ তথা استقبال ও استدبار (কেবলা দিকে মুখ ও পিঠ করে ইস্তিঞ্জা না করা) এবং استنجاء باليمين (ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করা) ও استنجاء بالاحجار (পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা) এগুলো শিক্ষা দেয়ার আগেই রাসূল (স) বলেছেন– اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ অর্থাৎ আমি তোমাদের পিতৃ সমতুল্য, তাই আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিবো। শিক্ষা দেয়ার আগেই পিতা দাবী করার কারণগুলো নিম্নরূপ–

১. তিনি যা শিক্ষা দিবেন তার গুরুত্ব বুঝানোর জন্যেই প্রথমে اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ বলেছেন।

২. পিতা যেভাবে সন্তানের মঙ্গলকামী হন। অনুরূপ তিনিও উম্মতের মঙ্গলকামী। এ বাস্তবতা তুলে ধরার জন্যে শিক্ষা দেয়ার আগেই একথা বলেছেন।

৩. পিতার ওপর ছেলেমেয়েদের যেভাবে গভীর আস্থা ও বিশ্বাস থাকে, অনুরূপ রাসূল (স) এর উপর আমাদের গভীর আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। এটা বুঝানোর জন্যে তালিমের আগে এ কথা বলেছেন।

৪. অথবা রাসূল (স) উপস্থিত সাহাবীদেরকে তার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার নিমিত্তে এরূপ বলেছেন।

سوال : هل يَكفِى الماءُ وحدَه فى الاستنجاء؟ اُذكُرْ بالدَّليل؟

প্রশ্ন ঃ শৌচকার্যে শুধুমাত্র পানি ব্যবহারই যথেষ্ট কি না? দলীলসহ উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ ইস্তিঞ্জার মধ্যে শুধু পানি ব্যবহারের বিধান ঃ শুধুমাত্র পানি দ্বারা শৌচকার্য করার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্যে রয়েছে।

১. আহলে জাওয়াহেরের মতে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ নয়। কেননা, এটা পানীয় বস্তু।

২. জুমহুরের মতে, শুধুমাত্র পানি দ্বারা শৌচকার্য করা বৈধ আছে।

আহলে জাওয়াহেরের দলীল ঃ তাদের প্রথম দলীল হলো রাসূলের বাণী– لايَسْتَنجِى احدُنا بِاقَلَّ مِن ثلاثةِ اَحجارٍ অর্থাৎ আমাদের কেউ যেন তিনের কম না থাকে পাথর দ্বারা ইস্তেঞ্জা না করে। এর দ্বারা বুঝা যায় শুধুমাত্র পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ না।

আকলী দলীল-১ ঃ পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে হাত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায় এবং হাতে এক ধরণের তৈলক্ত বস্তু লেগে থাকে তা থেকে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ নয়।

আকলী দলীল-২ ঃ পানি হচ্ছেখাদ্য জাতীয় বস্তু। তাই ইস্তিঞ্জা করে তাকে নষ্ট করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

জুমহুরদের দলীল ঃ পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা জায়েয এবং উত্তমও বটে। কেননা, রাসূল (স) নিজেই পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করেছেন।

ক. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا واللّٰه يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জাকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন। সুতরাং পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা জায়েয। যথা রাসূলের বাণী–

١. قال انسٌ رض كانَ النبىُّ صلعم اذا خَرَجَ لِحاجَتِه اجئُ انا وغلامٌ مَعَنا اِداوةٌ مِّن ماءٍ يَعْنى يَسْتَنجِى بِه.

এই হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, রাসূল (স) পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করেছেন।

٢. عن ابنِ عبّاس رض انّه دخلَ الخلاءَ فوَضَعْتُ له وَضوءً

এ হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, রাসূল (স) পায়খানায় প্রবেশ করে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করেছেন।

٣. عن ابن حبان رض قال مارايتُ النبى صلى الله عليه وسلم خَرَجَ من غائطٍ قطُّ اِلّا مسَّ ماءً.

এ হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, রাসূল (স) সব সময় পানি ব্যবহার করতেন।

* পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার বিধান হচ্ছে নাজাসাত যদি স্থান অতিক্রম করে, এবং ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন সম্ভব না হয় তখন, আর যদি নাজাসাত স্থান অতিক্রম না করে, তাহলে পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। এ সময় ঢিলা ও পানি উভয়টি ব্যবহার করাও মুস্তাহাব। আর শুধুমাত্র পানি দ্বারাও ইস্তিঞ্জা করা যায়, ঢিলা না নিলে কোন গুণাহ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সর্বাবস্থায় পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা জরুরী।

سوال : ما هو حكم الاستنجاء بالماء؟

প্রশ্ন ঃ পানি দ্বারা শৌচকার্য করার বিধান কি?

উত্তর ঃ পানি দ্বারা শৌচকার্য করা প্রসঙ্গে আলেমদের মতামত নিম্নরূপ–

১. সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব এবং তাঁর অনুসারীদের মতে, পানি দ্বারা শৌচকার্য করা জায়েয নেই। কেননা, পানি হচ্ছে পানীয় বস্তু। তাই নাপাকী দূর করার কাজে পানি ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

২. ইমাম আযম, মালেক শাফেয়ী, আহমদ সকলে সলফ ও খলফ এর মতে, পানি দ্বারা শৌচকার্য করা জায়েযই নয়, বরং উত্তম। কেননা, তা দ্বারা নাপাক ভালভাবে দূর হয়। ঢিলা ও পানি উভয়টি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। আর যদি নাজাসাত স্থান অতিক্রম করে, তাহলে পানি ব্যবহার করা ওয়াজিব।

৩. ইমাম তহাবী (র) পানি দ্বারা শৌচকার্য করার উপর দলীল হিসেবে এ আয়াতটি পেশ করেন–

فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

এখানে বলা হয়েছে, যারা পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

৪. আল্লামা আইনী (র) বলেন, পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা জায়েয, বরং মুস্তাহাব। এর দলীল হলো–

١. عن ابن عباس رض انه دخل الخلاء فوضعت له وضوءً

٢. انه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته فاتاه جرير باداوة من ماء فاستنجى به

٣. عن ابن حبان مارأيت النبى صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط الا مس ماء

এ সকল হাদীস দ্বারা এ কথায় বুঝে আসে যে, নবী (স) পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করেছেন এবং আল্লাহও এটা পছন্দ করেন। তাই পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা মুস্তাহাব।

سوال : قال صلعم فى الحديث المذكور انما انا لكم بمنزلة الوالد واخرج الامام احمد فى مسنده عن النبى صلى الله عليه قال اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم وحديثان متعارضان فما الحل؟

প্রশ্ন ঃ উল্লিখিত হাদীসে রাসূল (স) এরশাদ করেছেন, انما انا لكم بمنزلة الوالد, আর ইমামআহমদ (র) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে রাসূল (স) এর একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, তাতে তিনি (স) এরশাদ করেছেন اعبدوا ربكم و اكرموا اخاكم- অর্থাৎ এক হাদীসে নিজেকে পিতা আপর হাদীসে ভায়ের সাথে তুলনা করেছেন। কাজেই উভয় হাদীসের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হল। এর উত্তর কি হবে?

উত্তর ঃ রাসূল (স) এর বাণী اكرموا اخاكم। এর অর্থ এই নয় যে, রাসূল আমাদের সহোদর ভাই। বরং রাসূল (স) এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমরা মুমিন, তোমরা আমার সাথী বা পড়সী। রাসূল ভাই শব্দটি শুধু মন জয় বা অন্তরের প্রফুল্লতার জন্যই বলেছিলেন। কেননা, মুমিনগণ দ্বীনের ব্যাপারে একে অপরের অতি নিকটে। তিনি যে বলেছেন, আমি তোমাদের পিতৃতুল্য। এ কথাটিও মূলত: প্রকৃত পিতার প্রমাণ নয়, বরং তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, শিক্ষা-দিক্ষার দিক দিয়ে পিতার মত।যেমন পিতা পুত্রকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন তেমনি রাসূলও তার উম্মতকে প্রয়োজনীয় বিষয়াদির তালিম দেন যা তার দরকার। সুতরাং রাসূল (স) দ্বীনের ঘনিষ্টতা হিসেবে মুমিনের ভাই। আর তালীমের হিসেবে পিতা। সুতরাং হাদীসে ভাই ও পিতা বলার মাঝে কোন تعارض নেই।

سوال : هل الاستطابة مخصوص بالاحجار ام لا بين موضحا .

প্রশ্ন ঃ ইস্তিঞ্জা করার বিষয়টি কি পাথরের সাথে খাস? নাকি অন্য বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলেও ইস্তেঞ্জা সহীহ হবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ অন্যান্য হাদীসের জন্য যে শিরোনাম কায়েম করা হয়েছে তার মধ্যে পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইস্তিঞ্জা শুধুমাত্র পাথরের সাথেই খাস নয়। বরং অন্যান্য বস্তু দ্বারাও ইস্তিঞ্জা বৈধ, কারণ ইস্তিঞ্জার মূল উদ্দেশ্য হলো নাজাসাতকে দূর করে নাজাসাতের স্থানটিকে পরিষ্কার করা। কাজেই প্রত্যেক ঐ বস্তু যা শুকনো এবং দেহধারী ও পবিত্র (বস্তু) এবং তা মূল্যবানও নয়, অন্যের হকের অন্তর্ভুক্তও নয় তার দ্বারা নাজাসাত দূর করা যায় তাহলে এগুলো পাথরের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এগুলো দ্বারা ইস্তিঞ্জা করাও বৈধ হবে। এখন এখানে প্রশ্ন হতে পারে যদি পাথরের সাথে হুকুম খাস না হয় তাহলে পাথরের কথা উল্লেখ করল কেন? এর উত্তর নিম্নে দেয়া হল–

১. আধিক্য ও প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে এখানে পাথরের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ আলোচ্য হাদীসের মুখাতাব হলো আরববাসীগণ। আর আরবের সর্বত্রই অধিক হারে পাথর পাওয়া যায়, কাজেই তাদের উপর বিষয়টি সহজ করার জন্যেই পাথরের কথা উল্লেখ করেছেন। কোনক্রমেই এর দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, হুকুমটা পাথরের সাথে খাস, অন্য কোন বস্তু দ্বারা ইস্তেঞ্জা করলে ইস্তিঞ্জা সহীহ হবে না।

২." মুনতাকা" গ্রন্থকার বলেন, হাদীসে যে পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর দ্বারা কখনই এ উদ্দেশ্য নয় যে, এটা পাথরের সাথে খাস। যদি বিষয়টি এমনই হত, তাহলে গোবর ও হাড়কে বাদ দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। গোবর ও হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জাস করা যাবে না, এটা উল্লেখ করাই একথার প্রমাণ যে, মাটি, ঢিলা, টয়লেট পেপার ইত্যাদি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ। আর এগুলো দ্বারা ইস্তিঞ্জা হাসিল হওয়াই একথার প্রমাণ যে, এখানে ইস্তিঞ্জার হুকুম পাথরের সাথে খাস নয় বরং প্রত্যেক ঐ বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ হবে যা শুকনো তবে তা মূলবান ও অন্যের হকের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর দ্বারা নাজাসাতও দূর হয় এবং নাজাসাতের স্থানটিও পবিত্র হয়।

سوال : ما المُرادُ بالرّوثِ و الرِمّة ؟ هل هُما قُوت الجِنّ؟ بَيِّن موضحا مفصلا

প্রশ্ন ঃ গোবর ও হাড় জিনদের খাদ্য হওয়ার অর্থ কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ গোবর ও হাড় যে জিন জাতির খাদ্য এর অনেক অর্থ হতে পারে–

১. কেউ কেউ বলেছেন, গোবর জিনদের সারের কাজ দেয়। এভাবে এটি তাদের খাদ্যের উপকরণ হয়।

২. কেউ কেউ বলেছেন, গোবর জিনদের পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অতএব, তাদের পশুদের খাবার অর্থ জিনদের খাবার। যেমন ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত রয়েছে–

وكلُّ بَعْرةٍ عَلَفٌ لِدوابِّكم (مسلم ج اص ١٨٤ كتاب الصلوة باب الجهر بالقراءة)

অর্থাৎ প্রতিটি শুষ্ক গোবর তোমাদের জীব-জন্তুদের খাবার।

৩. কারো কারো মতে গোবর মূলত: জিনদের খোরাক। তাদের জন্য এটা থেকে নাপাকী তুলে নেয়া হয় এবং গোবরকে তাদের জন্য শস্যে পরিণত করে দেয়া হয়। যেমন হাদীসে এসেছে–

فسألونى الزادَ فدعوتُ اللّٰهَ لهم ان لايَمُرَّ بعظمٍ ولا بِرَوثةٍ الاّ وَجَدُوا عليها طعامًا ـ (بخارى ج اص ٥٤٤. كتاب المَناقِب باب ذكر الجن)

অর্থাৎ অতঃপর তারা (জিন) আমার নিকট খাদ্যের আবেদন করল। তখন আমি তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলাম যে, তারা যদি কোন হাড় বা শুষ্ক গোবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে তার মধ্যে তারা যেন তাদের খাবার পায়।

৪. হাড় জিনদের খাদ্য হওয়ার অর্থ হল, হাড়ে জিনদের জন্যে গোশত পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়। যেমন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন।

لَكُم كُلُّ عظمٍ ذُكِر اسمُ اللّٰه عليه يَقَعُ فِى اَيْدِيكم اَوْفَرُ مايكُوْن لحمًا (مسلم ج ص ١٨٤)

অর্থাৎ যে সব হাড়ের উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, যা তোমাদের (জিন) হাতে পড়ে সেগুলো আগের চেয়ে বেশী মাংসল হয়ে যায়।

كل عظمٍ لم يُذكرِ اسمُ اللّٰه عليه يقعُ فى ايديكم اوفرَ مَاكان لحمًا ـ (ترمذى ج ٢ص ١٦١ ابواب التفسير)

অর্থাৎ যে সেব হাড়ের উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয় না, সেগুলো তোমাদের (জিন) হাতে পড়ে অধিক মাংসল হয়ে যায়। বাহ্যিক অর্থে হাদীসদ্বয়ে বৈপরীত্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর সমাধানে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (র) বলেন, হাদীসদ্বয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো জবাই ও খাওয়ার সময় হাড়ের উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা।

৫. কেউ কেউ বলেন, কুকুর যেমন হাড় থেকে খাবারের কাজ সারতে পারে। এমনিভাবে জিনরাও তার থেকে খাবারের কাজ সারতে পারে। (তানযীমুল আশতাত, ১/১৪৪, দরসে মেশকাত ১/১৫৪ , দরসে তিরমিযী ১/ ২১৫)

৬.কেউ কেউ বলেন, জিনরা হাড়গুলো রান্না করে খাদ্যের উপযোগী করে তুলে। যেমন তিরমিযীতে ইবনে মাসউদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– فانّه زادُ اِخوانكم مِن الجنّ কারণ এগুলো তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য।

আলোচ্য হাদীসের রাবীরদের সম্পর্কে আলোচনা

قوله محمد بن عجلان ঃ ইমাম বুখারী (র) মুহাম্মাদ ইবনে আজলান যিনি আলোচ্য হাদীসের রাবী তাকে দ্বয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। আর ইমাম আহমদ ও ইবনে মাঈন তাকে সিকা সাব্যস্ত করেছেন।

قعقاع ঃ قعقاع এর পিতার নাম হলো হাকীক আল-কিনানী আল মাদানী. ইমাম আহমদ ও ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন তাকে সিকা সাব্যস্ত করেছেন এবং ইবনে হিব্বানও তাকে সিকা রাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

ابو صالح ঃ এ ব্যক্তি বলেন, জুরাইরিয়া বিনতে আহমাস গাতফানীর মাওলা। এ ব্যক্তি খিয়ানতদার এবং নির্ভযোগ্য রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তার নাম হল, যাকওয়ান মাদানী, তাঁর লকব হলো, সাম্মান।

سوال : اوضِح معنى الروث والرِمّة والرّجيع والركس والعَذرة

প্রশ্ন ঃ ركس ـ رجيع ـ رمة ـ روث **এর অর্থ বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ عذرة বলা হয় هى ما تَغوّطهُ الانسان অর্থাৎ মানুষ যে মলত্যাগ করে তাকে عذرة বলা হয়।

[বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاِكْتِفَاءِ فِى الْاِسْتِطَابَةِ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ

٤١. اَخْبَرَنَا اسحٰقُ بْنُ ابراهيم اخبرنا ابومعاوية قال حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ ابراهيم عَنْ عبدِ الرحمٰنِ بْنِ يزيدَ عَنْ سلمانَ رضى اللّٰهُ عنه قال قَالَ لَهُ رجلٌ اِنَّ صَاحِبَكُم لَيُعَلِّمُكُم حَتَّى الْخِرَاءَةَ قال اَجَلْ نَهَانَا اَنْ نَّسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ او نَسْتَنْجِىَ بِاَيْمَانِنَا اَو نَكْتَفِىَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ -

পবিত্রতা অর্জনকালে তিনটির কম ঢেলা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ

অনুবাদ ঃ ৪১. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)............সালমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, তোমাদের নবী তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। এমনকি পায়খানা-পেশাবে কিভাবে বসবে তাও। সালমান (রা) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, পায়খানার সময় তিনি আমাদেরকে কিবলামুখী হয়ে বসতে, ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করতে এবং পবিত্রতা অর্জনকালে তিনটি কুলুখের কম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : مامعنى الْاِسْتِنْجَاءِ لغةً واصطلاحًا ومَا الْمُنَاسَبَةُ بينهما.

প্রশ্ন ঃ اِسْتِنْجَاء **এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা কর এবং উভয়ের যোগসূত্র বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ اِسْتِنْجَاء **এর আভিধানিক অর্থ ঃ** استنجاء শব্দটি বাবে استفعال এর মাসদার। মূল অক্ষর হচ্ছে و - ج - ن। জিনসে ناقص واوى এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ক. মুক্তি পাওয়া, খ. কর্তন করা গ. ফলগ্রহণ করা, ঘ. দ্রুত চলা, ঙ. পরাজিত হওয়া। চ. উঁচু স্থান তালাশ করা।

শরীয়তের পরিভাষায় ইস্তিঞ্জা হচ্ছে– هُوَ التَّطَهُّرُ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ তথা মলমূত্র ত্যাগ করার পর পানি বা অন্য কিছু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে ইস্তিঞ্জা বলা হয়।

১. মু'জামুল ওয়াসিত গ্রন্থকার বলেন– هُوَ طَلَبُ نَجْوٍ لِاِخْرَاجِ الْاَذٰى

২. আল্লামা আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَلْاِسْتِنْجَاءُ هُوَ ازالةُ نَجِسٍ عَنْ سَبِيْلِهِ بِنَحْوِ الْمَاءِ او تَقْلِيْلِهِ بِنَحْوِ الْحَجَرِ

৩. আল্লামা সাদী আবু যির বলেন– الاستنجاءُ نَزْعُ الشَّئِ مِنْ مَوْضِعِهِ وتخليصه

৪. **ইস্তিঞ্জা** হলো পানি, মাটি বা পাথর জাতীয় বস্তু দ্বারা সাবিলাইন থেকে যা কিছু বের হয় তা পরিষ্কার করা।

যোগসূত্র ঃ ইস্তিঞ্জার জন্য যেহেতু লোকেরা উঁচুস্থান তালাশ করে এবং লোকদৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকে।

سوال : ماحكمُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْاَحْجَارِ ومَا الْاِخْتِلَافُ فيه تَثْلِيْثًا؟ بَيِّنْ مُدَلَّلًا مُرَجَّحًا.

প্রশ্ন ঃ পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার হুকুম কি? এবং তিন সংখ্যার ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে মতানৈক্য কি? দলিল প্রমাণ সহকারে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জার বিধান ঃ পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা ভালো তবে ইস্তিঞ্জা করাটা পাথরের সাথে খাস নয়। বরং যে সমস্ত বস্তু দ্বারা নাজাসাত ও নাজাসাতের স্থান পরিষ্কার হয় এবং তা যদি শরীর বিশিষ্ট, তা শুকনো তবে মূল্যবান না হয়, তাহলে তার দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ। তবে বিশেষ করে পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, আরবে অধিক হারে পাথর পাওয়া যায় এবং আরবের অধিবাসীরাই এর মুখাতাব।

[পূর্বের বাকী অংশ] اَلرَّوْثُ ঃ বলা হয় هو ما تغوطه غيرُ بَنِى آدم অর্থাৎ মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী যে মলত্যাগ করে তাকে। কেউ কেউ বলেন ماتغوطُ ذواتُ الحوافرِ অর্থাৎ খুর বিশিষ্ট প্রাণী যে মল ত্যাগ করে তা। الرَّجِيْع মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর মলকে رجيع বলা হয়। সুতরাং এর ব্যাপকতা عَذِرَةٌ ও رَوْثٌ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। اَلرِّمَّةُ ঃ এ শব্দটি رَمِيْمٌ এর বহুবচন, অর্থ- পুরাতন হাড়। اَلرِّكْسُ ঃ এ শব্দের অর্থ হলো নাপাকী, অপবিত্র বস্তু।

ইস্তিঞ্জার ক্ষেত্রে ঢিলার সংখ্যা নিয়ে ইমামদের মতামত

শৌচকার্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঢিলার সংখ্যা কতটি হবে। এ মাসআলায় ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, আবু সওর ও আহলে যাহিরের মতে এবং ইমাম মালেক এর একটি মতানুযায়ী ইস্তিঞ্জার ঢেলার সংখ্যা তিনটি হওয়া ওয়াজিব এবং বিজোড় হওয়া মুস্তাহাব।

২. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও ইমাম মালেক (র) এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী ইস্তিঞ্জার ক্ষেত্রে নাজাসাত ও মলদ্বার পরিষ্কার করা ওয়াজিব। আর ঢেলা তিনটি হওয়া সুন্নত। বিজোড় হওয়া মুস্তাহাব।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল

১. عن سلمان .... لايستنجى احدنا اقل من ثلاثة أحجار الخ (ابوداود ج ا ص ١٢٤ نسائى ج اص ١٦)

অর্থাৎ ... সালমান (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সা. বলেছেন ... আমাদের কেউ যেন তিনটি প্রস্তরের (ঢিলা-কুলুখের) কম দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে।

২. عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالاذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار .. الخ (نسائى ج اص ١٨)

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন। তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় গমন করে, তখন সে যেন তার সাথে তিনটি পাথর নিয়ে যায় যা দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট। উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে পাথর বিজোড় হওয়া এবং তিনটি হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। উভয় হাদীসে নির্দেশমূলক শব্দ (صيغة امر) ব্যবহার হয়েছে। আর আমর সাধারণত ওয়াজিব বুঝায়।

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ..... وكان يامر بثلاثة أحجار

অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (স) তিনটি পাথর ব্যবহার করতে হুকুম করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় তিনটি পাথর ব্যবহার করা শর্ত। তারা বলেন, শরীয়তে পাথরের নির্ধারিত সংখ্যা যদি ধর্তব্য না হত তাহলে আমর ও নাহী সীগার দ্বারা উল্লেখ করার প্রয়োজন হত না। এর দ্বারা বুঝা যায় ঢেলা তিন সংখ্যক হওয়া জরুরী।

আকলী দলীল ঃ কুরআনে কারীমে ইদ্দতের মাসআলার ক্ষেত্রে তিন হায়েযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও রেহেম পবিত্র হওয়ার বিষয়টা এক হায়েয দ্বারাই বুঝা যায়। কিন্তু শরীয়তে হায়েযের সংখ্যা তিন হওয়া বাঞ্ছনীয়, এর জন্য তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করা জরুরী। আলোচ্য ইস্তিঞ্জার মাসআলাটিও ইদ্দতের ক্ষেত্রে হায়েযের মত তথা একটি দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেলে ও তিনটি পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা জরুরী। কারণ এখানে শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। অপর দিকে এ ব্যাপারে আমর এর সীগা এসেছে এবং নাহী এর সীগা দ্বারা ও তিন সংখ্যার কমে ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তিনটি দ্বারা যদি পরিষ্কার না হয়, তাহলে অতিরিক্ত পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা ওয়াজিব। যাতে করে পবিত্রতা অর্জন হয়। আর এক্ষেত্রে বেজোড়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা মুস্তাহাব।

হানাফী মাযহাবের দলীল

মলদ্বার পরিষ্কার করা ওয়াজিব। তিনটি হওয়া সুন্নত। বিজোড় হওয়া মুস্তাহাব এর দলীল হলো–

১. عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ... من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ... الخ (ابوداود ج اص ٦ ابن ماجة٢٩)

অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (স) ইরশাদ করেন .... যে ব্যক্তি ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করে সে যেন বিজোড় সংখ্যক ব্যবহার করে। যে এরূপ করে সে উত্তম কাজ করে এবং যে ব্যক্তি এরূপ করে না, এতে কোন ক্ষতি নেই। উক্ত হাদীসে বিজোড় হওয়ার বিষয়ে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে– বিজোড় না হলে কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং এটা কোন ক্রমেই ওয়াজিব হতে পারে না।

২. عن عائشة رض قالت إنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهَبَ احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهنّ فانها تجزئ عنه (نسائى ج ا ص ١٨)

অর্থাৎ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় গমন করে তখন সে যেন তার সাথে তিনটি পাথর নিয়ে যায়। যা দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এই তার জন্য যথেষ্ট এখানে তিনটি পাথরকে **যথেষ্ট বলা** হয়েছে।

৩. عن عبد الله قال خرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال الْتَمِسْ لى ثلاثةَ أحْجارٍ قال فأتيتُه بحجرين وروثة فاخذ بحجرين والقى الروثة وقال إنها الرجسُ (بخارى ص ٢٧ ترمذى ج ص ١٠١ نسائى ج ١٧ ابن ماجه ص ٢٧)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সা. প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বের হলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, তুমি আমার জন্য তিনটি পাথর তালাশ করে নিয়ে এসো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁর নিকট দুটি পাথর এবং গোবরের একটি শুষ্ক টুকরা নিয়ে এলাম। তিনি পাথর দুটি গ্রহণ করে শুষ্ক গোবর টুকরাটি ফেলে দিলেন এবং বললেন এটি নাপাক। **উক্ত হাদীস দ্বারা** বুঝা যায় যে, যদি তিন সংখ্যক ওয়াজিব হত। তাহলে তিনি আরো একটি পাথর আনার নির্দেশ দিতেন।

৪. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) একটি মারফু হাদীস বর্ণনা করেন– তোমাদের মধ্যে যে কেউ ইস্তিঞ্জা করতে যায়। সে যেন তিনটি পাথর দ্বারা মুছে নেয়। নিশ্চয় এটাই তার জন্য যথেষ্ট।

আকলী দলীল ঃ যদি পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা হয়, আর মলদ্বার এক দু'বার ধৌত করার দ্বারা যদি নাপাক ও দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। তাহলে তিনবার ধৌত করা কারো মতেই ওয়াজিব নয়। সুতরাং পাথর বা ঢিলার ক্ষেত্রে একই হুকুম হওয়া উচিৎ। কারণ উভয়টির উদ্দেশ্য এক। (দরসে মেশকাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৫১)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

১. সে সব রেওয়ায়েতে তিনটি পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা স্বভাব বা রীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, সাধারণত তিনটি পাথর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন **যথেষ্ট হয়ে** যায়।

২. তিনটি পাথরের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুস্তাহাব বুঝানো, ওয়াজিব বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

৩. হাদীসে যে তিনটি পাথরের সংখ্যা **উল্লেখ রয়েছে** তা শর্ত হিসেবে নয়। বরং সতর্কতার জন্য।

৪. তিনটি পাথর হতেই হবে, এটাই **ওয়াজিব এ মতের** উপর পেশকৃত। এই হাদীসটির বাহ্যিক অর্থের উপর তো শাফেঈগণও আমল করেন না। কেননা, কেউ যদি **একটি বড় পাথরের তিন** কোণার দ্বারা তিনবার মাসেহ করে নেয়। তাহলে শাফেয়ীদের নিকটও পবিত্রতা অর্জিত হবে। সুতরাং এতে বুঝা গেল যে, পাথর বা ঢেলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা তখনই যথেষ্ট হবে, যখন নাপাকীটা বের হওয়ার স্থান থেকে এক দিরহামের অধিক ছড়িয়ে না পড়ে। অন্যথায় পানি দ্বারা শৌচকার্য করা আবশ্যক হবে। (দরসে তিরমিযী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২১০)

নবী করীম (স) এর যুগে যেহেতু শুকনো জাতিয় খাবার খাওয়া হত, তখন তাদের মল ছিল শুকনো, ফলে পায়খানা এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ত না। কিন্তু বর্তমানে মানুষ যেহেতু তৈলাক্ত খাবারে অভ্যস্ত এবং পায়খানা শুকনো না হওয়ার কারণে এদিক সে দিক ছড়িয়ে পড়ে এরূপ ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জনের জন্য সীমিত সংখ্যক পাথর বা কুলুখ যথেষ্ট নাও হতে পারে। তাই পানি ব্যবহার করাটাই সমীচীন। (দরসে মেশকাত ১/১৫৭ পৃ)

৫. অথবা এখানে মাকরূহ দ্বারা মাকরূহে তানযীহী উদ্দেশ্য। আর যুক্তি দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনের কম পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে যথেষ্ট হবে, কেননা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, পানি একবার কিংবা দু'বার ব্যবহার করার দ্বারা যদি নাপাক দূর হয়ে যায় তবে সে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নেই। এর দ্বারা বুঝা গেল যদি একটি বা দুটি পাথর দ্বারা পবিত্রতা হাসিল হয়, তাহলে তিনটি ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই।

মোটকথা, ইস্তিঞ্জার ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হলো মল দ্বারা পরিষ্কার করা। সুতরাং এর জন্য যে পরিমাণ ঢেলার প্রয়োজন হবে সে পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যক শর্ত নয়।

এ কথার দৃষ্টান্ত হলো মুহরিম সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র) এর উক্তি–

এক ব্যক্তি সুগন্ধিযুক্ত জুব্বা পরিধান করে রাসূল (স) এর নিকট আসলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (স) কে জিজ্ঞাসা করলেন উমরা কিভাবে করতে হবে? হুজুর (স) ওহীর প্রতিক্ষায় চুপ করে থাকলেন। অতঃপর ওহী আসলে নবী (স) বলেন তুমি জুব্বাকে খুলে তিনবার ধৌত কর যাতে করে খুশবু দূর হয়ে যায়। এখানে ثلاثا শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অথচ শাফেয়ী মাযহাবের কেউ তিনবার ধৌত করা ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা নন।

ইমাম নববী (র) বলেন, এখানে যে তিনবার ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা রং বা গন্ধ দূর করার জন্যে। কাজেই একবার ধৌত করার দ্বারা যদি তা অর্জিত হয়। তাহলে পুনরায় দু'বার ধৌত করার কোন প্রয়োজন নেই। ঠিক অদ্রুপভাবে ইস্তিঞ্জার ক্ষেত্রে পাথরের বিধান একটি দ্বারা যদি পবিত্রতা হাসিল হয়ে যায় তাহলে তিনবার ধৌত করার কোন প্রয়োজন নেই।

যেখানে তিনটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে পেশাব ও পায়খানা উভয়ের জন্যে তিনটি পাথরের কথা বলা হয়েছে। কাজেই শুধুমাত্র পায়খনার সময় ইস্তিঞ্জা করার জন্য যে তিনটি পাথর দ্বারা পরিষ্কার করা ওয়াজিব এটা সাব্যস্ত হলো না।

سوال : ماكان سوالُ المُشرِك ومَا كانَ جوابُ سَلمان الفارسِيِّ بَيِّن واضحًا

প্রশ্ন ঃ মুশরিকের প্রশ্ন এবং সালমান ফারেসীর জওয়াব কি ছিল? স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মুশরিকের প্রশ্ন– এক মুশরিক ঠাট্টাছলে সালমান ফারেসী (রা) কে বলল, তোমাদের নবী তোমাদেরকে লজ্জাকর অতি সাধারণ সাধারণ বিষয়ও শিক্ষা দেন। এমনকি পেশাব পায়খানার সময় বসার পদ্ধতিও? এসবকি শিক্ষনীয় কোন বিষয়? এটা কোন ধাধরণের ধর্ম?

উত্তর ঃ সালমান ফারেসী (রা) এর লোকটির কথায় রাগান্বিত হয়ে তাকে কটুকথা বলে ধমকানোই ছিল স্বাভাবিক দাবী। অথবা কোন উত্তর না দিয়ে একেবারে নিশ্চুপ থাকা: কিন্তু সালমান ফারেসী (রা) কোনটাই করেননি। বরং রাগকে হজম করে অত্যন্ত পাণ্ডিত্বপূর্ণ ও সুন্দর ভাষায় তার জবাব দেন।

তিনি বলেন নবী (স) এর আগমনের বরকতের ফলে আমরা যে ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছি তা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে দ্বীনের খুটি-নাটি, ছোট বড় সবই শিক্ষা দেয়া হয়। এমনকি পেশাব পায়খানা করার আদবও শিক্ষা দেয়া হয়। আর পেশাব-পায়খানা করার নিয়ামাবলী শিক্ষা দেয়াই একথার প্রমাণ যে, আমাদের ধর্ম পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। যে ধর্মের শান ও মর্যাদা এমন তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা এবং তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, যেমনটা তুমি করছ, এটা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের নামান্তর; অথচ এ ধর্মটি সত্য এবং আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয়। কাজেই বিদ্বেষ পোষণ ও বিরোধিতা পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর। যাতে তোমার বাহ্যিক ও আভ্যান্তরীন কুফর ও শিরকের জিন্দেগী হতে পাক হতে পার। অতঃপর সালমান ফারেসী (রা) রাসূল (স) কর্তৃক বর্ণিত পেশাব পায়খান্নার নিয়মাবলী বর্ণনা করেন যে, কেবলার দিকে মুখ ও পিঠ করে পেশাব-পায়খানা করবে না এবং ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে না। তিনটি কুলুখ দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে।

سوال : ما الفرقُ بينَ الاَجَل والنَّعم بيِّن واضحا

প্রশ্ন ঃ نَعَمْ ও اَجَلْ এর মধ্যে পার্থক্য বর্নণা কর।

উত্তর ঃ نعم ও اجل এর পার্থক্য নিম্নে বর্ণনা করা হল–

১. اجل শব্দটি خبر এর মধ্যে نعم থেকে বেশী ব্যবহৃত হয়।

২. আর نعم শব্দের ব্যবহার استفهام এর মধ্যে اجل থেকে বেশি হয়।

৩. ইমাম আখফাশ (র) বলেন, اجل ও نعم শব্দদ্বয় حرف ثبوت নফীর তাসদীকের জন্য আসে। এজন্য এ দুটিকে حرف تصديق ও বলা হয়।

سوال : قال قال رجلٌ مَنْ فاعلُ قَال قالَ ؟ و الى مَن يرجعُ ضميرُ له ؟

প্রশ্ন ঃ قال قال এর فاعل কে এবং له এর যমীর কোন দিকে ফিরেছে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ প্রথম قال এর فاعل হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ যিনি হযরত সালমান ফারেসী থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনে মাঈন ও ইবনে সাদ প্রমুখ তাঁকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। আর দ্বিতীয় قال এর فاعل হলো رجل (মুশরিক ব্যক্তি), আর له এর যমীরটি সালমান ফারেসী (রা) এর দিকে ফিরেছে।

سوال : بيِّن معنَى الخِراءة مُوضِحا

প্রশ্ন ঃ خراءة শব্দের অর্থ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ الخراءة। শব্দটির উচ্চারণে কেউ কেউ বলেন خ এবং ر উভয়টির উপরে যবর এবং পরে আলিফে মাকসূরা। আবার কেউ বলেন মদ্দ যুক্ত। আবার কেউ বলেন মদ্দসহ خ এর নিচে যের। আল্লামা নববী বলেন, এর خ এর উপর যবর এবং ر এর উপর জযম, অর্থ পায়খানায় বসার পদ্ধতি, তবে ة কে বাদ দিলে এবং خ এর নিচে যের বা উপরে যবর দিলে الخراءة। অর্থ হবে মল বা পায়খানা। আল্লামা সুয়ূতী (র) স্বীয় ব্যাখ্যা গ্রন্থে আল্লামা খাত্তাবী (র) এর উক্তি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সাধারণত মানুষ خ বর্ণে যবর দিয়ে পড়ে, এটা শুদ্ধ নয়। কেননা, এমন পড়লে তার অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। কাজেই خ বর্ণটিতে কাসরার সাথে এবং আলিফে মামদুদাহ সহকারে পড়া যায়। আর আল্লামা সিন্ধী (র) বিশ্ব বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ সিহাহ থেকে নকল করেছেন যে, خراءة শব্দটি كره باب سمع থেকে كراهة এর ওযনে। সুতরাং خ বর্ণকে যবরযোগে পড়াটাই বিশুদ্ধ। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে خ বর্ণকে যের যোগে এবং আলিফে মামদুদাহ ও ها সহকারে فعل حدث কে এবং কাসরা ও ফাতাহ এবং ها ব্যতীত মদ্দ সহকারে نفس حدث কে বলা হয়। আল্লামা জাওহারী বলেন, خ বর্ণটি যবরসহকারে মাসদার এবং যের সহকারে ইসম।

سوال : اكتب حياةَ سلمانَ مختصرًا

প্রশ্ন ঃ সালমান ফারেসী (রা) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।

উত্তর ঃ তাঁর নাম সালমান, কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ। তিনি ছিলেন রাসূল (স) এর আযাদকৃত গোলাম। রাসূল (স) ইয়াহুদীদের থেকে তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। তিনি নেতৃস্থানীয় মর্যাদাশীল সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সে ব্যক্তিত্রয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যাদের জন্য জান্নাত আগ্রহী। তিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। আবলাক ঘোড়ার পূজারী ছিলেন এবং সত্য দ্বীনের অন্বেষী ছিলেন। তিনি সর্ব প্রথম খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। তাদের কিতাব পাঠ করেন এবং পর্যায়ক্রমে আগত কষ্ট ক্লেশের উপর ধৈর্যধারণ করেন। অতঃপর আরব্য এক সম্প্রদায় তাকে গ্রেফতার করে ইয়াহুদীদের নিকট বিক্রি করে দেয়। দশ ব্যক্তির মালিকানা পরিবর্তনের পর পর্যায়ক্রমে রাসূল (স) এর হাতে এসে পৌছান। অতঃপর মদীনায় এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী (স) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন– سلمانُ مِنّا اهل البيت - তিনি তিন শত পঞ্চাশ বৎসর হায়াত লাভ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ২ শত পঞ্চাশ বৎসর হায়াত লাভ করেন। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। নজ হস্তের কামায় দ্বারা তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। ৩৫ হিজরীতে মাদায়েনে ইন্তিকাল করেন। হযরত আবু হুরায়রা ও আনাস (রা) প্রমুখ সাহাবী তার থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

الرُّخْصَةُ فِى الْاِسْتِطَابَةِ بِحَجَرَيْنِ

٤٢. اَخْبَرَنَا احمدُ بْنُ سليمانَ قال حدّثنا ابو نعيمٍ عن زُهَيرٍ عن ابى اسحٰقَ قال ليس ابو عبيدة ذكرَه ولكنّ عبدَ الرحمٰن بنِ الاسودِ عن ابيه انه سَمِعَ عبدَ اللّٰهِ رضى الله عنه يقولُ اَتَى النبىُّ ﷺ الغائطَ وامَرَنِى ان اٰتِيَه بثلاثةِ اَحجارٍ فوجدتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثالثَ فلم اجدْه فاتيتُ روثةً فاتيتُ بِهِنّ النبىَّ ﷺ فاخذَ الحجرَينِ والقَى الروثةَ وقال هٰذه ركسٌ قال ابو عبد الرحمن الرِكسُ طعامُ الجنِّ ـ

দু'টি পাথর দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি

অনুবাদ ঃ ৪২. আহমদ ইবনে সুলায়মান (র)..........আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী (স) একদিন পায়খানা-পেশাবের জন্য ঢালু জমিতে আসেন। আমাকে তিনটি পাথর (ঢেলা) আনার জন্য হুকুম করেন। আমি দুটি পাথর পেলাম। তৃতীয় একটি খোঁজ করলার, কিন্তু পেলাম না। কাজেই আমি একটি গোবরের টুকরা পেয়ে এগুলো নিয়ে নবী করীম (স) এর নিকট এলাম। তিনি পাথর দুটি নিলেন, আর গোবরটি এ বলে ফেলে দিলেন যে, এটি রিক্স। আবূ আব্দুর রহমান বলেন, রিক্স হলো জ্বিনদের খাদ্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : مَا الِاضطرابُ فِى سنَدِ الحديثِ؟ اَوْضِح

প্রশ্ন ঃ এ হাদীসের সনদে কি ইযতিরার রয়েছে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ এ হাদীসটি আবু ইসহাক হতে তাঁর ৬ জন ছাত্র নকল করেন।

১. ইসরাইল ইবনে ইউনুস।

২. কায়েস ইবনে রাবিহ।

৩. মা'মার।

৪. আম্মার বিন রাজিক।

৫. জুহাইর।

৬. যাকরিয়া ইবনে আবু যায়েদা।

এই হাদীসের সনদে দুটি ইযতিরাব রয়েছে–

১. প্রথম ইযতিরাব হলো আবু ইসহাক এবং আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর মাঝে দুটি সূত্র রয়েছে অথবা একটি। যুহাইর দুটি সূত্র বর্ণনা করেন, আর তা হলো–

عن زُهيرٍ عن ابى اسحَاق عن عبدِ الرحمٰن بن الاسودِ عن ابيه عبدِ اللّٰه ـ

আর অন্য পাঁচজন শিষ্য শুধু একটি সূত্র উল্লেখ করেছেন। তবে এ পাঁচটি রেওয়ায়েতের সূত্রটির নামের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

২. দ্বিতীয় ইযতিরাব হলো এ পাঁচজনের মধ্যে সূত্র নির্ধারণে। ইসরাঈল ইবনে ইউনুস এবং কায়েস ইবনে রবী এর রেওয়ায়েতে সূত্র হলো আবু উবায়দা মামার ও আম্মার এর রেওয়ায়েতে সূত্র আলকামা যাকারিয়া ইবনে আবু যাইদার রেওয়ায়েতে সূত্র হলো আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ।

سوال : مَا الاختلافُ بَيْنَ الإمام البُخاريِّ والامام التِّرمذيِّ فِي رفعِ الإضطرابِ المذكورِ ومَا الراجحُ عندكَ ولِمَ؟

প্রশ্ন ঃ উল্লেখ্য ইযতিরাব দূর করার ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম বুখারীর মধ্যে মতানৈক্য কি এবং তোমার নিকট অগ্রগণ্য মত কোনটি ও কেন? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ উল্লেখিত ইযতিরাব দূর করা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম তিরমিযী (র) এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম বুখারী (র) যুহাইরের রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়ে স্বীয় কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন। অপর দিকে ইমাম তিরমিযী ইসরাঈলের রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন আবু ইসহাকের ছাত্রদের মধ্য হতে ইস্রাইল অধিক স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া ইসরাইল এর রেওয়ায়েতে কাইস ইবনে রাবীহ রয়েছেন। এটা তার রেওয়ায়েতকে অধিক শক্তিশালী করে দিয়েছে। এ কারণে আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলেন, সুফিয়ান সাওরী আবু ইসহাক থেকে যে সব হাদীস বর্ণনা করতেন আমি সেগুলো শুধু এ কারণে ছেড়ে দিয়েছি যে, সে সব বর্ণনা ইসরাঈলের সূত্রে হাসিল করেছি। যেহেতু তিনি সেসব বর্ণনা পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করতেন। সে কারণে আমি তার উপরই নির্ভর করেছি। বাকী যুহাইরের হাদীসে এমন নির্ভর করা সমীচীন নয়। কেননা, তিনি আবু ইসহাক হতে তাঁর বৃদ্ধ অবস্থায় যখন তার স্মৃতি শক্তি দূর্বল হয়ে গিয়েছিল তখন হাদীস শ্রবণ করেছেন। এ কারণে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, যদি তোমরা যায়েদা ও যুহাইর হতে হাদীস শুনে থাক তবে তা শুদ্ধ হবে, আর ইসহাক থেকে শুনলে তা অশুদ্ধ হবে। মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম ইমাম বুখারী (র) এর (মতকে) প্রাধান্য দিয়েছেন। এর কারণ হিসেবে নিম্নে কয়েকটি উত্তর দেন–

ক. যুহাইর এর অনেক মুতাবি রয়েছে যা তার রেওয়ায়েতকে দৃঢ় করেছে। তারা হলেন ইব্রাহীম ইবনে ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনে আবী যায়েদা, লাইস ইবনে সালিম, যুরাইক প্রমূখ।

খ. আবু ইসহাক এ হাদীসটি আবু উবায়দা ও আব্দুর রহমান উভয় জন হতে শ্রবন করেছেন। এখানে ইমাম বুখারী (র) আবু উবায়দার রেওয়ায়েতকে ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা, ইবনে মাসউদ (র) হতে তার শ্রবণের ব্যাপারে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম অভিযোগ করেছেন।

فقال حدثنا زهيرٌ عن ابى اسحاقَ فقال ليسَ ابو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سَمِعَ عبد الله .... الخ

১. ইসরাঈল এ হাদীসটি عنعنه সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর ইউসুফ ইবনে আবু ইসহাক এটা تحديث শব্দে বর্ণনা করেছেন যা যুহাইরের রেওয়ায়েতকে দৃঢ় করেছে।

২. ইসরাইলের হাদীসে ইযতিরাব রয়েছে। অর্থাৎ কিছু শব্দ কিছু শব্দের বিরোধী। আর যুহাইরের হাদীসে ইযতিরাব নেই।

৩. দ্বিতীয় উত্তর হলো, যদি ইসরাইলের সূত্র অবলম্বন করা হয় তবুও ইমাম তিরমিযীর এ উক্তি তত্ত্বজ্ঞানীদের নিকট অগ্রহণযোগ্য যে, আবু উবায়দা তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে শ্রবণ করেননি। আল্লামা আইনী "উমদাতুল কারীতে" এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং আবু উবায়দার শ্রবণের ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার (র) এর মন্তব্যও এরূপই যে, আবু উবায়দার শ্রবণ তার পিতা থেকে প্রমাণিত রয়েছে। কারণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর ওফাতের সময় আবু উবায়দার বয়স ছিল সাত বছর। এ বয়স হাদীস গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। এ জন্য শুধু তাঁর কম বয়সের কারণে অশ্রুতির উপর প্রমাণ পেশ করা ঠিক নয়।

৪. তৃতীয়ত ঃ যদি স্বীকার করে নেই যে, আবু উবায়দা তাঁর পিতা থেকে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেননি। তা সত্ত্বেও মুহাদ্দিসীনে কিরামের এ ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে যে, তিনি ইবনে মাসউদের ইলম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন। ইমাম ত্বহাবী (র) এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। ইমাম বায়হাকী লিখেছেন, আবু উবায়দা আব্দুল্লাহ ইবনে

মাসউদের ইলম সম্পর্কে হুনাইফ ইবনে মালিক ও তাঁর ন্যায় অন্যান্যদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। এ কারণে উম্মত এ হাদীসটিকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। এ উত্তরটি যথার্থ। এর দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, কোন কোন সময় একটি হাদীস সূত্রগতভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও সহীহ এবং প্রামাণ্য হয়ে থাকে। ইমাম নাসায়ী (র) ইমাম বুখারী (র) এর মতকেই গ্রহণ করেছেন।

سوال : اَلْحَدِيْثَانِ مُتَعَارِضَانِ فَكَيْفَ التَّوفِيقُ -

প্রশ্ন ঃ উল্লেখিত হাদীস এবং সামনে আগত সালামা ইবনে কায়েস (র) এর হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান। এর সমাধান কি?

উত্তর ঃ হাদীসদ্বয়ের বৈপরীত্যের সমাধান ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল (স) নিজেই দুটি ঢেলা ব্যবহার করেছেন। আর সালামা ইবনে কায়েস (রা) এর হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় তিনি তিনটি ঢেলা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই রাসূল (স) এর فعل ও امر এর মধ্যে বৈপরীত্ব দেখা যায়। উভয় হাদীসের সমাধানে বলা যায়–

১. ইবনে মাসউদ (রা) এর হাদীসের মর্ম হচ্ছে– দুটি ঢেলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে তা জায়েয হবে। আর সালামা ইবনে কায়সের হাদীসে বলা হয়েছে তিনটি ঢেলা নেয়া মুস্তাহাব।

২. অথবা, বলা যায় ঢেলার সংকট হলে দুটি, আর সংকট না হলে তিনটি নিতে হবে।

৩. অথবা, বলা যায় হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর হাদীস যেহেতু ফে'লী। আর সালামা ইবনে কাইস এর হাদীস হচ্ছে কাওলী। সুতরাং কাওলী হাদীস প্রাধান্য পাবে।

৪. আল্লামা ইবনে বাত্তালের মতে হাদীসদ্বয় দু'স্থানে দু'ভাবে প্রযোজ্য। সালামা (র) এর হাদীসে স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর হাদীসে বিশেষ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫. অথবা, প্রথম হাদীসটি পূর্বের, আর দ্বিতীয়টি পরের। সুতরাং দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা প্রথম হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে।

سوال : كم قِسمًا لِلاِسْتِنجاء ومَا هِي؟ بيِّن

প্রশ্ন ঃ ইস্তিঞ্জা কত প্রকার ও কি কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ শৌচকার্যের প্রকারভেদ ঃ পায়খানা পেশাব করার পর পাথর, মাটি বা অন্য কোন পবিত্র বস্তু দ্বারা শৌচকার্য করাকে শরীয়তের পরিভাষায় استنجاء বলা হয়। এটা ৬ প্রকার। যেমন–

১. **ফরজ ইস্তিঞ্জা ঃ** نجاسة حقيقى যদি গুহ্যদ্বারে এক দিরহাম পরিমাণের বেশি নাপাক ছড়িয়ে পড়ে তখন ইস্তিঞ্জা করা ফরজ। এ পরিমাণ নাপাক নিয়ে নামায পড়লে তা শুদ্ধ হবে না।

২. **ওয়াজিব ইস্তিঞ্জা ঃ** যদি নাপাক এক দিরহাম পরিমাণ হয়, তখন ইস্তিঞ্জা করা ওয়াজিব। কোন কোন ফকীহ বলেন, এ পরিমাণ হলে তা ধোয়া ওয়াজিব নয়। বরং তা নিয়ে কিংবা তার চেয়ে কম পরিমাণ নাজাসাত নিয়ে নামায আদায় করা জায়েয। অনুরূপ نجاسة خفيفة কাপড়ের এক চতুর্থাংশের বেশী হলে তা ধোয়া ফরয এবং এক চতুর্থাংশ হলে ওয়াজিব।

৩. **সুন্নত ইস্তিঞ্জা ঃ** এক দিরহাম বা এক চতুর্থাংশের কম হলে তা ধোয়া সুন্নত।

৪. **মুস্তাহাব ইস্তিঞ্জা ঃ** নাপাকী গুহ্যদ্বার অতিক্রম না করলে তা পরিষ্কার করা মুস্তাহাব।

৫. **মাকরূহ ইস্তিঞ্জা ঃ** ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহ। কেননা, বাম হাতের তুলনায় ডান হাত উত্তম। তাই নিচু কাজে উত্তম বস্তুকে ব্যবহার করা সঙ্গত নয়। রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন–

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى

৬. **বিদআত ইস্তিঞ্জা ঃ** সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকাসত্ত্বে ইস্তিঞ্জা করা বিদআত। কেননা, এতে অযথা পানি খরচ হয় এবং সময় নষ্ট হয়, এটা শরীয়তে নিন্দনীয়।

سوال : باىّ شيئٍ يجوزُ الاِسْتِنجاء، وباىٍّ لاَ؟

প্রশ্ন ঃ কোন কোন বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ? আর কোন কোন বস্তু দ্বারা বৈধ নয়?

উত্তর ঃ যে সব বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ ঃ যে সব বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ সেগুলো হচ্ছে পাথর, ঢেলা। এতে নির্দিষ্ট সংখ্যার তেমন কোন কথা না থাকলেও তিনটি নেয়া মুস্তাহাব। যেমন– রাসূল (স) এর বাণী–

اِذا اتى احدُكم الغائطَ فيأتِ معَه ثلثة اَحجارٍ

যে সব বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা জায়েয নয় ঃ সে সব বস্তু হচ্ছে হাড়, গোবর, খাদ্য এবং ডান হাত ব্যবহার করা। তাই ফকীহগণ বলেন– ولا يَسْتَنجِى بعظمٍ ولا روثٍ ولا بِطعامٍ ولابيَمِينه

سوال : اذكر ادبَ قضاءِ الحاجة والاستنجاء

প্রশ্ন ঃ পেশাব-পায়খানা করার শরয়ী আদবসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ পেশাব-পায়খানার শরয়ী আদবসমূহ ঃ পেশাব-পায়খানার শরয়ী আদবসমূহ নিম্নরূপ–

১. ইস্তিঞ্জার স্থলে প্রবেশের সময় নিম্নের দোয়া পড়া– اَللّٰهُمَّ اِنّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الخُبُثِ والخَبائِثِ

৩. কেবলাকে সামনে বা পেছনে না রাখা। যেমন- হাদীসের বাণী– لاتَسْتَقبِلُوا القِبلَةَ ولاتَسْتَدبِرُوها

৪. যথাসম্ভব সতর ঢেকে রাখা এবং ডান হাত দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ না করা।

৫. ঢালু স্থানে পেশাব করা, গর্তে পেশাব না করা এবং পেশাবের ছিটা যেন কাপড়ে না লাগে সে ব্যাপারে সদা সজাগ থাকা।

৬. স্থায়ী আবদ্ধ পানিতে ও গোসলখানায় পেশাব না করা।

৭. মল-মূত্র ত্যাগ করা অবস্থায় সালাম না দেয়া এবং না নেয়া।

৮. পেশাবের সময় একটি এবং পায়খানার সময় তিনটি বিজোড় সংখ্যক কুলুখ ব্যবহার করা।

৯. পানি দ্বারা শৌচকার্য করা।

১০. ইস্তিঞ্জার পর উযু করা।

سوال : اذكر نبذًا مِّن سِيرة سيِّدِنا سلَمة بْنِ قَيْسٍ رض

প্রশ্ন ঃ হযরত সালামা বিনতে কায়েস (রা) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।

উত্তর ঃ সালামা বিনতে কায়েসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

পরিচিতি ঃ নাম সালামা, পিতার নাম কায়েস। তিনি সিরিয়ার অধিবাসী এবং প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন।

হাদীস বর্ণনা ঃ হাদীস বর্ণনায় তিনি কুফার মুহাদ্দিসগণের মধ্যে গণ্য হতেন। তিনি সরাসরি রাসূল (স) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে হযরত বেলাল ইবনে ইয়াসাফসহ অন্যান্য আরো রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

سوال : اذكر نبذًا مِّن سيرةِ سيِّدنا عبدِ الرحمٰن بنِ اسودَ

প্রশ্ন ঃ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ এর জীবনী লেখ।

উত্তর ঃ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ এর জীবনী

পরিচিতি ঃ নাম আব্দুর রহমান, পিতার নাম আসওয়াদ। তিনি কুরাইশ বংশের বনু যোহরা গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিজাজে বসবাস করতেন। তিনি মূলত: মদীনার অধিবাসী একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন।

হাদীস বর্ণনা ঃ তার বর্ণিত হাদীস সর্বত্র সমাদৃত ছিল। তিনি আবু বকর (রা), ওমর (রা), উবাই ইবনে কাব (রা), আমর ইবনে আওস (রা) ও আয়েশা (রা) প্রমূখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, আবু সালামা, মারওয়ান ইবনে হাকাম, ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

রাবী সম্পর্কে তথ্য ঃ আসওয়াদ ইয়াযীদ ইবনে কায়েস নাখয়ী এর ছেলে ছিলেন। তার কুনিয়াত হলো আবু আব্দুর রহমান। তিনি ইব্রাহীম নাখয়ীর মামা এবং ইবনে মাসউদ (রা) এর শাগরেদ ছিলেন। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী, ফকীহ এবং জাহেদ ছিলেন। তিনি ৭৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইবনে ত্বীন বলেন, তিনি হলেন আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস আযযুহরী, ইবনে ইয়াযীদ নাখঈ নন। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী এটাকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। কারণ তিনি ইসলাম পর্যন্ত পৌছাননি তাহলে কি ভাবে ইবনে মাসউদ (রা) এর শাগরেদ হবেন?

سوال : ما رایٔ امامِ النّسائی فِی اسنادِ هٰذا الحدیثِ

প্রশ্ন ঃ এ হাদীসের সনদের ক্ষেত্রে ইমাম নাসায়ীর মতামত কি?

উত্তর ঃ আলোচ্য হাদীসটি বিভিন্নসূত্রে বর্ণিত, কিন্তু ইমাম নাসায়ী (র) আলোচ্য রেওয়ায়েতকে–

زهيرٌعن ابی اسحٰق عن عبدِ الرحمٰن بن الاسودِ عَن ابیه عن عبدِ اللّٰه بنِ مسعودٍ ـ

এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বুঝা গেল যে, ইমাম নাসায়ী (র) এর নিকট আবু ইসহাক এর শাগরেদ যুহাইর-এর সূত্রটিই অগ্রগণ্য। কারণ এর দ্বারা সনদটা মুত্তাসিল হয়ে যায়। আবু ইসহাক এর শাগরেদ ইসরাইলের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি মুত্তাসিল নয় বরং মুনকাতি। কেননা, ইবনে হাজার বলেন, আবু উবায়দা তাঁর পিতা ইবনে মাসউদ থেকে হাদীসটি শোনেননি। ইমাম বুখারীও এ রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তার নিকট এটাই বেশী বিশুদ্ধ।

سوال : کیفَ ثَبَتَ عدمُ التَّثْلِیث (عدمِ ضرورة) بهٰذا الحدیثِ ومَا اعْتُرِضَ علیها بَیِّن مع جوابِ اِعْتِراضِ المُخالِفِین -

প্রশ্ন ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা কিভাবে প্রমাণিত হলো যে, ইস্তিঞ্জার ক্ষেত্রে تثلیث **জরুরী নয় এবং এর উপর কি আপত্তি উথাপিত হয়? প্রতিপক্ষের আপত্তির জবাব প্রদানকরত: মাসআলাটির স্পষ্ট বর্ণনা দাও।**

উত্তর ঃ ইস্তিঞ্জা করার জন্য যে, তিনটি পাথর জরুরী নয়, তা এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা, ১. যদি তিনটি কুলুখ নেয়া আবশ্যক হত তাহলে রাসূল (স) অবশ্যই তৃতীয় আরেকটি পাথর চাইতেন। অথচ কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা এটা প্রমাণিত নয় যে, রাসূল (স) তৃতীয় আরেকটা পাথর তালাশ করার জন্য কাউকে পাঠিয়েছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইস্তেঞ্জার ক্ষেত্রে কুলুখের সংখ্যা তিন হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার উল্লেখিত মাসআলার উপর আপত্তি উথাপন করে এটাকে দ্বয়ীফ সাব্যস্ত করেন। কারণ মুসনাদে আহমাদে মা'মার এর সূত্রে هذا رِکْسٌ এর পরে اِئْتِنِی الحَجَر বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে। তথা নবী (স) বলেছেন গোবরের টুকরাটি অপবিত্র অপর আরেকটি পাথর নিয়ে এসো। এর দ্বারা বুঝা যায় রাসূল (স) অপর আরেকটি পাথর নিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে ইবনে হাজার আসকালানী লিখেন এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য।

২. কেউ আপত্তি করতে পারে আলকামা থেকে আবু ইসহাকের سماع সাবেত নেই। এটা ভুল, কারণ কারবিসী আলোচ্য হাদীসটি আলকামা থেকে শুনেছেন, এটা প্রমাণ করেছেন। আর যদি হাদীসটিকে মুরসালও ধরা হয় তাহলে হানাফীগণ বলেন মুরসাল হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা বিশুদ্ধ। সুতরাং আর আপত্তি থাকে না।

৩. পরিশেষে ইবনে হাজার (র) বলেন, হয়তো বা ইমাম ত্বহাবী (র) মুসনাদে আহমেদ উল্লেখিত হাদীসের ব্যাপারে অনবহিত ছিলেন। (ফাতহুল বারী ১/ ১৮১)

আল্লামা আইনী (র) ইবনে হাজারের আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে বলেন, ইমাম ত্বহাবী উক্ত হাদীসের ব্যাপারে অনবহিত ছিলেন না। বরং অনবহিত তো ঐ ব্যক্তি যে, ইমাম ত্বহাবীর মত হাফেজে হাদীস এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি সম্পর্কে এমন উক্তি করে। কারণ ইমাম আহমদ (র) উল্লেখিত হাদীসটি আবু ইসহাক এবং আলকামার সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন। আর ইমাম ত্বহাবী (র) এর নিকট আলোচ্য হাদীসটি আবু ইসহাক আলকামা থেকে না শুনাটা নিশ্চিত। কাজেই উল্লেখিত হাদীসটি منقطع। আর মুনকাতে হাদীসের উপর মুহাদ্দিসীনে কেরাম আস্থাশীল নন।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য উমাদাতুলকারী ১/৭৩৭ পৃষ্ঠা)

আর ইবনে হাজার বলেছেন যে, আমাদের নিকট মুরসাল হাদীস স্বাভাবিকভাবে হুজ্জত এ কথাটি সহীহ নয়। কারণ আমরা حديث مُرْسَل بالمَعْنى المُتعارف কে হুজ্জত মানি, مُترادِف কে নয়। অপর দিকে ইবনে মাসউদ তৃতীয় একটি পাথর যে, এনেছেন এরও কোন প্রমাণ নেই। একটি বর্ণনায় যদিও তার সুবুত পাওয়া যায় তা হলো ابو। الحسن بن القصّار مالكى এর বর্ণনা কিন্তু স্বয়ং ইবনে হাজারের নিকটই তিনি গ্রহণযোগ্য নন তাহলে ইমাম ত্বহাবীর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা কিভাবে সহীহ হল?

শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র) বলেন, ইবনে হাজার আসকালানী (র) ইমাম ত্বহাবী (র) এর উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, القى الروثة দ্বারা استنجاء بالحَجَرَيْن এর উপর দলীল পেশ করা সহীহ নয়। কারণ এ বাক্যের পর ائتنى بثالث এর কথা উল্লেখ আছে।

আমরা এর জবাবে বলব একথা শুধুমাত্র ইমাম ত্বহাবীই বলেননি বরং ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসায়ীও বলেছেন। এমন কি তারা এ ব্যাপারে–

باب الاستنجاء بالحجرين ও الرُّخصة فِى الْاِسْتِطابَة بِحَجَرَيْن নামে স্বতন্ত্র শিরোনাম কায়েম করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় ইবনে হাজারের আপত্তি ও বক্তব্য সহীহ নয়। কারণ মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করেননি। (ফয়যুলবারী ১/ ২৬০)

سوال : ما معنى رِكس بيِّن مفصّلا -

প্রশ্ন ঃ رِكس এর অর্থ কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ ১. আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন, رِكس এর অর্থ হলো রূপান্তরিত হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া, পাল্টানো, আসলরূপ ছেড়ে অন্যরূপ ধারণ করা। অর্থাৎ طهارة এর অবস্থা থেকে نجاسة এর অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া এবং খাদ্যের অবস্থা থেকে গোবরের অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া।

২. হাফেজ ইবনে হাজার (র) বলেন, رِكْس শব্দের راء বর্ণে কাসরা এবং كاف বর্ণে সুকুনের সাথে হবে।

৩. কতক ব্যাখ্যাকার বলেন, ركس এর অর্থ হলো رجس অর্থ নাপাক বস্তু। ইবনে মাজাহ ও ইবনে খুযাইমাতে এভাবে রেওয়ায়েত করা হয়েছে অর্থাৎ ك এর স্থানে ج পড়তে হবে। তিরমিযীর বর্ণনা এটারই সমর্থন করে।

৪. ইমাম নাসায়ী ركس এর অর্থ বর্ণনা করেছেন জিন জাতির খাদ্যের দ্বারা। ركس এর অর্থ, জিন-জাতির খাদ্য। এটা কোন অভিধানের মধ্যে না পেয়ে ব্যাখ্যাকারগণ হয়রান হয়ে গেছেন। তবে এব অর্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খাদ্য জাতীয় বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা যাবে না।

মোটকথা, ইমাম খাত্তাবী (র) এর বর্ণিত অর্থ অনুযায়ী বস্তু নাপাক হওয়ার কারণে তার দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা যাবে না। আর নাসায়ী (র) এর বর্ণিত অর্থ অনুযায়ী খাদ্য জাতীয় বস্তু হওয়ার কারণে তার দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা যাবে না।

باب الرُّخْصَةِ فِى الْاِسْتِطابَةِ بِحَجَرٍ واحِدٍ

٤٣. اخبرنا اسحٰق بنُ ابراهيمَ اخبرَنا جريرٌ عن منصورٍ عن هلالِ بْنِ يسافٍ عن سلمَةَ بنِ قيسٍ رضى الله عنه عن رسولِ اللّه ﷺ قال اِذا اِسْتَجمرتَ فَاَوْتِرْ-

الِاجْتِزاءُ فِى الْاِسْتِطابَةِ بالحِجارة دُون غيرها

٤٤. اخبرَنا قتيبةُ قال حدّثنا عبدُ العزيز بْن ابى حازمٍ عن ابيه عَن مسلمِ بْن قرطٍ عن عُرْوَةَ عن عائشةَ رضى الله عنها اَنّ رسولَ اللّه ﷺ قال اذا ذَهَبَ احدُكم الغائطَ فليَذهبْ معَه بثلاثةِ اَحجارٍ فليَسْتَطِب بِها فاِنّها تُجزِئُ عَنْه -

---

অনুচ্ছেদ ঃ একটি কুলুখ দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি

অনুবাদ ঃ ৪৩. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)........সালামা ইবনে কায়স (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন ঢেলা ব্যবহার কর তখন বিজোড় সংখ্যক ব্যবহার কর

শুধু কুলুখ দ্বারা পবিত্রতা অর্জন যথেষ্ট

৪৪. কুতায়বা (র) ....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন পায়খানা-পেশাবের জন্য ঢালু ভূমিতে যাবে সে যেন সাথে করে তিনটি পাথর নিয়ে যায় এবং এগুলোর দ্বারা যেন সে পবিত্রতা অর্জন করে। এ ঢেলাগুলো তার পবিত্রতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : امام النسائى لِاَىِّ مذهبٍ يَقْتَدِى وما يَمِيْلُ فِى هٰذه المسئلةِ بَيِّن مفصّلاً.

প্রশ্ন ঃ নাসায়ী শরীফের গ্রন্থকার কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন? এবং আলোচ্য মাসআলায় তিনি কোন দিকে ঝুঁকেছেন তা বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ইমাম নাসায়ী (র) শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী তা সত্ত্বেও আলোচ্য মাসআলায় তিনি হানাফী মাযহাবের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। এর প্রমাণ হলো আলোচ্য মাসআলার শিরোনাম– باب الرخصة فى الاِسْتطابه بحَجرٍ واحد এবং এর পূর্ববর্তী শিরোনাম باب الرخصةِ فى الاستطابةِ بحَجَرين ঐ শিরোনাম দ্বারা বুঝা যায় তাঁর নিকট একটি বা দুটি পাথরবা কুলুখ দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ। তিনটি নেওয়া জরুরী নয়। অর্থাৎ একটি দ্বারা যদি মলদ্বার পরিষ্কার হয়ে যায় তাহলে দ্বিতীয় পাথরটি ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই। এখন যদি পরিষ্কার হওয়ার পরেও পুনরায় আরেকটি পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা হয় তাহলে এটা অনর্থক ও অপচয় গণ্য হবে; যা উচিৎ নয়। ইমাম নাসায়ী (র) হানাফী, মালেকী ও মাযানীর মাসলাক অগ্রগণ্য বুঝে তিনটি পাথর ব্যবহার করা ওয়াজিব বলেননি এবং শর্তও সাব্যস্ত করেননি বরং তিনি বলেন, ইস্তিঞ্জার মূল উদ্দেশ্য হলো انقاء المحل তথা মলদ্বার পরিষ্কার করা। চাই তা যে পরিমাণ ঢেলা দ্বারাই হোক না কেন?

لَيسَ فى الاستنجاءِ عددٌ مسنونٌ وانّما الشرطُ هو الاِنْقاءُ حتّى لو حصَلَ بحجرٍ واحدٍ يصيرُ مقيمًا لِلسُّنّةِ ولو لم يَحْصُل بثلثةِ احجارٍ لا يصيرُ مقيمًا لِلسّنّةِ.

(ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩০)

سوال : هل الاستطابة مخصوص بالحجارة ام لا وما الاختلاف فيه بين مدللا.

প্রশ্ন ঃ ইস্তিঞ্জা তথা মল-মূত্রের স্থান পরিষ্কার করা শুধু পাথরের সাথেই খাস কি না? এ ব্যাপারে মতানৈক্য কি? দলীলসহকারে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ইস্তিঞ্জা করা পাথরের সাথে খাস কি না? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. আহলে জাওয়াহের বলেন, পাথর ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ নয়।

২. জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন, ইস্তিঞ্জা করা শুধু মাত্র পাথরের সাথে খাস নয়। বরং পাথর ব্যতীত যে সকল বস্তুর মধ্যে পরিষ্কার করণের ক্ষমতা আছে এবং তা পবিত্র, শরীর বিশিষ্ট, শুকনো ও এমন হওয়া জরুরী। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো তা মূল্যবান বস্তু না হতে হবে। তাহলে তা পাথরের হুকুমে গণ্য হবে এবং তার দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ হবে।

আহলে জাওয়াহের এর দলীল ঃ রাসূল (স) এর বাণী– لايستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار

এখানে নবী (স) পাথরের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তিনের কম পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেও নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইস্তিঞ্জা করাটা পাথরের সাথে খাস।

জুমহুরের দলীল ঃ জুমহুরের বক্তব্য হলো রাসূল (স) যে পাথরের কথা উল্লেখ করেছেন তা খাস করার জন্য নয় বরং মলদ্বার পরিষ্কার করার জন্য। কাজেই যে সকল বস্তুর মধ্যে নিষ্কাষণের ক্ষমতা আছে এবং তা পবিত্র, শরীর বিশিষ্ট, শুকনো এবং তার মাঝে নাজাসাত দূর করার ক্ষমতাও আছে আর তা মূল্যবান বস্তু নয়। এর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (র) বলেন, ইস্তিঞ্জার উদ্দেশ্য হচ্ছে ময়লা দূর করে স্থানটি পরিষ্কার করা। তাই পরিষ্কার করতে যতগুলো ঢেলা নেওয়া দরকার ততগুলো নিতে হবে, তিনটি নেয়া শর্ত নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন এখানে যদিও পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু হুকুমটি আ'ম। কাজেই মূল্যহীন প্রত্যেক পাক পবিত্র বস্তু যার দ্বারা নাজাসাত পরিষ্কার করা সম্ভব এবং উদ্দেশ্যও অর্জিত হয় এগুলো পাথরের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে এবং এর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ হবে। শাহ সাহেব (র) বলেন, রাসূল (স) যখন উম্মতকে কোন কিছু শিক্ষা দিতে চাইতেন তখন আমলের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন এবং তার অনুকরণ করার নির্দেশ দিতেন। সর্বক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক নীতি নির্ধারক বাক্যমালা ঠিক করে সেটাকে লোকের সম্মুখে পেশ করতেন না। কারণ এটা মানুষের সাধারণ স্বভাবেরও সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কাজেই নবী (স) যখন বিষয়টি লোকদেরকে শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন লোকদের উপর সহজ করনার্থে শহরের মধ্যে যে জিনিস অধিকহারে পাওয়া যায় তাদ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নির্দেশ দেন।

اَلْاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ

٤٥. اخبرنا اسحق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر اخبرنا شعبة عن عطاء بن ابى ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله ﷺ اذا دخل الخلاء احمل انا وغلام معى نحوى إداوة من ماء فيستنجى بالماء -

٤٦ . اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة انها قالت مرن ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فانى استحييهم منه ان رسول الله ﷺ كان يفعله -

পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা

অনুবাদ ঃ ৪৫. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)....... আতা ইবনে আবু মায়মুনা (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (স) যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন তখন আমি এবং আমার সাথে আমার মতই আর একটি ছেলে পানির পাত্র নিয়ে যেতাম। তিনি পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন।

৪৬. কুতায়বা (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমাদের স্বামীদেরকে পানি দ্বারা শৌচকার্য সমাধা করতে বল। আমি নিজে তাদেরকে এ কথা বলতে লজ্জাবোধ করি যে, রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ করতেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : هل يكفى الماء وحده فى الاستنجاء؟ اذكر بالدليل .

প্রশ্ন ঃ শৌচকার্যে শুধুমাত্র পানি ব্যবহারই যথেষ্ট কি না দলীলসহ উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ শুধু পানি দ্বারা শৌচকার্য করার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

আহলে জাওয়াহেরদের অভিমত ঃ আহলে জাওয়াহের এর মতে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ নয়।

আহলে জাওয়াহের এর দলীল ঃ তারা বলেন, পানি যেহেতু পানাহার দ্রব্য। কাজেই তার দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা ঠিক হবে। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে যে, গোবর ও হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা কর না। কেননা, এটা জিন জাতির খাদ্য। আর জিন জাতির খাদ্যের প্রতি যখন এ পরিমাণ সতকর্তা অবলম্বন করা হয়েছে, তাহলে মানুষের খাদ্যের প্রতি তো আরো উত্তমরূপে লক্ষ্য রাখা চাই।

দ্বিতীয় দলীল ঃ পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে হাত দূর্গন্ধযুক্ত হয় এবং তাতে পায়খানার তৈলাক্ত ভাবটা থেকে যায়, যার ফলে তার থেকে বিভিন্ন রোগ জীবাণু সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা সহীহ নয়।

তৃতীয় দলীল ঃ রাসূলের হাদীস- لا يستنجى احدنا باقل من ثلثة احجار

আমাদের কেউ যেন তিনটার কমে পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে, এখানে রাসূল (স) পাথরের কথা উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পাথর ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা ইস্তিঝআ করা সহীহ নয়।

জুমহুরের দলীল ঃ পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা জায়েয বরং উত্তমও বটে। কারণ স্বয়ং রাসূল (স)ই পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করেছেন। তাদের দলীল নিম্নরূপ-

১. প্রথম দলীল হলো মহান আল্লাহ তাআলার বাণী- فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, যখন অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন স্বয়ং রাসূল সা. কুফার অধিবাসীদের নিকট গমন করেন এবং বলেন হে আনসার সম্প্রদায়! আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পবিত্রতা অর্জন করার ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন। কাজেই এখন তোমাদের পবিত্রতা অর্জন করার পদ্ধতিটি বল। তারা বলল, আমরা নামাযের জন্য উযু করি, জানাবাত হলে গোসল করি এবং পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করি। তখন রাসূল সা. বললেন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার কারণ এটাই। কাজেই এটাকে আঁকড়ে ধর।এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআনের আয়াতে طهارة শব্দ দ্বারা পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ হওয়া প্রমাণিত হয়।

রাসূলের হাদীস ঃ

١. قال انسٌ رض كان النبيّ صلى الله عليه وسلم اذا خرج لِحَاجتِه اجئ انا وغلام معنا اداوة من ماءٍ يعنى يستنجى به،

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় রাসূল (স) পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করেছেন।

٢. عن ابنِ عباس رض انه دخلَ الخلاءَ فوضعتُ له وضوءً،

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত নবী (স) পায়খানায় প্রবেশ করলে আমি তাঁর জন্য পানি নিয়ে দিতাম, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী (স) পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন।

٣. عن ابنِ حبّانٍ رض قال ما رأيتُ النبيَّ صلى بالله عليه وسلم خرجَ مِن غائطٍ الا مسَّ ماءً

ইবনে হিব্বান (রা) বলেন, আমি নবী (স) কে কখনো পানি স্পর্শ করা ব্যতীত পায়খানা থেকে বের হতে দেখিনি। এর দ্বারা ও বুঝা যায় নবী সা. পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ যখন পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার বিষটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সুতরাং مشروب ও مطعوم কে ইল্লত সাব্যস্ত করে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা মাকরূহ বলা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

এ কথা সতসিদ্ধ যে, পানি مشروب ও مطعوم বস্তু। কিন্তু পানি ও অন্যান্য খাদ্য ও পানীয় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো আল্লাহ তাআলা পানিকে مطهر - طاهر এবং নাপাক দূর করার মাধ্যম বানায়েছেন। কিন্তু অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যকে নাপাক দূর করার মাধ্যম বানাননি, কাজেই পানিকে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের উপর ক্বিয়াস করাটা قياس مع الفارق হবে। অন্যথায় যদি مشروب ও مطعوم এর ইল্লত সাব্যস্ত করে অন্যান্য খাদ্য বস্তুর মত এটাকে محترم সাব্যস্ত করা হয়। তাহলে তা দ্বারা অযু করা, জানাবাতের জন্য গোসল করা এবং নাপাক কাপড় ধৌত করা ইত্যাদি না জায়েয হওয়া চাই এবং শুধুমাত্র পাথর মাটি দ্বারা নাজাসাত দূর করা যথেষ্ট হওয়া চাই। অথচ কোন ইমামই এ কথার প্রবক্তা নন। কাজেই আপনাদের ক্বিয়াস সহীহ নয়। তাই পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ। (বজলুল মাজহুদ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং -২৭)

দ্বিতীয়তঃ পানির দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে হাত দুর্গন্ধ হয়। এ কথা সহীহ নয়। কারণ পাথর ইত্যাদি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলেও হাত ময়লা হয়। তাই বলে কি বলতে হবে যে, পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা যাবে না। বরং এ ময়লা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। ঠিকতদ্রূপ পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার পরও হাত ভাল করে ধৌত করতে হবে। হাত গন্ধ হয় এই ইল্লত বের করে তা পরিত্যাগ করা সহীহ নয়। কারণ নবী সা. নিজেই পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করেছেন।

তৃতীয়তঃ নবী সা. এর হাদীসে যে পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একথা বুঝানোর জন্য বলা হয়নি যে, ইস্তিঞ্জা করাটা পাথরের সাথে খাস বরং এ কারণে বলা হয়েছে যে, আরব দেশে অধিক পরিমাণ পাথর পাওয়া যেত। তাই বিষয়টি সহজ করার জন্য এমনটি বলা হয়েছে।

জুমহুরের আকলী দলীল ও প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব ঃ পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে খুব ভালরূপে মলদ্বার পরিষ্কার হয়। কিন্তু পাথরের দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে ভালরূপে মলদ্বার পরিষ্কার হয় না। বরং ময়লা থাকে অর্থাৎ এর দ্বারা নাজাসাত তো দূর হয়, কিন্তু মলদ্বার ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করাই যথার্থ।

দ্বিতীয়তঃ আহলে কুবাগণ প্রথমে পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন তখন তাদেরকে প্রশংসা করা হয়নি। কিন্তু যখন তারা পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশংসা করনার্থে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

سوال : ما هو حكمُ الاِستِنجاءِ بالماءِ؟

প্রশ্ন ঃ পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার বিধান কি?

উত্তর ঃ পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার বিধান ঃ পানি দ্বারা শৌচকার্য করার ব্যাপারে উলামাদের মতামত নিম্নরূপ।

১. ইমাম সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যির ও তাঁর অনুসারীদের মতে পানি দ্বারা শৌচকার্য করা জায়েয নেই। কেননা পানি হচ্ছে পানীয় বস্তু। তাই নাপাকী দূর করার কাজে পানি ব্যবহার করা উচিত নয়।

২. ইমাম চতষ্টয় আল্লামা আঈনী ও সকল সলফ ও খলফ এর মতে পানি দ্বারা শৌচকার্য করা জায়েযই নয়, বরং উত্তম। কেননা, তা দ্বারা নাপাক ভালভাবে দূর হয়। ঢেলা ও পানি উভয়টি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। নাজাসাত যদি স্থান অতিক্রম করে, যা ঢেলা দ্বারা পবিত্র হবার নয়। তখন পানি ব্যবহার করা ওয়াজিব। যদি নাজাসাত স্থান অতিক্রম না করে তাহলে পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। এ সময় ঢেলা ও পানি উভয়টি একত্রিত করাও মুস্তাহাব। আর শুধুমাত্র পানি দ্বারাও ইস্তিঞ্জা করা যায়। ঢেলা না নিলে কোন গুনাহ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সর্বাবস্থায় পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা জরুরী।

ইমাম তহাবী (রা) পানি দ্বারা শৌচকার্য করার উপর দলীল হিসাবে এ আয়াতটি পেশ করেন–

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

আল্লামা আঈনী (র) এ মতের দলীল হিসাবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেছেন–

١. عن ابنِ عبَّاسٍ رض انَّهُ دخَل الخَلاَءَ فوُضِعتْ لهُ وضوءٌ (بخارى)

٢. انه صلى الله عليه وسلم قضٰى حاجتَه فاتاه جريرٌ باداوةٍ مِّن ماءٍ فَاسْتَنجىٰ به (ابن خزيمة)

٣. عن ابنِ حبّان مارأيتُ النبى صلعم خرج منْ غائطٍ قطُّ إلاَّ مَسَّ ماءً (صحيح ابن حبان)

এগুলো দ্বারা পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার বিধান সাব্যস্ত হয়।

سوال : استنجاء بالماء افضل ام بالحجارة بين؟

প্রশ্ন ঃ পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা উত্তম না কি পাথরের দ্বারা? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ইস্তিঞ্জার ক্ষেত্রে উত্তম তো হলো পানি ও পাথর উভয়টা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা। কিন্তু কেউ যদি একটি দ্বারা যথেষ্ট করতে চায় তাহলে কোনটা উত্তম হবে? আল্লামা আইনী (র) বলেন, পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করাটাই উত্তম। কারণ এর দ্বারা নাজাসাতের সত্ত্বা ও আছর উভয়টা দূর হয়। কিন্তু ঢেলার দ্বারা শুধুমাত্র নাসাজাতের সত্ত্বা দূর হয়। কিন্তু আছর বাকী থাকে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, পানির দ্বারাই উত্তমরূপে পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হাসিল হয়। কাজেই শুধু একটি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার সুরতে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করাটাই উত্তম। শায়খ ইবনে হুমাম এর উপরেই ফাতওয়া দিয়েছেন। যেমন– وافتى الشيخُ ابنُ الهمامِ بسُنّيَّتِه اى الجمع بَينَ الحجرِ والماءِ فى زمَانِنا لِانّ الناسَ لكثيرةُ الكهم يَثلُطون ثلطًا

শায়খ ইবনে হুমাম (র) ফাতওয়া প্রদান করেন যে, বর্তমান যুগের লোকদের পায়খানা নরম হয়, অধিক ভক্ষণের কারণে। কাজেই ঢেলা ও পানি উভয়টা ব্যবহার করা উত্তম। (ফয়যুলবারী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৫৮)

سوال : ما المرادُ بانَا وغُلامٍ وما اعتُرِض عليه وما حَلُّه بَيِّنْ وعلى مَن اُطلِق عليه غُلام.

প্রশ্ন ঃ انا ও غلام দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এবং এর উপর যে আপত্তি উত্থাপিত হয় তার সমাধান কি? গোলাম শব্দ কার উপর প্রযোজ্য হয় বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ انا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আনাস (রা) আর গোলাম দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন গোলাম শব্দ দ্বারা হযরত ইবনে মাসউদ (রা) উদ্দেশ্য। কিন্তু এ বক্তব্যের উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

প্রশ্ন ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর উপর গোলাম শব্দের প্রয়োগ সহীহ নয়। কেননা, গোলাম শব্দ তো এমন ব্যক্তির উপর ব্যবহার হয় যার সবেমাত্র মোঁচ গজায়েছে। বড় দাড়ি বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর গোলাম শব্দ ব্যবহৃত হয় না। অথচ ইবনে মাসউদ (রা) বয়স্ক ও দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন তাহলে তার উপর গোলাম শব্দের ব্যবহার কিভাবে শুদ্ধ হল?

উত্তর ঃ বস্তুত এখানে গোলাম শব্দ দ্বারা এক আনছারী সাহাবী উদ্দেশ্য ইবনে মাসউদ (রা) নয়। কাজেই প্রশ্ন করাটা সহীহ আছে। আর গোলাম দ্বারা ইবনে মাসউদ (রা) কিভাবে উদ্দেশ্য হতে পারেন তিনি তো মুহাজির ছিলেন, আনসার নন। অথচ এখানে গোলাম শব্দ দ্বারা আনসারী সাহাবী উদ্দেশ্য। এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, প্রশ্নটি সহীহ এবং এটাই ইবারতের বাহ্যিক অবস্থার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল।

গোলাম শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র ঃ গোলাম শব্দের প্রয়োগের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের মত পাওয়া যায়।

১.গোলাম শব্দটি ১০ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত (বয়স্ক) ছেলেদের উপর ব্যবহৃত হয়। এটাই আবু উবায়দার বক্তব্য।

২.যমখশারী (র) আসাসুল বালাগায় লেখেন দাড়ি উঠার আগ পর্যন্ত ছেলেদের উপর গোলাম শব্দের ব্যবহার হয়। এরপরে আর তার ক্ষেত্রে গোলাম শব্দের ব্যবহার সহীহ নয়, যদি করা হয় তাহলে সেটা রূপক অর্থে হবে।

৩. "মুহকাম" গ্রন্থকার লেখেন দুধ ছাড়ার পর থেকে সাত বছর বয়স্ক বালকের উপর গোলাম শব্দ ব্যবহৃত হয়।

سوال : مَن قائِلُ هٰذه العِبارة "قوله فيَستَنجى بالمَاء

প্রশ্ন ঃ فيستنجى بالماء **এ বাক্যের প্রবক্তা কে বর্ণনা কর?**

উত্তর ঃ কোন কোন ব্যাখ্যাতা বলেন, উক্ত ইবারতের প্রবক্তা হলেন, আবু মায়মুনা থেকে বর্ণনাকারী রাবী হযরত আতা (র); কিন্তু এমতটি বিশুদ্ধ নয়। এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতম মত হলো আলোচ্য ইবারতটিও হযরত আনাস (রা) এর قول এটাই কাজী আয়াজ (র) এর ভাষ্য।

سوال : كم صورة لِلاِستنجاء وما هى بيِّن مفصلا.

প্রশ্ন ঃ ইস্তেঞ্জার পদদ্ধতি কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ ইস্তিঞ্জার তিনটি সুরত উল্লেখ করে থাকেন–

১. استنجاء بالحجارة তথা পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা।

২. استنجاء بالماء তথা পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা।

৩. استنجاء بالحجارة والماء তথা পানি ও পাথর উভয়টি দ্বারা একত্রে ইস্তেঞ্জা করা।

প্রথম প্রকার তথা পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার বিষয়টি হাদীসে মশহুর দ্বারা প্রমাণিত। সে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন হযরত ইবনে মাসউদ, আবু আইয়ুব আনসারী, ইবনে উমর (রা) ও হযরত জাবের (রা) প্রমূখ সাহাবীগণ।

এই সুরতের ব্যাপারে আহলে জাওয়াহের বলেন, ইস্তিঞ্জা করাটা পাথরের সাথে খাস, পাথর ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ নয়। তবে চারো ইমাম ও জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে শরীর বিশিষ্ট শুকনো পবিত্র এবং মূল্যহীন বস্তু যা দ্বারা নাজাসাত দূর করা যায় তার দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ।

সাঈদ ইবনে মুসায়্যিবসহ একদল উলামায়েকেরাম বলেন, পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ নয়। এটা পানীয় বস্তু হওয়ার কারণে এবং এর দ্বারা হাত দুর্গন্ধ হওয়ার কারণে। কিন্তু ইমাম চতুষ্ঠয় ও জুমহুর উলামার বক্তব্য হলো এর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ। কেউ যদি শুধু পানি বা শুধু পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে চায় তাহলে পাথর থেকে শুধুমাত্র পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করাটাই উত্তম। এ সংক্রান্ত মশহুর হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন, যথাক্রমে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আনাস (রা) প্রমূখ সাহাবীগণ।

তৃতীয় সুরত তথা পাথর ও পানি উভয়টা দ্বারা একত্রে ইস্তিঞ্জা করা, ইস্তিঞ্জা করার এটাই সর্বোত্তম সুরত। এবং এটার ব্যাপারে কুরআনে প্রশংসা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। তবে এ ব্যাপারে দুর্বল রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। এর মধ্যে সব থেকে সহীহ হাদীস হলো ইবনে আব্বাস (রা) এর রেওয়ায়েত, আর তা হল– اِنَّا نَتَّبِعُ الحِجَارَةَ المَاءَ অর্থাৎ আমি পাথর বা ঢিলা ব্যবহার করে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে থাকি। এই হাদীসের একজন রাবী হলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আযীয। তিনি দুর্বল কিন্তু ফাযায়েলে হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দেসীনে কেরাম দুর্বল রেওয়ায়েতকেও গ্রহণ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম রেওয়ায়েত হলো হযরত আলী (রা) এর এ আছার– اِنَّ مَنْ قبلكم كَانُوا يَبعَرون بعرًا واَنتم تَثلُطون ثلطًا فاتّبِعوا الحجارةَ المَاءَ

এই আছারের সনদের ব্যাপারে কেউ বিরূপ মন্তব্য করেনি। এটাকে ইবনে আবি শাইবা, আব্দুর রাজ্জাক, বায়হাকী নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম যাইলায়ী (র) "নসবুর রায়া" এর মধ্যে এটাকে উত্তম বলেছেন। আর এটা ইস্তিঞ্জার মধ্যে উভয়টাকে একত্রিত করার প্রমাণ এ জন্য জুমহুর উলামা কেরাম এবং সলফ ও খলফ উভয়টা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার ব্যাপারে একমত। [বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

النَّهْىُ عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ

٤٧. اخبرنا اسمعيلُ بنُ مسعودٍ قال حدّثنا خالدٌ قال حدّثنا هشامٌ عن يحيى عن عبدِ اللّٰه بن ابى قتادة عن ابى قتادة رضى اللّٰه عنه انّ رسولَ اللّٰه ﷺ قالَ اذا شربَ احدكم فلا يتنفّسْ فى اناءِه واذا اتى الخلاءَ فلا يمسَّ ذكرَهُ بيمينِه ولا يتمسّحْ بيمينِه -

٤٨. اخبرنا عبدُ اللّٰه بن محمّدِ بنِ عبدِ الرحمٰن قال حدّثنا عبدُ الوهاب عن ايوبَ عن يحيى بن ابى كثيرٍ عن ابنِ ابى قتادة عن ابيه انّ النبىَّ ﷺ نهى ان يتنفّسَ فى الاناءِ وان يمسَّ ذكره بيمينِه وان يستطيبَ بيمينِه -

٤٩. اخبرنا عمرُو بنُ علىٍّ وشعيبٌ والاعمشُ عن ابراهيمَ عن عبدِ الرحمٰن بنِ مهدىٍّ عنْ سفيانَ عن منصورٍ والاعمشُ عن ابراهيمَ عن عبدِ الرحمن بن يزيدَ عن سلمانَ قال قال المشركون انّا لنرى صاحبكم يعلّمكم الخراءةَ قال اجلْ نهانا ان يستنجى احدنا بيمينِه ويستقبلَ القبلة وقال لا يستنجى احدكم بدونِ ثلثةِ احجارٍ -

---

ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার নিষিদ্ধতা

অনুবাদ ঃ ৪৭. ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)........আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন পান করে সে যেন পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে এবং যখন পায়খানা-প্রশ্রাবের জন্য যায় তখন যেন সে তার ডান হাত দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে।

৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান (র)....... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (স) পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে, ডান হাতে লিঙ্গ স্পর্শ করতে ও ডান হাতে শৌচকার্য করতে নিষেধ করেছেন।

৪৯. আমর ইবনে আলী ও শুয়ায়ব ইবনে ইউসুফ (র)......... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা বললো, তোমাদের নবীকে দেখছি যে, তোমাদেরকে পায়খানা-পেশাবে বসার পদ্ধতি শিক্ষা দেন। সালমান (রা) বললেন, হ্যাঁ, আমাদের নিষেধ করেছেন যে, আমাদের কেউ যেন ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করে এবং কিবলামুখী হয়ে (পায়খানা-পেশাবে) না বসে। তিনি আরও বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন তিনটির কম কুলুখ (ঢেলা) দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে।

[পূর্বের পৃষ্ঠার বাকী অংশ]

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন বর্তমান যামানায় পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার পর পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা সুন্নত। কোন একজন জিজ্ঞাসা করলেন তাহলে সাহাবাগণ কেন পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন? তখন তিনি বলেন– انهم كانوا يبعرون بعرا وانتم تثلطون ثلطا অর্থাৎ তাদের পায়খানা ছাগলের লাদার ন্যায় শুকনো ও শক্ত ছিল, যার ফলে তা মলদ্বারের স্থান অতিক্রম করতো না, কাজেই শুধুমাত্র পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করাটা যথেষ্ট ছিল। আর বর্তমান যামানার লোকদের পায়খানা নরম বা পাতলা হয়। ফলে তা মলদ্বারা অতিক্রম করে থাকে। এ কারণে পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার পর পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা সুন্নত। অনেকে বলেন, রাসূলের যুগের পর সাহাবাদের যুগে উভয়টা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। যেমনটা বিশ রাকাত তারাবির নামায পড়ার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে।

(মাআরিফুস সুনান–কৃত ইমাম নববী)

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : بَيِّن طريقةَ المَسنونةَ لِشُرب الماءِ ولِمَا مَنَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَتَنَفَّسَ الرجلُ فِى إنائه ومَا الحِكمةُ فِيهَا بيِّن مُوضِحًا مع بَيان مَضَرَّتِها.

প্রশ্ন ঃ পানি পান করার সুন্নত তরিকা বর্ণনা কর এবং নবী (স) লোকদেরকে পানির পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করলেন কেন? তিন শ্বাসে পানি পান করার মধ্যে হিকমত কি? স্পষ্ট করে বর্ণনা কর, এভাবে পানি পান না করায় ক্ষতি কি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ পান করার সুন্নত তরিকা ঃ

১. বসে পান করা।

২. ডান হাতে পান করা।

৩. তিন শ্বাসে পান করা।

৪. পাত্রের ভিতর শ্বাস না ছাড়া এবং ফুঁ না দেওয়া।

৫. পান করার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা।

৬. পান শেষে এ দুআ পড়া- الحمدُ للّٰهِ الذى جَعله ماءً عَذبًا فُراتًا ولم يَجعلهُ بِذُنوبِنَا مِلحًا اُجَاجًا।

৭. দুধ, চা, কফি ইত্যাদি পান করার সময় এ দুয়া পড়া- اللّٰهم بَارِكْ لَنا فِيه وزِدْنا مِنه।

৮. জমজমের পানি কিবলা মুখী হয়ে পান করা মুস্তাহাব, দাঁড়িয়ে পানি করাও জায়েয।

৯. পরিবেশনকারী সর্বশেষ পান করা।

পাত্রে শ্বাস ফেলতে নিষেধের করার কারণসমূহ

১. প্রথমতঃ এর কারণ হলো শ্বাস হলো বিষাক্ত পদার্থ। যাকে কার্বনডাই অক্সাইড বলা হয়। এটা শরীর ও সাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। মানুষের শরীর ও সাস্থ্যের অনুকূলের পদার্থ হলো অক্সিজেন। এটা সে সার্বক্ষণিক গ্রহণ করে থাকে। আর এর বিপরীত বস্তুই হলো কার্বনডাই অক্সাইড। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি এমন স্থানে অবস্থান করে যেখানে অক্সিজেন নেই বরং সেখানে শুধুমাত্র কার্বনডাই অক্সাইড রয়েছে, তাহলে সে মারা যাবে। তাই নবী (স) পানির পাত্রে শ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।

২. দ্বিতীয়তঃ পানপাত্রে শ্বাস ফেললে গ্লাসটা ঘোলাটে হয়ে যায়, ফলে অন্য ব্যক্তি তাতে পানি পান করতে ঘৃণাবোধ করে। এ কারণে নবী সা. তাতে শ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।

৩. অনেক সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলার সময় দাঁত বা মুখের ময়লা গ্লাসে লেগে যায়, ফলে ঐ গ্লাসে পানি পান করতে নিজের কাছেও খারাপ লাগবে। এ জন্য নবী (স) নিষেধ করেছেন।

৪. আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের থিউরী অনুপাতেও পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা মারাত্মক ক্ষতিকর। এটা নবী (স) চৌদ্দশত বছর আগেই উম্মতকে জানিয়েছেন।

৫. উম্মতের পানি পান করার আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য নিষেধ করেছেন।

তিন শ্বাসে পানি পান করার হিকমত বা রহস্য

নবী করীম (স) বলেছেন কেউ যেন এক শ্বাসে পানি পান না করে, বরং তিন শ্বাসে পানি পান করে। তিন শ্বাসে পানি পান করার রহস্যগুলো নিম্নরূপ–

১. তিন শ্বাসে পানি পান করা হলে তৃষ্ণা মিটে যায় এবং পরিপূর্ণ তৃপ্তি হাসিল হয়।

২. অল্প-অল্প করে তিন শ্বাসে পান করলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে পেটের কোন সমস্যা থাকে না এবং খাদ্যের শক্তিগুলো তার যথাস্থানে পৌছে দেয়। আর এক শ্বাসে পানি পান করা হলে খাদ্যের শক্তিগুলো যথাস্থানে পৌছে না। ফলে খাদ্যের কার্যকারীত কম হয়ে যায়।

৩. আস্তে আস্তে পানি পান করলে পেটের উত্তাপ নষ্ট হয় না। যা হজম করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। আর পেটের উত্তাপ নষ্ট না হওয়ায় হজম শক্তির মধ্যে কোন ধরণের প্রভাব পড়ে না। ফলে হজমশক্তির কার্যকারিতা বহাল থাকে। তাই খাদ্যের শক্তি ও উপকারিতা শরীরের সকল অংশে পৌছে যায়। এর এর দ্বারা তৃষ্ণাও নিবারণ হয় পূর্ণ মাত্রায়। এ দিকে লক্ষ্য করেই রাসূল সা. তিন শ্বাসে পানি পান করতে বলেছেন।

তিন শ্বাসে পানি পান না করার ক্ষতি

যদি এক শ্বাসে পানি পান করলে আশংকা অধিক পরিমানে পানি একবারে পেটে চলে যাওয়ার ফলে খাদ্য হজম ক্রিয়ায় যে উত্তাপ কার্যকারী ভূমিকা রাখে তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।।

খাদ্য পাকস্থলিতে পৌঁছানোর পর এক পিচ্ছিল পদার্থেররূপ নেয়। যার মধ্যে একটি সূক্ষ্মাংশ গিয়ে কলিজার সাথে মিলিত হয়। আর ভারী অংশ গিয়ে নাড়ি-ভূড়ীর সাথে মিলিত হয়। যা পরবর্তীতে পেশাব পায়খানাররূপ নিয়ে স্ব-স্থান থেকে বের হয়। অতঃপর আরেকবার হজম হওয়ার পর রক্ত, পিত্ত, কফে পরিণত হয়। এর অতিরিক্ত অংশ পেশাবে পরিণত হয়ে পেশাবের রাস্তা দিয়ে নির্গত হয়। আর রক্ত রগের ভিতর গিয়ে পুনরায় রক্ত দুভাগে বিভক্ত হয়ে কিছু অংশ রগ থেকে বের হয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গোশতের সাথে মিলিত হয়ে যায়। আর কিছু অংশ রগে থেকে যায়। ফলে খাদ্যের উপকারিতা ও শক্তি শরীরের সর্বাংশে পৌঁছে যায়। আর এ কাজগুলো ঐ সময় হবে যখন হজম শক্তি পূর্ণমাত্রায় কাজ করবে। কিন্তু যদি খাদ্যগুলো পূর্ণরূপে হজম না হয়, তাহলে শরীরের সকল অঙ্গে প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য না পৌঁছানোর কারণে শরীর দূর্বল হয়ে পড়ে। এসব কারণে রাসূল (স) এক শ্বাসে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। উপরন্তু এক শ্বাসে পূর্ণ পানীয় পান করা তীব্র লালসার পরিচায়ক ও চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাব। আর এ ব্যাপারে রেওয়ায়েত এর মধ্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে–

وَلَا تَشْرَبُوا واحدًا كشُرْبِ البَعِير ولٰكن اشْرَبُوا مَثْنٰى وثُلَاثَ۔

অর্থাৎ উটের ন্যায় এক শ্বাসে পানি পান করবে না। বরং দুই বা তিন শ্বাসে পানি পান করবে। অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, দুই তিন শ্বাসে পানি পান করার ফলে অল্প পানিতেই পিপাসা নিবারণ হয়ে যায়। কিন্তু এক শ্বাসে পানি পান করলে বিশেষ করে প্রচণ্ড তৃষ্ণার অবস্থায় পিপাসা নিবারণ করতে অধিক পরিমাণ পানি পান করতে হয় এবং পেট ভর্তি হয়ে যাওয়ায় এটা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আর গ্লাসের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলা সুস্থ্যরুচি সম্পন্ন ব্যক্তিদের রুচির পরিপন্থী বটে। যার ফলে অন্যরা তা পান করতে ঘৃণাবোধ করে। অনেক সময় নিজের কাছেই এটা ঘৃণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সকল কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলাম ধর্ম তিন শ্বাসে পানি পান করার বিধান জারী করেছে।

قوله واذا اتى الخلاء .... الخ

سوال : مالفرقُ بَيْنَ الجُملتَيْن (فلايَمُسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِه ولايَمْسَحُ بِيَمِيْنِه) وما حكمُ الاستنجاء باليَمِيْن ـ

প্রশ্ন ঃ ولا يتمسح بيمينه ও فلا يمس ذكره بيمينه **এ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? এবং ডান হাত দ্বারা শৌচকার্য করার বিধান কি? বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ হাদীসে যে বাক্য দুটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হল– ১. فلا يَمَسُّ ذكره بِيَمِينِه ২. ولا يَتمسَّحُ بِيَمِينِه দুটি বাক্যের مفهوم (বক্তব্য) এক নাকি ভিন্ন ভিন্ন। এ ব্যাপারে আল্লামা ত্বীবী (র) বলেন, প্রথম বাক্যের সম্পর্ক হলো ছোট ইস্তিঞ্জা তথা পেশাবের সাথে। আর দ্বিতীয় বাক্যের সম্পর্ক বড় ইস্তিঞ্জা তথা পায়খানার সাথে। এটাই যুক্তির অধিক অনুকূলে তথা পেশাব-পায়খানা কোন সময় ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা যাবে না।

ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জার বিধান ঃ ইস্তিঞ্জার আদব হলো বাম হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা এবং ডান হাত দ্বারা না করা। কেননা, হাদীসে আছে– وَاَنْ لَّا يَسْتَنْجِى بِالْيَمِيْنِ

ডান হাত দ্বারা শৌচকার্য করা বৈধ কিনা এ মাসআলার ব্যাপারে ইমামদের মতামত নিম্নরূপ–

১. আহলে জাওয়াহের এর মতে ডান হাত দ্বারা শৌচকার্য করা মাকরূহে তাহরীমী কতক হাম্বলী ও শাফেয়ীদের বক্তব্যও এরূপই।

২. জুমহুর উলামার মতে পেশাব-পায়খানায় ডান হাত দ্বারা শৌচকার্য করা মাকরূহে তানযীহী। বাম হাত দিয়ে শৌচাকার্য করা মুস্তাহাব। তবে কোন সমস্যা থাকলে ডান হাত ব্যবহার করা যাবে। যখন পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা হবে, তখন ডান হাত দ্বারা পানি ঢালবে এবং বাম হাত দ্বারা মর্দন করবে।

ইমাম নববী (র) বলেন, মানুষ খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ডান হাত ব্যবহার করে থাকে। কাজেই এ হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা স্বাভাবিক রুচিবোধেরও পরিপন্থী। (উমদাতুলকারী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৭২৭)

سوال : متٰى يَسْتَعْمِلُ النبىُّ صلعم يَدَه اليُمْنٰى ومَتٰى يسْتَعْمِل يدَه اليُسْرىٰ بَيِّنْ مع بيانِ وُجهًا ؟

প্রশ্ন ঃ নবী (স) কখন ডান হাত ব্যবহার করতেন এবং কখন বাম হাত ব্যবহার করতেন এবং তার কারণ কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ নবী (স) এর ডান হাত ব্যবহার করার ক্ষেত্রসমূহ ঃ

১. খানা খাওয়ার সময় ডান হাত ব্যবহার করতেন।

২. পানি, দুধ ইত্যাদি পান করার সময় ডান হাত ব্যবহার করতেন।

৩. কোন কিছু প্রদান করার সময় ডান হাত দ্বারা প্রদান করতেন।

৪. কোন কিছু গ্রহণ করার সময় ডান হাতে গ্রহণ করতেন।

৫. উযূ করার সময় ডান হাত ব্যবহার করতেন।

৬. কাপড় পরার সময় ডান হাত ব্যবহার করতেন। মোটকথা যত ধরণের শরীক কাজ আছে সকল ক্ষেত্রে ডান হাত ব্যবহার করতেন। যেমন আয়েশা (রা) এর বাণী– كانتْ يدُ رسولِ اللّٰه صلعم اليُمْنٰى لِطُهورِه وطَعامِه

হাফসা (রা) বলেন– اِنَّ النبىَّ صلعم كان يجعَلُ يمِينَه لِطعامِه وشَرابِه وثِيابِه ويجعَل شِمالَه لِما سِوٰى ذٰلك

উত্তম কাজে ডান হাত ব্যবহারের কারণসমূহ ঃ উল্লেখিত স্থানগুলোতে ডান হাত ব্যবহারের কারণ হল–

১. আল্লাহ তাআলা ডান হাতকে বাম হাতের উপর মর্যাদা দান করেছেন।

২. ইসলামের একটি মূলনীতি হল– اِعطاءُ كلِّ ذِى حقٍّ حَقَّه

অর্থাৎ প্রত্যেক হকদারকে তার হক বা অধিকার দিয়ে দেওয়া কর্তব্য। আর ডান হাতের তাগাদা তো এটাই যে, তাকে প্রত্যেক মর্যাদা সম্পন্ন কাজে ব্যবহার করতে হবে. বাম হাতের উপর তার প্রাধান্য থাকার কারণে।

৩. নবী (স) যেহেতু খানা-দানা, পরিধান পবিত্রতার্জন, লেন-দেন ইত্যাদি সকল ভাল ক্ষেত্রে ডান হাত হাত ব্যবহার করতেন। তাই তার অনুসরনের কারণে এ সব জায়গাই ডান হাত ব্যবহার করতে হবে।

৪. ডান হাতকে যদি ইস্তিঞ্জার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে তার দ্বারা কোন কিছু খেতে ঘৃণার উদ্রেক হবে। এ কারণে ডান হাত দ্বারা নিকৃষ্ট কোন কাজ সম্পাদন করা যাবে না।

৫. ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কাজ করলে ডান হাতের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাকে মর্যাদা দান করেছেন। কাজেই বান্দার জন্য সে মর্যাদা ক্ষুন্ন করা ঠিক হবে না।

৬. এটা রাসূল (স) এর সার্বক্ষণিক ও সারা জীবনের আমল ছিল।

বাম হাত ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

১. ইস্তিঞ্জা করার সময় বাম হাত ব্যবহার করতেন, ২. নাক পরিষ্কার করার সময় বাম হাত ব্যবহার করতেন,

৩. সমস্ত নিম্নমানের কাজের ক্ষেত্রে বাম হাত ব্যবহার করতেন, এ মর্মে হযরত আয়েশা (রা) এর বাণী–

كانتْ يدَه اليُسْرٰى لِخَلائِه وماكانَ مِن اَذًى ـ اخرجها اصحابُ السنن

হযরত হাফসা (রা) এর বাণী– كان يجعلُ يَمِينَه لِطعامِه وشَرابِه وثِيابِه ويَجْعلُ شِمالَه لِما سِوٰى ذلك

নিকৃষ্ট কাজে বাম হাত ব্যবহার করার কারণ ঃ উল্লেখিত স্থানগুলোতে বাম হাত ব্যবহার করার কারণ হলো–

১. আল্লাহ তাআলা' যেহেতু ডান হাতকে বাম হাতের উপর মর্যাদা দান করেছেন কাজেই এর দ্বারা বুঝা যায় বাম হাতের মর্যাদা কম তাই তাকে নিম্নমানের কাজে ব্যবহার করা হবে।

২. নবী (স) বাম হাতকে নিম্নমানের কাজে ব্যবহার করতেন। এটাই নবী (স)এর সার্বক্ষণিক সুন্নত আমল ছিল।

৩. বাম হাত দ্বারা পানাহার করা শয়তানের কাজ। তাই বাম হাত দ্বারা খানা-পিনার কাজ করা যাবে না।

৪.এর উপর সকল সাহাবাদের আমল ছিল।

৫. ইস্তিঞ্জা ও নিম্নমানের কাজ করা বাম হাতের জন্য শোভনীয়। তাই বাম হাত দ্বারা এগুলো করতে হবে।

৬. বাম হাত দ্বারা খানা খেলে ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

৭. হযরত উসমানের বাণী– যখন আমি ডান হাত দ্বারা রাসূল (স) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি তারপর থেকে আর কোন দিন আমি ডান হাত দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ করিনি।

سوال : حديثُ الباب (واذا أتى الخلاءَ فلا يَمُسَّ ذكرهُ بيمينه اذا بال احدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه) فكيف التوفيقُ بينهما بيِّن موضحا۔

প্রশ্ন ঃ নাসায়ীর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ডান হাতে দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা পেশাব-পায়খারার সময় খাস। আর তিরমিযীর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় ডান হাতে স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা পেশাব-পায়খানার সময়ের সাথে খাস নয় বরং সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এ বর্ণনাদ্বয়ের সমাধান কি?

উত্তর ঃ বৈপরীত্যের সমাধান

১. হাফেজ ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেন حديث الباب এ মুতলাককে মুকাইয়্যাদ এর উপর প্রয়োগ করা হবে এবং বলা হবে যে পেশাব-পায়খানা করার সময় ডান হাত দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

২. অথবা, এর সমাধান হলো اذا بال احدكم الخ যে রাবী বৃদ্ধি করেছেন তিনি সিকা রাবীর অন্তর্ভুক্ত। আর সিকা রাবীদের বর্ধিত অংশ মাকবুল। তাই এই বর্ণনাটি راجح হবে। (ফাতহুল বারী, উমদাতুলকারী)

৩. আল্লামা নববী (র) বলেন, ইস্তিঞ্জা করা বা না করা সর্বাবস্থায় ডান হাত দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ করা নিষেধ। তবে যে হাদীসে ইস্তিঞ্জার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পেশাব-পায়খানা করার সময় লিঙ্গ স্পর্শ করার প্রয়োজন পড়ে। তাই যখন নিষিদ্ধ অন্যান্য সময় তো আরো উত্তমরূপে নিষিদ্ধ হবে।

৪. আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেন এ সংক্রান্ত সকল বর্ণনা يحى ابن ابى كثير عن عبد الله بن ابى قتاده عن ابيه এর প্রতি সম্বন্ধিত। কাজেই তিরমিযীর রেওয়ায়েতকে নাসায়ীর রেওয়ায়েতের উপর প্রয়োগ করতে হবে।

سوال : ما المرادُ المصنف بهذه العبارة (واللفظ له) بيِّنْ موضحا ممثلا۔

প্রশ্ন ঃ واللفظ له এ ইবারতের দ্বারা মুসান্নিফ (র) এর উদ্দেশ্য কি? উদাহরণ সহকারে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ তৃতীয় হাদীসের له শব্দের ، যমীরটি شعيب بن يوسف এর দিকে ফিরেছে। নাসায়ী (র) এর এ বাক্য আনার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিনি উক্ত হাদীস দুইজন শায়খ থেকে শুনেছেন। আর উভয় বর্ণনার অর্থ এক কিন্তু শব্দ ভিন্ন ভিন্ন। তাই উক্ত বাক্য বৃদ্ধি করে ইমাম নাসায়ী (র) শায়খের যে শব্দ গ্রহণ করেছেন তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

উদাহরণ ও মাসআলাটির ব্যাখ্যা ঃ হাফেজ ইবনুস সালাহ (র) বলেন, যদি কারও নিকট দু'জন শায়খ থেকে হাদীস পৌছে এবং উভয় শায়খের বর্ণিত রেওয়ায়েতের শব্দ যদি ভিন্ন ভিন্ন ও অর্থ এক হয়, তাহলে এক্ষেত্রে হাদীসের রাবী উভয় শায়খের রেওয়ায়েতকে এক সনদে একত্রিত করতে পারেন এবং এক শায়খের لفظ উল্লেখ করতে পারেন। যেমন বললেন, আমি এ হাদীসটি অমুক অমুক শায়খ থেকে বর্ণনা করছি। কিন্তু এ রেওয়ায়েতের শব্দগুলো হলো অমুক শায়খের, এমন বললে সন্দেহ-সংশয় শেষ হয়ে যায়। যেমন এখানে শেষ হাদীসটি ইমাম নাসায়ী (র) তার উস্তাদ উমর ইবনে আলী এবং শুয়াইব ইবনে ইউসুফ উভয়ের থেকে হাসিল করেছেন। কাজেই উল্লেখিত মূলনীতি অনুযায়ী উভয়কে সনদে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাদীসের শব্দ যা বর্ণনা করা হয়েছে তা খাস করে শুয়াইব ইবনে ইউসুফের। তাই ইমাম নাসায়ী (র) واللفظ له বৃদ্ধি করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

ইস্তিঞ্জা সম্পর্কিত হাদীস ও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে,শুধু পানি দ্বারা মলদ্বার পরিষ্কার করলে হাতে জীবানু ও তৈলাক্ত পদার্থ লেগে থাকে যা সাবান দ্বারা ধুলেও সহজে যায় না। তবে মাটি, ছাই বা এ জাতীয় কোন বস্তু দ্বারা হাত ধৌত করলে তা দূরীভূত হয়ে যায়। ফলে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। আর রোগেও আক্রমণ করতে পারে না।

জনৈক বিজ্ঞানী পানি দ্বারা মলদ্বার পরিষ্কার করার পর সাবান দ্বারা হাত ধৌত করলেন। অতঃপর অনুবিক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করে দেখেন যে, হাতে অসংখ্য জীবাণু রয়েছে। এভাবে সাতবার ধৌত করার পর দেখেন জীবাণু দূর হয়েছে। আরেক দিন পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার পর মাটি দ্বারা হাত ধৌত করে অনুবিক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখেন যে, তাতে আর কোন জীবাণু নেই। তখন ইসলামের বিধানের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং কুলুখ ব্যবহার শুরু করেন। হাতের এ জীবাণুকে দূর না করলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন চুলকানী, পাঁচড়া, দাউদ, পেট ফাঁপা পাতলা পায়খানা ইত্যাদি। কাজেই প্রথমে কুলুখ ব্যবহার করে অতঃপর পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা এবং এর পর হাতকে মাটি, বালু, সাবান ইত্যাদি দ্বারা ধৌত করে নেয়া উচিত।

بَابُ دَلْكِ الْيَدِ بِالاَرْضِ بَعْدَ الْاِسْتِنْجَاءِ

٥٠. اخبرنا محمدُ بن عبدِ اللّٰه بنِ المُبَارَكِ المَخرمِيّ قال حدّثنا وكيعٌ عن شريكٍ عن ابراهيمَ بْنِ جريرٍ عن ابى زُرْعَةَ عن ابى هريرةَ رضى الله عنه ان النبى ﷺ تَوَضَّأَ فلمّا اسْتَنْجٰى دَلَكَ يدَه بالارضِ -

٥١. اخبرنا احمدُ بنُ الصَّبَّاحِ قال حدّثنا شعيبٌ يعنى ابنَ حربٍ حدّثنا ابانُ بنُ عبدِ اللّٰه البَجَلِيّ قال حدّثنا ابراهيمُ بْنُ جريرٍ عن أبِيْه قال كنتُ مَعَ النبىّ ﷺ فَاتَى الخلاء فقَضَى الْحاجةَ ثم قال ياجريرُ هَاتِ طَهُورًا فَاَتَيْتُه بالمَاءِ فَاسْتَنْجٰى بالماءِ وقال بِيدِه فَدَلَكَ بها الارضَ- قال ابو عبدِ الرحمٰن هذا اشبهُ بالصّواب مِن حديثِ شريكٍ واللّٰهُ سُبْحَانَه وتَعَالٰى اعلمُ-

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিঞ্জার পরে মাটিতে হাত ঘষা

অনুবাদ ঃ ৫০. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক মুখাররামী (র)....... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) ইস্তিঞ্জা করার পর মাটিতে হাত ঘষেন এবং উযু করেন।

৫১. আহমদ ইবনে সাব্বাহ (র)......... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পায়খানা-পেশাবের জন্য গেলেন এবং তাঁর প্রয়োজন সমাধা করলেন। তারপর বললেন, জারীর! পানি আন। আমি তাঁকে পানি এনে দিলাম। তিনি পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করেন এবং হাত মাটিতে ঘষেন। আবু আবদুর রহমান বলেন, এটি শারীকের হাদীসের তুলনায় অধিক সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ সম্যক অবগত।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : هل يجبُ ازالةُ الرَّائِحَةِ الكَرِيْهَةِ لِلنَّجَاسةِ؟ بيّن اقوالَ العُلماءِ بالدّلائل.

প্রশ্ন ঃ নাপাকীর দুর্গন্ধ দূর করা কি জরুরী? এ ব্যাপারে আলিমগণের বক্তব্য কি দলীল সহকারে বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ নাপাকীর দুর্গন্ধ দূর করা জরুরী কি না?

এ অনুচ্ছেদে ইস্তিঞ্জা শেষে মাটিতে হাত ঘষার কথা উল্লেখ রয়েছে। এর ফলে নাপাকের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। এ গন্ধ দূর করা জরুরী কি না? তাছাড়া এ গন্ধের তাৎপর্য কি? এ ব্যাপারে হযরত সাহারানপুরী (র) দুটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। একদল ইসলামী আইনবিদদের মতে এটা দূরীভূত করা জরুরী। অবশ্য দূর করা কঠিন হলে তা এর ব্যতিক্রম গণ্য হবে।

দ্বিতীয় দলের মত হলো, হাত অথবা দেহ থেকে মূল অপবিত্র দূরীভূত হলে হাত ও শরীর পাক হয়ে যায়। পবিত্রতা অর্জন দুর্গন্ধ দূরীভূত হওয়ার উপর মওকুফ নয়।

এ দুপক্ষের প্রত্যেকের রায়ের একটি কারণ রয়েছে। যারা বলেন, দুর্গন্ধ দূর করা জরুরী, তারা বলেন, এ দুর্গন্ধের কারণ হলো মূলত: নাপাকীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য গোপন অংশগুলো। অতএব, এগুলো দূর করা জরুরী। আরেক দল বলেন, এগুলো নাপাকীর অংশ নয় বরং নাপাকীর সাথে সংস্পর্শের প্রভাব। যেহেতু কিছুক্ষণ পর্যন্ত হাতে নাপাকী লেগেছিল, সেহেতু হাত তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এটা সংস্পর্শের আছর। মূল নাপাকী নয়। অতএব এটাকে দূর করা জরুরী নয়। (বিস্তারিত বজলুল মাজহুদে দ্রষ্টব্য)

سوال : أَوْضِحْ هٰذه العِبارةَ قوله فَدَلَكَ بِهَا الارضَ مُوضحًا

প্রশ্ন ঃ قوله فَدَلَكَ بِها الْاَرْضَ **এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করো ।**

উত্তর ঃ নবী (স) ইস্তিঞ্জা করার পর হাতকে মাটির সাথে ঘষতেন যাতে করে হাত থেকে দুর্গন্ধ শেষ হয়ে যায় এবং হাত উত্তমরূপে পাক পবিত্র হয়ে যায়। অন্যথায় মূল পবিত্রতা তো শুধুমাত্র ধৌত করার দ্বারাই অর্জিত হয়েগেছে। এখানে একটি প্রশ্ন আরোপিত হয়।

প্রশ্ন ঃ সকল উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, নবী (স) এর পেশাব-পায়খানা পবিত্র। কাজেই ইস্তিঞ্জার পর হুজুরের হাত দুর্গন্ধ হওয়াটা তো অসম্ভব। তাহলে নবী করীম (স) ইস্তিঞ্জার পর মাটিতে হাত ঘষতেন কেন ?–

উত্তর ঃ বজলুল মাজহুদে নিম্নরূপভাবে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে –

১. নবী করীম (স) একাজ করেছেন উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য অর্থাৎ যখন ইস্তিঞ্জা করার পর হাত দুর্গন্ধ হলে অথবা, হাতে নাজাসাতের আছর বাকী থাকলে তখন কিভাবে তা দূর করবে সেটাকেই নবী (স) আলোচ্য হাদীসে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ইস্তিঞ্জা করার পর হাতকে মাটির সাথে ঘষবে। অতঃপর হাতকে ধৌত করে নেবে। তাহলে হাত উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে এবং দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে। (বজলুল মাজহুদ)

২. বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে দেখেছেন যে, ইস্তিঞ্জার পর হাত ধৌত করলেও তাতে নাজাসাতের আছর বাকী থাকে এবং তা থেকে বিভিন্ন ধরনের জীবানু থাকে। ফলে সে বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হতে পারে। আর যদি কেউ ইস্তিঞ্জার পর তার হাতকে মাটিতে ঘষে ধৌত করে নেয় তাহলে তার থেকে নাপাকী দূর হয়ে যায় এবং রোগ ব্যাধি থেকে সে নিরাপদ থাকে। এ কারণে নবী (স) মাটিতে হাত ঘষতেন।

আলোচ্য হাদীসের রাবী সম্পর্কে আলোচনা

قوله عن ابى زرعة ঃ এ রাবীর নামের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কতক রিজাল শাস্ত্রবিদ বলেন, তার নাম ও কুনিয়াত এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাঁর নাম হলো আবু যুরআ এবং তার কুনিয়াতও এটা। তিনি হযরত আলী (রা) এর দর্শন লাভ করেছেন। কিন্তু হাদীসে তার থেকে শ্রবণের বিষয়টি প্রমাণিত নয়। অবশ্য তিনি তাঁর দাদা জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ, হযরত মুআবিয়া ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি সিকা রাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ ব্যক্তি হলেন–

ابو زرعة ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلى الكوفى ،

এ ব্যক্তি হলেন এ হাদীসের রাবী ইব্রাহীম ইবনে জারীরের ভাতিজা। কাজেই এ রেওয়ায়েতটি روايت اكابر عن اصاغر অন্তর্গত। অপর দিকে বয়স হিসেবে ভাতিজা চাচার থেকে বড় তথা আবু যুরআ ইব্রাহীম থেকে বড়। এদিকে লক্ষ্য করলে روايت الْاَكَابِر عَنِ الْاَصَاغِر বলা সহীহ হয়। দ্বিতীয় আলোচনা হলো حديث باب এর সাথে সম্পৃক্ততায় বিষয় সম্পর্কে যা شريك عن ابراهيم بنَ جرير এর সনদে বর্ণিত।

প্রশ্ন ঃ ইবনে কাত্তান এ হাদীসের ব্যাপারে আপত্তি করেছেন এবং এটাকে মা'লুল সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন এইহাদীসের মধ্যে দুটি ইল্লত রয়েছে।

১. শরীকের মুখস্ত শক্তি বিনষ্ট হয়ে যাওয়া এবং তাদলীস করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হওয়া।

২. দ্বিতীয় ইব্রাহীম ইবনে জারীর যিনি শরীক থেকে রেওয়ায়েত করেন তিনি একজন মাজহুল (অজ্ঞাত) ব্যক্তি। কাজেই এই হাদীসটি অগ্রহনযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হলো এর সমাধান কি?

উত্তর ঃ আল্লামা সুয়ূতী (র) বিশিষ্ট মুহাদ্দেসদের বক্তব্যের আলোকে উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন যে, তিনি হলেন–

১. হাফেজ ইবনে হিব্বান শরীকের উস্তায ইবরাহীম বিন জারীর কে সিকা সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই তাকে মাজহুল বলা বিশুদ্ধ নয়।

২. ইবনে আদীর বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর সিকা হওয়ার সমর্থন পাওয়া যায়। ইব্রাহীম ইবনে আদী বাস্তবিক পক্ষে দুর্বল রাবী নন, তার বর্ণিত হাদীসকে সহীহ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। অবশ্য এটা বলা যায় যে, তিনি তাঁর পিতা থেকে কিছু ই শ্রবণ করেননি।

৩. হাফেজ জাহাবীর বক্তব্যের দ্বারাও তার সিকা হওয়ার বিষয়টি বুঝে আসে।

তিনি বলেন, هو صَدُوق অর্থাৎ ইব্রাহীম ইবনে জারীর সত্যবাদী। তার হাদীসের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে انقطاع এর কারণে, ধীশক্তি কম থাকার কারণে নয়।

মোটকথা, যখন ইবনে হিব্বান ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাকে সিকা সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই ইবনে কাত্তানের তাকে مجهول الحال (অপরিচিত ব্যক্তি) বলা গ্রহণযোগ্য নয়। এখন থাকলো শরীকের বিষয়টি, যদিও ইবনে কাত্তান তাকে ধীশক্তি কম হওয়ার কথা বলেছেন, অর্থাৎ তার স্মরণ শক্তি কম এবং ইমাম তিরমিযী (র)ও তাকে বলেছেন شريك كثير الغلط অর্থাৎ শরীক অধিক পরিমাণ ভুল করে থাকেন। কিন্তু ইবনে মাঈন, আজালী, বাজালী প্রমূখ তাকে সিকা সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই তার বর্ণিত রেওয়ায়েতের ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ থাকে? আর হাদীসের সনদে উল্লেখিত শরীক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো شريك بن عبد الله النخعي ابوعبد الله قاضي كوفه (তথা তিনি কুফার কাযী ছিলেন।) তিনি সহীহ মুসলিম শরীফের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখিত শরীক দ্বারা شريك بن عبد الله ابو عبد الله المدني যিনি বুখারী ও মুসলিম উভয়ের রাবী ছিলেন তিনি উদ্দেশ্য নন।

ইমাম নাসায়ী (র) এর বর্ণিত হাদীসকে যয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তিনি শরীকের হাদীসের পর এবং আবান ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালীর রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর বলেন,

هٰذا اشبَهُ بِالصَّوابِ مِن حديثِ شَرِيكٍ واللّٰهُ سُبْحانَه وتعالىٰ اعلم

অর্থাৎ আবান কর্তৃক বর্ণিত হাদীস শরীকের হাদীসের তুলনায় অধিক সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ তাআলা সম্যক অবগত।

নাসায়ীর ব্যাখ্যাকার এ কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, নাসায়ী (র)-এর এ বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত জারীর (র)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস, আবু হুরায়রার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় উন্নত। এর কারণ হল, ইব্রাহীম তার পিতার থেকে শোনার বিষয়টি প্রমাণিত নয়। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি যে সকল হাদীস স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন সেগুলো মুরসাল।

মোটকথা, মুহাদ্দেসীনে কিরাম আবান সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করা সত্ত্বেও ইমাম নাসায়ী (র) আবানের রেওয়ায়েতকে শরীকের রেওয়ায়েতের উপর উল্লেখিত وجوه ترجيح এর ভিত্তিতে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এর জবাব আল্লামা মাওয়ারদী (র) প্রদান করতে গিয়ে বলেন, আমরা এটাকে মানি না যে, আবানের হাদীস শরীকের হাদীসের তুলনায় অধিক উন্নত। কেননা, আবান সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হিব্বান (র) বলেন, كان ممن فحش خطاءه وانفرد بالمناكير

অর্থাৎ তিনি অধিক ভুলকারী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে একজন এবং তিনি মুনফারিদ রাবীর অন্তর্ভুক্ত, পক্ষান্তরে শরীক হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে অধিকযোগ্য এবং অত্যন্ত ভালো হাফেজ ছিলেন। ইমাম মুসলিম (র) প্রমাণ স্বরূপ তার থেকে হাদীস তাখরীজ করেছেন। কিন্তু তিনি আবান থেকে কোন হাদীস আনেননি।

সরফশাস্ত্রবিদগণের একটি কিতাব আমার হাতে পৌছেছিল, তাতে লেখা ছিল–

قال الحاكمُ اِحْتَجَّ بِه مُسْلِمٌ وحديثُه هٰذا اَخْرَجَهُ حِبَّانٌ فِي صحيحِه فلا نُسَلِّم اَنَّ حديثَ ابانَ اَشْبَهُ بالصَّواب مِنه اى مِن حديث شَرِيكٍ

দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়টিও অসম্ভব নয় যে, হাদীসটি ইব্রাহীমের নিকট দুই সনদে পৌছেছে। ১. আবু যুরআর সনদে। ২. স্বীয় পিতা জারীরের সনদে। এর নযীর বায়হাকীসহ অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

بَابُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَاءِ

٥٢. اخبرَنا هنَّادُ بنُ السَّرِىِّ والحسينُ بنُ حُرَيثٍ عن ابى اُسامة عن الوليد بنِ كثيرٍ عن محمدِ بن جعفرَ قال سُئِل رسولُ اللّٰه ﷺ عنِ الماءِ وما ينوبُه مِن الدوابِّ والسِّباعِ فقال اذا كان الماءُ قُلَّتَيْنِ لم يَحْمِلِ الْخُبْثَ -

অনুচ্ছেদ ঃ পানির (পাক না পাক হওয়ার) ব্যাপারে পরিমাণ নির্ধারণ

অনুবাদ ঃ ৫২. হান্নাদ ইবনে সারী ও হুসায়ন ইবনে হুরায়ছ (র)........ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে পানির (পাক না পাক হওয়ার) পরিমাণ এবং যে পানিতে চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র জন্তু আসা-যাওয়া করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি (উত্তরে) বলেন, পানি যখন দুই 'কুল্লা' হবে তখন তা নাপাক হবে না।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : بَيِّن حلّ لُغاتِ الالفاظ الاٰتيةِ بُضاعةَ ،الحُيَّض ،الكِلاب ، النَّتن ، طهور -

প্রশ্ন ঃ এ শব্দগুলোর তাহকীক করো– طهور ـ النتن ـ الكِلاب ـ الحيض ـ بضاعة

উত্তর ঃ بضاعة ঃ بضاعة শব্দটিতে ب বর্ণে পেশ এবং যের উভয়টি শুদ্ধ। অবশ্য পেশ এর সাথে পড়াটা অধিক প্রসিদ্ধ। এটি একটি প্রসিদ্ধ কূপের নাম যা মদীনার বনু সাইদা মহল্লায় অবস্থিত। তা এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে, এ কূপের মালিকের নাম অথবা এ স্থানটির নাম ছিল বুযআ। এজন্য এটিকে এ নামে নামকরণ করা হয়।

حيض ঃ حيض শব্দটিতে ح এর নিচে যের, ى এর উপর যবর হবে। এটি حيضة এর বহুবচন, অর্থ হচ্ছে বস্ত্র খণ্ড যা মহিলারা মাসিকের সময় ব্যবহার করে।

كلاب ঃ كلب এর বহুবচন। كلاب অর্থ হচ্ছে হিংস্র প্রাণী, কুকুর।

نتن ঃ نتن এর নুন বর্ণে যবর এবং ت সাকিন। কেউ কেউ ت এর নিচে যের বলেছেন। এর অর্থ হচ্ছে দূর্গন্ধ। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে দূর্গন্ধযুক্ত দ্রব্যাদি।

طهور ঃ طهور শব্দটি فعول এর ওযনে ইসমে মুবালাগার সীগা। অর্থ হলো সর্বোচ্চ পবিত্রতা বা পবিত্রকারী।

سوال : ما مَعْنى القُلَّة وما هُو مِقدارها؟ بيِّن مُوضِحًا ـ

প্রশ্ন ঃ قلة এর অর্থ কি? এর পরিমাণ কি? আলোচনা কর।

উত্তর ঃ قلة এর অর্থ ঃ قلة শব্দটি একবচন, অভিধানে قلّة শব্দটির অনেক অর্থ পাওয়া যায়। যেমন–

১. বড় মটকা ২. কলস ৩. পাহাড়ের চূড়া বা শৃঙ্গ। ৪. মটকা ৫. উটের বাহন বা বোঝা ৬. মানুষের দেহের গঠন বা উচ্চতা। তবে অধিকাংশ আলেমেদের মতে হাদীসে শব্দটি মটকা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

قلة এর পরিমাণ ঃ মুহাদ্দেসীন কিরাম قلة এর পরিমাণ নির্ণয়ে একাধিক মত পোষণ করেন। যেমন–

১. হাফেজ আবুল হাসান বলেন, তার পরিমাণ হলো পাঁচ কলস।

২. শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) বলেন, এক কুল্লায় দুই কলস।

৩. কারো মতে ৪ কলস।

৪. কাযী আবু বকর বাকিল্লানী (র) এর মতে ৬৪ রতল।

৫. আল্লামা শামী (র) বলেন قلتين হলো দুই বালতি।

৬. কেউ কেউ বলেন, এক কুল্লায় ৩০০ রতল।

৭. আবু হানীফা (র) বলেন- القِلَّة بالكسر وهو المكان فالمُراد بالقلتين المكانين

৮. কেউ কেউ বলেন তৎকালে একটা মটকায় সাধারণত তিন মনের কিছু বেশী পানি ধরত। সে হিসাবে দুই মটকা পানির পরিমান দাঁড়ায় আনুমানিক সোয়া ছয়মন। (উমদাতুলকারী। ফাতহুলবারী, ফাতহুলমুলহিম)

سوال : ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ما يَنُوبه من الدوابّ والسّباع؟

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) এর বাণীর মর্মার্থ কি?

উত্তর ঃ হাদীসের অত্র অংশে রাসূল (স) কে জনৈক সাহাবী পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, যে পানি দিয়ে চতুষ্পদ জন্তু, হিংস্র জানোয়ার চলা-ফেরা করে তার হুকুম কি হবে? এর ব্যাখ্যা হলো নিম্নরূপ-

এরূপ পানি হলো সাধারণত হ্রদ বা কূপের পানি যা দিয়ে হিংস্র প্রাণী চলাফেরা করে। এ সব প্রাণীর মধ্যে রয়েছে বাঘ, সিংহ, মহিষ প্রভৃতি প্রাণী। এ সব প্রাণী পানিতে গোসল বা সাঁতার কাটতে পছন্দ করে। এমনকি ছোট খাল বা নদী অতিক্রম করতে পারে সহজে। অন্যদিকে সাধারণ চতুষ্পদ জন্তু যেমন গরু, ছাগল, মহিষ, বিড়ালসহ অন্যান্য প্রাণী যেগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয়। এরা পুকুর নদী, হ্রদ বা কুয়ার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে। এসব পানি পবিত্রকরণের পদ্ধতি কি রকম হবে তা নিয়েই প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। কেননা, এসব প্রাণী অনেক সময় পানিতে পেশাব-পায়খানা করে থাকে। এদের যাতায়াতকৃত পানি পবিত্র করার জন্যে রাসূল (স) মূলনীতি বলে দিয়েছেন তা হলো পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হলে পবিত্র থাকবে এবং তা দিয়ে অযু, গোসল করা যাবে। আর দুই কুল্লার কম হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। তা দিয়ে উযূ গোসল জায়েয হবে না।

سوال : أوضح قوله صلّى الله عليه وسلم لم يَحْمِلِ الخُبث "إيضاحًا تامًّا"

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) এর বাণী لم يَحْمِلِ الخُبث এর ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ রাসূল (সা.) এর বাণী- لم يحمل النبث অপবিত্রতা বহন করে না এর ব্যাখ্যা ঃ

خبث শব্দের অর্থ অপবিত্রতা, অতএব لم يَحْمِلِ الخبث এর সমন্বিত অর্থ হচ্ছে। অপবিত্রতাকে বহন করবে না। রাসূল (স) এর এ বক্তব্য দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যদি পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হয়। তখন তাতে নাজাসাত পড়লে তা নাপাক হবে না। কেননা, দুই কুল্লা পানি হলে তা ماء كثير হিসেবে গণ্য হবে। তাই তা দ্বারা গোসল ও উযূ করা যাবে। পানির মোট তিনটি গুণ রয়েছে, রং, গন্ধ ও স্বাদ। যদি নাজাসাত পড়ার কারণে এ তিনটির কোন একটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। চাই পানি কম হোক বা বেশী হোক।

এ দিকে ইঙ্গিত করে বজলুল মাজহুদ গ্রন্থকার বলেন-

قال الاجماعُ على انّ الماءَ إذا تَغَيّر احدُ أوصافَ الثّلاثةِ بالنّجاسةِ يتنجّسُ قليلاً كان او كثيرًا جاريًا كان او غيرَ جاري.

سوال : ورد في الحديث "الماءُ طهور لايُنَجِّسُهُ شئٌ" بَيّن مُرادَه ومحلّ وروده.

প্রশ্ন ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে "পানি পবিত্র, কোন বস্তু তাকে অপবিত্র করতে পারে না" এটা বলার উদ্দেশ্য এবং প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ রাসূলের বাণী ان الماء طهور لاينجسه شئ এর ব্যাখ্যা ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

১. আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি বলেন- ان الماءَ طَهُور لا يُنَجِّسُه شئ এর অর্থ হলো-

إنّ خَلْقَ الماءِ طهورٌ اى مِن شانِ الماءِ ان يكونَ طاهرًا بِنَفْسِه ومُطَهِّرًا لِغَيْرِه لانّ كل فردٍ مِن الافْراد فهو طاهِر . وهٰكذا فى قوله تعالى اِنّ الإنسانَ لَظلوم كفور . يَعْنِى إنّ الظلم والكفر مِن شانِ الانسانِ لكن لَيْسَ كُلّ فردٍ ومِن النّاس ظالمٌ وكافرٌ

বস্তুতঃ পানির ধর্ম পবিত্র হলেও সর্বক্ষেত্রে পবিত্র নাও থাকতে পারে।

২. অথবা, রাসূল (স) এর বাণী–إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ মুখ নিসৃত বাণীটি بئر بضاعة এর জন্যে খাস ছিল। যেহেতু জাহেলী যুগে এ بئر بضاعة তে অনেক ময়লা আর্জনা ফেলা হত। ফলে সাহাবায়ে কেরামের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, পূর্বে নাজাসাত ফেলার কারণে বর্তমানেও তা অপবিত্র কি না? এ সন্দেহ অপনোদনের জন্যে রাসূল (স) দৃঢ়তার সাথে তাদেরকে বললেন, إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَيُنَجِّسُهُ شَيْءٌ রাসূল (স) এর উক্তিটি শুধুমাত্র بئر بضاعة এর জন্যে প্রযোজ্য। এর অর্থ এই নয় যে, পানিতে নাপাক পড়লেও তা পবিত্র থাকবে। কাজেই উভয় হাদীসে কোন বৈপরীত্য নেই।

৩. ان الماء طهور لاينجسه شئ এ বাক্যটি আবু দাউদ ও নাসায়ীতে রয়েছে আর ইবনে মাজাহ শরীফে আরো বর্ধিত করে বলা হয়েছে–إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَيُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مَالَمْ يَتَغَيَّرْ احدٌ مِّنْ اَوْصَافِهِ الثَّلاَثَةِ

এখানে مالم يتغير শর্ত দ্বারা পানিতে নাপাক পড়লে তদ্বারা পানির দুই গুণের কোন একটি গুণ বিকৃত হলে পানি নাপাক হওয়া বুঝায়; স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। সুতরাং হাদীসের মাঝে কোন বৈপরীত্ব নেই। উভয় হাদীসই স্ব-স্ব স্থানে যথার্থ।

কারণ ঃ "বুযাআ" কুপটির পানি ছিল প্রবাহমান। আর প্রবাহমান কূপের পানি ماء كثير এর হুকুম রাখে। তা কোন অপবিত্র বস্তু পড়লে অপবিত্র হয় না।

এ প্রসঙ্গে আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন মূলতঃ বুযাআ কূপে কেউ কোন নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করতো না। অবশ্য বৃষ্টির পানির স্রোতে অপবিত্র বয়ে নিয়ে এসে কূপে ফেলতো। তাই পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। আর রাসূল (স) সন্দেহ নিরসন কল্পে বলেছিলেন– ان الماء طهور لاينجسه شئ

سوال : ما اراد النبيّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ فى الْمَاءِ الدَّائم؟ هل يَتَنَجَّسُ الماءُ اذا بَالَ احدٌ فِى الغَدِيرِ والبَحْرِ؟

প্রশ্ন ঃ ماء الدائم বলে রাসূল (স) কি বুঝিয়েছেন? পুকুরে বা নদীতে যদি কেউ পেশাব করে তবে কি সে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ الماء الدائم এর সংজ্ঞা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) ماء الدائم বা আবদ্ধ পানি বলতে সে পানিকে বুঝিয়েছেন, যে পানি নির্দিষ্ট স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত এবং কোন প্রবাহিত পানির সাথে সংযুক্ত নয়। এ ধরণের পানি বলতে সাধারণ কূপ, হাউজ ও ছোট পুকুরকে বুঝায়। অথবা, আবদ্ধ পানি বলতে এমন পানিকে বুঝায় যে পানির এক পাশ থেকে নাড়া দিলে অন্য পাশের পানি নড়ে ওঠে।

ماء غدير এর বিধান ঃ غدير বলতে সাধারণত বড় পুকুরকে বুঝায় যার এক প্রান্তের পানি নাড়া দিলে অন্য প্রান্তের পানি নড়ে না। এ ধরণের পানিতে কেউ পেশাব করলে তা দ্বারা পানি অপবিত্র হবে না। এ ধরণের পানি দ্বারা উযূ গোসল জায়েয হবে।

ماء البحر এর বিধান ঃ নদী বা সমুদ্রের পানি প্রবাহমান। এতে পেশাব-পায়খানা মৃতদেহ যে কোন ধরনের নাপাক পড়ুক তা অপবিত্র হবে না। তা দ্বারা উযূ গোসল সব বৈধ হবে।

سوال : ما اراد ابو عبدِ الرحمٰن بِقوله كانَ يعقوبُ لايُحَدِّثُ بهٰذا الحديثِ الا بِدِينارٍ؟

প্রশ্ন ঃ রাবী আবু আব্দুর রহমান তার বক্তব্য كان يعقوبُ لايُحدِّث بهٰذا الحديثِ الا بدينارٍ؟ দ্বারা কি বুঝিয়েছেন?

উত্তর ঃ রাবীর উপরোক্ত ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ প্রশ্নোল্লেখিত হাদীসটির মূল রাবী বা বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবু হুরায়রা (রা)। অন্য দিকে ইমাম নাসায়ী (র) তার কিতাবে হাদীসটি যার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন তিনি হলেন ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম (র)। আর ইমাম নাসায়ী (র) এর ছাত্র বা যিনি নাসায়ী শরীফ লিপিবদ্ধ করার কাজে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি হলেন আবু আব্দুর রহমান। আবু আব্দুর রহমান (র) বলেন, ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম (র) হাদীসটি দীনার (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি দীনার (র) এর নাম উল্লেখ করেননি। তিনি সরাসরি নিজের নামেই ইমাম নাসায়ী (র) এর নিকট বর্ণনা করেছেন।

سوال : ابن بئر بضاعة وما وجه تسميتها؟ اكتب مع حل كلمة بضاعة

প্রশ্ন ঃ بئر بضاعة **কোথায় অবস্থিত এবং সেটাকে এনামে নামকরনের কারণ কি?** بضاعة **শব্দের তাহকীক লেখ।**

উত্তর ঃ بضاعة শব্দটির ب বর্ণে পেশ বা যের সহকারে পড়া যায়। অবশ্য পেশটি প্রসিদ্ধ এটি বনি সাইদার মহল্লার একটি প্রসিদ্ধ কূপ যা খাযরাজের একটি শাখা। কূপের মালিকের নাম ছিল بضاعة মালিকের নামেই এটার নাম রাখা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, بضاعة স্থানের নাম, স্থানের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে এ নাম রাখা হয়েছে।

سوال : متى ينجس الماء اذا وقعت فيه النجاسة بين مع اختلاف الائمة مدللا.

প্রশ্ন ঃ পানিতে নাপাক পড়লে তা কখন নাপাক হবে? দলিল সহকারে ইমামদের মতানৈক্য বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ পানিতে নাপাক পড়লে তার বিধান ঃ পানিতে নাপাক পড়লে পানি নাপাক হবে কি হবে না এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে নিম্নে তিনটি মাযহাব উল্লেখ করা হল—

প্রথম মাযহাব : আহলে জাওয়াহের, হাসান বসরী, দাউদে জাহেরী ও হযরত আয়েশা (রা) এর। তারা বলেন, পানি চাই কম হোক বা বেশী যদি তাতে নাপাক পতিত হয় তবে তা ততক্ষণ পর্যন্ত অপবিত্র হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বভাব অর্থাৎ তারল্য নষ্ট না হয়ে যায়। চাই তার তিনোটি গুণ পরিবর্তিত হোক না কেন?

দ্বিতীয় মাযহাব ঃ ইমাম মালিক (র) এর পছন্দনীয় মাযহাব হল, যতক্ষণ পর্যন্ত পানির তিনটি গুণের একটি পরিবর্তিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অপবিত্র পড়লে তা অপবিত্র হয় না। চাই পানি কম হোক বা বেশি।

তৃতীয় মাযহাব ঃ এ মাযহাবের অনুসারী হলেন, ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র)। তাদের বক্তব্য হল, যদি পানি কম হয় তবে অপবিত্র বস্তু পতিত হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। যদিও তার কোন একটি গুণও পরিবর্তিত না হয়। আর যদি বেশী পানি হয় তবে অপবিত্র হবে না। যতক্ষণ না তার অধিকাংশ গুণ পরিবর্তিত হয়। মোটকথা, হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে পানি পাক ও নাপাক হওয়া পানি কম ও বেশী হওয়ার উপর নির্ভর করে। (বজলুল মাজহুদ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৪৩)

আহলে জাওয়াহের এর দলীল ঃ তারা আল্লাহ তাআলার বাণী দ্বারা দলীল পেশ করেন। আর তা হলো وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আসমান থেকে ماء طهور অবতীর্ণ করেছি। আর مَاءً طَهُوْرًا বলা হয় এমন পানিকে যা বারংবার পবিত্র করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং বুঝা গেলো নাপাক পতিত হলেও পানি নাপাক হয় না।

দ্বিতীয় দলীল ঃ রাসূলের হাদীস—

عن ابى سعيد الخدرى انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور ولا ينجسه شيئ (ابوداؤد ج اص ٩، ترمذى ج اص ٢١، نسائى ج ص ٦٢)

আবু সাইদ আল খুদরী হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (স) কে জিজ্ঞেস করা হলে যে, আমরা কি বুযাআ কূপের পানি দ্বারা উযূ করতে পারি? আর কূপটি এমন ছিল যেখানে স্ত্রীলোকদের হায়েযের নেকড়া, কুকুরের গোশত এবং দূর্গন্ধযুক্ত ময়লা আজর্বনা নিক্ষেপ করা হয়। জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, পানি পবিত্র। কোন কিছু তাকে অপবিত্র করতে পারে না। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, একটি ছোট কূপে এত কিছু নাপাক জিনিস নিক্ষেপের পরেও নবী করীম সা. শর্তহীনভাবে পানিকে পাক বলেছেন। অতএব, পানির পরিমান কম হোক অথবা বেশি হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

ইমাম মালেক (র) এর দলীল ঃ ইমাম মালেক (র) রাসূল (স) এর হাদীসের মাধ্যমে দলীল পেশ করেন। আবু সাইদ খুদরী (রা) বলেন, হুজুর (স) বুযাআ নামক কূপ থেকে পানি নিয়ে উযূ করেছেন। জনৈক সাহাবী বললেন,

হে আল্লাহর রাসূল! উক্ত কূপে নাপাক, হারাম বস্তু, হায়েযের কাপড় ইত্যাদি ফেলা হয়। তখন হুজুর (স) বলেছেন– (এক বর্ণনায় আছে– إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مَالَمْ يَتَغَيَّرْ اَحَدُ اَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ (ابن ماجة)

পানির তিনটি গুণের কোন একটি পরিবর্তণ হওয়া ব্যতীত তাতে নাপাক পড়লে পানি নাপাক হয় না। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, পানি অপবিত্র হওয়ার জন্য তিনটি গুণের কোন একটি পরিবর্তন হওয়া শর্ত। সুতরাং পানিতে শুধু নাপাক পড়ার দ্বারা পানি নাপাক হয় না।

জুমহুর এর মাযহাবের দলীল

عن ابي هريرة عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنه (ابوداؤد ج اص ٣٧٠، مسلم ج اص ١٣٨، ترمذي ج اص ٢١، نسائي ج اص ٢١)

অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (স) হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সা. বলেন, তোমাদের কেউ যেন এমন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে যার দ্বারা সে গোসল করবে। এ হাদীস দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পানিতে নাপাক পতিত হওয়ার দ্বারা পানি অপবিত্র হয়ে যায়। কারণ এটা যদি না হতো তাহলে রাসূল (স) এর পানিতে পেশাব ও জানাবাতের গোসল করতে নিষেধ করার কি অর্থ?

দ্বিতীয় দলীল ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস–

قال النبيّ صلى الله عليه وسلم طُهُوْرُ اِنَاءِ احدكم اِذا وَلَغَ فِيه الكلبُ اَنْ يَغْسِلَ سبعَ مَرَّاتٍ اُوْلٰهُنَّ بِالتُّرَابِ (ابوداود ج اص ١٠، بخاری اص ٢٩، مسلم ج اص ١٣٧، ترمذی ج اص ٢٧، نسائی ج اص ٢٢)

অর্থাৎ নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, কুকুর যদি তোমাদের কারো পাত্রে মুখ দেয় তবে তা পাক করার নিয়ম হল, তা সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করতে হবে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পানিতে নাপাক পতিত হলে পানি নাপাক হয়ে যায়, চাই তার গুণত্রয় পরিবর্তন হোক বা না হোক।

তৃতীয় দলীল ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيرةَ عَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم انّه قالَ اِذا اسْتَيْقَظَ اَحدُكم مِن اللّيلِ فلا يُدْخِل يدَه فِى الاِنَاءِ حتّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ اوثلثا فانّه لايَدرِى اينَ بَاتَتْ يَدُه (ترمذی ج اص ١٣، بخاری ج ١ ص ٢٨، مسلم ج اص ١٣٦، نسائی ج اص ٤٠)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, তখন যেন সে দু'হাত দু'বার অথবা তিনবার না ধুয়ে পানির পাত্রে প্রবিষ্ট না করে। কারণ রাত্রে তার হাত কোথায় ছিল, সে তা জানে না। যখন রাসূল (স) সম্ভাবনাময় নাপাকীর কারণে পানিতে হাত ঢুকাতে নিষেধ করেছেন। তাহলে একথা সহজেই অনুমেয় যে, প্রকৃত নাপাকী দ্বারা অবশ্যই পানি নাপাক হবে।

চতুর্থ দলীল ঃ আতা (রা) এর বর্ণনা। তিনি বলেন, একদা একজন হাবশী জম জম কূপে পড়ে মরে যায় তখন ইবনে জুবায়েরকে আদেশ করা হলো তিনি যেন পানি উঠিয়ে ফেলেন। তিনি তাই করলেন। অথচ হাবশী কূপে পড়ায় পানির গুণ পরিবর্তন হয়নি। তা সত্ত্বেও তাকে পানি উঠিয়ে ফেলার হুকুম দেয়া হল।

আহলে জাওয়াহের এর দলীলের জবাব

জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন, এ কথার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ হওয়ায় তাতে নাপাকী পড়ার পর তা পবিত্র থাকা জরুরী নয়। কেননা, আকাশের পানি যদি নাপাক স্থানে বর্ষিত হয়। তবে তা অবশ্যই নাপাক হয়ে যাবে।

হযরত গাঙ্গুহী (র) বলেন, যদি এ মাযহাবটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হত, তবে এটি হত সবচেয়ে শক্তিশালী মাযহাব। কারণ হযরত আয়েশা (রা) পানি সংক্রান্ত মাসায়েল বেশী জানতেন এবং এ ব্যাপারে রাসূল (স) এর নিকট বেশী বেশী শরণাপন্ন হতেন। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো এ মাযহাবটি হযরত আয়েশা (রা) হতে রেওয়ায়েতগতভাবে প্রমাণিত নয়।

ইমাম মালেক (র) এর দলীলের জবাব

১. এ হাদীসের ব্যাপকতার উপর স্বয়ং ইমাম মালেক (র)ও আমল করেন না। কারণ এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যদি পানির গুণাবলী পরিবর্তিত হয়ে যায় তবুও তা পবিত্র থাকবে নাপাক হবে না। অথচ ইমাম মালিক (র) এর প্রবক্তা নন। বরং তার নিকট পানির পবিত্রতার জন্য তিনটি গুণই অপরিবর্তিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

২. বুযআ কূপের বর্ণনায় ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন– ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ (ابوداود ج اص ٩)

অর্থাৎ অতঃপর আমি কূপটি মেপে দেখি যে, এর প্রস্থ ছয় হাত পরিমাণ। উক্ত হাদীসে আরো বর্ণিত আছে যে, তাতে পানি সর্ব নিম্ন হাঁটু পর্যন্ত আর সর্বোচ্চ নাভি পর্যন্ত থাকত। অতঃপর এটা কিভাবে সম্ভব যে, তাতে হায়েযের কাপড় এবং মৃত কুকুরের গোশত নিক্ষেপ করা হবে আর পানির তিনোটি গুণ অপরিবর্তিত থাকবে? অতএব, যদি হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করতে হয় তাহলে পানির গুণ পরিবর্তিত হওয়া সত্বেও পবিত্র বলা উচিৎ। অথচ স্বয়ং ইমাম মালিক (র) এর প্রবক্ত নন।

৩. আবু নছর বাগদাদী (র) বলেন, বুযাআ কূপ থেকে প্রচুর পরিমাণ পানি উঠানো হত। ফলে সকল নাপাকী তা থেকে দূর হয়ে যেত। সাহাবীগণের সেখান থেকে নাপাকী উত্তোলনের পরও সংশয় হলে নবী করীম (স) উক্তিটি করেছিলেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, পানিতে নাপাক পড়লে তা নাপাক হবে না। (তানযীমুল আশতাত ১৭৭/১)

৪. ইমাম ত্বহাবী (র) বলেন, বুযাআ কূপের পানি ছিল প্রবাহমান। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়েতে এসেছে যে, এর পানি দ্বারা বাগানে সেচ দেয়া হত। তালখীসুল হাবীর প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৪)

৫. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন, الماء শব্দটিতে ব্যবহৃত الف لام টি عهد خارجى বা সুনির্দিষ্ট বস্তু বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা বিশেষভাবে উদ্দেশ্য বুযাআ কূপের পানি। আর لاينجسه شيئ এর অর্থ হলো তোমাদের সন্দেহ সংশয় কোন কিছু এটাকে নাপাক করে না। কেননা, জাহেলী যুগে এতে বিভিন্ন রকমের নাপাক ময়লা ফেললেও ইসলামের পর এই ধারা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এর পরও সন্দেহ হচ্ছিল যে, এটা আসলে পাক কি না? ফলে নবী করীম (স) এ উক্তিটি করেছিলেন।

৬. কেউ কেউ বলেন, হাদীসটির সনদে ইযতিরাব (গরমিল) রয়েছে। তার পরিমাণ কতটুকু তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাতানৈক্য রয়েছে।

৭. ان الماء لاينجس بوقوع النجاسة হাদীসটি ইমাম মালিকের স্বপক্ষে প্রমাণ হতে পারে না । কেননা, সেখানে বলা হয়েছে কোন অপবিত্র বস্তু পানিকে নাপাক করে না। পানি কম হোক বা বেশী হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত পানির কোন গুণ নষ্ট না হয়। আর যখন কোন গুণ পরিবর্তন হবে তখন নাপাক হয়ে যাবে। এ হাদীসে وصف تغير এর শর্ত নেই। যদি বলেন আমরা উক্ত কয়েদটি আবি উমামা ও সাওবান এর রেওয়ায়েত থেকে গ্রহণ করেছি। বর্ণনাটি এরূপ– إِنَّ الْمَاءَ هُوَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ

আমরা বলব উক্ত বর্ণনায় রাশেদ বিন সাঈদ নামক রাবী রয়েছেন। তাকে শাফেয়ী ও দারা কুতনী (র) দূর্বল বলেছেন, সুতরাং সেটা দ্বারা দলিল পেশ করা যায় না।

৮. সাহাবাগণ যে নবী (স)-কে প্রশ্নটি করেছিলেন মূলতঃ এটিই ইমাম মালেক (র) এর জন্য উত্তরস্বরূপ। কেননা, হুজুর (স) কে তারা প্রশ্ন করেছিলেন, কূপ থেকে পানি উত্তোলন এর পর কূপের কাদা-মাটি আর দেয়ালের আদ্রতা দ্বারা নতুন পানি নাপাক হবে কি না? এর উত্তরে রাসূল (স) বলেছেন তা দ্বারা পানি নাপাক হবে না। যেমন– রাসূল (স) বলেছেন المسلم لاينجس। এর দ্বারা হুজুরের উদ্দেশ্য এই নয় যে, মুসলমানদের শরীর নাপাক হয় না। বরং রাসূল সা. এর উদ্দেশ্য হল। গোসল করার পর নাপাক থাকে না। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, স্বল্প পানিতে নাপাক পড়ার দ্বারা নাপাক হয়ে যাবে। যদিও তার গুণাগুণ নষ্ট না হয়।

পানির পরিমাণের ব্যাপারে ইমামদের মতামত

উল্লেখ্য যে, স্বল্প ও বেশী পানির পরিমাণের ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র) এর মতে পানি যদি দু'কুল্লা বা এর চেয়ে বেশী হয় তাহলে তাকে বেশী পানি বলা হবে। আর এর চেয়ে কম হলে একে কম পানি বলা হবে।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র) এর দলীল

عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بن عُمَرَ عَن ابيه قالَ سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَاءِ ومَا يَنُوبُهُ مِن الدوابِّ والسِّباعِ فقال اذا كان المَاءُ قلّتَيْنِ لم يَحْمِلِ الخَبَثَ.

অর্থাৎ উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা রাসূল (স) কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে পানিতে চতুষ্পদ ও হিংস্র প্রাণী পানি পান করার জন্য বার বার আগমন করে এবং তা যথেচ্ছা ব্যবহার করে। সে পানির হুকুম কি? তিনি বলেন, যখন সে পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হয় তখন (নাপাক পড়ার দ্বারা) তা নাপাক হয় না।

২. কম পানি ও বেশী পানির ব্যাপারে হানাফী আলিমগণের অভিমত

ক. ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে কম ও বেশী পানির সুনির্দিষ্ট কোন পরিমান নেই। তাঁর মতে এ বিষয়টি অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। তিনি যদি পানি দেখে বলেন এটা কম, তাহলে তা কম এবং বেশী বললে বেশী পানি হিসেবে মেনে নিতে হবে।

খ. ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, যে পানিতে নাপাকীর ছাপ অন্য দিকে না পৌঁছে তাই বেশী পানি।

গ. ইমাম কুদুরী (র) এর মতে, পানির এক পার্শ্ব নড়া দিলে যদি অন্য পার্শ্ব না নড়ে তাহলে তা বেশী পানি।

ঘ. আবার কেউ কেউ বলেন, পানিতে রং দিলে তা যদি সমস্ত পানিতে বিস্তার লাভ করে তাহলে তা কম পানি হবে। আর যদি বিস্তার লাভ না করে তবে তা বেশী পানি হবে।

ঙ. পরবর্তীতে কোন কোন ফুকাহায়ে কিরাম মানুষের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করে আবু সুলায়মান (র) কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব গ্রহণ করে বলেন, যে জলাশয়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ (১০×১০) দশ হাত দশ হাত তথা ১০০ বর্গ হাত হলে এটাই অধিক পানি। (লুমআতুত তানকীহ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৩৮)

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল

১. শাবীর বর্ণনা পাখিও বিড়াল এ জাতীয় প্রাণী এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, যখন এগুলো কূপে পতিত হয় তখন কূপের পানির হুকুম কি? উত্তরে তিনি বলেন, কূপ থেকে ৪০ বালতি পানি উঠিয়ে ফেল।

দ্বিতীয় দলীল ঃ আলী (রা) এর বর্ণনা। তিনি বলেন, কূপে ইঁদুর পড়ে মরে গেলে কূপের পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে। তদ্রূপ সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে যা দ্বারা বুঝা যায় নাপাকী পড়ার দ্বারা তাঁরা কূপকে নাপাক হিসেবে গণ্য করতেন। তারা কূপের পানির পরিমাণের দিকে লক্ষ্য করেননি যে, পানি কুল্লাতাইন পরিমাণ কি না। বরং তারা দৃষ্টি দিয়েছেন পানির প্রবাহের দিকে।

তৃতীয় দলীল ঃ ١. اِذا اسْتَيقَظَ اَحَدُكُم مِن مَنامِه فلا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِى الاِناءِ حَتّى يَغسِلَها ثلاثًا

তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠলে হাত ধৌত করা ব্যতীত যেন সে পাত্রে হাত না ঢুকায়।

٢. لايَبُولَنَّ احدُكُم فِى المَاءِ الدّائِمِ ولا يَغْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنَ الجَنابَةِ.

তথা তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে এবং তাতে জানাবাতের গোসল না করে। উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহে পানির তিনটি গুণের মধ্যে কোন একটি পরিবর্তন হওয়ার শর্ত উল্লেখ নেই কিংবা দুই কুল্লার শর্তারোপও করা হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীলের জবাব

১. হিদায়া গ্রন্থকার এর জবাবে বলেন, হাদীসে বর্ণিত لم يَحْمِلِ الخَبَثَ এর অর্থ শাফেয়ীগণ যা গ্রহণ করেছেন তা ঠিক নয়। বরং এর অর্থ হলো দুই কুল্লা পানি নাপাকী ধারণ করতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ অপবিত্র হয়ে যায়।

২. এ হাদীসটি দুর্বল। কেননা, এ হাদীসের সনদ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের উপর নির্ভর। আর তিনি ছিলেন দুর্বল রাবী। সুতরাং এটা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. হাদীসটির সনদ, মতন, অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যথেষ্ট গরমিল ও অসঙ্গতি রয়েছে।

সনদের গরমিল ঃ কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে عن الزهري جعفر عن سالم عن ابن عمر কোন রেওয়ায়েতে عن محمد بن جعفر بن الزبير ইত্যাদি। তাছাড়া আবু দাউদ (র) এর মতে হাদীসটি মাওকূফ এবং তিরমিযী (র) এর মতে হাদীসটি মারফু।

মতনের গরমিল ঃ এক রেওয়ায়েতে এসেছে اذا كان الماء قلتين আবার কোনটিতে قلتين او ثلاثا আবার কোন সূত্রে اربعين قلة বর্ণিত হয়েছে।

অর্থের গরমিল ঃ কামূস গ্রন্থকারের মতে কুল্লার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন পাহাড়ের চূড়া, মানুষের কাঠামো, মটকা ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য বা বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে গরমিল ঃ আল্লামা ইবনে নুজাইম (র) বলেন, যদি কুল্লার অর্থ মটকা মেনে নেয়া হয় যা ইমাম শাফেয়ী (র) গণ্য করেছেন। তবুও প্রশ্ন জাগে যে, মটকা কত বড় হবে? যেহেতু হাদীসে এটি নির্দিষ্ট করা হয়নি।

অনেকে অবশ্য এসব গরমিলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানেরও প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তথাপি হাদীসে ব্যবহৃত কুল্লার সঠিক ও সুনির্দিষ্ট পরিমণ কি? তা অভিধানে কোন বর্ণনা বা অন্য কোন ভাবেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কাজেই এমন একটি অস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দের হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটা ইজমারও পরিপন্থী। (লুমআতুত তানকীহ দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৩৭)

৪. ইমাম ইবনুল কায়্যেম বলেন, ইবনে তাইমিয়া উক্ত হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৫. ইবনে হুমামের মতে قلة এর হাদীসটি দুর্বল। তাই এর উপর আমল করা যাবে না।

সনদের ইযতিরাব কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেন– হাদীসের সনদের মধ্যে অলিদ বিন কাছির, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও হাম্মাদ রয়েছে।

অলীদের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন কথা বলেছেন। যেমন অলীদের শায়খ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, অলীদের শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে জাফর। আবার কেউ বলেন তার শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবাদ অনুরূপভাবে তার শায়খের শায়খ সম্পর্কেও আলিমগণ মতবিরোধ করেন। কেউ বলেন, তার শায়খের শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ। আবার কেউ বলেন উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের ব্যাপারে মালেক (র) বলেন, সে দাজ্জালের একজন। সুতরাং এর দ্বারাও ইযতিরাব প্রমাণিত হয়ে যায়।

سوال : ما هو الاختلاف بين العلماء في حد الماء الكثير والماء القليل؟ بين المسئلة بادلتهم.

প্রশ্ন ঃ অল্প পানি ও অধিক পানির পরিমাণ নির্ণয়ে আলেমদের মধ্যে কি মতভেদ রয়েছে দলীলসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ কম ও বেশী পানির পরিমাণ নির্ণয়ে আলেমদের মতামত

স্বল্প পানি ও বেশী পানি নির্ণয়ে ফকীহগণের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র) এর মতে, পানি যদি দুই কুল্লা থেকে কম হয়। তাহলে তা ماء قليل, আর দুই কুল্লা এর চেয়ে বেশী হলে তা ماء كثير হবে। তাদের দলিল হচ্ছে–

عن ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.

২. ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে এক প্রান্তে পানি নড়াচড়া দিলে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নড়াচড়া করলে ماء قليل হবে নতুবা ماء كثير হবে। কুদূরীগ্রন্থকার এ মত গ্রহণ করে বলেন- مالم يتحرك بتحريك الطرف الآخر

৩. ইমাম মুহাম্মাদ (র) ইবনে সালাম বলেন, পানির এক প্রান্তে গোসল করলে অপর প্রান্তের পানি ঘোলাটে হলে ماء قليل আর ঘোলাটে না হলে ماء كثير

৪. ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন দৈর্ঘ্য ৮ হাত এবং প্রস্থ ৮ হাত হলে বেশী পানি বলা যাবে, এর কম হলে ماء قليل বলা হবে।

৫. আবু সুলায়মান জুরজানী (র) বলেন, ১০ হাত দৈর্ঘ্য এবং ১০ হাত প্রস্থ হলে ماء كثير অন্যথায় ماء قليل

৬. ইমাম আবু হাদীস বলেন يحد بالصبغ তথা রঙ্গের মাধ্যমে বেশী ও কম পানি নির্ণয় করবে। অর্থাৎ এক প্রান্তে রং ছাড়লে অন্য প্রান্তে তা ছড়িয়ে পড়লে ماء قليل হবে অন্যথায় ماء كثير হবে।

৭. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, مَا وُقِّتَ فِيهِ شَيْئًا بَلْ هو مُفَوَّضٌ الى رَأْيِ الْمُبْتَلٰى بِه অর্থাৎ আমি এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে বলবো না, বরং এটা مبتلى به তথা যে এ ধরণের অবস্থায় পড়েছে তার রায়ের উপর নির্ভরশীল। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত।

ইমাম কারখী বলেন, পর্যালোচনার পর দেখা গেল, ইমাম আবু হানীফা (র) এর রায়টি অধিক গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ বিবেকবান ব্যক্তি যে পরিমাণ পানিকে ماء قليل তথা স্বল্প পানি, আর যে পরিমান পানিকে ماء كثير বলে মনে করেন তাই অধিক পানি হিসেবে গণ্য হবে।

سوال : لِمَ لَمْ يعمل الاحنافُ بحديث قُلَّتَيْنِ وبما تَمَسَّكُوا على مَسْلَكِهِم؟

প্রশ্ন ঃ হানাফীগণ قلتين এর হাদীসের উপর আমল করেন না কেন? (বরং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রায়ের উপর ছেড়ে দিয়েছেন কেন?) তারা কিসের মাধ্যমে স্বীয় মাযহাবের উপর প্রমাণ পেশ করেন?

উত্তর ঃ হানাফীদের কুল্লাতাইনের হাদীসের উপর আমল না করার কারণ

ইমাম আবু হানীফা (র) ماء قليل এবং ماء كثير নির্ণয়ে اذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لم يَحْمِلِ الخَبَثَ এ হাদীসকে গ্রহণ করেননি বরং তিনি বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রায়ের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কুল্লাতাইন এর হাদীস গ্রহণ না করার পেছনে নিম্নোক্ত বিভিন্ন কারণ রয়েছে–

১. এ হাদীসের সনদে ইযতিরাব বা গরমিল রয়েছে।

২. এ হাদীসের মতনেও গরমিল রয়েছে। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে اذا كان الماءُ قُلَّتَيْنِ দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে اذا كان الماءُ قدرَ قُلَّتَيْنِ او ثلثٍ لم يَنْجُس তৃতীয় বর্ণনায় এসেছে اذا بلغ الماء اربعين قلة চতুর্থ বর্ণনায় এসেছে قلة

৩. قلة শব্দের অর্থেও গরমিল রয়েছে। কেউ বলেন, এর অর্থ মটকা, কেউ বলেন মশক, কেউ বলেন, পাহাড়ের চূড়া। আবার কেউ বলেন মানুষের দেহের গঠন ইত্যাদি।

৪. قلة এর পরিমাণ নির্ধারণেও ইখতিলাফ রয়েছে। কেউ বলেন, বড় কুল্লা ,আবার কেউ বলেন ছোট কুল্লা।

৫. এক বর্ণনায় এসেছে قلة , আরেক বর্ণনায় دَلْو , আরেক বণনায় غَرْب , অপর বর্ণনায় فَرْقَان এসেছে।

৬. এ হাদীসে وَقفًا ورَفعًا ইযতিরাব রয়েছে। কেউ কেউ এ হাদীসকে مرفوع বলেছেন। আবার কেউ কেউ موقوف على ابن عمر বলেছেন।

৭. এ হাদীসের উপর হিজায, ইয়ামান ও শাম দেশের কোন ফকীহ আমল করেননি। আর এটা যদি হাদীস হতো তাহলে তাদের কাছে গোপন থাকত না।

৮. ইবনে আব্দুল বার (র) বলেন, হাদীসটি معلول বা ত্রুটিযুক্ত।

৯. ইবনে তাইমিয়া (র) ও ইবনুল কাইয়্যিম (র) হাদীসটিকে ساقط العمل বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

১০. হযরত ইবনে ওমর (র) ব্যতীত অন্য কোন সাহাবী থেকে এ হাদীসের বর্ণনা পাওয়া যায় না।

১১. সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে কাউকে ماء كثير ও ماء قليل নির্ণয়ের ব্যাপারে حديث قلتين এর উপর আমল করতে দেখা যায়নি।

উপরোক্ত ত্রুটিগুলোর কারণে আহনাফ হাদীসে কুল্লাতাইনকে গ্রহণ না করে مبتلى به তথা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রায়ের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

سوال : حديثُ ابن عمر رض مُعارِضٌ لحديثِ ابى سعيدٍ الخُدْرِيِّ فكيف التوفيقُ بَيْنَهُمَا .

প্রশ্ন ঃ ইবনে ওমর (র) এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় দুই কুল্লা পরিমাণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাতে নাপাক পতিত হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত আবু সাইদ খুদরী (র) এর হাদীস মতে জানা যায় কোনো অবস্থাতেই পানি নাপাক হয় না। বিপরীতমূখী হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার বিরোধ নিরসন কর।

উত্তর ঃ হাদীসদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন

উপরোক্ত বিপরীতমূখী হাদীস দুটির দ্বন্দ্ব নিরসনে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন–

১. বুযাআ কূপটি বৃহদায়তন বিশিষ্ট ছিল যা অধিক পানির বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য রাসূল (স) বলেছেন–

إن الماء طهورٌ لا يُنَجِّسُه شيٌ

২. অথবা, বুযাআ কূপ হতে ক্ষেতে খামারে পানি সেচ করা হত। পানি শেষ হলে আবার নতুন পানি দিয়ে তা ভর্তি করা হতো। আর এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে পানিতে কিছু নাপাক পড়লেও পানি নাপাক হয় না।

৩. কেউ কেউ বলেন রাসূল (স) এর বাণী– إنّ الماءَ طهورٌ لايُنَجِّسُه شيٌ বুযাআ নামক কূপের সাথে সম্পৃক্ত তবে সর্বক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

৪. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, নিক্ষেপ অর্থ এ নয় যে, তাতে মরা কুকুর, ঋতুমতির নেকড়া ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হতো। এটা সাহাবায়ে কেরামের নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থী। কাজেই অপবিত্র কিছু নিক্ষেপ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। সন্দেহ নিরসনকল্পে রাসূল (স) তাকে পবিত্র বলেছেন।

৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এর হাদীসটি ماء كثير এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর হযরত ইবনে ওমর (র) এর হাদীসটি ماء قليل এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৬. কেউ কেউ বলেন بئر بُضَاعة এর হাদীসের সনদে দূর্বলতা রয়েছে। কেননা, এ হাদীসের বর্ণনাকারী অলীদ ইবনে কাছীর দূর্বল রাবী।

৭. আবু সাইদ খুদরী (রা) এর হাদীসে পানির মৌলিক ধর্মের কথা বলা হয়েছে। পানির ধর্ম হচ্ছে طاهر - مطهر হবে। এতে নাপাক পড়লে অবশ্যই অপবিত্র হবে যা ইবনে উমর (রা) এর হাদীস হতে প্রতীয়মান হয়।

৮. আল্লামা তীবী (র) বলেন, কূপটি এমন জায়গায় অবস্থিত ছিল যে, নালার স্রোতে মিশে নর্দমার ময়লা কূপে এসে পড়ার সম্ভাবনা ছিল, কাজেই কূপটির পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। সন্দেহ নিরসন কল্পে রাসূল সা. তাকে পবিত্র বলেছেন।

৯. কূপটির তলদেশ হতে পানি প্রবাহমান ছিল যার ফলে তাতে আবর্জনা পতিত হলে তা সাথে সাথে দূরীভূত হয়ে যেত।

১০. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন بئر بضاعة থেকে পতিত ময়লা-আবর্জনা দূর করার পর সাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ হলে, নবী সা. এর ব্যাখ্যায় বলেন– إنّ الماءَ طهورٌ لا يُنَجِّسُه شيٌ

سوال : مَا هُوَ حكمُ سُؤرِ الدَّوابِّ والسِّبَاعِ؟ ومَا الاختلافُ فيه بَيْنَ الائمّةِ؟

প্রশ্ন ঃ চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্টের বিধানে আলিমগণের মতবিরোধ বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ হালাল পশুর উচ্ছিষ্টের বিধান

হালাল পশু যেমন– গরু, ভেড়া-বকরী, মহিষ, হরিণ, ঘোড়া ইত্যাদির ঝুটা সকলের ঐক্যমতে পাক।

কুকুরের উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ

কুকুরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র না অপবিত্র, এ সম্পর্কে ইমামদের মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. **ইমাম মালেক (র) এর অভিমত ঃ** ইমাম মালেক (র) থেকে এ ব্যাপারে ৪টি মত পাওয়া যায়।

ক. কুকুরের ঝুটা অপবিত্র

খ. গ্রামীন কুকুরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। আর শহরের কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র।

গ. যেসব কুকুর লালন পালন করা জায়েয সেগুলোর উচ্ছিষ্ট পবিত্র আর অন্যগুলোর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র।

ঘ. তাঁর সর্বাধিক সহীহ অভিমত হলো কুকুরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। তবে পাত্র সাতবার ধৌত করার যে নির্দেশ এসেছে তা আমরে তায়াব্বুদী। বিবেক ও কিয়াসের উর্ধ্বে। তার অন্যতম দলীল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী–

قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ـ

এ আয়াতে কুকুরের উচ্ছিষ্টকে অপবিত্র ও হারাম বলা হয়নি।

২. **ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র) এর অভিমত ঃ** ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র) এর মতে কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র। তারা এ অভিমতের সমর্থনে নিম্ন বর্ণিত দলীলসমূহ পেশ করেন–

١. قال الله تعالى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الآية)

٢. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شَرِبَ الكلبُ فِي اناءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

অত্র আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কুকুরের ঝুটা অপবিত্র ।

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে ইমামদের মত পার্থক্য

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র না অপবিত্র এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন –

১. ইমাম শাফেয়ী, আবু ইউসুফ ও ইসহাক (র) এর মতে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। এতে কোন ধরণের كراهت (মাকরূহ) নেই। ইমাম মালেক ও আহমদও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তাদের দলীল হল–

١. انّ ابا قتادةَ أَصْغَى لَهَا الاناءَ حتّى شَرِبَتْ ـ

٢. إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ ـ

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র তবে তাতে كراهت রয়েছে। পবিত্রতার তুলনায় অপবিত্রতার দিকটি প্রবল। তিনি এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত দলীল পেশ করেন–

قال النبى صلى الله عليه إذا ولغتْ فيه الهِرَّةُ غُسِلَتْ مَرَّةً

বিড়ালের লালা যদি নাপাক না হতো, তাহলে পাত্রকে একবার ধৌত করতে বলতেন না।

গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্টের বিধান

গাঁধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র , না অপবিত্র এ বিষয়ে ইমামদের মত প্রার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইবনে আব্বাস (রা) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন গাঁধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। কেননা, প্রত্যেক জীব-জন্তুর চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয। তাই তার উচ্ছিষ্টও পাক। তাছাড়া অত্র হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ قال نَعَمْ

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন গাঁধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। তাদের দলিল হলো–

أنّه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ الَّتِي فِيهَا لُحُومُ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ ـ

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন এ ব্যাপারে উভয় ধরণের হাদীস পাওয়া যায়। আর উসূলের নিয়ম হলো জায়েয ও নাজায়েযের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে নাজায়েযের দিকটি প্রাধান্য লাভ করে থাকে।

৩. কোন কোন হানাফী আলেমের মতে গাঁধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট ছাড়া অন্য কোন পানি না থাকলে উযূ ও তায়াম্মুম উভয়টি করতে হবে।

হিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্টের বিধান

হিংস্র জন্তু বলতে বাঘ, সিংহ ইত্যাদি প্রাণীকে বুঝায়। এদের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে কুকুর ও শূকর ছাড়া সকল প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পবিত্র। তার দলিল হচ্ছে–

انه صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ قال نعم وبِما افضلتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا ـ

২. হানাফীদের মতে, সকল হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র। কারণ হিংস্র জন্তুর গোশত লালা ইত্যাদি হারাম ও নাপাক কাজেই তাদের উচ্ছিষ্ট ও নাপাক হবে। তিনি এ ধরণের হাদীসকে সহীহ মনে করেন না। যদি তাকে সহীহ বলে ধরা হয়, তবে তার অর্থ হবে বেশী পানি। যেমন দীঘি, পুকুর, বিরাট জলাশয়, সরোবর।

سوال : بَيِّنِ القولَ المُفتَى بِهِ فِى هٰذه المَسْئلةِ ولما أُفتِىَ عليها ـ

প্রশ্ন ঃ আলোচ্য মাসআলার قول مفتى به বর্ণনা কর এবং এর উপর কেন ফাতওয়া দেয়া হয়?

উত্তর ঃ পানি কম ও বেশী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের قول مفتى به কোনটি? প্রথমে তো راى مُبْتَلى به এর উপর দেওয়া দেয়া হত। কিন্তু মুতাআখখরীন উলামা উদাহরণ স্বরূপ হেদায়া গ্রন্থকার, কাযীখান প্রমুখ সাধারণ লোকদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে ده دره তথা ১০ × ১০ বর্গ হাতের উপর ফাতওয়া দিয়েছেন এবং راى مبتلى به পরিত্যাগ করেছেন। কারণ এটার উপর ফাতওয়া দিলে লোকেরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে।

سوال : لِما اعتُرِضَ علىٰ مَذهبِ الحَنفيّةِ من مذهب المُخالفِين بَيِّن مع جوابِ قول المُخالفِين ـ

প্রশ্ন ঃ হানাফী মাযহাবের উপর অন্য মাযহাবের পক্ষ হতে কি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সেটা বর্ণনা কর প্রতি পক্ষের বক্তব্যে জবাব প্রদান করে।

উত্তর ঃ ইমাম আবু দাউদ (র) হানাফী মাযহাবের উপর আপত্তি উথাপন করেছেন। তিনি বলেন, কূপটি জারী তথা প্রবাহমান ছিল না বরং আবদ্ধ ছিল। তিনি বলেন, আমি কুতাইবা বিন সাঈদ থেকে শুনেছি। সাঈদ বলেন, আমি কূপের পাহাদারকে কূপের গভীরতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেন, অধিকাংশ সময়েই এর পানি নাভী পর্যন্ত ছিল। আর যখন পানি কমানো হতো তখন হাঁটুর সমান থাকত। কূপটির অবস্থা যখন এমনই তাহলে সেটাকে কীভাবে জারী বলা যায়?

এর জবাবে হানাফীগণ বলেন জারী হওয়ার জন্য নদীর মত হওয়া জরুরি নয়। বরং অধিক পানি কূপ হতে বের হওয়ার দ্বারাই তাকে জারী বলা যায়। কেননা بئر بضاعة থেকে বাগান ও ক্ষেত খামারে পানি দেয়া হত। ইমাম ত্বহাবী (র) তারিখের ইমাম আল্লামা ওয়াকিদী থেকে নকল করেন যে, بئر بضاعة এর পানি জারী ছিল। আবু দাউদ بئر بضاعة এর পাহারাদারের যে, কথা উল্লেখ করেছেন. তা অগ্রাহ্য। কেননা, উক্ত পাহারাদার সিকা না গাইরে সিকা তা জানা নেই। সুতরাং তার কথা দলিল হওয়ারযোগ্য নয়। যা তিনি ওয়াকিদির বিপরীত বলেছেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, আমি بئر بضاعة কে আমার চাদর তার উপর বিছিয়ে পরিমাপ করেছি। দেখলাম তার প্রস্থ ৬ গজের বেশী নয়। আমি বাগানের প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলাম বুযায়া কূপের জাহেলী যুগের অবস্থা কি পরিবর্তন হয়েছে? তিনি বললেন না। তিনি এ কথার দ্বারা হানাফীদের মতকে রদ করতে চেয়েছেন। যেহেতু হানাফীগণ বলেছেন যে, উক্ত কূপটি ১০ × ১০ হাত ছিল এবং তার পানি অধিক ছিল। সে কারণে নবী (স) একে নাপাক বলেননি।

আবু দাউদ (র) এটাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, কূপটি ১০ × ১০ হাত নয়, বরং ৬ হাত প্রস্থ পেয়েছি। আর কূপটি রাসূল (স) এর সময়ে যেরূপ ছিল তা এখন পর্যন্ত সে অবস্থায় বহাল রয়েছে। যেমনটা প্রহরী বলেছে।

আবু দাউদ (র) এর এ কথার জবাবে হানাফীগণ বলেন, আমাদের মধ্যে এমন কোন লোককে দেখিনি যিনি আবু দাউদের মতকে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তার দাবি বাতিল বলে গণ্য হবে। তাছাড়া রাসূলের যামানা থেকে আবু দাউদের (র) যামানার ব্যবধান হচ্ছে ৫০০ বৎসরের। এ দীর্ঘ সময়ে কূপটি পরিবর্তন হওয়াটা স্পষ্ট এবং প্রহরীর অবস্থা আমরা অবগত নই যে, কেউ তাকে গ্রহণযোগ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন কি না। সুতরাং এমন ব্যক্তির কথা দলীল হতে পারে না।

আবু দাউদ (র) বলেন, আমি কূপের পানির রং পরিবর্তন দেখেছি। এর দ্বারাও আহনাফের রদ করা উদ্দেশ্য। কেননা, কতক হানাফী বলেন, যদিও উক্ত কূপে কুকুরের গোশত. হায়েযের নেকড়া ও মানুষের পায়খানা নিক্ষেপ করা হত তবে তা কূপে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারত না। কেননা, কূপের পানি অধিক পরিমাণে উঠানো হত। তাই কূপটি প্রবাহমান পানির হুকুমেই ধরা হয়। এ কথাটি খণ্ডন করার জন্য আবু দাউদ বলেন, আপনাদের (হানাফীদের) কথাটি যদি সঠিক হত তাহলে পানির রং পরিবর্তন হত না।

এর জবাবে হানাফীগণ বলেন, হয়তো দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ায় তা পরিবর্তন হয়েছে। একথার দ্বারা এরূপ বুঝাটা ঠিক হবে না যে. তা রাসূলের সময়কাল থেকে পরিবর্তন হয়ে আছে। কেননা, রাসূলের সময়কাল থেকে ইমাম আবু দাউদের সময়কাল হলো ৫০০ বছর।

سوال : كيف يَطْهرُ الماءُ القليلُ اذا وقعتْ فِيه النَّجَاسَةُ؟

প্রশ্ন ঃ অল্প পানিতে নাপাক পড়লে কিভাবে তা পাক করা যাবে?

উত্তর ঃ الماء القليل তথা অল্প পানি বলতে যা বুঝায় তা দ্বারা ছোট কূপকে উদ্দেশ্য নেয় যেতে পারে। কেননা, এর চেয়ে বেশী হলে তা পুকুর বা নদীতে পরিণত হবে। সুতরাং এ ধরণের পানিতে নাপাক পড়লে তা পবিত্র করার জন্যে নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

১. যদি তাতে ঈদুর, চড়ুই, টুনটুনি বা গিরগিটি পড়ে তবে ছোট বালতির ৩০ বালতি, আর বড় বালতির ২০ বালতি পানি তুলে ফেললে (কূপ ও) পানি পবিত্র হয়ে যাবে।

২. কূপের মধ্যে নাপাক পড়লে নাপাক বস্তু তুলে ফেলতে হবে। এ ক্ষেত্রে কূপের সমস্ত পানি উঠায়ে ফেললে তা পবিত্র হয়ে যাবে।

৩. কবুতর, মুরগী বা বিড়াল পড়ে মরে গেলে ৪০/৫০ বালতি পানি কূপ থেকে তুলে ফেলতে হবে।

৪. যদি কূপে কুকুর, ছাগল বা মানুষ মারা যায় অথবা মৃতদেহ ফুলে উঠে তাহলে পানি পবিত্র করার জন্যে সমস্ত পানি তুলতে হবে। এভাবে পানি পবিত্র হয়ে যাবে।

سوال : اكتُب قولَ ابىْ حنيفةَ فِى مسئلةِ تَنَجُّسِ الماءِ بوُقوعِ النَّجاسةِ فيه مع اَدِلَّتِهم.

প্রশ্ন ঃ পানিতে নাপাক পড়লে পানি নাপাক হওয়ার ব্যাপারে আবু হানীফা (র) এর বক্তব্য কি? দলীল সহকারে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, যদি পানির পরিমাণ কম হয় এবং তাতে নাপাক পতিত হয় তাহলে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। যদিও এর একটি গুণও পরিবর্তিত না হয়। আর যদি পানি বেশী হয় তাহলে নাপাক বস্তু পতিত হওয়ার দ্বারা পানি নাপাক হবে না। যতক্ষণ না এর অধিকাংশ গুণ পরিবর্তিত হয়। মোটকথা, আবু হানীফা (র) এর মতে পানি পাক ও নাপাক হওয়া পানি কম ও বেশী হওয়ার উপর নির্ভর করবে। (বজলুল মাজহুদ প্রথম খণ্ড পৃঃ নং ৪৩)

হানাফীদের প্রথম দলীল ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত–

قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم طهورُ اناءِ اَحَدِكُمْ اذا وَلَغَ فِيه الكلبُ اَنْ يَغْسِل سبعَ مرّاتٍ اُولٰهُنَّ بِالتُّرابِ (ابوداؤد ص ١٠، بخارى ٢٩، مسلم ص ١٢٧، ترمذى ٢٧، نسائى ص ٢٢، ابن ماجه ص ٣٠)

অর্থাৎ নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, কুকুর যদি তোমাদের কারো পাত্রে লেহন করে (খায় বা পান করে) তবে তা পাক করার নিয়ম হল, তা সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষন করতে হবে।

কুকুর শুধুমাত্র পানিতে মুখ দেয়ার দ্বারা পানির রং, স্বাদ, গন্ধ কোন কিছু পরিবর্তন হয়না, তাসত্বেও রাসূল (স) পাত্রের পানি ফেলে দিয়ে তাকে ধৌত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, অল্প পানিতে নাপাক পড়লে পানি নাপাক হয়ে যায়; যদিও পানির গুণাগুণ নষ্ট না হয়। এটা মালেকীদের বিপক্ষে দলীল।

দ্বিতীয় দলীল ঃ

عن ابى هريرةَ عنِ النبىّ صلعم اِذا استيقظَ اَحَدُكم مِن اللَّيل فلا يُدْخِل يَدَهُ فِى الْاِناءِ حتّى يُفْرِغَ عَلَيْها مرّتينِ او ثلثًا فانه لايَدرِى اين بَاتتْ يدُه (ترمذى ص ١٣، بخارى ص ٢٨، مسلم ص ١٣٦، نسائى ص ٤)

অর্থাৎ .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন– তোমাদের কেউ যখন রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়। তখন যেন সে হাত দু'বার অথবা তিনবার না ধুয়ে পানির পাত্রে প্রবিষ্ট না করে। কারণ রাতে তার হাত কোথায় ছিল, সে তা জানে না।

এখানে রাসূল সা. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া এবং পাত্রে হাত প্রবেশ করাতে নিষেধ করেছেন। কারণ সম্ভাবনা আছে যে, রাত্রে তার হাত বিশেষ অঙ্গে পৌঁছেছে, ফলে সেখান থেকে নাপাক-ময়লা হাতে লেগেছে। কাজেই হাত ধৌত করা ব্যতীত পাত্রে হাত ঢুকাবে না। এখানেও একথা স্পষ্ট যে, ঘুম থেকে উঠার পর পাত্রে হাত ঢুকালে পানির রং পরিবর্তন হয় না। তা সত্বেও পানিতে হাত ঢুকানোর দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যায়। এখানে লক্ষ্যনীয় হলো যখন রাসূল (স) সম্ভাবনাময় নাপাকীর কারণে পানি নাপাক হওয়ার বিধান আরোপ করেছেন। তাহলে কম পানিতে নাপাক পড়লে অবশ্যই নাপাক হয়ে যাবে। এর দ্বারা মালেকী মাযহাব খণ্ডিত হয়।

তৃতীয় দলিল :

عن ابى هريرة عن النبىّ صلى الله عليه وسلم قال لايبُولَنّ احدُكم فى الماءِ الدّائم ثم يغتسل منه

(ابوداود، البخارى ص ٣٧ ، مسلم ١٣٨ ، ترمذى ص ٢١ ، نسائى ص ٢١)

অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (স) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেন, তোমাদের কেউ যেন এমন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে যার দ্বারা সে গোসল করবে। এখানেও একথা স্পষ্ট যে, পানিতে পেশাব করার দ্বারা পানির রং পরিবর্তন হয় না। তা সত্ত্বেও রাসূল (স) বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় পানিতে পেশাব করার দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যায়, যদি পানির পরিমাণ কম হয়। উল্লেখ্য হাদীসে রং পরিবর্তন হওয়ারও কোন শর্ত নেই এবং দুই কুল্লারও শর্তারোপ করা হয়নি। এর দ্বারা শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাব খণ্ডিত হয়।

চতুর্থ দলীল : হযরত আতা (র) এর বর্ণনা। তিনি বলেন একবার একজন জমজম কূপে পড়ে মারা গেল। তখন ইবনে জুবাইয়েরকে আদেশ করা হল, তিনি যেন পানি উঠিয়ে নেন, তিনি তাই করলেন। অথচ পানির গুণ পরিবর্তন হয়নি। তা সত্ত্বেও তাকে পানি উঠিয়ে ফেলার হুকুম দেয়া হল। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, পানিতে নাপাক পতিত হলে পানি নাপাক হয়ে যায়। যদিও তার রং পরিবর্তন না হয়।

سوال : المشهورُ عندَ الاَحْنافِ اذا كان الماءُ عشرًا فى عشرٍ فهو كثيرٌ مِن اينَ اَخَذُوا هٰذا التّحديدَ وتركُوا حديثَ القُلّتَيْنِ؟

প্রশ্ন : আহনাফের নিকট এই মত প্রসিদ্ধ যে, পানি যখন কোন কূপে বা গর্তে ১০ × ১০ = ১০০ বর্গহাত হবে তখন তা অধিক পানি হিসেবে গণ্য হবে। হানাফীরা এ নির্দিষ্টকরণ কোত্থেকে গ্রহণ করেছেন। যার ফলে القلتين এর হাদীস বাদ দিয়েছেন।

উত্তর : উক্ত প্রশ্নের উত্তর হলো প্রকৃতপক্ষে পানির আয়তন ১০ × ১০ = ১০০ বর্গহাত হলে তা ماء كثير ধরা হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের অভিমত নয়, বরং এ মতটি হচ্ছে আবু সুলায়মান জুরজানী নামক একজন অপ্রসিদ্ধ ফকীহের। এ মতের উপর ফাতওয়া দেয়া হয় না। অতএব, ১০×১০ =১০০ হাত মতটি হানাফীদের প্রসিদ্ধ অভিমত নয়। ماء قليل، ماء كثير সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র) এর প্রসিদ্ধ অভিমত ও ফাতওয়া হল, এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রায়ের উপর নির্ভরশীল। তিনি বলেন– لا وَقّتَ فيه شيئًا بل هٰذا مُفوّضٌ الى رأيِ المُبتَلىٰ به وعليه الفتوىٰ

মোটকথা ১০ × ১০ হাত হলে অধিক পানির হুকুমটি হানাফীদের প্রসিদ্ধ মত নয়। তবে উলামায়ে মুতায়াখখিরীন যেমন, হেদায়া গ্রন্থকার কাযীখান লোকদের উপর সহজ করার জন ১০ × ১০ এর উপর ফতোয়া দিয়েছেন।

سوال : مَنْ نَقَدَ عَلى الْإمامِ الشافعىّ لِاسْتِدلالِه بحديثِ القُلّتَيْنِ ولِمَ؟

প্রশ্ন : কারা ইমাম শাফেয়ী (র) এর ماء قليل এবং ماء كثير নির্ণয়ে দলীল হিসেবে গৃহীত কুল্লাতাইন এর হাদীসের বিষয়ে সমালোচনা করেছেন এবং কেন?

উত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র) ماء قليل এবং ماء كثير নির্ণয়ে حديث قلتين-কে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। আহনাফ এ ব্যাপারে তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন। এ সমালোচনা করার কারণ হচ্ছে–

১. এ হাদীসের সনদ, মতন ও অর্থের মধ্যে গরমিল বা সন্দেহ আছে।

২. কুল্লাতাইনের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম পাওয়া যায়।

৩. এ হাদীসটি مرفوع ও موقوف হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।

৪. সাহাবা কিরামের মধ্য থেকে কাউকে এ হাদীসের উপর আমল করতে দেখা যায়নি।

৫. ইবনে আব্দুল বার বলেন এ হাদীসটি معلول

سوال : ما هو كُنيةُ عمرَبنِ الخطّاب؟ اذكر نبذةً مِّن حَياتِه الطَّيِّبة؟

প্রশ্ন ঃ ওমর ইবনুল খাত্তাব এর কুনিয়ত কি? তার পবিত্র জীবনী সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

পরিচিতি ঃ নাম ওমর, কুনিয়ত আবু হাফস, উপাধি ফারুক, পিতার নাম খাত্তাব, মায়ের নাম হান্তানা বিনতে হাশিম। তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভুত ছিলেন।

জন্ম ঃ হযরত উমর ফারুক (রা) হিজরতের ৪০ বছর পূর্বে রাসূল সা. এর জন্মের ১৩ বছর পর ৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক জীবন ঃ তাঁর বাল্য জীবন সম্পর্কে তেমন জানা যায়নি। যৌবনকালও প্রায় অনেকটা অজানা। কৈশরে হযরত ওমর ফারুক এর পিতা তাঁকে উটের রাখালির কাজে নিয়োজিত করেন। মক্কার নিকটতম দাজনান নামক স্থানে উট চরাতেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা এবং নসবনামা শিক্ষা এসব আয়ত্ত করেন। এক কথায় যুগ অনুপাতে তিনি একজন শিক্ষিত লোক ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ ইসলাম গ্রহণকালে তাঁর বয়স ছিল ২৬ বছর। তাঁর পূর্বে ৪০ জন পুরুষ এবং ১১ জন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো মতে তার দ্বারাই ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ৪০ পূর্ণ হয়। তার ইসলাম গ্রহণের পরই ইসলাম প্রকাশ্য ময়দানে নেমে আসে। ফলে তিনি ফারুক উপাধিতে ভূষিত হন।

খিলাফতের দায়ীত্ব গ্রহণ ঃ হযরত আবু বকর (রা) এর ইন্তেকালের পর ১৩ হিজরী সনের ২৩ শে জুমাদাল উখরা মোতাবেক ২৪ শে আগস্ট ৫৩৪ সালে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৩ হিজরীর ২৩ শে যিলহিজ্জা মোতাবেক ৩রা নভেম্বর ৬৪৪ সালে তার খিলাফত সমাপ্ত হয়। তার খিলাফতকাল সর্বমোট ১০ বছর ৬ মাস স্থায়ী হয়। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা, তবে তাঁকে সর্ব প্রথম আমীরুল মু'মিনীন বলা হত, কেননা হযরত আবু বকর (রা) কে খলীফাতুর রাসূল বলা হত।

মর্যাদা ঃ তিনি ছিলেন আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত। তার ইসলাম গ্রহণ ছিল রাসূল (স) এর জন্যে এক সুখকর সংবাদ। তিনি ইসলামে জন্যে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দেন। রাসূল সা. তাঁর সম্পর্কে বলেছেন–

لَوْكَانَ نَبِيًّا بَعْدِىْ لَكَانَ عُمَرُ

খিলাফত সংক্রান্ত কিছু তথ্য ঃ তাঁর শাসনামলে সর্বাধিক রাজ্য জয় হয়। বিজিত রাজ্যের সংখ্যা ১০৩৬টি। তিনি সর্ব প্রথম হিজরী সন প্রবর্তন করেন। তারাবীহর নামায জামাআতে পড়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময় ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তব ভিত্তি স্থাপিত হয়।

রাসূলের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ঃ রাসূল (স) এর সাথে দ্বীনী সম্পর্কই একজন সাহাবীর মুখ্যতম সম্পর্ক। তা সত্ত্বে হযরত ওমর ফারুক (রা) রাসূল সা. এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কেও ধন্য হয়েছিলেন। নিজ কন্যা হাফসাকে রাসূল সা. এর সাথে বিয়ে দেন। রাসূল সা. এর নাতনী হযরত আলী (রা) এর কন্যা উম্মে কুলসুম বিনতে ফাতিমাকে ৪০ হাজার দিরহাম নগদ মহর দিয়ে হযরত ওমর ফারুক (রা) ১৭ হিজরী সনে বিয়ে করেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ঃ তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৯টি। বুখারী ও মুসলিম শরীফ উভয় গ্রন্থে তার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারী শরীফে এককভাবে সর্বমোট ২৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যাস্ত থাকায় তাঁর হাদীসের সংখ্যা এত কম হয়েছে।

ইন্তিকাল ঃ ২৩ হিজরী সনের ২৪ শে যিলহিজ্জা বুধবার মসজিদে নববীতে ইশার নামায মতান্তরে ফজরের নামাযে ইমামতি করার সময় মুগীরা ইবনে শুবার দাস আবু লু-লু বিষাক্ত তরবারী দ্বারা তার মাথা ও নাভীতে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। আহত অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ২৭ যিলহিজ্জা শনিবার তিনি শাহাদাত লাভ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) হযরত সুহাইব তাঁর জানাযার নামায পড়ান। রওযায়ে নববীর মধ্যে সিদ্দীকে আকবার (রা) এর বাম পাশে হযরত আয়েশা (রা) এর অনুমতিক্রমে তাঁকে দাফন করা হয়। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

تَرْكُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَاءِ

٥٣. اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن ثابت عن انس ان اعرابيا بال فى المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله ﷺ دعوه لاتزرموه فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه قال ابو عبد الرحمن يعنى لا تقطعوا عليه -

٥٤. اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك قال بال اعرابى فى المسجد فامر النبى ﷺ بدلو من ماء فصب عليه -

٥٥. اخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت انسا يقول جاء اعرابى الى المسجد فبال فصاح به الناس فقال رسول الله ﷺ اتركوه فتركوه حتى بال ثم امر بدلو فصب عليه -

٥٦. اخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الاوزاعى عن محمد بن الوليد عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابى هريرة قال قام اعرابى فبال فى المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله ﷺ دعوه واهريقوا على بوله من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين -

---

পানির পরিমাণ নির্ধারণ না করা

অনুবাদ ঃ ৫৩. কুতায়বা (র)...........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে দেয়। কেউ কেউ (বাধা দিতে) উঠে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তার পেশাবে বাধা সৃষ্টি করো না। সে ব্যক্তি পেশাব শেষ করলে তিনি এক বালতি পানি আনতে বলেন। তারপর পানি তার পেশাবের উপর ঢেলে দেওয়া হয়।

৫৪. কুতায়বা (র)...........আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন ব্যক্তি মসজিদে পেশাব করে দেয়। নবী (স) এক বালতি পানি আনতে আদেশ করেন। তারপর ঐ স্থানে পানি ঢেলে দেয়া হয়।

৫৫. সুওয়াইদ ইবনে নাস্‌র (র)..........ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সা'ঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক বেদুঈন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে এবং পেশাব করতে শুরু করে। এতে লোকেরা চিৎকার করে উঠল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তারা তাকে ছেড়ে দেয়। সে ব্যক্তি পেশাব শেষ করে। পরে তিনি এক বালতি পানি আনতে নির্দেশ দেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দেয়া হয়।

৫৬. আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম (র)..........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন মসজিদে এসে পেশাব করে দেয়। লোকেরা তাকে ধমক দিতে আরম্ভ করলো। রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা, তোমরা নম্র ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হয়েছ, কঠোর ও রূঢ় আচরণের জন্যে নও।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ مُوَضِّحاً مَعَ بَيَانِ مُنَاسَبَةِ الْحَدِيثِ بِالتَّرْجَمَةِ ـ

প্রশ্ন ঃ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের যোগসূত্র বর্ণনা করে হাদীসের তরজমা কর।

উত্তর ঃ তরজামতুল বাবের সাথে হাদীসের যোগসূত্র ঃ এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর (স) পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পানি নাপাক হয় না। যদিও তা অল্প হয়। কারণ এক বালতি পানি অল্পই। আর তা পেশাবের উপর ঢেলে দেয়া হয়েছে। এতে তা তার সাথে মিশে গেছে। এখন পানি যদি পেশাবের সাথে মিশ্রিত হওয়ার দ্বারা নাপাক হয়ে যায় তাহলে এতে আরও নাপাকী কে বৃদ্ধি করা হল, দূর করা নয়; যা কিনা যুক্তির পরিপন্থী। কাজেই একথা মেনে নিতে হবে যে, নাজাসাতের সাথে মিশ্রিত হওয়ার দ্বারা পানি নাপাক হয় না। চাই পানি কম হোক কিংবা বেশী হোক। এটাই হাদীস শরীফের তরজমাতুল বাবের সাথে যোগসূত্র। ইটা ইমাম মালেক (র) এর মাযহাব। কিন্তু জুমহুর আইম্মায়ে কেরামের মাযহাব এর বিপরীত।

سوال : الاعرابيُّ مَن هُوَ وكَيفَ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ؟

প্রশ্ন ঃ গ্রাম্য ব্যক্তিটি কে এবং কিভাবে তিনি মসজিদে পেশাব করলেন?

উত্তর ঃ তাঁর নামের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম ছিল আকরা ইবনে হারেস। আবার কেউ কেউ বলেন, তার নাম হলো উয়াইনা বিন হাসান, কারো মতে তার নাম হলো যুল খুয়াইসা, আবার কেউ বলেন, তার নাম হলো যুল খুয়াইসারা। আর শেষ মতটিই অধিক নির্ভরযোগ্য। মসজিদে পেশাব করার কারণ হলো তিনি নব মুসলিম ছিলেন। বিধায় মসজিদের আদব কায়দা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। আবার এমনও হতে পারে যে, তার পেশাবের বেগ অত্যাধিক থাকার কারণে মসজিদ হতে বের হওয়র সময় পায়নি।

سوال : ما الحِكمَةُ فِي قَولِهِ عَلَيهِ السَّلامِ دَعُوهُ؟

প্রশ্ন ঃ নবী করীম (স) এর বাণী قوله دعوه এর রহস্য কি?

উত্তর ঃ রাসূল (স) আশংকা করলেন যে, তাকে বাঁধা দেয়া হলে তিনি পেশাব করা বন্ধ করে দিবেন। এতে তিনি কঠিন রোগে পতিত হতে পারেন। অথবা তিনি ভেবেছেন যে, তাকে বাঁধা দেয়া হলে তিনি পেশাবরত অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবেন। এতে মসজিদের অনেক স্থান নাপাক হয়ে যাবে।

سوال : حَرِّرِ اخْتِلافَ الائمَّةِ فِي كَيْفِيَّةِ تطهيرِ الأَرْضِ مُدَلَّلاً ـ

প্রশ্ন ঃ ভূমি পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামদের মতানৈক্য কি? দলীল সহকারে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ১. ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) এর মাযহাব হলো নাপাক ভূমি শুধুমাত্র পানি দিয়ে ধোয়ার দ্বারা পাক হবে অন্য কোনভাবে পাক হবে না।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে জমিন শুকিয়ে গেলে পাক হয়ে যাবে। তবে পানি দ্বারা পবিত্র করাই উত্তম।

ইমাম মালেক ও অন্যান্যগণের দলীল ঃ

عن ابى هريرةَ رضى الله عنه قال قامَ اعرابيٌّ فَبالَ فى المسجدِ فتناوَلَه النّاسُ لَهُ فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دَعُوهُ وَاَهْرِيقُوا على بَولِهِ دَلْوًا مِّنْ مَّاءٍ ـ

হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন একজন গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল সাহাবারা তাকে বাঁধা দিতে গেলেন। কিন্তু রাসূল (স) তাদেরকে বললেন, তাকে পেশাব করতে দাও। আর পেশাবের স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। এ হাদীসে হুযূর (স) নির্দিষ্টভাবে পানি ঢালতে বললেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এটা পানি দ্বারাই পবিত্র হয়; অন্য কোন কিছু দ্বারা নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল ঃ

١ـ عن ابنِ عمرَ رض قال كانتِ الكِلابُ تبولُ وتُقبِل وتُدبِرُ فِي المَسجِدِ فلمْ يكونوا يُرشّونَ شيئاً مِن ذلكَ ـ

১. হযরত ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন মসজিদের মধ্যে কুকুর পেশাব করত এবং সেখানে আসা যাওয়া করত। কিন্তু এর উপর পানি ছিটানো হতো না।

٢. عن عائشة قالتْ زكوةُ الْاَرْضِ يُبْسُها

২. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, জমিন শুকিয়ে যাওয়াই তার পবিত্রতা।

٣. عن ابنِ الحَنَفِيَّةِ اذا جُفَّتِ الارضُ فقد زَكَتْ.

৩. ইবনুল হানাফিয়্যা বর্ণনা করেন যে, জমিন যখন শুকিয়ে যাবে তখন তা পাক হয়ে যাবে।

٤. عن ابى قِلابةَ قال جفوفُ الْاَرْضِ طُهُورُها

৪. হযরত আবু কেলাবা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, জমিন শুকিয়ে যাওয়াটাই তার পবিত্রতা। এ সকল হাদীস দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, জমিন শুকিয়ে যাওয়ার দ্বারাও পবিত্র হয়ে যায়। প্রথম পক্ষের উল্লেখিত হাদীসের উত্তরে এরূপ বলা যেতে পারে যে, হুজুর সা. পানি ঢালার নির্দেশ এ কারণে দিয়েছেন যে, এটা উত্তম এবং এর দ্বারা তাড়াতাড়ি পবিত্রতা অর্জিত হয়। এ কারণে নয় যে, অন্য কিছু দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয় না।

سوال : اِلامَ اَرْشَدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِه فَاِنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ.

প্রশ্ন ঃ হুযুর (স) فانما بعثتم ميسرين দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করেছেন?

উত্তর ঃ فانما بعثتم ميسرين এ কথা দ্বারা হুযুর (স) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, সাহাবায়ে কিরাম তাঁর উপস্থিতিতে এবং অনুপস্থিতিতে সর্বাবস্থায়ই তাঁর পক্ষ হতে তাবলীগের কাজ করবে।

অথবা, তারা হুযুর (স) এর পক্ষ হতে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হবেন, সে ক্ষেত্রে তারা যেন সহজতাই অবলম্বন করেন, কঠোরতা নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল, তাঁর সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের উপর কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে দয়াশীল।

سوال : عَرِّف لفظَ اعرابىّ ثم بيِّن مِصداقَها

প্রশ্ন ঃ اعرابى শব্দের পরিচয় দাও। অতঃপর তার মেসদাক বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ উমদাতুকারী গ্রন্থে আছে। আর তা হলো اعرابى শব্দটি اعراب এর দিকে সম্বোধিত। শব্দটির একবচন ব্যবহৃত হয় না। অর্থ হলো গ্রামের অধিবাসী, গ্রাম্যব্যক্তি চাই সে আরবী হোক কিংবা আজমী।

আলোচ্য হাদীসে اعرابى শব্দের উদ্দেশ্য ঃ মসজিদে যে গ্রাম্য ব্যক্তি পেশাব করেছিল সে কে ছিল সেটা নির্ধারণের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ১. কেউ কেউ বলেন, সে ছিল আকরা ইবনে হারেস।

২. কেউ কেউ বলেন, সে ছিল উয়াইনাহ ইবনে হাসান।

৩. "সিহাহ" নামক গ্রন্থে আবু মূসা মাদানীর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় সে ছিল যুল খুয়াইসরা ইয়ামানী। যিনি সাহাবী ছিলেন। কামুস গ্রন্থকার বলেন শেষোক্ত মতটিই অধিক শুদ্ধ। (উমদাতুলকারী)

قوله فقام اليه بعضُ القوم الخ

سوال : كم روايةً فيها وما المُراد بها بَيِّن.

প্রশ্ন ঃ এ ব্যাপারে কতটি রেওয়ায়াত আছে ও তার দ্বারা উদ্দেশ্য কি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে চারটি রেওয়ায়েত রয়েছে– ১. فقامَ اليه بعضُ القومِ ২. فصاح به الناسُ ৩. فتناولَه ৪. الناس বুখারী শরীফেও এমন একটি বর্ণনা আছে।

এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) উল্লেখিত বর্ণনাগুলো উল্লেখ করে বলেন, এ সকল বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় লোকেরা তাকে গ্রেফতার করে বাধাদান করার চেষ্টা করেননি। বরং তাকে হাত দিয়ে ধরা ছাড়া মুখ দিয়ে ধমক দিয়ে করে তাকে এ অপ্রীতিকর কাজ থেকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। (ফাতহুল বারী)

سوال : أَوْضِحْ هٰذِهِ الْعِبَارَةَ قَوْلُهُ دَعُوْهُ لَاتُزْرِمُوْهُ ... الخ

প্রশ্ন ঃ قَوْلُهُ دَعُوْهُ لَاتُزْرِمُوْهُ **ঃ এ ইবারতের ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর ঃ قَوْلُهُ دَعُوْهُ لَاتُزْرِمُوْهُ **ঃ এর ব্যাখ্যা ঃ** সাহাবায়ে কেরাম গ্রাম্য ব্যক্তির এ অপ্রীতিকর কাজ দেখে বাঁধা দেয়ার জন্য উদ্যত হন। কিন্তু নবী করীম (স) তাদেরকে বাঁধা প্রদান করলেন এবং ধমকাতে নিষেধ করলেন। কারণ সে ছিল নব মুসলিম। ইসলামের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ এবং মসজিদে পেশাব করলে যে মসজিদ অপবিত্র হয়ে যায় সেটা তার জানা ছিল না। কাজেই এ কাজ করার ব্যাপারে সে মা'জুর। তাই তাকে বাঁধা দেয়া সমীচীন নয়। এতে সে বিগড়ে যেতে পারে এবং ইসলামের প্রতি তার অনীহা আসতে পারে। কোন কোন ব্যাখ্যাতা এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপভাবে দিয়েছেন। আর তা হলো এক্ষেত্রে একটি মূলনীতি রয়েছে যে,

إِذَا ابْتُلِىَ الْإِنْسَانُ بِمُصِيْبَتَيْنِ فَلْيَخْتَرْ أَهْوَنَهُمَا .

মানুষ যখন দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয়, সে যেন ঐ মসিবতদ্বয়ের মধ্য হতে সহজটি গ্রহণ করে। আর যুক্তির দাবীও এটাই। ঠিক তদ্রূপ আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (স) দুটি অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ১. মসজিদ অপবিত্র হয়ে যাওয়া।

২. গ্রাম্য ব্যক্তির জানের আশংকা। সে পেশাব শুরু করায় মসজিদ তো অপবিত্র হয়ে গেছে। কিন্তু অপবিত্রটা সমস্ত মসজিদে ছড়িয়ে যায়নি। সে মসজিদের এক কোণে পেশাব করেছিল। ইমাম বুখারী ও আবু দাউদের বর্ণনা দ্বারা এটাই বুঝা যায়। যেমন–

١. ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ إِنْ بَالَ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ - ابوداود

٢. فَبَالَ فِى طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ اى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ - بخارى

সে মসজিদের এক কোণে পেশাব করছিল। পেশাব যেহেতু করেই ফেলেছে। আর মসজিদ অপবিত্র হয়েই গেছে। এখন বাধা দিলে মসজিদ পবিত্র হবে না বরং আরো দুটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

১. হয়তো বা ধমকের ফলে তার পেশাব-ই বন্ধ হয়ে যাবে। আর পেশাব বন্ধ হয়ে গেলে তার কষ্ট হবে।

২. অথবা, তাকে এমনভাবে ধমক দেয়ার কারণে সে ভয়ে কম্পিত হয়ে পালানোর জন্যে ছুটাছুটি করবে। ফলে তার শরীরও নাপাক হবে এবং সমস্ত মসজিদে অপবিত্রতা ছড়ায়ে পড়বে। ফলে লাভের তুলনায় ক্ষতি বেশী হবে। কাজেই রাসূল (স) সাহাবাদেরকে বললেন তোমরা তাকে পেশাব করা অবস্থায় ছেড়ে দাও। এখানে রাসূল (স) তাঁর কষ্ট ও ক্ষতির আশংকা এবং সমস্ত মসজিদ এবং তার কাপড় ও শরীর নাপাক হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য ছোট্ট ক্ষতি তথা মসজিদের নির্দিষ্ট অংশ অপবিত্র হওয়াকে গ্রহণ করেছেন।

سوال : كَيْفَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ ... الخ
وَهُوَ (هذا امور) مُخْتَصٌّ بِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ لَيْسُوْا نَبِيًّا .

প্রশ্ন ঃ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ **এটা তো নবী করীম (স) এর সাথে খাস, তাহলে নবী করীম (স) সাহাবীদেরকে এটা কিভাবে বললেন, তাঁরা তো নবী নন?**

উত্তর ঃ নবী করীম (স) সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন তোমরা লোকদের উপর কঠোরতা আরোপ করার জন্য প্রেরণ করা হওনি। বরং তোমাদেরকে নরম ও শিষ্টাচারপূর্ণ আমল করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কাজেই কেউ যদি অজ্ঞতাবশত অপ্রীতিকর কোন কাজ করে ফেলে। তাহলে তার প্রতি স্নেহপরায়ণ হয়ে দ্বীনের সঠিক বিষয় তাকে শিক্ষা দেবে।

আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেন, সাহাবীদের দিকে بعث শব্দের নিসবত করা হয়েছে মাজাযীভাবে, হাকীকীভাবে নয়। কারণ প্রকৃত পক্ষে হুজুর (স)-ই উক্ত গুণের সাথে বিশেষিত। কেননা, তিনি দ্বীনের বিধানাবলী তালীম দেন এবং সকল সাহাবীদের নিকট পৌছে দেন। আর সাহাবারা নবী (স) এর উপস্থিতিতে এবং অনুপস্থিতিতে যেহেতু রাসূলের

এ কাজগুলোকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে সম্পাদন করে থাকেন। কাজেই রূপকভাবে بعث এর নিসবত তাদের দিকে করা হয়েছে। এভাবে রাসূল (স) যখন কোন সাহাবীকে কোন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন তখন তাকে পাঠানোর সময় বলতেন يسروا ولا تعسروا। মোটকথা এ উভয় স্থানে সাহাবাদের দিকে যে بعث এর নিসবত করা হয়েছে রূপকভাবে।

سوال : لِما انعقدَ المصنفُ بهٰذا العنوان (ترك التوقيت فى الماء) بعدَ بابِ التَّوقيتِ فى الماءِ، بَيِّن مقصدَ المصنِّفِ ومأخذَه موضحًا ـ

প্রশ্ন ঃ بابُ التَّوقيتِ فى المَاءِ এর পর মুসান্নিফ (র) আলোচ্য শিরোনাম কায়েম করলেন কেন? মুসান্নিফের উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ এভাবে শিরোনাম কায়েম করার দ্বারা মুসান্নিফ (র) এর উদ্দেশ্যে এটাই বুঝা যায় যে, তিনি (ক) পানির মধ্যে নাপাক বস্তু পতিত হওয়া (খ) এবং নাপাকের মধ্যে পানি পতিত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য করতে চাচ্ছেন। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। আর শাফেয়ী মাযহাবের বক্তব্য এটাই যে, যদি নাপাক বস্তু পানির মধ্যে পতিত হয় তাহলে এক্ষেত্রে পানি কম-বেশীর ধর্তব্য হবে অর্থাৎ পানি যদি 'বেশী (দুই কুল্লা) হয় তাহলে তা নাপাকী পতিত হওয়ার দ্বারা নাপাক হবে না। আর যদি পানি দুই কুল্লার কম হয় তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। এটাকে বুঝানোর জন্যেই পূর্বে توقيت فى الماء দ্বারা শিরোনাম কায়েম করেছিলেন। পক্ষান্তরে যদি পানি নাপাকীর উপর পতিত হয়। চাই পানির পরিমান কম হোক বা বেশী হোক তাহলে পানি পবিত্র থাকবে। কারণ এক্ষেত্রে নির্ধারিত কোন পরিমাণ নেই এবং নাপাকীও দূর করে দেবে। এটাকে সাব্যস্ত করার জন্যই আলোচ্য শিরোনাম নির্বাচন করেছেন।

শিরোনামের সঙ্গে হাদীসটির সঙ্গতি ঃ হাদীসে বলা হয়েছে فصبه عليه নবী (স) পেশাবের উপর পানি ঢেলে দিতে নির্দেশ দিলেন। আর এটা স্পষ্ট যে যদি পেশাবের উপর এক বালতি কিংবা দুই বালতি পানি ঢেলে দেয়া হয় তাহলে ঐ পানি নাপাকের সাথে মিশ্রিত হয়ে নাপাক আরো বৃদ্ধি পাবে এবং পানিও অপবিত্র হয়ে যাবে। এতে নাপাক দূর হবে না। এটাই যুক্তির দাবি। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবী (স) পানি ঢালতে নির্দেশ দিলেন সেটা পবিত্র করার জন্য। এর দ্বারা একথায় প্রতীয়মান হয় যে, পানি যদি-নাপাকের উপর পতিত হয় তাহলে পানি কম হোক বা বেশী হোক পানি নাপাক হবে না।

سوال : اكتب رأىَ امامِ الشافعى فى مسئلةِ وُرودِ الماءِ علٰى النَّجاسةِ مَعَ نقدِها ـ

প্রশ্ন ঃ নাপাকের উপর পানি পড়ার মাসআলার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) এর অভিমত এবং এ বিষয়ে মন্তব্য লিখ।

উত্তর ঃ যদি নাজাসাতের উপর পানি পতিত হয় তাহলে এক্ষেত্রে নাজাসাত দূর হয়ে যাবে এবং পানি পবিত্র থাকবে। চাই পানি কম হোক বা বেশী হোক। এর দলীল হলো রাসূল (স) এর নির্দেশে মসজিদ পবিত্র করার জন্য গ্রাম্য ব্যক্তির পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেয়া, এ ক্ষেত্রে যুক্তির দাবী হলো পানি ঢেলে দেয়ার দ্বারা নাপাক দূরীভূত হয় না বরং নাপাক আরো বৃদ্ধি পায়। বিষয়টি যেহেতু যুক্তির পরিপন্থী। তাই বুঝা গেল নাপাকের উপর পানি কম ঢালা হোক কিংবা বেশী পানি অপবিত্র হবে না এবং নাজাসাত দূর হয়ে যাবে।

আলোচ্য মাসআলার ব্যাপারে মন্তব্য ঃ আল্লামা সিন্ধী বলেন, নবী (স) যে গ্রাম্য ব্যক্তির পেশাবের উপর পানি ঢালতে বলেছিলেন। তা মসজিদকে পবিত্র করার জন্য নয় বরং এ জন্য পানি ঢালতে বলেছেন যাতে দূর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। আর শুকিয়ে যাওয়ার পরই মসজিদ পবিত্র হয়ে যাবে। এটা হানাফী মাহাবের বক্তব্য। তাদের দলীল হলো হযরত ইবনে হানাফিয়্যা ও হযরত আয়েশা (রা) প্রমূখ সাহাবীগণের বর্ণিত রেওয়ায়েত হলো হানাফীদের দলীল। দলীল হিসাবে এটা অধিক শক্তিশালী। ইমাম আবু দাউদ (র)ও শুকিয়ে গেলে যে, মসজিদ পবিত্র হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেছেন, এর দ্বারা বুঝা যায় তিনিও এর প্রবক্তা।

দ্বিতীয়তঃ নবী করীম (স) যে পানি ঢালতে বলেছেন এটা মাটির উপর পেশাবের যে ছাপ বা আবরণ পড়ে তা দূর করার জন্য।

بابُ الماءِ الدَّائِم

٥٧. اَخْبَرَنَا اسحٰقُ بْنُ ابراهيمَ حدّثنا عيسٰى بنُ يونسَ قال حدّثنا عوفٌ عن محمدٍ عن ابى هريرةَ عن رسولِ الله ﷺ قال لايَبُولَنَّ احدُكم فى الماءِ الدَّائِمِ ثمّ يتوضَّأُ مِنه قال عوفٌ وقال خلاسٌ عن ابى هريرةَ عن النبى ﷺ مِثلَه -

٥٨. اخبرَنا يعقوبُ بن ابراهيمَ قال حدّثنا اسماعيلُ عن يحىٰ بنِ عتيقٍ عن محمّدِ بْن سيرينَ عن ابى هريرةَ قال قال رسولُ الله ﷺ لا يَبُولَنّ احدُكم فى المَاء الدائم ثمّ يغتسلُ فيه قالَ ابو عبدِ الرحمٰن كان يعقوبُ لا يحدّث بهٰذا الحديثِ الا بدِينارٍ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ বদ্ধ পানির বর্ণনা

অনুবাদ ঃ ৫৭. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র).... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন কখনও বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে এবং পরে তদ্দ্বারা উযূ না করে।

৫৮. ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এমন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে যে, তাতেই আবার গোসল করে। ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, ইয়াকুব (র) এ হাদীস[illegible] এক দীনার নিয়ে বর্ণনা করতেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : ما ارادَ النبىُّ صلعم بِقَولِه "فِى الماءِ الدائِم"؟ هل يَتَنَجَّسُ الماءُ اذا بَالَ احدٌ فى الغَدِير والبَحْرِ؟

প্রশ্ন ঃ ماء الدائم **বলে রাসূল (স) কি বুঝিয়েছেন? পুকুর বা সমুদ্রে যদি কেউ পেশাব করে তেব কি সে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে?**

উত্তর ঃ الماء الدائم **এর সংজ্ঞা ঃ** আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) ماء الدائم বা আবদ্ধ পানি বলতে সে পানিকে বুঝিয়েছেন, যে পানি নির্দিষ্ট স্থল ভাগ দ্বারা বেষ্টিত এবং কোন প্রবাহিত পানির সাথে সংযুক্ত নেই। এ ধরণের কূপ বলতে সাধারণ কূপ, হাউজ, ছোট পুকুরকে বুঝায়। অথবা বদ্ধ পানি বলতে এমন পানি সমষ্টিকে বুঝায় যার এক পাশ থেকে নাড়া দিলে অন্য পাশের পানি নড়ে ওঠে।

ماء غدير**-এর বিধান ঃ** غدير বলতে সাধারণত বড় পুকুরকে বুঝায় যার এক প্রান্তের পানি নড়া দিলে অন্য প্রান্তরে পানি নড়ে না। এ ধরণের পানিতে কেউ পেশাব করলে তা দ্বারা পানি অপবিত্র হবে না, এ ধরণের পানিতে নাপাক পড়লেও তা দ্বারা উযূ গোসল জায়েয হবে।

ماء البحر **এর বিধান ঃ** নদ-নদী ও সমূদ্রের পানি প্রবাহমান এতে যে, কোন ধরণের নাপাক পড়ুক তা অপবিত্র হবে না। পেশাব, পায়খানা যাই পতিত হোক না কেন তা অপবিত্র হবে না। তা দ্বারা উযূ গোসল সব বৈধ হবে।

سوال : هل يجوزُ البولُ فى الماءِ الدَّائِمِ؟

প্রশ্ন ঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব নাজায়েয হওয়ার কারণ ঃ বদ্ধ ও জমে থাকা পানিতে পেশাব করতে রাসূল (স) নিষেধ করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে–

عن ابى هريرةَ (رض) قال قال رسولُ الله صلعم لايبولَنَّ احدُكم فى الماءِ الدائم ثم يَغْتَسِل فيه .

বদ্ধ পানিতে পেশাব করা থেকে নিষেধ করার হিকমত বা রহস্য হচ্ছে–

১. পানির স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে।

২. পানি অপবিত্র হয়ে যাবে।

৩. তাৎক্ষণিকভাবে পানি পরিবর্তন হয়ে যাবে।

৪. অথবা مُفْضِى الى التغيّر তথা পরিবর্তনের কাছাকাছি হয়ে যাবে। তবে প্রবাহিত পানিতে পেশাব করার অনুমতি রয়েছে والعَفاف افضلَ على كلِّ حال, অর্থাৎ সর্বাবস্থায়। তবে পানিতে পেশাব না করাই উত্তম।

ইমাম নববী বলেন– ক. পানিতে পেশাব ও পায়খানা করার হুকুম এক।

খ. পানিতে পেশাব করার তুলনায় পায়খানা করা বেশী অপরাধ।

খ. কোন পাত্রে পেশাব করে তা পানিতে নিক্ষেপ করা এবং পানিতে এমন নিকটে পেশাব করা, যাতে পেশাব পানিতে গড়িয়ে পড়ে উভয়টি নিষিদ্ধ।

سوال : بيِّن حكمَ الماءِ الدائمِ موضحًا ومفصّلاً

প্রশ্ন ঃ বদ্ধ পানির বিস্তারিত হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ১. আলোচ্য হাদীসে বদ্ধ পানির হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো বদ্ধ পানিতে পেশাব করা যাবে না। কারণ তাতে যদি পেশাব করা হয় বা তাতে কোন নাপাক পড়ে, আর পানি কম হয় তাহলে তা নাপাক হয়ে যাবে। কাজেই তা দ্বারা অযু করা বৈধ হবে না।

২. অন্য এক বর্ণনায় আছে ثم يغتسل منه এবং উক্ত পানি দ্বারা গোসল করাও বৈধ হবে না। হাদীসের মধ্যে শুধুমাত্র অযূ ও গোসলের কথা বলা হয়েছে; এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এ দু'বিষয় ছাড়া অন্য কাজে এর ব্যবহার করা যাবে। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ব্যাপক। বিশেষভাবে এ দুটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এ দুটির জন্যই বেশী ব্যবহৃত হয়।

৩. বদ্ধ কম পানিতে পেশাব করলে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। তা পান করার উপযোগী থাকে না। ফলে সে নিজের রুজি নষ্ট করে এবং অপারাপর ব্যক্তিদের রুজিও নষ্ট করে। এটা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ নয়।

৪. বদ্ধ পানি যদি বেশী হয় তাহলে তাতে নাপাক পড়লে পানি নাপাক হবে না। যতক্ষণ না তার তিনটি গুণের কোন একটি পরিবর্তন হয়ে যায়। গুণ তিনটি হল, পানির রং, স্বাদ ও ঘ্রাণ।

سوال : لا يَبُولَنَّ احدُكم " هٰذا النهي مختصٌّ بالبَول ام لا بيِّن موضحًا .

প্রশ্ন ঃ হাদীসের মধ্যে যে, পেশাব করতে নিষেধ করেছেন এটা কি! পেশাবের সাথে খাস নাকি অন্যান্য হুকুমের ক্ষেত্রেও এটা প্রাযোজ্য?

উত্তর ঃ হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে যে, নিষেধ করা হয়েছে, এটা পেশাবের সাথেই খাস। কাজেই তাতে পায়খানা করা যাবে। একথার প্রবক্তা হলো আল্লামা দাউদ জাহেরী, ইবনে হাজম প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণ (চারো ইমামসহ) কঠোরভাবে এর সমালোচনা করেছেন। জুমহুর উলমা বলেন, এখানে পেশাবের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো সাধারণত: ছোট বাচ্চারা পানিতে পেশাব করতে অভ্যস্ত। কাজেই কেউ পানিতে পেশাব করাকে বৈধ মনে করতে পারে। কিন্তু ছোট বড় সকলেই পানিতে পায়খানা করাকে অপছন্দ করে। আর শরীয়ত চায় যে, পানিতে পেশাব পায়খানা করার পথকে একেবারে বন্ধ করে দেয়া হোক। কাজেই যা করার সম্ভাবনা রয়েছে তাও নিষিদ্ধ হয়ে যাক।

আলোচ্য হাদীসে পানি দ্বারা যদি ماء قليل উদ্দেশ্য নেয়া হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে পানিতে পেশাব করার নিষেধাজ্ঞাটা হবে نهى تحريمى আর যদি পানি দ্বারা বেশী উদ্দেশ্য নেয়া হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে نهى দ্বারা মাকরূহ উদ্দেশ্যহবে।

سوال : ما اقوالُ العلماءِ بوُقوعِ البَول فى الماءِ بيِّن موضحا ؟

প্রশ্ন ঃ পানিতে পেশাব পতিত হলে সে ব্যাপারে আলিমগণের বক্তব্য কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ১. হানাফী আলিমগণ বলেন, পেশাব যদি কম পানিতে পড়ে তাহলে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। আর যদি প্রবাহমান বা জারী পানিতে পতিত হয় তাহলে পানি অপবিত্র হবে না। হ্যাঁ, যদি তা পতিত হওয়ার দ্বারা পানির গুণাগুণ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে এবং তার দ্বারা অযু গোসল কিছুই বৈধ হবে না কেউ উক্ত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করলে পুনরায় অযু গোসল করতে হবে। এটাই হাদীসের বাহ্যিক ইবারত দ্বারা বুঝা যায়।

২. কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, পানি যদি দুই কুল্লা কিংবা তার থেকে বেশী হয় তাহলে পেশাব পড়ার দ্বারা পানি অপবিত্র হবে না। আর যদি দুই কুল্লার কম হয় তাহলে পেশাব পতিত হওয়ার দ্বারা পানি অপবিত্র হয়ে যাবে।

[বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

بابٌ فِى مَاءِ الْبَحْرِ

٥٩. اخبرنا قُتَيْبَةُ عن مالكٍ عن صفوانَ بنِ سليمٍ عن سعيدِ بن سلمةَ انَّ المغيرةَ بنَ ابى بُرْدَةَ مِن بنى عبدِ الدَّارِ اخبرَه انَّه سَمِعَ ابا هريرةَ يقولُ سَأل رجلٌ رسولَ اللّٰه ﷺ فقالَ يا رسولَ اللّٰه اِنَّا نَركبُ الْبَحْرَ ونحمِلُ مَعَنا القليلَ مِن الماءِ فانْ توضَّأنا به عَطِشْنا اَفَنَتَوضَّأُ مِن ماءِ البحرِ فقال رسولُ الله ﷺ هُوَ الطهورُ ماءُه والحِلُّ مَيْتَتُه -

অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রের পানি প্রসঙ্গে

অনুবাদ ঃ ৫৯. কুতায়বা (র)..........মুগীরা ইবনে আবু বুরদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি। আমাদের সঙ্গে অল্প পরিমাণ পানি নিয়ে থাকি। এ পানি দ্বারা যদি আমরা উযূ করি তবে (পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে) আমরা পিপাসায় কষ্ট পাবো। এমতাবস্থায় আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা উযূ করবো? জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং সমুদ্রের মৃত প্রাণীও হালাল।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : اكتب سببَ ارشادِ الحديث

প্রশ্ন ঃ হাদীসের পটভূমি লেখ।

উত্তর ঃ হাদীসের পটভূমি ঃ রাসূল (স) এর হিজরতে পর মদীনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর ইসলাম প্রচার ও প্রসারের এবং শত্রুদের দমন করার লক্ষ্যে সাহাবীদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সফর করতে হতো। আর আরবের সফরে পহাড়, পর্বত ও মরুভূমির পথেই চলতে হতো, বিধায় পানিই ছিল তাদের সফরের বড় সম্বল। আর বেশী পানি সাথে নিয়ে চলাও তাদের জন্য সমস্যার ব্যাপার ছিল। কোনো কোন সময় সাহাবীগণ আবার সামুদ্রিক পথেও চলতেন। আর সে সকল সমুদ্রের পানি স্বভাবত লবনাক্ত থাকত। তাই ঐ পানি দ্বারা উযূ জায়েয হবে কি না? এ ব্যাপারে সন্দেহ জাগে। এ সকল সমস্যা ও সন্দেহ নিরসনের জন্য সাহাবীগণ হুজুরের সমীপে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে রাসূল (স) তাদেরকে সঠিক সমধান দানের জন্য উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

[পূর্বের পৃষ্ঠায় বাকী অংশ]

৩. ইমাম মালেক ও ইবনে তাইমিয়্যা (র) বলেন, পেশাব পড়ার দ্বারা যদি পানির গুণাগুণ পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে, অন্যথায় পানি পবিত্র থাকবে। এ ব্যাপারে পানি কম বা বেশী হওয়ার কোন শর্ত নেই। তারা উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, নবী করীম (স) যে, পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন এর কারণ হলো কোন ব্যক্তি যদি কাউকে পেশাব করতে দেখে তাহলে সেও দেখাদেখি পেশাব করবে, ফলে পানির রং পরিবর্তন হয়ে যাবে। এ কারণে তিনি (সা) নিষেধ করেছেন।

খ. নবী করীম (স) বার বার পেশাব করতে বা পানিতে পেশাব করার অভ্যাস বানাতে নিষেধ করেছেন।

৪. আহলে জাওয়াহের বলেন, পানিতে নাপাক পড়লে বা পেশাব পড়লে পানি অপবিত্র হবে না। চাই পানি কম হোক বা বেশী হোক। শাহওয়ালিউল্লাহ (র.) বলেন, ইবনে তাইমিয়্যা হাদীসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সহীহ নয়, কারণ হাদীসের অগ্রপশ্চাত এর বিপরীত। অপর দিকে স্বয়ং এই হাদীসের রাবী আবু হুরাইরা (রা) তাদের বক্তব্যের বিপরীত ফাতওয়া দিয়েছেন। কাজেই তাদের বক্তব্য বিশুদ্ধ নয়।

হাদীসটির গুরুত্ব ঃ এই হাদীসটি এমন গুরুত্বপূর্ণ যে, ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম যিনি ইমাম নাসায়ী এর উস্তাদ ছিলেন, যখন এ হাদীসকে বর্ণনা করতেন তখন এ হাদীসের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য একটি করে দিনার নিতেন

سوال : مَن السَّائِل عَن ماءِ البَحر ومَا نَشأ السوالُ عَن ماءِ البَحر؟

প্রশ্ন ঃ সমুদ্রের পানি সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তি কে? এবং সমুদ্রের পানি সম্পর্কে কেন প্রশ্ন করেছিলেন?

উত্তর ঃ প্রশ্নকারীর নাম ঃ এ ব্যাপারে তিনটি উক্তি রয়েছে- ১. তিনি হলেন মুদ্দইলিহী বা মুদলাযী গোত্রের আবদুল্লাহ বা উবায়দুল্লাহ কিংবা আবদ। ২. কেউ বলেন আবদুল্লাহ মুদাল্লাজি বা উবায়দুল্লাহ। ৩. কেউ কেউ তার নাম হুমাইদ ইবনে সখরা বলেছেন। (মুয়াত্তা)

সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কারণ ঃ এত বেশী পানি হওয়া সত্ত্বেও লোকটি কেন নদীর পবিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন? এ বিষয়ে আলিমগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছিলেন।

১. কারো মতে, নদীর পানি বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণের কারণে তার মূল অবস্থায় থাকে না। তার রং ও স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায় ফলে তাতে অযু জায়েয না হওয়ার সন্দেহের কারণে লোকটি প্রশ্ন করেছিল।

২. নদীতে অসংখ্য প্রাণী মারা যায়; আর মৃতরা তো অপবিত্র। তাই এ প্রশ্ন করেছিলেন।

৩. অথবা সমুদ্রে বিভিন্ন দিক হতে স্রোতে নাপাক পড়ে থাকে। তাই এ কারণে এ প্রশ্ন করেছেন।

৪. কিছু সংখ্যক উলামা বলেন, হাদীসে এসেছে যে, إنّ تحتَ البَحرِ نارًا فمَاءُ البحرِ مُختَلط بأثرِ الغضَب- তাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন।

৫. কারো কারো মতে, মূলত: নদীর পানি হলো হযরত নূহ (আ) এর তুফানের অবশিষ্ট পানি। তাও তো আল্লাহর গজবের চিহ্ন। তাই তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে কিনা এ সন্দেহ হওয়ার কারণে লোকটি প্রশ্ন করেছিলেন। (আনওয়ারুল মেশকাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬২, দরসে মেককাত ১৮৩-১৮৪)

সমুদ্রের পানির রং, স্বাদ এবং গন্ধ অন্য সব পানির মত নয়। তাই সাহাবাগণ ধারণা করেছেন যে, সমুদ্রের পানির গুণাগুন সাধারণ মত নয়। তাছাড়া সেখানে সামুদ্রিক প্রাণী মারা যায় এবং স্থলভাগের মৃত পশুও সেখানে নিক্ষিপ্ত হয়। এতে তা নাপাক হওয়ার ধারণা হতে পারে। অধিকন্তু নবী (স) ইরশাদ করেছেন হজ্জকারী এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীই সমুদ্র পৃষ্ঠে আরোহন করবে, কারণ পানির নিচে আগুন রয়েছে এবং আগুনের নিচে পানিই পানি রয়েছে। এ সকল কারণে তারা সমুদ্রের পানি দ্বারা অযুর বৈধতার ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাদের প্রশ্নের উত্তরে নবী (স) শুধু হ্যাঁ বলে সংক্ষেপে উত্তর দেননি। কারণ এতে শুধু অযুর বৈধতাই বুঝা যেত, বরং এর দ্বারা গোসল করা এবং নাপাকী পবিত্র করাও যে জায়েয, তা বুঝানোর জন্যই তিনি এভাবে উত্তর দিয়েছেন। রাসূল (স) তাঁর বুদ্ধিমত্তা দ্বারা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, যেমনিভাবে তারা সমুদ্র ভ্রমনের সময় সমুদ্রের পানি দ্বারা অযু করার মখুপেক্ষী হয়। তেমনিভাবে তারা তাদের খাবার শেষ হয়ে গেলে সমুদ্রের মৃত খাবারের মুখাপেক্ষী হবে। কাজেই তিনি অতিরিক্ত অংশ বাড়িয়ে বলেছেন। (শরহে আবু দাউদ পৃষ্ঠা নং ৩৭৭)

سوال : قوله الطهورُ ماءُه يُفِيدُ الحَصْرَ فمَا جَوابُكم عَنه؟

প্রশ্ন ঃ الطهور ماءُه **এটা হসর বা সীমাবদ্ধতার ফায়দা দেয়। এ ব্যাপারে তোমার জবাব কি?**

উত্তর ঃ হাদীসে الطهور ماءُه এ বাক্যের উভয় অংশ মা'রেফা আনার দ্বারা হসর বুঝা যায় কিন্তু এখানে হসর উদ্দেশ্য করা হয়নি। বরং এটা তাদের সন্দেহকে দূর করার জন্যে মুবালাগা হয়েছে। কেননা, মুবালাগা দ্বারাই সন্দেহ দূর হয়। (শরহে আবু দাউদ ৫৭৭ পৃষ্ঠা)

سوال : بيِّن سببَ الإطْنابِ في الجَوابِ موضِحًا ـ

প্রশ্ন ঃ প্রশ্নের জবাব দীর্ঘায়িত করার কারণ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ জবাব দীর্ঘায়িত করার কারণ ঃ রাসূল (স) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সাগরের পানি দ্বারা অজু করার অনুমতি আছে কি না? জবাবে তিনি হ্যাঁ বা না বললেই তো যথেষ্ট হতো, তথাপি هو الطهور ماءه এত দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করার হেতু কি? এর জবাবে বলা যায় যে, একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, প্রশ্নকারী তার প্রশ্নে অসুবিধা ও ঠেকার সময় সমুদ্রের পানি ব্যবহার করার অনুমতি আছে কিনা তা জানতে চেয়েছিলেন। যদি রাসূল (স) শুধু نعم বা হ্যাঁ. বলতেন; তখন প্রশ্নকারী মনে করতে পারতেন যে, কেবলমাত্র ঠেকার সময় তা ব্যবহার করা জায়েয

আছে, অন্য সময় জায়েয নেই। সুতরাং তার এ ধারণা দূর করে হুজুর (স) যে, জবাব দিয়েছেন তার অর্থ হলো, ঠেকা হোক বা না হোক, সমুদ্রের পানি সর্ব অবস্থায় পবিত্র। যে কোন সময় তা দ্বারা উযূ ও গোসল করা জায়েয আছে। (শরহে মিশকাত পৃষ্ঠা নং ৩৬২)

سوال : كان السوالُ عَن ماءِ البَحْرِ فلِمَ زادَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم والحِلُّ مَيْتَتُه؟

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল সমুদ্রের পানি সম্পর্কে (সমুদ্রের প্রাণী সম্পর্কে তার কোন জিজ্ঞাসা ছিল না) তাহলে নবী (স) والحِلّ مَيتتُه বাক্যটি কেন বৃদ্ধি করলেন?

উত্তর ঃ উত্তরে কথা বৃদ্ধিকরার কারণ ঃ রাসূল (স) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল সমুদ্রের পানি সম্পর্কে, সমুদ্রিক প্রাণী সম্পর্কে তার কোনো জিজ্ঞাসা ছিল না। কিন্তু নবী (স) উত্তরে একথাটি বৃদ্ধি করেন- والحِلّ ميتتُه তথা তার মৃত হালাল। আলিমগণ তার নিম্নরূপ জবাব প্রদান করেন-

১. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন যে, লোকটির প্রশ্ন দ্বারা জানা গেল যে, তারা সমুদ্রের পানির বিধান জানে না, ফলে রাসূল (সা) ধারণা করলেন যে, তারা সমুদ্রের শিকারের বৈধতাও জানে না। কেননা, আয়াতে আমভাবে বলা হয়েছে। حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ফলে তিনি জবাবে তা বাড়িয়ে বলেছেন।

২. مرقات الصعود গ্রন্থকার বলেন, প্রশ্নের দ্বারা যখন জানা গেল যে, মিঠা পানি শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তেমনি খাবারও শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য রাসূল (স) পানির পবিত্রতা বর্ণনার সাথে সাথে মাছের হালাল হওয়ার কথাও বলে দিয়েছেন।

৩. অথবা, পানির পবিত্রতা অতি মাশহুর হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা জানে না, তখন সমুদ্রের মৃত মাছের বিধান ও তাদের জানা থাকার কথা নয়। তাই রাসূল (স) একথাটিও বলে দিয়েছেন। (শরহে মিশকাত পৃষ্ঠা নং ৩৬২)

৪. এই অতিরিক্ত বাক্যটি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হল, তাঁদের প্রশ্নের মূল কারণের অবসান ঘটানো। অর্থাৎ যেখানে মৃত প্রাণী খাওয়া হালাল, সেখানে তো সাগরের পানি দিয়ে অযু করা নিঃসন্দেহে জায়েয। (তানজিমুল আশতাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৮০, দরসে মেশকাত ১৮৩-১৮৪)

৫. হুজুর (স) والحل ميتته বাক্যটি বাড়িয়েছেন অতিরিক্ত উপকারের জন্য। হুজুর (স) স্বীয় বুদ্ধিমত্তা দ্বারা বুঝতে পেরেছেন যে, তারা যখন তাদের খাদ্য শেষ হয়ে যাবে। তাদের সফরকালে মৃত মাছ খাওয়ার প্রতি মুহতাজ হবে। তাই তিনি এভাবে জবাব দিয়েছেন। (শরহে আবু দাউদ পৃষ্ঠা নং ৫৭৭)

سوال : ظاهِرُ قولِه صلعم "هُوَ الطهورُ ماءُه" يَدُلُّ على حصرِ الطهارةِ فِى ماءِ البحرِ ويلزَمُ منه اَن لّايكونَ ماءٌ غيرِ البحرِ طاهرًا وهو خلافُ الواقعِ عقلاً ونقلا فمَا الجوابُ عن هذه المُشْكِلة؟

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) এর বাণী هو الطهور ماءه এর দ্বারা বুঝা যায় শুধুমাত্র সমুদ্রের পানিই পবিত্র এবং দ্বারা সমুদ্রের পানি ব্যতিত অন্যসব পানির পবিত্র বুঝায় না। অথচ এটা বিবেকের বিরুদ্ধ কথা অযৌক্তিক। এ সমস্যার সমাধান কি?

উত্তর ঃ হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী সমুদ্রের পানি ব্যতিত অন্য পানির পবিত্রতার বিধান

এ হাদীসের ভাষ্য الطهور ماءه কে معرف باللام নেয়ার দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়, একমাত্র নদী ও সমুদ্রের পানিই পবিত্র; অন্য কোন পানি পবিত্র নয়। কেননা, আরবী ভাষায় الف لام টি সীমাবদ্ধতা বুঝায় এর জবাব হচ্ছে-

১. الطهور এর الف لام টি حصر তথা সীমাবদ্ধতার জন্যে নয়; বরং اهتمام شان তথা গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে আনা হয়েছে, যাতে তাদের মন থেকে সংশয় দূর হয়ে যায়।

২. শায়েখ আবদুল কাহের জুরজানী (র.) বলেন, মুবতাদার অবস্থা দৃঢ় করে বুঝানোর জন্যে খবরকে মারিফা আনা হয়েছে। যেমন-কুরআনের ভাষায় واولئك هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

৩. সমুদ্রের পানি পবিত্র হওয়ার দ্বারা অন্য পানির পবিত্রতাকে নিষেধ করে না। কেননা, কায়দা আছে- ذِكْرُ الشَّئِ لايَسْتَلزِمُ عدمَ شيٍ آخَر অর্থাৎ এক বস্তুর উল্লেখ অন্য বস্তুর অনস্তিত্বকে অনিবার্য করে না।

৪. সমুদ্রের পানিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করায় একথা মনে করার কারণ নেই যে, অন্য পানি নাপাক এবং পানির নির্দিষ্ট গুণাগুণ বজায় থাকলে যে কোন পানি পাক বলে বিবেচিত হবে। (শরহে নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১২৪)

سوال : ما حَدُّ السَّمَكِ وهَل بُرغوثُ البَحْرِ سَمكٌ ام لاَ؟

প্রশ্ন ঃ মাছের সংজ্ঞা কি? সমুদ্রের চিংড়ি প্রাণী মাছ কি না বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ মাছের পরিচয় ঃ ১. মাছ ঐ প্রাণীকে বলে যা মেরুদণ্ড বিশিষ্ট হয়, পানিতে বাসকরে এবং কর্ণের সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ করে।

২. মাছ হলো মেরুদণ্ড বিশিষ্ট প্রাণী, পানি ছাড়া তা জীবিত থাকতে পারে না এবং এটি চোয়াল দিয়ে শ্বাস নেয়।

চিংড়ি মাছ কি না এ ব্যাপারে এ ব্যাপারে ইমামগণের মতামত

১. ইমাম মালেকী ও শাফেয়ী (র) এর মতে তা মাছ এবং এর হালাল হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বিষয়টি নিয়ে বিশেষতঃ ভারতীয় উলামায়ে কিরামের মাঝে বিতর্ক রয়েছে।

২. ফাতওয়া হাম্মাদিয়া গ্রন্থকার ও অন্যান্য কোন কোন ফকীহ এটাকে মৎস বলতে অস্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয় গ্রুপের দলীল ঃ প্রাণী বিদ্যা বিশেষজ্ঞদের নিকট এ সম্পর্কে তাহকীক করা হলে তাদের সবাই চিংড়ি মাছ নয় বলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তাঁদের মতে মাছ হলো এরূপ মেরুদণ্ড বিশিষ্ট প্রাণী যেটি পানি ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না এবং এটি চোয়াল দিয়ে শ্বাস নেয়। এতে চিংড়ি প্রথম শর্ত দ্বারাই বাদ পড়ে যায়। কেননা, চিংড়ির কোন মেরুদণ্ড নেই।

খ. কোন কোন প্রাণী বিশেষজ্ঞ তো এটাকে পোকার অন্তর্ভুক্ত প্রাণী বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর পোকা ভক্ষণ করা জায়েয নেই।

গ. কেউ কেউ বলেন, উরফে চিংড়িকে মাছ হিসেবে গণ্য করা হয় না। কাজেই এটা মাছ নয়।

ঘ. যেহেতু মানুষের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে যে, চিংড়ি মাছ কি মাছ না; যদি মাছ বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে তা খাওয়া বৈধ হবে। আর যদি না হয় তাহলে তা খাওয়া বৈধ হবে না, এ ব্যাপারে উসূলে ফিকহ এর একটি মূলনীতি হলো যখন হালাল ও হারামের প্রমানাদি বিপরীতমুখী হয় সেখানে হালালের উপর হারামই প্রাধান্য পায়। কাজেই এখানেও হারামের প্রাধান্য হবে এবং তা খাওয়া বৈধ হবে না। কাজেই এ থেকে পরহেজ করা উচিৎ।

প্রথম দলের দলীল ঃ ক. তাদের প্রথম দলীল হলো ইজমা, আহলে লিসান, আহলে লুগাত ও জমুহুর সালফে সালেহীন ও খলফের ঐক্যমতে চিংড়ি মাছ। আর মাছ খাওয়া জায়েয। কাজেই এটা খাওয়া জায়েয হবে।

খ. ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ জাওহারী বলেন, বসরার চিংড়ি মাছ বলে জ্ঞান করা হয়। ইমামুল্লুগাত মুহাম্মদ মুরতাজা বলেন, চিংড়ি মাছের অন্তর্ভুক্ত। যেমন তিনি, বলেন, সাদা মাছ/ চিংড়ি মাছ, সাদা কাকড়ার অন্তর্ভুক্ত। আর সাদা কাকড়া যেহেতু খাওয়া বৈধ। তাই চিংড়ি খাওয়া ও বৈধ।

গ. দামীরী (র) হায়াতুল হাওয়ানে এটাকে ছোট মাছ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম জাহেযও এটাই বলেছেন।

গ. হযরত আশরাফ আলী থানভী ও হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরী মক্কী (র) এটাকে মাছ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে খাওয়াকে বৈধ বলেছেন।

ঘ. আল্লামা তাকী-উসমানী অনেক গবেষণার পর সর্বশেষে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন যে, চিংড়ি না খাওয়াই উত্তম। যেহেতু শরীয়তে উরফ বা প্রচলিত প্রথা ধর্তব্য। আর আমাদের দেশেও যেহেতু সবাই এটাকে মাছ হিসেবেই গণ্য করে। তাই চিংড়ি খাওয়া হালাল। এ অঞ্চলের সব আলিমই তিন ইমামের সাথে একমত পোষণ করে থাকেন।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

জুমহুর ফুকাহা বলেন, মাছের যে সংজ্ঞা তারা উল্লেখ করেছেন সেটা তো শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে নয় বরং সেই উক্তিটি হচ্ছে পশু বিশেষজ্ঞদের মতামত। সুতরাং তা ফুকাহা ও উলামাদের বিপরীতে হুজ্জত হতে পারে না। তাছাড়া তাদের সংজ্ঞা মতে পানির শূকর, কুকুরও মাছ হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। কারণ তা মেরুদণ্ড বিশিষ্ট সেগুলো অথচ কেউ এগুলোকে মাছের মধ্যে গণ্য করে না। সুতরাং তাদের সংজ্ঞাটি সঠিক নয়। জুমহুর ফুকাহা

এটাকে স্বীকার করেন না যে, চিংড়ি মাছকে উরফে মাছ বলা হয় না। বরং তাঁরা বলেন, চিংড়িকে মাছের মধ্যে উত্তম মাছ বলে গণ্য করা হয়। অপরদিকে উরফেও এটা স্বাদের মাছ হিসাবে সুপরিচিত। আর তারা যে বলেন, হারাম হালালে দ্বন্দের সময় হারামের দিকটিই প্রাধান্য পায়– এর উত্তরে আমরা বলব হারামের জন্য অকাট্য দলীলের প্রয়োজন। আর এখানে হারামের কোন অকাট্য দলীল নেই। কাজেই এটা হারাম হতে পারে না। (ফাতহুল মুলহিম তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৫১৪-৫১৩)

سوال : مَا الاِختِلافُ فِى غَيرِ السَّمكِ مِن الحَيَوانَاتِ البَحْرِيَة؟ اجب مُدلّلاً مُرَجّحًا .

প্রশ্ন ঃ মাছ ব্যতীত সামুদ্রিক অন্যান্য প্রাণীর হুকুম কি? অগ্রগণ্য মাযহাবটি বর্ণনা করে দলীল ভিত্তিক জবাব দাও।

او – سوال : هل يَحِلُّ جميعُ مَافِى البَحْرِ مِنَ الحَيوانِ؟ أُذكر آراءَ العُلَماءِ فِيه

প্রশ্ন ঃ সমুদ্রের সকল প্রাণীই কি হালাল? এ সম্পর্কে আলেমদের মতামত উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ সমুদ্রের প্রাণী নিয়ে ইমামদের মতবিরোধ

১. ইমাম মালেক (র) বলেন, সামুদ্রিক শুকর ব্যতীত সমুদ্রের সকল প্রাণীই হালাল।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, মাছ ছাড়া সমুদ্রের সকল প্রাণীই হারাম।

৩. ইবনে আবী লায়লা, মুজাহিদ ও সুফিয়ান সাওরীর মতে সমুদ্রের সকল প্রাণী হালাল।

৪. ইমাম শাফেয়ী (র) থেকে এ ব্যাপারে ৪টি মতামত রয়েছে–

ক. মাছ ব্যতীত সমুদ্রের অন্য প্রাণী হারাম। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর বক্তব্যের অনুরূপ।

খ. স্থলভাগের যে সকল প্রাণী হালাল, জলভাগেরও ঐ সকল প্রাণী হালাল। যেমন সামুদ্রিক গরু হালাল। আর স্থলভাগের যে সকল প্রাণী খাওয়া হারাম, জলভাগের ঐ সকল প্রাণী খাওয়াও হারাম। যেমন সামুদ্রিক শূকর, কুকুর। আর যে সকল প্রাণী জলে বাস করে কিন্তু স্থলে এর নযীর নেই সেগুলোও হালাল।

গ. ব্যাঙ, কুমির, কচ্ছপ, সামুদ্রিক শূকর ও কুকুর এই পাঁচ প্রকার প্রাণী ব্যতীত সমুদ্রের অন্য সব প্রাণী খাওয়া হালাল। এটাই ইমাম আহমদ (র) এর অভিমত।

ঘ. ব্যাঙ ব্যতীত সামুদ্রিক অন্য সব প্রাণী হালাল। আল্লামা ইমাম নববী (র) বলেন, এই সর্ব শেষ উক্তির উপরই শাফেয়ী মাযহাবের ফাতওয়া। (বজলুল মাজহুদ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ঃ ৫৪)

ইবনে আবী লায়লার দলীল ঃ রাসূল (স) বলেছেন وَالحِلُّ مَيْتَتُه, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সামুদ্রিক সকল প্রাণী খাওয়া বৈধ।

ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র) এর দলীল ঃ ১. আল্লাহর তাআলার বাণী– أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

অর্থাৎ তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও খাদ্য হালাল করা হয়েছে, (সূরা মায়েদাহ ঃ ৯৬) এখানে صيد হলো মাসদার, যা مفعول অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যাকে শিকার করা যায়। ফলে সব রকম জীব এর মধ্যে শামিল হয়ে গেছে। অথবা আয়াতে বিষয়টি ব্যাপকভাবে বলার দ্বারা বুঝা যায় যে, সমুদ্রের সকল শিকার ভক্ষণ করা জায়েয।

দলীল-২

قَالَ رَسُولُ اللّٰه صلعم هُوَ الطَّهُورُ مَائُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُه (ترمذي ص ٢١ ، نسائى ص ٢١ ، ابن ماجه ص ٢٣ . ٤١)

রাসূল (স) বলেন, সাগরের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী হালাল। আলোচ্য হাদীসেও আমভাবে (ব্যাপকভাবে) সমস্ত মৃত প্রাণী খাওয়ার বৈধতার প্রমাণ মিলে। কেননা, হাদীসে কোন কিছুকে খাস করা হয়নি।

দলীল-৩. তাদের তৃতীয় দলীল হলো হযরত জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস–

...... فَالْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ (بخارى ص ٦٢٦-٦٢٥)

অর্থাৎ ..... অতঃপর সমুদ্র আমাদের জন্য একটি প্রাণী নিক্ষেপ করল, যাকে আম্বর বলা হয়। আমরা এটি থেকে অর্ধমাস ভক্ষণ করেছি। এই রেওয়ায়েতের মধ্যে دابة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এর দ্বারা বুঝা যায় আম্বর একটি সামুদ্রিক প্রাণী ছিল। মাছ ছিল না এবং সাহাবায়ে কিরাম তা আহার করেছেন। প্রমাণিত হলো যে, মাছ ছাড়া অন্যান্য

প্রাণীও ভক্ষণ করা হালাল। উক্ত দলিলগুলোর সাথে ইমাম মালেক (র) নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও দলীল পেশ করেন–

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

অর্থাৎ তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত (বাক্বারা ঃ ১৭৩)

উল্লিখিত আয়াতে শূকরের গোশতের ব্যাপকতার কারণে সামুদ্রিক শূকরকেও হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী ব্যাঙ মারার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে ব্যাঙকে হালাল থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করেছেন। (দরসে তিরমিযী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং-২৮০)

ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত ঃ ইমাম আবু হানীফা, ইসহাক ও সুফিয়ান সাওরী (র) এর মতে, পানিতে বসবাসরত প্রাণীদের মধ্যে মাছ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী খাওয়া জায়েয নেই।

(বজলুল মাজহুদ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৫৪, তানযীমুল আশতাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৮১)

হানাফীদের দলীল ঃ হানাফীদের প্রথম দলীল– انما حرم عليكم الميتة

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর মৃত জীব হারাম করেছেন। (বাক্বারা-১৭৩) এতে বুঝা যায় যে, প্রতিটি মৃত জন্তু হারাম, চাই তা স্থলের হোক কিংবা জলের হোক, তবে মৃত মাছের বৈধতার ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষ্য থাকার কারণে তার হুকুম ব্যতিক্রম হয়েছে।

হানাফীদের দ্বিতীয় দলীল ঃ হানীদের দ্বিতীয় দলীল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী– وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ অর্থ- তিনি তাদের উপর যাবতীয় অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন।

তৃতীয় দলিল ঃ হানাফীদের তৃতীয় দলীল হলো রাসূল (স) এর বাণী–

عن عبد الله بن عمرَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال أُحِلَّتْ لَنا مَيْتَتانِ ودَمانِ فامّا الْمَيْتَتانِ فَالحُوتُ والجَرادُ امّا الدّمان فَالكَبِدُ والطِّحالُ.

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত– রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, আমাদের জন্য দুটি মৃত বস্তু এবং দুটি রক্ত পিণ্ড হালাল করা হয়েছে। মৃত প্রাণী দুটি হলো মাছ ও পঙ্গপাল, আর দুটি রক্ত পিণ্ড হলো কলিজা, প্লিহা। এর দ্বারাও স্পষ্টভাবে বুঝা গেলো যে, মৃত মাছ এবং পঙ্গপাল ব্যতীত আর কোনো মৃত প্রাণী হালাল নয়।

চতুর্থ দলীল ঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলীল হল, নবী করীম (স) এর সারা জীবনের আমল। তিনি এবং তৎপরবর্তী সাহাবায়ে কিরাম থেকে মাছ ছাড়া অন্য কোন সামুদ্রিক প্রাণী ভক্ষণ করেছেন বলে প্রমাণিত নেই। যদি এ প্রাণীগুলো হালাল হত তবে তিনি কোন না কোন সময় বৈধতার বিবরণের জন্য হলেও অবশ্যই তা খেতেন, যেহেতু তিনি খাননি, তাই সেগুলো হালাল হবে না।

পঞ্চম দলীল ঃ

١. سُئِلَ النبيّ صلى الله عليه وسلم عَن الضِّفدَعِ فقال خَبِيْثَةٌ مِّنَ الخَبائِث

٢. انّه سُئِلَ عَنِ الضفدعِ يُجْعَلُ شَحْمُهُ فِى الدَّواءِ. فَنَهَى النَّبِيُّ صلعم عَن قتلِه وذلك نهيٌ عَنْ اَكلِه.

(দরসে তিরমিযী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৮০)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

ইমাম মালেক (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীলের উত্তরে আমরা বলব যে, উল্লেখিত আয়াতে الصيد তথা শিকারকৃত প্রাণী দ্বারা, এখানে সকল শিকারকৃত প্রাণী উদ্দেশ্য নয়। বরং নির্দিষ্ট তথা শিকারকৃত মৎস উদ্দেশ্য। তদ্রূপ এ হাদীসের দ্বিতীয় অংশে والحل ميتته, তার মৃত হালাল দ্বারা সকল মৃতকে বুঝানো হয়নি। বরং নির্দিষ্ট তথা মৎসকে বুঝানো হয়েছে। আর যদি সকল মৃত উদ্দেশ্য নেয়া হয় তবে হালাল অর্থ পবিত্র ধরা হবে।

বিষয়টিকে এভাবেও বলা যেতে পারে الحل ميتته এর দলীলটি যদিও আম; কিন্তু অন্য হাদীসের দ্বারা তা খাস হয়ে গেছে। যেমন– أُحِلَّتْ لَنا مَيْتَتانِ السَّمكُ والجَراد ফলে মাছ ব্যতীত প্রাণীর সকল জীব বের হয়েগেছে। মোটকথা হল, হানাফীদের মতে, আয়াত ৩টির অর্থ হবে, তোমাদের (মুহরিমের) জন্য সমুদ্রের প্রাণী শিকার করা হালাল, আর ইমামত্রয় আয়াতটির অর্থ করেন, তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার প্রাণী (যে কোন প্রকার) ভক্ষণ করা

হারাম, অথচ আয়াতটির পূর্বাপর বর্ণনা প্রসঙ্গ লক্ষ্য করলে হানাফীদের গৃহীত অর্থ মেনে নিতে হয়। কেননা, আলোচনা চলছে মুহরিম ব্যক্তির জন্য কোন কোন কাজ করা বৈধ, আর কোন কোনটি বৈধ নয় সে সম্পর্কে। সুতরাং উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হলো শুধু একথা বলা যে, মুহরিম ব্যক্তির জন্য সমুদ্রের প্রাণী শিকার করা হালাল তথা জায়েয। এর দ্বারা যে কোন প্রকার প্রাণী খাওয়া যে হালাল তা প্রমাণিত করে না। (হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ পৃষ্ঠা নং ৫৫)

আর আম্বর ভক্ষণ হালাল হওয়ার ব্যাপারে উত্তরে আমরা বলব যে, আম্বর হলো মাছ। যেমন বুখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে সমুদ্র একটি মৃত মাছ ফেলে দিল। এতে প্রমাণিত হলো যে, হাদীসে উল্লেখিত আম্বর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাছ। কাজেই এ হাদীস দ্বারা মাছ ব্যতীত অন্য প্রাণীর বৈধতার ব্যাপারে দলীল উপস্থাপন করা যাবে না। আল্লামা শায়খুল হিন্দ (র) বলেন, যদি সম্বন্ধ পদটি (اضافت) সমস্ত সংখ্যা (استغراق) বুঝানোর জন্য মেনে নেয়া হয়। তাহলে বলল الحل। শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য বৈধতা নয়; বরং পবিত্রতা উদ্দেশ্য। সুতরাং নবী করীম (স) এর বাণী الحل। ميتته এর অর্থ হবে, সমুদ্রের মৃত প্রাণীগুলো পবিত্র থাকে।

(শরহে আবু দাউদ ৫৭৯-শরহে মিশকাত পৃষ্ঠা নং ৬৬৩, দরসে মিশকাত প্রথম খণ্ড ১৮৪-১৮৫, দরসে তিরমিযী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৮১-২৮২)

سوال : ما هو حكمُ السَّمك الطَّافِي؟

প্রশ্ন ঃ ভাসমান মাছের বিধান কি?

উত্তর ঃ سمك طافى এর অর্থ ঃ طافى শব্দের অর্থ ভাসমান। আর سمك অর্থ মাছ, পূর্ণটার অর্থ ভাসমান মাছ। সুতরাং যে মাছ পানিতে বহিরাগত কোন কারণ ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে মরে পেট উল্টে ভেসে ওঠে তাকে سمك طافى বলা হয়।

ভাসমান মাছের বিধান ঃ ভাসমান মাছ খাওয়া বৈধ কি না এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে–

১. ইমাম মালেক, শাফেয়ী, ও আহমদ (র) এর মতে, এরূপ মাছ খাওয়া হালাল।

২. ইমাম আবু হানীফা, ইব্রাহীম নাখয়ী, শাবী, তাউস, সাইদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র), হযরত আলী, ইবনে আব্বাস এবং জাবির (রা) এর মতের এরূপ মাছ খাওয়া হালাল নয়।

ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র) এর দলীল ঃ ১. হলো রাসূলের হাদীস–

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هو الطهُورُ مَائُه والحِلّ ميتتُه (ترمذى ٢١، نسائى ٢١)

রাসূল (স) বলেন, সাগরের পানি পবিত্র এবং এর মুরদার হালাল, আলোচ্য হাদীসে মৃত দ্বারা জবাই বিহীন মৃত উদ্দেশ্য। কাজেই বুঝা গেলো হাদীসে سمك طافى খাওয়ার বৈধতার হুকুম দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় দলীল ঃ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে–

... فَالقىٰ لنا البَحرُ دابَّةً يقال له العنبرُ فاكلنا منه نِصْف شهرٍ (بخارى ص ٦٢٥-٤٢٦)

অর্থাৎ অতঃপর সমুদ্র আমাদের জন্য একটি প্রাণী নিক্ষেপ করল, যাকে আম্বর বলা হয়। আমরা এটি থেকে অর্ধেক মাছ ভক্ষণ করেছি। আলোচ্য হাদীসে সাহাবায়ে কিরাম এটিকে পেয়েছিল মৃত অবস্থায়। তা সত্ত্বেও তাঁরা এটাকে অর্ধমাস পর্যন্ত খেতে থাকেন। এর দ্বারাও বুঝা যায় سمك طافى খাওয়া হালাল।

তৃতীয় দলীল ঃ তৃতীয় দলীল হলো হযরত আবু বকর (রা) এর একটি উক্তি। সুনানে বায়হাকী ও দারাকুতনীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তা বর্ণিত হয়েছে– ان ابابكر (رض) أَبَاحَ السَّمك الطافِي

এতে মরে ভেসে ওঠা মাছকে হালাল সাব্যস্ত করা হয়েছে। (মা'আরিফুস সুনান প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৫৭)

হানাফী মাযহাবের দলীল

عن جابر (رض) قال قالَ رسولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم ما القى البحرُ اوجزَر عنه فكُلُوه ومامَات فيه وَطَفَا فَلا تأكُلوه (ابوداود. ج ٢ ص ٣٤ ٥ ابن ماجه ٢٤١)

হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, সমুদ্র যে প্রাণী নিক্ষেপ করে অথবা সমুদ্রে ভাটা লাগার কারণে চরে আটকে পড়ে তোমরা তা ভক্ষণ কর। আর যা পানিতে ভেসে উঠে তা ভক্ষণ করো না। আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (সা) سمك طافى খেতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং বুঝা গেলো سمك طافى খাওয়া বৈধ নয়।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

প্রথম দলীলের জবাব الحِلُّ مَيْتَتُه থেকে হাদীসের মাধ্যমে سمك طافى কে বাদ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়, الحل ميتته দ্বারা জবাই বিহীন জন্তু বুঝানো হয়নি; বরং এমন জন্তু বুঝানো হয়েছে, যার রক্ত প্রবাহিত হয়নি।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব ঃ আম্বর সংক্রান্ত হাদীসের উত্তর হল, এটা মরে ভেসে ওঠা মাছ বলে সুস্পষ্ট বিবরণ নেই। طافى শুধু সে মাছকে বলে, যেটি কোন বাহ্যিক কারণ ব্যতীত নিজে নিজে পানিতে মরে ভেসে উঠে। পক্ষান্তরে যদি কোন মাছ কোন বাহ্যিক কারণে যেমন প্রচণ্ড গরম ও শৈত্যপ্রবাহে বা ঢেউ তরঙ্গের কারণে অথবা তীরে উঠার পর পানি সরে যাওয়ার কারণে মরে যায়, তবে সেটি طافى নয়, এটা খাওয়া হালাল। আম্বর সংক্রান্ত হাদীসেও সংশ্লিষ্ট মাছটি পানি থেকে তীরে উঠে আসার কারণে মরে গিয়েছিল বলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। অতএব, এ মাছটি হালাল হওয়া সম্পর্কে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

তৃতীয় দলীলের জবাব ঃ আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর আছরের উত্তরে বলা যায়– প্রথমত ঃ এতে প্রচণ্ড ইযতিরাব রয়েছে। দ্বিতীয়ত: যদি এটাকে সুত্রগতভাবে সহীহও মেনে নেয়া হয় তবুও এটি একজন সাহাবীর ইজতেহাদ হতে পারে যা মারফু হাদীসের বিপরীতে প্রমাণ গণ্য হতে পারে না। তৃতীয়ত: এটাও হতে পারে যে, এখানে মৃত মাছ দ্বারা এমন মাছ বুঝানো হয়েছে যেটি বাহ্যিক কারণে মারা গেছে।

(শরহে নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১২৮, হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ পৃষ্ঠা নং ৫৭)

سوال : قوله صلى الله عليه وسلم والحِلّ مَيْتَتُه " يَدُلُّ بِعُمومِه على أنّ جَمِيعَ مَيتاتِ البَحْرِ حلال حتّى الخبائث والله سبحانه يقولُ " يُحَرِّمُ عليهم الخبائث " فكيفَ التوفيقُ؟

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) এর বাণী والحل ميتته দ্বারা বুঝা যায় সমুদ্রের সকল নিকৃষ্ট ও মৃত প্রাণী বৈধ। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমাদের জন্যে নিকৃষ্টগুলো হারাম করা হয়েছে। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মধ্যকার বৈপরীত্যের সমাধান কি?

উত্তর ঃ আয়াত ও হাদীসের মধ্যকার বৈপরীত্যের সমাধান ঃ রাসূল (স) এর বাণী والحل ميتته দ্বারা বুঝা যায়, নদী ও সমুদ্রের সকল মৃত প্রাণী হালাল, এমনকি নদীর মধ্যে যেসব خبائث তথা অপবিত্র প্রাণী বাস করে। সেগুলো মারা গেলে তাও হালাল, অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন– وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

এই আয়াত ও হাদীসের মধ্যে যে বৈপরীত্য দেখা যায়। তার সমাধান নিম্নরূপ–

১. والحِلّ مَيْتَتُه এর মধ্যে ميتته দ্বারা মাছ উদ্দেশ্য, তাই حيوانات خبائث হালালের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

২. الحِلّ مَيْتَتُه এটা বাহ্যত ব্যাপক দেখা গেলেও ব্যাপকতার দাবি রাখে না। কেননা, হারাম প্রাণী আলোচনার বাইরে। তাই সেগুলো এর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

৩. হালাল বলে যা খাওয়ার যোগ্য সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য প্রাণী বুঝানো হয়নি।

৪. সমুদ্র হলো এমন স্থান, যাতে মানুষ মৎস্য শিকার করে; অন্য প্রাণী নয়, তাই মৃত প্রাণীর বিষয়ে আলোচনা বলতে মাছের কথা বুঝানোই যুক্তি সঙ্গত। (শরহে নাসায়ী- পৃষ্ঠা নং ঃ ১২৭)

জ্ঞাতব্য ঃ قوله مِن بَنِى عَبْدِ الدَّار ... ঃ আলোচ্য হাদীসের রাবী মুগীরা ইবনে আবী বুরদা বণী আব্দুদ্দারের লোক ছিলেন। আর আবদুদদার কুরাইশের একটি কবিলার নাম, যা عبد الدار بن قُصَى بنِ كلاب بنِ مُرّة এর সম্বন্ধযুক্ত। উক্ত গোত্রের দিকে কাউকে নিসবত করে আবদদারী বলা হয়।

قوله اخبره ঃ ، সর্বনামটি সাঈদ ইবনে সালামার দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ মুগীরা সাঈদ ইবনে সালামার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুগীরা সাঈদ ইবনে সালামাকে সংবাদ দিয়েছে।

قوله انه ঃ "ه" সর্বনামটি মুগীরা ইবনে আবী বুরদার দিকে ফিরেছে। ইমাম নাসায়ী (র) ও ইবনে হিব্বান (র) সহ অন্যান্য উলামা তাকে সিকা সাব্যস্ত করেছেন

بَابُ الْوُضُوْءِ بِالثَّلْجِ

٦٠. اخبرنا عليُّ بْنُ حجرٍ قال حدّثنا جريرٌ عن عُمارةَ بن القعقاعِ عن ابى زُرْعَةَ بْنِ عمرِو بْنِ جريرٍ عنْ ابى هريرةَ رضى الله عنه قال كانَ رسولُ الله ﷺ اذا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً فقلتُ بِاَبِى انتَ واُمِّى يا رسولَ الله ما تقولُ فِى سُكوتِك بينَ التَّكبير والقِراءة قال اقولُ اَللّٰهم بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خطايَاىَ كما بَاعدتَّ بَيْنَ المَشرقِ وَالمَغرِبِ اَللّٰهمّ نَقِّنِى مِنْ خطاياىَ كما يُنقَّى الثوبُ الاَبيَضُ مِن الدَّنسِ اللّٰهم اغْسِلْنِى مِن خطاياىَ بالثَّلْجِ والمَاءِ والبَرَدِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ বরফ দ্বারা উযূ করা

অনুবাদ ঃ ৬০. আলী ইবনে হুজর (র) ....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সালাত আরম্ভ করার পর অল্পক্ষণ নীরব থাকতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক; তকবীর ও কিরাআতের মধ্যবর্তী নীরবতার সময় আপনি কি পড়েন? তিনি বলেন, আমি তখন পড়ি– اَللّٰهم بَاعِد بَيْنِى وبَيْنَ خطايَاىَ كما بَاعدتَّ بَيْنَ المَشرِق والمَغرِبِ اَللّٰهم نَقِّنِى مِن خطاياىَ كما يُنقَّى الثوبُ الاَبيَضُ مِنَ الدَّنسِ اللّٰهم اغسِلنِى مِنْ خطاياىَ بِالثَّلجِ والمَاءِ والبَرَدِ "হে আল্লাহ! পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে আপনি যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন তেমনি আমার ও আমার অপরাধসমূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ থেকে আমাকে পবিত্র করুন যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহকে ধৌত করে দিন বরফ, পানি এবং শিলার পানি দ্বারা।"

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) তাকবীরের পর এবং কিরাতের পূর্বে উল্লেখিত দুয়াটি পড়তেন, উক্ত দুআর মধ্যে হুজুর (স) তিনটি বাক্য ব্যবহার করছেন। আর এই তিনটি বাক্যকে তাসিস স্বরূপ এনেছেন বাক্যের মাঝে নতুনত্ব সৃষ্টি করার জন্যে। কারণ বাক্যগুলোর মাফহুম প্রায় একই। কেননা تنقيه (পরিশোধন/পবিত্র করণ) টা مُباعدت (দুরত্ব সৃষ্টি করার) থেকে اخص, তদ্রূপ غسل (ধৌত করণ) আরো خاص - বস্তুত: এ তিনটি বাক্য ব্যবহার করেছেন তিনটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য مباعدت দ্বারা ঐ সমস্ত গোনাহ থেকে মুক্ত রাখার আবেদন করেছেন যা এখন সংঘঠিত হয়নি। আর تنقيه দ্বারা ঐ সকল গোনাহ ক্ষমা করার জন্য দরখস্ত করেছেন যা বর্তমানে সংঘঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে। আর غسل শব্দের দ্বারা অতিতের গোনাহ এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। মোটকথা غسل শব্দ দ্বারা অতীতের গোনাহ, تنقيه দ্বারা বর্তমানের গোনাহ এবং مباعدت দ্বারা ভবিষ্যতের গোনাহ এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। রাসূল (স) বিভিন্ন ধরনের শব্দ প্রয়োগ করে গোনাহের বিভিন্ন স্তরের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অথচ প্রত্যেকটা (পবিত্রতা করার মাধ্যমে) এমন যে, একটি দ্বারাই পূর্ণ পবিত্রতা হাসেল করা সম্ভব। অথবা, রাসূল (স) বিভিন্ন ধরণের শব্দ প্রয়োগ করে মাগফেরাতের (ক্ষমার) বিভিন্ন প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ হে আল্লাহ! পর্যায়ক্রমে আমাকে সর্ব প্রকারের গোণাহ থেকে মুক্ত রাখো। এখানে প্রকৃত ধৌতকরণ উদ্দেশ্য নয়।

আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন, বাস্তাবিক পক্ষে ধৌত করার বিভিন্ন آلَا (উপকরণ) উল্লেখ করেছেন, এটা উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো استعارة এর ভিত্তিতে সমস্ত গোনাহকে মিটিয়ে দিয়ে গোনাহ থেকে পবিত্র করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা। আল্লামা তীবী (র) বলেন, ماء এর পর ثلج অতঃপর برد এর উল্লেখ করেছেন সজ্ঞাত গোনাহ ক্ষমা করার পর বিভিন্ন ধরণের রহমত ও মাগফেরাতের মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি করার জন্য। যাতে করে আল্লাহ তাআলা গোনাহ এর আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপ নিভানোর জন্য মাধ্যম হয়ে যান। কতক ব্যাখ্যাকার বলেন, গোনাহ যেহেতু জাহান্নামের সবাব। এ কারণে গোণাহকে জাহান্নামের স্তরে গণ্য করে তার উত্তাপ কে নিভায়ে একেবারে ঠাণ্ডা করে দেয়ার জন্য غسل بالبردات এর কথা বলেছেন। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, আর তা হলো,

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) তো সর্ব প্রকারের গোণাহ থেকে মুক্ত ছিলেন তাহলে তাঁর এ তওবা ও ইস্তিগফার করার দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ ১. হুজুর তো সমস্ত গোণাহ থেকে মাছুম ছিলেন তা সত্ত্বেও তাওবা বা ইস্তিগফার করার দ্বারা উম্মতের তালিম দেয়া উদ্দেশ্য যে, কিভাবে তারা তাদের গোণাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

২. নবী করীম (স) তওবা ও ইস্তিগফার এই জন্য করতেন না যে, তিনি (স) গোনাহে জড়িত হয়েছেন বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার মহান সত্তাকে নিজের অন্তরে হাজির রেখে নিজেকে ছোট মনে করতেন এবং না জানি তার শানেই খেলাপি আচরণ প্রকাশ পায় এ ভয়ে তওবা ও ইস্তিগফার করতেন।

৩. আল্লাহ তাআলার নিকট আরো অধিক প্রিয় হওয়ার জন্য তওবা ও ইস্তিগফার করতেন।

৪. মহা মর্যাদাবান অমুখাপেক্ষী প্রভূর সামনে নিজের ইসমত ও বারাআতকে হাজির হতে দিতেন না। কারণ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, আর তার সকল সৃষ্টি জীব মুখাপেক্ষী। এ কারণে তিনি তওবা ও ইস্তিগফার করতেন।

৫. আমলের মধ্যে ত্রুটি হওয়ার ভয়ে তওবা ইস্তিগফার করতেন।

আলোচ্য হাদীস থেকে ইমাম নাসায়ী (র) যে মাসআলা ইস্তিম্বাত করেছেন

ইমাম নাসায়ী (র) আলোচ্য হাদীস থেকে একটি মাসআলা ইস্তিম্বাত করেছেন। আর তা হলো গরম পানির তুলনায় ঠান্ডা পানি দ্বারা অযু করা উত্তম। কারণ হল, অযু ও নামায দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গোনাহের অগ্নিকে নিভানো।

এ হাদীস থেকে মাসআলা ইস্তিম্বাত হলো

রাসূল (স) এর দোয়া اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ আলোচ্য দোয়ার মধ্যে দু'টি জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১. প্রথম, গোনাহের নাপাকীর দিকে সেটাকে ধোয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দরখাস্ত করেছেন। কারণ অপবিত্র বস্তুই ধৌত করা হয়, পবিত্র বস্তু নয়।

২. দ্বিতীয়ত, গোনাহের উত্তাপকে বরফ দ্বারা ঠাণ্ডা করার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। গোনাহের মধ্যে যদি শুধু নাপাকী থাকতো এবং উত্তাপ না থাকতো তাহলে নবী করীম (স) বরফের কথা উল্লেখ করতেন না। বরং শুধুমাত্র গোণাহ ক্ষমা করার জন্য দোয়া করতেন। কিন্তু যেহেতু গোনাহের মধ্যে নাজাসাত থাকার সাথে সাথে হারারাত তথা উত্তাপও আছে এ কারণে নবী (স) সে উত্তাপকে নিভানোর জন্য বরফের কথা উল্লেখ করেছেন। মোটকথা, নবী (স) এর পানি ও বরফ দ্বারা গোনাহ থেকে পবিত্র করার দোয়া করাই এ কথার প্রমাণ যে, গোনাহে নাপাকীর সাথে সাথে উত্তাপও আছে। কাজেই গোণাহ থেকে পবিত্র করার জন্য পানির কথা বলেছেন, আর তার উত্তাপকে নিভানোর জন্য বরফের কথা বলেছেন, এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, গরম পানি দ্বারা যদিও গোনাহের নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া যায়। কিন্তু তার উত্তাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। কাজেই গরম পানির তুলনায় ঠাণ্ডা পানি দ্বারা উযূ করা উত্তম। ইদ্রিস কান্দলভী (র) এমনই বলেছেন।

الوُضُوْءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ

٦١. اَخْبَرَنَا اسحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اخبرنا جريرٌ عَنْ هشامِ بْنِ عُرْوَةَ عن ابيهِ عَنْ عائشةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الابيضَ مِنَ الدَّنَسِ -

بَابُ الْوُضُوْءِ بِمَاءِ الْبَرَدِ

٦٢. اخبرنا هارونُ بن عبدِ اللّٰهِ قال حدّثنا معنٌ قال حدّثنا معاويةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حبيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قال شَهِدْتُ عوفَ بْنَ مَالِكٍ يقولُ سَمِعْتُ رسولَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي عَلٰى مَيِّتٍ فَسَمِعْتُ مِنْ دُعَائِهِ وهُوَ يقولُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ واَكْرِمْ لَهُ نُزُلَهُ وَاَوْسِعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ والثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ -

বরফের পানি দ্বারা উযূ করা

অনুবাদ ঃ ৬১. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)............আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) পড়তেন– .... اللهم اغسل خطاياى

অর্থ "হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ বরফের পানি এবং বৃষ্টির ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধৌত করে দিন, আমার অন্তরকে গুনাহ্সমূহ থেকে পবিত্র করে দিন যেমন আপনি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পবিত্র করেছেন।"

অনুচ্ছেদ ঃ শিলার পানি দ্বারা উযূ

৬২. হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)...........যুবায়ের ইবনে নুফায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আউফ ইবনে মালিক (রা)-এর নিকট গমন করি। তখন তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এক মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাতের সময় যে দোয়া পড়েছিলেন আমি তা শুনেছি। তিনি পড়েছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ...

অর্থ "হে আল্লাহ! আপনি তাকে মাফ করে দিন এবং তার উপর রহম করুন। তাকে আরাম দিন এবং ক্ষমা করুন। তার মঞ্জিলগুলোকে সুগম করে দিন। তার কবর প্রশস্ত করুন এবং তাকে পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করুন। তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করুন যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়।"

সংশ্লিষ্ট ও প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

শিরোনামের অধীনে বর্ণিত হাদীসের শব্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রথম শিরোনামে ماء এর কয়েদ উল্লেখ করেননি। অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিরোনামের অধীনে তা উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় বরফের কথা উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার দ্বারাও যে, উযূ বৈধ এটাকে প্রমাণ করা। আলোচ্য শিরোনামের আওতারে হাদীসের মধ্যে যে, মৃত ব্যক্তির বপর দোয়া পড়ার কথা বর্ণিত আছে, এটা তৃতীয় তাকবীরের পর ক্ষীণ স্বরে পড়তে হবে এবং নিম্ন আওয়াজে আস্তে পড়াই মুস্তাহাব। যেমনটা ফিকহর কিতাবে লেখা আছে। আর হুজুর যে উচ্চ আওয়াজে পড়েছেন তা হলো শিক্ষা দেয়ার জন্য।

سُؤْرُ الْكَلْبِ

٦٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ -

٦٤. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ اَنَّ ثَابِتًا مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ -

٦٥. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ هِلَالُ بْنُ اُسَامَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

কুকুরের উচ্ছিষ্টের বর্ণনা

অনুবাদ ঃ ৬৩. কুতায়বা (র).........হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যদি তোমাদের কারো পাত্র থেকে কুকুর পান করে (মুখ দেয়) তাহলে সে যেন তার পাত্রটি সাতবার ধৌত করে।

৬৪. ইবরাহীম ইবনে হাসান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ বরেছেন, তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয় তাহলে সে যেন পাত্রটি সাতবার ধুয়ে ফেলে।

৬৫. ইবরাহীম ইবনে হাসান (র).........আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট ও প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : مَا الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ فِىْ حُكْمِ سُؤْرِ الْكَلْبِ وَكَيْفِيَّةِ تَطْهِيْرِهٖ؟

প্রশ্ন ঃ কুকুরের উচ্ছিষ্ট বা ঝুটার ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য কি এবং তা পবিত্র করার পদ্ধতি কি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ কুকুরের ঝুটা পবিত্র কি পবিত্র না, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. ইমাম মালেক (র) ও ইমাম বুখারী (র) এর নিকট কুকুরের ঝুটা পাক।

২. জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে কুকুরের ঝুটা নাপাক।

ইমাম মালেক (র) এর দলীল ঃ ইমাম মালেক (র) এর প্রথম দলীল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী–

قُلْ مَا اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً

অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলে দিন, যা কিছু বিধান আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে এসেছে তার মধ্যে আমি কোনো

আহারকারীর জন্য হারাম খাদ্য পাই না কিন্তু মৃত জন্তু অথবা প্রবাহিত রক্ত কিংবা শূকরের মাংস। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গকৃত জন্তু। এ আয়াতে হারাম বস্তুসমূহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এতে কুকুরের উচ্ছিষ্ট উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় দলীল : তাদের দ্বিতীয় দলীল হলো আল্লাহ তাআলার অপর একটি আয়াত–

مَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ

অর্থাৎ "যে সব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দাও শিকারের প্রতি প্রেরণ করার জন্য" উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, শিকারী কুকুরের শিকার হালাল, সাথে সাথে একথাও প্রমাণিত হয় যে, তার উচ্ছিষ্ট পাক। কারণ তাতে লালা লেগে থাকে।

তৃতীয় দলীল : ইবনে উমর (রা) এর বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, মসজিদে নববীর ভিতর দিয়ে কুকুর আসা যাওয়া করত, কিন্তু তাতে পানি ঢালা হত না, অথচ কুকুরের স্বভাব হলো যেদিকেই যাবে লালা পড়তে থাকে, এতেও প্রমাণিত হয় যে, কুকুরের ঝুটা পাক (বুখারী ১/২৯)

জুমহুরের দলীল : জুমহুরের প্রথম দলীল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী–

يُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ

অর্থাৎ তিনি তোমাদের উপর সকল খবিস বস্তুকে হারাম করেছেন। (আরাফ : ১৫৭)

কুকুরের গোশত নাপাক, কাজেই তার উচ্ছিষ্টও নাপাক হবে। কারণ তা গোশত থেকে সৃষ্ট।

দ্বিতীয় দলীল :

দ্বিতীয় দলীল হলো রাসূলের হাদীস–

انّه عليه السلام حَرَّمَ كُلَّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطُّيُوْرِ

নবী করীম (স) প্রত্যেক দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী এবং পাঞ্জা-থাবা বিশিষ্ট পাখীকে হারাম করেছেন। আর কুকুর দাঁত দ্বারা শিকারকারী হিংস্র প্রাণী। তাই তা হারাম হবে। সুতরাং তার উচ্ছিষ্টও হারাম হবে।

তৃতীয় দলীল:

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عنه عَنِ النَّبِىِّ صلّى اللّٰه عليه وسلم قَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ. فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وفى رِوَايَةٍ اُخْرٰى اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَدْفَعْ

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হুজুর (স) হতে বর্ণনা করেন। কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা সাত বার ধৌত কর, এখানে ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটাই একথার প্রমাণ যে, কুকুরের লালা বা উচ্ছিষ্ট অপবিত্র।

৪ নং দলীল :

رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِىْ تَرِدُهَا السِّبَاعُ فَقَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا

যে সকল কূপে হিংস্র প্রাণী পানি পান করে সেগুলো সম্বন্ধে হুযুর (স) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, পানি দুই কুল্লা হলে তা নাপাক হবে না। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, দুই কুল্লার কম হলে হিংস্র প্রাণীর লালা দ্বারা পানি নাপাক হবে। আর কুকুর হিংস্র প্রাণী। কাজেই তার উচ্ছিষ্ট নাপাক।

৫ম দলীল :

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, কুকুরের লেহনকৃত খাদ্য যেন ফেলে দেয়া হয়, অথচ কোন বস্তু অযথা নষ্ট করা হারাম। সুতরাং যদি নাপাকই না হত তাহলে ফেলে দেয়ার হুকুম দেয়া হত না। (মুসলিম ১/১৩৭)

ইমাম মালেক (র) এর প্রথম দলীলের জবাব

উল্লেখিত আয়াতে শুধুমাত্র ঐ সমস্ত হারাম বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোকে আরববাসীরা হালাল মনে করত। কুকুরের উচ্ছিষ্টকে আরববাসীরা কখনো হালাল মনে করতো না। তাই এর উল্লেখ এ আয়াতে করা হয়নি। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা কুকুরের উচ্ছিষ্ট হালাল হওয়া প্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয়ত : পবিত্র কুরআনে কুকুর বা অন্য কোন জন্তু ও বস্তু উল্লেখ না থাকা এটা হালাল হওয়ার দলীল হতে পারে না। কেননা, এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা হাদীসের দ্বারা হারাম করা হয়েছে, কিন্তু পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই। এমন অনেক পশু-পাখি রয়েছে যেগুলোকে স্বয়ং ইমাম মালিক (র)ও হারাম বলে থাকেন অথচ সেগুলো কুরআনে উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব ঃ কুকুরের শিকার হালাল হওয়ার দ্বারা তার উচ্ছিষ্ট হালাল হওয়া বৈধ হয় না। কারণ তাকে ধোয়ার পরে খাওয়া হয়, না ধুয়ে খাওয়া জায়েয নেই।

দ্বিতীয়ত ঃ আয়াতটির উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল একথা বুঝান যে, শিকারী কুকুরের শিকারকৃত পশুকে কিছু শর্তসাপেক্ষে জবাই করা ছাড়াই তা ভক্ষণ করা হালাল।

তৃতীয় দলীলের জবাব ঃ একথা সর্বজন বিদিত যে, ধোয়া ব্যতীত কোন কোন জিনিস পাক করা সম্ভব। যেমন বীর্য যদি খুব গাড় হয় এবং তা যদি কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায়। এমতাবস্থায় খুঁটিয়ে উঠানোর দ্বারা কাপড় পাক হয়ে যাবে। ধোয়ার প্রয়োজন নেই, এমনিভাবে মাটিতে কোন নাপাক লাগলে তা শুকিয়ে গেলে এবং মাটিতে চুষে নিলে পাক হয়ে যায়। (দরসে মিশকাত প্রথম খণ্ড ১৮৯-১৯০ পৃষ্ঠা)

উপরের আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক, কাজেই কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা পবিত্র করার জন্য ধৌত করতে হবে।

দ্বিতীয় আলোচনা

কুকুরের ঝুটা পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে। কুকুরের ঝুটা পবিত্র করার জন্য কয়বার ধোয়া ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মাতনৈক্য রয়েছে,

১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র) এর মতে সাতবার ধোয়া ওয়াজিব। তবে ইমাম আহমদ অষ্টমবার মাটি দিয়ে ধোয়ার জন্য জোর তাগিদ প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম মালেক (র) এর মতে কুকুরের ঝুটা যেহেতু পবিত্র। সুতরাং তিনিও সাওয়াবের জন্য (امر تعبدی) এবং চিকিৎসা হিসেবে সাতবার ধোয়ার প্রবক্তা। (তানযীমুল আশতাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৮৮)

ইমাম ত্রয়ের দলীল ঃ

তাঁদের দলীল হলো রাসূলের হাদীস–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ صلّى اللّٰه عليه وسلم قَالَ طُهُوْرُاِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يُّغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلٰهُنَّ بِالتُّرَابِ

(বুখারী ১/২৯, মুসলিম ১/১৩৭, তিরমিযী ১/২৭, নাসায়ী ১/১২, ইবনে মাজাহ ২২)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন– কুকুর যদি তোমাদের কারো পাত্র লেহন করে তবে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তা সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। প্রথমবার মাটি দ্বারা মাজতে হবে। এখানে সাতবারের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই সাতবার ধৌত করতে হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল ঃ প্রথম দলীল হলো রাসূল (স) এর হাদীস–

عَنْ اَبِىْ هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

অর্থাৎ .... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দেয় তখন যেন সে তা ফেলে দেয় এবং এই পাত্র অবশ্যই তিনবার ধৌত করে। (উমদাতুলকারী ১/৮৭৪, মাআরিফুস সুনান. ১/২২৫, নসবুর রায়াহ ১/১৩১, দারাকুতনী ১/২৪)

দ্বিতীয় দলীল ঃ

عن ابنِ جُرَيْجٍ قالَ قلتُ لِعَطاءٍ كَمْ يُغْسَلُ الاِنَاءُ الَّذِى يَلِغُ فيهِ الكَلْبُ. قالَ كُلَّ ذلك سمعتُ سبعًا وخمسًا وثلاثَ مَرَّاتٍ

অর্থাৎ .... ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি আতাকে যে পাত্রে কুকুর মুখ দিয়েছে তা কয়বার ধুতে হবে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। উত্তরে তিনি বলেন, সাতবার, পাঁচ বার এবং তিনবার সবকটিই আমি শুনেছি। প্রকাশ থাকে যে, হযরত আতা (রা) সাতবারের হাদীসেরও রাবী। সাতবারের হুকুম যদি ওয়াজিবের জন্য হত তাহলে তিনি কখনো এর বিপরীত অনুমতি দিতেন না।

তৃতীয় দলীল ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيرة رضى الله عنه قالَ قالَ رسولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم اِذا قَامَ اَحَدُكُمْ مِن مَّنَامِه فَلا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حتّٰى يَغْسِلَها ثلاثًا فانّه لايَدْرِى اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর তোমাদের কেউ যেন হাত ধোয়ার পূর্বে পানির পাত্রে তার হাত না ঢুকায়। কারণ সে জানেনা নিদ্রিত অবস্থায় তার হাত কোথায় পৌছেছে। এ হাদীসে রাসূল (স) হাতে পেশাব-পায়খানা লাগার সম্ভাবনার ভিত্তিতে তা তিনবার ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে বুঝা গেল যে, তিনবার ধোয়ার দ্বারা পেশাব পায়খানার নাপাক পবিত্র হয়ে যায়। কাজেই কুকুরের লালার নাপাক তিনবার ধোয়ার দ্বারা পবিত্র হওয়াটাই স্বাভাবিক।

আকলী দলীল ঃ যেখানে কুকুরের কিংবা শূকরের পায়খানা পেশাবের দ্বারা নাপাক হলে সেই নাপাকী তিনবার ধোয়ার দ্বারা পাক হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে কুকুরের লালা তো নিঃসন্দেহে শূকরের মল-মূত্র থেকে অনেক হালকা। সুতরাং ঝুটার ক্ষেত্রেও তিনবার ধোয়ার দ্বারা পাক হয়ে যাবে এটাই যুক্তিযুক্ত।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সাতবার ধোয়ার হাদীস বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও তার থেকে তিনবার ধোয়ার হাদীস বর্ণিত হওয়ার দ্বারা প্রমাণ মিলে যে, সাতবারের হুকুম ওয়াজিব বুঝানোর জন্য নয়।

২. তিনবার ধৌত করার হাদীস ওয়াজিব, আর সাতবার ধৌত করার হাদীস মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হবে। অতএব, উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্ব নেই।

৩. ইবনে রুশদ বলেন, সাতবার ধৌত করার হুকুম চিকিৎসা হিসেবে দেয়া হয়েছে, নাপাকীর কারণে নয়। কেননা, কুকুরের লালায় এক প্রকার বিষ থাকে। সাতবার ধৌত করা এবং মাটি দ্বারা মাজার ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

৪. ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাতবারের হুকুম ছিল। অতঃপর তিনবার ধোয়াকে ওয়াজিব করা হয়। আর সাতবার ধোয়া মুস্তাহাব থেকে যায়।

৫. সাতবারের হাদীসগুলোতে অনেক গরমিল রয়েছে। যেমন তাঁদের পেশকৃত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমবার মাটি দ্বারা মাজবে। ইমাম মুগাফফাল এর রেওয়ায়েতে আছে–

وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ অর্থাৎ অষ্টমবার মাটি দ্বারা মাজবে। (আবু দাউদ ১/১০) কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, প্রথমবার ও শেষবার মাটি দ্বারা ঘষবে। أُولَهُنَّ وَأُخْرَهُنَّ بِالتُّرَابِ তিরমিযী ১/২৭

আর কোন রেওয়ায়েতে আছে السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ। তথা সপ্তমবার মাটি দিয়ে মাজবে। (দারাকুতনী ১/২৪)

অতএব সাতবার ধৌত করা যদি ওয়াজিব ধরা হয়, তাহলে অন্য রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব, কিন্তু সাতবার ধৌত করা যদি মুস্তাহাব ধরে নেয়া হয়, তাহলে কোন অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হবে না; বরং প্রতিটি পদ্ধতির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হবে।

৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে। কারণ হুজুর (স) মানুষের অন্তর হতে কুকুরের মহব্বত দূর করার জন্য সাতবার ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে পূরণ হওয়ার পর তিনি তিনবার ধোয়ার নির্দেশ দেন। স্বয়ং হযরত আবু হুরায়রা (রা)ও এ আমল করেছেন এবং এ ফতোয়া দিয়েছেন। সুতরাং তার বিপরীত বক্তব্য সাতবারের হুকুম মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হবে। (দরসে মিশকাত ১/১৯০-১৯১, তানযীমুল আশতাত ১/১৭৭-১৯০, দরসে তিরমিযী, ১/৩২২-৩২৬)

سوال : ما هى شَرَائِطُ الصَّيدِ بِالكَلْبِ؟ ولِإرْسَالِ المُعَلَّمِ؟ مَتٰى يَصِيْرُ الكلبُ مُعَلَّمًا؟ بَيِّنْ ايضاحًا تامًّا ـ

প্রশ্ন ঃ কুকুর দ্বারা শিকার করার শর্তাবলী কি কি? এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক'রকে প্রেরণ করার জন্য কি কি শর্তাবলী রয়েছে? কুকুরের শিকার কখন বৈধ? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মাআরিফুল কুরআন গ্রন্থকার কুকুরের শিকার করা প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য হানাফী মাযাহাবের পাঁচটি শর্ত উল্লেখ করেছেন–

১. কুকুর শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে, শিক্ষার পদ্ধতি এই যে, আপনি যখন কুকুরকে শিকারের দিকে প্রেরণ করবেন তখন সে শিকার ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসবে। নিজে খাওয়া শুরু করবে না।

২. আপনি নিজ ইচ্ছায় কুকুরকে প্রেরণ করবেন। কুকুর যেন স্বেচ্ছায় শিকারের পেছনে দৌড়ে শিকার না করে।

৩. শিকারী জন্তু নিজে শিকার কে খাবে না। বরং আপনার কাছে নিয়ে আসবে।

৪. শিকারী কুকুর শিকারের দিকে প্রেরণ করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হবে।

৫. আবু হানীফা (র) বলেন শিকারী জন্তু শিকারকে আহতও করতে হবে। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন পৃষ্ঠা নং ৩০৯-৩১০)

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিকারী কে প্রেরণ করার শর্তাবলী ঃ

১. শিকারী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছে কি না যাচাই করা।

২. শিকারীকে بِسْمِ اللّٰهِ বলে প্রেরণ করা। হাদীসে এসেছে–

إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

৩. প্রেরণকারী মুসলিম অথবা আহলে কিতাব হতে হবে।

৪. ইচ্ছাকৃতভাবে শিকারীকে পাঠাতে হবে।

৫. প্রেরণের পূর্বে শিকার নির্দিষ্ট করতে হবে।

৬. প্রেরণকারীর সাথে এমন লোক না থাকা যার জবাই শুদ্ধ নয় (আহসানুল কিফায়াহ পৃষ্ঠা নং ৫৪১)

الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ এর পরিচয় ঃ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর বলতে ঐ কুকুরকে বুঝায়, যে কুকুর প্রেরণের সাথে সাথে শিকার ধরার জন্যে ঝাপিয়ে পড়ে, ডাকার সাথে সাথে ফিরে আসে এবং শিকারকৃত প্রাণীকে না খেয়ে জখম করে নিয়ে আসে। (আহসানুল কিফায়াহ পৃষ্ঠা নং ৫৪২)

কুকুরের শিকার কখন বৈধ ঃ ইসলামী শরীয়তে কুকুর দ্বারা শিকারের অনুমোদন দিলেও নিম্নোক্ত শর্তাবলীর আওতায় কুকুরের শিকার বৈধ। যেমন–

১. কুকুর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। যেমন আল্লাহর বাণী– وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ

২. কুকুরটি কোন মুসলমান কর্তৃক প্রেরিত হওয়া, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিকারী প্রাণীটির সাথে অন্য কোন প্রাণীর শিকার ধরায় সহযোগী হতে পারবে না।

৩. প্রেরণের সময় بسم الله বলা। যথা - فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ الاية

৪. শিকারকৃত প্রাণী হালাল হওয়া।

৫. শিকারকৃত প্রাণীর দেহ জখম করা। যেমন কুরআনে আছে– وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ الاية

৬. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরটির সাথে অন্য কোন প্রাণী না থাকা।

৭. শিকারকৃত প্রাণীর মৃত্যু কুকুরটির দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

৮. প্রেরণ করার সময় কুকুরটি পথে দেরি না করা।

৯. প্রেরণকৃত কুকুর শিকারকৃত প্রাণী থেকে কিছু অংশ ভক্ষণ না করা ইত্যাদি।

শিকারীর জন্য শর্ত ঃ শিকারীর জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। যথা–

১. শিকারী মুসলমান অথবা আহলে কিতাব হতে হবে।

২. শিকারীর সাথে এমন কোন ব্যক্তি সংযুক্ত হতে পারবে না; যার শিকার হালাল নয়।

৩. শিকারী ইচ্ছাকৃতভাবে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রক্ষিণপ্রাপ্ত কুকুর প্রেরণ করতে হবে।

৪. শিকারী بسم الله পাঠ করে প্রেরণ করতে হবে।

৫. শিকারী ব্যক্তি প্রাণী প্রেরণের মাঝে অন্য কোন কাজে লিপ্ত হাত পারবে না। (আহসানুল কিফায়াহ, ৫৪০পৃঃ)

سوال : حَقِّقِ الْوُلُوْغَ

প্রশ্ন ঃ وُلُوْغ শব্দের তাহকীক বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ولوغ শব্দটি বাবে فتح থেকে উদ্ভুত। ولوغ শব্দের অর্থ হল, কুকুর কর্তৃক কোন তরল জিনিসে মুখ দিয়ে জিহবা নাড়াচাড়া দেয়া, চাই পান করুক বা না করুক। আর এ খাওয়ার জন্য لحس এবং খালি পাত্র চাটার জন্য لَعْق শব্দ ব্যবহৃত হয়। এখানে وُلُوْغ দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণত: মুখ দেয়া। لَحْس ও لَعْق ও এর অন্তর্ভূক্ত।

(আওনুল ওয়াদুদ পৃষ্ঠা নং ১১৬-১১৭)

سوال : بَيِّنْ اَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِىْ حُكْمِ سُؤْرِ الْكَلْبِ؟

প্রশ্ন ঃ কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে উলামাদের বক্তব্য কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ কুকুরের উচ্ছিষ্টের বিধান ঃ কুকুরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র না অপবিত্র এ সম্পর্কে ইমামদের মতামত নিম্নরূপ,

১. ইমামে আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র) এর মতে কুকুরের ঝুটা অপবিত্র এবং এটাকে যে সাতবার ধৌত করার হুকুম দেয়া হয় তা পবিত্র করার জন্যই। (আনওয়ারুল মিশকাত পৃষ্ঠা নং ১৬৯)

২. গ্রামের কুকুরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র আর শহরের কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র।

৩. যে সব কুকুর লালন-পালন জায়েয সেগুলোর উচ্ছিষ্ট পবিত্র, আর অন্যগুলোর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র।

৪. কুকুরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র, তবে সাতবার ধৌত করার যে নির্দেশ এসেছে তা অ'মরে তাআব্বুদী বা عقل ও قياس এর উর্ধে।

سوال : مَنْ قَالَ اِنَّ تَطْهِيْرَ الْاِنَاءِ مِنْ وُلُوْغِ الْكَلْبِ حُكْمٌ تَعَبُّدِيٌّ؟ وَلِمَ اخْتَارَ هٰذَا الْقَوْلَ؟

প্রশ্ন ঃ কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র ধৌত করা আমরে তায়াব্বুদী উক্তিটি কে এবং কেন করেছেন।

উত্তর ঃ পাত্র পরিস্কার করা اَمْرِ تَعَبُّدِى এর কথকের পরিচয়

কুকুরে যদি পাত্রে মুখ দেয় তা ধৌতকরণ اَمْرِ تَعَبُّدِى - এ উক্তিকারী হলেন ইমাম মালেক (র)। তিনি বলেন, কুকুরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র, আর সে পাত্র ধৌত করার আদেশ হচ্ছে اَمْرِ تَعَبُّدِى তথা ইবাদত স্বরূপ যা আকল ও কিয়াস দ্বারা বুঝা যায় না। ইবনে রুশদ ও ইবনে রুশদ সগীর বিদায়াতুল মুজতাহিদে বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি معقول المعنى। কিন্তু বাহ্যিকভাবে নাপাকীর সাথে তার কোন সম্পৃক্ততা নেই। তবে কুকুরের লেহনকৃত পাত্রকে যে সাতবার ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অপবিত্র হওয়ার কারণে নয়; বরং চিকিৎসা স্বরূপ এ হুকুম দিয়েছেন। কারণ কুকুরটি পাগল কি না তা জানা নেই। আর পাগলা কুকুরের লালায় বিষ থাকে। এ কারণে সাতবার ধৌত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, সাতবার ধৌত করলে তার বিষ নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লামা শা'রানী (র) লেখেন, আহলে কাশ্‌ফ এ ব্যাপারে একমত যে, কুকুরের লালায় এমন বিষ আছে যে, যদি কেউ কুকুরের ঝুটা ভক্ষণ করে তাহলে তার আছরের কারণে অন্তরের মধ্যে নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা, অন্ধকারত্ব সৃষ্টি হয়। যার ফলে ভালো ও সৎকর্ম করার স্পৃহা নষ্ট হয়ে যায়, ধর্মের কথা শুনার আগ্রহ নিঃশেষ হয়ে যায়। ইমাম বুখারী (র)ও এমতকে গ্রহণ করেছেন। আর সাতবার ধৌত করার জবাবে বলেন, এটা আমরে তাআব্বুদী। আর আমরে তাআব্বুদী বলা হয় এমন বিধানকে, যা পালন করা উম্মতের উপর অপরিহার্য, তার গূঢ় তত্ত্ব বুঝা যাক বা না যাক। তার হিকমত সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। শরীয়তে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন কুরআনের সূরাগুলোর ধারাবাহিকতা, বিতরের নামাযের তৃতীয় রাকাতে তাকবীর বলা ইত্যাদি।

امر تعبُّدى এর মত গ্রহণ করার কারণ ঃ

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا

অর্থাৎ কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশত। এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ।

এ আয়াতে হারাম বস্তুর তালিকার মধ্যে কুকুরের কথা উল্লেখ নেই। এতে বুঝা যায় যে, এর ঝুটা পাক।

২. فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ যে শিকারী জন্তু শিকারকে তোমাদের জন্য ধরে রাখে তোমরা তা ভক্ষণ কর। (মায়েদা ;৪) এ শিকারী কুকুরের শিকারকৃত পশু খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। অথচ দাঁত দিয়ে শিকার করার কারণে গোশতে অবশ্যই লালা লেগেছে। এতে ও প্রমাণিত হয় যে, কুকুরের ঝুটা পাক।

৩. ইবনে উমর (রা) এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে,

كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فِى زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ (بخارى)

মসজিদে নববীর ভিতর দিয়ে কুকুর আসা-যাওয়া করত, কিন্তু তাতে পানি ঢালা হত না। অথচ কুকুরের স্বভাব হলো যেদিকেই যায় তার লালা পড়তে থাকে। এতেও প্রমাণিত হয় যে, কুকুরের ঝুটা পাক। (বুখারী ১/২৯)

তাই কুকুরের লালাযুক্ত পাত্র ধৌত করার পশ্নই আসে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হাদীসে ধোয়ার যে নির্দেশ এসেছে তা امر تعبدى স্বরূপ যা পালন করা উম্মতের দায়িত্ব, যদিও তা বিবেকের দাবীর পরিপন্থী হয়।

سوال : عَرِّفِ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ ـ

প্রশ্ন ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের পরিচয় দাও।

উত্তর ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের পরিচয়

كلب শব্দের অর্থ হলো কুকুর, আর معلم শব্দের অর্থ হলো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। শিকার করা ও ঘর-বাড়ী পাহারা দেয়ার জন্যে যে কুকুরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, সেই কুকুরকে প্রশিক্ষণপ্রাপপ্ত বা শিকারী কুকুর বলে।

২. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর বলতে ঐ কুকুরকে বলা হয়- যে কুকুর প্রেরণের সাথে সাথে শিকার ধরার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ডাকার সাথে সাথে প্রত্যাবর্তন করে এবং শিকারকৃত প্রাণী না খেয়ে জখম করে নিয়ে আসে। শরীয়তের পরিভাষায় এ ধরণের কুকুরকে اَلْكَلْبُ الْمُكَلَّبُ ـ اَلْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ ؛ كلبُ الصَّيْدِ বলা হয়ে থাকে।

৩. আল্লামা কিরমানী বলেন– هُوَ الَّذِىْ يَنْزَجِرُ بِالزَّجْرِ وَيَسْتَرْسِلُ بِالْاِرْسَالِ وَلَا يَاكُلُ مِنْهُ

কুকুর শিকারী হওয়ার জন্যে নিম্নোক্ত শর্তগুলো থাকা আবশ্যক–

১. শিকারের জন্য ছাড়া মাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

২. ডাক দেয়ার সাথে সাথে কাছে চলে আসবে।

৩. শিকার করে নিজে মোটেও খাবে না। বরং মালিকের জন্য নিয়ে আসবে।

৪. শিকার করার স্থানে বেশী দেরী করবে না।

৫. তার সাথে এমন প্রাণী থাকবে না যার শিকার হালাল নয়। এজন্যে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন–
وَاَن لَّا يُشَارِكَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ كَلْبًا لَايَحِلُّ صَيْدُهٗ

৬. শিকারে মৃত প্রাণী একমাত্র শিকারী কুকুর দ্বারাই হয়েছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।

সাহেবাইনের অভিমত ঃ সাহেবাইন (র) বলেন, তিনবার শিকার প্রেরণের পরে যদি দেখা যায় শিকারী কুকুরটি শিকারকৃত প্রাণী থেকে কিছু ভক্ষণ করেনি। তাহলেই কেবল সেটাকে শিকারী কুকুর বলা যাবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত ঃ ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, শিকারী কুকুরের প্রশিক্ষণের স্বীকৃতি প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। (শরহে নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১৩৬)

سوال : لِم لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ فِىْ بَيْتٍ فِيْهِ كلبٌ

প্রশ্ন ঃ যে ঘরে কুকুর বাস করে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ না করার কারণ কি?

উত্তর ঃ ফেরেশতারা প্রবেশ না করার কারণ ঃ রাসূল (স) বলেছেন, যে ঘরে কুকুর থাকে সেই ঘরে, রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। যেমন ইরশাদ করেছেন–
لَا يَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بيتًا فيه كلبٌ او تَصَاوِيرُ এর দ্বারা রহমত ও বরকতের ফেরেশতা উদ্দেশ্য।

ফেরেশতা প্রবেশ না করার কারণসমূহ নিম্নরূপ –

১. কুকুর হচ্ছে نجاسة عين তথা মৌলিকভাবে অপবিত্র প্রাণী।

২. কুকুরের সাথে শয়তান থাকে।

৩. কুকুরের লালায় মানবতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি বিধ্বংসী রোগ জীবাণু ও কু-প্রভাব রয়েছে।

৪. কুকুরের মধ্যে কুলক্ষণ ও অকল্যাণ রয়েছে।

৫. কুকুর সাধারণতঃ মানুষের মলসহ অনেক পঁচা গলা আবর্জনা ভক্ষণ করে থাকে।

৬. ঘরে কুকুর রাখা বিজাতীয় সভ্যতার পরিচায়ক।

৭. কুকুরকে ঘরে জায়গা দিলে মালিকের মধ্যে কুকুরের প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

উল্লেখ্য যে, শিকারী বকরী পাহারাদার এবং কৃষি কাজে নিয়োজিত কুকুরসহ অন্যান্য উপকারী কুকুরের বিধান এ কুকুর থেকে ব্যতিক্রম। (শরহে নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১৩৭)

سوال : هَلِ التَّعْفِيْرُ فِى الثَّامِنَةِ عَلَى الْاِسْتِقْلَالِ او داخِلٌ فِى السَّبْعَةِ وَالّا فَما تَأوِيلُ الْاَحادِيْثُ؟

প্রশ্ন ঃ কুকুর কর্তৃক মুখ দেয়া পাত্র পবিত্র করার জন্যে অষ্টমবার মাটি দিয়ে ঘষে ধৌত করা একটি পৃথক ব্যবস্থা সাতবারের মধ্যে গণ্য নয়।

উত্তর ঃ অষ্টমবার মাটি দ্বারা ধোয়া পৃথক ব্যবস্থা কি না ঃ কুকুর কর্তৃক মুখ দেয়া পাত্র পবিত্র করার জন্যে অষ্টমবার মাটি দিয়ে মেজে ধৌত করা পৃথক একটি ব্যবস্থা, নাকি তা সাতবারের মধ্যে গণ্য এ সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এর মতে, অষ্টমবার মাটি দিয়ে মেজে ধৌত করা একটি পৃথক ব্যবস্থা। এটি সাতবারের মধ্যে গণ্য নয়। কাজেই কুকুরের মুখ দিয়া পাত্র, সাতবার ধৌত করার পর অষ্টম বার মাটি দিয়ে মেজে ধৌত করতে হবে। কেননা, রাসূল (স) এর বাণী – وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ

২. জুমহুর আলিমদের মতে অষ্টমবার মাটি দিয়ে মেজে ধৌত করা এটা পৃথক ব্যবস্থা নয় বরং সাতবারের মধ্যেই গণ্য। কেননা, হাদীসে عَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ দ্বারা রাসূল (স) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সাতবার ধৌত করার মধ্যে যে কোন একবার মাটি দিয়ে মেজে ধৌত করবে, সাতবারের পর অষ্টমবার মাটি দ্বারা মাজা নয়। যেমন ইমাম নববী বলেন–

اِنَّ الْمُرادَ اِغْسِلُوْهُ سَبْعًا واحدةٌ مِنْهُنَّ بِالتُّرَابِ مَعَ الْمَاءِ فَكَانَ التُّرَابُ قائمٌ مَقَامَ غَسْلِهِ فَسُمِّيَتْ ثَامِنَةً لِهٰذا

মোটকথা, মাটি দ্বারা মাজা ওয়াজিব নয় বরং احتياط ও استحباب এর উপর প্রযোজ্য। (শরহে নাসায়ী ঃ ১৩৯)

اَلْاَمْرُ بِاِرَاقَةِ مَا فِى الْاِنَاءِ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ

٦٦. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ وَاَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ - قَالَ ابو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لا اَعْلَمُ اَحَدًا تَابَعَ عَلِىَّ بْنَ مسهرٍ على قوله فَلْيُرِقْهُ -

---

কোন পাত্রে কুকুরে মুখ দিলে পাত্রের জিনিস ফেলে দেয়ার নির্দেশ

অনুবাদ ঃ ৬৬. আলী ইবনে হুজ্‌র (র)........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন পাত্রের জিনিস ঢেলে ফেলে দেয়। তারপর যেন তা সাতবার ধুয়ে ফেলে। আবু আবদুর রহমান বলেন, (পাত্রের জিনিস ঢেলে ফেলে দেয়) এই কথায় (সনদের উর্ধ্বতন রাবী) আলী ইবনে মুসহিবকে কেউ অনুসরণ করেছে বলে আমি জানি না।

হাদীস সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : قوله فَلْيُرِقْهُ داخلٌ فِى الْحَدِيْثِ اَمْ لَا بَيِّنْ موضحًا .

প্রশ্ন ঃ فَلْيُرِقْهُ এটা হাদীসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কি-না স্পষ্ট ভাষায় তা বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ فَلْيُرِقْهُ এর ব্যাপারে ইমাম নাসায়ী (র) এর বক্তব্য ঃ আলোচ্য হাদীসে فَلْيُرِقْهُ বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে যা পূর্ববর্তী কোন রেওয়ায়েতে নেই। কাজেই এ বাক্যের ব্যাপারে ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, لَا اَعْلَمُ اَحَدًا... الخ। অর্থাৎ তিনি বলেন, আলী ইবনে মিসহার ব্যতীত অন্য কেউ তার মুতাবাআত করেছে বলে আমার জানা নেই। হাফেজ ইবনে আবদুল বার মালেকী (র) বলেন, আমাশের সাগরেদের মধ্য হতে আলী ইবনে মিসহার ব্যতীত কেউ এটা বর্ণনা করেননি। অথচ আবু মুআবিয়া শু'বার মত হাফেজে হাদীস আ'মাশের সাগরেদ তারাও উক্ত শব্দ বর্ণনা করেননি। উল্লেখ্য যে, সকল উলামার বক্তব্য দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে, আলোচ্য শব্দটি হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ ব্যাপারে ইবনে হাজার আসাকালানীর বক্তব্য ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) তালখীসে বলেছেন, দারাকুতনী আলোচ্য হাদীসের সনদকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে খুযাইমা (র)ও নিজ সহীহ গ্রন্থে উক্ত হাদীসকে উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইবন হাজার আসকালানী (র) ফাতহুল বারীর মধ্যে امر بالاراقة তথা পানি ঢালার বিধানকে عطاء عن ابى هريرة এর সূত্রে মারফূ সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে আদী তার তাখরীজে বর্ণনা করেন উক্ত বাক্যের ব্যাপারে বিশুদ্ধ কথা হল তা মাওকূফ। অনুরূপভাবে اراقة এর হুকুম হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও ايوب عن ابن سيرين عن ابى هريرة এর সূত্রে موقوف বর্ণনা করেছেন। এ সনদটাও সহীহ দারাকুতনী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য আলোচনার সারকথা হল, ইমাম নাসায়ী (র) আলী ইবনে মিসহার এর কোন মুতাবাআত না থাকা সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা সহীহ নয়।

بَابُ تَعْفِيرِ الْإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ

٦٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ -

অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র মাটি দ্বারা মাজা

৬৭. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা সাম'আনী (র)........আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য শিকার ও ছাগ-পালের পাহারাদারীর জন্য কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছেন যে, কোন পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয় তখন তা সাতবার ধৌত করবে এবং অষ্টমবারে মাটি দ্বারা মেজে নিবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : بَيِّنْ مَعْنَى التَّعْفِيرِ مُوَضِّحًا

প্রশ্ন ঃ التَّعْفِيرِ **শব্দটির অর্থ বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ التَّعْفِيرِ **এর অর্থ ঃ** تعفير **শব্দটি** বাবে تفعيل এর মাসদার, عفر মূলধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। অর্থ হচ্ছে মাটি দ্বারা ঘষা, মাজা। রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- عَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ

কুকুরের লালায় রোগ জীবাণু থাকে। পানি দ্বারা যতই ধৌত করা হোক না কেন, তার কুপ্রভাব দূর হয় না। এজন্য মাটি দ্বারা মাজলে তার বিষক্রিয়া সহজেই দূর হয়ে যায়। কেননা, মাটি হচ্ছে জীবানু নাশক দ্রব্য। কাজেই সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে تعفير মুস্তাহাব।

سوال : مَا الْحِكْمَةُ فِي تَعْفِيرِ الْإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ؟

প্রশ্ন ঃ কুকুরের মুখ দেয়া পাত্রকে মাটি দিয়ে মাজার মধ্যে কি হিকমত রয়েছে বর্ননা কর।

উত্তর ঃ কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র মাটি দ্বরা ঘষা-মাজার মধ্যে হিকমত ঃ যে পাত্রে কুকুর মুখ দেয় তাকে পবিত্র করার জন্য একবার মাটি দিয়ে ঘষে মেজে নেয়ার মধ্যে যে হিকমত নিহিত রয়েছে তা নিম্নরূপ-

গবেষণার দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে, কুকুরের লালার মধ্যে রোগ জীবাণু থাকে। পানি দ্বারা যতই পাত্র ধোয়া হোক না কেন, তার প্রভাব কিছু না কিছু থাকবেই। আর মাটি যেহেতু জীবাণু নাশক। তাই মাটি দ্বারা জীবানু দূরীভূত হয়। কাজেই কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র মাটি দ্বারা ঘষে মেজে ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও কুকুরের মুখ দেয়া থেকে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করার জন্যে تعفير এর হুকুম দেয়া হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, কুকুরের প্রতি অধিক ঘৃণা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এ হুকুম দেয়া হয়েছে। কেননা, আরবদের মধ্যে রাসূল (স) এর যুগে কুকুরপ্রীতি খুবই প্রকট আকার ধারন করেছিল। ফলে রাসূল (স) ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন, আত্মার প্রশান্তি লাভের জন্যে تعفير এর আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা কুকুর সাধারণত মানুষের মলসহ বিভিন্ন পঁচাগলা আবর্জনা ভক্ষণ করে। শুধু পানি দিয়ে ধুলে মনে পুরো স্বস্তি আসে না। তাই মাটি দিয়ে মাজার নির্দেশ দিয়েছেন।

سوال : إلى ما أشار المصنف بقوله خالفه ابو هريرة (رض) فقال احداهن بالتراب وما هو الراجح عندك نقلا وعقلا .

প্রশ্ন ঃ خالفه ابو هريرة **দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করেছেন? অতঃপর তিনি বলেছেন** احداهن بالتراب **তোমার নিকট গ্রহনযোগ্য মত কোনটি।**

উত্তর ঃ গ্রন্থকারের বক্তব্য ঃ নাসায়ী গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম আহমদ ইবনে শুয়াইব আন নাসায়ী (র) অত্র হাদীস উল্লেখের পর বলেন- خالفه ابو هريرة অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা) এ কথার বিরোধিতা করেছেন। মাটি দিয়ে অষ্টমবার ঘষার কথা বলেননি যা আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

আমার নিকট গ্রহণযোগ্য মত ঃ কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র পবিত্রকরণ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কুকুর যেহেতু অপবিত্র সেহেতু কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা অপবিত্র হয়ে যায় তা পবিত্র করার ব্যাপারে হাদীসের বিভিন্নতার কারণে আলেমদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। হাদীসের আলোকে আমাদের মতামত হল কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র পবিত্র করতে হলে তা সাতবার পানি দিয়ে ধৌত করলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। আর মাটি দিয়ে ঘষাটা মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত হবে।

নকলী দলীল ঃ

١. عن ابى هريرة رض ان رسول الله صلعم قال اذا شرب الكلب فى اناء احدكم فليغسله سبع مرات .

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বলেন, তোমাদের কারো পাত্র থেকে যদি কুকুর পানি পান করে তাহলে সে যেন পাত্রকে সাতবার ধৌত করে নেয়।

٢. طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات .

অর্থাৎ যখন কুকুর খাদ্য ও পানীয় পাত্রে মুখ দেয় তখন ঐ পাত্রকে সাতবার ধৌত করে নিলেই তোমাদের পাত্র পবিত্র হবে।

আকলী দলীল ঃ কোন অপবিত্রকে পবিত্র করার জন্য পানি দিয়ে ধৌত করাই স্বাভাবিক পন্থা; মাটি দিয়ে সাধারণত কোন কিছু পবিত্র করা হয় না। বিষয়টি মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত হবে।

سوال : هل بقى امر قتل الكلب ام لا؟ بين حكم قتله بالدلائل .

প্রশ্ন ঃ কুকুর হত্যার বিধান এখনো কি বিদ্যমান আছে? কুকুর হত্যার বিধানটি দলীলসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ কুকুর হত্যার বিধান ঃ সাহাবায়ে কেরাম জাহেলী যুগের অভ্যাসমত কুকুরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, সদা কুকুরকে সাথে রাখতেন। এমনকি মসজিদে আসার সময়ও কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। এ জন্যে রাসূল (স) ইসলামের প্রাথমিক যুগে সব ধরণের কুকুর হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। যেমন হাদীসে আছে-

عن جابر بن عبد الله رض يقول امرنا رسول الله صلعم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله .

হযরত জাবের (রা) বলেন নবীজি (স) আমাদেরকে কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমনকি কোন মহিলা কুকুরসহ গ্রাম থেকে শহরে আসলে, আমরা তাকেও হত্যা করতাম। আস্তে আস্তে সাহাবীদের অন্তর হতে কুকুর প্রীতি কমে যেতে থাকলো। তখন রাসূল (স) পূর্বের হুকুমকে কিছুটা শিথিল করেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন তিলযুক্ত কালো কুকুরকে হত্যা করবে। এ ছাড়া অন্যগুলো আজ থেকে হত্যা করবে না। যেমন জাবের (রা) বলেন-

ثم نهى عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم ذى النقطين فانه شيطان

অতঃপর নবী (স) কুকুর হত্যা করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, দুই নোকতা বিশিষ্ট তথা তিলযুক্ত কালো কুকুরকে তোমরা হত্যা কর। কেননা, সেটা শয়তান।

বর্তমানে উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামের রায় হচ্ছে, যেসব কুকুর মানুষকে কষ্ট দেয় সেগুলো হত্যা করা জায়েয। এ ছাড়া অন্যান্য কুকুর হত্যা করা জায়েয নেই। তা যদিও কালো ও তিলোকযুক্ত হয়। ইমাম মালেক (র) বলেন, হাদীসে যে সব কুকুর পালনের অনুমতি দেয়া হয়েছে সেগুলো ব্যতীত অন্যান্য কুকুর হত্যা করা জায়েয।

আলোচ্য হাদীসের সনদ ও পাত্র ধোয়ার তরতীবের ব্যাপারে ইমামদের অভিমত

আলোচ্য হাদীসের সনদের যথার্থতার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস ঐক্যমত পোষণ করেছেন। অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘষে ধৌত করার বিধানের প্রবক্তা হল হাসান বসরী (র)। আল্লামা কিরমানী (র) বলেন ইমাম আহমদ (র) এর একটি রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় তিনিও এ কথার প্রবক্তা। ইবনে দাকীকুল ঈদ ইমাম আহমাদের কথাকেই অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন। (ফাতহুল বারী)

ইমাম মালেক (র) আটবার পাত্র ধৌত করারও প্রবক্তা নন, অনুরূপভাবে অষ্টমবার মাটি দ্বারা ধৌত করারও প্রবক্ত নন। কারণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের রেওয়ায়েত রয়েছে। যথা–

১. أُولَاهُنَّ ২. أُخْرَاهُنَّ ৩. إِحْدَاهُنَّ ৪. السَّابِعَةِ بِالتُّرَابِ ৫. কোন বর্ণনায় الثَّامِنَةُ بِالتُّرَابِ। শব্দ বর্ণিত রয়েছে। আর সব রেওয়ায়াতই সহীহ। এখন কোনটাকে গ্রহণযোগ্য হবে, আর কোনটাকে বর্জনযোগ্য হবে? এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। কাজেই তারা অপারগ হয়ে ৭ বার ধৌত করার প্রবক্তা হয়েছেন এবং মাটি দিয়ে ঘষে ধৌত করার বিধানকে পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র) تتريب কে ওয়াজিব বলেন, কিন্তু এটা স্বতন্ত্র ভাবে নয় বরং সাত বারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হিসাবে।

এখন কথা হল তা কখন করতে হবে? কেননা, এ ব্যাপারে তো বিভিন্ন ধরণের শব্দ ব্যবহৃত রয়েছে। মুসলিম শরীফে أُولَاهُنَّ শব্দ রয়েছে। এটাই ইবনে সীরীনের অধিকাংশ শিষ্য বর্ণনা করেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে إِحْدَاهُنَّ শব্দ রয়েছে। আবু দাউদ গ্রন্থে السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ এসেছে। এর উত্তরে বলেন– إِحْدَاهُنَّ টি হল অস্পষ্ট, আর أُولَاهُنَّ এবং السابعة। হল নির্দিষ্ট। কাজেই এখানে إِحْدَاهُنَّ যা মুতলাক এটাকে أُولَاهُنَّ মুকাইয়্যাদ এর উপর প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রথমবার মাটি দিয়ে ঘষে ধোয়ার পর অবশিষ্ট কয়েকবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে।

এখানে প্রশ্ন হল اولاهن ও السابعة উভয়টা তো متعين এবং সহীহ সনদ বর্ণিত। তাহলে اولاهن। কে কেনা গ্রহণ করা হল? ইবনে হাজার (র) এর উত্তরে বলেন, যদি মাটি দ্বারা প্রথমবার ধৌত না করে শেষবার ধৌত করা হয় তাহলে মাটি দিয়ে পাত্রটি ঘষার পর পাত্রে ময়লা থেকে যাবে যা ধৌত করার জন্য পুনরায় আরেকবার ধৌত করার প্রয়োজন দেখা দেবে। ফলে আটবার ধৌত করতে হবে। আর এটা তো ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতের পরিপন্থী। এ কারণে প্রথমবার মাটি দ্বারা ধৌত করবে; শেষ বার নয়।

হানাফী উলামায়ে কেরাম তিনবার ধৌত করাকে ওয়াজিব বলেন, এবং সাতবার ধোয়া বা মাটি দিয়ে ঘষে ধোয়াকে মুস্তাহাব বলেন। ফলে সকল রেওয়ায়েতের উপর আমল হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম মালেক (র) মাটি দিয়ে ঘষার বিধানকে পরিত্যাগ করেছেন। অথচ এটা সহীহ হাদীস, এভাবে শাফেয়ী (র) অষ্টমবার মাটি দিয়ে মাজার বিধানকে পরিত্যাগ করেছেন অথচ এটাও সহীহ হাদীস। যেহেতু আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি শাফেয়ী মাযহাবের পরিপন্থী। এ কারণে তারা উক্ত হাদীসের বিভিন্ন জবাব প্রদান করেছেন। কিন্তু তাদের সকল জবাব ত্রুটিযুক্ত। যেমন কেউ কেউ বলেন, এ হাদীসটা যে সহীহ এটা ইমাম শাফেয়ী (র) এর জানা ছিল না। ইবনে হাজার (র) এর জবাবে বলেন, এ হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যে জ্ঞাত তার জন্য এ মতের প্রবক্তা হওয়া ঠিক নয়।

سوال : هَلِ التَّعْفِيْرُ فِى الثَّامِنَةِ عَلَى الْاِسْتِقْلَالِ او داخِلٌ فِى السَّبْعَةِ وَالَّا فَمَا تَاوِيلُ الْاَحَادِيْثِ؟

প্রশ্ন ঃ কুকুর কর্তৃক মুখ দেয়া পাত্র পবিত্র করার জন্যে অষ্টমবার মাটি দিয়ে ঘষে ধৌত করা একটি পৃথক ব্যবস্থা সাতবারের মধ্যে গণ্য নয়।

উত্তর ঃ অষ্টমবার মাটি দ্বারা ধোয়া পৃথক ব্যবস্থা কি না ঃ কুকুর কর্তৃক মুখ দেয়া পাত্র পবিত্র করার জন্যে অষ্টমবার মাটি দিয়ে মেজে ধৌত করা পৃথক একটি ব্যবস্থা, নাকি তা সাতবারের মধ্যে গণ্য এ সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এর মতে, অষ্টমবার মাটি দিয়ে মেজে ধৌত করা একটি পৃথক ব্যবস্থা। এটি সাতবারের মধ্যে গণ্য নয়। কাজেই কুকুরের মুখ দিয়া পাত্র, সাতবার ধৌত করার পর অষ্টম বার মাটি দিয়ে মেজে ধৌত করতে হবে। কেননা, রাসূল (স) এর বাণী – وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ

২. জুমহুর আলিমদের মতে অষ্টমবার মাটি দিয়ে মেজে ধৌত করা এটা পৃথক ব্যবস্থা নয় বরং সাতবারের মধ্যেই গণ্য। কেননা, হাদীসে عَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ দ্বারা রাসূল (স) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সাতবার ধৌত করার

মধ্যে যে কোন একবার মাটি দিয়ে মেজে ধৌত করবে, সাতবারের পর অষ্টমবার মাটি দ্বারা মাজা নয়। যেমন ইমাম নববী বলেন–

اِنَّ الْمُرَادَ اِغْسِلُوْهُ سَبْعًا وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِالتُّرَابِ مَعَ الْمَاءِ فَكَانَ التُّرَابُ قَائِمٌ مَقَامَ غَسْلِهٖ فَسُمِّيَتْ ثَامِنَةً لِهٰذَا

মোটকথা, মাটি দ্বারা মাজা ওয়াজিব নয় বরং احتياط ও استحباب এর উপর প্রযোজ্য। (শরহে নাসায়ী ঃ ১৩৬)

سوال : حديثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مُعَارِضٌ لِحَدِيْثِ ابْنِ مُغَفَّلٍ فَكَيْفَ التَّفَصِّى عَنْهُ بَيِّنْ مُوَضِّحًا۔

প্রশ্ন ঃ আবু হুরায়রা (র) এর এক বর্ণনায় তিনবার ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। আর ইবনে মুগাফ্ফালের হাদীসে আটবার ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দু'হাদীসের এ বৈপরীত্যের সমাধান কি?

উত্তর ঃ মুহাদ্দিসগণ উক্ত বৈপরীত্যের বিভিন্নরূপ সমাধান দিয়েছেন–

১. কমসংখ্যকবার ধৌত করা বেশীসংখ্যকবার ধৌত করার পরিপন্থী নয়। কারণ কম সংখ্যা বেশী সংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

২. ইমাম ত্বহাবী (র) বলেন, এখানে বিভিন্ন ধরণের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে ওয়াজিব বুঝানোর জন্যে নয় বরং ধৌত করার মধ্যে মুবালাগা বুঝানোর উদ্দেশ্যে যে, পাত্রটি ভালোভাবে ধৌত করবে।

৩. আল্লামা আইনী (র) বলেন, তিনবার ধৌত করার বিধান মারফু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর আটবার ও সাতবার ধৌত করার কথা মাওকুফ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, কাজেই মারফু হাদীস দ্বারা موقوف হাদীসের ওয়াজিবের হুকুম মানসূখ করে দিয়েছে। এখন তিনবার ধৌত করা ওয়াজিব হওয়ার বিধান বহাল রয়েছে।

৪. কোন কোন ব্যাখ্যাকার এর জবাবে বলেন, সাহাবীদের মধ্যে যখন কুকুর প্রীতি মারাত্মকভাবে বসে গিয়েছিল তখন তিনি (স) আটবার ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর যখন তাদের থেকে কুকুরপ্রীতি লোপ পায় তখন তিনবার ধৌত করার নির্দেশ দেন।

৫. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন ৭/৮ বার ধৌত করার বিধান ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। অতঃপর তিনবার ধৌত করার বিধান দেয়া হয়। কাজেই সাতবার ধৌত করার বিধান মানসূখ হয়ে গেছে।

সনদ ও অগ্রগণ্য রেওয়ায়েত সম্পর্কে আলোচনা

ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) তাঁর যুগে সব থেকে বেশী মুখস্ত ও ধী শক্তির অধিকারী ছিলেন। কাজেই তার রেওয়ায়েতটি আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফালের রেওয়ায়েতের উপর প্রাধান্য পাবে। লেখকের মতে ইবনে মুগাফ্ফালের হাদীসের সনদটি সহীহ। (আল জাওহারুন নুকা পৃষ্ঠা নং ২৪১)

আল্লামা আইনী (র) ইমাম বায়হাকী (র) এর কথার উপর আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যদি ترجيح এর কথা বলতে হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফালের রেওয়ায়েত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতের উপর তারজীহ পাওয়ার বেশী যোগ্য। (অর্থাৎ ترجيح এর ক্ষেত্রে বায়হাকীর বক্তব্য সঠিক নয়) কেননা, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল ঐ দশজন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে হযরত উমর (রা) দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি আসহাবে শাজারা তথা বাইআতে রেদওয়ানের সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি আবু হুরায়রা (রা) এর তুলনায় افقه। ছিলেন। কাজেই তার রেওয়ায়েত গ্রহণেই অধিক সতর্কতা বিদ্যমান। সুতরাং তার রেওয়ায়েতটাই প্রাধান্য পাওয়ার বেশী উপযুক্ত। সতর্কতার কারণে তার রেওয়ায়েত এর উপরেই আমল করা হয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) ইমাম বায়হাকীর উক্ত জবাবকে খণ্ডন করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এখানে ترجيح দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ উভয় হাদীসের উপর একত্রে আমল করা সম্ভব। কেননা, ইবনে মুগাফ্ফালের হাদীসের উপর আমল করলে আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসের উপরেও আমল হয়ে যায়। কিন্তু এর বিপরীত সূরতে তা হয় না। কারণ ইবনে মুগাফ্ফালের হাদীসে কিছু শব্দ বেশী আছে। আর এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি আছে যে, اَلزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُوْلَةٌ তথা নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য। عَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ এ অংশটুকু সহীহ এবং নির্ভযোগ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত। ইবনে হাজার বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদে যদি ترجيح এর পন্থা অবলম্বন করতাম তাহলে تتريب তথা মাটি দিয়ে ঘষে পাত্র ধোয়ার প্রবক্তা হতাম না। কেননা,

ইমাম মালেক (র) এর রেওয়ায়াতে تتريب তথা মাটি দিয়ে ঘষে ধৌত করার কথা নেই। এমনকি তার রেওয়ায়াতটি সে সব রাবীদের রেওয়ায়াতের তুলনায় অধিক অগ্রগণ্য যারা تتريب কে সাব্যস্ত করেন। কাজেই আমরা আলোচ্য মাসআলায় নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করে تتريب তথা মাটি দিয়ে ঘষে পাত্র ধৌত করার প্রবক্তা হয়েছি।

উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনে ইমাম নববীর অভিমত

ইমাম নববী (র) প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার ব্যাপারে একটি পন্থা বের করেছেন। আর তা হল- اِغْسِلُوْهُ سَبْعًا وَاحِدَةً مِّنْهُنَّ بِالتُّرَابِ مَعَ الْمَاءِ

পাত্রকে সাতবাবার ধৌত করবে এবং এর মধ্যে থেকে একবার মাটি ও পানি উভয়টার সমন্বয়ে ধৌত করবে। কাজেই এক্ষেত্রে মাটি দিয়ে ধৌত করাটা একবার ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত হল। যখন মাটি দ্বারা ধৌত করাটা একবার ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত হল তো কেমন যেন আটবারই পাত্রটি ধোয়া হলো। কাজেই এক্ষেত্রে تسبيع ও تثمين সাতবার বা আটবার ধৌত করার উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় হয়ে গেলো।

ইমাম নববীর বক্তব্যের উপর ইবনে হাজারের মন্তব্য

ইমাম নববী (র) এর উক্ত আলোচনার উপর স্বয়ং ইবনে হাজার আসকালানী (র) খুশি হতে পারেননি। তিনি বলেন, ইবনে দাকীকুল ঈদ উক্ত আলোচনার উপর বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, وعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتراب এর দ্বারা একথা স্পষ্ট বুঝে আসে যে, অষ্টমবার মাটি দিয়ে ঘষাটা স্বতন্ত্রভাবে হওয়া চাই। যা সাতবার ধৌত করার বিধান থেকে পৃথক হবে। অতঃপর ইবনে দাকীকুলঈদ নিজের পক্ষ থেকে উক্ত আলোচনার উপর একটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, যদি পাত্রটি প্রথমেই মাটি দ্বারা ধৌত করা হয়। অতঃপর পানি দ্বারা পাত্রটি সাতবার ধৌত করা হয় তাহলে এক্ষেত্রে পাত্রটি আটবার ধৌত করাও হল এবং সাতবার ধৌত করার রেওয়ায়াতের উপরেও আমল হয়ে গেল। এখানে রূপকভাবে تتريب এর উপর গোসল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

ইমাম নববী ও দাকীকুলঈদের বক্তেব্যর উপর বজলুল মাজহুদ গ্রন্থকারের মন্তব্য

আবু দাউদের ব্যাখ্যাকার আল্লামা খলীল আহমদ (র) উক্ত আলোচনার প্রতি উত্তরে বলেন, ইমাম নববী ও ইবনে দাকীকুলঈদের তাবীল দ্বয়ীফ (দুর্বল) ও অযৌক্তিক। কারণ এর দ্বারা রাসূল (স) এর বাণী الثامنة কে পরিত্যাগ করা হয়। কেননা, নবী (স) এর উক্ত বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য হল- وَفِى الْغَسْلَةِ الثَّامِنَةِ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ তথা অষ্টমবার পাত্রটিকে মাটি দিয়ে ঘষে ধৌত করবে। আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, পানি ব্যতীত পাত্র ধৌত করা সম্ভবনয়। কাজেই অষ্টমবার মাটির সাথে সাথে পানি দিয়ে পাত্র ধৌত করাও জরুরী। কাজেই এর দ্বারা ইমাম দাকীকুলঈদের তাবীল খণ্ডিত হল। কারণ তিনি অষ্টমবার মাটি দ্বারা পাত্র ধৌত করার প্রবক্তা নন। অনুরূপভাবে তিনি শুধুমাত্র মাটি দিয়ে পাত্র ঘষার কথা বলেছেন। মাটির সাথে পানি ব্যবহার করার কথা বলেননি। এটা যাহেরী মাযহাবের পরিপন্থী।

ইমাম নববী (র) এর তাবীলের জবাব হল تتريب তথা মাটি দিয়ে ঘষে ধৌত করার বিধানটি অষ্টমবার হতে হবে এবং এটা সাতবার ধোয়ার অষ্টমবার হতে হবে। আর এটা সাতবার ধোয়ার হুকুম থেকে পৃথক হতে হবে। অথচ তিনি অষ্টমবার পাত্র ধৌত করার প্রবক্তা নন। অনুরূপভাবে অষ্টমবারেই মাটি দিয়ে পাত্রটি ধৌত করতে হবে। এরও প্রবক্তা নন। কাজেই তার তাবীল হাদীসের পরিপন্থী হওয়া স্পষ্ট।

অন্য মাযহাব খণ্ড না করার ক্ষেত্রে ইমাম ত্বহাবীর মতামত

ইমাম ত্বহাবী (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল উক্ত হাদীসে সপ্তমবারের পর অষ্টমবার মাটি দিয়ে ধৌত করার প্রবক্তা। হাদীস সহীহ হওয়া সত্ত্বেও কেউ অষ্টমবার ধৌত করাকে ওয়াজিব বলেন না। কাজেই ইমাম ত্বহাবী (র) উক্ত হাদীস এর মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করেছেন। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে যদি সাতবার ধৌত করা ওয়াজিব হয় তাহলে অষ্টমবার মাটি দ্বারা পাত্রটি ধৌত করার বিধানটি আরো

উত্তমরূপে ওয়াজিব হওয়া চাই। কারণ ইবনে মুগাফ্ফালের বর্ণনায় অতিরিক্ত অংশ রয়েছে। আর الزيادة أولى من الناقص তথা زيادة - ناقص থেকে উত্তম। আর এর অতিরিক্ত অংশটাতো নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বর্ণিত। কাজেই যারা হানাফীদের উপর আক্রমনাত্মক কথা বলেন সাতবার ধৌত করার হাদীস পরিত্যাগ করার কারণে, তাদের উপর আমাদের অভিযোগ হল তারা আটবার ধৌত করার হাদীসকে কেন পরিত্যাগ করেন?

ইমাম ত্বহাবীর বক্তব্যের উপর ইবনে হাজার (র) এর মতামত

ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, শাফেয়ীগণ ইবনে মুগাফ্ফালের ظاهر حديث এর প্রবক্তা না হওয়ায় তার হাদীস সম্পূর্ণ ত্যাগ করা অনিবার্য হয়। কারণ শাফেয়ী মাযহাবের পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের উপর আমল না করার ওযর বর্ণনা করা হয়েছে। যদি তা সঠিক হয় তাহলে আমরা উক্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত, অন্যথায় হাদীস ত্যাগ করার দিক দিয়ে আমরা উভয় পক্ষ বরাবর। (ফাতহুল বারী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৪২)

ইবনে হাজারের বক্তব্যের উপর যফর আহমদ উসমানী (র) এর মন্তব্য

আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (র) ইবনে হাজারের উক্ত বক্তব্যের জবাবে বলেন, হানাফী উলামা কখনই হাদীসের উপর আমল করাকে পরিত্যাগ করেননি। বরং হানাফীগণ সাতবার ধৌত করা ও অষ্টমবার মাটি দ্বারা ধৌত করার বিধানকে মুস্তাহাব এবং তিনবার ধৌত করাকে ওয়াজিব বলেন। তিনি বলেন রেওয়ায়েতের মতানৈক্যের দ্বারা এ কথা স্পষ্ট বুঝে আসে যে, ৭/৮ বার ধৌত করার দ্বারা ওয়াজিব বুঝানো উদ্দেশ্য নয় বরং ধৌত করার ক্ষেত্রে মুবালাগা বা আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ খুব ভালো ভাবে পাত্রটি ধৌত করবে যাতে নাজাসাত না থাকে। আর তিনবার ধৌত করা ওয়াজিব। কারণ এর কম কোন রেওয়ায়াতে বর্ণিত নেই। (ইস্তাদরাকুল হাসান ৯৫/১)

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা

রাবী সম্পর্কে আলোচনা ঃ قوله عن ابى التياح ঃ ইনি আলোচ্য হাদীসের রাবীদের একজন। তার আসল নাম হল ইয়াযীদ ইবনে হুমাইদ বসরী। তিনি সিহাহ সিত্তার রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। মুহাদ্দিসগণ তাকে সিকা সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) তার সম্পর্কে বলেন তিনি সিকা রাবী।

অনুরূপভাবে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আবু যুর‘আ এবং নাসায়ী গ্রন্থকার তাকে সিকা সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে সা'দ ও ইবনে হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য রাবী সাব্যস্ত করেছেন। তিনি ১২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

مطرف ঃ ইনি হল আবু তাইয়্যাহ এর উস্তাদ। তার পিতার নাম হল عبد الله بن الشخير - ش বর্ণটি যের সহকারে এবং خ বর্ণটি তাশদীদ সহকারে পড়তে হবে। ইনিও সিহাহ সিত্তার রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে হিব্বান, ইবনে সা'দ প্রমুখ তাকে নির্ভরযোগ্য রাবী সাব্যস্ত করেছেন। তিনি হুজুর (স) এর যুগে ভূমিষ্ট হন। তিনি বসরার অধিবাসী ছিলেন। ইবনে সা'দ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তার অনেক ফাজায়েল ও মানাকেব বর্ণনা করেছেন। তিনি ৯৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

سوال : اذكر نبذة من حياة سيدنا عبد الله بن المغفل رح

প্রশ্ন ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) এর জীবনী লেখ?

উত্তর ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) এর জীবনী ঃ

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আবু সাঈদ, আবু আব্দুর রহমান। পিতার নাম মুগাফফাল। তিনি মুযানী গোত্রের একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। অতএব বংশ পরম্পরা হলো আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল ইবনে আবদে গানম বা নুহম ইবনে আফীফ ইবনে আছহাম, ইবনে রাবীয়া ইবনে আদী ইবনে সা'লাবা ইবনে যুয়াইব আল মুযানী।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ তিনি ষষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

জিহাদ ঃ ইসলাম গ্রহণ করে তিনি সর্ব প্রথম হুদাইবিয়ার সন্ধিতে যোগদান করেন। ইকমাল গ্রন্থকারের মতে তিনি হুদায়বিয়ার বৃক্ষের নীচে বাইয়াত কারীদের একজন। খায়বার যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি রাসূল (স) এর সঙ্গী ছিলেন। নবম হিজরীতে সাওয়ারী ও মালের অভাবে তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে না পেরে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। অতঃপর ইবনে ইয়াসীন নামে এক ব্যক্তির সাহায্যে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (র) এবং তাঁর এক সাথী আবদুর রহমান ইবনে কা'ব (রা) তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাদের এ নিঃস্বতা বর্ণনায় সূরা তওবার নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়–

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ (توبة - ٩١)

হযরত ওমর (রা) এর যুগে ইরাকী বাহিনীতে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

গুণাবলী ঃ তিনি একজন প্রাজ্ঞ সাহাবী ছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তিনি পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। হাসান বসরী (র) বলেন, বসরা শহর বিজিত হলে হযরত উমর (রা) বসরার লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্যে যে দশজন সাহাবীকে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (র) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হাসান বসরী (র) বলতেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (র) অপেক্ষা অধিক বুযুর্গ ব্যক্তি আজ পর্যন্ত বসরায় আগমন করেননি। তিনি ছিলেন বাইয়াতে রিযওয়ানে বৃক্ষের নিচে বাইয়াত গ্রহণকারীদের অন্যতম।

বসবাস ঃ তিনি প্রথমতঃ মদীনায় বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর হযরত উমর (রা) এর আমলে বসরায় চলে যান। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বসরাতেই ছিলেন।

হাদীস বর্ণনা ঃ হাদীস শাস্ত্রে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। তিনি রাসূল (স), হযরত আবু বকর (রা), ওসমান (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে সালিম থেকে সর্বমোট ৪৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম যৌথভাবে চারটি, এককভাবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম একটি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে অসংখ্য মনীষী হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন হুমাইদ ইবনে হিলাল (র) সাবিত বুনানী। মুতাররিফা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর, মুয়াবিয়া ইবনে কুররাহ, উকবা ইবনে সুহবান (রা), হাসান বসরী, সাইদ ইবনে জুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনে বুযাইদাহ, তাঁর পুত্র ইয়াযীদ (র) প্রমুখ।

ওফাত ঃ তিনি মতান্তরে ৫৭ / ৫৯ / ৬০ হিজরী সনে বসরায় ওফাত লাভ করেন। আবু বারযা আসলামী (র) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তাঁকে বসরায় সমাহিত করার হয়। ওফাতকালে তাঁর সাতজন সন্তান সন্তুতি ছিল।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য– ইকমাল ৬০৫, উসদুল গাবাহ ৩/৩৯৫-৩৯৬ ইসাবা, ২/৩৭২ ইত্যাদি।)

কুকুরের ঝুটা মাটি দ্বারা পবিত্র করার বৈজ্ঞানিক রহস্য

জার্মানির প্রসিদ্ধ ডাক্তার ক্রখ লিখেন, আমাকে কুকুরে কামড়াবার চিকিৎসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি মুহাম্মাদ (স) এর নীতিমালার অনুসরণ করি। রাসূল বলেন কুকুরের ঝুটার পাত্রকে সাতবার ধৌত করবে এবং অষ্টমবার মাটি দ্বারা ধৌত করবে। কাজেই এর রহস্য জানার জন্যে আমি মাটির সকল প্রকার উপাদানকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতঃ কুকুরের চিকিৎসায় তা ব্যবহার করতে শুরু করলাম। অবশেষে আমার নিকট একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুকুরের ঝুটার বিষাক্ত প্রভাব দূর করণের জন্যে মাটিই একমাত্র উপাদান। তাই আমি মাটির উপাদানগুলো নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলাম এবং প্রতিটি উপাদানকে কুকুর কাটা রোগে পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার শুরু করলাম। অবশেষে নওশাদর ব্যবহার করতেই রহস্য উম্মোচিত হয়ে যায় যে, এটা ঐ রোগের ঔষধ। কাজেই নবী (স) মাটি দিয়ে পাত্র ধৌত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কারণ মাটিতে সব সময় নওশাদর থাকে। আর মাটি সর্বদা হাতের কাছেই পাওয়া যায়। আর যদি তিনি নওশাদর দিয়ে পাত্র ধোয়ার নির্দেশ দিতেন তবে অনেক সময় তা পাওয়া অসম্ভব হয়ে যেত। পরিশেষে তিনি বলেন, সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে অদ্যাবধি তাঁর সমকক্ষ্য কোন হাকীম চিকিৎসক সৃষ্টি হয়নি। (আহকামে ইসলাম আকল কি নজর মেঁ)

কুকুরের লালায় রোগ জীবাণু থাকে। পানি দ্বারা যতই পাত্র ধোয়া হোক না কেন, তার প্রভাব কিছু না কিছু থাকবেই। কিন্তু মাটি দ্বারা ঘষলে সেই জীবাণু দূর হয়ে যায়। জনৈক বিজ্ঞানী কুকুরকে খুব ভাল বাসতেন এবং এক সাথেই থাকতেন। ইসলামের এ বিধানের কথায় তিনি অবাক হন। অতঃপর বিষয়টিকে নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। তিনি হাতে কিছু খাদ্যদ্রব্য নিলেন। অতঃপর কুকুর তা জিহ্বা দ্বারা চেটে ভক্ষণ করল। অতঃপর পানি দ্বারা হাত ধৌত করে অনুবিক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখেন যে, হাতে অনেক জার্ম ও জীবাণু রয়েছে। তারপর তিনি এভাবে প্রতিবার ধৌত করে অনুবিক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখতে থাকেন। তিনি দেখলেন ঐ জীবাণু ধৌত করার দ্বারা নিঃশেষ হয় না। অতঃপর যখন মাটি দ্বারা ধৌত করলো তখন ঐ জীবানুগুলো সমূলে বিনাশ হয়ে গেলো। এরপর তিনি রাসূলের এ বাণীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এবং কুকুর প্রীতি ত্যাগ করলেন।

سُؤْرُ الْهِرَّةِ

٦٨. اخبرنا قُتَيْبَةُ عن مالكٍ عن اسحٰق بْنِ عبدِ اللّٰهِ بنِ ابى طلحةَ عن حميدةَ بنتِ عُبَيْدِ ابنِ رفاعةَ عن كبشةَ بنتِ كعبِ بْنِ مالكٍ رضى الله عنها انّ ابا قتادةَ دخل عليها ثم ذكرتْ كلمةً معناها فسكبتُ له وَضُوءًا فجاءتْ هِرَّةٌ فشربتْ منه فاصغى لها الاناءَ حتّى شربتْ قالتْ كبشةُ فرانى انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنةَ اخى فقلتُ نعم قال انّ رسولَ اللّٰه ﷺ قال انّها ليستْ بنجسٍ انّما هى من الطوّافين عليكم والطوّافاتِ -

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

অনুবাদ ঃ ৬৮. কুতায়বা (র)........কাবশা বিনতে কা'ব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু কাতাদা (রা) একদিন তাঁর নিকট আগমন করেন। তারপর কাব্‌শা কিছু কথা বলেন, তার অর্থ হচ্ছে ঃ আমি আবু কাতাদা (রা)-এর জন্য উযূর পানি এন রাখলাম। ইত্যবসরে একটি বিড়াল এসে তা থেকে পানি পান করল। আবু কাতাদা (রা) পাত্রটি কাত করে দিলে বিড়ালটি আরও পানি পান করল। কাব্‌শা বলেন, আবু কাতাদা (রা) আমাকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাতিজী! (আমি বিড়ালকে পাত্র থেকে পানি পান করিয়েছি তা দেখে) তুমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, রাসূল-ল্লাহ (স) বলেছেন যে, বিড়াল অপবিত্র নয়। কারণ বিড়াল প্রতিনিয়ত তোমাদের আশে পাশে ঘোরাঘুরীকারী প্রাণীদের অন্যতম।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : اكتب المسئلة فى طهارة سؤر الهرة

প্রশ্ন ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়ার মাসআলা লেখ। অথবা–

প্রশ্ন ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য কি দলীল সহকারে লেখ।

উত্তর ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ ঃ বিড়ালের ঝুটার বিধান কি? এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালেক, ইসহাক ও আবু ইউসুফ (র) এর প্রসিদ্ধ মত হল বিড়ালের ঝুটা পবিত্র।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র) এর মতে বিড়ালের ঝুটা পবিত্র কিন্তু মাকরূহ। অতঃপর এ মাকরূহ সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে– ১. ইমাম ত্বহাবী (র) বলেন, এটা মাকরূহে তাহরীমী, আর ইমাম কারখী (র) বলেন মাকরূহে তানযীহী। অধিকাংশ হানাফী কারখী (র) এর মতকে প্রাধান্য দিয়ে মাকরূহে তানযীহীর উপর ফাতোয়া দিয়েছেন। (দরসে তিরমিযী ৩২৬/১, দরসে মিশকাত ১৮৭/১)

জুমহুরের দলীল ঃ

١. حديثُ ابى قتادةَ اَصْغى لها الاناءَ حتّى شربتْ

হযরত আবু কাতাদা (র) পাত্রটি তার জন্য কাত করে ধরলেন এমনকি বিড়াল তা থেকে পানি পান করল।

٢. عنْ قتادةَ قال قال رسولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم انّها (اى الهرة) ليستْ بنجسٍ انّها من الطوّافين عليكم والطوّافاتِ

আবু কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। কেননা, তা তোমাদের নিকট ঘনঘন বিচরণকারী বা বিচরনকারিনী। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

٣. عن عائشةَ رض قالتْ اَنّ رَسولَ اللّٰه صلى الله عليه وسلم قالَ اِنّها ليستْ بنَجسٍ اِنّما هِى مِن الطوّافينَ عليكُم . وقد رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتوضّأ بفضلِها .

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিড়াল অপবিত্র (প্রাণী) নয়, এরা তোমাদের আশেপাশেই ঘুরাফেরা করে। অতঃপর আয়েশা (রা) আরো বলেন, আমি রাসূল (স) কে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা উযূ করতে দেখেছি। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ বিহীন পাক। যেহেতু নবী (স) এখানে মাকরূহ বা অপছন্দের কথা উল্লেখ করেননি।

٤. عن عائشةَ رض قالتْ كنتُ اَغتَسِلُ انا ورسولُ اللّٰه صلعم مِنْ اناءٍ واحدٍ وقد اصابتِ الهرُّ منه قبلَ ذالك .

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি এবং রাসূল (স) একটি পাত্র থেকে গোসল করছিলাম। অথচ গোসল করার পূর্বে বিড়াল তাতে মুখ দিয়েছিল। এ হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় বিড়ালের ঝুটা পবিত্র। যদি পবিত্র না হবে তাহলে নবী (স) উক্ত পাত্র দ্বারা (বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা) কিভাবে গোসল করলেন।

হানাফীদের দলীল

١. عن ابى هريرةَ رض اَنّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال ... واذا ولغتْ فيه الهرّةُ غُسِلت مرّةً.

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন ----- যদি বিড়াল কোন পাত্র লেহন করে তবে তা একবার ধৌত করতে হবে। (আবু দাউদ ১/১০, তিরমিযী ১/২৭)

٢. عن ابى هريرة رض قال ..... يُغسَلُ الاناءُ مِن الهِرّ كما يُغسَلُ مِن الكلبِ .

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বিড়াল মুখ দিলে পাত্র এরূপভাবে ধৌত করতে হবে যেরূপভাবে ধৌত করতে হয় কুকুর মুখ দিলে। (ত্বহাবী-১/১১)

উল্লেখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি মাকরূহও না হত তাহলে তিনি ধোয়ার হুকুম দিতেন না।

তৃতীয় দলীল ঃ এরূপভাবে ত্বহাবী (র) স্বীয় কিতাবে ইবনে উমর (র) এর উক্তিও বর্ণনা করেছেন–

حدّثنا ابنُ عمرَ رضى الله عنه لاتَوضّؤُا مِنْ سُورِ الحِمار ولا الكلبِ ولا السِنّورِ .

অর্থাৎ ইবনে উমর আমাদের কে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা গাঁধা, কুকুর ও বিড়ালের উচ্ছিষ্ট দ্বারা উযূ কর না। উক্ত হাদীসটিও অন্তত মাকরূহ হওয়ার দাবী রাখে।

٤. كذلك اخرج رواية معمر موقوفا على ابى هريرة فى الهر بلغ فى الاناء قال اغسله مرة واهرقه .

অনুরূপভাবে মাওকূফসূত্রে মামার আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বিড়াল কোন পাত্রে মুখ দিলে, পাত্রকে একবার ধৌত করবে এবং তা ঢেলে ফেলে দিবে।

٥. عن ابى هريرةَ رض ان النبىّ صلعم قال طهورُ الاناءِ اذا ولَغَ فيه الهرّةُ يُغسَلُ مرّةً او مرّتينِ ،

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত নবী (স) বলেন, কুকুরে লেহনকৃত পাত্র যখন এক অথবা দু'বার ধৌত করা হবে তখন তা পবিত্র হয়ে যাবে।

٦. عن ابى هريرةَ رض قال قالَ رسولُ الله صلعم السِنّورُ سَبُعٌ (رواه الحاكم والدار قطنى والبيهقى)

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন বিড়াল চতুষ্পদ জন্তুর অন্তর্ভূক্ত।

কাজেই বিড়ালের ঝুটা নাপাক হওয়ার ছিল। কিন্তু পূর্বের পাঁচটি দলীলের কারণে তার মধ্যে خفت বা হালকা অবস্থা এসে গেছে। কাজেই তা মাকরূহ হবে এবং হানাফী মাযহাবে মাকরূহে তানযীহী হওয়ার পরেই ফতওয়া।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ ১. আবু কাতাদার হাদীসকে ইবনে মানদা معلول বলেছেন, কেননা, এর রাবী كبشة ও حميدة উভয়ই مجهول বা অজ্ঞাত।

২. صاحب الجوهر النقى গ্রন্থকার বলেন, উক্ত হাদীসের সনদে اضطراب রয়েছে।

৩. হযরত আয়েশা (রা) এর বর্ণিত হাদীস اِنّهُ لَيستْ بِنَجِسٍ অংশটি দুটি হাদীসে এসেছে। আর উভয়টি جهالت رواى এর কারণে دليل হিসাবে গ্রহণের উপযুক্ত নয়।

৪. **তিন ইমামের দলীল** হিসাবে প্রদত্ত উভয় হাদীসে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, বিড়ালের ঝুটা মাকরূহ ছাড়াই যদি পবিত্র হত তাহলে নবী করীম (স) পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করতেন انها طاهرة তথা বিড়ালের ঝুটা পবিত্র। এমনভাবে পেঁচিয়ে বলা দরকার ছিল না যে, انها ليست بنجس এতে বুঝা যায় যে, বিড়ালের ঝুটা সত্ত্বাগতভাবে তা নাপাকই কিন্তু তা গৃহে অধিক বিচরণকারী বিধায় তা ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে এটা পরিপূর্ণ পাকও নয়। এ কারণটিই মাকরূহে তানযীহী হওয়ার প্রমাণ যা হানাফীগণ বলে থাকেন।

৫. মাকরূহে তানযীহীও বৈধতার একটি অংশ। অতএব, তিন ইমামের দলীল বৈধতা বা জায়েয বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর হানাফীদের রেওয়ায়েত মাকরূহ তানযীহীর উপর প্রযোজ্য। (বজলুল মাজহুদ ৪৯/১, তানযীমুল আশতাত১৮৬/১)

৬. جواب انکاری ঃ তাদের পেশকৃত রাসূল (স) এর হাদীস–

عن قتادة قال قال رسول الله صلعم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم او الطوافات

এর উত্তর এই যে, তিনি এটা এ কথা বুঝানোর জন্য বলেছেন যে, শিকার বা ক্ষেত খামারের জন্য কুকুরের মত এটাকেও জায়েয রাখা আছে। এর সংস্পর্শের দ্বারা কাপড় অপবিত্র হয় না। কিন্তু একথা গ্রহণযোগ্য নয় যে, হাদীসের দ্বারা বিড়ালের ঝুটার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে।

جواب تسلیمی ঃ আর যদি আমরা এটা মেনেও নেই। তাহলেও এটা আমাদের বিপক্ষে দলীল হতে পারে না। কেননা, রাসূল (স) এর বাণী– انها من الطوافين عليكم او الطوافات এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বিড়ালের ঝুটা সাধারণ পানির মত নয় বরং এতে মাকরূহ এর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তাছাড়া এও হতে পারে যে, এটা আবু কাতাদার নিকটও মাকরূহ ছিল। কিন্তু তারা মাকরূহ কাজকে করতেন জায়েয বর্ণনা করার জন্যে। অপরদিকে আয়েশা (রা) এর হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসের সাথে تعارض হচ্ছে, আর এই تعارض এর ক্ষেত্রে সনদ ও মতনের বিবেচনায় আবু হুরায়রা (র) এর হাদীসটি আয়েশা (রা) এর হাদীসের উপর প্রাধান্য পাবে। মতনের ক্ষেত্রে তার বর্ণনাটির উদ্দেশ্য স্পষ্ট। আর সনদের ক্ষেত্রে তার সনদটি আয়েশা (রা) এর সনদের তুলনায় শক্তিশালী। কেননা, তার বর্ণনাটি তিনটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম সূত্রে বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান আবু রিজাল থেকে অথচ তাদের পরস্পরের মধ্যে সামাআত তথা শ্রবণ প্রমাণিত নেই।

দ্বিতীয়সূত্রে সুফিয়ান হারেসা ইবনে আবু রিজাল থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হারেসা মুহাদ্দিসীনের নিকট হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল হিসেবে বিবেচিত।

তৃতীয় সূত্রে সালেহ ইবনে হিসান বর্ণনা করেছেন। তিনি মাতরূকুল হাদীস। অর্থাৎ তার হাদীস অগ্রহনযোগ্য। অর্থাৎ প্রথম সূত্রে এটা منقطع দ্বিতীয় সূত্রে দুর্বল তৃতীয় সূত্রে অগ্রহণযোগ্য। আর মাকরূহ বর্ণনাকারী হাদীস সমূহ সিহাহ সিত্তাই উল্লেখ আছে এবং এগুলো বিশুদ্ধ হাদীস। আর সহীহ হাদীসের মুকাবেলায় দুর্বল হাদীস প্রমাণ হতে পারে না। এ ছাড়াও সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীদের বর্ণনা আমাদের মাযহাবের অনুকূলে। সুতরাং হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হল যে, বিড়ালের ঝুটা মাকরূহ। (শরহে ত্বহাবী পৃষ্ঠা নং ৭১৮)

যৌক্তিক দলীলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

কোন প্রাণীর ঝুটার হুকুম তার গোশতের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। যদি গোশত পাক হয় তাহলে তার ঝুটাও পাক হবে। আর যদি গোশত নাপাক হয় তাহলে তার ঝুটাও নাপাক হবে। সুতরাং গোশত চার প্রকারের হয়ে থাকে–

১. কোন কোন প্রাণীর গোশত পাক এবং সেটা খাওয়াও হয়। যেমন উট, গরু, বকরী, মহিষ সর্বসম্মতিক্রমে এগুলোর গোশত পবিত্র। আর লালা যেহেতু হালাল গোশতের সংস্পর্শে তৈরী হয় তা এগুলোর ঝুটাও সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র।

২. দ্বিতীয় প্রকার হল, গোশত পবিত্র কিন্তু তা ভক্ষণ করা হয় না। যেমন মানুষের গোশত, মানুষের ঝুটা পবিত্র। কারণ লালা পবিত্র গোশতের সংস্পর্শে তৈরী হয়েছে।

৩. তৃতীয় প্রকার হল হারাম গোশত এবং যার হারাম হওয়াটা কুরআনের দ্বারা প্রমাণিত। যেমন শূকরের গোশত। এর ঝুটা সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। কারণ তার লালা হারাম গোশতের সংস্পর্শে তৈরী হয়েছে।

৪. হারাম গোশত, যার হারাম হওয়াটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন পালিত গাধা, হিংস্র প্রাণীর গোশত। পূর্বের তিন প্রকারের ঝুটার হুকুম সর্বসম্মতিক্রমে যখন তার গোশতের ভিত্তিতে হয়েছে। সুতরাং চতুর্থ প্রকারের গোশতের হুকুমও সর্ব সম্মতভাবে তার গোশতের ভিত্তিতে হবে। হিংস্র প্রাণী ও পালিত গাঁধার গোশত যেহেতু নাপাক। তাই তার ঝুটাও নাপাক হবে। আর বিড়াল যেহেতু হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। তাই তার ঝুটা নাপাক হওয়ার কথা ছিল। (যেমন রাসূলের বাণী السنور سبع) আর যুক্তির দাবিও এটাই। কিন্তু রাসূল (স) এর বিভিন্ন হাদীসের কারণে আমরা তার ঝুটাকে মাকরূহ বলি। যথা-

١. انّها لَيْسَتْ بِنَجِسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكم اوِ الطَّوَّافَاتِ ـ

٢. كنتُ اَغْتَسِلُ انا ورسولُ اللّه صلعم مِنَ الاناءِ الواحدِ وقدْ اصابَتِ الهِرُّ منه قبلَ ذالك ـ

٣. كانَ رسولُ اللهِ صلعم يُصْغِى الاناءَ لِلهِرَّةِ ويتوضَّأُ بفَضْلِه ـ

দ্বিতীয়তঃ বিড়ালের গোশত ও গৃহ পালিত গাঁধার গোশত খেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তার গোশত মাকরূহ। সুতরাং তার ঝুটার হুকুমও এরূপ হবে। যেহেতু ঝুটা গোশত থেকে সৃষ্ট। (নজের ত্বহাবী ২৭/২৮, শরহে ত্বহাবী ৭১৮)

আলোচ্য হাদীসের রাবী সম্পর্কে আলোচনা ঃ قوله عن كبشة بنت كعب ঃ এটা কাবশার রেওয়ায়াত। তিনি حميدة بنت عبيد এর খালাও আবু কাতাদার পুত্রবধু ছিলেন। তার স্বামীর নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে হিব্বান। তাকে সাহাবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, আমি আবু কাতাদার পুত্রবধু ছিলাম। আমি একদা আবু কাতাদার জন্য উযূর পানি ঢেলে আনলাম। এ সময় একটি বিড়াল এসে উযূর পানি থেকে পানি পান করতে লাগল। আর হযরত আবু কাতাদা তার জন্য পাত্রটি আরো কাত করে ধরলেন, যাতে করে বিড়ালটি সহজেই পাত্র থেকে পানি পান করতে পারে। আবু কাতাদার উক্ত কাজের কারণে আমি আশ্চার্যান্বিত হলাম। অতঃপর তিনি আমাকে দেখে বলেন, হে ভাতিজি! তুমি কি এটা দেখে আশ্চর্যবোধ করছ? (ভাতিজী? এ শব্দটি আরবে স্নেহ-সূচক সম্বোধনের জন্য ব্যবহার করা হয়। আর আলোচ্য আলোচনায় এটাই উদ্দেশ্য। কেননা, তিনি সম্পর্কের দিক দিয়ে পুত্রবধু ছিলেন) তিনি তখন উত্তর দিলেন হ্যাঁ, তার বিস্ময় দেখে আবু কাতাদা বললেন, রাসূল (স) বলেছেন বিড়াল নাপাক নয়। কেননা, তা তোমাদের নিকট ঘনঘন বিচরণকারী। উক্ত হাদীসের অংশটুকু কুরআনের আয়াত থেকে উদ্ধৃত। কুরআনের আয়াত– طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

কোন কোন বর্ণনায় او এসেছে তাই ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, او এখানে شك এর জন্য ব্যবহৃত হয়নি। কেননা, নাসায়ীর রেওয়ায়েতে واو এসেছে। বরং তাদের শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করার জন্য তথা পুংলিঙ্গের জন্য طَوَّافُوْن আর স্ত্রী লীঙ্গের জন্য طوافات ব্যবহৃত হয়েছে।

اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ **দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ** রাসূল (স) তার আলোচ্য বাণী দ্বারা এটি বুঝিয়েছেন যে, বিড়াল একটি গৃহপালিত প্রাণী। ঘরের প্রতিটি স্থানেই তার বিচরণ রয়েছে। সুতরাং তার অভ্যাস অনুযায়ী প্রতিটি স্থানেই সে মুখ দেবে। খাদ্যদ্রব্য বা পানি তার মুখ হতে হেফাজত করা কষ্টকর। অতএব, শরীয়ত এদের উচ্ছিষ্টকে নাপাক বলে, ঘোষণা করলে এটা মানুষের জন্য সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। তাই রাসূল (স) এ সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করে তা পাক হওয়ার কথা বলেছেন।

قوله فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ ঃ **এর ব্যাখ্যা ঃ** হযরত আবু কাতাদা (রা) পাত্রটি তার জন্য কাত করে ধরলেন যাতে করে বিড়ালটি পাত্র থেকে পানি পান করতে পারে। এরূপ করার কারণ হল যদি তিনি এমন না করতেন তাহলে তাঁর পুত্র বধূ ধারণা করত যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট হারাম, এরূপ ধারণা যেন সৃষ্টি না হয় সে জন্য তিনি এরূপ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, প্রয়োজনে নামাযের মধ্যে ইশারা করাও জায়েয আছে। যদি তা নামাযের পরিপন্থী আমলে কাসীর না হয়। আর এটাও জানা যায় যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অযূ করা জায়েয আছে। যদিও বিশুদ্ধ পানি বিদ্যমান থাকতে তা দ্বারা অযূ না করাই উত্তম বটে। ভালো পানি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে বিড়ালের ঝুটা পানি দ্বারা উযূ করা যাবে তা দেখানোর জন্যই হযরত আবু কাতাদা (রা) এরূপ করেছেন। এটা ইমাম আবু হানীফা ও তার অনুসারীদের অভিমত।

بَابُ سُؤْرِ الْحِمَارِ

٦٩. اخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يزيدَ حدّثنا سفيانُ عن ايوبَ عن محمدٍ عن انسٍ قال اتانا مُنادِي رَسولِ اللّٰهِ ﷺ فقال اِنّ اللّٰهَ ورسولَه يَنْهاكُم عن لُحومِ الحُمُرِ فانّها رِجْسٌ -

অনুচ্ছেদ ঃ গাধার উচ্ছিষ্ট

অনুবাদ ঃ ৬৯. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (র)..........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (স) এর ঘোষণাকারী এসে বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) তোমাদের জন্য গাধার গোশ্ত (খেতে) নিষিদ্ধ করেছেন। কেননা, তা অপবিত্র।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : اكتب اختلافَ العُلماءِ فِي سُؤرِ الحِمار مُوَضّحًا

প্রশ্ন ঃ গাধার উচ্ছিষ্ট পানির ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য কি? স্পষ্ট ভাষায় লেখ।

উত্তর ঃ গাধার উচ্ছিষ্ট পানির ব্যাপারে ইমামদের মতামত

গাধার উচ্ছিষ্ট পানি পাক না নাপাক এ ব্যাপারে ইমাদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী (র) এর অভিমত ও দলীল

ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে, গাধার উচ্ছিষ্ট পাক। কেননা, প্রত্যেক জীবের চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। আর গাধার চামড়া দ্বারা যখন উপকার অর্জন করা যায়। তখন তার উচ্ছিষ্ট পাক হতে আপত্তি কোথায়? দ্বিতীয়তঃ হযরত জাবের (রা) এর বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসও এর পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত ও দলীল

ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে গাধার উচ্ছিষ্ট নাপাক। যেমন হাদীসে এসেছে–

انه عليه السلام اَمَرَ مُنادِيًا يُنادِي بِاِكْفاءِ القُدورِ الّتي فيها لُحومُ الحُمُرِ فانّها رِجْسٌ (رواه الطحاوى)

নবী (স) একজন ঘোষককে নির্দেশ দিলেন সে যেন পালিত গাধার গোশত ভর্তি পাত্রকে উল্টায়ে দেয়ার ঘোষণা দেয়। কেননা, তা নাপাক। (ত্বহাবী)

٢. عن انسٍ قال اتانا منادِي رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقال اِنّ اللّٰهَ ورسولَه يَنْهاكُم عن لُحومِ الحُمُرِ فِانّها رِجْسٌ

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাসূল সা. এর ঘোষক এসে বললেন– আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা, তা অপবিত্র।

৩. তবে অধিকাংশ হানাফী মাশায়েখের মতে গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট مشكوك বা সন্দেহযুক্ত।

৪. আবার কেউ কেউ এটাকে সন্দেহের সাথে পবিত্র বলেন।

৫. আবার কারো মতে পবিত্র করণের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। এটাকেই বিশুদ্ধতম মত হিসাবে অভিহিত করেছেন। كما وَرَدَ فِي الخَيْبَرِ اَنّهُ عليه السلام اَمَرَ بِالْقَاءِ القُدُورِ

যেমন খায়বর যুদ্ধে নবী (স) পালিত গাধার গোশত ভর্তি ডেগ গুলোকে উল্টায়ে দিতে নির্দেশ দেন।

এ জন্য কোনো পানি না থাকলে তা দ্বারা উযূ ও তায়াম্মুম উভয়ের হুকুম দেয়া হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলিলের জবাব

১. ইমাম শাফেয়ী (র) ও তাঁর অনুসারীদের যুক্তিমূলক দলীলের জবাব এই যে, উচ্ছিষ্টের সম্পর্ক হল গোশতের সাথে, চামড়ার সাথে নয়। কেননা, মুখের লালা গোশত হতেই তৈরী হয়। কাজেই এটা দ্বারা দলীল দেওয়া ঠিক নয়।

২. দ্বিতীয়ত ঃ জাবেরের হাদীসটি হল مرسل কেননা, তার বর্ণনাকারী داود بن حصين এর হযরত জাবের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। (শরহে মিশকাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬৬)

سوال : اكتُب اختلافَ العُلماءِ فِى سُورِ السِّبَاعِ مفصّلا

প্রশ্ন ঃ হিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ হিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে ইমামদের অভিমত ঃ

হিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্ট পবিত্র কি না এ ব্যাপারে উলামাদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে-

ইমাম শাফেয়ী (র) এর অভিমত ও দলীল

ইমাম শাফেয়ী (র) এর নিকট শূকর ও কুকুর ব্যতীত সকল হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পাক।

দলীল ঃ

١. حديثُ جابرٍ سُئِلَ النبيُّ صلعم اَنَتَوَضَّأُ بِما اَفْضَلَتِ الحُمُرُ قالَ نَعَمْ وبِما اَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّها .

অর্থাৎ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল (স) কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা কি উযূকরতে পারি? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ এবং ঐ সমস্ত পানি দ্বারাও যা হিংস্র প্রাণী অবিশষ্ট রেখেছে। (শরহুস সুন্নাহ)

٢. وفى روايةٍ سُئِلَ عنِ الحِياضِ الّتِى بينَ مكّةَ والمدينةِ فقِيلَ اِنَّ الكلابَ والسباعَ تَرِدُ عَلَيْهَا فقالَ عليه السلام لَها ما اَخَذَتْ فِى بُطُونِهَا وما بَقِىَ شرابٌ وطَهورٌ

অর্থাৎ একদা রাসূল (স) কে মক্কা মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সে সব কূপসমূহের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল (তাকে বলা হল) যে, সেগুলোতে হিংস্র জন্তু ও কুকুর পানি পান করতে আসে। জবাবে রাসূল (স) বললেন জন্তু যা পেটে নিয়েছে (তথা পান করেছে) তা তাদের জন্য। আর যা অবশিষ্ট রয়েছে তা আমাদের জন্য পবিত্রকারীও পানযোগ্য।

হানাফীদের মত ও দলীল ঃ

হানাফীদের মতে সকল হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র। তাদের দলীল নিম্নরূপ-

١. عن يحيى بنِ عبدِ الرحمٰن اَنَّ عمرَ خرَجَ فِى ركبٍ فِيهم عمرُو بنُ العاصِ حتّى وَرَدُوا حَوْضًا فقال عمرو بنُ العاصِ يا صاحبَ الحَوْضِ لا تُخْبِرْنَا -

অর্থাৎ হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুর রহমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ওমর (রা) একটি কাফেলার সাথে বের হলেন, তাদের মধ্যে হযরত আমর ইবনুল আস (রা)ও ছিলেন। অবশেষে তারা এক হাউজের নিকট পৌঁছলেন। তখন হযরত আমর ইবনুল আস (রা) হাউজের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন যে, হে হাউজের মালিক! আপনার হাউজে কি হিংস্র জন্তুরা আসে? তখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন হে হাউজের মালিক! আপনি আমাদের কে এই সংবাদ দেবেন না।

২. এ ছাড়া হিংস্র জন্তুর লালা তার মাংস হতেই সৃষ্টি হয়। মাংস হারাম হওয়ার কারণে তার লালাও হারাম হয়। তাই তার লালাযুক্ত উচ্ছিষ্ট ও নাপাক।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীলের জবাব

১. হযরত জাবের (রা) এর হাদীসটি مرسل কেননা, তার বর্ণনাকারী داود بن حصين হযরত জাবেরের সাক্ষাৎ পাননি।

২. অথবা, তা অধিক পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩. অথবা, তা হারামের হুকুম আসার পুর্বেকার হাদীস।

৪. আর দ্বিতীয় হাদীসটি معلول কেননা, তার বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম معلول রাবী।

৫. অথবা, এটা হুরমত সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বেকার হাদীস। (শরহে মিশকাত প্রথম খণ্ড পৃষ্টা নং ৩৬৭)

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীস দ্বারা পালিত গাধার গোশত ও তার ঝুটা হারাম হওয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় এবং খচ্চর ও উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কারণ খচ্চর গাঁধার থেকেই জন্ম নেয়। আর লালা যেহেতু গোশত থেকে সৃষ্টি হয়। আর তাদের গোশত হারাম। কাজেই তাদের উচ্ছিষ্টও হারাম ও অপবিত্র হবে। কিন্তু অন্য একটি হাদীস দ্বারা বুঝা যায় গাধা ও খচ্চরের লালা ও ঘাম পবিত্র। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে হযরত উসামা বিন যায়েদ বর্ণনা করেন। রাসুল (স) গাধার উপর সওয়ার হয়েছেন এবং উসামা ঐ গাধার পিছনে ছিলেন।

বুখারী শরীফের অন্য একটি রেওয়ায়াতে আছে যে, হুজুর (স) হুনাইনের যুদ্ধে সাদা খচ্চরের উপর আরোহন করেছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস তার লাগাম ধরা ছিলেন।

তখন নবী (স) বলেছিলেন أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ - أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

উল্লেখ্য, হাদীসগুলো দ্বারা রাসূল (স) এর গাধাও খচ্চরের উপর আরোহণ করা সাব্যস্ত হয় এবং এটাও সাব্যস্ত হয় যে, একজন সাহাবী খচ্চরের লাগাম ধরেছিলেন। আর সাহাবাদের গাধা ও খচ্চরের উপর আরোহন করার বিষয়টি প্রসিদ্ধ।

অপর দিকে আল্লাহ তাআলা এশাদ করেছেন– الخيلُ والبغالُ والحَمِيْرُ لِتَرْكَبُوْهَا -- الخ

আল্লাহ তাআলা ঘোড়া, গাঁধা ও খচ্চর, তোমাদের আরোহণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। কাজেই গাঁধা খচ্চরের উপর আরোহন করা বৈধ হওয়ার উপর খচ্চরের উপর আরোহন করলে তার ঘাম ও লালা থেকে বেঁচে থাকা দুস্কর, বিশেষ করে যে তার লাগাম ধরে রাখে, অথচ হাদীসে তার লালা ও ঘাম থেকে পবিত্রতা অর্জন করার কোন বিধান বর্ণনা করা হয়নি। কাজেই গাঁধা খচ্চরের লালা ও ঘাম পবিত্র হওয়া সাব্যস্ত হলো, অথচ অধ্যায়ের আলোচ্য হাদীস দ্বারা এগুলো অপবিত্র হওয়া ছাবেত হয়। কাজেই তার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা উযূ বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর আলোচনা তো একথার উপর যে, তার লালা ও ঘাম পবিত্র এবং যে পানিতে সে মুখ দেবে সেটাও পবিত্র, কিন্তু উক্ত পানি مطهر তথা অন্যকে পবিত্র করতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কাজেই তার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা উযূ না করা উচিত, কারণ তার দ্বারা সংশয় যুক্ত পবিত্রতা হাসেল হবে। কাজেই তার জন্য করণীয় হল উক্ত পানি ব্যতীত আর কোন পানি যদি না পাওয়া যায় তাহলে উযূ ও তায়াম্মুম উভয়টা করবে। আর যদি পাওয়া যায় তাহলে তা দ্বারা উযূ করবে না।

(المختصر من استدراك الحسن لعلامة ظفر احمد عثمانى رحمه الله)

بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ

৭০. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اتعرق العرق فيضع رسول الله ﷺ فاه حيث وضعت وانا حائض وكنت اشرب من الاناء فيضع فاه حيث وضعت وانا حائض -

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতি মহিলার উচ্ছিষ্ট

অনুবাদ ঃ ৭০. আমর ইবনে আলী (র)............আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাড় থেকে গোশ্‌ত চর্বন করতাম। আমি যেদিক দিয়ে চর্বন করতাম রাসূলুল্লাহ (স)-ও আমার চর্বিত হাড়ের সে দিক চর্বন করতেন। অথচ তখন আমি ঋতুমতি ছিলাম। আমি পাত্রের যে স্থান থেকে পানি পান করতাম তিনিও সে স্থানে মুখ রেখে পানি পান করতেন। আমি তখন ঋতুমতি ছিলাম।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

ঋতুমতী মহিলার উচ্ছিষ্টের বিধান ঃ আলিমগণ এ সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন।

১. কেউ কেউ এর অনুমতি দিয়েছেন। তাদের দলীল হল–

عن عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض؟ فقال واكلها

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি নবী (স) কে ঋতুমতির সাথে খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন তার সাথে খাও।

২. আর কেউ কেউ তার পবিত্রতা অর্জনের পর উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহার মাকরূহ মনে করেছেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঋতুমতি মহিলার অঙ্গ প্রতঙ্গ যেমন হাত, মুখ ইত্যাদি ও তার উচ্ছিষ্ট ও নাপাক নয় বরং পাক। ঋতুমতি মহিলার ব্যাপারে ইয়াহুদীদের বিধান ছিল অত্যন্ত কঠোর তাদেরকে ঘর থেকে বের করে নির্জনে পাঠিয়ে দিত। আর খ্রীষ্টানরা ঐ মুহূর্তেও সহবাস করত। কিন্তু মানব জাতীর হিতাকাঙ্খী ও কল্যানকামী নবী (স) লোকদেরকে আলোকিত পথ দেখান। তিনি বলেন তোমরা ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের মুখালাফাত কর। ইয়াহুদীর বিধান তোমাদের জন্য উপযোগী নয়। মোটকথা, আলোচ্য হাদীস দ্বারা ঋতুমতি মহিলার ঝুটা এবং তার সাথে উঠা বসা করা, খাওয়া দাওয়া করা বৈধ সাব্যস্ত হয়।

আলোচ্য হাদীস ও আধুনিক বিজ্ঞান

আল্লাহ তাআলা মহিলাদেরকে পুরুষের পরিপুরক হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তারা কোন অবহেলার পাত্র নয়। সুতরাং কোন অবস্থাতেই তাদের পৃথক ভাবা সমীচীন নয়। অথচ পূর্ববর্তী অনেক দার্শনিক ও অধিকাংশ ধার্মিক ব্যক্তিবর্গ স্বীকারই করত না যে, নারীজাতি মানুষের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে ঋতকালে ঘরের কোণে ফেলে রাখা হত, তাদেরকে অমঙ্গল ধারণা করা হত। কিন্তু যখন তারা দেখলো নবী (স) ঋতুমতি মহিলার সাথে থাকতেন এবং তাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করতেন। তখনই তারা গবেষণার মাধ্যমে এর রহস্য নিহিত আছে।

তারা দেখলো কোন বস্তুকে যদি আরেক বস্তুর সম্পুরক হিসাবে তৈরী করা হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল সর্বদা বস্তুটি উক্ত বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। আর মহিলাকে যেহেতু পুরুষের সম্পুরক হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তাকে ঘর থেকে বহিস্কৃত করা সমীচীন নয়। দ্বিতীয়তঃ তাদেরকে যে ঋতুকালীন সময়ে অশুভ মনে করা হয়। এটা ভুল প্রথা ছাড়া কিছু নয়।

তৃতীয়তঃ মহিলাদের মন ঋতুকালে অত্যন্ত সংকীর্ণ থাকে। এ সময় তাদের সাথে কথা বার্তা, খাওয়া দাওয়া, ও চলাফেরা বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে এটা অমানবিক আচরণ হবে। এতে তাদের মন ভেঙ্গে যাবে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক বিনষ্ট হবে। ইসলাম যে মানুষের মন তুষ্টির প্রতি এতো দৃষ্টি রাখে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক এত উচুঁ করে দেখে এটা ভেবে তারা খুবই অবাক হল এবং ইসলামকে সাম্যের ধর্ম স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হল।

بَابُ وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا

٧١. اخبرنى هارونُ بنُ عبدِ اللّٰهِ قال حدّثنا معنٌ قال حدّثنا مالكٌ رح والحارثُ بنُ مِسْكِينٍ قراءةً عليه وأنا اسمعُ عنِ ابنِ القاسمِ قال حدّثنى مالكٌ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ قال كانَ الرِّجالُ والنِّساءُ يتوضّؤن فِى زمانِ رسولِ اللّٰهِ ﷺ جميعًا -

অনুচ্ছেদ ঃ নারী পুরুষ একত্রে উযূ করা

অনুবাদ ঃ ৭১. হযরত হারুন ইবনে আবদুল্লাহ (র).........ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যামানায় নারী-পুরুষ একত্রে উযূ করতেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় যে, রাসূল (স) এর যুগে পুরুষ মহিলা একত্রে উযূ করত। কিন্তু নবী (স) তাদের এ কর্মের উপর কোন আপত্তি করেননি এবং নিষেধও করেননি। এটাই এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, পুরুষ মহিলা একত্রে উযূ করা জায়েয আছে, কারণ যদি সেটা শরীয়ত অনুমোদিত না হত বা তার ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকতো তাহলে রাসূল (স) তার অনুমতি দিতেন না। শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত হওয়াই বোধগম্য হয় যে, এ পদ্ধতিতে উযূ করার মধ্যে কোন ধরনের দোষ নেই। এটাই সমস্ত ইমামদের বক্তব্য, এর বিপরীতে আরো দুটি সূরত রয়েছে।

১. পুরুষের ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা মহিলারা উযূ করতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারেও সকল ইমাম একমত পোষণ করেন যে, মহিলারা উক্ত পানি দ্বারা উযূ করতে পারবে।

২. মেয়েলোকের ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষ উযূ করতে পারবে কি না এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে তবে এক্ষেত্রে হানাফীদের মাযহাব হল উযূ করতে পারবে। (শরহে উর্দু নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১৩৮)

سوال : بيّن اختلافَ العُلماءِ فِى فضلِ طَهورِ المَرْأةِ مُدَلَّلًا؟

প্রশ্ন ঃ মেয়ে লোকের ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা উযূ করার ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মেয়ে লোকের ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার সম্পর্কে মতভেদ

মেয়ে লোকের ব্যবহার করার পর যে উদ্বৃত্ত পানি থাকে তা দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ কিনা এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে—

১. ইমাম হাসান বসরী (র) ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রা) এর নিকট পুরুষের ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা মহিলাদের পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয। কিন্তু মেয়েদের ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয নেই।

২. ইমাম আমের, শা'বী এবং ইমাম আওযায়ী (র) এর নিকট পুরুষের ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা মহিলাদের পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয আছে। কিন্তু পুরুষের জন্য আজনবী ও হায়েযা মহিলার উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনা করা জায়েয নেই। (ইযাহুত ত্বহাবী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১১৭)

৩. কতক আহলে জাহেরদের নিকট পুরুষের ব্যবহারের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা মহিলাদের পবিত্রতা অর্জন করা এবং তাদের ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা উভয়টা নাজায়েয। কিন্তু যদি উভয়ে একত্রে উযূ করা শুরু করে তাহলে জায়েয আছে। এ কথার প্রবক্তা হল আল্লামা ইবনুল মুনযির এবং আবু হুরায়রা (রা)।

৪. ইমাম আহমদ, ইসহাক ও দাউদ জাহেরীর মতে মেয়েদের ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয আছে। যদিও তারা নির্জনে একাকী ব্যবহার করুক বা পুরুষের সম্মুখেই করুক। অনুরূপভাবে পুরুষের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা মহিলার পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয। অবশ্য আজনবী মহিলার ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা মাকরূহ। (নজরে ত্বহাবী পৃষ্ঠা নং ২৯, বিদায়াতুল মুজতাহিদ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩১, আমানিউল আহবার প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৯৮)

প্রথম চার মাযহাবের দলীল

মেয়েদের ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয নয়। তাদের দলীল হল–

١. نَهَى النَّبِيُّ عَنْ فَضْلِ طُهُورِ الْمَرْأَةِ

রাসূল (স) মহিলাদের ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পনি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন।

نَهَى النَّبِيُّ اَنْ يتوضَأَ الرجلُ بِفَضْلِ طُهُورِ الْمَرْأَةِ

নবী করীম (স) মেয়েলোকদের ব্যবহারের পর থেকে যাওয়া উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা উযূ করতে নিষেধ করেছেন।

٣. نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم اَنْ يَغْتَسِلَ الرجلُ ب بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ والمرأةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ ولٰكن يَشْرَعانِ جميعًا

অর্থাৎ রাসূল (স) পুরুষদেরকে মহিলাদের ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে মহিলাকে পুরুষের ব্যবহারে পর থেকে যাওয়া পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যদি উভয়ে একত্রে উযূ করতে শুরু করে তাহলে তার হুকুম ভিন্ন। এটাই আবু হুরায়রা ও ইবনুল মুনযিরের দলীল।

٤. عن سوادةَ بنِ عاصمِ الغِفاريِّ قال نَهَى رسولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم عَنْ سُورِ الْمَرْأَةِ

অর্থাৎ রাসূল (স) মহিলাদের উদ্বৃত্ত দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন। এগুলো ছাড়া অসংখ্য হাদীসে তার মাযহাবের প্রমাণ মেলে।

আকলী দলীল ঃ তাদের যৌক্তিক দলিল হল মহিলারা সাধারণত অধিকাংশ সময় অপবিত্র থাকে বিশেষ করে হায়েয ও নেফাসের সময় তো অপবিত্র থাকেই। কাজেই তাদের ঝুটা অপবিত্র হবে। এ কারণে মহিলার ব্যবহৃত পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয নেই।

জুমহুরের দলীল

١. عن مُعاذةَ رض قالتْ عائشةُ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنا ورسولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلمَ مِنْ اِناءٍ واحدٍ الخ

অর্থাৎ হযরত মুয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন– আমি ও রাসূল (স) একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম।

٢. عن ابنِ عبّاسٍ (رض) قال اغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْواجِ النبيِّ صلى اللّٰهُ عليه وسلم فى جَفْنَةٍ فَاَرادَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم اَنْ يَتَوضَّأَ مِنْه فقالتْ يا رسولَ اللّٰهِ اِنِّى كُنْتُ جُنُبًا فقال عليه السلام اِنَّ الماءَ لايُجْنِبُ

অর্থাৎ আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) এর কোন স্ত্রী একই পাত্র থেকে গোসল করত। একবার নবী (স) উক্ত পাত্র হতে উযূ করার ইচ্ছা করলে রাসূল (স) এর স্ত্রী বলল, হে রাসূল (স) আমি জুনুবী। তখন রাসূল (স) জবাব দিলেন, পানিতো জুনুবী (অপবিত্র) হয় না।

٣. عنِ ابنِ عمرَ قال كانَ الرِّجالُ والنِّساءُ يتوضَّؤُن فِى زمانِ رسولِ اللّٰه صلى الله عليه وسلم جميعًا

ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) এর যামানায় নারী পুরুষ একত্রে উযূ করতেন।

জুমহুরের যৌক্তিক প্রমাণ

প্রথম চার মাযহাবের বর্ণিত হাদীস জুমহুরের বর্ণনাকৃত হাদীসের পরিপন্থী। কাজেই আমাদের জন্য করণীয় বৈপরীত্বপূর্ণ দুটি রেওয়ায়েত এর মধ্য হতে কোন একটি ইল্লত বের করে তাকে প্রাধান্য দেয়া। তাই আমরা চিন্তা করে দেখলাম নারী পুরুষ উভয়ের জন্য এক সাথে পানি ব্যবহার করা জায়েয। এদিকে সমস্ত নাপাকের অবস্থা হল চাই সে নাপাক অযু করার পূর্বে পানিতে পড়ুক অথবা উযূ করার সময় উভয় অবস্থাতেই তা পানিকে নাপাক করে দিবে। এ মূলনীতির বর্তমানে একথা বলা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, নারী পুরুষ এক সাথে হলে পানি অপবিত্র হবে না। আর একের পর এক হলে, নাপাক হয়ে যাবে। অবশ্যই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, উযূর পূর্বে পড়লে পানি নাপাক হয়ে যায়। আর অযুর সময় পড়লে পানি নাপাক হয় না। অতএব, বলতে হবে এক সাথে নারী পুরুষ উযূ করলে যেমন পানি নাপাক হয় না। এমনিভাবে একজনের উযূর পর অবশিষ্ট পানি অপর জনের জন্য নাপাক হবে না। (ইযাহুত্ তৃহাবী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১২১, বিদায়াতুল মুজতাহিদ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩১, আমানিল আহবার ১/৯৮,১২১)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

১. পানি অপবিত্র হওয়া يقينى (নিশ্চিত) এবং মহিলার হাত ও পায়ে নাপাক লাগা সংশয়যুক্ত। আর এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল- اليقين لا يزول بالشك। অর্থাৎ শুধুমাত্র সংশয়ের দ্বারা يقين বিলুপ্ত হয় না। কারণেই মহিলাদের ব্যবহারের উদ্বৃত্ত পানি অপবিত্র হতে পারে না। কাজেই তার ব্যবহৃত পানি পবিত্র।

২. আপনারা যে সকল রেওয়ায়েতের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন। এ বিধান ইসলামের প্রথমযুগে ছিল। পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে গেছে। কাজেই এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করে পুরুষ মহিলার ব্যবহারের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা নাজায়েয বলা ঠিক নয়।

৩. যে সকল হাদীসে মহিলাদের ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করা হয়েছে উক্ত নাহী দ্বারা নাহীয়ে তানযীহী উদ্দেশ্য; তাহরীমী নয়। আর আমরা পুরুষ মহিলার (ব্যবহৃত) উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে মাকরূহে তানযীহী বলি।

৪. আপনাদের পেশকৃত রেওয়ায়েত দ্বয়ীফ। আর দ্বয়ীফ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সহীহ নয়।

৫. অথবা, আপনাদের পেশকৃত রেওয়ায়েতগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হল আজনবী মহিলার ব্যবহারের উদ্বৃত্ত পানি। সকল মহিলার ব্যবহারের উদ্বৃত্ত উদ্দেশ্য নয়। কাজেই ব্যাপকভাবে সকল পুরুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে এ বিধান প্রয়োগ করা বিশুদ্ধ নয় যে, তাদের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সহীহ নয়।

৬. অথবা, মেয়েলোকদের ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানির প্রতি পুরুষের সংশয় বা ঘৃণাবোধ থাকার কারণে এরূপ নিষেধ করেছেন। (ইযাহুত তৃহাবী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১১৯-১২০)

৭. আল্লামা তৃকী সাহেব স্বীয় গ্রন্থে আল্লামা আনোয়ার শাহ (র) এর একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। আর তাহলো হযরত হাকাম ইবনে আমর গিফারী (র) ও অন্যান্য রাবীগণ যে নাহীর হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানুষকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মহিলার জন্য পুরুষের ঝুটা, আর পুরুষে জন্য মহিলার ঝুটা পানি ব্যবহার করা বৈধ নয়। বরং এ ধরনের পানি ব্যবহার করার দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রেম, ভালবাসা মহব্বত ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। (ফতহুল মুলহিম শরহে নাসায়ী পৃষ্টা নং ১৩৯)

ফায়েদা ঃ قوله جميعًا ঃ হাদীসের মধ্যে جميعا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তথা পুরুষ মহিলা সমন্বিতভাবে উযূ করত। যদি এখানে মহিলা দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হয় অর্থাৎ মহরাম গাইরে মাহরাম সকল মহিলা পুরুষদের সাথে একই সময় উযূ করত। তাহলে এ ঘটনাটি পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগের বিধান হবে। আর যদি এ হুকুমটা পর্দার বিধান আসার পরে হয় তাহলে হাদীসের মধ্যে মহিলা দ্বারা স্ত্রী ও মাহরামা মহিলা বুঝাবে। (শরহে উর্দু নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১৩৯)

بابُ فَضْلِ الْجُنُبِ

٧٢. اخبرنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ قال حدّثنا الليثُ عن ابن شهابٍ عن عُروةَ عن عائشةَ رضى الله عنها اَنَّها اَخبرتْه انّها كانتْ تغتسلُ مع رسولِ الله ﷺ فِى الاناءِ الواحدِ -

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুব ব্যক্তির (গোসলের পর) অবশিষ্ট পানি

অনুবাদ ঃ ৭২. কুতায়রা ইবনে সাঈদ (র)........ উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে একই পাত্রে গোসল করতেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হযরত আয়েশা (রা) এর কথা দ্বারা উদ্দেশ্য

পুরুষ-মহিলা যেভাবে এক সাথে একই পাত্র থেকে উযূ করতে পারে ঠিক তদ্রুপ পুরুষ-মহিলা এক পাত্র থেকে গোসলও করতে পারে। ত্বহাবী শরীফে من اناء এর পরে يَغْتَرِفُ قَبْلَهَا وتَغْتَرِفُ قَبْلَهٗ শব্দ বর্ণিত আছে। এটাই একথার উপর স্পষ্ট প্রমাণ যে, হুজুর (স) এবং হযরত আয়েশা (রা) উভয়ে একজন অপরজনের পূর্বে পানি নিচ্ছিলেন। সুতরাং হুজুর (স) যখন আয়েশা (রা) এর আগেই হাত ঢুকায়ে দিতেন তাহলে উক্ত পানি হযরত আয়েশা (রা) এর জন্য জুনুবী ব্যক্তির ব্যবহৃত উদ্বৃত পানি হত। আর যদি আয়েশা (রা) রাসূলের পূর্বে হাত ঢুকাতেন তখন অবশিষ্ট পানি রাসূলের জন্য জুনুবী মহিলার ব্যবহৃত উদ্বৃত পানি হতো, এখন যদি উভয়ের মধ্য থেকে একজনের অবশিষ্ট পানি অপর জনের জন্য ব্যবহার করা না জায়েয হত, তাহলে হুজুর সা. ও আয়েশা (রা) গোসলের এ পন্থা অবলম্বন করতেন না। কাজেই এর দ্বারা বুঝা যায় পুরুষ মহিলার ব্যবহারের উদ্বৃত পানি ব্যবহার করা বৈধ।

হযরত আয়েশা (রা) এর বাক্যটির অর্থ এই নয় যে, রাসূল সা. প্রথমে পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন। আর আয়েশা (রা) পরে গোসল করার জন্য কিছু পানি রেখে দেয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতেন। বরং বাক্যটির দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাঁরা উভয়ই একত্রে গোসল করতেন। কিন্তু রাসূল সা. গোসলের ক্ষেত্রে একটু তাড়াতাড়ি করতেন।

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে ইবনে হুমাম এর বক্তব্য

আল্লামা ইবনে হুমাম বলেন, আমাদের ইমামদের মতে যদি কোন অপবিত্র ব্যক্তি কিংবা অজু বিহীন ঋতুমতি মহিলা অঞ্জলিভরে পানি উঠানোর উদ্দেশ্যে পাত্রের মধ্যে হাত প্রবেশ করায় তবে উক্ত পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে পরিগণিত হয় না। কাজেই তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ। কেননা, এখানে পানিতে হাত ঢুকানোর প্রয়োজন রয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁরা আয়েশা (রা) এর এই হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।

قالت عائشةُ كنتُ اَغْتَسِلُ اَنا ورسولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلمَ مِن اناءٍ واحدٍ بَيْنِى وبَيْنَهٗ ...... وهُمَا جُنُبَانِ .

এর পর ইবনে হুমাম (রা) বলেন, পক্ষান্তরে যদি কোনো অপবিত্র ব্যক্তি তার পা বা মাথা পাত্রে ঢুকায় তবে সে পানি ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা তখন পা মাথা প্রবেশ করানোর প্রয়োজন ছিল না।

(শরহে মিশকাত ১/৩৩৭)

بَابُ الْقَدرِ الَّذِى يَكْتَفِى بِهِ الرَّجُل مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ

٧٣. اخبَرَنا عمرو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا يحيى حدَّثنا شعبةُ قال حدَّثنِى عبدُ اللهِ ابنُ عبدِ اللهِ ابنِ جبرٍ قال سمعتُ انسَ بْنَ مالكٍ يقولُ كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يتوضَّأُ بِمَكُّوكٍ ويغتسل بخمسة مكاكي -

٧٤. اخبَرَنا محمدُ بنُ بشارٍ قال حدَّثنا محمدٌ ثم ذكر كلمةً معناها قال حدَّثنا شعبةُ عن حبيبٍ قال سمعتُ عبَّادَ بْنَ تميمٍ يُحَدِّثُ عن جَدَّتِى وهى امُّ عُمارةَ بنتِ كعبٍ انَّ النبىَّ ﷺ توضَّأَ فأُتِىَ بِماءٍ فى اناءٍ قدرَ ثُلُثَىِ الْمُدِّ قال شعبةُ فاحفظ انَّه غَسَل ذِراعَيْهِ وجَعَل يَدْلُكُهما ويَمْسَحُ اُذُنَيْهِ باطِنَهُما ولا احفظُ انه مَسَحَ ظاهِرَهُما -

অনুচ্ছেদ ঃ উযূর জন্য একজন পুরুষের কি পরিমাণ পানি যথেষ্ট

অনুবাদ ঃ ৭৩. আমর ইবনে আলী (র).........আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এক মাক্কুক পরিমাণ পানি দ্বারা উযূ করতেন এবং পাঁচ মাক্কুক পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন।

৭৪. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার (র)......... উমারা বিনতে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী (স) উযূ করেন (এ উযূর জন্য) এমন একটি পাত্রে পানি আনা হয় যাতে এক মুদ-এর দু-তৃতীয়াংশ পানি ছিল। হাবীব থেকে বর্ণনাকারী শু'বা বলেন, আমার এ কথাও স্মরণ আছে যে, তিনি উভয় হাত মর্দন করে ধৌত করেন এবং উভয় কানের ভেতর দিকে মাসেহ করেন। কানের উপর দিকে মাসেহ করেছেন কি না তা আমার খেয়াল নেই।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : حديثُ النَّسائِى مُعارِضٌ لِحَدِيثِ البُخارِيِّ فكَيْفَ التوفيقُ بينَهُما بَيِّنْ مَعَ بيانِ مَعْنى المَكُّوكِ

প্রশ্ন ঃ নাসায়ী (র) এর বর্ণিত হাদীস বুখারীর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত এর সমাধান কি? এবং مكوك **শব্দের তাহকীক বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ مَكُّوك **এর অর্থ ঃ** مَكُّوك শব্দের ميم বর্ণে যবর এবং প্রথম ك বর্ণটি তাশদীদসহকারে পেশ বিশিষ্ট; এ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হল مَكَاكِيْكُ এটা একটি প্রসিদ্ধ পরিমাপক পাত্র। ইমাম নববী ও ইমাম বাগাবী (র) বলেন, মাক্কুক দ্বারা উদ্দেশ্য হল এক মুদ্দ। ইমাম কুরতুবী (র) ও নিহায়া গ্রন্থকার একথারই প্রবক্তা। এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মত হল মাক্কুক এর অর্থ হল এক মুদ্দ। আর ১ মুদ্দ ইরাকের ফকীহগণের মতে ২ রতল বা ১ লিটার (প্রায়) এবং হিজাযের ফকীহগণের মতে ১ রতল ও ১ রতলের তিনভাগের একভাগ বা পৌনে ১ লিটার (প্রায়)। উল্লেখ্য ১ রতল = ৪০ তোলা।

দুই হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ঃ

আনাস (রা) এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় নবী (স) ১ মুদ্দ দিয়ে উযূ করতেন এবং পাঁচ মুদ্দ দ্বারা গোসল করতেন। অথচ তিনি বুখারীর রেওয়ায়েতে বলেছেন রাসূল (স) এক থেকে পাঁচ মুদ্দ পর্যন্ত পানি দ্বারা গোসল করতেন এবং এক মুদ্দ দ্বারা উযূ করতেন। কাজেই দুই বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্ব দেখা যায়। এর সমাধান নিম্নরূপ–

১. রাসূল (স) কখনো পাঁচ মুদ্দ দ্বারা গোসল করতেন। তাই আনাস (রা) পাঁচ মুদ্দের কথা বলেছেন। তবে তিনি অধিকাংশ সময় এক 'সা' তথা চার মুদ্দ দ্বারা উযূ করতেন। তাই তিনি বুখারীর রেওয়ায়াতে এটা বলেছেন।

২. এ দুটি বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্ব নেই। কারণ তিনি যখন প্রথমে রাসূলের একটি অবস্থা দেখেছেন। তখন সেটাকে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর যখন আরেক দিনের অবস্থা দেখেছেন তখন সেটা বর্ণনা করেছেন।

৩. যেখানে কমের কথা বলা হয়েছে। তা বেশীর বিপরীত নয়। কারণ কম মুদ্দ বেশী মুদ্দের মধ্যে শামিল।

৪. এখানে নির্ধারিত কোন পরিমাণ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

তাত্ত্বিক আলোচনা

উযূর পানির পরিমাণের ব্যাপারে ইমামগণের মতামত

১. ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ, হযরত আয়েশা (রা) প্রমুর্খ বলেন, রাসূল (স) এক মুদ্দ দ্বারা উযূ করতেন।

২. ইমাম নাসায়ী (র) বিনতে কা'ব সূত্রে লেখেন, নবী (স) এক মুদ্দ এর দুই তৃতীয়াংশ দ্বারা উযূ করতেন।

৩. এক রেওয়ায়েতে আছে নবী (স) অর্ধ মুদ্দ দ্বারা উযূ করতেন, কিন্তু রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ নয়। কারণ উক্ত হাদীসের সনদে সল্লাত ইবনে দিনার রয়েছে যে, মাতরুক রাবীর অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা, নবী সা. অধিকাংশ সময় এক মুদ্দ দ্বারা অযু করতেন। যেমনটা হযরত আনাস (রা) ও হযরত সাফিয়্যা প্রমুখ বর্ণনা করছেন এবং কখনো কখনো এক মুদ্দ এর দুই তৃতীয়াংশ দ্বারাও উযূ করতেন। যেমনটা عُمَارة بنتِ كعب বর্ণনা করেছেন।

এক মুদ্দ দ্বারা উযূ ও পাঁচ মুদ্দ দ্বারা উযূ গোসল করা আবশ্যক কি না

উযূ গোসলের মধ্যে এক মুদ্দ ও পাঁচ মুদ্দের ব্যবহার জরুরী কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মতামত নিম্নরূপ–

১. ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এক মুদ্দ বা পাঁচ মুদ্দের এর প্রতি লক্ষ্য রাখা উযূ গোসলের মধ্যে মুস্তাহাব।

২. ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ প্রমূখ বলেন, উযূর মধ্যে যে এক মুদ্দ ও গোসলের এর ক্ষেত্রে পাঁচ মুদ্দ এর কথা বলা হয়েছে। এটা সীমাবদ্ধকরণ এর জন্য নয়, বরং সতর্কতামূলক। কারণ এর দ্বারা উযূ গোসল যথেষ্ট হয়ে যায়। এর থেকে বেশী পানির প্রয়োজন হয় না।

৩. জুমহুর উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, উযূ গোসলের ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত পরিমাণ শর্ত নেই, কিন্তু সুন্নত হল উযূর ক্ষেত্রে এক মুদ্দ এবং গোসলের ক্ষেত্রে পাঁচ মুদ্দ এর কম যেন না হয়।

হাদীস ব্যাখ্যাকার বলেন এ ব্যাপারে মানুষকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, কাজেই পরিমাণ পানি উযূ গোসলের জন্য তার প্রয়োজন হয় সে সে পরিমাণ দ্বারা উযূ গোসল করবে এ ব্যাপারে নির্ধারিত কোন পরিমান নেই এবং অপচয় থেকে বেঁচে থাকবে।

মুদ্দ ও "সা" এর ব্যাপারে ইমামগণের মতামত

পূর্বে একথা বলা হয়েছে যে, এক "সা" পরিমাণ হল চার মুদ্দ। এখন মুদ্দ এর পরিমাণ নির্ধারণ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হল– ১. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ ও আহলে ইরাকগণ বলেন, এক মুদ্দ হল দুই রতল সমপরিমাণ। এ ভিত্তিতে এক "সা" সমান আট রতল হবে।

২. ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও আবু ইউসুফ (র) এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এক মুদ্দ হল এক রতল এবং এক রতল এর এক তৃতীয়াংশ। তাইএক "সা" সমান ৫ রতল এবং এক রতল এর এক তৃতীয়াংশ হবে।

আবু ইউসুফ (র) এর মত পরিবর্তন

আবু ইউসুফ (র) প্রতমে আবু হানীফা (র) এর মতের প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু হজ্জ সফর শেষে দেশে ফিরে এসে তিনি তার পূর্বে মত পরিবর্তন করে জুমহুরের উক্তি গ্রহণ করেন।

ফাতহুল মুলহিমে ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, যখন আমরা মদীনায় পৌছলাম তখন মদীনার অধিবাসীরা আমাকে "সা" এর পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তারা বলল, আমাদের এখানে যে সা' এর প্রচলন আছে তা হল রাসূল সা. এর "সা"। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম এটা যে রাসূলের সেই "সা" এর প্রমাণ কি? লোকেরা বলল আগামী কাল এর প্রমাণ পেশ করবো। দ্বিতীয় দিন সকালে প্রায় পঞ্চাশ জন আনসার ও মুহাজিরদের সন্তানগণ নিজ নিজ "সা" কে পেশ করলেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বলল তা রাসূল সা. এর "সা"। আমরা আমাদের বাপ দাদা থেকে এটা প্রাপ্ত হয়েছি। অতঃপর অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে আমি সেগুলো দেখলাম। সবগুলো "সা" আমার নিকট বরাবর মনে হলো। অতঃপর আমি পরিমাপ করে দেখলাম সেটা পাঁচ রতল এবং এক রতলের এক তৃতীয়াংশ। আবু ইউসুফ (র) বলেন অতঃপর আমি দেখলাম উক্ত দলীলটি বেশী শক্তিশালী। কাজেই আমি আবু হানীফা (র) এর মতকে ত্যাগ করে আহলে মদীনার মতকে গ্রহণ করলাম। (সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী ৪/১৭১)

আলোচ্য ঘটনার ব্যাপারে ইবনে হুমামের বক্তব্য

শায়খ ইবনে হুমাম (র) উক্ত ঘটনাকে ফাতহুল ক্বাদীরে ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। কারণ এ ঘটনা একজন مجهول ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। আর মুহাদ্দিসীনদের মূলনীতি মুতাবেক এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা বিশুদ্ধ নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ এটা এমন একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা অথচ ইমাম মুহাম্মদ তার কিতাবের মধ্য হতে কোন কিতাবে তা

উল্লেখ করেননি। অথচ মতানৈক্য পূর্ণ মাসআলাগুলোকে তিনি বর্ণনা করে থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে যদি ইমাম আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতকে ছেড়ে দিয়ে ইমাম মালেকের মতের দিকে রুজু করে থাকেন। তাহলে এটা ইমাম মুহাম্মদ (র) এর নিকট অস্পষ্ট না থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং বুঝা গেলো এ ঘটনাটি ভিত্তিহীন।

আল্লামা ইবনে হুমাম বলেন, প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা ইমাম আবু ইউসুফ (র) যখন ইরাকী "সা"কে পরিমাপ করলেন তখন তার পরিমান ও আহলে মদীনার "সা" এক পরিমাণ বরাবর তথা আহলে মদীনার রতল আহলে বাগদাদ থেকে বড় পেলেন। কাজেই ইরাকী আট রতল পরিমাণ "সা" এর সমান হল মদীনার ৫ রতল ও এক রতল এর এক তৃতীয়াংশ রতল। কেননা, তাদের রতল ৩০ আসতারে হয়, আর আহলে বাগদাদ এর রতল ২০ আসতারে হয়। সুতরাং যদি বাগদাদী আট রতলকে এবং মদীনার পাঁচ রতল ও এক রতল এর রতলের এক তৃতীয়াংশ কে পরিমাপ করা হয় তাহলে উভয়টা সমান সমান হবে। শায়খ মাসউদ ইবনে শায়বাহ সিন্ধী ইবনে হুম .মর একথাকে সমর্থন করেছেন। (মাআরিফুস সুনান ১/ ২০৭)

আল্লামা কাউসারী (র) বলেন, বায়হাকী (র) উক্ত ঘটনাকে হুসাইন ইবনে ওয়ালীদ কুরাশী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র) আবু হানীফার উক্ত মত ত্যাগ করে ইমাম মালেকের মতকে গ্রহণ করেছেন। আর উক্ত সূত্রের মধ্যে একজন মাজহুল রাবী আছে। কোন কিতাবের মধ্যে তাঁর আলোচনা নেই। অপরদিকে বিষয়টি যদি এমনই হতো তাহলে বিষয়টি সকলের নিকট স্পষ্ট থাকতো; অস্পষ্ট হতো না।

হযরত শাহ সাহেব বলেন, কোন ব্যক্তি ইরাকী "সা" কে অস্বীকার করতে পারে না। কারণ রাসূলের জামানায় তারও প্রচলন ছিল। আমাদের নিকট এ সম্পর্কে মজবুত দলীল আছে। আবু দাউদে হযরত আনাস (রা) বলেন হুজুর (স) এমন এক পাত্রে উযূ করেন যার মধ্যে দুই রতল পানি ধরত এবং গোসল এক "সা" দ্বারা করতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফেও বর্ণিত আছে যে, হুজুর (স) এক মুদ্দ দ্বারা উযূ করতেন।

নাসায়ী শরীফে মূসা জুহানী বলেন, মুজাহিদের নিকট একটি পাত্র ছিল। তিনি আমাকে তা দেখালেন। আমি পরিমাপ করে দেখলাম তা আট রতল পরিমাণ। মুজাহিদ বলেন আমি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি (আয়েশা (রা) বলেন) হুজুর (স) এমন পাত্র দ্বারা উযূ করতেন।

ত্বহাবী শরীফে আছে যে, ইব্রাহীম নাখয়ী (র) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত উমর (রা) এর "সা" কে পরিমাপ করে দেখলাম তা হেজাযী "সা" এর বরাবর। আর হিজাযী "সা" হল আট রতল। ইবনে শায়বা (র) ইয়াহইয়া ইবনে আদম, হাসান ইবনে সালেহ (র) থেকে বর্ণনা করেন, যার শব্দ নিম্নরূপ صاع عمر ثمانية ওমর (রা) এর "সা" আট রতল ছিল। এগুলো দ্বারা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, রাসূলের যুগেও ইরাকী "সা" এর প্রচলন ছিল। মোটকথা, রাসূলের যুগে দু'ধরনের "সা" প্রচলিত ছিল- ১. ইরাকী, ২. হিজাযী। অবশ্য হিজাযী "সা" এর প্রচলন বেশী ছিল, আর ইরাকী "সা" এর প্রচলন কম ছিল।

سوال : ما معنى الصَّاع وَمَا الاختلافُ بَيْنَ الائمّةِ فِى قَدرِ ما يَسَعُ فيه؟

প্রশ্ন ঃ صاع এর অর্থ কি, صاع এ ধারণকৃত বস্তুর পরিমাপ সম্পর্কে মতবিরোধ কি? বর্ণণা কর।

উত্তর ঃ صاع এর সংজ্ঞা ঃ صاع বলা হয় এমন পরিমাপক পাত্রকে যার মধ্যে আট রতল মুগুরী কিংবা ডাউল ধরে। এখানে আট রতল এর কথা বলা হয়েছে। আর আট রতল ধারণ করতে পারে এমন পাত্রকে صاع বলে। ইংরেজিতে ৮০ তোলায় এক সের হয় এবং ৩৫ তোলায় এক রতল হয়ে থাকে। সুতরাং এই হিসাব অনুযায়ী ১ "সা" সমান সাড়ে তিন সের হয়। আর نصف صاع সমান পৌনে দুই সের হয়। صاع কি পরিমাণ ধারণ করতে পারে এই নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

১. হানাফী মাযহাবে ৮ রতল সমান এক صاع আর এটা হল ইরাকী হিসাব অনুপাতে।

২. ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে ৫ রতল =১ 'সা'। এটা হিজাযী হিসাব অনুপাতে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এ কথার প্রবক্তা। আহনাফের মত অনুযায়ী যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে এমন صاع কে গ্রহণ করা হবে যা আট রতল পরিমান ধারণ ক্ষমতা রাখে। এখন এ আট রতল কোন জিনিসের হবে তা নিয়ে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

মাত্তিনের অভিমত ঃ মাতেন (র) বলেন যে, মাসকলাই ও মুগুরী থেকে আট রতল ধরা হবে। কারণ مكيل নির্ধারন করা হয় এমন জিনিস দ্বারা যার কায়েল ওযন বরাবর হয়। আর মাসকলাই মুগুরী-ই কায়েল ও ওযন এর দিক দিয়ে বরাবর হয়ে থাকে। কেননা, তার দানার মাঝে ছোট বড় হওয়ার দিক দিয়ে তারতম্য খুবই কম। এ কারণে এর রতল দ্বারা "সা" নির্ধারণ করতে হবে।

[বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

بَابُ النِّيَّةِ فِى الْوُضُوْءِ

٧٥. اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيّ عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِى مَالِكٌ ح وَاَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ -

অনুচ্ছেদ ঃ উযূর নিয়ত

অনুবাদ ঃ ৭৫. ইয়াহইয়া ইবনে হাবীব ইবনে আরাবী ....উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সব কাজই নিয়তের উপর নির্ভরশীল। মানুষ যা নিয়ত করে তাই লাভ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করবে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত হবে দুনিয়া লাভের জন্য সে তাই লাভ করবে। অথবা যার হিজরত হবে কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য, তার হিজরত সে জন্যই হবে যার উদ্দেশ্য সে হিজরত করেছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : ما هِىَ الواقعةُ الَّتى تَتَعَلَّقُ بهذا الحَديثِ؟ وما اسْمُ المَرْأةِ؟

প্রশ্ন ঃ অত্র হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি কি? উক্ত মহিলার নাম কি ছিল?

উত্তর ঃ হাদীসের পটভূমি বা সংশ্লিষ্ট ঘটনা– এ হাদীসের সাথে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত আছে– দীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে রাসূলে কারীম (স) মহান আল্লাহর নির্দেশে মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন এবং অন্যান্য সকল মুসলমানকেও মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন একনিষ্ট মুসলমানগণ রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে মদীনায় পাড়ি জমান। এদের মধ্যে অজ্ঞাতনামা জনৈক সাহাবী "উম্মে কায়স" বা উম্মে "কায়লা" নামক একজন মুহাজিরা মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। লোকটির হিজরতের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল মহিলাকে বিবাহ করা। হিজরত তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। মহানবী (স) এর দরবারে এ বিষয়টি

[পূর্বের পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ] **শারেহ এর অভিমত ঃ** শারেহ (র) বলেন যে, এই আট রতল হবে الحِنْطَةُ। الجَيِّدَةُ المُكْتَنِزَةُ উত্তম গম থেকে। এর কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আমি মাশকলাই, গম ও যব এই তিনটা জিনিসকে পরিমাপ করে দেখলাম যে, মাশকলাইটা গম থেকে বেশী ভারী। আর গম যব থেকে বেশী ভারী। তাই এখন ঐ مكيال যা আট রতল মাশ দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায় তাতে উন্নত গম পরিমাপ করলে আট রতল এর কম দ্বারাই পূর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং আট রতল উন্নত গম ধরাতে হলে পাত্রটা একটু বড় করতে হবে। বিধায় উন্নত গমের আট রতল দ্বারাই صاع নির্ধারণ করা হবে। যাতে করে মাপটা পরিপূর্ণভাবে শুদ্ধ হয়। কেননা, যদি মাশ দ্বারা পরিমাপ করা হয়। তাহলে পাত্রটি ছোট হয়ে যাবে। যার কারণে আট রতল গম ধরবে না। এই জন্য সতর্কতামূলক গমের দ্বারা মিকয়াল নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে মাপটা পরিপূর্ণ সহীহ হয়। (সিকায়া ৩৬২-৬৩-৬৪)

আলোচিত হলে রাসূল (স) তিনি এ হাদীসটি ইরশাদ করে বলেন , হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই হওয়া উচিত। উল্লেখ্য যে, এ হাদীসকে হাদীসে উম্মে কায়সও বলা হয়।

মহিলার নাম ঃ যে মুসলিম রমনীটির প্রেমে ঐ লোকটি হিজরত করেছিল। তার নাম সম্পর্কে দুটি মত পাওয়া যায়। উম্মে কায়স (র) ও উম্মে কায়লা।

سوال : مَا الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَتَرْجَمَةِ الْبَابِ؟ حَرِّرْ مُوضِحًا ـ

প্রশ্ন ঃ আলোচ্য হাদীস ও অনুচ্ছেদের শিরোনামের মধ্যে সম্পর্ক কি? বিস্তারিত লেখ।

উত্তর ঃ হাদীস ও তরজমাতুল বাবের মধ্যে যোগসূত্র ঃ এ বাব হচ্ছে النية فى الوضوء তথা উযূর মধ্যে নিয়ত প্রসঙ্গে। এ বাবের অধীনে ইমাম নাসায়ী (র) যে হাদীসটি এনেছেন তাতে উযূর কোন উল্লেখ নেই। তাহলে হাদীস ও বাবের মধ্যে মুনাসাবাত হল কোথায়? এ প্রশ্নের সমাধানে বলা যায়, যদিও সরাসরি হাদীসে উযূর উল্লেখ নেই। কিন্তু পরোক্ষভাবে তাতে উযূর উল্লেখ আছে। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে- اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ - সুতরাং উযূও একটি আমল। কাজেই অনুচ্ছেদের সাথে হাদীসের মিল পাওয়া গেল।

سوال : مَا مَعْنَى النِّيَّةِ لغةً وشرعًا وما الفرقُ بَيْنَهَا وبَيْنَ الْاِرَادَةِ

প্রশ্ন ঃ নিয়ত শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? নিয়ত এবং ইরাদার মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ নিয়তের আভিধানিক অর্থ ঃ نية শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হল نيات - শাব্দিক অর্থ হল الارادة والقصد, ইচ্ছা বা সংকল্প করা।

নিয়তের পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ

১. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন- هُوَ قَصْدُكَ لِشَيٍ بِقَلْبِكَ وتَحَرِّى الطَّلَبِ مِنْكَ لَهُ
অর্থাৎ তোমার অন্তর দ্বারা কোনো কাজের সংকল্প করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করা।

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন- النِّيَّةُ هِىَ الْقَصْدُ الى الْفِعْلِ

৩. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন- هِىَ تَوَجُّهُ الْقَلْبِ نحوَ الْفِعْلِ اِبْتِغَاءً لِوَجْهِ اللّٰهِ تَعَالَى

৪. মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- النِّيَّةُ هِيَ تَوَجُّهُ النَّفْسِ نَحْوَ الْفِعْلِ

৫. ফাতহুর রাব্বানী গ্রন্থকার বলেন-

النِّيَّةُ هِىَ توجُّهُ القلبِ جهةَ الفِعْلِ اِبْتِغَاءً لِوَجْهِ اللّٰه تعالى وامتثالًا لِاَمْرِهِ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু করার প্রতি হৃদয় ও মনের অভিনিবিষ্ট হওয়াকে নিয়ত বলে।

نيت ও ارادة মধ্যে পার্থক্য ঃ نية ও ارادة শব্দদ্বয়ের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা বা সংকল্প করা। উভয়ের অর্থ এক হলেও প্রয়োগ ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

১. নিয়ত শব্দটি খাস যা শুধু বান্দার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর ارادة শব্দটি আম যা বান্দা ও আল্লাহ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এজন্য ارادة الله বলা হয়, نوى الله বলা হয় না।

২. نية শব্দটি مُعَلَّلٌ بِالْاَغْرَاضِ তথা নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের উপর ব্যবহৃত হয়। আর ارادة শব্দটি উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩. আবুল হাসান আলী মুকাদ্দেসী (র) বলেন ارادة ـ قصد ـ نية ـ عزم সবগুলোর অর্থ একই ; অর্থাৎ এ শব্দ গুলোর শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ এক ও অভিন্ন। শুধু প্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। (শরহে মিশকাত ১২-১৩/১)

سوال : ما الفرقُ بَيْنَ العَمَلِ والفِعلِ؟ وهَل يُوْجَدُ العَمَلُ بِغَيْرِ النيّة؟

প্রশ্ন ঃ عمل ও فعل এর মধ্যে পার্থক্য কি? নিয়ত ব্যতীত কি কোন কাজ পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ فعل ও عمل এর মধ্যে পার্থক্য ঃ عمل ও فعل উভয় শব্দের আভিধানিক অর্থ কাজ করা। আভিধানিক অর্থের মধ্যে এক রকম দেখা গেলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরূপ–

১. عمل শব্দটি বান্দার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর ক্ষেত্রে এ শব্দটি আসেনা। পক্ষান্তরে فعل শব্দটি আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের জন্যে ব্যবহার হয়। এ ক্ষেত্রেও عمل শব্দটি খাস। আর فعل শব্দটি আম।

২. ذوى العقول এর কাজকে عمل বলা হয়। আর فعل শব্দটি ذَوِى العُقُول ও غيرِ ذَوِى العُقُولِ উভয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং عمل শব্দটি হল খাস, আর فعل শব্দটি আম।

৩. عمل এর মধ্যে طوالت বা দৈর্ঘতা থাকে। আর فعل এর মধ্যে طوالت বা দৈর্ঘতা হয় না। যেমন-

١. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - ٢. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ

৪. عمل হল আম যা جوارح ও غير ذوى العقول উভয় হতে প্রকাশিত কাজের উপর ব্যবহৃত হয়। আর فعل টি খাস যা শুধু جوار তথা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হতে প্রকাশিত কাজের উপর ব্যবহৃত হয়। (মেরাকত ১/৩৯, ইযাহুল মিশকাত ১/৩৮)

নিয়ত বিহীন কর্মের বর্ণনা ঃ নিয়ত ব্যতীতও কোন কোন কাজ পাওয়া যায়। যেমন زَلَّةُ الْقَدَمِ তথা পদস্খলন। قتل خطا ভুলক্রমে হত্যা, ভুলক্রমে কোন কর্ম করা।

سوال : اِنّما الاعمالُ بالنيّات وانّما لِامْرِئٍ مّانوٰى لِم كرّر الجملة؟

প্রশ্ন ঃ হাদীস একবার বলা হয়েছে انّما الاعمال بالنيات **আবার বলা হয়েছে** وانّما لِامْرِئٍ مّانوى **একই বাক্য দুইবার বলার কারণ কি?**

উত্তর ঃ বারবার উল্লেখের কারণ ঃ হাদীসে উল্লেখিত انما الاعمال بالنيات ও انما لامرئ مّانوٰى পৃথক দুটি বাক্য হলেও উভয়টির ভাব ও মর্মার্থ এক। তাহলে একইভাব বুঝানোর জন্যে দুটি বাক্য বলা হল কেন? মুহাদ্দিসীনে কিরাম এর নিম্নোক্ত উপকারিতাগুলো বর্ণনা করেছেন–

১. ইমাম কুরতুবী (র) এর অভিমত ঃ ইমাম কুরতুবী (র) বলেন দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা প্রথম বাক্যের تحقيق ও تاكيد উদ্দেশ্য। নিয়তের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিধায় একই ভাব ও মর্মার্থকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বলা হয়েছে।

২. কারো মতে, প্রথম বাক্য দ্বারা আমলের অবস্থা ও দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা আমলকারীর অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

৩. ইবনে দাকীকুল ঈদের অভিমত ঃ ইবনে দঈকুল ঈদ (র) বলেন, প্রথম বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়ত ও আমলের মধ্যকার সংযোগ বর্ণনা করা। আর দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বর্ণনা করা যে, নিয়ত অনুপাতে ফল পাবে, যদি কোন নিয়ত না করে তবে কিছুই পাবে না।

৪. ইমাম নববী (র) এর অভিমত ঃ ইমাম নববী (র) বলেন, প্রথম বাক্য ربط তথা সংযোজনের উপকারিতা দেয়। আর দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা تعيين منوى তথা নিয়তের নির্দিষ্টকরণ উদ্দেশ্য।

৫. ইবনে আবদুস সালামের অভিমত ঃ ইবনে আব্দুস সালাম (র) বলেন, প্রথম বাক্য দ্বারা একথা বর্ণনা দেয়া উদ্দেশ্য যে, عمل مع النية গ্রহণযোগ্য। আর আমলের উপর যে ফলাফল আরোপিত হবে তার বর্ণনা দ্বিতীয় বাক্যে দেয়া হয়েছে।

৬. ইবনে সামআনী (র) এর অভিমত ঃ ইবনে সামআনী (র) বলেন, যে সব কাজ সাধারণ ইবাদত; যেমন

পানাহার। যথা– এতে নিয়ত ব্যতীত সাওয়াব হবে না এটা বর্ণনা করা-ই দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য। যদি পানাহারের সময় قُوَّت عَلى الطَّاعَة এর নিয়ত করা হয় তখন সাওয়াব পাওয়া যাবে নতুবা নয়।

৭. কেউ কেউ বলেন, প্রথম বাক্য দ্বারা ربط بَيْنَ النِّيَّةِ وَالعَمَلِ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, প্রতিদানের পরিমাণ নিয়তের পরিমানের উপর নির্ভরশীল। (শরহে নাসায়ী ১৫১-১৫২/১)

سوال : بَيِّنْ مَورِد الحديث ووَجْهُ ذكر أو امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا

প্রশ্ন ঃ হাদীসটি বর্ণনার প্রেক্ষাপট উল্লেখ কর. অতঃপর امرأة يَنْكِحُهَا এর ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ او امرأة। দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে রাসূল (স) সাহাবায়ে কিরামকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করলেন। সাহাবাদের সাথে উম্মে কায়েস নামকএক মহিলাও হিজরত করেন। মক্কায় অবস্থানকারী আবু ত্বলহা নামক এক মুসলিম উক্ত মহিলাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠালে উক্ত মহিলা শর্ত জুড়ে দেন যদি সে মদীনার হিজরত করে তবে সে তাকে বিবাহ করবে। আবু তালহা তাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে মদীনায় হিজরত করেন। উদ্ধৃত হাদীসে او امرأة দ্বারা উম্মে কায়েস নামক মহিলার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অবশ্য বিভিন্ন বর্ণনা মতে মহিলাটির নাম ছিল কায়লা, কুনিয়াত ছিল উম্মুল কায়েস। (শরহে নাসায়ী ১৫৮/১)

سوال : شرّح قوله عليه السلام وانّما لِامْرِئٍ مَّانَوى

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) এর বাণী وانّما لِامْرِئٍ مَّانَوى এর ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ انّما لِامْرِئٍ مَّانَوى এর ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায় مُهاجِر اُمِّ قَيْس নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে মক্কা থেকে হিজরত করে আসে। ফলে হিজরতের অফুরন্ত সাওয়াব থেকে সে বঞ্চিত থাকে। রাসূল সা. এ সম্পর্কে বলেন, নিয়ত শুধু হিজরতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রত্যেক মানুষ প্রতিটি কাজে যে নিয়ত করবে সেই অনুসারে সে ফল পাবে। ভাল হলে ভাল অথবা খারাপ হলে খারাপ ফল পাবে।

৩. ইমাম নববী (র) বলেন انّما لِامْرِئٍ مَّانَوى দ্বারা অনির্দিষ্ট বস্তুর নিয়ত করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর فَهِجْرَتُه اِلى مَا هَاجَرَ اِلَيْه দ্বারা বিধানের নিয়তের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (ফয়জুল বারী ১/১১)

سوال : ما معنى الوَضوء لغةً وشرعًا؟ وبِايَّةِ اٰيةٍ فُرِضَ؟ اُذْكُر؟

প্রশ্ন ঃ وضوء এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? কোন আয়াত দ্বারা উযূ ফরয হয় বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ উযূর আভিধানিক অর্থ ঃ وضوء শব্দটিকে তিনভাবে পড়া যায়–

১. الوضوء শব্দের واو বর্ণে পেশ দ্বারা পড়লে তখন অর্থ হবে الطهارة النظافة তথা পরিষ্কার হওয়া, পবিত্রতা অর্জন করা, স্বাভাবিকভাবে উযূ বলতে এটাকেই বুঝানো হয়। পরিভাষায় الغَسْلُ والمَسْحُ على اَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ অর্থাৎ শরীরের কতিপয় নির্দিষ্ট অঙ্গ যথা নিয়মে ধোয়া ও মাসেহ করা।

২. واو বর্ণে যবর হলে অর্থ হবে مابه الطهارة যার দ্বারা পবিত্রতা লাভ করা যায়। যেমন মাটি, পানি ইত্যাদি।

৩. আর واو বর্ণে যের হলে অর্থ হবে ظرف مافيه الطهارة যে পাত্রে পবিত্রতা অর্জনা করার বস্তু রাখা হয়।

سوال : اِتّحَدَ الشرطُ والجزاءُ في الجملتَيْنِ فمَنْ كانت هِجْرَتُه الخ والقاعدةُ تُغايِرُهما فما هو الجوابُ عن هذا؟

প্রশ্ন ঃ হাদীসাংশ فمن كانت هجرته الخ এর মধ্যে এক-ই বাক্যে শর্ত ও জাযা একত্রিত হয়েছে। অথচ নিয়ম হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। অত্র প্রশ্নের জবাব কি?

উত্তর ঃ বৈপরীত্য নিরসন ঃ রাসূল (স) এর বাণী فَمَن كانت هِجْرَتُه اِلى الله او الي دُنْيا এর মধ্যে শর্ত ও জাযা একত্রিত হয়েছে। অথচ নিয়ম হল ভিন্ন ভিন্ন হওয়া।

১. এর উত্তর নাসায়ীর পাদটীকায় বলা হয়েছে فمن كانت هجرته বাক্যদ্বয়ের মধ্যে যদিও اتحاد পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা فمن كانت هجرته الى الله ورسوله তথা প্রথম বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এবং ومن كانت هجرته الى دنيا তথা দ্বিতীয় বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। অতএব দুটি বাক্যের মধ্যে اتحاد। বা ঐক্য হয়নি। বরং تغاير বা ভিন্নতা সাধিত হয়েছে। তাই উভয়ের মাঝে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব নেই। (শরহে নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১৬০)

২. যদিও বাহ্যিকভাবে উভয়টিকে এক মনে হয়। কিন্তু অর্থগত দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন। অর্থগত দৃষ্টিকোণ থেকে বাক্য দ্বয়ের ইবারত হবে নিম্নরূপ–

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه إلى اللّٰه ورَسوله قصدًا ونيّةً فهِجْرَتُه الى اللّٰه ورسوله ثمرةً ومنفعةً

২. কেউ কেউ বলেন, এখানে জাযা উহ্য রয়েছে। আর سبب কে جزاء এর قائم مقام করা হয়েছে। মূলত বাক্যটি ছিল– فهِجْرَتُه مقبولةٌ فإنّ هِجْرَتَهُ الى اللّٰهِ ورَسولِه

৩. تعظيم এর মধ্যে মুবালাগা বুঝানোর জন্যেও কখনো শর্ত ও জাযাকে একইরূপ আনা হয়। যেমন শায়েরের উক্তি أنا ابو النّجم وشِعْرى شِعْرى

অর্থাৎ আমি আবুন নজম, আমার শে'র শে'রই। অর্থাৎ তার শে'রের মুকাবেলায় অন্যান্য শে'র মূল্যহীন। আলোচ্য হাদীসের অর্থও ঠিক এমনই, তথা যে ব্যক্তির হিজরত আল্লাহ তাআলার জন্য হবে। সেটা আল্লাহ তাআলার জন্যই। তাহলে সেটা কেন কবুল হবে না? অবশ্যই কবুল হবে। (ফয়জুলবারী ১১০/১, ইযাহুল মিশকাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৪৩)

سوال : بيّن وجه تخصيص المرأة بعد ذكر عموم الدنيا

প্রশ্ন ঃ دنيا **শব্দটির ব্যাপকতা উল্লেখের পর বিশেষভাবে** امرأة **শব্দটি উল্লেখের কারণ কি বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ دنيا **শব্দটি উল্লেখের পর** امرأة **শব্দ উল্লেখ করার কারণ ঃ**

আলোচ্য হাদীসে ব্যাপক অর্থবোধক دنيا শব্দটি উল্লেখের পর আবার বিশেষভাবে মহিলার কথা উল্লেখের কারণ হল, মহিলাই হচ্ছে দুনিয়ার বড় ফিতনা। পৃথিবীতে যত ফেতনা ও বিশৃংখলা ঘটে তার অধিকাংশই নারীজনিত কারণেই ঘটে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الخ

এমনিভাবে নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন– مَاتَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ـ

অথবা উক্ত হাদীসটি উম্মে কায়েস নামক মহিলাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়েছে। বিধায় এখানে মহিলাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (শরহে মিশকাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৪)

سوال : ما المناسبةُ بينَ الدنيا والمرأة

প্রশ্ন ঃ দুনিয়া ও মহিলার মধ্যে সম্পর্ক কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ দুনিয়া ও মহিলার মাঝে সম্পর্ক ঃ দুনিয়ার ও মহিলা উভয়টা ভোগের বস্তু। উভয়ের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। তাদের প্রেমে পাগল হয়। তাদের পাওয়ার আশায় উম্মাদ হয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন ফেতনা ও বিপদ আপদের মধ্যে নিপতিত হয়। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলা ও দুনিয়া উভয়টা ফিতনা ও ধোকার বস্তু। ফলে পৃথিবীর ভিতরে যত ধরণের বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা হয়ে থাকে, সবকিছু তাদের চিত্তাকার্ষক দৃশ্যের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকানোর কারণেই হয়ে থাকে। দুনিয়া সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছেন– حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ মোটকথা, ফেতনার দিক থেকে উভয়টার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে।

سوال : قولُه عليه السلام وانّما لِامْرِئٍ مَّانَوٰى تاكيدٌ لِما قَبْلَه ام تاسِيْسٌ ـ

প্রশ্ন ঃ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّانَوٰى **এ বাক্যটি পূর্বের বাক্যের** تاكيد **নাকি** تاسيس **? বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ قوله انما لامرئٍ مَّانَوٰى **ঃ** প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঐ জিনিসই দেয়া হবে যা সে নিয়ত করে। এ বাক্যটি পূর্ববর্তী جملة থেকে تاكيد হয়েছে না تاسيس এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. কতক উলামায়ে কিরাম বলেন এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের তাকীদ।

২. কিন্তু মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের ভাষ্য হলো এটা تاسيس কেননা, التَاسِيْسُ اَوْلٰى مِنَ التَّاكِيْدِ তাকীদের তুলনায় তাসীস, উত্তম।

আল্লামা সিন্ধী হানাফী (র) বলেন, পূর্বের জুমলাকে শুধুমাত্র ভূমিকা স্বরূপ আনা হয়েছে। আর দ্বিতীয় জুমলাটাই মূল উদ্দেশ্য যেন রাসূলের বাণী– لِكُلِّ شيءٍ زِيْنَةٌ وزِيْنَةُ القرانِ الرحمٰنُ

পূর্বের জুমলায় নিয়তের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় জুমলায় নিয়তের ধরণ ও প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (ফয়জুল বারী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১১, ঈযাহুল মিশকাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৫২)

سوال : ما معنَى الهِجرة و كم قِسْمًا لها؟ بَيِّن كلَّ قسمٍ مفصّلاً ثم بيِّن هلِ الهجرةُ باقيةٌ الانَ ام لَا؟

প্রশ্ন ঃ هجرة **এর অর্থ কি? হিজররতর বিধান এখনো বলবৎ আছে কি-না বর্ণনা কর (অথচ রাসূল বলেছেন** لاهجرة بعد الفتح**)**

উত্তর ঃ هجرة **শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ** هجرة শব্দটি باب نصر ينصر এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ত্যাগ করা, সম্পর্ক ছেদ করা, এক স্থান থেকে বের হয়ে অন্য স্থানে যাওয়া। শব্দটি باب مفاعلة থেকে দেশ ত্যাগ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

হিজরতের পারিভাষিক সংজ্ঞা

শরীয়তের পরিভাষায় হিজরতের সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

১. **ইবনে হাজার আসকালানী (র) এর অভিমত ঃ** ইবনে হাজার আসকালানী (র) এর মতে হিজরত বলা হয়– هُوَ تركُ مانهى اللّٰهُ عنه অর্থাৎ আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন, তা পরিত্যাগ করা।

২. **উমদাতুল ক্বারী গ্রন্থকারের অভিমত ঃ** উমদাতুলকারী গ্রন্থ প্রণেতা বলেন,

هُوَ مُفَارَقَةُ دارِ الْكُفرِ الى دارِ الْاِسْلامِ خوفَ الْفِتْنَةِ وطَلَبَ اِقامَةِ الدِّيْنِ.

অর্থাৎ বিপর্যয়ের ভয়ে এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুফরী রাষ্ট্র ছেড়ে ইসলামি রাষ্ট্রে চলে যাওয়াকে হিজরত বলে।

৩. القاموسُ الفقهى এর মধ্যে রয়েছে–

الهجرةُ هِى تركُ الوَطَنِ الّذى بَيْنَ الكُفّارِ والْاِنْتِقالُ اِلى بِلادِ الْاسلام

৪. কারো কারো মতে هو ترك الدار لحصول رضوان الله تعالى অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে নিজ বাস স্থানে ত্যাগ করাই হচ্ছে হিজরত।

هجرة এর প্রকারভেদ ঃ হিজরত মোট পাঁচ প্রকার। যথা,

১. পাপ কার্য থেকে দূরে থাকা। যেমন রাসূল (স) এর বাণী– المُهاجِرُ مَن هَجَرَ ما نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ

২. মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত। মক্কা বিজয়ের পর এ হিজরতের দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন হাদীসে আছে – لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

৩. ইসলাম প্রচারের নিমিত্তে প্রতিকূল স্থান থেকে অনুকূল স্থানে গমন করা। যেমন– আল্লাহর বাণী– اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا

৪. শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে এক মুসলিম দেশ থেকে অন্য মুসলিম দেশে গমন করা।

৫. প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভে নিজেকে উৎসর্গ করা।

হিজরতের বিধান

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রবর্তনের নিমিত্তে আন্দোলন ও সংগ্রামের যতগুলো পদ্ধতি রয়েছে তন্মধ্যে হিজরত অন্যতম। এটা দ্বীনের স্বার্থে বাস্তবায়িত হয়। তবে এর হুকুমের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। যেমন–

১. **হিজরত করা মুস্তাহাবঃ** বায়তুল্লাহ, বাইতুলমুকাদ্দাস, মসজিদে নববী এবং জ্ঞানার্জনের জন্যে হিজরত করা মুস্তাহাব।

২. **হিজরত করা ফরযে কিফায়া ঃ** দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জনের জন্যে হিজরত করা ফরযে কিফায়া। যেমন– আল্লাহর বাণী– فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ

৩. **হিজরত করা ফরয ঃ** কোন জনপদের মুসলিম অধিবাসী যদি স্বীয় ধর্ম কর্ম সম্পাদনে বাধাগ্রস্ত হয়, ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনৈসলামিক কার্যকলাপ তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তখন ঐ মুসলিম অধিবাসীদেরকে ঐ জনপদ থেকে অনুকূল পরিবেশে হিজরত করা ফরয। যেমন আল্লাহ তাআলা ফরমায়েছেন–

اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا - হিজরত করা পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত হিজরতের দ্বার উম্মুক্ত থাকবে। কেননা, হাদীস শরীফে এসেছে–

لَاتَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى لَاتَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ

অর্থাৎ তাওবার অবকাশ থাকা অবধি হিজরতের ধারাও বলবৎ থাকবে। মূলতঃ এ বাণীটুকুই হিজরতের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকার পক্ষে যথেষ্ট। (শরহে নাসায়ী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৫২-১৫৩)

سوال : النية في الوضوء فرض ام لا وما الاختلاف فيه بيننا وبين الشافعي اجب مع بيان دلائل الاحناف والشوافع مفصلا -

প্রশ্ন ঃ উযূতে নিয়ত করা ফরয কিনা? আমাদের এবং শাফেয়ী মাযহাবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ কি? উভয় মাযহাবের দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

উত্তর ঃ অযুর ভিতরে নিয়ত করা ফরজ কিনা এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কিরামের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মতবিরোধ রয়েছে। নিম্নে বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করা হল।

১. নিয়ত সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমতঃ উলামায়ে আহনাফের মতে উযূর ভিতরে নিয়ত করা ফরজ নয় বরং সুন্নত।

২. নিয়ত সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র) এর অভিমত ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) এবং ইমাম মালেক (র) এর মতে উযূতে নিয়ত করা ফরয।

আহনাফের দলীল ঃ এ সম্পর্কে উলামায়ে আহনাফ তিনটি দলীল উপস্থাপন করে থাকেন। নিম্নে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হল।

প্রথম দলীল ঃ কুরআনে কারীমের যে আয়াত দ্বারা উযূর ফরজিয়্যাত সাব্যস্ত হয়েছে। তার ভিতরে নিয়তের কোন হুকুম দেয়া হয়নি। সুতরাং এখন যদি নিয়তকে ফরয বলা হয় তাহলে কিতাবুল্লাহর উপর অতিরঞ্জন সাব্যস্ত হবে। আর স্পষ্ট এমন কোন হাদীসও পাওয়া যায় না যার মধ্যে নিয়ত ফরয হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং নবী করীম (স) এর সর্বদা তার উপর আমল করার কারণে তা সুন্নাত হবে।

দ্বিতীয় দলীল ঃ আমাদের দ্বিতীয় দলীল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী- وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا অর্থাৎ আমি আসমান থেকে পবিত্রকারী পানি অবতীর্ণ করেছি। এ আয়াতের ভিতরে ماء طهور মুতলাকভাবে বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আসমান থেকে পানি যে স্থানে এবং যেভাবেই বর্ষণ হোক সেটা পবিত্রকারী। চাই পবিত্রতার নিয়ত করুক বা না করুক। সুতরাং যদি নিয়ত করা ফরয হত তাহলে এ পানির দ্বারা নিয়ত ব্যতীত পবিত্রতা অর্জন করা শুদ্ধ হত না। অথচ এ পানির দ্বারা নিয়ত ব্যতীতই পবিত্রতা অর্জন করা শুদ্ধ হয়। তাই বুঝা গেলো নিয়ত ফরয নয় বরং সুন্নত।

তৃতীয় দলীল ঃ আমাদের তৃতীয় দলীল হলো কিয়াস। আর তা হলো এই যে, উযূ নামাযের শর্তসমূহের একটি শর্ত। সুতরা যেহেতু নামাযের অন্যান্য শর্ত যেমন কাপড়, শরীর ও জায়গা পাক ইত্যাদির ভিতরে নিয়ত করা শর্ত নয়। তাই উযূর মধ্যেও নিয়ত করা শর্ত বা ফরয নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) এ সম্পর্কে দুটি দলীল রয়েছে-

প্রথম দলীল ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী - وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

এ আয়াতে مخلص শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। আর مخلص শব্দটি اخلاص থেকে নিস্পন্ন। আর اخلاص শব্দের একটি অর্থ হলো নিয়ত খাঁটি করা। সুতরাং এ হিসেবে এ আয়াতের অর্থ হবে তাদের কেবল এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য খাঁটি নিয়তে তারই ইবাদত করবে। সুতরাং উযূ যেহেতু একটি ইবাদত। তাই অন্যান্য ইবাদতের মত উযূতেও নিয়ত করা ফরয।

দ্বিতীয় দলীল ঃ দ্বিতীয় দলীল হলো নবী করীম (স) এর প্রসিদ্ধ হাদীস اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ তথা সমস্ত আমল নিয়তের উপরই নির্ভরশীল। এ আয়াত দ্বারা দলীল এভাবে পেশ করা হয় যে, এ হাদীসের حقيقى বা ظاهرى অর্থ এটাই যে, নিয়ত ব্যতীত কোন আমল হতে পারে না। অর্থাৎ نفى وجود الاعمال بلا نية কিন্তু এ অর্থ বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী হওয়ার কারণে সহীহ নয়। কেননা, আমরা প্রতিদিন এমন অনেক কাজ করি যার মধ্যে কখনো নিয়ত করা হয় না। বরং অধিকাংশ সময় নিয়তের খেলাফ বহু কাজ আমাদের থেকে প্রকাশ পায়। যেমন দরসে বসে ঘুমানো ইত্যাদি। সুতরাং বুঝা গেলো যে, হাদীসের حقيقى অর্থ মাতরূক হয়ে গেছে। কাজেই রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নিতে হবে। আর তা হলো نفى حكم الاعمال بلا نية

হুকুমের আবার দুটি শাখা রয়েছে– ১. صِحَّتْ ২. ثَوَاب এখন কথা হলো এ দুটির মধ্য থেকে কোনটা উদ্দেশ্য হবে نفی صِحَّتِ الاَعْمَال بلانيَّة নাকি نفی ثواب الاعمال بلا نيَّة - মাজাযী অর্থ উদ্দেশ্য নেয়ার ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হল, একাধিক মাজাযী অর্থের মধ্যে হতে যে অর্থটা حقيقى معنى এর অধিক নিকটবর্তী বা সামঞ্জস্যশীল সেটাই উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং এই মূলনীতি দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, نفی صحّت الشئ এটা نفی وجود الشئ এর বেশী নিকটবর্তী. উপকার ও উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়ার ব্যাপারে। আর তা এভাবে যে, কোন জিনিস معدوم হওয়ার সুরতে যেমনিভাবে তার দ্বারা উপকার এবং উদ্দেশ্য অর্জনের আশা করা যায় না। তেমনিভাবে কোন জিনিস গাইর সহীহ হওয়ার সুরতেও তার দ্বারা উপকার এবং উদ্দেশ্য অর্জনের আশা করা যায় না, বিধায় نفی صِحَّت টা نفی وُجود এর সদৃশ। এ কারণেই نفی صِحَّت উদ্দেশ্য নেয়া হবে এবং تقديرى عبارت হবে اِنَّمَا صِحَّتُ الاَعْمَال بالنِّيَّات এখন হাদীসের অর্থ হবে কোন আমল নিয়ত ব্যতীত সহীহ হবে না। আর এ عمل তথা উযূ করাটাও হাদীসে বর্ণিত اعمال এর মধ্য থেকে একটি। কাজেই তা নিয়ত ব্যতীত সহীহ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দীলের জবাব ঃ

প্রথম দলীলের জবাব ঃ উল্লেখিত আয়াতে ইবাদত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইবাদতে মাকসুদাহ। সুতরা ইবাদতে মাকসুদাহ এর ভিতরে নিয়ত করা উদ্দেশ্য। ইবাদতে গাইরে মাকসুদাহ এর মধ্যে নিয়ত করা উদ্দেশ্য নয়। ইবাদতে মাকসুদাহ হওয়ার উপর করীনা হলো দ্বীন শব্দটি। কেননা, পরিভাষায় دين ইবাদতে মাকসুদাহ এর উপরেই প্রযোজ্য হয়। গাইরে মাকসুদাহ এর উপর নয়। আর যেহেতু উযূটা ইবাদতে গায়রে মাকসুদাহ। সুতরাং তা এ আয়াতের হুকুমের আওতাভুক্ত নয়। কাজেই উযূতে নিয়ত করা ফরয নয়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব ঃ আপনারা যে, উল্লেখিত প্রসিদ্ধ হাদীসে صِحَّت শব্দ উহ্য মেনেছেন এটা সহীহ নয়। এ জন্য যে, সমস্ত اعمال এর সওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং সওয়াবের ক্ষেত্রে নিয়ত জরুরী হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ কারণে এখানে হয়তোবা ثواب উহ্য মানতে হবে। অথবা এমন একটি শব্দ উহ্য মানতে হবে যেটা সাওয়াবকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর তা হলো حكم শব্দ। এখন যদি হাদীসে ثواب উহ্য মানা হয়। তাহলে এ হাদীস দ্বারা শাফেয়ী ও মালেক (র) এর দলীল পেশ করা বাতিল হওয়া সুস্পষ্ট। আর যদি حكم শব্দ উহ্য মানা হয় তাহলে ثواب এর صِحَّت উভয়টাই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে যদিও বাহ্যিকভাবে এ কথাটা তাদের দিকে মনে হয়। কিন্তু কায়দা ও উসূল এর দিক দিয়ে তাদের استدلال সহীহ হয় না। আর তা এভাবে যে, এ হাদীসে বাক্যের শুদ্ধতা ঠিক রাখা এবং নিয়তের ক্ষেত্রে সওয়াবের মাসআলাকে প্রমাণিত করা প্রয়োজন। কাজেই ইজমার ভিত্তিতে حكم উহ্য মেনে ثواب উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। এর দ্বারা সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেছে। আর কায়দা আছে– الضرورةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَة - যখন হুকুম উহ্য মেনে সওয়াব উদ্দেশ্য নেয়ার দ্বারা জরুরত পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই এখন হুকুমকে علم ধরে সওয়াবের সাথে صِحَّت উহ্য মানার কোন সুযোগ নেই। কেননা, এর দ্বারা প্রয়োজন পরিমাণ থেকে আরো অতিরিক্ত জিনিস মুকাদ্দার মানা অনিবার্য হয়। একারণে صحت উহ্য মানা বাতিল। অনুরূপভাবে এ হাদীস দ্বারা صِحَّت এর পক্ষে দলীল পেশ করাও বাতিল। (উমদাতুর রিআয়া ঃ)

سوال : مَا حكمُ النِّيَّة؟ هَل النِّيَّةُ شرطٌ لِكُلِّ عَمَلٍ؟

প্রশ্ন ঃ নিয়তের বিধান কি? প্রতিটি কাজের জন্যে নিয়ত শর্ত কি-না?

উত্তর ঃ নিয়তের বিধান ঃ নিয়তের বিধান সম্পর্কে আলিমদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় যেমন–

১. মুতায়াখখিরীন আলিমদের বক্তব্য ঃ মুতায়াখখিরীন আলিমগণের মতে শরীয়ত সম্পৃক্ত কার্যাবলী যেগুলো নিয়তের মুখাপেক্ষী, সেগুলোর ক্ষেত্রে নিয়ত করা শর্ত। নিয়ত ছাড়া সেগুলো শুদ্ধ হবে না। তবে সাধারণ কার্যাবলী যেগুলো নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়; যেমন খাওয়া, পানকরা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়ত করা শর্ত নয়।

২. জুমহুর আলিমদের বক্তব্য ঃ জুমহুর আলিমগণের মতে সকল প্রকার কাজের বিশুদ্ধতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। নিয়ত ছাড়া কোন কাজই বিশুদ্ধ হবে না।

৩. ইমাম আবু হানীফা (র) এর বক্তব্য ঃ ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এর মতে, মানুষের আমলসমূহ দুই প্রকার। যথা ১. اعمال مقصودة তথা সরাসরি উদ্দেশ্যকৃত আমল। যেমন সালাত, সওম ইত্যাদি।

২. আর দ্বিতীয় প্রকার হলো اعمال غير مقصودة তথা সরাসরি উদ্দেশ্যহীন আমল, যেমন নামাযের জন্য উযূ, হজ্জের জন্যে ইহরাম, ইত্যাদি। এ দু'প্রকার আমলের মধ্য হতে اعمال مقصودة এর ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত। আর اعمال غير مقصودة এর ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত নয়।

প্রতিটি কাজের জন্য নিয়তের বিধান ঃ সকল কাজে নিয়ত শর্ত কিনা এ ব্যাপারে আমাদের মনীষীদের মত পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম আযম ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারীদের মতে কোন আমল যদি اعمال مقصوده এর অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার জন্য নিয়ত শর্ত। যেমন নামাযের নিয়ত, অন্যথায় নিয়ত শর্ত নয়। যেমন উযূতে নিয়ত করার প্রয়োজন নেই। কেননা, উযূ اعمال غير مقصودة এর অন্তর্ভুক্ত।

২. **ইমাম শাফেয়ী ও জুমহুর আলিমদের বক্তব্য ঃ** ইমাম শাফেয়ী (র) এবং অধিকাংশ আলিমের মতে প্রত্যেক কাজেরজন্য নিয়ত শর্ত, চাই তা اعمال مقصودة এর অন্তর্ভুক্ত হোক অথবা اعمال غير مقصودة এর অন্তর্ভুক্ত হোক। সর্বাবস্থায় নিয়ত করা অপরিহার্য, অন্যথায় আমল বিশুদ্ধ হবে না।

দলীল ঃ তাঁরা انما الاعمال بالنِّيَّات এ হাদীসটি দলীলরূপে গ্রহণ করে বলেছেন যে, উক্ত হাদীসে উল্লেখিত اعمال শব্দের মধ্যে الف لام অব্যয়টি استغراق এর জন্য ব্যবহৃত, অতএব সকল আমলে নিয়ত আবশ্যক।

৩. **মুতায়াখখিরীন আলেমগণের বক্তব্য ঃ** মুতায়াখখিরীন আলিমগণের মতে শরীয়ত সম্পৃক্ত কার্যাবলী, যেগুলো নিয়তের মুখাপেক্ষী সেগুলো নিয়ত ছাড়া শুদ্ধ হবে না। তবে স্বাভাবিক কার্যাবলী যেগুলো নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়। যেমন খাওয়া দাওয়া, পান করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়ত জরুরী নয়।

سوال : أَوْضِحْ قَوْلَهُ الرَّاوِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ

প্রশ্ন ঃ রাবীর উক্তি قراءةً عليه وانا اسمع এর বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ঃ قراءةً عليه وانا اسمعُ **এর ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম নাসায়ী (র) তাঁর উস্তাদ হারিস ইবনে মিসকিন (র) থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে ভিন্ন এক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তিনি সাধারণ নিয়ম حدّثنا বা اخبرنا না বলে এর সাথে قراءة عليه وانا اسمع বাড়িয়ে বলেছেন এর কারণ হল–

১. উস্তাদ হারিস ইবনে মিসকিন (র) কোন এক কারণে তাঁর ছাত্র ইমাম নাসায়ী (র) এর উপর রাগান্বিত হন। ফলে ইমাম নাসায়ী (র) হারিস (র) এর উপর রাগান্বিত হন। ফলে ইমাম নাসায়ী (র) হারিস (র) এর মজলিসে মুখোমুখি না বসে আড়ালে বসে হাদীস শুনতেন। যেহেতু তিনি সরাসরি হাদীস শুনতেন না। সেহেতু সনদে قراءة عليه وانا اسمع বাড়িয়ে বলতেন।

২. অথবা শায়খ হারিস (র) এর কাছ থেকে অন্য কোন ছাত্র হাদীস শুনতেন। অতপর ইমাম নাসায়ী (র) তা শুনে এভাবে বর্ণনা করতেন।

سوال : هٰذَا الحَدِيثُ عَنْ اَيِّ قِسْمٍ وَهَلْ يَصِحُّ إِثْبَاتُ فَرِيضَةِ النِّيَّةِ بِهٖ فِي مَوَاقِعِهَا ؟ اَجِبْ عَلَى ضَوْءِ مَذَاهِبِ الفُقَهَاءِ .

প্রশ্ন ঃ আলোচ্য হাদীসটি কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত? এর দ্বারা কি নিয়তের ফরজিয়্যত সাব্যস্ত করা সহীহ আছে? ফকীহগণের মাযহাবের আলোকে জবাব দাও?

উত্তর ঃ উল্লেখিত হাদীসটি রাসূল (স) থেকে শুধু হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে শুধু আলকামা, তার থেকে একমাত্র মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম তার থেকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী (র) বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকেই হাদীসটি মশহুর হয়েছে। সুতরাং এ হিসেবে হাদীসটি মশহুর। কিন্তু প্রথম সনদ হিসাবে

টি غريب - তিনো ইমাম صحة শব্দকে উহ্য মানার ভিত্তিতে বলেন যে, আমলের মধ্যে নিয়ত ফরয। আর এখানে আলিফ লামকে استغراق হিসাবে গণ্য করেন। ফলে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, উযূ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং এগুলোর মধ্যেও নিয়ত করা ফরয সাব্যস্ত হয়।

আহনাফের মতে এখানে ثواب শব্দ উহ্য রয়েছে। এ হিসেবে অর্থ হবে আমলের সওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এ হাদীস দ্বারা লেখকের উদ্দেশ্য নিয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে সতর্ক করা।

سوال : اَوْضِحْ مَكَانَةَ هٰذَا الحديثِ فِى اُمُورِ الدِّيْنِ .

প্রশ্ন ঃ দ্বীনের ক্ষেত্রে এ হাদীসের মর্যাদা ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মর্যাদার দিক দিয়ে এ হাদীসটি অনেক উচুঁ স্তরের। আর সকলের মতেই এ হাদীসটা সহীহ। এটা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কথা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, এ হাদীসটি ইলমের তৃতীয়াংশ। কেননা দ্বীনের ইলমসমূহ তিন প্রকার। ১. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত ২. যবানের সাথে সম্পৃক্ত ৩. আরকানের সাথে সম্পৃক্ত। আর আলোচ্য হাদীসে এমন ইলম এর কথা বলা হয়েছে যা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এটা ইলমের এক তৃতীয়াংশ প্রমাণিত হল। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন দ্বীনের বিষয়গুলো দু'ভাগে বিভক্ত- ১. অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হচ্ছে নিয়ত। ২. অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হচ্ছে عبادة بدنية আর আলোচ্য হাদীসে প্রথম প্রকারের কথা আলোচনা করা হয়েছে, কাজেই হাদীসটি অর্ধ ইলম প্রমাণিত হল। ইমাম শাফেয়ী (র) থেকে আরেকটি বক্তব্য রয়েছে। আর তা হলো এ হাদীসটি ইলমের এক চতুর্থাংশ। তা এভাবে যে, দ্বীনের স্তম্ভের মৌলিক কালিমা চারটি। যেমন হুজুর (স) বলেছেন- ১.সন্দেহজনক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা, ২. দুনিয়া থেকে অনাসক্তি অবলম্বন করা, ৩. অনর্থক বস্তু ত্যাগ করা। ৪. নিয়তসহকারে আমল করা। আলোচ্য হাদীসটি এ চার প্রকারের মধ্য হতে চতুর্থ প্রকারের। তাই হাদীসটি ইলমের এক চতুর্থাংশ হল। (শরহে নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১৪৯)

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে তাত্ত্বিক কিছু আলোচনা

আলোচ্য হাদীসটি মশহুর পর্যায়ের। এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সমস্ত মুহাদ্দিস একমত। ইবনে মাকুলাসহ অন্যান্যরা এ হাদীস সম্পর্কে যে কালাম বা বিরূপ মন্তব্য করেছেন, তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। কোন কোন আলিম তো এটাকে মুতাওয়াতির সাব্যস্ত করেছেন কিন্তু এটা বিশুদ্ধ নয়। কারণ হাদীসটির প্রাথমিক চারজন রাবী غريب এর পর্যায়ের। পরবর্তীতে এটা মাশহুরের স্তরে উন্নিত হয়েছে। তাই এটা মুতাওয়াতির হতে পারে না।

মোল্লা আলী ক্বারী (র) লেখেন, হযরত উমর (রা) তার থেকে আলকামা, তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম, তার থেকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী এর পরে ১০০ থেকে বেশী রাবী উক্ত হাদীসকে বর্ণনা করেছেন যাদের অধিকাংশই ছিলেন ইমাম।

হাফিজগণের একটি জামাত বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী এর পরে ৭০০ জন রাবী উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ইমাম মালিক, সাওরী, আওযায়ী, ইবনে মুবারক, লাইস ইবনে সা'দ, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, ইবনে উয়াইনাসহ প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ। মোটকথা, এটা প্রথম চার স্তরে غريب এবং তার পরবর্তীতে মশহুর হয়েছে।

মতানৈক্যের ভিত্তি ঃ عمل দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় ইবাদতে মাকসুদা যেমন নামায, যাকাত, রোযা তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এ ক্ষেত্রে নিয়ত করা শর্ত। নিয়ত ছাড়া এ আমলগুলো বিশুদ্ধ হবে না। আর যদি عمل দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ইবাদতে গায়রে মাকসুদাহ যেমন উযূ গোসল ইত্যাদি তাহলে তার জন্য নিয়ত করা জরুরী কি না এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালিক (র) বলেন, উযূতে নিয়ত করা ফরয। নিয়ত ছাড়া উযূ হবে না, তাদের দলীল হলো حديث الباب এখানে বলা হয়েছে আমলের মূল ভিত্তি হলো নিয়ত। আর উযূ যেহেতু আমলের অন্তর্ভূক্ত তাই তাতে নিয়ত আবশ্যক।

২. হানাফীগণ বলেন উযূতে নিয়ত করা জরুরী নয়।

আহনাফের দলীল ঃ ১

জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলের নিকট এসে উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হুজুর (স) তাকে উযূর কায়দা কানুন শিক্ষা দিলেন। কিন্তু সেখানে নিয়তের কথা উল্লেখ করেননি। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেলো উযূতে যদি নিয়ত জরুরী হতো তাহলে রাসূল (স) অবশ্যই তা বলতেন, কোন ক্রমেই ছেড়ে দিতেন না। হুজুর নিয়তের কথা না বলাই এ কথার প্রমাণ যে, উযূতে নিয়ত জরুরী নয়।

২য় দলীল ঃ দ্বিতীয় উযূর শিক্ষা দিয়া হয়েছে যে আয়াতে সেখানেও নিয়তের কথা উল্লেখ নেই। এটাও একথার প্রমান যে, উযূতে নিয়ত করা জরুরী নয়।

তৃতীয় দলীল ঃ উযূ ছাড়া নামাযের আরো অনেক শর্ত রয়েছে। সেগুলোর জন্য নিয়ত করা জরুরী নয়। কাজেই উযূতেও নিয়ত করা জরুরী নয়। আর তারা যে হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সহীহ নয়। কারণ সেটা ইবাদতে মাকসুদাহ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

চতুর্থ দলীল ঃ আল্লাহর বাণী–

١. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا (سورة انفال) ٢. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি, যাতে করে তোমরা তার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে পার। এখানে নিয়তের কথা বলা হয়নি, তাই নিয়ত ছাড়াই উযূ হয়ে যাবে এবং তার দ্বারা নামায আদায় করা যাবে।

মতানৈক্যের ফলাফল ঃ কোন ব্যক্তি বৃষ্টিতে ভেজার কারণে তার উযূর অঙ্গগুলো ধোয়া হয়ে গেল, কিন্তু সে উযূর নিয়ত করেনি, অথবা কাউকে উযূর শিক্ষা দিচ্ছিল কিন্তু সে উযূ করার নিয়ত করেনি, তাহলে এ সকল সূরতে আবু হানীফা (র) এর নিকট উযূ হয়ে যাবে এবং তার দ্বারা নামায আদায় করা যাবে। কিন্তু শাফেয়ী (র) এর নিকট উযূ হবে না। কাজেই তার দ্বারা নামায আদায় করা যাবে না।

নিয়তের ক্ষেত্রে উযূ ও তায়াম্মুমের মধ্যে পার্থক্য করার কারণ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا ٢. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

এ আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় পানি সত্ত্বাগতভাবে পবিত্রকারী কিন্তু মাটি সত্ত্বাগতভাবে পবিত্রকারী নয়, বরং এটাকে مطهر বানানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী– جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا

আমার জন্য ভূমিকে ইবাদতের স্থান এবং مُطَهِّر বানানো হয়েছে। আর جعل শব্দটি ঐ বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করার দ্বারা বুঝা যায় যে, ভমি সত্ত্বাগতভাবে বা মৌলিকভাবে مُطَهِّر ছিল না। বরং উম্মতে মুহাম্মাদীর সম্মানার্থে প্রয়োজনের সময় তাদের জন্য এটাকে طهور বানানো হয়েছে। পক্ষান্তরে পানি এমন নয় কেননা, সেটাকে مطهر বানানোর কারণে طَهُور হয়নি বরং তা স্বত্ত্বাগতভাবেই مطهر ও طهور এর গুনে গুণান্বিত। এ পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে হানাফীগণ বলেন, তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত, কিন্তু উযূতে নিয়ত শর্ত নয়। তবে হ্যাঁ, তা ইবাদত হওয়ার জন্য নিয়ত জরুরী, নিয়ত ব্যতীত তা ইবাদত হবে না।

اعمال خير **এর প্রকারভেদ ঃ** اعمال خير তিন প্রকার ১. طاعة ২. قربت , ৩. عبادت - طاعت ঐ আমলকে বলা হয়, যার উপর সওয়াব দেয়া হয়, তাতে ইতাআতের নিয়ত করা শর্ত নয়। চাই উক্ত আমল নিয়তের উপর মাওকুফ হোক অথবা না হোক এবং ঐ সত্ত্বার পরিচয় পাওয়াও জরুরী নয় যার জন্য ইবাদত করছে। যেমন– কোন ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব এবং তার একত্ববাদের দলীলের ব্যাপারে চিন্তা ফিকির করে, যাতে করে সে আল্লাহর পরিচয় জানতে পারে। তাহলে এটা হলো طاعت - আর قربت ঐ সৎকর্মকে বলা হয়, যার উপর সওয়াব দেয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে مقرب اليه এর পরিচয় জানা জরুরী, কিন্তু নিয়ত জরুরী নয়। যেমন কুরআন তেলাওয়াত, গোলাম আযাদ করা, সদকা প্রদান করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার জাতের মারেফাত হাসেল হওয়া জরুরী। এবং উক্ত আমল দ্বারা তার নৈকট্য অর্জন করা উদ্দেশ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত নয়। আর عبادت ঐ আমলকে বলা হয় যার উপর সওয়াব প্রদান করা হয় তবে সেক্ষেত্রে নিয়তের সাথে সাথে উক্ত ইবাদত দ্বারা যার নৈকট্য অর্জন করা উদ্দেশ্য তার জাতের মা'রেফাত হাসিল হওয়াও জরুরী হয়। যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি।

الْوُضُوْءُ مِنَ الْاِنَاءِ

٧٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فِىْ ذٰلِكَ الْاِنَاءِ وَاَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَتَوَضَّؤُوْا فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ اَصَابِعِهِ حَتّٰى تَوَضَّؤُوْا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ -

٧٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَجِدُوْا مَاءً فَاُتِىَ بِتَوْرٍ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فَلَقَدْ رَاَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ فَيَقُوْلُ حَىَّ عَلَى الطَّهُوْرِ وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْاَعْمَشُ فَحَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ اَبِى الْجَعْدِ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ اَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ -

পাত্র থেকে উযূ করা

অনুবাদ ঃ ৭৬. কুতায়বা (র)............আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখলাম যে, আসরের নামায নিকটবর্তী (অথচ পানি নেই)। লোকেরা পানির অনুসন্ধান করল কিন্তু পানি পেল না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একটি পাত্র আনা হয়। তিনি পাত্রটির ভেতরে হাত রাখেন এবং লোকদের উযূ করার নির্দেশ দেন। আমি দেখলাম, তাঁর হাতের আঙ্গুল থেকে পানি উৎসারিত হচ্ছে। তাঁদের সর্বশেষ ব্যক্তিসহ সকলেই (এ পানি দ্বারা) উযূ করেন।

৭৭. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র) ....আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (এক সফরে) নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। লোকেরা পানি পাচ্ছিলেন না। তাঁর কাছে একটি (তশতরীর ন্যায়) পাত্র নিয়ে আসা হয় এবং তিনি তাতে হাত ঢোকান। আমি দেখলাম, তাঁর হাতের আঙ্গুলের ফাঁক হতে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বলছিলেন, তোমরা আল্লাহর তরফ থেকে পানি ও বরকত নিতে এসো। আ'মাশ (রা) বলেন, আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সালিম ইবনে আবুল জা'দ। তিনি বলেন, জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনারা তখন কতজন লোক ছিলেন? তিনি বলেন, আমরা তখন দেড় হাজার লোক ছিলাম।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

রাসূল (স) এর অলৌকিক ঘটনা ঃ শিরোনামের অধীনে দুটি হাদীস আনা হয়েছে। প্রথম হাদীসে اناء (পাত্র) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, নবী (স) এর নিকট একটি পাত্র আনা হল, যাতে সামান্য পানি ছিল। তিনি পাত্রের মধ্যে পবিত্র হাত রাখেন। ফলে পানির মধ্যে বিরাট বরকত দৃষ্টিগোচর হল। আলোচ্য হাদীসের রাবী এটারই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ الخ এ শব্দাবলী দ্বারা হযরত আনাস (রা) বলেন, হুজুর (স) এর আঙ্গুলের নিচ হতে ঝর্ণা নির্গত হতে দেখেন এবং ঘটনাস্থলে যত সাহাবী উপস্থিত ছিলেন, সকলেই উক্ত পাত্র হতে উযূ করেন। এটাকেই রাবী

বর্ণনা করেছেন حَتّٰى تَوَضَّؤُا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ দ্বারা (তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিসহ সকলে উক্ত পানি দ্বারা উযূ করলেন। উক্ত বাক্যটি اولهم الي اخرهم এর সংক্ষিপ্তরূপ। উক্ত বাক্য দ্বারা এ কথার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঘটনাস্থলে হুজুর (স) এর সাথে যত সাহাবী উপস্থিত ছিলেন সকলেই উক্ত পানি দ্বারা উযূ করেছেন। আলোচ্য হাদীসে হযরত আনাস (রা) যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এটা মদীনার বাহিরের ঘটনা ছিল। বাস্তবিকপক্ষে এটা রাসূল (স) এর পবিত্র হাতের মু'জিযা ছিল।

কাযী আয়াজ (র) লেখেন উক্ত ঘটনা নির্ভরযোগ্য ও সিকারাবীদের এক বিরাট জামাআত উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি মুত্তাসিল সনদে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এরূপভাবে প্রমাণিত যে, কেউ তার বিপরীত রেওয়ায়েত করেননি এবং কেউ উক্ত ঘটনাকে অস্বীকারও করেননি। যখন রাবী উক্ত ঘটনাকে লোক সম্মুখে বর্ণনা করেন, তখন সকলে নিরবতা অবলম্বন করেন এবং নিশ্চুপ থাকেন। এটাই একথার প্রমাণ যে, ঘটনাটি বিশুদ্ধ। কারণ তারা কখনো বাতিল বিষয়ে নিরব থাকতেন না বরং সেটাকে খণ্ডন করতেন এবং মিথ্যা বিষয় প্রচার করা হতে বিরত রাখতেন। সুতরাং আলোচ্য ঘটনাটি রাসূলের অকাট্য মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় হাদীসের মধ্যে تور শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। تور হলো এক ধরণের ছোট পাত্র, তাতে সামান্য পরিমাণ পানি ছিল। যখন উক্ত পাত্রে নবী (স) নিজের পবিত্র হাতকে রাখেন তখন এক বিরাট বরকত পরিলক্ষিত হল। এটাকেই রাবী فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, আমি দেখলাম নবী (স) এর হাতের আঙ্গুলের ফাঁক হতে ঝর্ণার ন্যায় পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তখন রাসূল (স) বলছিলেন- حَيَّ عَلَى الطَّهُوْرِ وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ তথা তোমরা আল্লাহর তরফ থেকে পানি ও বরকত নিতে আস। আবুল বাকা বলেন, الْبَرَكَةِ শব্দটি الطهور শব্দের উপর আতফ হয়েছে। কাজেই সেটাকে جر এর সাথে পড়তে হবে। এ আতফকে عطف الوصف على الشئ বলা হয়। যেমন أَعْجَبَنِيْ زَيْدٌ عِلْمُهُ এর মধ্যে وصف علم এর আতফ যায়েদের উপর হয়েছে।

রাবী বলেন, নবী করীম (স) পানিকে বরকত দ্বারা এ কারণে ব্যাক্ত করেছেন যে, প্রথমে ঐ পানি অল্প পরিমাণ ছিল। অতঃপর তা প্রচুর আকারে ধারণ করে। শব্দটিকে যদি رفع এর সাথে পড়া হয় তাহলে এখানে কোন উদ্দেশ্য লাভ হবে না। আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, এ ধরণের ক্ষেত্রে এমন বৃহত বরকতের প্রকাশ ঘটার উপর অন্য কোন শক্তির খেয়ালকে নির্মূল করার জন্য এবং আল্লাহ তাআলার ইহসানকে নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার লক্ষ্যে বরকতের নিসবত আল্লাহ তাআলার দিকে করেছেন। আর তার থেকে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার সংবাদ প্রদানের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকে না। কাজেই البركة শব্দটিকে رفع সহকারে পড়তে নিষেধ করার কোন কারণ নেই।

মোটকথা, হুজুর (স) এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, লোটা, বদনা, পাত্র ইত্যাদি দ্বারা উযূ করা বৈধ।

এখন কথা হল, রাসূল (স) এর সাথে ঘটনাস্থলে কত জন সাহাবা ছিলেন? তাদের সংখ্যা কত ছিল? এ সংখ্যা নির্ণয়ের ব্যাপারে উলামাযে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য হয়ে গেছে।

কোন কোন বর্ণনায় আছে রাসূল (স) এর সাথে একশত আট জন সাহাবী ছিলেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে প্রায় তিনশত সাহাবা ছিলেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে ৮০ অথবা তার থেকে কিছু বেশী সাহাবী ছিলেন।

কোন কোন বর্ণনায় ৭০ এবং ৮০ এর মধ্যবর্তী সংখ্যার কথা উল্লেখ আছে। সালিম ইবনে আবুল জা'দ এর প্রশ্নের জবাবে হযরত জাবের (রা) বলেন ১৫০০ সাহাবী ছিলেন।

بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوْءِ

٧٨. اخبرنا اسحاقُ بْنُ ابراهيمَ انْبَانَا عبدُ الرزّاقِ قال حدّثنا معمرٌ عن ثابتٍ وقتادة عَن انسٍ رضى الله عنه قال طلبَ بعضُ اصحابِ النبيّ ﷺ وَضُوْءًا فقالَ رسولُ الله ﷺ هَل معَ احدٍ مّنكم ماءٌ فوضعَ يَدَهُ فِي الماءِ ويقولُ توضّؤا بسم الله فرايتُ الماءَ يَخرجُ من بَيْنِ اصابِعِه حتّى توضّؤا مِن عندِ اخرِهم - قال ثابتٌ قلتُ لِانسٍ كَمْ تراهُم قال نَحْوًا مِّن سَبْعِيْنَ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ উযূ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা

অনুবাদ ঃ ৭৮. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কোন এক সফরে) নবী করীম (স)-এর কয়েকজন সাহাবী উযূর পানি তালাশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমাদের কারও নিকট পানি আছে কি? (একজন পানি এনে দিলে) তিনি পানিতে হাত রাখলেন এবং বললেন বিসমিল্লাহ বলে উযূ কর। আমি তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক থেকে পানি বের হতে দেখলাম। তাঁদের সর্বশেষ ব্যক্তিসহ সকলেই উক্ত পানি দ্বারা উযূ করেন। সাবিত (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি উপস্থিত লোকের সংখ্যা কত মনে করেন? তিনি বললেন, সত্তর জনের মত।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : ما حكم التّسمية عند الوضوء؟ هل هى واجبةٌ ام سنةٌ وما الاختلافُ فيه بينَ الائمّة؟ بيّن مُدلّلا.

প্রশ্ন ঃ উযূতে বিসমিল্লাহ পাঠের বিধান কি? এটা কি ওয়াজিব নাকি সুন্নত? এ বিষয়ে আলিমদের অভিমত দলীলসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ উযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার বিধান ঃ উযূ করার শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ফরয কিনা এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. আহলে জাওয়াহের, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই ও ইমাম আহমদ (র) এর মতে, উযূর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। তবে ইমাম আহমদ (র) ও ইসহাক (র) বলেন, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে বুঝে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয় তাহলে পুনরায় উযূ করা ওয়জিব হবে। আর যদি ভুলে ছেড়ে দেয় তাহলে উযূ দোহরানো ওয়াজিব নয়।

২. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক (র)সহ জুমহুর উলামায়ে কিরামের মতে এবং ইমাম আহমদ (র) এর বিশুদ্ধমতে উযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত; ওয়াজিব নয়। (আল-আইনী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৬৯৫)

৩. ইমাম আবু হানীফা (র) এর এক রিওয়ায়েত মুতাবেক ইমাম মালেক ইবনে খুযাইমা ও বায়হাকী প্রমূখ বলেন, উযূতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ওয়াজিব নয়।

আহলে জাওয়াহের এর দলীল ঃ

١. عن ابى هريرةَ رض قال قال رَسولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لا صَلوٰةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ وَلَا وُضُوْءَ لِمَن لَمْ يَذكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, ঐ ব্যক্তির নামায আদায় হয় না, যে সঠিকভাবে উযূ করে না এবং ঐ ব্যক্তির উযূ হয় না যে, আল্লাহর নাম স্মরণ করে না। (বিসমিল্লাহ বলে না) উভয় স্থানে লাম হরফটি জাতের নফীর জন্য এসেছে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ ব্যতীত উযূ হবে না। (আবু দাউদ ১/১৪, বুখারী-১/২৫, তিরমিযী ১/১৩, নাসায়ী ১/২৫, ইবনে মাজাহ ৩২)

২. لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَا صَلّٰى مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ

অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির উযূ হয় না যে আল্লাহ তাআলার নাম স্মরণ করে না এবং ঐ ব্যক্তির নামায হয় না যে ভালভাবে উযূ করে না। উভয় হাদীস দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, বিসমিল্লাহ বলা ব্যতীত উযূ হবে না।

ইমাম খুযাইমা ও মালেক (র) এর দলীল ঃ তারা বলেন, উযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। দলীল নিম্নরূপ–

১. طَلَبَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوْءً فَلَمْ يَجِدُوْا مَاءً فَقَالَ هَلْ مَعَ اَحَدٍ مِّنْكُمْ مَاءٌ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْاِنَاءِ فَقَالَ تَوَضَّئُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম (উযূর জন্য) পানি তালাশ করলেন, কিন্তু (তারা) পানি পাননি। অতঃপর রাসূল (স) বললেন, তোমাদের মধ্যে কারো নিকট কি পানি আছে? অতঃপর তিনি তাঁর হাতকে পাত্রে রাখলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা বিসমিল্লাহ সহকারে উযূ কর।

২. كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَمْ يُبْدَاْ فِيْهِ بِبِسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ

যেকোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিসমিল্লাহ বিহীন শুরু করলে তা ত্রুটিপূর্ণ হয়।

এ হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, বিসমিল্লাহ দ্বারা উযূ শুরু করা ওয়াজিবও নয় সুন্নাতও নয়, বরং মুস্তাহাব।

জুমহুরের দলীল ঃ তাদের প্রথম দলীল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ.

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুইসহ ধৌত কর, তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং তোমাদের পদদ্বয় টাখনুসহ ধৌত কর। (মায়েদাহ :৬)

উক্ত আয়াতে উযূর ফরয হিসেবে শুধু চারটি উযূর কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বিসমিল্লাহ এর কথা উল্লেখ নেই। এর দ্বারা বুঝা যায় বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব নয়। আবু হুরায়রা (রা) হতে মারফূ হাদীস বর্ণিত আছে–

مَنْ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى وُضُوْئِهِ كَانَ طُهُوْرًا لِجَسَدِهِ قَالَ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَانَ طُهُوْرًا لِاَعْضَائِهِ

অর্থাৎ যে উযূর সময় আল্লাহর নাম নিয়ে উযূ করবে, এটা তার গোটা দেহের পবিত্রতার কারণ হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আর যে, আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে উযূ করবে, এটা তার উযূর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পবিত্রতার কারণ হবে। (দারাকুতনী ১/৭৪-৭৫, বায়হাকী ১/৪৫)

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিসমিল্লাহ ছাড়াও উযূ শুদ্ধ হবে যদিও বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত।

২. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاِنَّ حَفَظَتَهَا لَا تَبْرَحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتّٰى تُحْدِثَ مِنْ ذٰلِكَ الْوُضُوْءِ.

অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো একটি মারফূ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, আবূ হুরায়রা! তুমি যখন উযূ কর, তখন বিসমিল্লাহ বল ওয়ালহামদু লিল্লাহ। কারণ তোমার রক্ষক ফেরেশতারা তোমার জন্য এ উযূ থেকে পুনরায় অপবিত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নেকী লিখতেই থাকবে।

(মাজউয যাওয়ায়েদ ১/২২০)

এ হাদীসটি বিসমিল্লাহ সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট। কেননা, এতে আলহামদু লিল্লাহ বলারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা কারো মতে ওয়াজিব নয়।

চতুর্থ দলীল ঃ

حَدِيْثُ الْاَعْرَابِيِّ الْمُسِيْئِ فِي الصَّلٰوةِ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْوُضُوْءَ وَقَالَ تَوَضَّأْ كَمَا اَمَرَكَ اللّٰهُ وَلَمْ يَاْمُرْ بِالتَّسْمِيَةِ.

নামাযে ভুলকারী গ্রাম্য ব্যক্তির হাদীস। রাসূল (স) তাকে উযূ শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন তুমি উযূ কর, আল্লাহ তাআলা তোমাকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে। তিনি তাকে বিসমিল্লাহ পড়ার নির্দেশ দেননি।

পঞ্চম দলীল ঃ

عن مهاجر بن قنفذ انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال انه لم يمنعني أن أرد عليك الا انى كرهت أن اذكر الله الا على طهارة.

মুহাজির ইবনে কুনফুয থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)কে সালাম দিলেন। তখন রাসূল (স) উযূ করছিলেন। রাসূল (স) তার সালামের উত্তর দেননি। অতঃপর যখন তিনি উযূ থেকে ফারেগ হন, তখন বললেন, তোমার সালামের জবাব দিতে আমাকে অন্য কিছুতে বিরত রাখেনি তবে অপবিত্র অবস্থায় সালাম দেওয়াকে আমি অপছন্দ করি। এ হাদীসে বলা যে, হয়েছে রাসূল (স) অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহর যিকির করাকে অপছন্দ করতেন। আর বিসমিল্লাহও আল্লাহর যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে কিভাবে উযূর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলবে?

৬ষ্ঠ দলীল ঃ অনেক সাহাবী নবী করীম (স) এর উযূর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, তাতে কোথাও বিসমিল্লাহর আলোচনা পাওয়া যায় না। যদি বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব হত তবে সে সব হাদীসে অবশ্যই এর আলোচনা করা হত। (আহকামুল হাদীস পৃষ্ঠা নং ৬৩, শরহে মাআনীল আছার পৃষ্ঠা নং ৩১৯, শরহে নাসায়ী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৬৩- ১৬৪)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

১. বিসমিল্লাহ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং বিসমিল্লাহকে যদি ওয়াজিব মানা হয় তাহলে এটা কুরআনের উপর অতিরঞ্জন করা হবে যা জায়েয নয়। কেননা, কুরআনে শুধু চারটি উযূর কথাই উল্লেখ রয়েছে।

২. উক্ত হাদীসে নফী (না) দ্বারা নফীয়ে কামিল (অপূর্ণাঙ্গতা) উদ্দেশ্য, অশুদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হল–

لا الوضوء الكامل لمن لم يذكر اسم الله عليه অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির উযূ পরিপূর্ণ নয়, যে উযূতে বিসমিল্লাহ বলে না। যেমন অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে– لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد অর্থাৎ মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদে ছাড়া হয় না। (দারাকুতনী-১/৪২০)। এখানেও নফী দ্বারা نفى كامل উদ্দেশ্য,

৩. বিসমিল্লাহ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি কোন শক্তিশালী রেওয়েত দ্বারা প্রমাণিত নয়। স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (র) ইমাম আহমদ (র) এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, لا أعلم فى هذا الباب حديثا له اسناد جيد অর্থাৎ এই অনুচ্ছেদে উত্তম সনদ বিশিষ্ট কোন হাদীস সম্পর্কে আমার জানা নেই। (তিরমিযী ১/১৩, আহকামুল হাদীস পৃষ্ঠা নং ৬৪)

৪. আহলে জাহের ও ইমাম আহমদ (র) এর দলীললের জবাবে আল্লামা কাশ্মীরী (র) বলেন, এ হাদীসটি ضعيف এমনটি ইমাম আহমদ (র)ও বলেন, ماوجدت فى هذا حديثا صحيحا অতএব এটা দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে না।

৫. ইমাম ত্বহাবী (র) বলেন এখানে لاوضوء দ্বারা متكامل فى الثواب কে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্যান্য হাদীসে আছে– لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد (শরহে মিশকাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩১৯)

৬. তাদের বর্ণিত হাদীস– لا صلوة لمن لاوضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه এর ব্যাখ্যা রয়েছে, হতে পারে এখানে পূর্ণাঙ্গতার নফী করা হয়েছে। সে মতে অর্থ হবে, তার উযূ পরিপূর্ণ সওয়াবের অধিকারী হতে পারে না। যেমন রাসূল (স) বলেছেন– ليس المسكين الذى ترده التمرة والتمرتان

ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয় যার নিকট দু'এক টি খেজুর দু'এক লোকমা খাবার আছে।

এ কথা দ্বারা রাসূল (স) এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাদের মিসকীনের সংজ্ঞা থেকে বের করে দিবেন। এখানে উদ্দেশ্য হলো সে পরিপূর্ণ মিসকীন নয় একথা বুঝানো। যেমন তিনি বলেছেন, ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই যার আমানতদারী নেই। আরো বলেছেন, সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে উদরপূর্তি করে খাবার খায়, অথচ তার পাশের প্রতিবেশী ক্ষুধার্থ থাকে। এ সকল হাদীসে তাদেরকে মুমিনের সংজ্ঞা থেকে বের করে দেওয়া রাসূল (স)এর উদ্দেশ্য

নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা ঈমানের সর্বোচ্চ চূড়ায় উপনীত নয়। এ ধরনের আরো অনেক হাদীস রয়েছে। মোটকথা এর উদ্দেশ্য হল, সে এমন পরিপূর্ণ উযূ করেনি যার ফলে সে সওয়াবের অধিকারী হতে পারে। সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, এখানে ৮ অব্যয়টি জাতের নফীর জন্য হতে পারে এবং কামালের নফীর জন্যও হতে পারে। আর দ্বিতীয়টা অগ্রগণ্য যাতে মুহাজির ইবনে কুনফুয এর রেওয়ায়েতের সাথে تعارض না হয়।

যৌক্তিক প্রমাণ ঃ উযূ হলো নামাযের আসবাবের অন্তর্ভুক্ত। আমরা দেখি নামাযের অন্যান্য শর্তগুলোর ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ পড়ার প্রয়োজন হয় না। যেমন সতর ঢাকা নামাযের একটি শর্ত। যদি কোন ব্যক্তি বিসমিল্লাহ ছাড়া সতর ঢাকে তাতে কোন অসুবিধা নেই। অতএব, নামাযের জন্য অন্যান্য শর্তের ন্যায় উযূতেও বিসমিল্লাহ পড়ার দরকার নেই। এটাই যুক্তির দাবী। (শরহে মাআনিল আছার পৃষ্ঠা নং ৭৩০)

سوال : هل التَّسْمِيَةُ فِى كُلِّ اَفْعَالِ الْمُسْلِمِ سنةٌ ام لا؟

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের প্রতিটি কাজে বিসমিল্লাহ বলা কি সুন্নত নাকি সুন্নত নয়?

উত্তর ঃ মুসলমানদের প্রতিটি কাজে বিসমিল্লাহ পড়ার বিধান ঃ মুসলমানদের প্রতিটি কাজের শুরুতে "বিসমিল্লাহ" পড়া সুন্নত কি-না এর জবাবে নিম্নোক্ত অভিমতগুলো প্রনিধানযোগ্য। ইয়াযুদ্দীন আব্দুস সালাম বলেন, মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে তিন ধরণের কাজ আছে। যথা–

১. প্রথম প্রকার কাজ যার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নত। যথা– উযূ, গোসল, তায়াম্মুম, যবাই করা, কুরবানী করা, কুরআন তিলাওয়াত করা। এছাড়াও কতিপয় মুবাহ কাজ আছে। যেমন– খাওয়া, পানকরা, শয়ন করা, সঙ্গম ইত্যাদি কাজের শুরুতে ও বিসমিল্লাহ বলা সুন্নত। যেমন রাসূল (স) অন্য হাদীসে বলেছেন–

كل امرٍ ذِى بَالٍ لمْ يُبْدأ بِبِسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ

২. দ্বিতীয় প্রকার কাজ, যার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নত নয়। যেমন আযান, হজ্জ, উমরা, যিকির করা, মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় ডাকা, আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন প্রতিষ্ঠার কাজ ইত্যাদি।

৩. তৃতীয় ঃ হারাম কাজ, নাফরমানিমূলক কাজ ইত্যাদির শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা নাজায়েয।

سوال : ما هُوَ المقصودُ مِنْهُ بِتَرْجمةِ البَابِ؟

প্রশ্ন ঃ ترجمة الباب এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম নাসায়ী (র) অত্র অনুচ্ছেদটির শিরোনাম দিয়েছেন, باب التسمية عند الوضوء এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো উযূর প্রারম্ভে بسم الله الرحمن الرحيم পাঠ অপরিহার্য প্রমাণ করা। কেননা, তাঁর নিকট উযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। ইমাম নাসায়ী (র) তার এ বক্তব্যটি প্রমাণ করেছেন নিম্নোক্ত যুক্তির মাধ্যমে যেমন– ১. হাদীসে নির্দেশ এসেছে–توضؤوا بسم الله

এখানে।توضؤوا শব্দটি امر। তথা নির্দেশজ্ঞাপক যা নির্দেশিত কাজের অপরিহার্যতা তথা وجوب প্রমাণ করে।

২. অন্য হাদীসে এসেছে لا وُضُوْءَ لِمن لَمْ يذكرِ اسْمَ اللّٰهِ عليه এটাও প্রমাণ করে যে, بسم الله الرحمن الرحيم সহকারে উযূ করা অপরিহার্য।

سوال : ما هو حكمُ التَّسْمِيَةِ عندَ الجِمَاعِ؟

প্রশ্ন ঃ সহবাসের সময় বিসমিল্লাহ পাঠের বিধান কি?

উত্তর ঃ স্ত্রী সহবাসের সময় বিসমিল্লাহ বলার বিধান ঃ নিতান্ত গোপনীয় কাজ হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী সঙ্গমকালে প্রত্যেকের বিসমিল্লাহ পড়া উচিত। রাসূল (স) বিষয়টিকে উৎসাহিত করে বলেছেন–

لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتٰى اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ الله اَللّٰهُمَّ ..... الخ

সঙ্গমকালে বিসমিল্লাহ নয়, বরং নিম্নোক্ত দুয়া পড়া যায়।

بسم اللّٰه اَللّٰهم جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا ـ

سوال : كيف استدل البخاری رح علی مشروعية التسمية عند الوضوء؟ بين.

প্রশ্ন ঃ কিভাবে বুখারী (র) উযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করেছেন? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ উযূর সময় বিসমিল্লাহ পাঠের আবশ্যকতার বিধান ঃ ইমাম বুখারী (র) সহ কতিপয় মুহাদ্দিস উযূর সময় বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব তথা অপরিহার্য বলেছেন, অথচ আল কুরআনে উযূর ارکان। বর্ণনা প্রসঙ্গে বিসমিল্লাহ বলা আদৌ উল্লেখ নেই। তারা নিম্নোক্ত পন্থায় এ বিষয়টি প্রমাণিত করেন–

১. ইমাম বুখারী (র) ইবনে আব্বাস (রা) এর হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূল (স) বলেন,–

لو كان احدكم اذا اتى هذه قال بسم الله الخ

ইমাম বুখারী (র) অত্র হাদীসের সূত্র ধরে বলেন, প্রতিটি ভাল কাজের সূচনায় বিসমিল্লাহ বলতে হবে। উযূ একটা উত্তম কাজ হিসেবে এর সুচনায়ও বিসমিল্লাহ্ বলতে হবে।

২. অন্য হাদীসে এসেছে– لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

৩. রাসূল (স) বলেন, توضئوا بسم الله الخ

উদ্ধৃত হাদীসসমূহ থেকে বুঝা যায় উযূর সময় বিসমিল্লাহ বলা অপরিহার্য।

হাদীস সংশিশ্ল তাত্ত্বিক আলোচনা

মুহাদ্দিসগণের নিকট উযূর প্রাক্কালে বিসমিল্লাহ বলার ব্যাপারে যে হাদীসটি মাশহুর রয়েছে তা হল– لا وضو لمن لم يذكر اسم الله عليه কিন্তু এই হাদীসের সনদের ব্যাপারে কালাম রয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে তা সিহহাতের স্তরে পৌছে না। কাজেই ইমাম নাসায়ী (র) উক্ত হাদীসের শিরোনামে উল্লেখ করার উপযুক্ত মনে করেননি। তিনি আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসকেই ইমাম বায়হাকী, ইবনে মান্দাহ, ইবনে খুযাইমাহ, দারাকুতনী নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ও বলেছেন– هذا اصح ما فى التسمية

তথা উযূর প্রাক্কালে বিসমিল্লাহ সংক্রান্ত হাদীসগুলোর মধ্যে এটা সব থেকে বিশুদ্ধ হাদীস। ইমাম নববী (র) বলেন, اسناده جيد আলোচ্য হাদীসের সনদটা উত্তম। কাজেই ইমাম নাসায়ী (র) لا وضوء .. الخ হাদীসকে পরিত্যাগ করে স্বীয় শিরোনামের অধীনে আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস এনেছেন।

ইবনে কুদামার বক্তব্য ঃ ইবনে কুদামা লেখেন, উযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ার বিষয়টি মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা।

১. ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও সুফিয়ান সাওরী এর মতে, উযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত।

২. ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, দাউদে জাহেরী ও ইমাম আহমদ (র) এক বর্ণনা মুতাবেক উযূর প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব। আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেন, ইমাম মালেক (র) উযূর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়াকে বিদআত মনে করেন, ইমাম মালেক ও আবু হানীফা (র) এর আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে যে, উযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। (মুগনী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৮৪)

ইমাম আহমদ (র) এর বক্তব্য ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, উযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে বর্ণিত কোন হাদীস আমার জানা নেই, তা সত্ত্বেও তিনি উযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা। এর কারণ হল, এ ব্যাপারে একাধিক হাদীস বর্ণিত রয়েছে, যদিও হাদীসগুলো ত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু একাধিক সনদ থাকার কারণে তার মধ্যে শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। তাই এর দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা যায়।

ইমাম আহমদের বক্তব্যের জবাব ঃ لاوضوء .... الخ দ্বারা উযূর ফযীলতের নফী করা হয়েছে অথবা পূর্ণাঙ্গতার নফী করা হয়েছে; جواز বা صحت এর নফী করা হয়নি। যেমন–

لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد এর মধ্যে লক্ষ করা যায়।

ইবনে উমরের বক্তব্য ঃ ইবনে উমর (রা) মারফূ হাদীস বর্ণনা করেন যে, হুজুর (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি উযূ করল এবং উযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ল, তাহলে তার এ উযূ তার সমস্ত শরীরকে পবিত্র করে দেবে, কিন্তু যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ ব্যতীত উযূ করল তার এ উযূ কেবল উযূর অঙ্গগুলোকে পবিত্র করবে। সমস্ত শরীরকে নয়। এ হাদীসটি দারাকুতনী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।

صَبُّ الْخَادِمِ الْمَاءَ عَلَى الرَّجُلِ لِلْوُضُوْءِ

٧٩. اخبرنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ والحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ قراءةً عليه وانا اَسْمَعُ واللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وهبٍ عَنْ مالكٍ ويُونُسَ وعَمْرِو بْنِ الحارثِ اَنَّ ابنَ شهابٍ اَخْبَرَهُمْ عن عَبَّادِ بْنِ زيادٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ اَنَّهُ سَمِعَ أَباه يقولُ سكبتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ توضَّأَ فِى غزوةِ تبوكَ فمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ - قال ابو عبدِ الرحمٰن لم يذكر مالكٌ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ -

পুরুষের জন্য খাদেমের উযূর পানি ঢেলে দেয়া

অনুবাদ ঃ ৭৯. সুলায়মান ইবনে দাউদ ও হারিস ইবনে মিসকীন (র).........উরওয়া ইবনে মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা (মুগীরা রা)-কে বলতে শুনেছেন, তাবূকের যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর উযূ করার সময় পানি ঢেলে দিয়েছি। তিনি মোজার উপর মাসেহ করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ ইমাম নববী (র) বলেন, আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় উযূতে অন্যের সাহায্য চাওয়া জায়েব আছে। সাহায্য চাওয়ার তিনটি সূরত হতে পারে–

১. কোন ব্যক্তি কারো নিকট উযূ করার জন্য পানি প্রার্থনা করল, এ সূরত মাকরূহহীনভাবে জায়েব।

২. খাদেম পানি ঢালে এবং উযূকারী ব্যক্তি স্বয়ং নিজেই উযূর কার্যাবলী সম্পাদন করে।

৩. (কোন ব্যক্তি) পানি ঢালা এবং উযূর কার্যাবলী যেমন– হাত-পা ধৌত করা এবং মাথা মাসেহ করার কার্যাদি অন্যজন সম্পাদন করায়ে দেয়া।

শেষ প্রকারের সাহায্য সহযোগিতা চাওয়া প্রয়োজন ব্যতীত সর্ব সম্মতিক্রমে মাকরূহ। হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন থাকে অথবা অপারোগ হয় তাহলে এ সুরতও বৈধ।

সারকথা, প্রথম ও দ্বিতীয় সূরতে উযূর ক্ষেত্রে সহযোগিতা চাওয়া ও অপারগতা ব্যতীত অন্যের সাহায্য নেয়া মাকরূহ। তাতারখানিয়া গ্রন্থে আছে–

وَمِنَ الْاَدَبِ اَنْ يَقُوْمَ بِاَمْرِ الْوُضُوْءِ بِنَفْسِهِ ولو اسْتَعَانَ بِغَيْرِهِ جَائِزٌ بعدَ اَنْ لَّايَكُوْنَ الْغَاسِلُ غَيْرُهُ بَلْ يَغْسِلُ بِنَفْسِهِ.

অর্থাৎ উযূর আদব হল, উযূর কার্যাবলী নিজেই সম্পাদন করা। যদিও অন্যের সাহায্য লওয়া জায়েব আছে অর্থাৎ উযূকারী ব্যক্তি উযূর কার্যাবলী নিজেই সম্পাদন করে, আর অন্যজন পানি ঢেলে দেয়। এ সুরতে অন্যের সাহায্য লওয়া জায়েয আছে। কতক রেওয়ায়েতে আছে- রাসূল (স) বলেছেন–

اَنَا لَا اَسْتَعِيْنُ فِى وُضُوْئِى بِاَحَدٍ

অর্থাৎ আমি আমার উযূতে অন্যের সহযোগিতা গ্রহণ করি না। একথা হযরত উমর (রা) কে বলেছিলেন, যখন তিনি হুজুর (স) এর উভয় পা মোবারক ধৌত করার জন্য তাড়াহুড়া করছিলেন। ইমাম নববী (র) শরহে মুহাযযাব গ্রন্থে লিখেন– هذا حديثٌ باطلٌ لَااَصْلَ لَهُ

অর্থাৎ انا لا استعين ... الخ হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই। مسح عَلَى الْخُفَّيْنِ এর অধীনে সংক্রান্ত এ আলোচনা আসবে, ইনশা আল্লাহ।

سوال : اذكر نبذة من حياة سيدنا المغيرة بن شعبة رح

প্রশ্ন ঃ মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) এর জীবন পরিচিতি লেখ।

উত্তর ঃ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ঃ তাঁর নাম হলো মুগীরা। আল্লামা আইনী (র) তাঁকে আলিফসহ আল মুগীরা পড়েছেন, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, আবু মুহাম্মদ, আবু ঈসা। পিতার নাম শো'বা, তিনি তায়েফের সাকীফ বংশোদ্ভুত ছিলেন।

বংশ পরিচিতি ঃ মুগীরা ইবনে শো'বা ইবনে আবু আমির ইবনে মাসউদ ইবনে মাওহাব ইবনে মালিক ইবনে কা'ব ইবনে আমর ইবনে সা'দ ইবনে আউফ।

জন্ম ঃ তিনি হিজরতের প্রায় বিশ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ তিনি পঞ্চম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেই মদীনায় হিজরত করেন।

জিহাদ ঃ তার প্রথম জিহাদ খন্দক দিয়ে শুরু হয়। অতঃপর তিনি বাইয়াতে রিযওয়ান ও হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশ গ্রহণ করেন। ইয়ামামা, কাদেসিয়া প্রভৃতি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। সিরিয়া বিজয়েও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

গভর্ণররূপে দায়িত্ব পালন ঃ হযরত উমর (রা) তাকে প্রথমে বসরায় এবং পরে কূফায় নিয়োগ করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর আমলে হিজরী ৪১ সনে তিনি পুনরার কূফায় গভর্ণর নিযুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি সেখানেই বসবাস করেন। হযরত আলী (র) এবং মুয়াবিয়া (র) এর বিরোধকালে তিনি কোন পক্ষ সমর্থন করেন নি। ফলে তিনি সিফফীন ও জঙ্গে জামালের কোনটাতেই অংশ গ্রহণ করেননি। বরং সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করেন।

গুণাবলী ঃ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) একজন কর্তব্য পরায়ন বিচক্ষণ ও মেধাবী সাহাবী ছিলেন। অনেক সফরে তিনি রাসূল (স) এর সঙ্গী ছিলেন। মুজাহিদ বলেন, চারজন লোক খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন মুগীরা ইবনে শো'বা।

হাদীস রেওয়ায়েত ঃ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। এ কারণে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত কম করেছেন। তিনি রাসূল (স) থেকে মোট ১৩৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তার থেকে অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হল, তাঁর ছেলে হযরত উরওয়া, হামজা, তার দাদার ছেলে জুবাইর ইবনে হাইয়া, যিয়াদ ইবনে জুবাইর, কায়েস ইবনে আবু হাযিম। মাসরূক ইবনে আজদা, নাফি ইবনে জুবাইর ইবনে মুতঈম, আমির শাবী, উরওয়া ইবনে জুবাইর। আমর ইবনে ওয়াহাব সাকাফী কাবীসা ইবনে যুবাইর। উবাইদা ইবনে নাযলা, বকর ইবনে আব্দুল্লাহ, আসওয়াদ ইবনে হিলাল। তামীম ইবনে হানজালা, আলকামা ইবনে ওয়াইল, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান। আলী ইবনে রবীআ। হুযাইল ইবনে শুরাহবীল প্রমুখ।

ওফাত ঃ তাঁর ইনতিকালের সময়টি বিতর্কিত। যেমন আবু উবাইদা কাসিম ইবনে সাল্লাম বলেন, তিনি হিজরী ৫১ সনে মৃত্যু বরন করেন, (ইকমালঃ ৬১৬) মিশকাত)

الوُضُوءُ مَرَّةً مَرَّةً

٨٠. اخبرنا محمدُ بنُ المُثنّى قال حدّثنا يحيى عن سُفيانَ قال حدّثنا زيدُ بنُ اسلمَ عن عطاء بنِ يسارٍ عن ابنِ عبّاسٍ قال اَلا اُخبرُكُم بوُضوء رسولِ اللّٰه ﷺ فتوضّأ مرّةً مرّةً -

بابُ الوُضوء ثلثًا ثلثًا

٨١. اخبرنا سُوَيدُ بنُ نصرٍ قال اَخبرنا عبدُ اللّٰه بنُ المُبارك قال حدّثنا الاَوزاعيُّ قال حدّثني المُطّلبُ بنُ عبدِ اللّٰه بنِ حنطبٍ اَنَّ عبدَ اللّٰه بنَ عُمرَ توضّأ ثلثًا ثلثًا يُسنِدُ ذٰلك الى النبيِّ ﷺ -

---

উযূর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করা

অনুবাদ ঃ ৮০. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র)......ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদেরকে রাসূল (স)-এর উযূর সংবাদ দেব কি? পরে তিনি (প্রত্যেক অঙ্গ) এক একবার ধৌত করে উযূ করলেন।

উযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা

৮১. সুয়াইদ ইবনে নাসর (র)..........মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তিন তিনবার ধৌত করে উযূ করেছেন এবং বলেছেন নবী (স) এরূপ উযূ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় হুজুর (স) উযূর অঙ্গগুলোকে এক একবার ধৌত করেছেন। এটা ফরযের পর্যায়ভুক্ত। কাজেই অঙ্গগুলোকে একেকবার ধৌত করার দ্বারাই উযূ পূর্ণ হয়ে যায়, তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো উযূর অঙ্গগুলোকে পূর্ণরূপে ধৌত করতে হবে। তাহলে এ ধরনের উযূ দ্বারা নিঃসন্দেহে নামায আদায় করা সহীহ হবে। দুই দুইবার ধৌত করার বিষয়টিও হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। এটা সুন্নতের পর্যায়ভুক্ত। এর দ্বারা মূল সুন্নত আদায় হয়ে যায়। কিন্তু তিন বার ধৌত করার দ্বারা সুন্নত পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় হয়। তিনবার ধৌত করা ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ সুন্নত আদায় হয় না।

দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ মহানবী (স) হতে এটা প্রমাণিত আছে যে, তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে উযূ করেছেন, কখনো কখনো অঙ্গগুলো একবার, কখনো কখনো দু'বার, আবার কখনো তিনবার ধৌত করেছেন। এ সবই উম্মতের সহজতার জন্য করেছেন। যাতে উম্মত কষ্টকর অবস্থার মধ্যে পড়ে না যায়। তবে তিনি সাধারণত মাথা মাসেহ একবার এবং হাত, পা ও মুখমণ্ডল তিনবার করেই ধৌত করতেন। উযূর অঙ্গসমূহ একবার ধৌত করা ফরয। আর তিনবার ধৌত করা সুন্নত। রাসূল (স) যখন একবার ধৌত করেছেন তখন তিনি ফরযের উপর আমল করে উম্মতকে দেখিয়েছেন। আর দুইবার করে ধুয়ে জায়েযের উপর আমল করেছেন। আর যখন তিনবার ধৌত করেছেন, তখন সুন্নত পদ্ধতি শিক্ষা দান করার লক্ষ্যে করেছেন। তাই সাব্যস্ত হলো যে, উযূর অঙ্গসমূহ একবার ধৌত করা ফরয। দু'বার ধৌত করা জায়েয। আর তিনবার ধৌত করা সুন্নত। বিনা প্রয়োজনে তিন বারের বেশী ধৌত করা মাকরূহ। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, রাসূল (স) তো কথার মাধ্যমেও উযূর নিয়ম কানুন শিখাতে পারতেন, তাহলে কর্মের মাধ্যমে কেন শিক্ষা দিলেন?

উত্তর ঃ কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে এটার প্রভাব লোকদের উপর বেশী পড়ে এবং আন্তরিক প্রশান্তিও লাভ হয়, কিন্তু কথার দ্বারা শিক্ষা দিলে এমনটা হয় না। কাজেই সাহাবায়ে কিরাম যখনই রাসূল (স) এর নিকট উযূ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করতেন তখন রাসূল (স) উযূ করে তাদেরকে দেখিয়ে দিতেন।

صِفَةُ الْوُضُوْءِ : غَسْلُ الْكَفَّيْنِ

٨٢. اخبرنا محمدُ بْنُ ابراهيمَ البصريُّ عن بِشْرِ بنِ المُفضّلِ عن ابنِ عَوْنٍ عن عامرٍ الشّعبيّ عن عُروةَ بْنِ المُغيرةِ عنِ المغيرة وعَن محمدِ بْنِ سيرينَ عَن رجلٍ حتّى رَدَّه الى المُغيرة قال ابنُ عونٍ ولا احفظُ حديثَ ذَا مِن حَديثِ ذَا انَّ المغيرةَ قال كُنّا معَ النبىّ ﷺ فى سفرٍ فقرَعَ ظهرِىْ بعَصا كانتْ مَعَهُ فعَدَلَ وعدلتُ مَعَهُ حتّى اتى كذا وكذا مِن الارضِ فاناخَ ثمّ انطلقَ قال فذهَبَ حتّى توارى عَنّى ثم جاءَ فقال امَعَك ماءٌ ومَعِى سطيحةٌ لِى فاتيتُه بها فافرغتُ عليه فغسَلَ يَدَيْهِ ووَجْهَه وذَهَبَ ليَغْسِلَ ذِراعَيْهِ وعليه جُبّةٌ شاميةٌ ضيِّقةُ الْكُمَّيْنِ فاخرَجَ يدَهُ مِن تحتِ الجُبّةِ فغَسَلَ وجهَه وذِراعَيْه وذكَر مِن ناصيتِه شيئًا وعِمامتِه شيئًا قال ابنُ عونٍ لا احفظُ كما اُريد ثم مَسَحَ على خُفَّيْهِ ثم قال حاجتَك قلتُ يا رسولَ اللّه لَيْسَتْ لِى حاجةٌ فجِئْنا وقد امَّ الناسَ عبدُ الرحمٰنِ بنُ عَوفٍ وقد صلّى بِهِم ركعةً مِن صلوةِ الصُّبحِ فذهبتُ لِاُوذِنَه فنهانى فصَلَّيْنا ما اَدْرَكنا وقضَيْنا ما سَبَقَنا -

উযূর বর্ণনা ঃ উভয় কব্জি ধৌত করা

অনুবাদ ঃ ৮২. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম বসরী (র)......... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর সঙ্গে আমরা এক সফরে ছিলাম। তাঁর সঙ্গে একটি লাঠি ছিল। (পথের এক স্থানে) তিনি লাঠিটি দিয়ে আমার পিঠে ঠোকা দিলেন। পরে তিনি মাঝ পথ ছেড়ে পাশ দিয়ে চলতে লাগলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলাম। (কিছুক্ষণ চলার পর) এক স্থানে এসে উট থামালেন। এরপর তিনি আবার চলতে লাগলেন। রাবী বলেন, তিনি এতদূর গেলেন যে, আমার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। (কিছু সময় পর) ফিরে এসে বললেন, তোমার নিকট পানি আছে? আমার সাথে একটি পানির পাত্র ছিল। আমি তা নিয়ে তাঁর নিকট এলাম এবং পানি ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি তাঁর হাত মুখ ধোয়ার পর কব্জির উপরিভাগ ধৌত করতে চাইলেন। তখন তাঁর পরিধানে ছিল চিকন হাতার একটি শামী জুব্বা। তিনি জুব্বার ভেতর থেকে হাত বের করলেন এবং মুখমণ্ডলও হাত ধৌত করলেন। তিনি কপাল ও পাগড়ির কিছু অংশ মাসেহ করেছিলেন বলে রাবী উল্লেখ করেছেন।

হাদীসের একজন রাবী- ইবনে আওন (র) বলেন, আমার যেমন ইচ্ছা ছিল হাদীসটি তেমন স্মরণ রাখতে পারিনি। (এরপর রাবী বলেন) এরপর তিনি তাঁর মোজার উপর মাসেহ করেন এবং বললেন, তোমার প্রয়োজন সমাধা করো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কোন প্রয়োজন নেই। তারপর আমরা চলে এলাম। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) অগ্রগামী দলে ছিলেন। (এদিকে রাসূল (স)-এর বিলম্বের কারণে) আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) লোকদেরকে নিয়ে ফজরের নামায এক রাকআত আদায় করলেন। আমি আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-কে রাসূল (স)-এর আগমন সংবাদ দেয়ার ইচ্ছা করি কিন্তু তিনি (স) আমাকে নিষেধ করেন। অতএব আমরা যতটুকু পেলাম তা (জামাতে) আদায় করলাম এবং বাকীটুকু নিজেরা আদায় করে নিলাম।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : اكتب الحادثة التى تتعلق بهذا الحديث

প্রশ্ন ঃ উপরোক্ত হাদীস সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ আলোচ্য হাদীসে যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে ঃ আলোচ্য হাদীসে যে সফরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এর দ্বারা গাজওয়ায়ে তাবুক উদ্দেশ্য। যে যুদ্ধে স্বয়ং নবী করীম (স) উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাটি নবম হিজরীর রজব

মাসে সংঘটিত হয়, ত্রিশ হাজার সাহাবা তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন। উক্ত সফরে হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রা) রাসূল (স) এর খেদমতের সৌভাগ্য অর্জন করেন, যেটা রাবী নিজেই হাদীসে বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কেউ যদি কাউকে উযূ করায়ে দেয় তাহলে তা জায়েয আছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পিছনে অতিবাহিত হয়েছে। (শরহে উর্দূ নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১৫৭)

سوال : بَيِّنْ وَجْهَ اِخْتِصَارِ الْوُضُوْءِ

প্রশ্ন ঃ সংক্ষেপে উযূ করার কারণ কি লিখ।

উত্তর ঃ আলোচ্য হাদীসে উযূর সবগুলো বিষয় উল্লেখ না করার কারণ

আলোচ্য হাদীসের রাবী উভয় হাত ও মুখ ধৌত করার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুলি করা ও নাকে পানি দিয়ার কথা উল্লেখ করেননি এর কারণ নিম্নে বর্ণনা করা হল।

১. রাবী উযূর কার্যাবলীকে সংক্ষেপে বর্ণনা করে চেয়েছেন। তাই তিনি উযূর সবগুলো বিষয় উল্লেখ করেননি।

২. অথবা, রাসূল (স) উযূর সবগুলো বিষয় তো সম্পাদন করেছিলেন কিন্তু রাবী ভুলে যাওয়ার কারণে সবগুলো বলতে পারেননি।

৩. অথবা, নাক পরিষ্কার করা, কুলি করা ইত্যাদি তো মুখের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তিনি মুখের কথা বলে সবগুলোকে বুঝিয়েছেন। (শরহে উর্দু নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১৫৭)

سوال : مَا الْمُرَادُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ بَيِّنْ -

প্রশ্ন ঃ পাগড়ীর উপর মাসেহ করার দ্বারা উদ্দেশ্য কি লেখ?

উত্তর ঃ পাগড়ীর উপর মাসেহ করার দ্বারা উদ্দেশ্য

পাগড়ীর উপর মাসেহ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মাথার এক চতুর্থাংশ মাথা মাসেহ করার পর সুন্নত আদায়ের লক্ষ্যে পূর্ণ মাথার পাগড়ীর উপর মাসেহ করেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে انشاء الله।

سوال : اُكْتُبْ مَا اسْتُنْبِطَ الْمَسْئَلَةُ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

প্রশ্ন ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে কি মাসআলা ইস্তেম্বাত হয় লিখ।

উত্তর ঃ আলোচ্য হাদীস হতে ইস্তেম্বাতকৃত মাসআলা

আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝে আসে যে, উত্তম ব্যক্তির ইক্তিদা অনুত্তম ব্যক্তির পিছে জায়েয আছে। কারণ নবী (স) উত্তম হওয়া সত্ত্বেও হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফের পিছনে ইক্তিদা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ হুজুর (স) আবু বকর (রা) ও আব্দুর রহমান ইবনে আওফ উভয়কে তাদের স্ব স্ব স্থানে স্থির থাকার ইঙ্গিত করলেন, ফলে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তো তার স্থানে থাকলেন কিন্তু আবু বকর (রা) পিছনে সরে গেলেন, তাদের দু'জনের মধ্যে পার্থক্য কি? পিছনে সরে যাওয়ার রহস্য কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ১. হযরত আবু বকর (রা) রাসূলের (নির্দেশ বা ওয়াজিব এর জন্য নয় তার তুলনায়) আদবের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখাকে উত্তম মনে করেছেন তাই তিনি আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে পিছে সরে গেছেন। অপর দিকে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাসূলের নির্দেশ পালন করাকে উত্তম মনে করেছেন। কাজেই তিনি আপন স্থানে স্থির থাকাকে গ্রহণ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আবু বকর (রা) এর তরিকাটাই সর্বোত্তম।

২. যখন হুজুর (স) মসজিদে তাশরীফ আনতেন তখন হযরত আবু বকর (রা) সীমাহীন খুশী হতেন এবং আনন্দ অনুভব করতেন। আর এই খুশীর ফলশ্রুতিতে তিনি পিছনে সরে এসেছিলেন। তবে মোল্লা আলী কারী (র) প্রথম জবাবটাকে উত্তম সাব্যস্ত করেছেন।

আলোচ্য হাদীস সংক্রান্ত একটি জরুরী আলোচনা ঃ فَصَلَّيْنَا مَا اَدْرَكْنَا .... الخ এই হাদীস থেকে জানা যায় ইমাম মাসূম হওয়া শর্ত নয়। এ উক্তির দ্বারা فرقة امامية তথা যারা বারো ইমামে বিশ্বাসী তাদের মত খণ্ডিত হয়ে যায়। কেননা, তারা বলেন, ইমাম মাসূম হওয়া শর্ত। হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে قَضَيْنَا مَا سَبَقَنَا الخ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কারো যদি কোন রাকাত ছুটে যায় তাহলে তা আদায় করার জন্য ইমাম সালাম ফিরানোর পর দাঁড়াবে। ইমামের সালাম ফিরানোর আগে নয়। [বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

كَمْ تُغْسَلَانِ

٨٣. اخبرنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حبيبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سالِمٍ عن ابنِ أَوْسٍ عن جَدِّهِ قال رايتُ رسولَ اللّٰه ﷺ اِسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا -

কব্জি কতবার ধৌত করতে হবে?

অনুবাদ ঃ ৮৩. হুমায়দ ইবনে মাসআদাহ (র)........ইবনে আবূ আওস (র) তাঁর দাদার নিকট থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে (উযূর সময়) তিনবার করে পানি ঢালতে দেখেছি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ قوله اِسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا ঃ বায়হাকী শরীফে আছে হাদীসের রাবী শো'বা বলেন, আমি নো'মান ইবনে সালিমকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, اِسْتَوْكَفَ শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য কি? তিনি উত্তর দিলেন উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করতে হবে।

আল্লামা ইবনে তুরকুমানী বলেন যে, উক্ত কালাম থেকে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, اِسْتَوْكَفَ শব্দটি كَفٌّ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে অথচ বিষয়টি এমন নয় বরং اِسْتَوْكَفَ শব্দটি وكفَّ البَيْتُ থেকে নিষ্পন্ন যার অর্থ হলো ছাদ থেকে পানি ঝরা। কাজেই হাদীসের ব্যাখ্যা যা কতক উলামায়ে কিরাম করেছেন তা ঠিক আছে। استوكف অর্থ হলো استقطر الماء অর্থাৎ তিনবার ধোয়া এবং ভালো করে পানি ঢালা, যাতে ফোঁটাফোঁটা করে পানি পড়তে থাকে। এই ব্যাখ্যা মুতাবেক এই হাদীসটি শুধু মাত্র হাত ধৌত করার সাথে খাস নয়।

سوال : هل الوُضوء على مَن قامَ الي الصَّلوة لِكُلِّ صَلٰوة مَعَ بَقاءِ الوُضوء السَّابِقِ

প্রশ্ন ঃ পূর্বের উযূ থাকা সত্ত্বেও প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্যে নামাযী ব্যক্তির উযূ করা ফরয কি না?

উত্তর ঃ প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্যে উযূর বিধান ঃ নামাযী ব্যক্তির প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্যে নতুন করে উযূ করার হুকুম প্রসঙ্গে মনীষীগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. আমাদের সালফে সালেহীনের অভিমত ঃ সালফে সালেহীনের একদল বলেন, একবার উযূ করে যদি কোন ইবাদত করে থাকে তবে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্যে (নামাযের ইচ্ছুক ব্যক্তির) নতুন করে উযূ করা ফরয। পূর্বের উযূ থাকুক বা না থাকুক।

[পূর্বের বাকী অংশ] আবু দাউদ (র) বলেন, ثم سَلَّمَ عبدُ الرحمٰن فقامَ النبيُّ صلعم فِى صلوٰته অর্থাৎ অতঃপর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ সালাম ফিরালেন, হুজুর (স) আব্দুর রহমান ইবনে আউফের সাথে সালাম ফিরাননি বরং সালাম ফিরানো ব্যতীত ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং তা আদায় করেন। ইমাম শাফেয়ী (র) আলোচ্য হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলেন যে, সালামের পূর্বে ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার জন্য দাঁড়ানো জায়েয নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন সালামের পূর্বে দাঁড়ানো মাকরূহে তাহ্রীমী। কারণ হতে পারে ইমামের উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব ছিল। আর সাহু সজদা এক সালামের পরেই দেয়া হয়, এখন যদি কেউ সালামের আগেই দাঁড়িয়ে যায় তাহলে ইমাম সাহু সিজদা করলে ইমামের অনুসরণ করণার্থে তাকে পুনরায় বসতে হবে এবং সাহু সিজদা শেষ করে এক সালামের পর আবার দাঁড়াতে হবে। এ কারণে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, সালামের পূর্বে ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার জন্য দাঁড়ানো মাকরূহে তাহরিমী। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে যদি নিশ্চিত ধারণা হয় যে, যদি আমি না দাঁড়াই তাহলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে, যেমন ফজরের নামাযের সময় যদি ইমামের সালামের অপেক্ষা করা হয় তাহলে সূর্য উদিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ছুটে যাওয়া রাকাত আদায় করার জন্য ইমামের পূর্বেই দাঁড়ানো বৈধ।

তাঁদের দলীল ঃ তাঁদের দলীল হলো পবিত্র কুরআনের বাণী–

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ...الخ

যখন তোমরা নামায আদায়ের ইচ্ছা কর, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল হস্তদ্বয় কনুইসহ ধৌত কর।

আয়াতের সারমর্ম হলো অভ্যাসগত উযূ থাকলেও নামাযের জন্যে মনস্থ করলে তদুদ্দেশ্যে এ আয়াতে উযূর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২. **কতিপয় ফিকহবিদের অভিমত ঃ** কতিপয় ফকীহের মতে, উযূ থাকাবস্থায় প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্যে আবার নতুন করে উযূ করা মুস্তাহাব।

৩. **জুমহুরের অভিমত ঃ** জুমহুর আলেমগণের মতে, শুধুমাত্র বে উযূ ব্যক্তির জন্যে উযূ করা ফরয। আর উযূ থাকাবস্থায় নতুন করে উযূ করা ফরয নয়, বরং মাকরূহ।

জুমহুরের দলীল ঃ

١. قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لَا وُضُوْءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيْحٍ

এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বায়ু নির্গত বা হদস হলেই উযূ করতে হবে, হদস না হলে উযূ করতে হবে না।

٢. أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم صَلَّى صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ

ফাতহে মক্কার দিন রাসূল (স) এক উযূ দ্বারাই কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করেন।

٣. قوله صلى الله عليه وسلم لَوْلَا أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِوُضُوْءٍ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ ،

অর্থাৎ যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্ট মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক নামাযের সময় আমি তাদেরকে উযূ করার নির্দেশ দিতাম। এর দ্বারা বুঝা যায় প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ থাকা অবস্থায় উযূ করা যাবে না।

৪. **ইমাম নববী (র) এর অভিমত ঃ** ইমাম নববী (র) এর মতে, অপবিত্র না হলে উযূ থাকাবস্থায় আবার নতুন করে উযূ করা নামাযী ব্যক্তির জন্যে ফরয নয় তবে মাকরূহ হবে না।

সালফে সালেহীনের দলীলের উত্তর ঃ তাঁদের দলীলের জবাবে বলা যায়–

১. ١. إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ أَيْ إِذَا قُمْتُمْ مُحْدِثِيْنَ إِلَى الصَّلٰوةِ ... الخ

মোটকথা, আয়াতটি বে-উযূ ব্যক্তিদের জন্যে প্রযোজ্য।

২. ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্যে নতুন করে উযূ করা ফরয ছিল, পরে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়।

৩. রাসূল (স) নিজেও এক উযূ দ্বারা একাধিক নামায আদায় করেছেন বলে বর্ণিত আছে। বে-উযূ না হলে উযূ থাকাবস্থায় আবার নতুন করে উযূ করা নামাযের ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্যে ফরয নয় তবে এটা উত্তম।

اَلْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ

٨٤. اخبرنا سُوَيْدُ بْنُ نصرٍ اخبرنا عبدُ اللّٰه عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ اَبَانَ قَالَ رأيتُ عُثْمانَ بْنَ عفّانٍ توضّأ فأفرغ على يَدَيْهِ ثلثًا فغسلهما ثمّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ ثمّ غَسَلَ وَجْهَه ثلثًا ثم مَسَحَ بِرأسِه ثم غَسَلَ قدَمَه اليُمْنٰى ثلثًا الى المِرفَقِ ثلاثًا ثمّ اليُسْرٰى مثلَ ذلك ثمّ قال رايتُ رسولَ اللّٰه ﷺ توضّأ نحوَ وُضوئِى ثم قال مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِى هٰذا ثم صلّى ركعَتَيْنِ لايُحَدِّثُ نَفْسَه فيهما بشيئٍ غُفِرَلَه ماتقدّمَ مِنْ ذَنْبِه -

কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা

অনুবাদ ঃ ৮৪. সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (র)..........হুমরান ইবনে আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি তিনবার হাতে পানি ঢেলে হাত ধৌত করেন। এরপর গড়গড়া করে কুলি করেন এবং নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করেন। তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং কনুই পর্যন্ত তিনবার ডান হাত ধৌত করেন। অনুরূপভাবে বাম হাতও। এরপরে মাথা মাসেহ করেন এবং ডান পা তিনবার ধৌত করেন। অনুরূপভাবে বাম পাও। এভাবে উযূ শেষ করে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এরূপ উযূ করতে দেখেছি এবং বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করবে এবং তারপরে একাগ্রতার সাথে দু'রাকাত নামায আদায় করবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : مَا الحِكْمَةُ تَقَدُّمُ الْمَضْمَضَةِ والاِسْتِنْشَاقِ عَلٰى غَسْلِ الوَجْهِ

প্রশ্ন ঃ مضمضة ও استنشاق কে চেহারা ধৌত করার উপর মুকাদ্দাম করার হিকমত বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ مضمضه ও استنشاق কে মুকাদ্দাম করার হিকমত ঃ

মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম مضمضة ও استنشاق কে মুকাদ্দাম করার এ রহস্য বর্ণনা করেন যে–

যে ব্যক্তি পানি দ্বারা উযূ করবে, তার সে পানি সম্পর্কে জানা থাকা উচিত যে, তা কি পবিত্রতা অর্জন করার যোগ্য, নাকি যোগ্য নয়। এটা পানির গুণাগুণের ভিত্তিতে জানা যায়, আর পানির গুণাগুণ জানা যায় দেখার দ্বারা, মুখ দ্বারা জানা যায় তার স্বাদ এবং নাক দ্বারা জানা যায় তার ঘ্রাণ। অতঃপর পানির পবিত্রতা (গুণাগুণ) নির্ণয় করার জন্যে সব থেকে শক্তিশালী মাধ্যম মুখকে মুকাদ্দাম করা হয়েছে, (কারণ কুলি করার দ্বারা তার স্বাদ জানা যাবে যে, তা পবিত্র না কি অপবিত্র। অতঃপর ঘ্রাণ নির্ণয় করার জন্য নাক (استنشاق) কে আনা হয়েছে। অতঃপর পানির রং নির্ণয় করার জন্য প্রয়োজন চোখের। তাই তারপর চেহারা ধৌত করার বিধান রাখা হয়েছে। এ হিকমতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই মুসান্নিফ (র) غسل الوجه এর পূর্বে مضمضة ও استنشاق এর আলোচনা এনেছেন। কারণ এর দ্বারা প্রশান্ত মনে উভয় কাজ সম্পাদন করা যাবে।

سوال : ما معنى المَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ وَمَا الاختلافُ بَيْنَ الائمةِ فى حُكْمِها وكَيْفِيتِهِما؟ اَجِبْ مدلَّلًا.

প্রশ্ন ঃ مضمضة ও استنشاق এর অর্থ বর্ণনা কর এবং উভয়ের বিধানের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য কি? এবং এর ধরণ কি? দলীল ভিত্তিক জবাব দাও।

উত্তর ঃ مضمضة এর অর্থ হলো মুখে পানি দিয়ে নড়া চড়া দিয়ে তা ফেলে দেয়া তথা কুলি করা। আর استنشاق শব্দটি شوق মূলধাতু থেকে নির্গত। অর্থ হলো নাকে পানি প্রবেশ করানো।

উযূ ও গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার হুকুম

উযূ ও গোসলের মধ্যে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার হুকুমের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. ইমাম আহমদ (র) প্রমুখের অভিমত ঃ ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক, ইমাম আবু সাওর, ইমাম ইবনে মুনযির ও আবু উবায়দা (র) এর মতে, কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব। উযূ গোসল উভয় অবস্থায় নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু উভয় অবস্থায় কুলি করা সুন্নত।

২. ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র) এর অভিমত ঃ ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আওযায়ী, লাইস, হাসান বসরী (র) প্রমূখ উলামার মতে উযূ গোসল উভয় অবস্থায় কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া সুন্নত।

৩. ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত ঃ ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, উযূতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত। কিন্তু ফরয গোসলের সময় উভয়টিই ফরয।

ইমাম আহমদ এর দলীল ঃ ইমাম আহমদ (র) প্রমূখ তাদের মতের স্বপক্ষে আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন–

عَن ابى هُرَيرة عن النبىّ صلى الله عليه وسلّم قال اذا تَوَضَّأتَ فَاسْتَنْثِر وفى رواية فليَسْتَنْشِر

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা উযূ কর নাকে পানি দাও; অপর বর্ণনায় فليستنشر আমরের সীগা উল্লেখ রয়েছে। আর যখন নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব প্রমাণিত হলো, তাহলে কুলি করার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য হবে। কেননা, উভয়টার মধ্যে পার্থক্যের প্রবক্তা কেউ নন। কেননা, উভয়ে (ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ) নাকে মুখে পানি দেয়ার হুকুম এক হওয়ার ক্ষেত্রে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আর যখন উভয়টি উযূর সময় ওয়াজিব, আর তাহলো হদসে আসগার। সুতরাং হদসে আকবর অর্থাৎ গোসলের মধ্যেও উত্তমরূপে ওয়াজিব হবে।

٢. عن سلمةَ بنِ قيسٍ رض اَنّه عليه السلام قال اِنْ تَوَضَّأتَ فَاسْتَنْشِر .

٣. عن ابى هريرة رض انه عليه السلام قال اذا توضَّأ احدُكم فَلْيَجْعَلْ فِى اَنْفِه ماءً ثم يَسْتَنْشِر.

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ উযূ করে সে যেন তার নাকে পানি দেয় এবং নাক পরিষ্কার করে।

٤. عن ابى هريرة رض انه عليه السلام اَمَرَ بِالمَضْمَضَةِ والاِسْتِنْشَاقِ

নবী (স) কুলি করতে এবং নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সকল হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, কুলিকরা ও নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা উভয়টা ওয়াজিব।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) এর দলীল

١. عن عمّارِ بنِ ياسرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عنه اَنَّ رسولَ اللّٰه صلى الله عليه وسلّم قال اِنَّ مِنَ الفِطْرَةِ المَضْمَضَةُ والاِسْتِنْشَاقُ

অর্থাৎ আম্মার ইবনে ইয়াসির (র) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা পেশ করেন। তিনি বলেন, হুজুর (স) বলেছেন নাকে মুখে পানি দেয়া হলো ফিতরাত। আর ফিতরাতের একটি অর্থ হলো সুন্নত। কাজেই এ দুটি সুন্নত হবে।

٢. عن عائشة رض عَشْر مِن سُنَنِ الْمُرسَلِين وعَدَّ مِنها المضمضة والاستنشاق

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলগণের দশটি সুন্নত রয়েছে, কুলিকরা ও নাকে পানি প্রবেশ করানোও তার অন্তর্ভুক্ত। ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র) বলেন, উযূও গোসলের আয়াতে কুলি ও নাকে পানি দেয়ার কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং উভয়টি আয়াত দ্বারা ফরয বলে গণ্য হবে না এবং হাদীস দ্বারাও নয়। কেননা, তাতে কিতাবুল্লাহর উপর বৃদ্ধি করা লাযেম আসে। আর এটা বাতিল।

৩. এগুলো করা কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত নয়; বরং হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে; তাই সুন্নত হবে; ওয়াজিব নয়।

৩. উযূতে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার নির্দেশ রয়েছে। অভ্যান্তরীণ অঙ্গ ধৌত করার নির্দেশ নেই। আর কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া অভ্যান্তরীণ উযূর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই নাকে মুখে পানি দেয়া ওয়াজিব হতে পারে না।

হানাফী মাযহাবের দলীল

হানাফীদের প্রথম দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী–

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -

অত্র আয়াতে উযূ করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এটি উযূতে ওয়াজিব নয়। তবে গোসলের আয়াতে উভয়টি ওয়াজিব হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা, এ ব্যাপারে এরশাদ হয়েছে– فَاطَّهَّرُوا (তাশদিদসহ) এর দ্বারা পবিত্রতার ক্ষেত্রে মুবালাগা বুঝানো হয়েছে। আর এখানে মুবালাগা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কাইফিয়্যাত এর ক্ষেত্রে মুবালাগা করা। কামালিয়্যাত বা পূর্ণতার ক্ষেত্রে নয়, অর্থাৎ ধৌত করার পরিমাণ তিন এর বেশী করা উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ এটা নিষেধ। لِقَوْلِه عليه السلام فَمَنْ زَادَ عَلى هٰذا او نَقَصَ فَقَدْ ظَلَمَ রাসূল (স) ফরমায়েছেন, যে তিন এর কম বা বেশী করল সে জুলুম করল। আর مُبَالَغة فى الكَيْفِيت হচ্ছে জাহেরী অঙ্গ ধৌত করা। জাহেরী অঙ্গ হচ্ছে নাক ও মুখ। কাজেই উভয়টিতে পানি পৌঁছানো গোসলের মধ্যে ওয়াজিব গণ্য হবে।

٢. عن ابنِ سيرين مُرْسَلًا قال اَمَرَ رَسولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِالْاِسْتِنْشَاقِ مِن الجَنابةِ ثلاثًا .

দ্বিতীয় দলীল ঃ ইবনে সিরীন (র) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর (স) আমাদেরকে ফরয গোসলে তিনবার নাকে পানি দেওয়ার কথা বলেছেন।

٣. عن ابنِ عباسٍ رضى الله عنه انه سُئِلَ عن الجُنُبِ اِغْتَسَلَ ونَسِىَ المضمضةَ والاستنشاقَ فقال يُمَضْمِضُ ويَسْتَنْشِقُ ويُعِيْدُ الصلوةَ

তৃতীয় দলীল ঃ ইবনে আব্বাস (রা) এর বর্ণনা। তাকে এমন জুনুবী ব্যক্তির গোসল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যিনি জানাবাতের গোসলে কুলি করা এবং নাকে পানি পৌঁছানোর কথা ভুলে গিয়েছেন। তিনি উত্তর দিলেন, সে কুলি করবে এবং নাকে পানি পৌঁছায়ে নামাযকে পুনরায় আদায় করবে।

٤. عن عليٍّ قال تحتَ كُلِّ شَعْرةٍ جَنابةٌ فاغْسِلِ الشَّعْرَ واَنْقُوا البَشَرةَ .

চতুর্থ দলীল ঃ আলী (রা) বলেন, হুজুর (স) বলেছেন, প্রত্যেকের পশমের নিচে নাপাক থাকে। অতএব, তোমরা পশমকে ধৌত কর এবং চামড়া পরিষ্কার কর। আর নাকের ভিতরেও পশম আছে। সুতরাং নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব। যেমনিভাবে কুলি করাও ওয়াজিব। কেননা, উভয়টির মাঝে পার্থক্য করার কেউ প্রবক্তা নেই।

ইমাম আহমদ (র) এর দলীলের জবাব ঃ রাসূল (স) এর বাণী فَلْيَسْتَنْثِر শব্দ দ্বারা এখানে ওয়াজিব হবে না। কেননা "আমর" দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় ঐ সূত্রে, যেখানে ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। অথচ এখানে ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার প্রতিবন্ধকতা পাওয়া গেছে। কেননা, ওয়াজিব প্রমাণ করতে গেলে উক্ত হাদীসটি দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর زيادتى (অতিরঞ্জন) করা লাযেম আসে। আর এটা জায়েয নেই।

ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র) এর দলীলের জবাব

১. রাসূল (স) এর বাণী– الْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْفِطْرَةِ। এমনিভাবে তাদের পেশকৃত দলীল عشر من سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ এখানে ফিতরাত দ্বারা ঐ সুন্নত উদ্দেশ্য নয় যা ফরয ওয়াজিব এর মুকাবেলায় আসে বরং এখানে ফিতরাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তরিকায়ে মাসলুকা যা আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসৃত রীতি-নীতি। সুতরাং সুন্নাতের মধ্যে ফরয ওয়াজিবগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অথবা, আমরা বলব, উযূর মধ্যে মুখে ও নাকে পানি দেয়াকে গোসলের আয়াত থেকে বাদ দেয়া হয়েছে যা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র) বলে থাকেন আমরা (হানাফীরা) তা গ্রহণ করি না। আমরা উক্ত আয়াতের ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, উভয়টি গোসলের মধ্যে ফরয।

(শরহে আবু দাউদ পৃঃ ৪৬৬, শরহে মিশকাত ১/ ৩২০, শরহে নাসায়ী ১৬০-১৬১ পৃষ্ঠা)

ইমাম শাফেয়ী (র) দলীলের জবাব- ২.

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন উযূর মধ্যে যেহেতু কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া সুন্নত তাহলে গোসলের ক্ষেত্রেও সুন্নত হবে আমরা এটা মানি না। কারণ কুরআনের আয়াত দ্বারা উভয়টা ফরয হওয়ার দলীল পাওয়া যায়। অতএব ইমাম শাফেয়ী (র) এর গোসলকে উযূর উপর কিয়াস করা বাতিল। আর তা এভাবে যে, মানুষের শরীরের অঙ্গগুলো তিন ভাগে বিভক্ত।

১. কিছু অঙ্গ সকল দিক দিয়ে ভিতরের অংশ বলে বিবেচিত।

২. কিছু অঙ্গ সকল দিক দিয়ে বাহিরের অংশ হিসেবে বিবেচিত।

৩. আর কিছু অঙ্গ আছে এমন যা এক দিকে লক্ষ্য করলে ভিতরের অংশ হয়। আর এক দিকে লক্ষ্য করলে বাহিরের অংশ হয়।

প্রথম প্রকার গোসলের ভিতরেও ধৌত করা ফরয নয়। অনুরূপভাবে উযূর ভিতরেও ধৌত করা ফরয নয়।

দ্বিতীয় প্রকার, গোসলের ভিতরে ধৌত করা ফরয, আর উযূর ভিতরেও কিছু কিছু অঙ্গকে ধৌত করা ফরয, যেমন– হাত, চেহারা।

তৃতীয় প্রকার, সন্দেহযুক্ত অর্থাৎ এক দিক দিয়ে সেটা ভিতরের অংশ, আর এক দিক দিয়ে বাহিরের অংশ। যেমন– মুখ ও নাক। এ দু' অঙ্গ খোলার সময় বুঝা যায় যে, তা বাহিরের অংশ। আর বন্ধ করার সময় বুঝা যায় ভিতরের অংশ। অনুরূপভাবে এটা শরয়ী হুকুমের বিষয়েও বুঝে আসে। আর তা এভাবে যে, রোযাদার ব্যক্তি থু থু গিলে খাওয়ার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু বাহিরের কোন কিছু খাওয়ার দ্বারা তার রোযা ভেঙ্গে যায়। এ কারণে এ দু'অঙ্গ গোসলের সময় ধৌত করা ফরয, কিন্তু উযূর মধ্যে ধৌত করা ফরয নয়। আর তা একারণে যে, কুরআনে কারীমে। فاطهروا মুবালাগার সীগা আনা হয়েছে। অর্থাৎ পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন উদ্দেশ্য। তাই বাহিরের অঙ্গগুলোও এক দিক দিয়ে ধৌত করা ফরয। কিন্তু উযূর ভিতরে ধৌত করা ফরয নয়। কারণ উযূর ক্ষেত্রে মুবালাগা এর সীগা ব্যবহার করা হয়নি। তাই সুন্নত হবে। তবে এই ফরয অস্বীকারকারী কাফের হবে না। কারণ এর ভিতরে মুজতাহিদগণের মতানৈক্য রয়েছে। নাক পরিষ্কার করার হুকুমও এর মতই। (সিকায়া প্রথম১/৪৫৮, প্রশ্নোত্তরে শরহে বেকায়া পৃঃ ৪৬)

مضمضة ও استنشاق। এর কাইফিয়্যাত : مضمضة ও استنشاق। এর প্রথম দুই সুরত

১. وصل অর্থাৎ অঞ্জলির কিছু অংশ পানি দ্বারা কুলি করা এবং কিছু অংশ দ্বারা নাকে পানি দেয়া।

২. فصل তথা প্রথমে এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি করে ফারেগ হওয়ার পর আবার পানি নিয়ে নাকে পানি দেয়া।

مضمضة ও استنشاق। কায়ফিয়্যাত এর দিক দিয়ে চিন্তা করলে পাঁচ সুরত হতে পারে।

১. এক অঞ্জলি পানি দ্বারা وصل করা তথা কুলি ও নাকে একত্রে পানি দেয়া।

২. উভয়টি এক অঞ্জলি পানি দ্বারা فصل তথা পৃথক পৃথকভাবে করা।

৩. দুই অঞ্জলী পানি দ্বারা فصل নির্দিষ্ট, তথা দুই অঞ্জলি পানি দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে আমল করবে।

৪. তিন অঞ্জলী পানি দ্বারা وصل নির্দিষ্ট তথা তিন অঞ্জলি দ্বারা একত্রে করবে।

৫. ছয় অঞ্জলি পানি দ্বারা فصل করা তথা ছয় অঞ্জলি দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে আমল করবে। উক্ত সকল সুরতের কোনটি করা উত্তম এ বিষয়ে ইমামগণ মতানৈক্য করেন–

১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র) বলেন, তিন কোষ পানি দ্বারা মিলিতভাবে মুখে ও নাকে পানি দেবে।

২. ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র) এর মতে, ছয় কোষ দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে আমল করা উত্তম।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র) এর দলীল

عن عَبدِ اللّٰهِ بن زيدِ بْنِ عاصمٍ انّه سُئِلَ كَيْفَ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فدعا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فغَسَل يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثمّ مضمضَ وَاسْتَنْثَرَ ثلاثًا الى اٰخرِ الحديث وفى روايةٍ فمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كفٍّ واحدٍ ففعَل ذلك ثلاثا.

শাফী ও আহমদ (র) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আছেম এর বর্ণনা দ্বারা তাদের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেন। তিনি বলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে রাসূল (স) কিভাবে উযূ করেছেন? তখন তিনি পানি চাইলেন এবং হাতে দুইবার দুইবার উভয় হাত ধৌত করেছেন করে। অতঃপর কুলি করেছেন এবং নাকে পানি দিয়েছেন তিনবার। অন্য বর্ণনায় আছে এক অঞ্জলী দ্বারা তিনবার করে নাকে ও মুখে পানি দিয়েছেন।

আবু হানীফা (র) এর দলীল

عن طلحةَ عَنْ ابيْهِ عن جَدِّه قال دخلتُ يعني عَلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهُوَ يتوضَّأُ والماءُ يَسِيلُ مِن وَجْهِه ولِحْيَتِه عَلَى صَدرِه فرَايتُه يَفصِلُ بينَ المَضمضةِ والاستنشاقِ.

ইমাম আবু হানীফা (র) ও মালেক (র) তালহা (র) এর বর্ণনা দ্বারা (যা তিনি তার পিতার থেকে বর্ণনা করেছেন) দলীল পেশ করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম এমন সময়য় যখন তিনি উযূ করছিলেন। আর পানি তার দাঁড়ি ও মুখ মণ্ডল থেকে বুকের উপর গড়িয়ে পড়ছিল। আমি তাঁকে পৃথক পৃথকভাবে নাকে ও মুখে পানি পৌঁছাতে দেখলাম।

٢. عن ابى وائلٍ شقيقِ بْنِ سلمةَ قال شَهِدتُّ عليَّ بْنَ ابى طالبٍ وعثمانَ بْنِ عفّانٍ تَوَضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا وافْرَدَا المَضمضةَ مِنِ الاستنشاقِ ثم قَالَا هٰكذا رأيْنَا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ.

দ্বিতীয় দলীল শাকীক বিন ছালামা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি দেখলাম আলী ইবনে আবু তালেব ও উসমান ইবনে আফফান (র) উযূ করলেন। তিনবার তিনবার পৃথক পৃথকভবে নাকে ও মুখে পানি দিলেন। অতঃপর উভয়ে বললেন, রাসূল (স) কে আমরা এরূপ উযূ করতে দেখেছি। এই হাদীসটি স্পষ্টভাবে এ কথা বুঝায় যে, নবী (স) ছয় অঞ্জলি পানি দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে নাকে মুখে পানি দিয়েছেন।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র) এর দলীলের জবাব

আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ এর বর্ণনা দ্বারা انّه مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثلاثًا যে প্রমাণ পেশ করেছিলেন, উক্ত হাদীসের উহ্য ইবারতটি এমন হবে– مضمضَ ثلاثًا إِسْتَنْثَرَ ثلاثًا দুই ফে'লের মধ্যে একটি ফে'লের মামুলকে হজফ করা হয়েছে উক্ত মামুলকে নিয়ে উভয় فعل কে নিয়ে তানাজু করার কারণে। বাকী আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ এবং অন্য বর্ণনায় যে রয়েছে এক অঞ্জলী দ্বারা নাকে ও মুখে পানি দিয়েছেন। এখানে এক অঞ্জলির অর্থ এই নয় যে, এক অঞ্জলি পানি উঠিয়েছেন কুলি এবং নাকে দেয়ার জন্য বরং তিনি এক অঞ্জলি দ্বারা কুলি করেছেন ও নাকে দিয়েছেন চেহারার মত দুই অঞ্জলি দ্বারা নয়। কেননা, চেহারা ধৌত করা হয় দু অঞ্জলি দিয়ে, অথবা, আমরা উক্ত হাদীসকে জায়েযের উপর প্রযোজ্য করতে পারি। অতএব, হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উত্তম হলো উভয় অঙ্গ ছয় অ লি দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে ধৌত করা। এটি কিয়াস দ্বারাও বুঝা যায়। তা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নাক ও মুখ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গসমূহ ভিন্ন পানি দ্বারা তিন বার ধৌত করা সুন্নত। সুতরাং এটাকেও তার উপর কিয়াস করতে হবে।

سوال : هل الكبائر تغفر بالوضوء؟

প্রশ্ন ঃ উযূ দ্বারা কবীরা গুনাহসমূহ ক্ষমা হবে কি?

উত্তর ঃ উযূ দ্বারা কবীরা গোনাহ মাফ হওয়া প্রসঙ্গ ঃ উযূ দ্বারা কবীরা গোনাহ মাফ হয় কি-না এ ব্যাপারে **ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–**

১. জুমহুর ফুকাহা ও মুহাদ্দেসীনের অভিমত

জুমহুর ফোকাহা ও মুহাদ্দেসীনের মতে উযূ দ্বারা কেবলমাত্র সগীরা গোনাহসমূহ মাফ হয়; কবীরা গোনাহ নয়। **কবীরা গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবা শর্ত।**

জুমহুরের দলীল ঃ তাঁদের মতের স্বপক্ষে দলীল হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীস।

١. إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ الْإِثْمِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْكُمْ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

অর্থাৎ তোমাদেরকে যে সকল কবীরা গোনাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা তা থেকে বিরত থাক, তাহলে আমি তোমাদের গোনাহকে ক্ষমা করব। এখানে سيئات কে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে سيات দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সগীরা গোনাহ। কাজেই এর দ্বারা বুঝা গেলো উযূ দ্বারা সগীরা গোনাহ মাফ হয় কবীরা গোনাহ নয়। হ্যাঁ, সে যদি কবীরা গোণাহ থেকে তওবা করে এবং উযূ করার সময় তা মাফ হওয়ার নিয়ত করে তাহলে তার কবীরা গোণাহও মাফ হয়ে যাবে।

٢. قوله صلى الله عليه وسلم الصَّلَوٰتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُمْ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

অর্থাৎ যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআ থেকে অপর জুমআ এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান মধ্যবর্তী সময়ের যখন তার সমস্ত সগীরা গোনাহকে নির্মূলকারী কবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকে। এ হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় উযূর দ্বারা সগীরা গোনাহ মাফ হয়; কবীরা গোনাহ নয়। উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসে কবীরা গোনাহ পরিহার করার শর্তে অন্য গোনাহ মাফ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হবে না।

২. কতিপয় মনীষীর অভিমত ঃ অপর একদল মনীষী বলেন, উযূর মাধ্যমে সগীরা গোনাহ এর সাথে কবীরা গোনাহও মাফ হয়।

তাঁদের দলীল ঃ তাঁদের দলীল হলো রাসূল (স) এর বাণী–

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ.

রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন সন্ধান দিব না যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গোনাহকে মিটায়ে দেবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন? সাহাবারা বললেন, হ্যাঁ। নবী (স) বললেন, সকল খারাপ জিনিসের মোকাবেলায় পূর্ণাঙ্গরূপে উযূ করা। এর দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উযূ দ্বারা সগীরা গোনাহ ও কবীরা গোনাহ সব মাফ হয়ে যায়। এ জন্য তওবা করা শর্ত নয়।

سوال : هل يُشْتَرَطُ الدَّلْكُ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ؟

প্রশ্ন ঃ উযূ-গোসলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার সময় ঘষা মাজা শর্ত কি -না।

উত্তর ঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘষা-মাজা প্রসঙ্গ ঃ তাহারাতের উদ্দেশ্যে গোসলের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার সময় তা ঘষা-মাজা করা শর্ত কি না এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন –

১. জুমহুরের অভিমত ঃ জুমহুর আলেমগণের মতে, তাহারাতের উদ্দেশ্যে উযূ এবং গোসলের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার সময় উযূর উপর পানি প্রবাহিত করাই যথেষ্ট। এতে ঘষা-মাজা করা শর্ত নয়। ইমাম নববী (র) বলেন–

اِتَّفَقَ الْجُمْهُوْرُ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِيْ فِيْ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ جَرَيَانُ الْمَاءِ وَلَا يُشْتَرَطُ الدَّلْكُ.

২. ইমাম মালেক (র) ও অন্যান্যদের অভিমত ঃ ইমাম মালেক ও ইমাম মাযনী (র) এর মতে, তাহারাতের উদ্দেশ্যে উযূ এবং গোসলের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার সময় উক্ত অঙ্গ ঘষা-মাজা করা শর্ত। কেননা, তাহারাতের পূর্ণাঙ্গরূপ হলো– اِيْصَالُ الْمَاءِ اِلَى اُصُوْلِ الْاَشْعَارِ

অর্থাৎ পানি পশমের গোড়ায় পৌঁছিয়ে দেয়া। আর তা ঘষা ছাড়া সম্ভব নয়।

سوال : اذكر نُبْذَةً مِّنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رض

প্রশ্ন ঃ হযরত আলী (রা) এর জীবনী লিখ ঃ

উত্তর ঃ নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ তাঁর নাম আলী, উপনাম আবুল হাসান ও আবু তোরাব। উপাধি হচ্ছে আসাদুল্লাহ ও হায়দার, পিতার নাম আবু তালিব। তিনি ছিলেন রাসূল (স) এর চাচাত ভাই। তিনি ১১ বছর বয়সে ইসলাম কবুল করেন। বালকদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী, ২য় হিজরীতে নবী কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

হিজরত ঃ প্রিয় নবী (স) মদীনায় হিজরতের সময় আলী (রা) কে স্বীয় বিছানায় শায়িত রেখে যান, তাঁর কাছে গচ্ছিত আমানত মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য। রাসূল (স) এর হিজরতের তিন দিন পর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে তিনি মদীনায় হিজরত করে আসেন।

জিহাদ ঃ তাবুকের যুদ্ধে তিনি মদীনায় মহানবী (স) এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ যুদ্ধ ছাড়া তিনি রাসূল (স) এর সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। খায়বার অভিযানে তিনিই ইয়াহুদীদের দূর্গগুলো জয় করেন। তাছাড়া বদর, ওহুদ, আহযাব ইত্যাদি যুদ্ধে মহা বীরত্ব সহকারে জিহাদ করেন।

ফাযায়েল ঃ হযরত আলীর অন্যতম মর্যাদা হচ্ছে–

১. তিনি বালকদের মধ্যে সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

২. তিনি আশারায়ে মুবাশ্শারার অন্যতম সাহাবী।

৩. তিনি নবী (স) এর চাচাত ভাই, জামাতা ও চতুর্থ খলীফা।

৪. বীরত্বের জন্য মহানবী (স) তাকে আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধি দিয়েছিলেন।

৫. তার সম্বন্ধে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন।

ক. আমি জ্ঞানের শহর, আর আলী এর দরজা।

খ. তুমি আমার পক্ষ থেকে তেমন পর্যায়ের, যেমন হযরত হারুন আ. মূসা এর পক্ষে।

গ. আল্লাহ তাআলা আলীর প্রতি রহমত করুন। আল্লাহ! আলী যে দিকে যাবে তুমি হককে সেদিকে ঘুরিয়ে দাও।

ঘ. সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফয়সালাদাতা আলী (রা)।

ঙ. আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূল (স) তাকে ভালবাসেন, সেও আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলকে ভালবাসে।

চ. আমি বিশ্ব নেতা, আর আলী আরব নেতা।

খলীফারূপে দায়িত্ব পালন ঃ হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান এর খিলাফত আমলে তিনি মন্ত্রী ও উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা) এর শাহাদাতের পর ৩৫ হিজরীতে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল ৪ বছর ৯ মাস।

হাদীস বর্ণনা ঃ হযতর আলী (রা) সর্বমোট ৫৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২০টি। আবার এককভাবে বুখারী শরীফে ৯টি, আর মুসলিম শরীফে ১৫টি হাদীস রয়েছে।

ওফাত ঃ হযরত আলী (রা) ৪০হিজরীর ১৮ ই রমযান শুক্রবার প্রত্যুষে কুফা নগরীতে ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে জামাআতে যাওয়ার সময় আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম নামক এক খারেজী দুর্বৃত্ত কর্তৃক মারাত্মক আহত হন, এর তিনদিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁকে কুফার জামে মসজিদের পার্শ্বে, কারো মতে নাজফে আশরাফে দাফন করা হয়। (ইকমাল ৬০২, ইসাবা ২/৫০৭-৫০৮, উসদুল গাবাহ ৪/৮৭-৮৮ ইত্যাদি।)

হাদীস প্রসঙ্গে তাত্ত্বিক আলোচনা

ইমাম আহমদ (র) এর বক্তব্য ঃ ইমাম আহমদ বলেন, উযূ গোসলে নাকে মুখে পানি দেওয়া ওয়াজিব। এর দলীল হলো হুজুর (স)-এর ফে'লী রেওয়ায়াতগুলো। দ্বিতীয়তঃ রাসূল (স) এর উপর مواظبت করেছেন। নবী (স) এর সর্বদা গুরুত্ব ও পাবন্দীর সাথে উক্ত কাজ সম্পাদন করাই নাকে-মুখে পানি দেয়া ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ। এ ব্যাপারে সামনে রাসূল (স) এর قولى হাদীস যা আসছে লাকিত ইবনে সাবুরা (র) থেকে বর্ণিত।

আল্লামা খাত্তাবী (র) এর বক্তব্য ঃ আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন, উযূর আয়াতে নাকে মুখে পানি দেয়ার কথা নেই, আর আয়েশা (রা) এর যে হাদীস আছে عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ مِنْهَا الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ এখানে ফিতরাত দ্বারা অধিকাংশ উলামাদের নিকট সুন্নত উদ্দেশ্য। কাজেই নাকে মুখে পানি দেওয়া সুন্নত হবে ওয়াজিব নয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) এর বক্তব্য ঃ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, ইবনে মুনযির বর্ণনা করেছেন যে, নাকে মুখে পানি দেয়ার ব্যাপারে امر এর সীগা ব্যবহার করা সত্ত্বেও ইমাম শাফেয়ী (র) এটাকে সুন্নত বলেন। এর কারণ হলো সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণ যদি কেউ এটাকে ছেড়ে দিতেন তাহলে কেউ ইবনেরায় তা করাকে আবশ্যক মনে করতেন না। অবশ্য হযরত আতা (র) নাকে মুখে পানি না দিলে ইবনেরায় উযূ করাকে আবশ্যক মনে করতেন, কিন্তু পরবর্তীতে এমত থেকে তিনি রুজু করেন। এর দ্বারা উযূতে নাকে মুখে পানি দেয়া সুন্নত সাব্যস্ত হল।

ইমাম জাস্‌সাসের বক্তব্য ঃ সকল ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, চেহারার সীমা হলো কপালের উপরে চুল উদগত হওয়া স্থান থেকে শুরু করে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত।

আর وجه শব্দটি مواجهة থেকে গৃহীত। অর্থ হলো সম্মুখীনতা, মুখোমুখি অবস্থান। কাজেই কুরআনের আয়াতে যে وجه শব্দ আছে, ফুকাহায়ে কিরাম এর যে সীমা বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে নাকে-মুখে পানি দেয়ার কথা নেই। কারণ এ দুটি অভ্যন্তরীন অঙ্গ। আর উযূতে বাহ্যিক অঙ্গ ধৌত করা আবশ্যক, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ নয়। কারণ তা চেহারার সীমার মধ্যে দাখিল নয়।

দ্বিতীয়তঃ চোখে পানি দেয়াকে কেউ ওয়াজিব বলেন না তাহলে নাকে মুখে পানি দেয়া কিভাবে ওয়াজিব হবে? বরং রাসূল (স) এর উপর مواظبت কারণে সুন্নত বলা হবে।

মোটকথা, مضمضة ও استنشاق সম্পর্কে যত রেওয়ায়েত রয়েছে তা দ্বারা এদুটি ওয়াজিব মনে হয়। কিন্তু এতে অন্যান্য হাদীসের সাথে বৈপরীত্বপূর্ণ হয়ে যায়। অপরদিকে এদুটি ওয়াজিব ধরলে কুরআনের আয়াত মানসুখ করা অনিবার্য হয় অথচ তার মধ্যে এমন যোগ্যতা নেই যার দ্বারা কুরআনের আয়াতকে মানসূখ করা যায়। কাজেই এটা সুন্নত হবে; ওয়াজিব নয়।

আল্লামা আনোয়ার শাহ (র) এর বক্তব্য ঃ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন, উযূতে নাকে মুখে পানি দেয়া সুন্নত। কিন্তু জুনুবী ব্যক্তির গোসলের ক্ষেত্রে এগুলোতে পানি দেয়া ফরয। তবে এ ফরযটা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত ফরযের মত নয়। কারণ কুরআন দ্বারা প্রমাণিত ফরযগুলো قطعى আর খবরে ওয়াহেদ দ্বারা যে ফরয সাব্যস্ত হয় তা قطعى নয়।

قوله ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ الخ **এর ব্যাখ্যা ঃ** নবী (স) এখানে যে নামাযের কথা বলেছেন, সে নামায দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাহিয়্যাতুল উযূ। আর রাসূল (স) বলেছেন, সে দু'রাকাত নামাযকে এমনভাবে আদায় করবে যেন সে স্বীয় অন্তরের সাথে কথা না বলে এবং এদিক সেদিক না তাকায়, বিভিন্ন ধরণের চিন্তা না করে বরং খুশু খুযূ সহকারে নামায আদায় করে। আলোচ্য হাদীসে যে আমলের ফযীলত বর্ণনা করেছেন তার সম্পর্ক হলো নামাযী ব্যক্তির اختيارى عمل যা নামাযের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তা না করার সাথে। অর্থাৎ এর দ্বারা এমন কথা বা কাজ উদ্দেশ্য যা মানুষের ইচ্ছা বা ইখতিয়ারে হয়ে থাকে, غير اختيارى বিষয় উদ্দেশ্য নয়। মনে মনে কথা বলাটা যদি দুনিয়াবী বিষয়ে হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ। আর যদি আখেরাতের বিষয়ে হয় তাহলে নিষিদ্ধ নয় বরং উত্তম বটে। (শরহে উর্দু নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১৬১-১৬২)

بابٌ الْيَدَيْنِ يَتَمَضْمَضُ

٨٥. اخبرنا احمدُ بْنُ محمّدِ بْنِ الْمُغيرةِ قال حدّثنا عثمانُ هو ابنُ سعيدِ بْنِ كثيرِ بْنِ دينارٍ الحِمْصِيُّ عَنْ شعيبٍ هو ابنُ أبِى حمزةَ عنِ الزُّهريِّ اخبرَنِى عطاءُ بنُ يزيدَ عَنْ حُمْرانَ أنّهُ رَأى عثمانَ دَعا بِوَضوءٍ فأفْرَغَ على يديه مِن إنائه فغسلَهُما ثلاثَ مرّاتٍ ثم أدْخَلَ يَمينَه فِى الوَضُوءِ فتمضمضَ واستنشقَ ثم غسلَ وجهَه ثلاثًا ويديه الى المرفقَين ثلاثَ مرّاتٍ ثم مسحَ برأسه ثم غسلَ كلَّ رِجْلٍ مِن رِجْلَيْهِ ثلاثَ مرّاتٍ ثمّ قال رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضّأ وُضوئِي هٰذا ثمّ قال مَنْ توضّأ مثلَ وُضوئِي هٰذا ثم قامَ فصلّى ركعتَيْنِ لا يُحدِّثُ فِيهِما نفسَه بشيءٍ غُفِرَلَهُ ماتقدّمَ مِن ذَنْبِه -

কোন হাত দ্বারা কুলি করতে হবে

অনুবাদ ঃ ৮৫. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুগীরা .... হুমরান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উসমান (রা)-কে উযুর পানি চাইতে দেখলেন। (পানি আনা হল) তিনি পাত্র হতে হাতে পানি ঢালেন এবং হস্তদ্বয় তিনবার করে ধৌত করেন। পরে ডান হাত পাত্রে ঢুকান এবং কুলি করেন ও পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করেন। এরপরে মাথা মাসেহ করেন ও প্রত্যেক পা তিনবার করে ধৌত করেন ও বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছি যে, তিনি আমার উযুর ন্যায় উযু করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি আমার এ উযুর ন্যায় উযু করবে এবং একাগ্রতা সহকারে দু'রাকাআত সালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : اوضِحِ الحَديثَ المذكورةَ مُوضِحًا .

প্রশ্ন ঃ উল্লেখিত হাদীসের স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, কুলি করা ও নাকে পানি প্রবেশ করানোর সময় ডান হাত ব্যবহার করা সুন্নত। অর্থাৎ ডান হাতে পানি নিয়ে কুলি করা। অনুরূপভাবে নাকে পানি প্রবেশ করার সময়ও ডান হাত ব্যবহার করা সুন্নত। হাদীসের শব্দ ثم ادْخَلَ يمينَه فى الوَضُوءِ الخ এর উপরেই প্রমাণ বহন করে। বাম হাত দ্বারা অথবা উভয় হাত দ্বারা কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া সুন্নত পরিপন্থী, কিন্তু মুখ ধৌত করার সুন্নত তরিকা হলো ডান হাতের সাথে সাথে বাম হাতও ব্যবহার করবে, বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর রেওয়ায়াত–

ثم اخَذَ غُرفَةً مِّن ماءٍ فجعَلَ بها هٰكذا اشارَ الى يَدِ الأُخرى فغسَلَ بها وَجْهَه

এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, পানি ডান হাতে নিতে হবে, কিন্তু মুখ ধৌত করার সময় তার সাথে বাম হাতও ব্যবহার করবে। এবং উভয় হাত দ্বারা ঘষে ধৌত করবে। এটাই মূলত সুন্নত তরিকা।

আল্লামা আনোয়ার শাহ (র) এর বক্তব্য ঃ

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, উযূতে নাকে মুখে পানি দেয়া সুন্নত। কিন্তু জুনুবী ব্যক্তির গোসলের ক্ষেত্রে এগুলোতে পানি দেয়া ফরয, কিন্তু এ ফরযটা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত ফরজের মত নয়। কারণ কুরআন দ্বারা প্রমাণিত ফরযগুলো قطعى হয়, কিন্তু খবরে ওয়াহেদ দ্বারা যে ফরয সাব্যস্ত হয় তা قطعى নয়।

قوله ثم صلّى ركعتَين لا يُحدِّثُ الخ **এর ব্যাখ্যা ঃ** নবী (স) এখানে যে নামাযের কথা বলেছেন তা দ্বারা তাহিয়্যাতুল উযূ উদ্দেশ্য। তিনি (স) বলেন এ দু'রাকাত নামাযকে এমনভাবে আদায় করবে যেন সে স্বীয় অন্তরের সাথেও কথা না বলে এবং এদিক সেদিক না তাকায়। বরং পূর্ণ খুশু খযূ সহকারে নামায আদায় করে। আলোচ্য হাদীসে যে আমলের ফযীলত বর্ণনা করেছেন, এর সম্পর্ক হলো اختيارى عمل এর সাথে যা নামাযের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এর দ্বারা غيرا ختيارى বিষয় উদ্দেশ্য নয়। (শরহে উর্দূ নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১৬১-১৬২)

سوال : اكتب حَيَاةَ سَيِّدِنَا حضرة عثمانَ بْنِ عفان رضى الله عنه بالايجاز۔

প্রশ্ন ঃ সংক্ষেপে হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) এর জীবনী লিখ।

উত্তর ঃ হযরত উসমান ইবনে আফফান (র) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ নাম উসমান, পিতার নাম আফফান। বংশ পরিচিতি হলো– উসমান ইবনে আফফান ইবনে আবুল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ কুরাশী উমারী।

আবদে মানাফে গিয়ে প্রিয় নবী (স) ও তাঁর বংশ একীভূত হয়ে যায়। তাঁর উপনাম আবু আবদুল্লাহ্, মায়ের নাম উম্মে আরওয়া বাইযা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব। তিনি ছিলেন প্রিয় নবী (স) এর ফুফু। হযরত উসমান গণী (রা) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা, প্রিয় নবী (স) এর দু' কন্যার জামাতা।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর দাওয়াতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি বলতেন, আমি হলাম চতুর্থ মুসলমান।

ইসলাম গ্রহণের পর প্রিয় নবী (স) আপন কন্যা হযরত রুকাইয়্যা (রা) কে তাঁর নিকট বিয়ে দেন। তারা দু'জন দুবার হাবশা অভিমুখে হিজরত করেন। অতঃপর মক্কায় ফিরে এসে পুনরায় মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় এসে হযরত উসমান (রা) হাস্সান ইবনে সাবিত (র) এর ভাই আউস ইবনে সাবিত (র) এর নিকট অবস্থান করেন। এ জন্য হযরত হাস্সানও তাঁকে ভালবাসতেন এবং তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর জন্য কান্নাকাটি করেন।

নবীজী (স) এর দ্বিতীয় কন্যার বিয়ে ঃ প্রিয় নবী (স) এর কন্যা রুকাইয়া (রা) এর ওফাত হলে নবী (স) তাঁর অপর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রা) কে তার নিকট বিয়ে দেন। তারও যখন ওফাত হয়ে যায়, তখন রাসূল (স) বলেন, যদি আমার তৃতীয় আর একটি কন্যা থাকতো তবে অবশ্যই আমি তাকে উসমানের নিকট বিয়ে দিতাম।

হযরত আলী (রা) এর একটি রেওয়ায়েতে আছে প্রিয় নবী (স) ইরশাদ করেছেন– যদি আমার নিকট চল্লিশ জন কন্যা থাকত, তবে আমি তাদের সবাইকে একের পর এক উসমানের নিকট বিয়ে দিতাম। হযরত উসমান (রা) এর ঘরে হযরত রুকাইয়া (রা) এর একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। কিন্তু ছয় বছর বয়সেই চতুর্থ হিজরীতে সে ওফাত লাভ করে।

বদরের মালে গণিমতে অংশীদারিত্ব ঃ বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে তাঁকে বারণ করেছিলেন প্রিয় নবী (স)। কারণ তখন হযরত রুকাইয়া (রা) ছিলেন মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তার সেবা শুশ্রূষার জন্য প্রিয় নবী (স) তার নিকট তাঁকে থাকতে বলেন। প্রিয় নবী (স) এর বিজয় সংবাদ পৌঁছার দিন হযরত রুকাইয়া (রা) এর ইন্তিকাল হয়। জান্নাতের সুসংবাদ লাভ ও নবী (স) বদরে অংশ গ্রহণকারীদের ন্যায় তাঁকে ও যুদ্ধের মালে গণিমতের অংশ দেন।

তিনি ছিলেন আশারায়ে মুবাশ্শারার একজন নবী করীম (স) তাঁকে দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) কে এক ব্যক্তি বলল, আমি আলী (রা) কে এমন ভালবাসি অন্য কিছুকে এরূপ ভালবাসি না। তিনি বললেন, ভাল করেছ একজন জান্নাতীকে ভালবেসেছ। লোকটি বলল, আমি উসমান এর প্রতি এমন বিদ্বেষ পোষণ করি যে, অন্য কিছুর প্রতি এমন বিদ্বেষ নেই। তখন তিনি বললেন, মন্দ কাজ করেছ। তুমি একজন জান্নাতীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছ। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন, রাসূল (স) এতদা হেরায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী তালহা ও যুবাইর (রা)। তিনি বললেন, হে হেরা! তুমি অটল থাক। তোমার উপর তো কেবল একজন নবী অথবা সিদ্দীক অথবা শহীদই রয়েছে।

শাহাদাত ঃ হযরত উসমান (রা) কে শুক্রবার দিন শহীদ করা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক মুনাফিক নেতার ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে মিসর, বসরা ও কুফাবাসী এবং মদীনার কিছু সংখ্যক লোক মিলে উসমান (রা) কে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং খেলাফত ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ দেয়। তিনি তাতে রাজি হননি। অতঃপর সে ষড়যন্ত্রকারীরা দেয়াল টপকিয়ে ঘরে ঢুকে নির্মমভাবে তাঁকে শহীদ করে দেয়।

খেলাফতকাল ঃ তাঁর খেলাফতকাল ছিল ১২ দিন কম ১২ বছর। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) হযরত উসমান (রা) কে বলেন, মজলুম অবস্থায় তোমাকে শহীদ করা হবে। তোমার রক্তের ফোটা পড়বে فسيكفيكهم الله আয়াতের উপর এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন শরীফের উপর থাকবে। *[বাকী পঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য]*

اِيْجَادُ الْاِسْتِنْشَاقِ

٨٦. اخبَرنا محمدُ بْنُ منصورٍ قال حدّثنا سفيانُ قال حدّثنا ابو الزناد ح وحدّثنا الحسينُ بْنُ عيسٰى عن مَعْنٍ عنْ مالكٍ عن ابِى الزنادِ عَن الاَعْرجِ عن ابى هريرةَ رضى الله عنه ان رسولَ اللّٰه ﷺ قال اذا توَضّأَ احَدُكُم فَلْيَجْعَلْ فِى اَنْفِه ماءً ثم ليَسْتَنْثِر -

الْمُبَالغَةُ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ

٨٧. اخبَرنا قتيبةُ بْنُ سعيدٍ قال حدّثنا يحيٰى بنُ سُلَيْمٍ عَن اِسْمٰعِيلَ بْنِ كثيرٍ ح واخبَرنا اسحٰقُ ابْنُ ابراهيمَ اخبَرنا وكيعٌ عَن سُفيانَ عن ابى هاشمٍ عن عاصمِ بْنِ لَقِيطِ ابْنِ صَبْرَةَ عَن أبيهِ قال قلتُ يا رسولَ الله اَخْبِرْنِى عَنِ الوُضوءِ قال اَسْبِغِ الْوُضوءَ وبَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تكونَ صَائِمًا -

নাক পরিষ্কার করা

অনুবাদ ঃ ৮৬. মুহাম্মদ ইবনে মানসূর ও হুসায়ন ইবনে ঈসা (র)........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উযু করবে তখন সে যেন তার নাকে পানি দেয় এবং নাক পরিষ্কার করে ফেলে।

নাকে ভালভাবে পানি দেয়া

৮৭. কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র) ....লাকীত ইবনে সাবুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে উযু সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, পূর্ণরূপে উযু করবে, আর তুমি যদি রোযাদার না হও তাহলে উত্তমরূপে নাকে পানি পৌঁছাবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে বলা হয়েছে যে, ইমাম আহমদ (র) এবং ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ مضمضة ও استنشاق এর ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা। পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে, তাদের দলীল সামনে আসবে। আর এটাই তাদের দলীল। এ হাদীসে فَلْيَجْعَلْ فِى اَنْفِه مَاءً বলা হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব। কেননা, এখানে امر এর সীগা ব্যবহার করা হয়েছে। যা ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। কাজেই এর দ্বারা ইমাম আহমদ প্রমূখের মাযহাব সাব্যস্ত হয়। সুতরাং আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, উযূতে নাকে মুখে পানি দেয়া ওয়াজিব। এ হাদীসের উত্তর সামনে আসবে। ان شاء الله *[বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]*

[পূর্বের বাকী অংশ] **দাফন ঃ** তাঁকে রাত্রে দাফন করা হয়। জানাযা নামায পড়ান হযরত জুবায়ের ইবনে মুতঈম (র), মতান্তরে হাকীম ইবন হিযাম বা মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (র)। কারও কারও মতে কেউ তার জানাযার নামায পড়াননি। ষড়যন্ত্রকারীরা এতেও বাধা দেয়। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। দাফনকালে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর তাঁর দুই স্ত্রী উম্মুল বানীন ও নায়েলা (র) উপস্থিত ছিলেন। তাকে কবরে রাখার পর কন্যা আয়েশা চিৎকার করে কাঁদতে লাগলে ইবনে যুবাইর বললেন, চুপ থাক, না হয় তোমাকে হত্যা করে ফেলব। দাফনের পর বললেন, এবার যা ইচ্ছা চিৎকার কর, কান্নাকাটি কর। ৮২ অথবা ৮৬ অথবা ৯০ বছর বয়সে তাঁর শাহাদাত হয়। (উসদুল গাবাহ ৫৭৮–৫৮৭, ইকমাল ৬০২ বিদায়া নিহায়া)

الامرُ بالاِسْتِنْثار

٨٨. اخبرنا قُتَيْبَةُ عَن مالِكٍ ح وحدّثنا اسحٰقُ بْنُ منصورٍ قال حدّثنا عبدُ الرحمٰنِ عَن مالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَن اَبى ادريسَ الخَولانىِّ عن ابى هريرةَ اَنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ مَن تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ومَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ -

٨٩. اخبرنا قُتَيْبَةُ قال حدّثنا حمّادُ عَن منصورٍ عن هِلالِ بْنِ يسافٍ عَن سلمةَ بْنِ قَيْسٍ اَنّ رَسولَ الله ﷺ قال اِذا تَوَضَّأتَ فَاسْتَنْثِرْ واِذا اسْتَجْمَرْتَ فَاَوْتِرْ -

---

নাক ঝাড়ার নির্দেশ

অনুবাদ ঃ ৮৮. কুতায়বা ও ইসহাক ইবনে মনসুর (র)......... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি উযু করবে সে যেন নাক ঝাড়ে এবং যে ব্যক্তি ঢেলা ব্যবহার করবে সে যেন বে-জোড় ব্যবহার করে।

৮৯. কুতায়বা (র).........সালামা ইবনে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যখন উযু কর তখন নাক ঝেড়ে নাও। যখন কুলুখ ব্যবহার কর, তখন বেজোড় ব্যবহার কর।

সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ اِسْتِنْثار শব্দটি باب استفعال এর মাসদার, نثر মূলধাতু থেকে নির্গত। অর্থ হলো নাক ঝাড়া, নাক পরিষ্কার করা, নাকে পানি প্রবেশ করায়ে নাক ঝাড়া। আর استنثار শব্দটি আলোচ্য হাদীসে امر এর সীগারূপে ব্যবহার করায় ইমাম আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ اِسْتِنشاق এর ন্যায় استنثار কেও ওয়াজিব বলেন এবং এ সকল বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

[পূর্বের বাকী অংশ]

দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ হযরত লাকীত ইবনে সাবুরা (রা) নবী (স) কে উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হুজুর (স) তাঁর প্রশ্নের জবাবে বললেন, اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ উযূকে পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পন্ন কর। পূর্ণাঙ্গ উযূ ঐ উযূকে বলা হয় যার মধ্যে উযূর সুন্নত ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখা হয়। যদি এগুলোর প্রতি পূর্ণ খেয়াল না করা হয় তাহলে সে উযূ অসম্পূর্ণ হবে। এর পর রাবী বলেন, নাকের মধ্যে উত্তমরূপে পানি প্রবেশ করাবে। নাকে পানি প্রবেশ করানোর সীমা হল, পানি নাকের নরম অংশ পর্যন্ত পৌঁছাবে। পানিকে নাকের মধ্যে উত্তমরূপে প্রবেশ করাবে যদি রোযাদার না হয় তাহলে এর প্রতি ইহতেমাম করবে। কিন্তু যদি রোযাদার হয় তাহলে এ থেকে বিরত থাকবে। কেননা, এর দ্বারা রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। কাজেই শরীয়ত প্রবর্তক উক্ত হুকুমকে পূর্বের হুকুম থেকে পৃথক করে দিয়েছে। দুয়ালাবী যিনি সাওরীর হাদীসকে সংকলন করেছেন। তার নিকট লাকীত ইবনে সাবুরার হাদীসটি এই শব্দে বর্ণিত আছে- بَالِغْ فِى الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشاقِ اِلَّا اَنْ تَكونَ صَائِمًا

ইবনে কাত্তান (র) বলেন, هذا سند صحيح এই হাদীসটাও ইমাম আহমদ প্রমুখের দলীল। এখানে امر এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে যার দ্বারা مضمضة ও استنشاق ওয়াজিব প্রমাণিত হয়।

بَابُ الامرِبالْاِسْتِنْثَارِ عِنْدَ الِاسْتِيْقَاظِ مِنَ النَّوم

٩٠. اخبرنا محمدُ بْنُ زُنبورٍ المكيُّ قال حدّثنا ابنُ ابى حازمٍ عن يزيدَ بنِ عبدِ الله انّ محمدَ ابْنَ ابراهيمَ حدَّثَهُ عن عِيسٰى بْنِ طلحَةَ عَن ابى هُريرة عَنْ رَسولِ اللّٰه ﷺ قالَ اذا اسْتَيْقَظَ احدُكم مِن مَّنامِهِ فتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثلاثَ مرّاتٍ فإنّ الشَّيْطانَ يَبِيتُ عَلٰى خَيْشُومِهِ -

অনুচ্ছেদ ঃ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর নাক ঝেড়ে ফেলার নির্দেশ

৯০. মুহাম্মদ ইবনে যুমবূর মাক্কী (র)..........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে উযু করে সে যেন তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়। কেননা, শয়তান নাকের (মস্তক সংলগ্ন) ছিদ্রের উপরিভাগে রাত্রি যাপন করে।

সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهِ ঃ এর তাৎপর্য

শয়তান মানুষের নাকের বাঁশিতে রাত যাপন করে এর অর্থ এই যে,– মানুষ যখন ঘুমন্ত থাকে তখন শয়তান তাকে কু-মন্ত্রনা দেয়ার সুযোগ পায় না। ফলে নাকের বাঁশিতে আশ্রয় নিয়ে নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দেখায় যার প্রভাব সে জাগ্রত হওয়ার পরও অনুভব করে। সুতরাং কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পানি দ্বারা যখন নাক পরিষ্কার করে নেয় তখন শয়তান দূর হয়ে যায় এবং তার প্রভাব কেটে যায়। এই জন্য রাসূলুল্লাহ (স) ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর উযূ করা ও নাকে পানি দেয়ার আদেশ দিয়েছেন।

কাজি আয়ায (র) বলেন, নাকের ভিতরে মস্তিষ্ক সংলগ্ন স্থানকে خيشوم বলে, এখানে মানুষের খেয়াল ও অনুভূতি জাগ্রত হয়, মানুষ ঘুমালে এখানে আঠা জাতীয় বস্তু জমা হয়ে তা শুকিয়ে অনুভূতি শক্তি তিরোহিত করে এবং চিন্তা চেতনার মধ্যে গরমিল করে। ফলে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখে। এমনকি ঘুম হতে জাগার পরও সে অবস্থা বিরাজমান থাকে, ফলে অলসতা ও দুর্বলতা তাকে ঘিরে ফেলে, নামায আদায় করতেও মন চায় না। এতে শয়তান খুবই আনন্দিত হয়। তখন নাক পানি দ্বারা ভালো করে ধৌত করে ফেললে তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (স) ঘুম হতে জাগার পর নাকের বাঁশি ধৌত করতে বলেছেন।

আল্লামা তুরপুশতী (র) বলেন, উপরে যা বলা হয়েছে সবই ধারণা প্রসূত। সঠিক বক্তব্য হলো রাসূলুল্লাহ (স) এর এ জাতীয় দুর্বোধ্য কথার তত্ত্ব ও তাৎপর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা না করে মহানবী (স) যা বলেছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই উত্তম। কেননা, এ সমস্ত কথার মর্ম একমাত্র মহানীব (স)-ই জানেন। অন্য কেউ নয়।

(শরহে মিশকাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩১০)

আল্লামা তীবী (র) বলেন, যখন মানুষ ঘুমায়ে যায় তখন ধুলা, বালু, ময়লা ইত্যাদি নাকের উপরাংশে জমা হয়, যা মস্তিষ্কের সংলগ্ন স্থান। আর যেহেতু শয়তান এমন ময়লাযুক্ত স্থানে বসবাস করে। এ কারণে উক্ত স্থানকে তারা রাত্র যাপনের স্থান নির্ধারণ করে এবং বসে বসে যেহেনে অনেক কুধারণা ঢালতে থাকে। তাই রাসূল (স) امر এর সীগা দ্বারা সম্বোধন করেছেন যে, যখন তোমরা ঘুম থেকে জাগ্রত হও এবং উযূ করতে আরম্ভ কর তখন তিনবার নাক ঝাড়। যাতে করে শয়তানের আছর দূর হয়ে যায়। এ গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইমাম আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াই উযূতে استنثار কে ওয়াজিব বলেন। কারণ রাসূল (স) এটাকে امر এর সীগা দ্বারা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জুমহুর উলামায়ে কিরাম ও আবু হানীফা (র) مضمضة – استنشاق ও استنثار কে উযূতে সুন্নত বলেন, এর [illegible] পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) এর দলীলের জবাব

১. হানাবেলাগণ তো রাসূল (স) এর কর্ম তথা فعلی روایت দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, রাসূল (স) مُواظَبَتْ তথা গুরুত্বসহকারে নিরবচ্ছিন্নভাবে তা সম্পাদন করেছেন। জুমহুর উলামা বলেন, হুজুর (স) উক্ত কর্মের উপর مواظبت করা সুন্নতের প্রমাণ হতে পারে। ফরযের দলীল হতে পারে না। কারণ রাসূল (স) এর এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো রাসূল (স) সব সময় করেছেন কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে তা মুস্তাহাব। যেমন تَيَامُنْ তথা ডান হাত দ্বারা কর্ম সম্পাদন করা ইত্যাদি।

২. জুমহুর উলামা তাদের পেশকৃত রাসূলের قولی হাদীসের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, তারা যে বলেছেন امر এর সীগা ওয়াজিব হওয়ার উপর দালালত করে, তাদের এ বক্তব্য যথার্থ নয়। কেননা প্রত্যেক امر এর সীগা ওয়াজিব এর উপর দালালত করে না। বরং কখনো মুস্তাহাবের জন্যও ব্যবহৃত হয়। এর ব্যবহারও ব্যাপাক। যেমন–

১. যখন হযরত আবু বকর (রা) লোকদেরকে নিয়ে ইমামতি করছিলেন। অতঃপর হুজুর (স) শারীরিক কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলেন। ফলে নামায আদায় করার জন্য তাশরীফ আনেন। যখন আবু বকর (রা) রাসূল (স) কে দেখলেন তখন পিছনে সরে আসার ইচ্ছা করলেন, তখন নবী (স) ইরশাদ করলেন দাঁড়ায়ে থাকো, অন্য রেওয়ায়েতে আছে তিনি পিছে সরে আসেন এবং নবী (স) নামায সমাপন করেন। নামায শেষে নবী করীম (স) আবু বকর (রা) কে বললেন مَا مَنَعَكَ اَنْ تَثْبُتَ কোন বস্তু তোমাকে স্থির থাকতে মানা করল? তখন আবু বকর (রা) জবাব দিলেন–

مَا كَانَ لِابْنِ اَبِى قُحَافَةَ اَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم،

মোটকথা, নবী (স) তো নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, অপর দিকে তাকে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন যখন আমি তোমাকে নির্দেশ প্রদান করলাম, তাহলে তুমি কেন পিছনে সরে গেলে? বুঝা গেল হযরত আবু বকর (রা) বুঝে ছিলেন এ নির্দেশটা ওয়াজিব মূলক নয়।

২. দ্বিতীয় উপমা হলো হযরত উমর (রা) সম্পর্কে যখন হুজুর (স) অন্তিমকালে কাগজ চাইলেন, তখন হযরত উমর রা. বললেন, حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ এবং রাসূলের পবিত্র খেদমতে কাগজ পেশ করেননি। এখানে যদিও امر এর সীগা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু হযরত ওমর রা. বুঝেছিলেন এই নির্দেশটা ওয়াজিব এর জন্য নয়। কেননা, যখন হুজুর (স) কিছু লেখার জন্য কাগজ প্রার্থনা করলেন, অতঃপর যখন হযরত উমর (রা) তা আনলেন না, তখন এটা লেখা যদি একান্ত জরুরীই হতো, তাহলে অন্য সাহাবা দ্বারা আনাতেন অথবা, হুজুর (স) নিজেই আরেকবার বলতেন এবং উমর (রা) কে বাধা দিতে পারতেন।

৩. হযরত আলী (রা) হুদায়বিয়ার সন্ধি কালে যখন কুরাইশ সম্প্রদায় বলল, আমরা যদি আপনাকে রাসূলই মেনে নেই তাহলে আমাদের ও আপনাদের মধ্যে তো কোন গণ্ডগোলই থাকতো না। কাজেই আপনি محمد بن عبد الله লেখেন, তখন হুজুর (স) হযরত আলী (রা) কে নির্দেশ প্রদান করলেন اسم। অর্থাৎ رسول الله শব্দটি কেটে দাও এখানে চিন্তা করার বিষয় যদি এখানে امر টা ওয়াজিব এর জন্য হতো, তাহলে আলী (রা) রাসূলের আদেশ কিভাবে লঙ্ঘন করলেন? এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক امر ওয়াজিব এর জন্য হওয়া জরুরী ন', এ কারণেই রাসূল (স) কারো প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন না।

দ্বিতীয়তঃ মুজতাহিদীনদের জন্য কোন বাহ্যিক বিষয়ের উপর এমন কঠোর না হওয়া চাই যে, যেখানেই امر এর সীগা পাওয়া যাবে সেখানেই তা ওয়াজিব এর জন্য বলা হবে। এখন লক্ষ্য করতে হবে مضمضة، استنشاق – استنثار কোন হুকুমের আওতাভুক্ত, ওয়াজিব না সুন্নত? জুমহুর উলামায়ে কিরাম উল্লেখিত ঘটনাকে সামনে রেখে বলেন, مضمضة ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে امر এর সীগা ব্যবহার করা হয়েছে এর দ্বারা মুস্তাহাব উদ্দেশ্য, ওয়াজিব নয়। কাজেই এখন আর কোন প্রশ্ন থাকে না। (শরহে উর্দু নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১৬৫-১৬৬-১৬৭)

بَابٌ الْيَدَيْنِ يَسْتَنْثِرُ

٩١. اَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى فَفَعَلَ هٰذَا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ هٰذَا طُهُوْرُ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ

কোন হাতে নাক ঝাড়তে হবে?

অনুবাদ ঃ ৯১. মূসা ইবনে আবদুর রহমান (র).........আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পানি আনতে বলেন, পরে তিনি কুল্লি করেন এবং নাকে পানি দেন। বাম হাতে নাক ঝাড়েন। তিনবার এরূপ করেন। পরে বলেন, এরূপই হচ্ছে নবী (স)-এর উযূ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

রাবীর পরিচয় ঃ হাদীসের রাবী আব্দে খায়ের ইবনে ইয়াযিদ। কুনিয়াত হলো আবু আম্মারা। তিনি রাসূল (স) এর রিসালাতের যুগ তো পেয়েছেন কিন্তু নবী (স) এর সাথে তার সাক্ষাৎ প্রমাণিত নেই। তিনি হযরত আলী (রা) এর খাস শাগরেদ ছিলেন। নির্ভরযোগ্য ও সিকা রাবী ছিলেন। কুফায় অবস্থান করতেন। তিনি হযরত আলী (রা) উযূর বিবরণ দিতে هذا শব্দ দ্বারা পূর্ণ উযূর দিকে ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু রাবীর মূখ্য উদ্দেশ্য হলো নাকে পানি প্রবেশ করানোর পর কোন হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করবে তার বিবরণ দেয়া। তাই সংক্ষিপ্তরূপে তা উল্লেখ করার জন্য বলেন, ডান হাত দ্বারা কুলি করবে এবং নাকে পানি দিবে। অতঃপর বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করবে। আর এটাই সুন্নত তরিকা। আর বাকী উযূর কার্যাবলী জানা বিষয়। তাই তিনি তা বর্ণনা করেননি।

কুলি করা সম্পর্কিত হাদীস ও আধুনিক বিজ্ঞান

বস্তুত কুলি করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বিষয়। কেননা, কুলির মাধ্যমে পানির স্বাদ গন্ধ ও রং সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। আমরা যখন আহার গ্রহণ করি তখন খাবারের ছোট ছোট কণা দাঁতের ফাঁকে আটকে থেকে পঁচে দুর্গন্ধ হয় এবং থুথুর সাহায্যে তা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। আর এই দুর্গন্ধময় পদার্থ ক্ষতি সাধান করে দাঁত ও মাড়ীর। অধিকাংশ সময় দাঁতের গোড়া ফুলে তাতে পুঁজ হয় এবং সে পুঁজ পাকস্থলিতে ও পেটে গিয়ে পাথরের সৃষ্টি হয়।

অপরদিকে বাতাসে অসংখ্য ধ্বংসাত্মক রোগ জীবানু উড়ে বেড়ায় যা আমরা চর্ম চোখে দেখতে পাই না। অথচ সে রোগ জীবাণু বাতাসের সাহায্যে আমাদের মুখে প্রবেশ করে এবং থুথুর সাথে মুখে সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি সৃষ্টি করে। যেমন– ১. মুখ পাকা যা এইড্‌সের প্রাথমিক লক্ষণ এবং মুখের কিনারা ফেঁটে যাওয়া ২. মুখে দাদ হওয়া, মেছতা রোগ হওয়া। মোটকথা কুলি করা এমনই একটি আমল যার দ্বারা মানুষ এমন অনেক রোগ থেকে মুক্তি পায়। তদুপরি কুলির মধ্যে গড়গড়া করার দ্বারা নামাযী ব্যক্তি টনসিল ও গলার অনেক্য রোগ থেকে রক্ষা পায়। এমনকি বারবার গলায় পানি পৌঁছানো গলাকে ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

নাকে পানি দেওয়া ও আধুনিক বিজ্ঞান

শ্বাস গ্রহণের একমাত্র পথ হলো নাক। আর যেই বাতাস থেকে শ্বাস গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে লালিত পালিত হয় অসংখ্য রোগ জীবাণু যা নাকের ভিতর দিয়ে অতি সহজেই মানব দেহে প্রবেশ করে। সুতরাং এ রোগ জীবাণু ধুলাবালী যা সর্বদা শ্বাসের সাহায্যে নাকের মধ্যে প্রবেশ করে এভাবে যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করতেই থাকে তাহলে বিপজ্জনক রোগ ছড়ায়ে পড়ার আশংকা থাকে। তাই স্থায়ী সর্দি-কাশি ও নাকের রুগীদের জন্য নাক ধৌত করা খুবই উপকারী। আমরা তো উযূর বরকতে দৈনন্দিন ৫বার নাক পরিষ্কার করে থাকি। তাই নাকের মধ্যে কোন প্রকার রোগ জীবাণু লালিত-পালিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। নাক হলো মানবদেহের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এটি আওয়াজকে শ্রুতিমধুর করে।

নাকের ভিতরের পর্দা আওয়াজকে শ্রুতিমধুর করতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আর কান দেয় মস্তিষ্কে আলোর জোগান। পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে নাকের রয়েছে বলিষ্ঠ ভূমিকা। নাক ফুসঁফুসেঁর জন্য হাওয়াকে পরিষ্কার অর্দ্র উষ্ণ ও উপযোগী বানিয়ে দেয়। মানবদেহে প্রত্যহ কমপক্ষে ৫০০ ঘনফুট বাতাস নাকের সাহায্যে প্রবেশ করে থাকে। মানবদেহের ফুসঁফুসঁ জীবাণু, ধোয়া, ধুলাবালী ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকতে চায়। [বাকী পঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ

٩٢. اخبرنا قُتَيْبَةُ قال حدّثنا ابو عَوانة عن خالِدِ بْنِ علقمة عن عبدِ خَيْرٍ قال اَتَيْنَا علىَّ بْنَ ابِىْ طالبٍ وقد صلّى فدعا بطَهُورٍ فقلنا ما يَصْنَعُ به وقد صلّى ما يُرِيد الّا لِيُعَلِّمَنا فأُتِىَ بِاناءٍ فيه ماءٌ وطستٌ فأفْرَغَ مِنَ الاناءِ على يَدَيْه فغسلها ثلاثا ثم تمضمضَ واستنشقَ ثلثا مِنَ الكفِّ الّذى يأخُذُ به الماءَ ثمّ غسلَ وجهَه ثلاثا وغسَلَ يَدَه اليُمْنى ثلاثا ويَدَه الشِّمالَ ثلاثا ومسَح بِرأسِه مرّةً واحدةً ثم غسل رِجْلَه اليُمنى ثلاثا ورِجْله الشِّمالَ ثلاثا ثم قال مَن سَرَّه اَن يَعْلَمَ وُضوءَ رسولِ الله ﷺ فهو هذا -

অনুচ্ছেদ ঃ মুখমণ্ডল ধৌত করা

অনুবাদ ঃ ৯২. কুতায়বা (র)........আবদ খায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর নিকট এলাম। এমতাবস্থায় যে, তিনি সালাত আদায় করেছিলেন। (আমাদেরকে দেখে) তিনি উযুর পানি আনতে বলেন। আমরা বললাম, তিনি তো সালাত আদায় করেছেন এখন পানি দিয়ে কি করবেন? (পরে বুঝলাম) তিনি আমাদেরকে উযু শিক্ষা দেয়ার জন্যই এরূপ করেছেন। তাঁর হুকুম অনুযায়ী পানি ভর্তি একটি পাত্র ও অন্য একটি পাত্র আনা হল। তিনি পাত্র হতে হাতে পানি ঢেলে তিনবার হাত ধৌত করলেন। এরপর এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। এরপর ডান হাতে পানি দিয়ে তিনবার কুল্লি করেন ও নাকে পানি দেন। আর ডান ও বাম হাত তিনবার করে ধৌত করেন এবং একবার মাথা মাসেহ করেন। পরে ডান পা ও বাম পা তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) এর উযূ দেখে খুশি হতে চায় সে যেন আমার উযূ দেখে। কেননা, এর অনুরূপই রাসূলুল্লাহ (স)-এর উযূ ছিল।

হাদীস সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা

আলোচ্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সালফে সালেহীনদের মধ্যে এর আমলী তালীম প্রচলন ছিল। কেননা, আমলী তালীমের মাধ্যমে যেমনিভাবে বিষয়টি অন্তরে গেথে যায় এবং অন্তর প্রশান্তি লাভ করে বক্তব্যের মাধ্যমে তেমনটি হয় না। সুতরাং হযরত আলী (রা) নিজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও শাগরেদদের আমলী তা'লীম দেয়ার জন্য একটি পাত্রে কিছু পানি আনতে বললেন। তার খেদমতে পানি পেশ করা হল। অতঃপর তিনি উযূর সমস্ত আমলগুলো আমলের মাধ্যমে শিক্ষা দিলেন। অর্থাৎ তিনি উযূ করলেন আর সকলে তা দেখল। তিনি সর্ব প্রথম উভয় হাতকে তিনবার কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন। অতঃপর তিনবার কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিলেন। রেওয়ায়াতে مِنَ الْكَفِّ الَّذِى يَأْخُذُ بِهِ الْمَاءَ শব্দ এসেছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ডান হাত অর্থাৎ তিনি ডান হাতে পানি নিচ্ছিলেন এবং কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার জন্য উক্ত হাতকে ব্যবহার করছিলেন। এটাই সুন্নত তরিকা। কিন্তু ডান হাত নাকে পানি প্রবেশ করবে এবং বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করবে এটাই সুন্নত পদ্ধতি। এটা অন্যান্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে।

মোটকথা, হযরত আলী (রা) মাথা মাসহ ব্যতীত অন্য সকল অঙ্গকে তিন তিন তিনবার করে ধৌত করেন এবং একবার মাথা মাসাহ করেন। হযরত আলী (রা) এর এই উযূ রাসূল (স) এর উযূর সাথে পূর্ণ সাদৃশ্যশীল। এ কারণেই তিনি উযূ শেষে বলেছেন مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَعْلَمَ الخ যে রাসূলের উযূর ন্যায় উযূ করতে আগ্রহী সে যেন এমন উযূ করে যেমনটা আমি দেখিয়েছি। আর যে এর বিপরীত উযূ করবে তার উযূটা সুন্নতের পরিপন্থী হবে।

[পূর্বের বাকী অংশ]

হাওয়া প্রদানকারী সাধারণ এয়ার কন্ডিশনার একটি ট্রাংকের সমান হয়ে থাকে, কিন্তু নাকের মধ্যের এয়ার কন্ডিশনারকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এত ক্ষুদ্র অথচ ব্যাপক করে সৃষ্টি করেছেন যা মাত্র কয়েক ইঞ্চি প্রশস্ত। হাওয়াকে ঠাণ্ডা করার জন্য নাক ৪/১ গ্যালন আর্দ্র পদার্থ প্রত্যহ তৈরী করে। পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য কঠিন কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব নাকের ছিদ্রের। নাকের মধ্যে রয়েছে এক অনুবীক্ষণ ক্ষুদ্র মার্জনী। তার মধ্যে রয়েছে অদৃশ্য পশম যা হাওয়ার সাথে মিশ্রিত হয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশকারী ক্ষতিকর রোগসমূহ ধ্বংস করে দেয়। রোগ জীবাণুকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আটক করা ছাড়াও তার রয়েছে আরো প্রতিহত করণ পদ্ধতি যাকে ইংরেজিতে Lysoziam বলা হয়।

عَدَدُ غَسْلِ الْوَجْهِ

٩٣. اخبرنا سُوَيد بنُ نصرٍ قال اخبرنا عبدُ اللهِ وهو ابنُ المباركِ عن شعبةَ عن مالكِ بنِ عُرْفَطَةَ عَن عبدِ خيرٍ عن عليّ انه أُتِيَ بكُرسيّ فقَعَدَ عليه ثمّ دعَا بِتَوْرٍ فيه ماءٌ فكفأ على يَدَيْه ثلثًا ثم مضمضَ واستنشقَ بكفٍ واحدٍ ثلثَ مرّاتٍ وغسَلَ وَجْهَه ثلثا وغسَلَ ذِراعَيْهِ ثلثًا ثلثًا واخَذَ مِنَ الماءِ فمَسَحَ برَاسِه واشارَ شعبةُ مرّةً مِن ناصيتِه الى مُؤخّرِ رَاسِه ثمّ قال لاادرى اَرَدَّهُمَا ام لا وغسَلَ رِجلَيْه ثلثًا ثلثًا ثم قال مَنْ سَرَّهُ ان يَنْظُرَ الى طُهورِ رسولِ الله ﷺ فهٰذا طُهورُهُ وقال ابو عبدِ الرحمٰن هٰذا خَطأٌ والصوابُ خالدُ بنُ علقمةَ ليس مالكُ بنُ عُرْفَطة ـ

মুখমণ্ডল কতবার ধৌত করতে হবে?

অনুবাদ ঃ ৯৩. সুওয়ায়দ ইবনে নাস্‌র (র)........আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট একটি বসার চৌকি নিয়ে আসা হয় এবং তিনি তাতে বসেন। পরে পানি ভর্তি একটি পাত্র আনতে বলেন। (পানি আনা হলে) তিনি উভয় হাতের উপর পাত্রটি কাত করে তিনবার করে পানি ঢালেন। পরে এক এক অঞ্জলি পানি দ্বারা তিনবার কুলি করেন ও নাকে পানি দেন এবং তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। আর তিনবার করে কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করেন এবং হাতে কিছু পানি নিয়ে মাথা মাসেহ করেন। শু'বা (আলোচ্য হাদীসের রাবী) তাঁর মাথার অগ্রভাগ থেকে মাথার শেষ ভাগ পর্যন্ত একবার ইঙ্গিত করে দেখান এবং বলেন, তিনি হাত দু'টি সম্মুখের দিকে ফিরিয়ে এনেছিলেন কিনা তা আমার মনে নেই। এরপর তিনি (হযরত আলী রা.) তিনবার করে উভয় পা ধৌত করেন এবং তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর উযূ দেখে খুশি হতে চায় (সে যেন আমার এ উযূ দেখে); এটাই তাঁর উযূ। ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, মালিক ইবনে উরফুতা নন, সঠিক হলো খালিদ ইবনে আলকামা (র)।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে উযূতে চেহারা কতবার ধৌত করা হবে। সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হলো যে, তিনবার ধৌত করবে যেমন হাদীসে বলা হয়েছে وغَسَلَ وَجْهَه ثلاثا এটা সুন্নতের সর্বোচ্চ সীমা। আর ফরয তো একবার ধৌত করার দ্বারাই আদায় হয়ে যায়।

ইমাম আবু বকর ইবনে জাসসাসের বক্তব্য ঃ ইমাম আবু বকর জাসসাস বলেন, فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الخ আয়াতে। فاغسلوا হলো امر যা চেহারা একবার ধৌত করাকে কামনা করে। কারণ উক্ত আয়াতে ধৌত করার عدد (সংখ্যা) উল্লেখ করা হয়নি। যেহেতু সংখ্যা উল্লেখ নেই তাই বাহ্যিক শব্দ দ্বারা تكرار فعل তথা কয়েকবার ধৌত করার বিষয়টি সাব্যস্ত হবে না। কেননা امر بالشئ তথা কোন বস্তুর প্রতি নির্দেশ প্রদান তাকরার চায় না। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি উযূতে একবার চেহারা ধৌত করে এবং অন্যান্য অঙ্গগুলোকেও একবার ধৌত করে তাহলে তার দ্বারা তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। ফরযে সাথে সাথে উযূতে সুন্নতও রয়েছে। যেগুলো রাসূল (স) করেছেন, যেমন তিনবার চেহারা ধৌত করা সুন্নত। মোটকথা, হুজুর (স) থেকে تثليث তথা তিন তিনবার অঙ্গ ধৌত করার আমল প্রমাণিত রয়েছে। আর এটা করা হয় ফজীলতের জন্য। কেননা, এক এক বার ধৌত করার দ্বারাই ফরয আদায় হয়ে যায়। কিন্তু সুন্নত আদায় করার জন্য তিনবার করা জরুরী। হাদীসে غسل শব্দ উল্লেখের দাবী হলো অঙ্গগুলো ডলতে হবে। কেননা, আহলে আরবগণ غسل ও غمس শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন। غسل এর মধ্যে অঙ্গগুলোকে ঘসে বা ডলে ধৌত করতে হয়। কিন্তু غمس এর বিষয়টি এমন নয়।

ইমাম মালেক (র) এর বক্তব্য ঃ ১. ইমাম মালেক (র) এর প্রসিদ্ধ মতে অঙ্গগুলোকে ঘষা ওয়াজিব।

২. ইবনে আব্দুল হাকাম এবং আবুল ফরয বলেন, অঙ্গগুলো ঘষে ধৌত করা ওয়াজিব নয়।

৩. হানাফীদের নিকট অঙ্গগুলোকে ডলে ধৌত করা সুন্নত; ফরয নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা ঘষার কয়েদ বৃদ্ধি করা ছাড়াই ধৌত করার হুকুম দিয়েছেন। আর গোসলের সূরত হলো, পানি কপালের উপর হতে প্রবাহিত করবে ছুড়ে দেবে না। যেমন অধিকাংশ সাধারণ লোকজন করে থাকে। কারণ এটা হলো মাসাহ, গোসল নয়।

আলোচ্য হাদীসে মাথা মাসাহ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এখানে এর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ অর্থাৎ হযরত আলী (রা) স্বীয় মাথা মাসাহ করেন। কতবার করেছেন তার সংখ্যা উল্লেখ নেই। কিন্তু অন্য রেওয়ায়াতে তা উল্লেখ আছে। পূর্বে শিরোনামের অধীনে আবু আওয়ানার রেওয়ায়াতে وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً উল্লেখ আছে এবং সামনে صفة الوضوء এর অধীনে হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রা) এর বিস্তারিত বিবরণ আসছে। সেখানে ثم مَسَحَ بِرَأْسِهِ مسحةً واحدةً এর শব্দ উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে আবু দাউদ শরীফে খালিদ ইবনে আলকামা থেকে রেওয়ায়েতকারী ব্যক্তি যায়েদ ইবনে কুদামা এর রেওয়ায়াতে مرة শব্দ উল্লেখ রয়েছে। কেউ বলেন হযরত আলী (রা) এর রেওয়ায়াত যা صفت وضوء نبوى -তে বর্ণিত আছে, তা একবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত কিন্তু কোন রেওয়ায়েতে মাসাহ করার সংখ্যা উল্লেখ নেই। শো'বা (র) বলেন– لاادرى ... الخ

سوال : اوضِحْ قولَه يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثم بِمُقَدَّمِه.

প্রশ্ন ঃ ব্যাখ্যা লিখ– يبدءُ بِمُؤَخَّرٍ بِمُقَدَّمه

উত্তর ঃ يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه এর দ্বারা তারাই দলীল পেশ করেন যারা উক্ত আমলটি রাসূল (স) কে করতে দেখেছেন, জুমহুর উলামা বলেন, এটি সুন্নত তরিকার বিপরীত। কেননা, উক্ত মাসয়ালায় মূল সুন্নত হচ্ছে যা আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আছেম আল মাযানীর বর্ণনা থেকে বুঝা যায়। তিনি রাসূল (স) এর মত উযূ করেছেন। অতঃপর দু'হাত দ্বারা মাথার সম্মুখ থেকে মাসাহ আরম্ভ করে পেছনের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। অতঃপর পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে এনেছেন। বাকী يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثم بِمُقَدَّمِهِ এর জুমহুর এর কয়েকটি জবাব দেন–

১. يَبدأ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثم بِمُقَدَّمِهِ এটা রাবীর ভুল বুঝার কারণে বর্ণনায় হেরেপের হয়ে গেছে। যেমন আবু বকর ইবনে আরাবী উক্তি করেছেন।

২. উক্ত হাদীসটির আব্দুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের সঙ্গে تعارض হয়েছে। এক্ষেত্রে আব্দুল্লাহর হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে প্রাধান্য পাবে।

৩. হুজুর (স) এ কাজটি এখানে জায়েয ও মুবাহ বুঝানোর জন্য করেছেন।

৪. يبدأ بمؤخر رأسه এর অর্থ মূলতঃ হাত সম্মুখ থেকে পিছনের দিকে নিয়ে আরম্ভ করা। অতঃপর উভয় হাতকে পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে আনা। রাবী ভুল করেছে বা তাহরীফ করেছেন এটা না বলে চতুর্থ নাম্বার উত্তরটি দিয়াই অধিক উত্তম। (শরহে আবু দাউদ)

سوال : اذكُر اقوالَ الائمّةِ فى دخولِ مابيْنَ العِذاروالاُذنِ فِى حدِّ الوَجه؟

প্রশ্ন ঃ مابينَ العذار والاُذن **চেহারার ভিতরে দাখিল কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য কি? বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ ما بين العذار والاذن **এর সংজ্ঞা ঃ** ما بين العذار والاذن কানের পার্শ্বের ঐ স্থানকে বলা হয়, যে স্থান হতে যৌবনে দাঁড়ি গজায়। এখন কথা হলো তা ما بين العذار والاذن চেহারার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত কি না? এই নিয়ে তিনটি মাযহাব রয়েছে।

১. আবু হানীফা (র) এর অভিমত ঃ ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ (র) ও আমাদের মাযহাবের অধিকাংশ মাশায়েখের মতে ما بين العذار والاذن চেহারার মধ্যে দাখিল। সুতরাং ঐ স্থানকে ধৌত করা ফরয হবে।

২. ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর অভিমত ঃ হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এটা চেহারার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যেহেতু চেহারার ভিতরে দাখিল নয় এই জন্য ধৌত করাও ফরয নয়। আর মাসাহ করার সময় পানি পৌছানোও জরুরী নয়।

৩. ইমাম শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ীর অভিমত ঃ শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র) বলেন যে, ما بين العذار والاذن চেহারার ভিতরে দাখিল কিন্তু حرج عظيم তথা অতি অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার কারণে সেটাকে ধৌত করা ফরয নয়। বরং শুধুমাত্র পানি পৌঁছানোই যথেষ্ট হবে। তবে প্রথম মাযহাবটাই অধিক বিশুদ্ধ।

سوال : اَثْبِتْ تَمَامَ حُدُودِ الْوَجْهِ

প্রশ্ন ঃ চেহারার পূর্ণাঙ্গ সীমার প্রমাণ দাও।

উত্তর ঃ কোন বস্তুর পূর্ণ সীমানা প্রমাণ করতে হলে সেই বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের পরিধি বর্ণনা করতে হয়। কেননা, দৈর্ঘ-প্রস্থের পরিধি জানার মাধ্যমেই সে বস্তুর পূর্ণ সীমা জানা যায়। তাই মুসান্নিফ (র) উক্ত ইবারতে চেহারার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো غسل الوجه من الشعر الى اسفل الذقن ও غسل الوجه من الاذنين তথা চুলের গোড়া থেকে থুৎনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত। মুসান্নিফ (র) এর এ ইবারত দ্বারা পূর্ণ চেহারা উদ্দেশ্য হওয়া সাব্যস্ত হলো।

মুখ ধৌত করা সম্পর্কিত হাদীস ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

১. মুখ ধৌত করলে সর্বদা মুখমণ্ডল গরম থাকার রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

২. মুখ ধৌত করলে ক্যামিক্যালের ক্ষতি থেকে সুরক্ষা হয়। তথা বর্তমান এটমের যুগে সর্বত্র চলছে এটমের বিস্ফোরণ। ধোঁয়ার মধ্যে রয়েছে অনেক ধ্বংসাত্মক ক্যামিক্যাল। যেমন Lcad ইত্যাদি যা কিছুক্ষণ চামড়ার উপর জমে থাকলে চর্মরোগ ও এলার্জি সৃষ্টি হয়। তাই বিশেষজ্ঞগণ শরীরের খোলা অংশগুলো বারবার ধৌত করতে বলেছেন। (তারা অধিক পরিমাণ বৃক্ষ রোপন ও অপরিচ্ছন্নতা হ্রাস করার কথাও বলছেন।) কারণ ধোঁয়া, ধূলিকণা ইত্যাদির আকৃতিতে যে ক্যামিক্যালগুলো চেহারায় জমে তার একমাত্র চিকিৎসা হলো উযূ তথা ধৌত করা।

৩. নিয়মিত মুখ ধৌত করলে মুখে ব্রণ হয় না। আর হলেও তার পরিমাণ খুব নগন্য হয়।

৪. আমেরিকান কাউন্সিল বিউটি সংস্থার সম্মানিত সদস্য লেডী হীচার বিস্ময়কর এক তথ্য উদঘাটন করেছেন। তিনি বলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের কোন প্রকার রাসায়নিক লোশন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। কারণ তারা উযূর দ্বারা চেহারার যাবতীয় রোগ থেকে মুক্তি পায়।

৫. এক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন এলার্জি থেকে আত্মরক্ষার প্রধান উপায় হলো বারংবার চেহারা ধৌত করা। কাজেই চেহারার এলার্জি রুগী যদি উযূতে চেহারা উত্তমরূপে ধৌত করে তাহলে এলার্জি হ্রাস পাবে।

৬. উযূতে চেহারা ধৌত করার ফলে হাত দ্বারা চেহারার ম্যাসেজ হয়, রক্তের গতি চেহারার দিকে ধাবিত হয়। এতদভিন্ন উযূর দ্বারা চেহারায় জমে থাকা ময়লা ও ধূলা-বালি দূর হয়ে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

৭. মেডিসিন বা সাস্থ্য সংস্থার মূলনীতি অনুযায়ী ভ্রুতে আদ্রতা থাকলে চক্ষু এমন এক মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পায় যা অন্য কিছু দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ ভ্রু ভিজা না থাকলে চোখের ভিতরের আদ্রতা হ্রাস পায় এবং ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়ে।

৮. জনৈক ইউরোপিয়ান ডাক্তার একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, যার শিরোনাম ছিল- চক্ষু, পানি, সুস্থতা। উক্ত প্রবন্ধে তিনি একথার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন যে, চক্ষুকে দিনে কয়েকবার পানি দ্বারা ধৌত করলে মারাত্মক ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৯. বস্তুত পানি এমন এক মহা প্রতিষেধক ঔষধ যার দ্বারা চোখের সর্ব প্রকার রোগ নিঃশেষ হয়ে যায়।

১০. নাকে মুখে যেমন ধূলা-বালি জমে তেমনি চোখেও ধূলা বালু জমে এবং এর থেকে রোগের সৃষ্টি হয়। সাধারণত এ কারণেই ঘরের কারোর চোখে যদি ব্যাথা হয় তাহলে বলা হয় যে, চোখে শীতল পানি ছিটিয়ে দাও।

১১. জনৈক ইঞ্জিনিয়ার মাওয়ায়েজ গ্রন্থে লেখেন- বিজ্ঞানের এ যুগে একথা স্বীকৃত যে, মানুষের চোখে যে ছানী পড়ে তার চিকিৎসা হলো সকাল বেলা চোখে পানির ছিটা দেয়া। কারণ এভাবে তার চক্ষুব্যাধি দূরীভূত হয়ে যায়।

রাসূল (স) কেন তিনবার মুখ ধৌত করতেন

রাসূল (স) এর মুখ তিনবার ধৌত করার হিকমত হলো, প্রথমবার পানি ঢেলে ময়লা নরম করা হয়। দ্বিতীয়বার পানি ঢেলে সে ময়লা দূর করা হয় এবং তৃতীয়বার পানি দেওয়ার দ্বারা চেহারা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।

غَسْلُ الْيَدَيْنِ

٩٤. اخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثني شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير قال شهدت عليا دعا بكرسي فقعد عليه ثم دعا بماء في تور فغسل يديه ثلثا ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلثا ثم غسل وجهه ثلثا ويديه ثلثا ثم غمس يده في الاناء فمسح برأسه ثم غسل رجليه ثلثا ثلثا ثم قال من سره أن ينظر الى وضوء رسول الله ﷺ فهذا وضوءه -

উভয় হাত ধৌত করা

অনুবাদ : ৯৪. আমর ইবনে আলী ও হুমায়দ ইবনে মাসআদা (রা)........আবদে খায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি একটি চৌকি আনতে বললেন ; (চৌকি আনা হলে) তিনি তাতে বসেন এবং একটি পাত্রে পানি আনতে বলেন, (পানি আনা হলে) তিনি তিনবার করে উভয় হাত ধৌত করেন। এক এক অঞ্জলি পানি দ্বারা তিনবার কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। পরে তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন ও উভয় হাত তিনবার করে ধৌত করেন। এরপর হাত পানির পাত্রে প্রবিষ্ট করান এবং মাথা মাসেহ করেন। পরে উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর উযূ দেখে খুশি হতে চায় (সে যেন আমার উযূ দেখে); এরূপই তাঁর উযূ ছিল।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

আলোচ্য শিরোনামের অধীনে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, তা ভিন্ন কোন হাদীস নয় বরং তা সে হাদীস যা পূর্বের শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এখানে কিছু শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে ভিন্ন সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি এস্তেম্বাতকৃত মাসআলা বর্ণনা করা। আর তা হলো ইমাম শাফেয়ী (র) এর নিকট ফরয চতুষ্টয়ের মধ্যে তারতীব রক্ষা করা ফরয। কিন্তু আমাদের নিকট তারতীব ফরয নয়। ইমাম নাসায়ী (র) যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তাই তিনিও তারতীব ফরয বলেন। এটা বুঝানোর জন্যেই তিনি সর্ব প্রথম غسل الوجه এর শিরোনাম কায়েম করছেন। অতঃপর غَسْلُ الْيَدَيْنِ এর শিরোনাম কায়েম করছেন। অতঃপর صفة مسح الرأس এর বর্ণনা এনেছেন এবং পরিশেষে غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ এর বর্ণনা এনেছেন।

سوال : اكتب حكم الترتيب في الوضوء. وما الاختلاف فيه بين المجتهدين بين مفصلا مبرهنا ورجح مذهبك؟

প্রশ্ন : উযূর মধ্যে তারতীবের হুকুম বর্ণনা কর? মুজতাহিদগণের এক্ষেত্রে মতানৈক্য কি? দলীলে প্রমাণ সহকারে উল্লেখ কর। এবং তোমার মাযহাব অগ্রগণ্য হওয়ার প্রমাণ দাও।

উত্তর : তারতীবের বিধান : উযূর মধ্যে তারতীবের হুকুমের ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

১. উলামায়ে আহনাফের মতে উযূর মধ্যে তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা ফরয নয় বরং সুন্নত।

২. ইমাম শাফেয়ী (র) এর নিকট উযূতে তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা ফরয।

আহনাফের দলীল : কুরআনে কারীমের কোন আয়াতে এমনকি উযূ সম্পর্কিত আয়াতেও তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখার হুকুম দেয়া হয়নি। সুতরাং এখন যদি বলা হয় উযূতে তারতীব রক্ষা করা ফরয। তাহলে কিতাবুল্লাহর

উপর অতিরঞ্জিত করা অনিবার্য হয়; যা জায়েয নেই, এজন্য এটা ফরয হতে পারে না। কিন্তু যেহেতু নবী করীম (স) ধারাবাহিকভাবে সর্বদা উযূ করেছেন এ কারণে এটা সুন্নত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) এর ক্ষেত্রে দুটি দলীল রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম দলীল বুঝার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ একটি মুকাদ্দামা জানা জরুরী। আর তা হল–

اجماع مركب عدم القائل بالفصل এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা উসূলুল ফিকহ এর বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে। এখানে শুধুমাত্র এতুটুকু জানাই যথেষ্ট যে, عَدَمُ الْقَائِل بِالْفَصْل এর অর্থ হলো দু'টি বিষয়ের হুকুমের করার ব্যাপারে কোন قائل বা প্রবক্তা না থাকা। عدم قائل بالفصل এর পারিভাষিক সংজ্ঞা এই যে, কোন বিষয়ের মধ্যে দুটি দল পরস্পরে মতপার্থক্য করা। কিন্তু এর দ্বারা তৃতীয় আরেকটি বিষয়ের মধ্যে পরস্পরে একমত পোষণ করা আবশ্যক হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ দূর থেকে কোন একটি প্রাণী দেখে যায়েদ বলল যে, ওটা ছাগল। আর খালেদ বলল না, বরং ওটা ভেড়া। তাদের ভিতরে ইখতেলাফ হওয়া সত্ত্বেও তারা পরস্পরে একটি বিষয়ে একমত পোষণ করল যে, তা ওটা কুকুর নয়।

তারতীবের ব্যাপারে عدم قائل بالفصل এর সুরত হলো ইমাম শাফেয়ী (র) উযূর সমস্ত অঙ্গ ধৌত করার ব্যাপারে তারতীব ফরয হওয়ার প্রবক্তা কিন্তু উলামায়ে আহনাফ এ কথার প্রবক্তা নন। আমাদের এবং শাফেয়ীদের মধ্যে এই ইখতেলাফের দ্বারা তৃতীয় আরেকটি জিনিসের মধ্যে এত্তেফাক হওয়া লাযেম আসে, তা হলো উযূর অঙ্গসমূহের মধ্যে তারতীব ওয়াজিব হওয়া এবং না হওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। যদি তারতীব ওয়াজিব না হয়, তাহলে কোন অঙ্গের ক্ষেত্রে তারতীব ওয়াজিব হবে না, এটাই হলো اجماع مركب عدم القائل بالفصل যে উযূর অঙ্গসমূহের ব্যাপারে ফরক করার কোন প্রবক্তা নেই।

ইমাম শাফেয়ীর (র) এর প্রথম দলীল ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) কুরআনে কারীমের আয়াত فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ এর দ্বারা দলীল পেশ করেন। উল্লেখিত আয়াতের শুরুতে فا، এসেছে যা وصل এবং تعقيب بلا تراخى এর জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আয়াতের তাগাদা হলো নামাযের ইচ্ছা করার সাথে সাথে প্রথমে চেহারা ধৌত করবে। এ জন্য চেহারা আগে ধৌত করা জরুরী। এ আয়াত দ্বারা চেহারা ধৌত করার তারতীব সাব্যস্ত হল। কাজেই অবশিষ্ট অঙ্গগুলোর ভিতরেও তারতীব ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা হতে হবে। কারণ যদি শুধুমাত্র চেহারার ক্ষেত্রে তারতীব মেনে অবশিষ্ট অঙ্গগুলোর ক্ষেত্রে তারতীব না মানি তাহলে ভূমিকায় উল্লেখিত اجماع مركب عدم القائل بالفصل এর খেলাফ লাযেম আসে। আর এটা ইজমার খেলাফ হওয়ায় বাতিল গণ্য হবে। এ জন্য সমস্ত অঙ্গের ক্ষেত্রে তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দ্বিতীয় দলীল ঃ শাফেয়ী মাযহাবের কিছু আলিম এভাবে দলীল পেশ করে থাকেন যে, হুজুর (স) উযূ করে বলেছিলেন هٰذَا وُضُوْءٌ لَايَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى الصَّلٰوةَ الاٰية আর নবী করীম (স) এর ঐ উযূ ধারাবাহিকভাবে ছিল। এখন হাদীসের অর্থ হবে কেমন যেন হুজুর (স) বলেছেন– ধারাবাহিক উযূ ব্যতীত নামায হবে না। সুতরাং জানা গেলো যে, উযূর মধ্যে তারতীব ফরয।

উল্লেখিত দু'টি মাযহাবের মধ্যে আহনাফের মাযহাবটাই راجح বা অগ্রগণ্য। সামনে আহনাফের মাযহাব সুদৃঢ় করতঃ ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীলের জবাব দেয়া হলো–

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীলের জবাব

প্রথম দলীলের জবাব দুইটি, ১. جواب انكارى ২. حواب تسليمى

প্রথম জবাব ঃ আমরা এটা মানি না যে, আয়াতে فا، আনার কারণে চেহারা ধৌত করাকে মুকাদ্দাম করতে হবে এবং তার উপর কিয়াস করে অন্যান্য অঙ্গগুলোতে তারতীব ফরয সাব্যস্ত করতে হবে। কেননা فَاغْسِلُوا

وَجُوهَكُم এর পরে واو উল্লেখ আছে যা মুতলাক جمع এর অর্থে ব্যবহৃত হয়; তারতীবের জন্য নয়। এবং أَيْدِيَكُمْ ও أَرْجُلَكُم এটা وَجُوهَكُم এর উপরে আতফ। সুতরাং فا এর পরে শুধুমাত্র চেহারাই ধৌত করতে বলা হয়নি। বরং অন্যান্য অঙ্গগুলোকেও ধৌত করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে-

فَاغْسِلُوْا هٰذَا الْمَجْمُوْعَ مُرَتَّبًا اَوْ غَيْرَ مُرَتَّبٍ

তথা তোমরা তোমাদের অঙ্গগুলো ধারাবাহিকভাবে ধৌত করতে পার, আবার ধারাবাহিকতা ছাড়াও ধৌত করতে পারো। এ কারণে চেহারাকে আগে ধৌত করা এবং তারতীব ফরয হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তারতীব ফরয হবে না।

দ্বিতীয় জবাব : আমরা যদি মেনেও নিই যে, ↓ আয়াত দ্বারা চেহারা ধৌত করা যদি মুকাদ্দাম সাব্যস্ত হয়, তথাপি বাকী অঙ্গগুলোর উপর ইজমার মাধ্যমে ইসতেদলাল করা সহীহ হবে। আর তা এ জন্য যে, اجماع এর মাধ্যমে استدلال তখনি সঠিক হবে, যখন ইতিপূর্বে اجماع مركب সংঘটিত হবে। কেননা, استدلال এর পূর্বে اجماع مركب সংঘটিত হওয়া জরুরী। অথচ ইতিপূর্বে اجماع সংঘটিত হয়নি। আর اجماع সংঘটিত হওয়ার পূর্বে اجماع এর খেলাফ হওয়ার দাবি করা ভিত্তিহীন বিষয়। কেননা, اجماع مركب সংঘটিত হওয়ার জন্য প্রথমে উভয় পক্ষের মাযহাব প্রমাণিত হওয়া জরুরী। যাতে তার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য মাসআলার ভিতরে اجماع কায়েম করা যায়। কিন্তু তাদের মাযহাব এখনো পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। তাই এদের استدلال - اجماع এর উপর মওকুফ হবে। আর ইজমা মওকুফ হলো মাযহাব সাব্যস্ত হওয়ার উপর। অপরদিকে মাযহাব সাব্যস্ত হওয়াটাও আবার পূর্বের ঐ استدلال এর উপর মওকুফ। সুতরাং তাদের দলীলের মধ্যে دور (দাওর) এবং تسلسل লাযেম আসে। আর তা বাতিল। সুতরাং এর দ্বারা ইস্তেদলাল করাও বাতিল। কেননা, তাদের দলীল معدوم এবং তার দ্বারা استدلال করা بلادليل হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র)এর দ্বিতীয় দলীলের জবাব : দ্বিতীয় দলীলের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন, তাঁরা যে, হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, তাঁরা তো শুধুমাত্র হাদীসের শেষ অংশ দেখেই استدلال করেছেন। নতুবা পূর্ণ হাদীস সামনে আনার দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, مشار اليه বাস্তবিক পক্ষে কি? ফলে তাদের দলীল বাতিল সাব্যস্ত হবে। হাদীসটি এই-

عِنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلّم مَرَّةً وقَالَ هٰذَا وضوءٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ اِلَّا بِه ثُمّ تَوَضَّأَ مُرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وقَالَ هٰذَا وَضُوْءُ مَنْ يُضَاعَفُ لَهُ الْاَجْرُ ثمّ توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هٰذَا وُضُوْئِى .... الخ

পূর্ণ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য রাখার দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, هذا এর ইশারা শুধুমাত্র مرة এরই দিকে, উযূর কোন সিফত এর দিকে নয়, এবং جميع اوصاف এর দিকেও নয়, যার অধীনে তারতীব সাব্যস্ত হবে। কেননা, جميع اوصاف উদ্দেশ্য নেয়ার ক্ষেত্রে تَيَامُن - مُوَلَاة ইত্যাদি বিষয়াবলীকেও ফরয বলতে হবে। অথচ তাঁরা এ সব ফরয হওয়ার প্রবক্তা নন। এই কারণে هذا এর ইশারা যখন শুধু মাত্র مَرَّةً مَرَّةً এর দিকে, তারতীব ও অন্যান্য বিষয়াবলীর দিকে নয়। এ কারণে এর দ্বারা তারতীব ফরয হওয়া প্রমাণিত হয় না। উলামায়ে আহনাফ শাফেয়ী (র) এর এ দলীলের আরো বিভিন্নভাবে জবাব দিয়েছেন। যথা-

১. এ হাদীস সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। এর দ্বারা আহকামের ব্যাপারে দলীল পেশ করা যায় না।

২. এ হাদীসটি خبر واحد সুতরাং এর দ্বারা فرضيّت সাব্যস্ত হয় না।

৩. এ হাদীসের দ্বারা উযূর মধ্যে তারতীব সাব্যস্ত করার ব্যাপারে দাবী করা ভিত্তিহীন বিষয়। কেননা, হাদীসে এব্যাপারে কোন (প্রকার) স্পষ্ট বর্ণনা নেই।

بَابُ صِفَتِ الْوُضُوْءِ

٩٥. اخبرنا ابراهيم بْنُ الحَسَنِ المِقْسَمِيّ قال حدّثنا حَجّاجُ قال قال ابنُ جُرَيج حدّثنى شيبةُ أنّ محمّد بن عليّ اخبره قال اخبرنى ابى على أنّ الحُسَيْنَ بن عليّ قال دعانى ابى عَلِيّ بِوَضُوءٍ فقرّبتُهُ له فبدأ فغسل كفّيه ثلثَ مرّاتٍ قبلَ أنْ يُدخِلَهُما في وَضُوءِه ثم مضمضَ ثلثًا واستنثر ثلثًا ثمّ غسل وجهه ثلثَ مرّاتٍ ثمّ غسل يدَه اليُمنى إلى المرافق ثلثًا ثم اليُسرى كذالك ثم مسح برأسه مسحةً واحدةً ثمّ غسلَ رِجلَهُ اليُمنى إلى الكعبين ثلثًا ثمّ اليُسرى كذلك ثمّ قامَ قائمًا فقال ناولنى فناولتُهُ الاناءَ الّذى فيه فضلُ وضوءِه فشرِبَ مِنْ فضلِ وَضُوءِه قائمًا فعجبتُ فلمّا رآنى قال لاتعجب فإنّى رأيتُ اباك النبيّ ﷺ يَصْنَعُ مِثْلَ ما رأيتنى صنعتُ يقولُ لِوُضُوءِه هذا وشُربَ فضلَ وضوءِه قائمًا.

অনুচ্ছেদ ঃ উযূর বর্ণনা

অনুবাদ ঃ ৯৫. ইবরাহীম ইবনে হাসান মিকসামী (র)...........হুসায়ন ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আলী (রা) আমাকে উযূর পানি আনতে বলেন। আমি তাঁর নিকট পানি এনে দিলাম। তিনি উযূ করতে আরম্ভ করেন। (প্রথমে) উযূর পানিতে হাত ঢুকাবার পূর্বে হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন। এরপর তিনবার কুলি করেন ও তিনবার নাকে নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং ডান হাত তিনবার কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। অনুরূপভাবে বাম হাত ধৌত করেন এবং একবার মাথা মাসেহ করেন। এরপর গোড়ালি পর্যন্ত ডান পা তিনবার এবং অনুরূপভাবে বাম পা ধৌত করেন। পরে সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং বলেন পানির পাত্রটা (আমার হাতে) দাও। আমি (তাঁর উযূর পর যে পানিটুকু পাত্রে ছিল তাসহ) পাত্রটি তাঁকে দিলাম। তিনি উযূর অবশিষ্ট পানিটুকু দাঁড়িয়ে পান করেন। আমি তাঁকে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখে অবাক হলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখে বললেন, অবাক হয়ো না। তুমি আমাকে যেমন করতে দেখলে আমিও তোমার নানা নবী (স)-কে এরূপ করতে দেখেছি। আলী (রা) তাঁর এ উযূ এবং অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা সম্পর্কে বলছিলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে উযূর সিফত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা হানাফী মাযহাবের সমর্থন লাভ হয়। আলোচ্য হাদীসের শেষ দিকে বলা হয়েছে- فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِهِ وَضُوْئِهِ قَائِمًا ... الخ

অর্থাৎ হযরত আলী (রা) উযূর অতিরিক্ত পানি দাঁড়িয়ে পান করলেন, এখানে فضل وضوء দ্বারা উযূর পর পাত্রের বেচেঁ থাকা অতিরিক্ত পানি উদ্দেশ্য। হযরত আলী (রা) উযূকে পূর্ণ করার পর উযূর অতিরিক্ত পানি দাঁড়িয়ে পান করেন। হযরত হুসাইন (রা) তাঁর পিতার এ কাজ দেখে আশ্চার্যান্বিত হল। তাই তিনি বলেন, فَعَجِبْتُ তথা আমি আমার পিতার দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখে আশ্চার্যান্বিত হলাম। এ দ্বারা বুঝা গেলো, হযরত আলী (রা) এর অভ্যাস ছিল বসে পানি পান করার এবং হাদীসে বসে পানি পান করতেই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তিনি উযূর অতিরিক্ত পানিকে দাঁড়িয়ে পান করলেন, যা তাঁর অভ্যাসের পরিপন্থী। এ কারণে হুসাইন (রা) বিস্ময় প্রকাশ করেন।

অতঃপর আলী (রা) যখন এটা অনুধাবন করলেন, তখন বললেন, হে প্রিয় বৎস! আশ্চার্য হওয়ার কি আছে? আমি তো তোমার প্রিয় নানাজান নবী করীম (স) কে এভাবে পানি পান করতে দেখেছি : যেমনটা আমি করেছি এবং আমি রাসূলের অনুসরণেই এ আমল করেছি।

আলোচ্য হাদীসের উপর ভিত্তি করে উলামায়ে কিরাম লিখেন যে, দাঁড়িয়ে পানি পান করার বিষয়টি উযূর অবশিষ্ট পানির সাথেই খাস। এটাকে মুস্তাহাবও বলা হয়।

صاحب بُرهان এর বক্তব্য : صاحب بُرهان বলেন, উযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা উযূর মুস্তাহাব এর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে যমযমের পানিও দাঁড়িয়ে পান করার অনুমতি আছে এবং এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ দু'প্রকারের পানি ব্যতীত অন্যান্য পানি দাঁড়িয়ে পান করা মুনাসিব নয়। কেননা, এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে।

আলোচ্য হাদীসের ব্যাপারে আল্লামা সিন্ধী (র) এর বক্তব্য : আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, বিশুদ্ধ কথা এটাই যে, এ দু' প্রকারের পানি ব্যতীত অন্যান্য পানিও দাঁড়িয়ে পান করার অনুমতি আছে এবং এটা হাদীস দ্বারাও সমর্থিত। কাজেই যে সকল হাদীসে দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। তার দ্বারা মাকরূহে তানযীহী উদ্দেশ্য। দাঁড়িয়ে পানি করতে নিষেধ করার কারণ হলো এর দ্বারা কিডনীর ক্ষতি হয় এবং লিঙ্গে দুর্বলতা দেখা দেয়। আর যে সকল রেওয়ায়াতে দাঁড়িয়ে পানি পান করার প্রমাণ পাওয়া যায় তার দ্বারা بيان جواز তথা দাঁড়িয়ে পানি পান করা যে জায়েয এটা বুঝানো উদ্দেশ্য। والله اعلم

আলোচ্য হাদীসের ব্যাপারে মোল্লা আলী ক্বারী (র) এর বক্তব্য : মোল্লা আলী ক্বারী (র) বলেন, এ দুটিকে পৃথক করার কারণ হয়তবা এটা যে, যমযমের পানি পান করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পিপাসা নিবারণ করা, পরিতৃপ্ত হওয়া এবং তাঁর বরকত শরীরের সর্বাঙ্গে পৌঁছে দেয়া। অনুরূপভাবে উযূর বেঁচে যাওয়া পানি পান করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ظاهرى ও باطنى পবিত্রতা অর্জন করার সাথে সাথে তার বরকত সর্বাঙ্গে পৌঁছে দেয়া। আর এ উভয়টি দাঁড়িয়ে পান করার দ্বারা উত্তমরূপে হাসিল হয়। (শরহে উর্দূ নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১৭২)

سوال : إِدْفَعِ التَّعَارُضَ بَيْنَ حَدِيثِ أَبِى هُرَيرة رضى قال قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لاَيَشْرَبَنَّ أَحَدُكُم قَائِمًا ـ الخ (مشكوة ٣٧٠)

প্রশ্ন : আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বলেছেন তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে এবং আলী (রা) এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় তিনি যোহরের নামায আদায় করলেন, অতঃপর জনগণের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ শোনার জন্য কূফার মসজিদের আঙ্গিনায় বসলেন। এমনকি আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পাত্রের অবশিষ্ট পানি পান করলেন। পরে বললেন, লোকেরা দাঁড়িয়ে পান করাকে মাকরূহ মনে করে অথচ আমি যেরূপ করেছি নবী (স)ও অনুরূপ করেছেন। এই দুই হাদীসের মধ্যকার বৈপরীত্যের সমাধান দাও।

উত্তর : বৈপরীত্যের সমাধান : ১. আলিমগণ বলেন, দুই প্রকার পানি ব্যতীত অন্যান্য পানির ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য।

১. যমযমের পানি تعظيم এর উদ্দেশ্য এবং উযূর অবশিষ্ট পানি বরকত লাভের উদ্দেশ্যে দাঁড়ায়ে পান করা বৈধ।

২. যে হাদীসে দাঁড়ায়ে পান করতে নিষেধ করা হয়েছে তার দ্বরা নাহীয়ে তানযীহী উদ্দেশ্য এবং যে হাদীস দ্বারা দাঁড়িয়ে পান করা বৈধ মনে হয় তা জায়েযের বিবরণ স্বরূপ ছিল।

৩. আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেন, রাসূল (স) যে যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন এটা প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে ছিল অথবা জায়গাটা ভিজা থাকার কারণে দাঁড়িয়ে পান করেছেন অথবা জায়গা সংকুলন না হওয়ার কারণে দাঁড়িয়ে পান করছেন। (ইযাহুল মিশকাত চতুর্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ৪২১-৪২২, মেরকাত অষ্টম খণ্ড পৃষ্ঠা ২১৬, তানযীমুল আশতাত পৃষ্ঠা ১২৭, দরসে মিশকাত পৃষ্ঠা ১৫২)

عَدَدُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ

৯৬. اخبرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيدٍ قال حدّثنا ابو الاَحْوَصِ عن ابى إسحاقَ عن ابى حَيَّةَ وَهُوَ ابنُ قَيْسٍ قال رأيتُ عليًّا توضّأ فغسل كفّيه حتّى أنْقَاهُمَا ثم تَمَضْمَضَ ثلثًا وغسل وجهَهُ ثلثًا وغسل ذِراعَيْه ثلثًا ثلثًا ثمّ مَسَحَ بِراسِه ثمّ غسل قَدَمَيْه إلى الكَعْبَيْنِ ثم قامَ فاَخَذَ فَضْلَ طَهُوْرِه فشَرِبَ وهُو قائمٌ ثم قال اَحْبَبْتُ اَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ طُهُوْرُ النبيِّ ﷺ.

হাত কতবার ধৌত করবে?

অনুবাদ ঃ ৯৬. কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)..........আবু হাইয়া ইবনে কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি (সর্বপ্রথম) হাতের কব্জি পর্যন্ত অত্যন্ত পরিষ্কার করে ধৌত করলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন ও তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করলেন। পরে মাথা মাসেহ করলেন এবং উভয় পা গোঁড়ালী পর্যন্ত ধৌত করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে উযূর অবশিষ্ট পানি পান করলেন এবং বললেন, নবী (স)-এর উযূর পদ্ধতি কিরূপ ছিল, আমি তা তোমাদেরকে দেখাতে ভালবাসি। (তাই আমি তোমাদের উযূ করে দেখালাম)।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসের রাবী সম্পর্কে আলোচনা ঃ আলোচ্য হাদীসেমর রাবী আবু হাইয়া ইবনে কায়স এর হাদীসকে ইবনুস সাকান প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। ইবনুল জারুদ الكنى নামক গ্রন্থে লেখেন যে, ইবনুল নুমাইর তাকে সিকা তথা গ্রহণযোগ্য রাবী সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে হিব্বান প্রমূখ মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাকে সিকা রাবীদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আলোচ্য হাদীসের মূল বক্তব্য হলো হাত কতবার ধৌত করতে হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা। পূর্ববর্তী হাদীসে যদিও এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ইমাম নাসায়ী আলোচ্য হাদীসের স্বতন্ত্র একটি শিরোনাম কায়েম করে উক্ত হুকুমকে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য হাদীসের সাথে অনুচ্ছেদের শিরোনামের যোগসূত্র ঃ হযরত আলী (রা) উভয় হাতকে ধৌত করেছেন। কিন্তু কতবার ধৌত করেছেন সে কথা উল্লেখ নেই। বরং শুধুমাত্র حتّى أنْقَاهُمَا শব্দ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি উভয় হাতকে ধৌত করতেন যাবৎ না তা পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, أنقى শব্দটি إنقاء থেকে গৃহীত। আর কোন বস্তুকে তিনবার ধৌত করার দ্বারাই انقاء হাসিল হয়। আর পূববর্তী রেওয়ায়াতে এটাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু حتّى انقاهما তিনবার ধৌত করার অর্থ প্রদান করে। কারণেই মুসান্নেফ (র) আলোচ্য শিরোনামের অধীনে উক্ত হাদীসকে এনেছেন। ঠিক তদ্রুপ এরও সম্ভাবনা আছে যে, মুসান্নিফ (র) غسل اليدين দ্বারা غسل الذِّراعَيْنِ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মোটকথা, অধনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে হাদীসের যোগ্যসূত্র সুস্পষ্ট।

قوله مَسَحَ بِرَأْسِه .. الخ ঃ মাথা মাসেহ করা এবং পা ধৌত করার কোন সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু পূর্বের হাদীসে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রতীয়মান হলো যে, আলোচ্য রেওয়ায়াতটি মুজমাল। কাজেই উসূলের মূলনীতি মুতাবেক তাকে مفصل হাদীসের উপর প্রয়োগ করতে হবে। হযরত আলী (রা) উযূ সম্পন্ন করার কথা বলেছিলেন।

احببتُ انْ أُرِيكم ... الخ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমার উযূ করার কোন প্রয়োজন নেই এবং নামায আদায় করার ও ইচ্ছা করিনি, যে তার জন্য আমি উযূ করব, কিন্তু ইচ্ছা করলাম তোমাদেরকে রাসূল (স)এর উযূর বিবরণ শিক্ষা দেয়ার। আর তা হলো যা তোমরা এখন দেখলে।

بَابُ حَدِّ الغَسْلِ

٩٧. اخبرنا محمدُ بْنُ سلمَةَ والحارثُ بْنُ مسكينٍ قراءةً وانا اسمعُ واللفظُ لهُ عن ابن القاسم قال حدّثني مالكٌ عن عمرو بن يحيى المازنيّ عن ابيه انّهُ قال لعبدِ اللهِ بن زيدِ بن عاصمٍ وكانَ منْ اصحابِ النبيِّ ﷺ وهو جدُّ عمرو بن يحيى هل تستطيعُ انْ تريني كيفَ كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يتوضَّأُ قالَ عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ نعمْ فدعا بوضوءٍ فافرغَ على يديهِ فغسلَ يديهِ مرَّتينِ مرّتينِ ثمّ تمضمضَ واستنشقَ ثلثًا ثمّ غسلَ وجههُ ثلثًا ثم غسلَ يديهِ مرّتينِ مرّتينِ الى المرفقينِ ثمّ مسحَ رأسهُ بيدهِ فاقبلَ بهما وادبرَ بدأَ بمقدَّمِ رأسهِ ثمّ ذهبَ بهما الى قفاهُ ثمّ ردَّهما حتّى رجعَ الى المكانِ الّذى بدأَ منهُ ثم غسلَ رجليهِ -

অনুচ্ছেদ ঃ ধৌত করার সীমা

অনুবাদ ঃ ৯৭. মুহাম্মদ ইবনে সালামা ও হারিস ইবনে মিসকীন (রা)............থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ ইবনে আসিম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (স) কিভাবে উযূ করতেন, আপনি আমাকে তা দেখাতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখাতে পারি। এ বলে তিনি পানি আনতে বলেন। পানি আনা হলে তিনি হাতে পানি ঢালেন এবং উভয় হাত দু'দুবার করে ধৌত করেন। তিনবার কুলি করেন ও তিনবার নাকে পানি দেন। পরে মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন এবং উভয় হাত দু'বার করে কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। তারপর দু'হাতে মাথা মাসেহ করেন। একবার দু'হাত পিছনে নেন, আর একবার মাথার সামনের দিকে আনেন। মাথার সামনের দিক হতে শুরু করে পেছনে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যান। আবার হাত ফিরিয়ে আনেন, মাথার যে স্থান থেকে মাসেহ শুরু করেছিলেন সে স্থান পর্যন্ত। পরিশেষে উভয় পা ধৌত করেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসের رجال সম্পর্কে আলোচনা ঃ

قوله عن عمرو بن يحيى المازنى ঃ আলোচ্য হাদীসের রাবী হলো عمرو بن يحيى ابن عمارة بن ابى حسن انصارى مازنى مدنى ইনি সিহাহ সিত্তার রাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবু হাতেম তাকে সিকা সাব্যস্ত করেছেন এবং তাকে সৎ ও যোগ্য রাবী বলেছেন। ইমাম নাসায়ী, ইমাম আজলী এবং ইবনে নুমায়ের তাকে নির্ভরযোগ্য রাবী সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে সা'দ (র) বলেন, তিনি সিকা ও অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। অনুরূপভাবে ইবনে হিব্বান (র) সহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণও তাকে সিকা রাবীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

قوله عن ابيه ঃ তাঁর পিতা হলো يحيى بن عمارة ابن ابى حسن انصارى তিনিও সিহাহ সিত্তার একজন রাবী। ইবনে ইসহাক, ইমাম নাসায়ী ও ইবনে খিরাশ তাকে সিকা রাবী সাব্যস্ত করেছেন এবং ইবনে হিব্বান ও তাকে সিকা রাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

قوله عبد الله بن زيد بن عاصم ঃ ইনি সাহাবী ছিলেন এবং আনসারী ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আবু আহমদ হাকেম ইবনে মানদাহ বলেন, তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইবনে আব্দুল বার মালেকী বলেন। তিনি বদর যুদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য যুদ্ধ যেমন– ওহুদ যুদ্ধসহ

বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি হুজুর (স) থেকে উযূ সম্পর্কিত হাদীস এবং এটা ব্যতীত অন্যান্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসায়লামা তার ভাই حبيب بن زيد কে কতল করেছিল। অতঃপর যখন তার পরে ইয়ামামা যুদ্ধের জন্য লোক বের হল, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ, হযরত ওয়াহশী ইবনে হারব (রা) এর সাথে মুসায়লামার হত্যায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৬৩ হিজরীর يوم الحرة তে মারা যান। (ইসাবা)

ইমাম মালেক (র) এর রেওয়ায়াত দ্বারা যা ইমাম নাসায়ী তার উস্তাদ মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা এবং হারেস ইবনে মিসকীন থেকে ইবনে কাসেম এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে প্রশ্ন করেছেন ইয়াহইয়া ইবনে উমরাহ এবং এ ব্যাপারে উতবা ইবনে আব্দুল্লাহ ও ইবনে কাসেমের موافقت করেন, যা আগত শিরোনামের হাদীস থেকে বুঝা যায়। অনুরূপভাবে আবু দাউদ ইমাম মালেক থেকে বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা এবং ত্বহাবী শরীফে ইমাম মালেক (র) থেকে বর্ণনাকারী ইবনে ওহাবও ইবনে কাসেম এর موافقت তথা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্নকারী কে?

১. প্রশ্নকারী হলো يحيى بن عمارة তবে মুয়াত্তার অধিকাংশ রেওয়ায়াতে প্রশ্নকারীর নামকে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। তাতে إنَّ رجُلاً قال لعَبدِ الله بن زيدٍ বলা হয়েছে। আর যেখানে প্রশ্নকারী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে يحيى بن يحيى এর রেওয়ায়াতে يحيى بن عماره এর দিকে নিসবত করা হয়েছে।

২. ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর রেওয়ায়াতে প্রশ্নকারী আবুল হাসানকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। মা'আন ইবনে ঈসা এর রেওয়ায়াতেও প্রশ্নকারী তাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৩. বুখারীতে উহায়ব এর রেওয়ায়াতে প্রশ্নকারী عمرو بن ابى حسن বলা হয়েছে, অনুরূপভাবে দারাকুতনীর রেওয়ায়াতেও যা محمد بن فُلَيْح بْن سليمان মাধ্যমে বর্ণিত তাতে প্রশ্নকারী عمروبن ابى حسن বলা হয়েছে।

ইবনে হাজার আসকালানী (র) মতানৈক্যের সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করেছেন

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) উক্ত মতানৈক্যের সমন্বয় সাধন করেন নিম্নরূপে– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ এর মজলিসে তিন ব্যক্তি ছিলেন-

১. আবু হাসান আনসারী।

২. তার ছেলে আমর ইবনে আবু হাসান।

৩. তার নাতি ছেলে ইয়াহইয়া ইবনে উমারাহ ইবনে আবু হাসান।

এ সকল ব্যক্তিবর্গ হুজুর (স) এর উযূর কাইফিয়্যাত বা ধরণ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদকে জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাদের মধ্য হতে আমর ইবনে আবু হাসান প্রশ্ন করেছিল। সুতরাং যেখানে জিজ্ঞাসা করার সম্বন্ধ আমর ইবনে আবু হাসান এর দিকে করা হয়েছে সেখানে বাসাতবের ভিত্তিতে করা হয়েছে এবং যেখানে তার পিতা আবু হাসানের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে সেখানে রূপকভাবে করা হয়েছে। কেননা, তিনি বয়সের দিক দিয়ে বড় ছিলেন এবং উক্ত অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন।

আর যেখানে ইয়াহইয়া ইবনে উমারা এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে সেখানেও রূপকভাবে করা হয়েছে। কারণ সে উক্ত হাদীসের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত এবং জিজ্ঞাসা করার সময়ও সে উপস্থিত ছিল। সমন্বয় সাধন করার এই পদ্ধতিটি খুবই উত্তম। এর দ্বারা মতানৈক্যও শেষ হয়ে যায় এবং সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়।

قوله وهو جدُّ عمروبْن يحيى ঃ هو এর مرجع কি? বাহ্যিকভাবে বুঝা যাচ্ছে هو যমীরের مرجع হলো عبد الله بن زيد। অর্থাৎ সে আমর ইবনে ইয়াহইয়া এর দাদা। অথচ এটা ভুল। আর এ ভুলটা ঐ সমস্ত রেওয়ায়াতের কারণেই সংঘঠিত হয়েছে। বিশুদ্ধ বক্তব্য ঐটাই যা বুখারী শরীফে আছে। তা হল–

عن ابيه ان رجلا قال لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زيدٍ هُوَ جَدُّ عمروبن يحيى

এখন এই রেওয়ায়াত মুতাবেক যমীরের مرجع হলো ঐ ব্যক্তি যে প্রকৃতপক্ষে জিজ্ঞাসাকারী। আর সে হলো

আমর ইবনে আবু হাসান যে ইয়াহইয়া ইবনে উমারা ইবনে আবু হাসান এর চাচা ছিলেন। আবু হাসানের দু'জন সন্তান ছিল। ১. আমর ও ২. উমারা।

এখন প্রশ্ন হলো এ ব্যাখ্যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, জিজ্ঞাসাকারী হলো আমর ইবনে আবু হাসান, কোনভাবেই আমর ইবনে ইয়াহইয়ার দাদা নয়। বরং দাদা উমারা ইবনে আবু হাসান তো যেমনভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদের দাদা আমর ইবনে ইয়াহইয়া হওয়া সহীহ নয়, ঠিক তদ্রূপ আমর ইবনে আবু হাসানও তার দাদা হওয়া বিশুদ্ধ নয়।

উত্তর ঃ এর উত্তর হল, এ কথাতো যথার্থই যে, আমর ইবনে আবু হাসান আমর ইবনে ইয়াহইয়ার হাকীকী দাদা নয়, কিন্তু আমর ইবনে ইয়াহইয়ার রূপকার্থে দাদা তো হতে পারে। কেননা, সে তার দাদার ভাই এবং নিজের পিতার চাচা। কারণ আমর ইবনে ইয়াহইয়ার প্রকৃত দাদা হলো উমারা। আর আমর ইবনে আবু হাসান উভয়ে সহোদর ভাই ছিল। কাজেই جد শব্দের প্রয়োগ আমর ইবনে আবু হাসানের উপর রূপকার্থে হবে, এখন আর কোন প্রশ্ন থাকে না।

قوله ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ঃ আলোচ্য হাদীসে এসেছে ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا যে, রাসূল (স) এর নাকে ও মুখে তিনবার পানি দিয়েছেন। এটা আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদের হাদীস, বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থেও এ হাদীসটি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সামান্য শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ এর পরে مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ শব্দ এসেছে, আর নাসায়ী শরীফের রেওয়ায়াতে ثلاثا এবং বুখারী ও মুসলিম এর রেওয়ায়াতে فَفَعَلَ ذَالِكَ ثَلَاثًا শব্দ এসেছে। এর উদ্দেশ্য হলো হযরত আব্দুল্লাহ এক অঞ্জলী দ্বারাই উভয়টি কাজ সম্পাদন করেন এবং তিনি তিনবার এমন করেন। এতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া তিন তিনবারই হয়। কিন্তু তিন অঞ্জলি পানি নেন। এটাই وصل এর সুরত এবং এটাই ইমাম শাফেয়ী (র) এর মাযহাব। তিনি তার গ্রন্থ কিতাবুল উম্ম এর মধ্যে এটা বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ইমাম মাযনী (র) বলেন, ইমাম শাফেয়ী, (র) এর নিকট وصل উত্তম অর্থাৎ উভয়টা তিন কোষ পানি দ্বারা করা ভাল। আর তা এভাবে যে, এক অ লির কিছু অংশ পানি দ্বারা কুলি করবে এবং অবশিষ্টাংশ পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করবে। এভাবে তিনবার করবে।

কাযী আয়ায (র) ইমাম মালেক (র) থেকে وصل এর একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। মুগনী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইমাম আহমদ (র) গ্রহণযোগ্য মত এটাই। উলামায়ে আহনাফ فصل কে উত্তম বলেন, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কোষের পানি দ্বারা কুলি করবে এবং নাকে পানি দিবে অর্থাৎ ছয় কোষ পানি দ্বারা কুলি করবে এবং নাকে পানি দিবে। ইমাম মালেক (র) থেকেও এমন একটি বর্ণনা আছে। এটাই ইমাম তিরমিযী (র) ইমাম শাফেয়ী (র) হতে বর্ণনা করেছেন। যদি কুলি ও নাকে পানি দেয়ার বিষয়টি এক অঞ্জলি পানি দ্বারা সম্পন্ন করা হয় তাহলে তা জায়েয। وان فرقهما احب الينا কিন্তু নতুন পানি দ্বারা প্রত্যেকটিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে ধৌত করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র) এর পূর্বের উক্তি। আর এটাই আহনাফের বক্তব্য।

ইমাম শাফেয়ী (র) শিষ্য بويطى এবং زعفرانى ভিন্নভাবে পানি নিয়ে নাকে মুখে পানি দেওয়াকে উত্তম বলেন, এখানে زعفرانى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আবু আলী হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাবাহ। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী (র) এর কিতাব جامع الصغير এবং زيادات বিন্যাস্ত করেন।

মোটকথা, ইমাম শাফেয়ী (র) এর পূর্ববর্তী উক্তি এবং আবু হানীফা (র) এর বক্তব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বরং উভয়টা একই কিন্তু শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ও তাঁর শেষ উক্তিতে وصل কে উত্তম বলা হয়েছে। আর فصل এর সুরতকে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু তিনি বলেন وصل উত্তম হবে তখন যখন তিন কোষ পানি দ্বারা নাকে মুখে একত্রে পানি দেবে।

শাফেয়ীদের দলীল ঃ শাফেয়ী মাযহাবের প্রথম দলীল হলো আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদের হাদীস যা নাসায়ীর রেওয়ায়াত রয়েছে যে, ثم تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا

২. বুখারী ও অন্যান্য কিতাবের রেওয়ায়াত হল- فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَالِكَ ثَلَاثًا -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল (স) উভয় কাজকে এক অঞ্জলি পানি দ্বারা সম্পন্ন করেছেন এবং এমন তিনবার করেছেন।

শায়খ ইবনে হুমামের বক্তব্য ঃ শায়খ ইবনে হুমাম (র) ইমাম শাফেয়ী (র) -এর উক্ত বক্তব্যের জবাব দেন যে, ব্যাখ্যাটা এভাবেও করা যায় যে, রাবী مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ দ্বারা এ কথা বলছেন যে, কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার জন্য উভয় হাতকে ব্যবহার করবে না, বরং উভয় কাজের জন্য এক হাত ব্যবহার করবে।

অথবা, এর দ্বারা تعاقب এর নফী করা উদ্দেশ্য। যেমন- কতক লোক ধারণা করে যে, কুলি ডান হাত দ্বারা করতে হবে। আর নাকে পানি দিবে বাম হাত দ্বারা। তাদের এ ধারণাকে অপনোদন করা উদ্দেশ্য যে, ডান হাত দ্বারা কুলি করবে এবং উক্ত ডান হাত দ্বারাই নাকে পানি দিবে; বাম হাত দ্বারা নয়।

ইবনে মিলক এর বক্তব্য ঃ ইবনে মিলক বলেন, এ تنازع فعلين তথা দুটি ফে'ল পরস্পর আমলের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব করার কারণে এমনটা হয়েছে। বাক্যের ধরণ হবে এমন- تَمَضْمَضَ مِنْ كَفٍّ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ

আর واحدة এর যে কয়েদ বৃদ্ধি করা হয়েছে এটা قيد احترازى , এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, تثنية কে খণ্ড করা। অর্থাৎ কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার কাজ এক হাত দ্বারাই সম্পাদন করেছেন, অন্য হাতকে মিলায়ে নয় (মেরকাত)।

শায়খ ইবনে হুমামের ব্যাখ্যার উপর শাফেয়ীগণের মন্তব্য

শায়খ ইবনে হুমাম (র) যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, এটা উল্লেখিত হাদীসের ক্ষেত্রে চলতে পারে। কিন্তু এ রেওয়ায়াত ভিন্ন শাফেয়ীগণ এমন আরো রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যেখানে তাবীলের কোন অবকাশ নেই। যেমন-

নাসায়ী শরীফে مسح الأذنين এর শিরোনামের অধীনে হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة

অনুরূপভাবে মুসতাদরাকে হাকেমসহ অন্যান্য গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (র) এর স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান রয়েছে- وجمع بين المضمضة والاستنشاق

আবু দাউদে হযরত আলী (রা) এর একটি হাদীস রয়েছে যার রাবী হলো আব্দে খায়ের, সেখানে স্পষ্টভাবে بماء واحد শব্দ উল্লেখ রয়েছে। এ সকল রেওয়ায়াতে তাবীল করার কোন প্রকার অবকাশ নেই। এর দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, وصل উত্তম এবং এর দ্বারা وصل ই সাব্যস্ত হয়।

হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) এর বক্তব্য

হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, উত্তম তো এটাই যে, উক্ত হাদীসের কোন প্রকার তাবীল না করা এবং এটা বলা যে, আসল সুন্নত جمع এর সুরতে (তথা নাক মুখে এক সাথে পানি দেয়ার সুরতে) আদায় হয়ে যায়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সুন্নত আদায় হয় না। বরং পৃথক পৃথকভাবে নাকে মুখে পানি দেয়ার দ্বারাই পূর্ণাঙ্গ সুন্নত আদায় হয় এবং এভাবে তিন বার করতে হবে। এ কারণে হাফেজ আল্লামা আঈনী (র) হাদীসের উল্লেখিত পদ্ধতিকে বৈধতার উপর প্রয়োগ করেছেন।

হযরত শাহ সাহেব এটাও বলেন যে, সিফাতে উযূ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ দেখেছিলেন এবং তার দেখা অনুপাতেই جمع এর সুরত বর্ণনা করেছেন। শাহ সাহেব বলেন, আমার মনে হয় এটা একটি واقعة جزئيه থেকে গৃহীত এবং একটি جزئى فعل কে নকল করেছেন। যেখানে ব্যাপকতার অবকাশ নেই। সুতরাং আব্দুল আজিজ ইবনে আবু সালামার রেওয়ায়াত যা বুখারীর بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْغَضَبِ এর অধীনে আনা হয়েছে তা এ ব্যাপারে প্রমাণ। তাতে এসেছে-

اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَاَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِى تَوْرٍ مِنْ صفرٍ فَتَوَضَّأَ الخ

প্রবল ধারণা ঐ ঘটনাই যা আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদের মাতা উমারাহ বিনতে কা'ব রেওয়ায়াত করেছেন. (উম্মে উমারাহ এর নাম نسيبه তার স্বামীর নাম যায়েদ ইবনে আছিম, তার দুই সন্তান ছিল। এক জনের নাম حبيب এর অপর জনের নাম عبد الله (الاصابه بحافظ ابن حجر)

উম্মে উমারাহ এর বর্ণনায় এসেছে–

انّ النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم توضّأ بماءٍ فِى اناءٍ قدْرَ ثُلُثَي المُدِّ الخ

এ রেওয়ায়াত নাসায়ীতে بابُ القدرِ الّذِى يُكْتَفى به الخ এর অধীনে অতিবাহিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদের হাদীসে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা فعل جزئى এর ঘটনা। কাজেই তাকে বৈধতার উপর প্রয়োগ করতে হবে; اكمال وضوء ও اتمام وضوء এর এর উপর নয়। যেমন– সামনের হাদীসে আসছে যে ,রাসূল (স) দু'বার হাত ধৌত করার উপর ইকতেফা করেছেন। অথচ দু'বার ধৌত করাকে স্বয়ং ইমাম সাহেবও সুন্নত বলেন, না বরং তিনবার ধৌত করা সুন্নত এ ব্যাপারে সকলে একমত। কাজেই দু'বার ধৌত করার ব্যাপারে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাকে কামেল উযূর উপর প্রয়োগ করতে হবে। এটা সম্ভব যে পানির স্বল্পতার কারণে রাসূল (স) وصل এর সুরতের উপর ক্ষ্যান্ত করেছেন। উম্মে উমারাহ এর হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ হুজুর (স) যখন উযূর ইচ্ছা করতেন তখন এক মুদ্দ এর দুই তৃতীয়াংশ পানি তার সামনে পেশ করা হত। আর হুজুর (স) এর অভ্যাস ছিল এক মুদ্দ পানি দ্বারা উযূ করা। কাজেই পানির এ পরিমাণটা কম, এর দ্বারা সুন্নত তরিকায় উযূ করা মুশকিল। কাজেই এ সুরতে তিনি এক অঞ্জলি পানি দ্বারা উভয় কাজকে সম্পাদন করেছেন। আর এটা হলো وصل এর সুরত। তাই এতে কোন সমস্যা নেই। আর আমরা যে বললাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ একটি فعل جزئ কে বর্ণনা করেছেন। فعل دائمى নয় এর সমর্থন পাওয়া যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) এর এ উক্তি দ্বারা যা ইমাম মালেক (র)ও বলে থাকেন। ইমাম মালেক (র) এর রেওয়ায়াতটি عن عمرو بن يحيى المازنى عن ابيه এর সূত্রে বর্ণিত। এতে এসেছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (র) কে জিজ্ঞেস করল যে; রাসূল (স) কিভাবে উযূ করতেন? আপনি কি আমাকে তা দেখাতে পারবেন? হযরত আব্দুল্লাহ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। فدعا فدعا بتور من ماء بماء ...الخ এর পর হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, وهيب এর রেওয়ায়াতে এবং আব্দুল আজিজ ইবনে আবু সালামা এর রেওয়ায়াতে এসেছে –

اَتَانا رسولُ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلم فاَخْرَجْنَا لَهٗ ماءً فِى تَوْرٍ مِنْ صفرٍ

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, এটা সম্ভব যে. উল্লেখিত تور (এক প্রকার ছোট পাত্র) ঐটাই যার দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদেন নিকট কেউ রাসূল (স) এর উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হুজুর (স) এর উযূর ন্যায় উযূ করে দেখাতেন, যাতে হুজুর (স) এর উযূ করার ঘটনাটি পূর্ণাঙ্গরূপে বিবৃত হয়। এখন বাকী থাকলো হানাফী আলিমগণ যে فصل এর প্রবক্তা যেমনটা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে এ বিষয়ে তাদের দলীল কি?

এর ব্যাপারে আমরা বলব যে, এ বিষয়ে তথা فصل সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আমাদের নিকট প্রমাণ রয়েছে। যেমন– ১. নাসায়ী শরীফে عدد غسل اليدين এর শিরোনামের অধীনে হযরত আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত হযরত আবু হাইয়্যার হাদীস পেছনে অতিবাহিত হয়েছে। এখানে ثم تَمَضْمَضَ ثلاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثلاثًا শব্দ এসেছে, ইমাম তিরমিযী (র)ও এটা বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন।

২. দ্বিতীয় দলীল : আবু দাউদ শরীফে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক বর্ণিত ইবেন আবী মুলাইকার হাদীস–

فتَمَضْمَضَ ثلاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثلاثًا

আল্লামা নববী (র) এ হাদীসের সনদকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

৩. তৃতীয় দলীল হলো طبرانی اوسط গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক রেওয়ায়াতকৃত হযরত রাশেদের হাদীস। এখানে এসেছে, ثم تَمَضْمَضَ ثَلاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلْثًا

আল্লামা হায়সামী (র) বলেন, এ হাদীসের সনদ হাসান পর্যায়ের।

৪. চতুর্থ দলীল ঃ ত্বরানী শরীফে طلحه بن مصرف عن ابيه عن جده এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثلاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثلاثًا يَاْخُذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَاءً جَدِيْدًا

অনুরূপভাবে এটা আবুদাউদ শরীফেও বর্ণিত আছে এবং এই হাদীসের উপর باب الفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ والاستنشاق এর শিরোনাম কায়েম করেছেন। এখানে يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ এর শব্দ এসেছে যে, তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উভয়টিকে পৃথক পৃথকভাবে করতেন।

৫. পঞ্চম দলীল ঃ এটা হানাফী মাযহাবের উপর প্রমাণ বহনকারী সর্বাধিক স্পষ্ট দলীল। তা হলো ইবনুস সাকানের রেওয়ায়াত যা তিনি তার "সহীহ" নামক গ্রন্থে এনেছেন। এতে শাকীক ইবনে মাসলামা বলেন যে, আমি হযরত আলী ও হযরত উসমানকে উযূ করতে দেখেছি। তাঁরা তিন তিনবার করে প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করেছেন। উক্ত রেওয়ায়াতে আছে যে, وَاَفْرَدَ الْمَضْمَضَةَ مِنَ الْاِسْتِنْشَاقِ, অর্থাৎ তিন তিন অঞ্জলি পানি দ্বারা এ দুটি সম্পাদন করেন। অতঃপর বলেন হুজুর (স) কে আমরা এভাবে উযূ করতে দেখেছি।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) তালখীসুল হাবীর নামক গ্রন্থে এটা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি উক্ত হাদীসের উপর সহীহ দ্বয়ীফ বা হাসান কোন হুকুম বর্ণনা করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় হাদীসটি তার নিকট গ্রহণীয় ও সহীহ। কেননা, যদি তার মধ্যে কোন ধরণের ضعف থাকতো তাহলে অবশ্যই তার উপর তিনি তানবীহ করতেন, নিশ্চুপ থাকতেন না। কারণ তার প্রসিদ্ধ অভ্যাস হল, যদি কোন হাদীসের মধ্যে ত্রুটি থাকে তাহালে তাকে উল্লেখ করে দেন। এ হাদীসকে গাইরে মুকাল্লিদগণ বিশুদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করেননি। এর কারণ হলো ইবনে হাজার আসকালানী (র) উক্ত হাদীসের উপর কোন হুকুম লাগাননি। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদগণের একথা গ্রহণযোগ্য নয় বরং এটা অযৌক্তিকও বটে। মোটকথা, এ হাদীসটি সহীহ এবং গ্রহণযোগ্য। কেননা, ইবনুস সাকান এটাকে সহীহ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যাক্ত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ইবনে হাজার আসকালানী (র) ও তালখীসুল হাবীর নামক গ্রন্থে এটাকে উল্লেখ করেছেন এবং এ ব্যাপারে কোন হুকুম আরোপ করেননি। বরং নিরবতা অবলম্বন করেছেন, অথচ তার প্রসিদ্ধ অভ্যাস হলো হাদীসের ত্রুটি বর্ণনা করা, এ সকল বিষয় এ কথার প্রমাণ যে, হাদীসটি তার নিকট গ্রহণযোগ্য। বরং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) এ হাদীসের দ্বারা ইবনুস সালাহর বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। ইবনুস সালাহ বলেন, হযরত আলী (রা) থেকে فصل প্রমাণিত নেই। তখন ইবনে হাজার আসকালানী (র) উক্ত হাদীসকে উল্লেখ করে তার দাবীকে খণ্ডন করেছেন যে, হযরত আলী (রা) থেকে فصل প্রমাণিত আছে। এটাই এ কথার প্রমাণ যে, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) উক্ত হাদীসকে সহীহ মেনে নিয়েছেন। কাজেই গায়রে মুকাল্লিদগণের উক্ত হাদীসকে অস্বীকার করা ভিত্তিহীন ও অগ্রহণযোগ্য কথা।

মোটকথা, উলেখিত হাদীসগুলো দ্বারা فصل সাব্যস্ত হলো এবং وصل ও সাব্যস্ত হল। এখন শুধুমাত্র ترجيح এর সুরত বাকী থাকল। কাজেই যে হাদীসগুলো কিয়াসের মুওয়াফেক হবে সেগুলো প্রাধান্য পাবে। এটা উসূলে ফিকহ এর মূলনীতি। হানাফী মাযহাব অবলম্বীগণ فصل কে একারণে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন যে, এটা কিয়াসের অনুকুলে। কেননা, নাক ও মুখ ভিন্ন অঙ্গ। কাজেই কিয়াসের তাগাদা হলো উভয়টা একত্রে করা যাবে না। যেমনিভাবে অন্যান্য উযূর ক্ষেত্রে একত্রে করা হয় না। উল্লিখিত সমস্ত হাদীস এবং কিয়াসের আলোকে হানাফীগণের মাযহাব সুদৃঢ় হয়।

بَابُ صِفَةِ مَسْحِ الرَّاسِ

٩٨. اخبرنا عتبة بن عبد الله عن مالك هو ابن انس عن عمرو بن يحيى عن ابيه انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ قال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فافرغ على يده اليمنى فغسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذى بدا منه ثم غسل رجليه -

অনুচ্ছেদ ঃ মাথা মাসেহ করার পদ্ধতি

অনুবাদ ঃ ৯৮. উতবা ইবনে আবদুল্লাহ (র)............ইয়াহয়া মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আসিম মাযিনী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) কিভাবে উযূ করতেন তা আমাকে দেখাতে পারেন? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হ্যাঁ, এরপর তিনি পানি আনতে বলেন। পানি আনা হলে তিনি ডান হাতে পানি ঢালেন এবং দু'বার করে উভয় হাত ধৌত করেন এবং দু'বার উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে দু'হাতে মাথা মাসেহ করেন। একবার সামনে আনেন একবার হাত পেছনে নেন, আর মাথার অগ্রভাগ হতে শুরু করেন এবং উভয় হাত পেছনে ঘাড় পর্যন্ত নেন। আবার মাসেহ যে স্থান থেকে শুরু করেন সে স্থান পর্যন্ত উভয় হাত ফিরিয়ে আনেন। তারপর উভয় পা ধৌত করেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসটি পূর্বের শিরোনামের আধীনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে ঐটাই ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নাসায়ী (র) এর অভ্যাস হলো একটি হাদীসকে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেন। কিন্তু প্রত্যেক জায়গায় শিরোনামটা উক্ত মাসআলার এতেবারে করে থাকেন। যে মাসআলাকে তিনি উক্ত হাদীস থেকে ইস্তিম্বাত করার ইচ্ছা করেন। যেহেতু আলোচ্য হাদীসে মাথা মাসেহ করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। কাজেই তাকে সামনে রেখে শিরোনাম কায়েম করা হয়েছে।

আলোচ্য হাদীসে এসেছে ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما الخ অর্থাৎ হুজুর (স) উভয় হাত দিয়ে মাথা মাসেহ করেন এবং এ ক্ষেত্রে ادبار ও اقبال উভয়টাই করেন, অত:পর হাদীসের রাবী اقبال ও ادبار এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। রাবীর উক্তি بدا بمقدم راسه...الخ দ্বারা অর্থাৎ হুজুর (স) মাথার অগ্রভাব থেকে মাসেহ শুরু করে পিছের দিকে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যান। অতঃপর উভয় হাতকে ফিরায়ে যেখান থেকে মাথা মাসেহ শুরু করেছিলেন ঐ পর্যন্ত নিয়ে আসলেন। এটাই মাথা মাসেহ করার পদ্ধতি।

আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (র) বলেন, একথা স্পষ্ট যে, بدا بمقدم راسه এটা হাদীসের শব্দ; রাবীর পক্ষ থেকে বর্ধিত নয় তথা ইমাম মালেক (র) এর কথা নয়। নবী (স) استقبال ও استدبار এর মাধ্যমে যে মাসেহ করেছেন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্ণ মাথা মাসেহ করা। ইমাম আবু হানীফা (র) ও সুন্নতের সীমার ব্যাপারে এর প্রবক্তা। কিন্তু ফরয আদায় করার জন্য মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা জরুরী; এর কম নয়। এ ব্যাপারে হযরত আনাস (রা) ও হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) এর রেওয়ায়াতএর প্রমাণ, যা নাসায়ী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

سوال : حرر مسئلة فرض مسح الراس مع اختلاف العلماء فيه مدللا مرجحا .

প্রশ্ন ঃ মাথা মাসেহ করার ফরযের ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য কি? দলীল সহকারে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মাথা মাসেহ করার ব্যাপারে ইমামদের মতামত ঃ ইমাম মালেক (র) এর মতে সমস্ত মাথা মাসেহ করা ফরয। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে পুরো মাথা মাসেহ করা ফরয নয়। বরং আংশিক ফরয। অতঃপর আংশিক পরিমানের ব্যাপারে তাদের মাঝে মতবিরোধ আছে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, কেউ যদি একটি বা দুটি চুল পরিমাণ মাসেহ করে তাহলে যথেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে আবু হানীফার (র) এর নিকট মাথায় এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয। আর তা হচ্ছে নাসিয়া পরিমাণ।

ইমাম মালেকের দলীল ঃ ১. আল্লাহর বাণী وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মাথা মাসেহ করার আদেশ করেছেন। আর অভিধানে মাথা বলা হয় পুরাটাকে, নির্দিষ্ট কোন অংশকে বলা হয়নি। যেমন হাত ও পায়ের ক্ষেত্রেবল হয়েছে। সুতরাং এখানে পুরোটাই উদ্দেশ্য হবে।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম আল মুযানী রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন–

١. اَنَّهٗ اَخَذَ بِيَدِهٖ لِلصَّلٰوةِ مَاءً فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأسِهٖ ثُمَّ ذَهَبَ بِيَدِهٖ اِلٰى مُؤَخَّرِ الرَّاْسِ ثم رَدَّهُمَا

٢. عن طلحة بن مطرفٍ قال رأيتُ رسولَ الله صلعم مَسَحَ مقدَّمِ رَاْسِه حتّٰى بَلَغَ القَذَالَ مِن مقدَّمِ عُنُقِه.

٣. حديث مُعَاوية فلمَّا بلغ مَسَحَ رَأسَه وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى مقدَّمِ رأسِه ثم مَرَّبِهِمَا حتّٰى بَلَغَ القَفَا ثم رَدَّهُمَا حتى بَلَغَ المَكَانَ الذى بَدَأَمِنْهُ.

এ সকল রেওয়ায়াতে ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরয।

ইমাম মালেকের দলীলের জবাব ঃ আল্লাহর বাণী وامسحوا برؤسكم দ্বারা তিনি যে দলীল পেশ করেছেন যে, এই আয়াতে মাসাহের আদেশ করা হয়েছে, এখন আমরা মাসেহ এর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখি যে, এটা فعل মোতাআদ্দী। আর فعل মুতাআদ্দী কখনো واسطة ছাড়া মাফউলের দিকে متعدى হয়। যেমন তুমি বল, আমি অমুকের দিয়ে দেখেছি। এর দ্বারা তার পুরাটা দেখা উদ্দেশ্য নয়। অদ্রুপ যেমন তুমি বল আমি জায়েদকে মেরেছি এই কথার দ্বারা যায়েদের পুরা শরীরে মারা আবশ্যক না বরং তার পিছু অংশে মারার দ্বারা যথেষ্ট হয়ে যায়। তেমিনি ভাবে আল্লাহর বাণীর ক্ষেত্রে পুরা মাথা মাসেহ করা আবশ্যক নয়। আর রাসূল (স) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি পুরো মাথাকে মাসেহ করেছেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না। যে পুরা মাথা মাসেহ করা ফরয। যেমন রাসূল থেকে বর্ণিত আছে তিনি উভয় হাত ও উভয় পাকে তিনবার তিনবার ধৌত করেছেন। এর দ্বারা প্রামাণিত হয় না যে, তিনবার পা ধৌত করা ফরয। এছাড়াও পুরো মাথা মাসেহ করা ফরয না হওয়ার ব্যাপারে হযরত মুগীরা ইবনে শোবার বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন– اَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وتَوَضَّأَ ومَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ

রাসূল (স) কওমের ময়লা ফেলার স্থানে এসেছেন এবং সেখানে পেশাব করেছেন। অতঃপর অযু করেছেন এবং নাসিয়া পরিমাণ মাথা মাসেহ করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হলো পুরো মাথা মাথা মাসেহ করা ফরয নয়। বরং কিয়োদাংশ মাসেহ দ্বারা ফরয আদায় হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল ঃ আল্লাহর বাণী وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ তিনি বলেন, يُجْرِ لِلْمُطْلَقِ عَلٰى اِطْلَاقِهٖ কুরআনের আয়াতের নির্দেশ শর্তহীন বা মতলক সুতরাং হাদীস দ্বারা কুরআনের শর্তহীন আয়াতকে মুকায়েদ করা অবৈধ। এ হিসেবে মতলক কে মতলক রেখেই আমল করতে হবে।

আহনাফের দলীল ঃ মুতলাকভাবে কিছু অংশ মাসেহ এর দ্বারা মাসেহ যথেষ্ট হবে না। বরং এমন কিছু অংশকে মাসেহ করতে হবে যাকে মাসেহ হিসাবে গণ্য করা যায়। কেননা আল্লাহ তাআলা মাসেহকে একটি পরিপূর্ণ রোকন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।এ দ্বারা দাবী হলো এমন কিন্তু অংশকে মাসেহ করা যাকে মাসেহ বিবেচনা করা যায়। কিছু অংশ মাসেহ তো অনিচ্ছায় চেহারা ধৌত করার সময়ও হয়ে থাকে। আর যে কাজ নিজের অনিচ্ছায় হয়ে থাকে তা মুস্তাকিল হতে পারে না। তাছাড়া মাসেহ এর আয়াতটি পরিমাণের বর্ণনার ব্যাপারে মুজমাল।এর ব্যাখ্যা হলো মুগীরা ইবনে শো'বা এর বর্ণনা– اَنَّهٗ عليه السلام اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ وتَوَضَّأَ ومَسَحَ عَلَى النَاصِيَةِ

এ অনুচ্ছেদের হাদীসে এসেছে ثم غَسَلَ رِجْلَيْهِ কিন্তু কোন পর্যন্ত ধৌত করতে হবে তার উল্লেখ নেই। কিন্তু ওহাইব এর রেওয়ায়াতে اِلَى الْكَعْبَيْنِ এসেছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, উভয় পাকে টাখনু পর্যন্ত ধৌত করতে হবে। হাদীসের বাকী ব্যাখ্যা পূর্বের শিরোনামের অতিবাহিত হয়েছে। এ হাদীসে চেহারাকে তিনবার ধৌত করা এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'দুইবার ধৌত করার যে বর্ণনা এসেছে তার ব্যাখ্যা ইমাম নববী (র) এটা করেছেন যে, আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, একই উযূতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার বিভিন্ন সুরত জমা হতে পারে। অর্থাৎ কতক অঙ্গকে তিনবার ধৌত করা। কতক অঙ্গকে দু'বার ধৌত করা এবং কতক অঙ্গকে একবার ধৌত করা এবং এ পদ্ধতিতে উযূ করা নিঃসন্দেহে জায়েয। কিন্তু মুস্তাহাব হলো সমস্ত অঙ্গগুলোকে তিন তিনবার করে ধৌত করা এবং কোন সময় ঐ পদ্ধতিতে যা হাদীসে উল্লেখ আছে। আর হুজুর (স) এর এভাবে উযূ করা ছিল। বৈধতার বয়ান দেয়া।

عَدَدُ مَسْحِ الرَّأْسِ

٩٩. اخبرنا محمد بنُ منصورٍ قال حدثنا سفيانُ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الذى أُرِىَ النِّداءَ قال رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضأ فغسل وجهه ثلثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين -

মাথা মাসেহ কতবার করতে হবে?

অনুবাদ ঃ ৯৯. মুহাম্মদ ইবনে মনসুর (র)......আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ আসিম মাযিনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি (হাত ধোয়া, কুলি করা ইত্যাদির পর) তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং দু'বার করে হাত ধৌত করেন এবং দু'বার করে পা ধৌত করেন ও মাথা মাসেহ করেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : بَيِّن طريقةَ المَسْنُونَةَ فِى مَسْحِ الرأسِ بَيْنَ العُلَماء -

প্রশ্ন ঃ মাথা মাসেহ করার সুন্নত তরীকার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মাথা মাসেহ করার সুন্নত তরীকা ঃ উযূর সময় মাথা তিনবার মাসেহ করা সুন্নত নাকি একবার, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে, উযূতে তিনবার মাথা মাসেহ করা সুন্নত। ইমাম আহমদ (র) থেকেও অনুরূপ একটি উক্তি বর্ণিত রয়েছে।

২. ইমাম আবু হানীফা, মালেক, ইসহাক, সুফিয়ান সাওরী ও আহমদ (র) এর এক উক্তি অনুযায়ী মাথা শুধু একবার মাসেহ করা সুন্নত।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল ঃ ১.

عن شقيقِ بنِ سلمةَ قال رأيتُ عثمانَ بنَ عفّانٍ غسلَ ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ومسحَ رأسه ثلاثًا ثم قال رأيتُ رسولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فعل هٰذا (ابوداود ج ص ١٤)

অর্থাৎ শাকীক ইবনে সালামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা) কে উযূর মধ্যে দু'হাতের কনুই সমেত তিনবার করে ধৌত করতে এবং তিনবার মাথা মাসেহ করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূল (স) কে এরূপ করতে দেখেছি। উক্ত হাদীসে তিনবার মাথা মাসেহ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। অতএব, ইহা সুন্নত।

২. সহীহ মুসলিম শরীফে আছে, হযরত উসমান (রা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (স) এর উযূর ধরন শিক্ষা দেব না! এ হাদীসে তিনি বলেছেন ثم توضأ ثلاثا ثلاثا এর দ্বারা বুঝা যায় রাসূল (স) তিন বার মাথা মাসেহ করেছেন। কেননা, শব্দটি ব্যাপকতা সম্পন্ন। এর মধ্যে মাসেহও অন্তর্ভুক্ত।

আকলী দলীল ঃ উযূর অন্যান্য অঙ্গসমূহ তিনবার ধৌত করা সুন্নত, আর মাথাও উযূর অঙ্গসমূহের একটি সুতরাং মাথাও তিনবার মাসেহ করা সুন্নতহবে। (দরসে মিশকাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৬৩)

হানাফী মাযহাবের প্রথম দলীল ঃ

عن حُمْرانَ قال رأيتُ عثمانَ بن عفّانٍ توضّأ فأفرغَ على يديه ثلاثًا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثًا وغسل يده اليُمْنى الى المرافق ثلاثا ثم اليُسْرى مثل ذالك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليُمْنى ثلاثًا ثم اليُسْرى مثل ذلك ثم قال رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توضأ مِثلَ وُضوئى هٰذا ... الخ

অর্থাৎ হুমরান হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি (প্রথমে) তাঁর দুই হাতে তিনবার করে পানি ঢেলে ধৌত করেন। অতঃপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার (সমস্ত) মুখমণ্ডল ধৌত করেন। পরে ডান হাত কনুই সমেত তিনবার ধৌত করেন এবং বাম হাত ও অনুরূপভাবে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসেহ করেন। পরে ডান পা তিনবার ধৌত করেন এবং একইরূপে বাম পা ধৌত করেন। অবশেষে তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করতে দেখেছি। (বুখারী ১/২৭-২৮ মুসলিম ১/১১৯ নাসায়ী ১/৩১)

উক্ত হাদীসে নবী করীম (স) এর উযূর পদ্ধতি খুলে খুলে বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ তিনবার ধৌত করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মাথা মাসেহ এর ক্ষেত্রে তিনবারের কথা উল্লেখ নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, মাথা একবার মাসেহ করাই সন্নাত, তিনবার নয়।

দলীলঃ ২.

عن عبدِ الرحمٰن بن ابى لَيْلىٰ قال رأيتُ عليًّا توضّأ فغَسَل وَجْهَه ثلاثًا وغَسَل ذِراعَيْه ثلاثًا ومَسَح بِرأسِه واحدةً ثم قال هٰكذا توضّأ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (ابوداؤد ج ص ١٢)

অর্থাৎ আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আলীকে উযূ করতে দেখি। তিনি তার মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন এবং দু'হাতের কনুই সমেত তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি একবার মাথা মাসেহ করেন, অবশেষে তিনি বলেন, রাসূল (স) এরূপ উযূ করতেন।

দলীল ঃ ৩.

عن ابن عباسٍ (رضـ) رَاٰى رسولَ الله صلعم يَتَوَضّأُ كلّه ثلاثًا ثلاثًا قال ومَسَح برأسِه واُذُنَيه مسحةً واحدةً

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত (তিনি বলেন) তিনি রাসূল (স) কে উযূ করতে দেখেছেন। তিনি (স) উযূর সময় প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করেন এবং মাথা ও কর্ণদ্বয় একবার মাসেহ করেন। (আবু দাউদ ১/১৮ তিরমিযী ১/১৬ নাসায়ী ১/২৮ ইবনে মাজাহ ৩৫)

উপরেল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাথা একবার মাসেহ করা সুন্নত।

আকলী দলীল ঃ মোজা ও পট্টির উপর একবার মাসেহ করলে তা যথেষ্ট হবে। সুতরাং মাথা মাসেহও একবারই হওয়া উচিত।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হাদীসটি শায (বিরল)। কারণ একটি হাদীস ছাড়া উসমান (রা) এর সকল রেওয়ায়াতে শুধু একবার মাসেহ করার কথা রয়েছে। তাই স্বয়ং ইমাম আবু দাউদ (র) শাফেয়ী মতালম্বী হওয়া সত্ত্বেও তিনবার মাসেহ বিশিষ্ট রেওয়ায়াতটি এ বলে রদ করে দিয়েছেন যে,

احاديثُ عثمانَ الصِّحاحُ كُلُّها تَدُلُّ على مَسْحِ الراسِ انّه مرّةً فانّهم ذَكَرُوا الوضوءَ ثلاثا وقالُوا فيها ومَسَح رَأسَه ولمْ يذكُروا عددًا كما ذَكَرُوا غيرَه (ابوداؤد ج اص ١٥)

অর্থাৎ হযরত উসমান (রা) হতে বর্ণিত। সহীহ হাদীস সমূহে প্রমাণিত হয় যে, উযূর মধ্যে মাথা মাসেহ শুধু একবার করতে হবে। প্রত্যেক বর্ণনাকারী উযূর অঙ্গগুলি তিনবারে ধৌত করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকের বর্ণনায় কেবলমাত্র ومسح راسه উল্লেখ রয়েছে কিন্তু সংখ্যার কোন উল্লেখ নেই। অথচ অন্যান্য অঙ্গধৌত করার ব্যাপারে তিন তিনবারের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

২. হিদায়া গ্রহন্থকার বলেন, নতুন পানি দিয়ে যদি তিনবার মাসেহ করা হয়, তাহলে তা আর মাসেহ থাকে না; বরং তা গোসল বা ধোয়া হয়ে যায়।

৩. যদি মেনে নেয়া হয় যে, তিনবার মাসেহ সংক্রান্ত হাদীসটিও বিশুদ্ধ, তবে তা বৈধতার জন্য প্রযোজ্যহবে, সুন্নত হিসেবে নয়।

৪. আসলে হাদীসে তিনবার মাথা মাসেহ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি ছিল পূর্ণ মাথা মাসহের একটি পদ্ধতি অর্থাৎ মাথার সামনের অংশ, পিছনের অংশ এবং উভয় পার্শ্ব। নবী করীম (স) হয়তো শিক্ষা দেয়ার জন্য আলাদা আলাদা ভাবে তিনো অংশে মাসেহ করেছেন। আর এটাকেই রাবী তিনবার বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

আকলী দলীলের জবাব ঃ শাফেয়ী (র) এর কিয়াসী দলীলটি সহীহ নয়। কেননা, ধোয়ার উপর মাসেহ এর কিয়াস করা শুদ্ধ নয়। তাছাড়া অন্যান্য অঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হল, পূর্ণ অঙ্গটি ধৌত করা, যা ফরয কিন্তু একবারে পূর্ণ অঙ্গটি ধৌত করা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। বিধায় তিনবার মাসেহ করা ফরয নয় এবং প্রত্যেকটি চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানোও ফরয নয়। এজন্য তিনবারেরও প্রয়োজন নেই। তাই এটা সুন্নতও নয়। (দরসে মিশকাত ১/১৬৩)

سوال : هل يُشْتَرَطُ ماءُ الجديدُ لِمَسْحِ الرأسِ وما الاختلافُ فيه بَيْنَ الائمةِ أوضِح .

প্রশ্ন ঃ মাথা মাসেহ করার জন্য নতুন পানি শর্ত কি এবং এ ব্যাপারে উলমাদের মাঝে মতানৈক্য কি? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ মাথা মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নেয়া শর্ত কি না ঃ মাথা মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নেয়া শর্ত কি না এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ সহ জুমহুর উলামায়ে কিরামের মতে, মাথা মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নেয়া শর্ত। অতএব, কেউ যদি হাতের অবশিষ্ট পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করে, তবে তার উযূ শুদ্ধ হবে না।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে, মাথা মাসেহ এর জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নত, তবে উযূ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল ঃ

عن عبدِ الله بن زيدِ بْنِ عاصمٍ انّه رأى رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه قال ومَسَحَ رأسَهُ بماءٍ غيرَ فَضْلِ يَدَيْه وغَسَلَ رِجْلَيْهِ حتى أنقاهُما .

অর্থাৎ ..... আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে উযূ করতে দেখেছেন। অতঃপর তিনি উযূর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন। তিনি নতুন পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করেন এবং পদযুগল পরিষ্কার করে ধৌত করেন। (আবু দাউদ ১/ ১৬ মুসলিম ১/ ১২৩ তিরমিযী ১/১৬)

আবু হানীফা (র) এর দলীল ঃ عن الربيعِ انّ النبيَّ صلعم مَسَحَ برأسِه مِن فَضْلِ ماءٍ كانَ فِي يَدِه

নবী করীম (স) তাঁর হাতের অতিরিক্ত পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করেন। (আবু দাউদ ১/১৭)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ মূলত: জুমহুরের প্রদত্ত দলীল হানাফীদের পরিপন্থী নয়। কারণ উক্ত হাদীস দ্বারা সুন্নত প্রমাণিত হবে, ওয়াজিব নয়। আর হানাফীগণ ও তো একে সুন্নত বলে থাকেন। অতএব, কোন বৈপরীত্য নেই।

উল্লেখ্য যে, এ মতবিরোধের মূল ভিত্তি হলো ব্যবহৃত পানি (ماء مستعمل) সাব্যস্ত করণের ক্ষেত্রে। কেননা, ব্যবহৃত পানি দ্বারা অন্য অঙ্গ ধৌত বা মাসেহ করা জায়েয নয়। শাফেয়ী ও অন্যদের নিকট কোন পানি অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বেই তা ব্যবহৃত পানি হিসেবে সাব্যস্ত হয়, আর হানাফীদের মতে, পানি ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহৃত সাব্যস্ত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। (দরসে তিরমিযী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৪৬)

سوال : ما الاختلافُ بَيْنَ الائمةِ الكرام فى القَدْرِ المَفْرُوضِ مِن مَسْحِ الرأسِ؟ بيِّن مُدَلَّلًا مع الجواب عَن قولِ الامامِ المَالِكِ .

প্রশ্ন ঃ মাথা মাসেহ করার ফরযের পরিমাণ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মতামত দলীলসহকারে বর্ণনা কর এবং ইমাম মালেক (র) এর অভিমতের উত্তর দাও।

او - سوال : بيِّنوا مِقدارَ مَسْحِ الرأسِ مُدَلَّلًا مُبَرْهَنًا مَعَ تَرجيحِ الرَّاجِحِ .

প্রশ্ন ঃ قوله راجح **উল্লেখসহ মাথা মাসেহ করার পরিমাণ দলীলের ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ মাথা মাসেহ করার পরিমাণের ব্যাপারে আলিমদের অভিমত ঃ মাথা মাসেহ করার পরিমাণ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা–

১. ইমাম মালেক বলেন, পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরয।

২. ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে মুতলাক بعض মাথা মাসেহ করা ফরয। অর্থাৎ أدنى ما يطلق عليه اسم المسح। তথা যে পরিমাণ মাথা মাসেহ করার দ্বারা তার উপর মাসেহ শব্দ প্রযোজ্য হয়। তার উপর মাসেহ করা ফরয।

৩. ইমাম আবু হানীফা (র) এর নিকটে মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয।

৪. ইমাম আহমদ (র) থেকে এ সম্পর্কে দুটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো ইমাম মালেক (র) এর মুতাবেক পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরয। আর দ্বিতীয়টি ইমাম শাফেয়ী (র) এর قول মুতাবেক بعض মাথা মাসেহ করা ফরয।

ইমাম মালেক (র) কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন, আর তা হলো وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ কেননা, এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মাথা মাসেহ করার কোন সীমা বর্ণনা করেননি। আর লুগাতে পূর্ণ মাথাকেই رأس বলা হয়। তাই আয়াতের মাসেহ করার দ্বারা পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরয হবে। কেননা, فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ও فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم আয়াতদ্বয়ে চেহারা ধৌত করার কোন সীমা বর্ণনা করা হয়নি। অথচ চেহারা ধৌত করার ক্ষেত্রে পূর্ণ চেহারা এবং مسح করার ক্ষেত্রে পূর্ণ চেহারা মাসেহ করা ফরয।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) কুরআনে কারীমের আয়াত وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ দ্বারাই দলীল পেশ করেন। তিনি বলেন, যে উল্লেখিত আয়াতে মাথা মাসেহ করার কোন পরিমাণ বর্ণনা করা হয়নি। সুতরাং মাথা মাসেহ করার ফরয পরিমাণ সম্পর্কে এ আয়াতটি হলো মুতলাক। আর মুতলাক এর হুকুম হলো এর কোন একটি فرد এর উপর আমল করলেই মুতলাক হুকুমের দাবী বা চাহিদা পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং মাথার কিছু অংশ বা أدني ما يطلق عليه اسم المسح এতটুকু পরিমাণ মাথা মাসেহ করা ফরয যার উপর মাসেহ শব্দ প্রযোজ্য হয়।

আহনাফের দলীল ঃ আহনাফের দলীল হলো, মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) এর প্রসিদ্ধ হাদীস– أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتى سُباطَةَ قومٍ فبَال وتوضأ ومَسَح عَلى النَاصية. এ হাদীস দ্বারা দু'ধরণের দলীল পেশ করা হয়।

১. ناصية দ্বারা যদি কপাল উদ্দেশ্য হয় তাহলে হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্যে হবে রাসূল (স) কপাল পরিমাণ মাথা মাসেহ করেছেন। আর কপাল সাধারণত মাথার এক চতুর্থাংশ হয়ে থাকে।

২. আর যদি ناصية দ্বারা মাথার সামনের ভাগ উদ্দেশ্য হয় তাহলেও মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয হবে। কেননা, ناصية টা মাথার চার ভাগের একভাগ। এর কারণ হলো পূর্ণ মাথার চারটি অংশ রয়েছে। ১. ناصية ২. قذال ৩-৪. فودان এ চারটির একটি হলো ناصية - সুতরাং ناصية পরিমাণ মাসেহ করা ফরয সাব্যস্ত হলো। এ তিন মাযহাবের মধ্যে আহনাফের মাযহাবটিই প্রাধান্যযোগ্য। নিম্নে আহনাফের মাযহাবকে দৃঢ় করত: বাকী দুই মাযহাবকে রদ করনার্থে বিপক্ষবাদীদের দলীলের জবাব দেয়া হলো–

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীলের জবাব

১. উল্লেখিত মাসেহ সংক্রান্ত আয়াতটি পরিমাণ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুতলাক নয় বরং মুজমাল। কেননা, যদি মুতলাক হত তাহলে ادنى থেকে اعلى পর্যন্ত সমস্ত افراد কে অন্তর্ভুক্ত করে নিত। আর তখন এক চুল কিংবা তিন চুল পরিমাণ মাসেহ করার দ্বারা মাথা মাসেহ করেছে বলে ধরে নেয়া হত। অথচ ওরফে তাকে মাসেহ বলা হয় না। সুতরাং বুঝা গেলো যে, مسح করার ক্ষেত্রে এমন একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রয়োজন যার উপর আমল করার দ্বারা তার উপর মাসেহ এর হুকুম লাগানো যায়। আর এ অংশ বর্ণনার ক্ষেত্রে এ আয়াতটি মুজমাল। এ জন্য এখন এমন একটি نص দরকার যা তার জন্য بيان হবে। সুতরাং ناصية সম্পর্কিত হাদীস হলো তার বয়ান। এতে ربع الرأس তথা ناصية এর কথা এসেছে। তাই এর কম মাসেহ করলে মাসেহ জায়েয হবে না।

২. استعمال তথা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, محل এর উপর باء দাখিল হওয়ার দ্বারা কখনো بعض উদ্দেশ্য হয়। যেমন- مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ আবার কখনো محل উদ্দেশ্য হয়। যেমন- وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ কিন্তু এখানে কি উদ্দেশ্য হবে সেটা সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায় না। এ কারণে পরিমাণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এ আয়াতটি হলো মুজমাল। আর حديث ناصية হলো তার বয়ান। কাজেই ربع رأس, এর কম মাসেহ করা জায়েয হবে না।

ইমাম মালেক (র) এর দলীলের উত্তর

উত্তর ঃ ১. হাদীসে ناصية দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, مسح الرأس এর ক্ষেত্রে পূর্ণ মাথা মাসেহ করা শর্ত নয়। কারণ নবী করীম (স) পূর্ণ মাথা মাসেহ করেননি। এখন যদি استيعاب তথা পূর্ণ মাথা মাসেহ করার শর্ত লাগানো হয়। তাহলে রাসূল (স) এর আমল কুরআনের মুখালেফ হওয়া অনিবার্য হয়। অথচ এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং এক চতুর্থাংশ মাথা মাসেহ করা সাব্যস্ত হল। তাই উক্ত আয়াত দ্বারা পূর্ণ মাথা মাসেহ উদ্দেশ্য নেয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

উত্তর ঃ ২. পবিত্র কুরআনে إمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ এর মাঝে باء অব্যয়টি محل এর উপরে দাখিল হয়েছে। আর باء এর ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো তা الة এর উপর দাখিল হয়। যেমন- كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ এবং ضَرَبْتُ بِالْخَشَبَةِ কিন্তু الة টা بالذات উদ্দেশ্য হয় না। বরং তার থেকে এ পরিমাণই উদ্দেশ্য হয় যার দ্বারা مقصود তথা উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। এ জন্য الة এর ব্যাপারে হুকুম হলো তার مدخول এর بعض উদ্দেশ্য হবে; استيعاب বা পরিবেষ্টন উদ্দেশ্য হয় না। এভাবে যখন باء টা محل এর উপর দাখিল হয়। তখন محل কে الة এর সাথে তাশবীহ দিয়ে محل এর بعض উদ্দেশ্য হয়। যেমন- مسحتُ بِالْحَائِطِ এর দ্বারা حائط এর পূর্ণটা উদ্দেশ্য হয় না।

আয়াতে যেহেতু باء টা محل এর উপর দাখিল হয়েছে। সুতরাং এ কায়দা অনুযায়ী وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ এর ব্যাখ্যা হবে وَامْسَحُوا بَعْضَ رُؤُسِكُمْ অর্থাৎ محل এর بعض উদ্দেশ্য হবে। তাইএ আয়াত দ্বারা استيعاب সাব্যস্ত করা এবং ইমাম মালেক (র) এর দলীল পেশ করা সহীহ নয়।

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ ঃ আল্লামা সিন্ধী (র) সহ মুহাদ্দেসীনে কিরাম বলেন, আলোচ্য হাদীসে الذى ارى النداء তে ইযাফত করে আযানের শব্দাবলী স্বপ্নে দেখার যে নিসবত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদের দিকে করা হয়েছে এটা ভুল। কেননা, উযূ সম্পর্কিত হাদীসের যে রাবী তিনি হল, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিম মাযনী আর আযানের শব্দাবলীল রাবী হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্দে রব্বিহী। কারণেই رؤيت نداء এর নিসবত আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসের রাবীর দিকে করা সহীহ না।

قوله ومَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ ঃ ইমাম নাসায়ী (র) শিরোনামের অধীনে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ এর হাদীস এনেছেন। যিনি مرتين শব্দ নকল করেছেন। অথচ অন্যান্য হাফেজগণ এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী (র) বলেন, ইমাম মালেক, উহাইব, সুলায়মান ইবনে বেলাল, খালেদ ওয়াসেতি প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ এর বিপরীত আমর ইবনে ইয়াহইয়া থেকে মাথা মাসেহ সম্পর্কে– ثم مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ শব্দ বর্ণনা করেছেন এবং উহাইবের রেওয়ায়াতে مرة واحدة এর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ اقبال ও ادبار এর সাথে মাথা মাসেহ এক বারই করবে, দুই বার নয়। কিন্তু হাদীসের রাবী مرتين বলতেছেন, যার দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় মাসেহ কয়েক বার করেছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এমন নয়। তিনি মাসেহ একবারই করেছেন অবশ্য তার চলন, (নড়ন) দু'বার হয়েছে। প্রথমে উভয় হাত সম্মুখ থেকে পেছনের ঘাড় পর্যন্ত নিয়েছেন। অতঃপর সেখান থেকে কপালের দিকে এনছেন। আর পেছন থেকে উভয় হাতকে সামনের দিকে আনাকে مسح ثانى বলা ঠিক নয়। কারণ এটা প্রথম মাসেহরই পরিপূরক। কেননা, প্রথম মাসেহ দ্বারা পূর্ণ মাথা মাসেহ হয়নি, তাই পেছন থেকে উভয় হাতকে সামনের দিকে আনার প্রয়োজন পড়েছে , দ্বিতীয়বার মাসহের দ্বারাই মাসেহ পূর্ণতা লাভ করে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাসাহের আমলটা একাধিকবার নয় বরং তা একবারই হয়ে থাকে কিন্তু তার চলনটা দু'বার হয়।

আলোচ্য মাসআলা বুঝার জন্য একটি উপমা ঃ

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, اِنْشَقَّ الْقَمَرُ فِى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ আর এটা একটি স্বীকৃত যে, চন্দ্র বিদারণ একবারই হয়েছে। কিন্তু তার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় দু'বার দ্বারা। কারণ তা বিদীর্ণ হয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তদ্রূপ মাসেহ এর মাসআলাটি ও বুঝতে হবে যে, রাসূল (স) একবার প্রথমে সম্মুখ থেকে শুরু করে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যান, অতঃপর পেছনের ঘাড় থেকে শুরু করে সামনের দিকে চুল পর্যন্ত নিয়ে আসেন। এটাকেই রাবী দু'বার বলে ব্যক্ত করেছেন। অথচ اقبال ও ادبار উভয়টা মাথা মাসেহ পূর্ণ হওয়ার জন্য দুটি চলন, আর এ ছাড়া মাসেহ পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার বক্তব্য ঃ ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (র) বলেন, জুমহুরের মাযহাবই অধিক বিশুদ্ধ। কেননা, রাসূল (স) হতে বর্ণিত সহীহ হাদীস দ্বারা এক বার মাসেহ করার বিষয়টি প্রমাণিত এবং হযরত উসমান (রা) কর্তৃক বর্ণিত সহীহ হাদীস একবার মাসেহ করাকে প্রমাণ করে। হযরত উসমান (রা) এর مفصل বর্ণনা মুজমাল বর্ণনার ব্যাখ্যা দিয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানেও তিন বার মাসেহ করার কথা উল্লেখ নেই। আকলের ও তাগাদা এটাই যে, তায়াম্মুম পট্টির উপর যেমন মাসেহ একবার করতে হয় ঠিক তদ্রূপ মাথার উপরও মাসেহ একবার করতে হবে। অপর দিকে তিন বার মাসেহ করলে মাসেহ বাকী থাকে না বরং গোসল হয়ে যায় এটা সহীহ না। (ফাতহুল মুলহিম ৩৯১/১)

জুমহুরের দলীল ঃ ১. ইমাম নাসায়ী (র) باب غسل الوجه এর আওতারে وفد خير কর্তৃক হযরত আলী থেকে একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, যেখানে উযূর পূর্ণ নকশাটা খুলে খুলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে এসেছে- مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

২. باب صفة الوضوء এর শিরোনামের আওতারে حسين بن على بن ابيه এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে এসেছে ثم مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحَةً واحدةً

৩. باب مسح المرأة رأسها এর আওতারে হযরত আয়েশা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে তার শব্দ নিম্নরূপ ثم مَسَحَتْ رَأْسَهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً তিনি একবার মাথা মাসেহ করেন।

৪. সালামা ইবনে আকওয়া ও ইবনে আবী আওফা এর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) মাথা একবার মাসেহ করছেন।

৫. ইমাম তাবরানী (র) اوسط গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) এর একটি হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। তাতে এসেছে যে, مسح برأسه مرة ইবনে হাজার এ হাদীসের সনদকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

৬. ইমাম তিরমিযী (র) হযরত রবী' এর একটি হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। তাতেও مرة واحدة এর শব্দ উল্লেখ আছে। তিনি এ হাদীসের সনদকে সহীহ ও হাসান বলেছেন।

৭. বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে যে, انَّه مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً নবী (স) তাঁর মাথা মোবারক একবার মাসেহ করেছেন। অপরদিকে অধিকাংশ সাহাবা, তাবেয়ীন ও অন্যান্যদের আমলও একবার মাসেহ করার উপর।

প্রশ্ন ঃ ইমাম আবু হানীফা (র) থেকেও তিনবার মাসেহ করার বর্ণনা এসেছে। যেমন দারাকুতনী ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মাধ্যমে ইমাম আবু হানীফা থেকে তিনি খালেদ ইবনে আলকামা থেকে এবং তিনি আব্দে খায়ের এর সূত্রে আলী (রা) এর হাদীস রেওয়ায়াত করেন। তাতে এসেছে- وَمَسَحَ رَأْسَه ثلثا

উত্তর ঃ ১. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে যে, তিনবারের রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে। সেখানে একই পানি দ্বারা তিনবার মাসেহ করার কথা আছে। এটাও শরীয়ত অনুমোদিত যেমন হাসান (র) আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন মাসেহ এর ক্ষেত্রে বার বার পানি নিবে না, যাতে মাসেহ গোসলে রূপান্তরিত না হয়।

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন, যদিও ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে একটি রেওয়ায়াত তিনবারের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে মাযহাবের প্রসিদ্ধ ও মুখতার قول হলো একবার মাসেহ করতে হবে; তিনবার নয়।

৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, তিনবার মাসেহ সংক্রান্ত যে হাদীস আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে, যদিও তা সহীহ কিন্তু তার দ্বারা استيعاب তথা পূর্ণ মাথা মাসেহ করা উদ্দেশ্য।

بابُ مَسْحِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا

١٠٠. اخبرنا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قال حدّثنا الفضلُ بْنُ موسى عَن جُعيدِ بْنِ عبد الرحمٰن قال اَخْبَرَنِىْ عبدُ الملكِ بْنِ مَروانَ بْنِ الحارثِ بْنِ اَبِى ذُبَابٍ قال اخبرنى ابو عبدِ اللّه سالمٌ سَبْلانُ قال وكانتْ عائشةُ تَسْتَعْجِبُ بِاَمانَتِه وتَسْتاجِرُه فَاَرَتْنِى كيفَ كانَ رَسُوْلُ اللّه ﷺ يَتَوَضَّأُ فَتَمَضْمَضَتْ وَاسْتَنْثَرَتْ ثلثًا وغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثلثًا ثم غَسَلَتْ يَدَهَا اليُمْنٰى ثلثًا واليُسْرىٰ ثلثًا ووَضَعَتْ يدَها فِى مُقَدَّمِ رَاْسِها ثمّ مَسَحَتْ رَاْسَهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً الى مُؤَخَّرِه ثمّ اَمَرَّتْ يَدَيْهَا بِاُذُنَيْهَا ثم اَمَرَّتْ عَلَى الْخَدَّيْنِ قال سَالمٌ كنتُ اٰتِيْهَا مُكَاتَبًا ماتَخْتَفِى مِنِّى فتَجْلِسُ بَيْنَ يَدَىَّ وتُحَدِّثُ مَعِىْ حَتّٰى جِئْتُهَا ذاتَ يومٍ فقُلْتُ اُدْعِى لِىَ بِالبَرَكَةِ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قالتْ وَمَا ذاكَ قلتُ اَعْتَقَنِىَ اللّهُ قَالَتْ تَبَارَكَ اللّهُ لَكَ وَاَرْخَتِ الْحِجَابَ دُوْنِىْ فَلَمْ اَرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের মাথা মাসেহ করা

অনুবাদ ঃ ১০০. হুসায়ন ইবনে হুরায়স (র)........আবু আবদুল্লাহ সালিম সাবলান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) তাঁর আমানতদারীতে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁকে অর্থের বিনিময়ে কাজে নিযুক্ত করতেন। (সে) সালিম বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ (স) কিভাবে উযূ করতেন তা দেখান। তারপর তিনি তিনবার কুল্লি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন। তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। তিনবার করে ডান ও বাম হাত ধৌত করেন এবং হাত মাথার অগ্রভাগে রাখেন ও মাথার পেছন পর্যন্ত একবার মাসেহ করেন। পরে তিনি উভয় কান মাসেহ করেন। তারপর মুখমণ্ডলে হাত বুলান। সালিম বলেন, আমি যখন মুকাতাব ছিলাম তখন তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করতাম। তিনি আমার সম্মুখে বসতেন এবং আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন। একদিন আমি তাঁর নিকট এলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমার জন্য বরকতের দোয়া করুন। তিনি বললেন, কিসের দোয়া করব? বললাম, আল্লাহ যেন আমাকে আযাদ করে দেন। তিনি বললেন, (এ কথা বলে) তিনি আমার সামনে পর্দা ফেলে দিলেন। এরপর আমি তাঁকে কোন দিন দেখিনি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য শিরোনামটি কায়েম করার দ্বারা ইমাম নাসায়ী (র) এটা বলা উদ্দেশ্য যে, মাথা মাসেহ করার বিধানের ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং উক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় হযরত আয়েশা (রা) اقبال এবং ادبار এর সাথে পূর্ণ মাথা মাসেহ করেছেন এবং এটাও জানা যায় যে, اقبال ও ادبار এর মাধ্যমে যে মাসেহ এর কাইফিয়্যাত বর্ণনা করা হয়েছে তাকে একবার মাসেহ করতে হবে। কেননা, হাদীসের রাবী তাকে مسحة واحدة বলে ব্যক্ত করেছেন। আলোচ্য হাদীসটিও জুমহুরের স্বপক্ষে দলীল এর দ্বারা বুঝা যায় মাথা একবার মাসেহ করতে হবে। তিনবার নয়।

قوله ثمّ اَمَرَّتْ عَلَى الْخَدَّيْنِ ঃ অর্থাৎ মাথা মাসেহ করার পর হযরত আয়েশা (রা) উভয় হাতকে চেহারার উপর বুলান। সম্ভবত এর কারণ হলো চেহারা ধৌত করার পরে চেহারা ও ভ্রুতে কিছু পানি অবশিষ্ট থাকে, তাইইবনেরায় হাত বুলালে ঐ আদ্রতা দূর হয়ে যায়। বিশেষ করে শীতকালে উভয় হাতকে চেহারার উপর ফিরানো হয়।

(বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

مَسْحُ الْاُذُنَيْنِ

١٠١. اخبرنا الْهَيْثَمُ بْنُ اَيُّوبَ الطَّالِقَانِيُّ قال حدَّثنا عبدُ العزيزِ بْنُ محمدٍ قال حدَّثنا زيدُ بْنُ اسلمَ عَنْ عطاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قال رايتُ رسولَ اللّٰه ﷺ تَوَضَّأَ فغَسَلَ يَدَيْهِ ثمّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وغَسَلَ وَجْهَه وغَسَلَ يَدَيْه مرةً مرةً ومَسَحَ بِرَأْسِه وَاُذُنَيْهِ مرةً قال عبدُ العزيزِ واخبرنِي مَنْ سَمِعَ ابنَ عَجْلَانَ يقولُ فِي ذٰلك وغَسَلَ رِجْلَيْهِ -

কান মাসেহ করা

অনুবাদ ঃ ১০১. হায়সাম ইবনে আইয়ুব তালাকানী (র)..... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি (প্রথমে) হাত ধৌত করেন এবং এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। মুখমণ্ডল ও উভয় হাত একবার করে ধৌত করেন। একবার মাথা ও উভয় কান মাসেহ করেন। আবদুল আযীয (র) বলেন, ইবনে আজলান (র) হতে যিনি শুনেছেন, তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আজলান এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উভয় পা ধৌত করার কথাও বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : مَا الْاِخْتِلَافُ فِى حكمِ كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْاُذُنَيْنِ بَيِّنْ مُدَلَّلًامُّرَجَّحًا.

প্রশ্ন ঃ উভয় কান মাসেহ করার ধরণের বিধানের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য কি? দলীল প্রমাণ সহকারে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ উযূতে কর্ণদ্বয় মাসেহ করার বিধান ঃ আলোচ্য মাসআলার ব্যাপারে ইমামদের ৪টি মাযহাব রয়েছে।

১. ইমাম যুহরী এবং দাউদ জাহিরী (র) এর মতে কর্ণদ্বয়ের অভ্যন্তর ও বহিরাংশ উভয়টিই চেহারার সাথে ধৌত করতে হবে। কর্ণদ্বয় চেহারার অন্তর্ভুক্ত।

২. ইমাম ইসহাক (র) এর মতে, অভ্যন্তর অংশ চেহারার সাথে মাসেহ করতে হবে, আর বহিরাংশ মাসেহ করতে হবে মাথার সাথে।

৩. ইমাম শা'বী ও হাসান ইবনে সালিহ (র) এর মতে মাথার সাথে বহিরাংশ মাসেহ করতে হবে। আর অভ্যন্তর অংশ ধৌত করতে হবে চেহারার সাথে। ত্বহাবী (র) فذهب قوم দ্বারা তাদের কথা বর্ণনা করেছেন।

৪. ইমাম চুতষ্টয় সুফিয়ান সাওরী, ইবনে মুবারক ও অধিকাংশ ইমামের মতে, বহিরাংশ ও অভ্যন্তর অংশ উভয়টিকেই মাসেহ করতে হবে, তবে কান মাথার পর্যায়ভুক্ত। মাথার সাথে তা মাসেহ করতে হবে।

ইমাম শাবী (র) এর দলীল ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰه بن عبّاسٍ قال دَخَلَ عَلَىَّ عَلِيُّ بْنُ ابِى طَالِبٍ رضى الله عنه وقَدْاَرَاقَ الْمَاءَ. فَدَعَا بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ فقال يا ابْنَ عَبَّاسٍ اَلَا اَتَوَضَّأُ لك كَمَا رَأَيْتُ رسولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ قلتُ بَلٰى

(পরবর্তী পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

قوله كنتُ اٰتِيهما مُكَاتَبًا ঃ সালিম (র) এর বক্তব্য আমি আয়েশা (রা) এর নিকট যাওয়া আসা করতাম, অথচ তখন আমি মুকাতাব ছিলাম এটাই একথার প্রমাণ যে, বদলে কিতাবাত পূর্ণ পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত সে মুকাতাব হিসাবেই থাকে। আর হয়তোবা তিনি আয়েশা (রা) এর আত্মীয়ের গোলাম ছিলেন। আর আয়েশা (রা) এ অভিমত ছিল মুকাতাব গোলাম তার মনিবা, ও আত্মীয় স্বজনদের নিকট যাওয়া আসা করা বৈধ। পর্দার প্রয়োজন নেই তবে তার মুক্তিপন আদায় করার পর আর দেখা জায়েয নেই। এর প্রমাণ হলো সালিম তার মুক্তিপণ আদায় করার পর তার সামনে পর্দা ফেলে দিলেন। তথা তিনি তার থেকে পর্দা করা শুরু করলেন।

فداكَ أبِى وأمِّى فذكَر حديثًا طويلًا ذكَر فيه أنّه أخذ حَفنةً مِن ماء بيديه جميعًا فصكّ بهما وَجْهه ثم الثانيةَ مثلَ ذٰلك ثمّ الثالثةَ ثم ألقَمَ إبهامَيه ما أقبلَ من أذنَيه ثم أخذ كفًّا مِن ماءٍ بيدِه اليُمنى فصبّها على ناصيتِه ثم أرسَلها تستنُّ على وَجْهه ثم غسَل يدَه اليُمنى الى المِرفقِ ثلثًا واليُسرى مثلَ ذٰلك ثم مَسَح رأسه وظُهورَ أذنَيه.

আলোচ্য হাদীসে হযরত আলী (রা) উযূর সকল বিষয়াবলীর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। পরিশেষে মাথা মাসেহর কথা বলেছেন এবং উভয় কানের বহিরাংশ অর্থাৎ পেছনের অংশ মাসেহ করার কথা বলেছেন। এটাই একথার প্রমাণ যে, উভয় কানের পেছনের অংশে মাসেহ করার বিধান এবং অভ্যন্তর অংশ মাসেহ করা যাবে না। বরং চেহারার সাথে ধৌত করতে হবে। সুতরাং এটা বলতে হবে যে, অভ্যন্তর অংশ চেহারার সাথে ধৌত করা জরুরী এবং পেছনের অংশ মাথার সাথে মাসেহ করা জরুরী।

জুমহুরের দলীল ঃ মারফু হাদীস যথা–

١. عن عثمانَ بْنَ عفّانٍ أنّه توضّأ فمَسَح برأسِه وأذُنَيه ظاهرهما وباطنهما

হযরত উসমান (রা) হতে বর্ণিত নবী (স) উযূ করেন। অতঃপর মাথা মাসেহ করেন এবং উভয় কর্ণের বহিরাংশ ও অভ্যন্তর অংশ মাসেহ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে দুই সনদে উক্ত হাদীস বর্ণিত আছে–

٢. عن عبدِ الرحمٰن بن مَيْسَرَةَ أنّهُ سَمِعَ المقدامَ بْنَ مَعدِ كرِبَ يقولُ رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يتوضّأ ...... ومَسَح بأذنَيه ظاهرَهما وباطنهما مرةً واحدةً.

আলোচ্য হাদীসে উভয় কর্ণের বহিরাংশ ও অভ্যন্তরাংশ একবার মাসেহ করার কথা উল্লেখ আছে–

٣. عن عباس بن تميم الانصاريّ عن ابيه أنّه رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توضّأ فمَسَح رأسَه وأذنَيه داخِلَهما وخارِجَهما.

এছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ হযরত উমর ইবনে শোয়াইব তার পিতা থেকে তার পিতা তার দাদা থেকে। হযরত উমামা বাহেলী। হযরত রুবাইয়া ইবনেতে মুয়াওয়াজ ইবনে আফরা।

এ সকল হাদীসে হুজুর (স) এর স্পষ্ট ফেল বিদ্যমান আছে যে, হুজুর (স) উভয়কানের বাহিরাংশ ও অভ্যন্তরাংশ মাসেহ করেছেন। আর এ বিষয়ে এত অধিক পরিমাণ হাদীস বর্ণিত আছে যে, এটা মুতাওয়াতের পর্যন্ত পৌঁছেছে। কাজেই মুতাওয়াতের বর্ণনার মোকাবেলায় অন্য রেওয়ায়াতের উপর আমল করা যায় না।

যৌক্তিক দলীল-২ ঃ এ ব্যাপারে যৌক্তিক প্রমাণ হলো ইহরাম অবস্থায় মহিলার জন্য তার চেহারা ঢাকার অনুমতি নেই। কিন্তু মাথা ঢাকার অনুমতি আছে। এতে কারও মতবিরোধ নেই। আর এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, মুহরিমা মহিলার জন্য উভয় কানের বহিরাংশ ও ভিতরাংশ উভয়টিই ঢাকা জায়েয আছে। অতএব, যেভাবে ইহরামের মাসআলায় কানের উপর ও ভিতরাংশ মাথার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং মাসেহর ক্ষেত্রেও উভয় কান মাথার হুকুমে হবে এবং কানের ভিতর ও বহিরাংশ উভয় অংশ মাসেহ করা আবশ্যক হবে; শুরু অংশ ধৌত করা ঠিক হবে না।

যৌক্তিক দলীল-৩ ঃ প্রতিপক্ষ কানের বহিরাংশ মাসেহ করার ব্যাপারে মতানৈক্য করেন না কিন্তু কানের ভিতরের অংশ মাসেহ করার ব্যাপারে মতানৈক্য করেন। কাজেই যদি উভয় কানের ভিতর অংশ ধৌত করা হয় তাহলে মতানৈক্য শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা দেখি উযূতে ফরয চারটি অঙ্গ তিনটি ধৌত করতে হয়। চেহারা, হাত পা, একটি অঙ্গ মাসেহ করতে হয়।এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, যে সব অঙ্গ ধোয়ার হুকুম সেগুলোকে পরিপূর্ণরূপে ধৌত করতে হয়। এরূপ নয় যে, এক উযূর কিছু অংশ ধৌত করবে, আর কিছু অংশ মাসেহ করবে। যে সব অঙ্গ মাসেহ করার হুকুম রয়েছে সেগুলোতে পরিপূর্ণ মাসেহ করতে হয়। কিছু অংশ মাসেহ করবে আর কিছু ধৌত করবে এ রকম নয়। আর কানের বহিরাংশ মাসেহ করার ব্যাপারে প্রতিপক্ষও আমাদের সঙ্গে একমত, মতানৈক্য হলো, অভ্যন্তর ভাগ সম্পর্কে। অথচ উযূর অঙ্গ সম্পর্কে মূলনীতি হলো কোন এক অঙ্গ এরূপ কোন বিভাজন হয় না যে, কিছু মাসেহ করবে আর কিছু ধৌত করবে। কাজেই কানের কিছু অংশ সম্পর্কে যেহেতু তারাও মাসেহ করার প্রবক্তা, সেহেতু আবশ্যিকভাবেই অবশিষ্ট অংশেও তাদের মাসেহ মেনে নিতে হবে। যাতে একইঅঙ্গে পার্থক্য না হয়।

চতুর্থ দলীল : সাহাবায়ে কিরামের এক বৃহত জামাতের আমল ও ফাতওয়া হলো উভয় কানের বহিরাংশে ও অভ্যন্তরীণ অংশ মাসেহ করতে হবে। হযরত আনাস (রা) এর আমল এর উপর প্রমাণ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) এর উপরই ফাতওয়া দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এর উপরই আমল করেছেন এবং এর উপরই ফতওয়া প্রদান করেছেন। হযরত সাহাবা কিরামের আমল এবং ফতওয়া এ কথার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, উভয় কানের বহিরাংশ ও অভ্যন্তর অংশ মাসেহ করতে হবে।

বিপক্ষবাদীদের দলীলের জবাব

প্রতিপক্ষ নিজেদের মাযহাবের সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আলী (রা) এবং হুজুর (স) এর আমলকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন। আর এটা একেবারে সুস্পষ্ট কথা যে, স্বয়ং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আমল তার নিজের রেওয়ায়াতের পরিপন্থী। আর এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো যখন রাবীর রেওয়ায়াত তার আমলের বিপরীত হয় তখন রেওয়ায়াতকে মানসূখ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং আমলকেই নসখের দলীল ধরা হয়। কাজেই অনুচ্ছেদের শুরুর রেওয়ায়াত যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত তা ইবনে আব্বাস (রা) এর আমল দ্বারা মানসুখ হয়ে যাওয়া স্পষ্ট। সুতরাং তাকে দলীল হিসাবে পেশ করা সহীহ নয়। (ইযাহুত ত্বহাবী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৩৭-১৩৮-১৩৯-১৪০-১৪১)

سوال : ما حُكْمُ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ بَيِّنْ مَعَ اِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ۔

প্রশ্ন : কর্ণদ্বয় মাসেহ করার হুকুম কি? উলামাদের মতানৈক্যসহকারে বর্ণনা কর।

উত্তর : কান মাসেহ করার ব্যাপারে ইমামদের অভিমত বর্ণনা কর : কান মাসেহ করার হুকুম কি? এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে তিনটি মাযহাব রয়েছে।

১. ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী (র) بدائع الصنائع এর প্রথম খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখেন, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানীফা এবং জুমহুর ফুকাহাদের নিকট উযূতে উভয় কান মাসেহ করা সুন্নত।

২. আল্লামা মুওয়াফ্ফাকুদ্দীন ইবনে কুদামা মুগনী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৯০ পৃষ্ঠায় নকল করেছেন যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এর নিকট উভয় কান উযূতে মাসেহ করা ওয়াজিব। আল্লামা শাওকানী (র) নায়লুল আওতার নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায় ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এর মতও এটা বলে উল্লেখ কচ্ছেন।

৩. আল্লামা ইবনে রুশদ মালেকী বজলুল মাজহুদের প্রথম খণ্ডের ১৪ পৃষ্ঠায় নকল করেন ইমাম আবু হানীফা মালেকী মাযহাবের কতক উলামাদের নিকট উভয় কান মাসেহ করা ফরয। ইবনে রুশদ যে ইমাম আবু হানীফা (র) এর দিকে ফরজিয়্যাতের নিসবত করেছেন, তাঁর বিষয়ে জ্ঞাত না থাকার কারণে। হানাফী মাযহাবের অসংখ্য কিতাবের কোথাও ইমাম আবু হানীফা (র) এর নিকট ফরযিয়্যাত এর কথা নেই।

(বজলুল মাজহুদ ১/৭৫, আওজাযুল মাসালিক ১/৭৬, হাশিয়ায়ে কাওকাবুদ দুরারী ২/২৮, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/২৮, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/১৪)

سوال : هَلْ يَجِبُ مَاءُ الْجَدِيْدُ لِمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ اَمْ لَا بَيِّنْ.

প্রশ্ন : কান মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নেয়া জরুরী কিনা বর্ণনা কর।

উত্তর : কান মাসেহ করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে পানি নেয়া জরুরী নাকি মাথা মাসাহের অবশিষ্ট পানি দ্বারাই মাসেহ যথেষ্ট হবে। এ ব্যাপারে দুটি মাযহাব রয়েছে–

১. ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং আবু সাওর প্রমূখ ইমামের নিকট কান মাসেহ করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে পানি নেয়া এবং তা দ্বারা কান মাসেহ করা সুন্নত, এটাই সকল কিতাবে বর্ণিত আছে।

২. ইমাম আবু হানীফা এবং সুফিয়ান সাওরী (র) এর নিকট মাথা মাসেহ এর অবশিষ্ট পানি দ্বারা কান মাসেহ করা সুন্নত; স্বতন্ত্রভাবে পানি নেয়া জরুরী নয়। (ইযাহুততৃহাবী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৪২)

سوال: هَلْ تَكْرَارٌ مُسْتَحَبٌّ فِيْ مَسْحِ الْاُذُنَيْنِ بَيِّنْ.

প্রশ্ন ঃ কান মাসেহ করার ক্ষেত্রে تكرار মুস্তাহাব কি?

উত্তর ঃ কান একাধিকবার মাসেহ করা মুস্তাহাব কি না এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে–

১. মুয়াফফাকুদ্দীন ইবনে কুদামা মুগনী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৮৮ পৃষ্ঠায় নকল করেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র) এর নিকট تكرار তথা একাধিকবার মাসেহ করা মুস্তাহাব।

২. অবশিষ্ট তিন ইমাম ও জুমহুর উলামায়ে কিরামের মতে কান একাধিকবার মাসেহ করা মুস্তাহাব নয়, বরং একবার মাসেহ করা মুস্তাহাব। (ইযাহুত ত্বহাবী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৪২)

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ঃ হাদীসের এ ইবারত থেকে বুঝা যায় কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া উভয়টা এক অঞ্জলি পানি দ্বারা করেছেন। এটাই وصل এর সুরত। ইমাম শাফেয়ী (র) এটাকেই উত্তম বলেন, এবং হানাফীগণও এটাকেই জায়েয বলেন, কিন্তু তাদের নিকট فصل আফজাল তথা উভয় কাজ ছয় অঞ্জলি পানি দ্বারা করা হবে, এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ পেছনে অতিবাহিত হয়েছে।

মোল্লা আলী ক্বারী (র) শরহে নুকায়া এর মধ্যে وصل এবং فصل উভয় প্রকার রেওয়ায়াত নকল করার পর লেখেন, উভয় রেওয়ায়াত সহীহ তবে উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধন হল, প্রত্যেক রাবী যে যা দেখেছে সে সেটাকে বর্ণনা করেছে। কাজেই যে কোনটার উপর আমল করা হোক না কেন, সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য কোনটা করা আফজাল এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, আমি ظهيرية গ্রন্থে এ মাসআলা পেয়েছি। যদি কেউ প্রথমে কুলি করে অতঃপর নাকে পানি দেয় এক অঞ্জলি পানি দ্বারা তাহলে পানি مستعمل (ব্যবহৃত) হবে না। কিন্তু যদি কেউ এর বিপরীতটা করে তাহলে পানি مستعمل (ব্যবহৃত) হয়ে যাবে। সুতরাং সর্বত্তোম কথা তো এটাই যে, যদি কেউ وصل এর সাথে তিন অঞ্জলি পানি দ্বারা উভয় কাজ সম্পাদন করে তাহলে মাকরূহ বিহীনভাবে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। কেননা, এটা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। শায়খ ইবনে হুমাম (র) এ কথার প্রবক্তা, অবশ্য كمال سنه (পূর্ণাঙ্গ সুন্নত) শুধুমাত্র فصل তথা ৬য় অঞ্জলি পানি দ্বারা উভয়টি পৃথক পৃথকভাবে আদায় করার দ্বারাই আদায় হবে।

قوله مرة مرة ঃ শব্দের ব্যাপারে আলিমগণের বক্তব্য ঃ ১. আল্লামা কুসতুলানী (র) বলেন, শব্দ দুটি مفعول مطلق হিসাবে নছব বিশিষ্ট হয়েছে এবং এটা সংখ্যা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

২. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, শব্দ দুটি মাসদার হিসাবে নছব বিশিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ اى غَسَلَ كُلَّ عُضْوٍ مَرَّةً واحدة অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গকে একেকবার ধৌত করা।

ইবারত সম্পর্কে আলোচনা

১. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এ হাদীস দ্বারা ইবনুত ত্বীন দাড়ি খেলাল করা ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেন। কেননা, চেহারাকে একবার ধৌত করার পর হুজুর (স) এর নিকট এ পরিমাণ অতিরিক্ত পানি বিদ্যমান ছিল না যার দ্বারা দাড়ি খেলাল করা সম্ভব। ইবনুত ত্বীন (র) এটাও বলেন যে, হাদীসের উক্ত ভাষ্য দ্বারা ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের কথা খণ্ডিত হয়ে যায় যারা তিনবার ধৌত করাকে ফরয বলেন।

২. মোল্লা আলী ক্বারী (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) যে উযূর বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে প্রত্যেক অঙ্গকে একেক বার ধৌত করেছিলেন। অন্যথায় অসংখ্য সহীহ হাদীসে তার থেকে বেশী বার ধৌত করার কথা উল্লেখ আছে। আর হুজুর (স) থেকে যে একবার ধৌত করার বর্ণনা এসেছে তা বৈধতার বর্ণনার জন্য। মোটকথা, এ ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর হাদীসে রাসূল (স) এর অভ্যাস ও সবসময়ের আমল বর্ণনা করা হয়নি। বরং فعل جزى এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য হাদীসে পা ধৌত করার কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনায় তা উল্লেখ আছে। যেমন হাদীসের রাবী– আব্দুল আজিজ ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি সংবাদ প্রদান করেছে যে ইবনে আজালান তথা মুহাম্মাদ ইবনে আজালান থেকে শুনেছে, তিনি বলেন, আলোচ্য হাদীসে পা ধৌত করার কথাও উল্লেখ ছিল, সুতরাং তা সামনের শিরোনামে উল্লেখ করা হবে। (শরহে উর্দু নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১৮৫)

بَابُ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ

١٠٢. اخبرنا مُجَاهِدُ بنُ موسى قال حدّثنا عبدُ الله بنُ ادريسَ قال حدّثنا ابنُ عَجلانَ عن زيدِ بنِ اسلمَ عن عطاءِ بنِ يسارٍ عن ابنِ عبّاسٍ قال توضّأ رسولُ الله ﷺ فغرف غُرفةً فمضمضَ واستنشقَ ثمّ غرفَ غُرفةً فغسلَ وجهَهُ ثمّ غرف غُرفةً فغسل يده اليُمنى ثم غرف غُرفةً فغسل يده اليُمنى ثم غرف غرفةً فغسل يَدَه اليُسرى ثم مسح برأسه وأُذُنيه باطنهما بالسَّبّاحتينِ وظاهرهما بإبهاميه ثم غرف غُرفةً فغسل رِجلَيه اليُمنى ثم غرف غرفةً فغسل رِجلَه اليُسرى ـ

١٠٣. اخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ وعُتبةُ بنُ عبدِ الله عن مالكٍ عن زيدِ بنِ اسلمَ عن عطاءِ بنِ يسارٍ عن عبدِ الله الصُّنابحيِّ انّ رسولَ الله ﷺ قال إذا توضّأ العبدُ المؤمنُ فتمضمضَ خرجتِ الخطايا مِنْ فِيهِ فإذا استنثرَ خرجتِ الخطايا مِن أنفه فإذا غسل وجهه خرجتِ الخطايا مِن وجهه حتّى تخرجَ مِن تحتِ أشفارِ عينيه فإذا غسل يديه خرجتِ الخطايا مِن يديه حتّى تخرجَ مِن تحتِ أظفارِ يديه فإذا مسح برأسه خرجتِ الخطايا مِنْ رأسه حتّى تخرجَ مِن أُذنيه فإذا غسل رجليه خرجتِ الخطايا مِن رجليه حتّى تخرجَ مِن تحتِ اظفارِ رِجليه ثم كانَ مَشيُه إلى المسجدِ وصلوتُه نافلةً لهُ - قال قُتيبة عنِ الصُّنابحيِّ أنّ النبيَّ ﷺ قال ـ

অনুচ্ছেদ ঃ মাথার সাথে কান মাসেহ করা এবং যা দ্বারা উভয় কান মাথার অংশ প্রমাণ করা হয় তার বর্ণনা

অনুবাদ ঃ ১০২. মুজাহিদ ইবনে মূসা (র)......... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) উযূ করেন। (উভয় হাত ধৌত করেন।) তিনি এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। আবার এক অঞ্জলি পানি নেন এবং মুখমণ্ডল ধৌত করেন। আবার এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং আর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান হাত ধৌত করেন। পুনরায় এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম হাত ধৌত করেন। তারপর মাথা ও কান মাসেহ করেন। কানের ভিতর দিক শাহাদত অঙ্গুলী ও বাহির দিক বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মাসেহ করেন। আবার এক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান পা ধৌত করেন এবং এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম পা ধৌত করেন।

১০৩. কুতায়বা ইবনে সাঈদ ও উত্‌বা ইবনে আবদুল্লাহ (র)....... আবদুল্লাহ সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মুমিন বান্দা যখন উযূ করে এবং কুলি করে তখন তার মুখের গুনাহ বের হয়ে যায়। যখন সে নাকে পানি দেয় তখন নাকের গুনাহ বের হয়ে যায়। যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন মুখমণ্ডলের গুনাহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার চক্ষু-পলকের গোড়ার গুনাহ্ পর্যন্ত বের হয়ে যায়। যখন হাত ধৌত করে তখন তার হাতের গুনাহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নিচের গুনাহ পর্যন্ত বের হয়ে যায়। যখন মাথা মাসেহ করে তখন মাথার গুনাহ বের হয়ে যায়। এমনকি কানের গুনাহ পর্যন্ত বের হয়ে যায়। যখন পা ধৌত করে তখন পা-এর গুনাহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার পায়ের নখের নিচের গুনাহ্ পর্যন্ত। তারপর মসজিদে যাওয়া ও নামায আদায় করা তার জন্য অতিরিক্ত (নফল) ইবাদত (অতিরিক্ত সওয়াব) হিসাবে গণ্য হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : بَيِّنْ اِخْتِلَافَ الامام مَالِكٍ وَالْبُخَارِى فِى الصُّنَابِحِى الَّذِى رَوٰى عَنِ النَّبِىِّ صلعم ـ

প্রশ্ন ঃ হাদীসের রাবী সুনাবিহী সম্পর্কে ইমাম মালেক ও ইমাম বুখারী (র) এর মতভেদ উল্লেখ করে।

উত্তর ঃ সুনাবিহী নামে তিনজন মনীষী ছিলেন–

১. আব্দুল্লাহ সুনাবিহী , তিনি সর্ব সম্মতিক্রমে সাহাবী।

২. আবু আব্দুল্লাহ সুনাবিহী তিনি মুখাযরামীনের অন্তর্ভূক্ত।

৩. আস সুনাবিহী ইবনুল আসার আল-আহমাসী তিনি সাহাবী ছিলেন।

ইমাম মালেক (র) এর মতে, উযূর ফযীলত সম্পর্কে যিনি হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন তিনি হল, সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ সুনাবিহী। এ হিসেবে হাদীসটি মুত্তাসিল। ইমাম বুখারী ও আলী ইবনুল মাদীনীর মতে তিনি হল, আবু আব্দুল্লাহ সুনাবিহী মুখাযরামী। সে হিসেবে হাদীসটি মুরসাল। তাদের উক্তি হল, আব্দুল্লাহ সুনাবিহী নামক কোন সাহাবী নেই। মূলতঃ ইমাম মালেক (র) এর ওহাম বা ভুল হয়েছে।

ইমাম বুখারী (র) এবং ইবনুল মাদিনী (র) যে মতটি পেশ করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভুল, ইমাম মালেক (র) এর মতই সহীহ। তার মতকেই হাফেজ ও অন্যান্যরা সঠিক বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, আব্দুল্লাহ আস সুনাবিহী নামক সাহাবী যে রয়েছেন তা বিভিন্ন দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত। ইমাম তিরমিযী (র)ও এ মাসআলার ব্যাপারে ইমাম মালেক (র) এর পক্ষ অবলম্বন করেছেন। তিরমিযী শরীফের যে নুসখাটি আমাদের কাছে রয়েছে, তা এটাই প্রমাণ করে। তবে মিশরের একটি নুসখাতে ইমাম বুখারী (র) এর রায়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। (শরহে তিরমিযী ৩১০)

সুনাবিহী সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা

صنابح শব্দটি يائے نسبت ব্যতীত ব্যবহৃত হয়। কখনো يا ء সহ তথা صنابحى ও ব্যবহৃত হয়। ইনি ছিলেন সাহাবী; তার পিতার নাম اعسر احمسى - ইমাম নববী (র) মুসলিমের শরাহ গ্রন্থে লেখেন, সুনাবিহ মুরাদের একটি শাখা। ইমাম তিরমিযী ইমাম বুখারী প্রমূখ মুহাদ্দিসীন বলেন, عبد الرحمن صنابحى এর শ্রবণ হুজুর (স) থেকে প্রমাণিত নেই। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) এর কথা দ্বারা স্পষ্টরূপে এটা বুঝা যায়। আব্দুল্লাহ সুনাবিহী ও আবু আব্দুল্লাহ সুনাবিহী দু'জন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। (ইসাবা)

"তাকরীব" গ্রন্থে আছে আবদুর রহমান ইবনে উসাইলা মুরাদী ঐ আব্দুর রহমান সুনাবিহী নির্ভরযোগ্য এবং বিশিষ্ট তাবেয়ীদের অন্তর্ভূক্ত। তিনি নবী (স) এর মৃত্যুর পাঁচ দিন পর মদীনায় পৌছেন। এটা বুখারীর রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়। বুখারী শরীফের কিতাবুল মাগাযির শেষে আছে যে, ৬৪২ হিজরীতে আবুল খায়ের সুনাবিহীকে জিজ্ঞেস করেন যে, مَتٰى هَاجَرْتَ তোমরা কখন হিজরত করেছ? তখন তিনি উত্তর দিলেন, আমি হিজরত করার উদ্দেশ্যে ইয়ামান থেকে বের হয়ে জুহফা নামক স্থানে পৌছলাম। (জুহফা হলো শামের অধিবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান) ঘটনাক্রমে এক আরোহী আমার সামনে এলো। আমি তাকে বললাম রাসূল সম্পর্কে আমাকে সংবাদ শোনাও। তিনি উত্তর দিলেন– دَفَنَّا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ خَمْسٍ এ থেকে বুঝা যায় আবু আব্দুল্লাহ সুনাবিহী রাসূল (স) এর সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হন। তিনি আব্দুল্লাহ মালিকের খেলাফত আমলে ইন্তিকাল করেন। মোটকথা, আব্দুল্লাহ সুনাবিহী ও আবু আব্দুল্লাহ সুনাবিহী ভিন্ন ভিন্ন দু'ব্যক্তি। প্রথম জন সাহাবী, আর দ্বিতীয় জন তাবেয়ী।

قوله خرجت الخَطَايَا مِنْ فِيْهِ ঃ উযূকারী ব্যক্তি যখন কুলি করে তখন সমস্ত গোনাহ মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ যখন সমস্ত গোনাহ মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো এখন অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা কি বের হবে? তার কোন গোনাহই তো অবশিষ্ট থাকে না। অথচ পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য অঙ্গ ধৌত করা ও মাসেহ করার দ্বারাও গোনাহ বের হয়ে যায়।

উত্তর ঃ ১. الخطايا এর মধ্যে - لام تعريف مضاف اليه এর বদলে এসেছে। এখন মূল বাক্য হবে

اى خَطَايَا الفَمِ مِنْ فِيْهِ وخَطَايَا الأَنْفِ مِنْ اَنْفِهِ عَلٰى هٰذَا الْقِيَاس

২. অথবা, এর করীনা থাকার কারণে الف لام হলো عهدى এখন উদ্দেশ্য হবে, স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রত্যেক অঙ্গ থেকে গোনাহ বের হয়ে যায়। কেননা, অঙ্গ থেকে গোনাহ বের হয়ে যাওয়া উক্ত উযূর পবিত্রতার فرع। সুতরাং প্রত্যেক অঙ্গ পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত গোনাহ বের হয়ে যায়, এখন আর কোন প্রশ্ন থাকে না।

প্রশ্ন ঃ উযূর দ্বারা তো সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়। এর দ্বারা কি শুধুমাত্র সগীরা গোনাহ মাফ হয় না কি সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনাহ মাফ হয়ে যায়?

উত্তর ঃ উযূ দ্বারা কি শুধু সগীরা গোনাহ মাফ হয় নাকি সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনাহ মাফ হয়ে যায় এ ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য রয়েছে।

১. মুতাআখখিরীন উলামায়ে কিরাম বলেন, শুধুমাত্র সগীরা গোনাহ মাফ হয়। কেননা, কুরআনে কারীমে এসেছে- إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

২. হাদীসে এসেছে مَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرَ এবং مَا لَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ অথবা, এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সগীরা গোনাহ তো অবশ্যই মাফ হবে। আর কবীরা গোনাহ তওবার মাধ্যমে মাফ হয়, তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, বাহ্যিকভাবে হাদীস দ্বারা বুঝা যায় সগীরা গোণাহ মাফ হওয়ার জন্য কবীরা গোনাহ ত্যাগ করা শর্ত। আমরা বলি যে, এর অর্থ এটা নয় যা বাহ্যিকভাবে বুঝে আসে, বরং এর অর্থ হলো সকল সগীরা গোণাহ তো অবশ্যই মাফ হয়ে যায়, যা সে পূর্বে করেছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে যদি কোন কবীরা গোনাহ থাকে তাহলে তা তওবা ব্যতীত মাফ হবে না, বরং তওবার মাধ্যমেই মাফ হবে। অথবা যদি আল্লাহ তাআলা স্বীয় ফজল ও করম দ্বারা মাফ করে দেন তাহলে মাফ হয়ে যাবে।

২. মুতাকাদ্দিমীন উলামায়ে কিরাম বলেন, তার সগীরা ও কবীরা সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে এ ক্ষেত্রে কোন কয়েদ নেই। যেমনটা মুতাআখখিরীন উলামায়ে কিরাম বলে থাকেন।

سوال : كيف نُسِبَ الخروجُ الى الخَطِيئَةِ وهِيَ مِنَ الْأَعْرَاضِ

প্রশ্ন ঃ গোনাহ তো اعراض **এর অন্তর্ভুক্ত তা সত্ত্বেও কিভাবে** خروج **এর সম্বন্ধ তার দিকে করা হল?**

উত্তর ঃ হাদীসে গোনাহ বের হওয়ার আলোচনা এসেছে। আর বের হওয়ার ক্রিয়াটি তো جوهر ও দেহের বৈশিষ্ট। অতএব গোনাহের ক্ষেত্রে বের হওয়ার প্রয়োগ কিভাবে হল? এর বিভিন্ন উত্তর নিম্নে দেয়া হল—

১. গোনাহ বের হওয়ার দ্বারা রূপকার্থে গোনাহ ক্ষমা হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য। এটি আল্লামা সুয়ূতী (র) এর মত।

২. আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) এর মতে গোনাহ বের হওয়ার নিসবতটি আল্লাহ তাআলার অধিক পছন্দনীয়।

৩. এখানে مضاف উহ্য রয়েছে। তা হল- اثر শব্দ। ইবারত এমন ছিল يَخْرُجُ مِنْ وَجْهِهِ اثرُ الْخَطِيئَةِ الخ অর্থাৎ তার চেহারা হতে গোনাহের প্রতিটি আছর বের হয়ে যাবে। বান্দা যখন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি দাগ পড়ে যায়। যখন সে উযূ করে তার সে দাগ দূর হয়ে যায়। এটি আবু বকর ইবনুল আরাবী (র) এর মত।

৪. এ ব্যাপারে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা দিয়েছেন হযরত শাহ সাহেব (র)। তিনি বলেন, মূলত: জগত দু' প্রকার। একটি হলো দৃশ্যমান জগত যা আমাদের চোখে সচেতন অবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়। আরেকটি হলো মিসালী জগত। পরিদৃষ্ট জগতে যে সব জিনিস عرض হয়ে থাকে সেগুলো অনেক সময় মিসালী জগতে جوهر বা স্বাধিষ্ঠতার রূপ ধারণ করে। অনুরূপ অবস্থায় সমস্ত গোনাহ যদিও পরিদৃষ্ট জগতে সেগুলো عرض। কিন্তু মিসালী জগতে এগুলোর প্রত্যেকটির দেহ এবং বিশেষরূপ বিদ্যমান। হাদীসে বের হওয়ার প্রয়োগ সে মিসালী জগতের দিকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে।

৫. মানুষের অঙ্গসমূহ হতে গুনাহ বের হওয়াটা বাস্তবেই হতে পারে। তা অসম্ভব কিছুই নয়, যেমন ইমাম আবু হানীফা (র) উযূকারীর অঙ্গ হতে গোনাহ বের হওয়াকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন।

৬. আল্লামা ইমাম নববী (র) বলেন, এখানে خروج এর হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা, গোনাহ غير مجسم (অশরীরি) বস্তু, বরং خروج خطايا দ্বারা এখানে রূপক অর্থে ক্ষমা উদ্দেশ্য।

৭. আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন, এখানে উদাহরণ স্বরূপ خروج শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তথা যেমনিভাবে শরীর বিশিষ্ট বস্তু বের হয়ে যায় ঠিক অদ্রুপ গোনাহও বের হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা না করে বরং এটাকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই উচিত।

৮. ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন বান্দা থেকে কোন গোনাহ সংঘঠিত হয় তখন তার অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যখন সে তা হতে তওবা করে নেয় তখন তা মুছে যায় এবং অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি তওবা না করে তাহলে কালো দাগ পড়তে পড়তে অন্তর কালো হয়ে যায়। তখন তা অন্তরের উপর প্রভাবশালী হয়। যেমন কুরআনে এসেছে–

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

৯. ইমাম আহমদ (র) ও ইবনে খুযাইমা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেন, হুজুর (স) বলেছেন, হজরে আসওয়াদ জান্নাতের একটি সাদা মূল্যবান পাথর। এটা বরফ থেকেও বেশী শুভ্র ছিল। কিন্তু মুশরিকদের গোনাহ তাকে কালো করে দিয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেন, যখন গোনাহ পাথর এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, তাহলে তা পাপী শরীরের উপর আরো উত্তমরূপে প্রভাব বিস্তার করবে। কাজেই হয়তো বা خطايا এর শুরুতে مضاف উহ্য মানতে হবে। মূল ইবারত হবে خَرَجَتْ اٰثَارُ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ

অর্থাৎ গোনাহের আছর তার মুখ থেকে বের হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ উক্ত আলোচনার উপর প্রশ্ন আরোপিত হয় যে, পূর্বের কথা দ্বারা বুঝা যায় উযূর দ্বারা গোনাহের আছর বের হয়ে যায়। আমরা তা কিভাবে বুঝব? কারণ আমরা তো তা দেখতে পাই না?

উত্তর ঃ গোনাহের যে আছর বের হয়ে যায় তা আমাদের চর্মচক্ষু দিয়ে কোন কিছু না দেখা তার অস্তিত্ব না থাকাকে প্রমাণ করে না। কারণ বহু জিনিস এমন আছে যা বাস্তবে বিদ্যমান কিন্তু আমরা চর্ম চক্ষু দ্বারা তা দেখি না। উদাহরণ স্বরূপ পানির কণা, অনু পরমাণু, বিভিন্ন ধরণের বাতাসে ভাসমান জীবাণু, এগুলো যদি অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করি তথাপি তা আমাদের দৃষ্টিতে আসবে না। কিন্তু যদি আমরা তা অনুবিক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখি তাহলে আমরা তো দেখতে পারি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন বস্তু আমাদের চোখে দেখতে না পারা তার অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করে না। ঠিক অদ্রুপ উযূর দ্বারা যে গোনাহ বের হয়ে যায় এটা যদিও আমরা আমদের দৃষ্টিতে দেখতে পাই না। কিন্তু যাদের অন্তর দৃষ্টি আছে তারা এটাকে দেখতে পারে। এ সম্পর্কে নিম্নে ঘটনা বর্ণনা করা হল–

১. এক ব্যক্তি হযরত উসমান (রা) এর মজলিসে আসল। সে রাস্তায় এক বেগানা মহিলাকে দেখেছিল। তিনি তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, অতঃপর বললেন, লোকদের কি অবস্থা হলো যে, রাস্তায় চোখের যিনায় লিপ্ত হয়ে আমার মজলিসে উপস্থিত হয়। গোনাহর আছর ঐ ব্যক্তির চোখে বিদ্যমান ছিল এবং হযরত উসমান (রা) তাকে নিজ চক্ষু দ্বারা দেখেছিলেন। এর দ্বারা গোনাহর আছর থাকার বিষয়টি বুঝা যায়।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) কুফার জামে মসজিদের উযূ খানায় তাশরীফ নেন। তখন লোকেরা উযূ করছিল। তিনি এক যুবকের উযূর পানি পড়তে দেখলেন, তাকে তিনি বললেন يَا وَلَدِىْ تُبْ عَنْ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ তখন যুববটি বলল تُبْتُ اِلَى اللّٰهِ عَنْ ذٰلِكَ (আমি উক্ত গোনাহ থেকে তওবা করছি।)

অনুরূপভাবে অন্য আরেক ব্যক্তির উযূর পানি দেখে বললেন يَا اَخِىْ تُبْ مِنَ الزِّنَاءِ সেও তখন উক্ত কর্মের ব্যাপারে তওবা করল। তিনি আরেক ব্যক্তির উযূর পানি দেখে বললেন, يَا اَخِىْ تُبْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَسِمَاعِ الاٰلَاتِ সে বলল اَللّٰهُمَّ تُبْتُ عَنْهَا মোটকথা, আল্লাহ তাআলা ইমাম আবু হানীফা (র) কে এমন অন্তর দৃষ্টি দান করেছিলেন যে, তিনি শরীর হতে গোনাহ বের হওয়াকে দেখতে পেতেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো অঙ্গ থেকে গোনাহ বের হওয়াকে দেখতে গেলে তেমন দূরদৃষ্টি থাকা আবশ্যক। আমাদের তেমন দৃষ্টি নেই, তাই আমরা দেখি না। মোটকথা এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, গোনাহ বের হতে দেখা সম্ভব।

ماء مستعمل এর ব্যাপারেইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত

ماء مستعمل এর হুকুমের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বিভিন্ন ধরণের মতামত পাওয়া যায়। কারণ আবু হানীফা (র) উযূর পানিতে গোনাহর আছর দেখতে পেতেন। কাজেই তিনি যেখানে উযূর পানি দিয়ে কবীরা গোনাহ বের হতে দেখেছেন সেখানে ماء مستعمل এর হুকুম বর্ণনা করেছেন نجاسة غليظة আর যেখানে সগীরা গোনাহ বের হতে দেখেছেন সেখানে ماء مستعمل এর হুকুম বর্ণনা করেছেন نجاسة خفيفة আর যেখানে উত্তম বস্তু ত্যাগ করতে দেখেছেন সেখানে ماء مستعمل এর হুকুম বর্ণনা করেছেন طاهر غير مطهر মোটকথা,

তার নিকট ماء مستعمل এর হুকুম গোনাহের আছারের সাথে সম্পৃক্ত। বর্ণিত আছে পরবর্তী সময়ে ইমাম আবু হানীফা (র) আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করেন, যেন তার এ অবস্থা উঠিয়ে নেয়া হয়। কারণ এতে লোকদের অবস্থা প্রকাশিত হয়ে যায় এবং তাদের প্রতি খারাপ ধারণা জন্ম নেয়। আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করে তাকে এ অবস্থা থেকে মুক্ত করেন। (ফতহুল মুলহিম প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৪০৯)

قوله حتى تخرج من اذنيه ঃ হাদীসের এ ইবারত দ্বারা ইমাম নাসায়ী (র) প্রমাণ পেশ করেন যে, কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মাথা মাসেহ এর কারণে উভয় কান থেকে গোনাহ বের হওয়া ঠিক হবে ঐ সময় যখন তা মাথার অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্ন হলো আলোচ্য মাসআলা প্রমাণিত করার জন্য কানকে মাথার অন্তর্ভুক্ত করে তাকে মাথার সাথে মাসেহ করতে হবে। এটা মশহুর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন– الاذنان من الرأس। তাহলে ইমাম নাসায়ী (র) এ হাদীসকে ছেড়ে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসকে কেনো গ্রহণ করলেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, প্রসিদ্ধ হাদীস ত্যাগ করে এ হাদীসকে এ জন্য গ্রহণ করেছেন যে, এ হাদীসটি মাশহুর হওয়ার ব্যাপারে হাম্মাদ সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি কি মারফু, না কি মাওকুফ এবং সনদ মজবুত, না কি মজবুত নয় এ ব্যাপারে নানান মন্তব্য রয়েছে , হ্যাঁ যদিও তার জবাব মুহাদ্দেসীনে কিরাম প্রদান করেছেন যে, হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে এর মারফু হওয়ার বিষয়টি শক্তিশালী হয় এবং দুর্বলতা থেকেমুক্ত হয়। আমাদের মুসান্নিফ (র) যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন তা অত্যন্ত উন্নত। এটা ইমাম নাসায়ী (র) এর দূরদর্শিতা এবং গভীর দৃষ্টির ফল।

আলোচ্য হাদীসটি হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল। কারণ যখন মাথা মাসেহ করার দ্বারা তার সমস্ত গোনাহ কান দিয়ে বের হয়ে যায়। এটাই এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, উভয় কান মাথার তাবে' বা অনুগামী। কাজেই কান মাসেহ করার জন্য স্বতন্ত্র পানি নেয়া সুন্নত নয় বরং মাথা মাসাহের পর অবশিষ্ট আদ্রতা দ্বারা কান মাসেহ করাই যথেষ্ট। অধিকাংশ قولى এবং فعلى হাদীস দ্বারা এ হুকুমই প্রমাণিত হয়। আর এটাই ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র) এর মাযহাব। এক বর্ণনা মুতাবেক এটা ইমাম মালেক (র) এরও বক্তব্য। ইমাম শাফেয়ী (র) এর মাযহাবের ন্যায় ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক (র) এর অপর আরেকটি قول আছে। ইমাম শাফেয়ী (র) এর নিকট উভয় কান নতুন পানি দ্বারা মাসেহ করা সুন্নত। এ ব্যাপারে একটি মারফু হাদীস বর্ণিত আছে। হাকেম (র) উক্ত হাদীসকে حرملة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن ابيه عن عبد الله بن زيد . সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন। আলোচ্য হাদীসে এসেছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেন, আমি হুজুর (স) কে উযূ করতে দেখেছি, فاخذ ماء لاذنيه خلاف الماء الذى مسح برأسه হাকেম বলেন, এ হাদীসটি মুসলিম ও বুখারী শরীফের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। এ হাদীস দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র) প্রমাণ পেশ করেন। কেননা, আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উভয় কান মাসেহ করার জন্য স্বতন্ত্র পানি নিয়েছেন।

হানাফীরা এর উত্তর প্রদান করতে গিয়ে বলেন, এর দ্বারা বুঝা যায় একই পানি দ্বারা হুজুর (স) মাথা ও কান মাসেহ করতেন। তবে যদি কখনো হাতের আদ্রতা শুকিয়ে যেত তাহলে নতুন করে পানি নিতেন। মোটকথা, নতুন পানি নেয়ার বিষয়টি হলো হাতে আদ্রতা না থাকার ক্ষেত্রে। অথবা, এটা বৈধতা বর্ণনা করার জন্য। এর দ্বারা উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় হয়ে যায়। আর হানাফীরা এ কথারই প্রবক্তা। তারা বলেন উভয় হাতে আদ্রতা থাকা অবস্থায় মাথা মাসেহ করার অবশিষ্ট পানি দ্বারা কান মাসেহ করবে। নতুন পানি নেয়ার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় নতুন করে পানি নেয়া জায়েয। শায়খ ইবনে হুমাম ফাতহুল কাদীরে এমনই উল্লেখ করেছেন।

قوله وصلاته نافلة له ঃ অর্থাৎ তার মসজিদে চলা এবং তার নামায আদায় করা তার জন্য অতিরিক্ত বিষয় হয়ে যায়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উযূর দ্বারা তো সে সমস্ত গোনাহর থেকে পবিত্র হয়ে যায়। আর সে যে নামায আদায় করে তা অতিরিক্ত মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ ঘটে।

আল্লামা ত্বীবী (র) বলেন, যে নামায আদায় করে তা অতিরিক্ত অর্থাৎ উযূ দ্বারা তো উযূর অঙ্গসমূহের গোনাহ পাক হয়ে গেছে । আর নামায দ্বারা অতিরিক্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়। (শরহে নাসায়ী ১৯০-১৯১ পৃষ্ঠা)

بابُ المَسْحِ عَلى العِمامَةِ

١٠٤. اخبرَنا الحَسين بنُ منصورٍ قال حدّثنا ابو مُعاوية حدّثنا الاعمشُ ح واخبرَنا الحسينُ ابن منصورٍ قال حدّثنا عبدُ الله بنُ نُميرٍ قال حدّثنا الاعمشُ عن الاَحكمِ عن عَبْدِ الرّحمٰن بنِ ابى ليلٰى عن كعبِ بْنِ عُجرةَ عن بلالٍ قالَ رأيتُ النبيَّ ﷺ يَمْسَحُ على الخُفّيْن والخِمار -

١٠٥. اخبرَنا الحسينُ بن عبدِ الرحمٰن الجَرجرائى عن طلقِ بْنِ غنامٍ قال حدّثنا زائدةُ وحفصُ بْنُ غياثٍ عَن الاَعْمشِ عَن الحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرحمٰنِ بْنِ اَبى لَيْلٰى عَنِ البَراء بْنِ عازبٍ عنْ بِلالٍ قالَ رايتَ رسولَ اللّٰه ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ -

١٠٦. اخبرَنا هنّادُ بْنُ السّرِيِّ عَن وكيعٍ عنْ شُعْبَةَ عن الحَكَمِ عن عبدِ الرحمٰنِ بْنِ اَبى ليلىٰ عن بلالٍ قالَ رأيتَ رسولَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الخِمار والخُفَّيْنِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ পাগড়ির উপর মাসেহ করা

অনুবাদ ঃ ১০৪. হুসায়ন ইবনে মানসূর (র)......বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে মোজা ও পাগড়ির উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

১০৫. হুসায়ন ইবনে আবদুর রহমান জারজারায়ী (র)........বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে উভয় মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

(বাগদাদ ও ওয়াসিতের মাঝখানে অবস্থিত একটি শহরের নাম জারজারায়া।)

১০৬. হান্নাদ ইবনে সারী (র).........বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে পাগড়ী ও মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : هل يجوزُ المَسْحُ علَى العِمامَةِ بَدَلاً عَنْ مَسْحِ الرأسِ؟ هَاتِ اقوالَ العُلماءِ فِيْه.

প্রশ্ন ঃ মাথা মাসেহ এর পরিবর্তে পাগড়ীর উপর মাসেহ জায়েয হওয়ার বিষয়ে আলেমদের মতামত উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ পাগড়ীর উপর মাসেহ প্রসঙ্গে মতভেদ ঃ উযূতে মাথা মাসেহ না করে কেবল পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়েয কি না এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১. হযরত সুফিয়ান সাওরী, দাউদে জাহেরী, ইমাম আওযায়ী, ইমাম ইসহাক ও ইমাম আহমদ (র) এর মতে পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়েয। কাজেই কেউ পাগড়ীর উপর মাসেহ করলে মাথা মাসেহ এর ফরজ আদায় হবে। তবে ইমাম আহমদ (র) এর মতে পূর্ণ পবিত্রতা ও উযূর পর পাগড়ীর উপর মাসেহ করলে ফরজ আদায় হবে।

২. ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে, পাগড়ীর উপর মাসেহ করলে মাথা মাসেহ এর ফরজ আদায় হবে না। তবে হ্যাঁ ফরজ পরিমাণ মাসেহ করার পর পাগড়ীর উপর মাসেহ করা সুন্নত।

৩. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইবনে মুবারক, সুফিয়ান সাওরী, শা'বী, ইব্রাহীম নাখয়ী ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে, পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়েয নেই।

ইমাম আহমদ (র) এর দলীল ঃ

..... عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَمَرَهُمْ اَنْ يَمْسَحُوا عَلَي الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِين

সাওবান (র) হতে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (স) [শত্রু মুকাবিলায়] একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা ঠান্ডায় আক্রান্ত হন, অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট ফিরে এলে তিনি (স) তাদেরকে পাগড়ী ও মোজার উপর মাসেহ করার আদেশ (অনুমতি) দেন।

দলীল ঃ ২.

عن مُغِيْرَة بنِ شُعْبَة قال تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَة.

অর্থাৎ ... হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন নবী কারীম (স) উযূ করলেন এবং চামড়ার মোজা ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করেন। (বুখারী ১/৩৩, তিরমিযী ১/২৯, ইবনে মাজাহ ৪২)

দলীল ঃ ৩. عَنْ بلال ان النبيّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلي الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَار অর্থাৎ...বিলাল (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) মোজা ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করেছেন। (তিরমিযী ১/২৯, নাসায়ী ১/২৯, ইবনে মাজাহ ৪২)

আকলী দলীল ঃ পায়ে মোজা পরিহিত হলে মোজার উপর মাসেহ করা যেমন জায়েয, তেমনিভাবে মাথার উপর পাগড়ী থাকলে তার উপর ও মাসেহ করা জায়েয হওয়া যুক্তির দাবী।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল ঃ فَمَسَحَ بِنَاصِيَة وعَلَى الْعِمَامَة অর্থাৎ তিনি কপালের অগ্রভাগ ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করেন।

আবু হানীফা (র) এর দলীল ঃ ১. আল্লাহ তাআলার বাণী- اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُم

অর্থাৎ তোমরা উযূতে তোমাদের মাথা মাসেহ কর। (মায়েদা-৬) পাগড়ীতে মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়নি।

দলীল ঃ ২. মাথা মাসেহ করার হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির এবং অসংখ্য।

আকলী দলীল ঃ পবিত্র কুরআনে যে তায়াম্মুমের জন্য মুখ ও হাত মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে সে ক্ষেত্রে যদি মুখ ও হাতের উপর কোন প্রকার কাপড় থাকে তাহলে তার উপর মাসেহ করলে মাসেহ আদায় হবে না। এর কারণ হলো মাঝখানে কাপড়ের প্রতিবন্ধকতা। আর এক্ষেত্রেও পাগড়ী হলো মাথার জন্য প্রতিবন্ধকতা। অতএব, পাগড়ীর উপর মাসেহ করলে, তা শুদ্ধ হবে না।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

১. পাগড়ীর উপর মাসেহ করার হাদীসগুলো খবরে ওয়াহিদ এবং সংখ্যায় খুবই কম যা দ্বারা কিতাবুল্লাহ ও মাথা মাসেহ সংক্রান্ত অসংখ্য মুতাওয়াতির হাদীসের বিধান খর্ব করা যায় না।

২. আল্লামা হাফিজ যায়লাঈ (র) বলেন, যে সব রেওয়ায়েতে পাগড়ীর উপর মাসেহ করার আলোচনা রয়েছে। সেগুলো সংক্ষিপ্ত যা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে, যেমন মূলে ছিল مسح عَلى ناصِيَته وعِمامَته অর্থাৎ তিনিতার মাথার সম্মুখ ভাগ ও তাঁর পাগড়ী মাসেহ করেছেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে।

عن انسِ بْنِ مالك قال رأيتُ رسولَ اللّٰه صلي الله عليه وسلّم يَتَوَضَّأُ وعَلَيْه عِمامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فادْخَل يَدَه مِن تَحتِ العِمامَة فَمَسَحَ مقدَّم رَأْسِه ولم يَنْقُض العِمامَة.

অর্থাৎ আনাস ইবনে মালেক (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে একটি কিতরী পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় উযূ করতে দেখেছি। এ সময় তিনি তাঁর হাত পাগড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মাথার সম্মুখ ভাগ মাসেহ করলেন। কিন্তু পাগড়ী খোলেননি। এতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (স) প্রথমে ফরজ পরিমাণ মাথা মাসেহ করার পর পাগড়ীর উপর মাসেহ করেছেন। আর এটা সবার নিকটই জায়েয।

আল্লামা সারাখসী (র) অনুচ্ছেদের শুরুতে সাওবান (রা) এর বর্ণিত হাদীসের অন্য একটি জবাবে বলেন, পাগড়ীর উপর মাসেহ করার হুকুমটি ছিল ঐ সেনাদলের জন্য খাস। ওযরের ভিত্তিতে তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

(তানযীমুল আশতাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৫৯)

৪. সম্ভবত রাসূলে কারীম (স) মাথা মাসেহ করার পর পাগড়ী ঠিক করেছিলেন। এর দ্বারা রাবী বুঝে নিয়েছেন যে, পাগড়ীর উপর মাসেহ করেছেন, যেমন–হযরত ইবনে মা'কাল (রা) এর হাদীসে আছে। তিনি বলেন, আমি মহানবী (স) কে উযূ করতে দেখেছি। তখন তাঁর মাথায় পাগড়ী ছিল। তিনি পাগড়ীর ভিতরে হাত ঢুকালেন এবং মাথা মাসেহ করলেন। কিন্তু পাগড়ী খুললেন না।

৫. মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করে এর পর পাগড়ীর উপর মাসেহ করেছেন।

৬. وَعَلَى الْعِمَامَةِ বাক্যাংশ عاطفة নয় বরং حالية তাহলে অর্থ হয়, তিনি মাথার এক চতুর্থাংশ এমন অবস্থায় মাসেহ করেছেন যে, তাঁর মাথায় পাগড়ী ছিল।

৭. এ হাদীসের مَسْحُ عِمَامَةٍ অংশটি রহিত হয়ে গেছে এবং مسح خفين সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয আছে।

(শরহে মিশকাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩১৮)

আকলী দলীলের জবাব ঃ মোজার উপর মাসেহ করার হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির। কিন্তু পাগড়ীর উপর মাসাহের বিষয়টি এমনটি নয়। সুতরাং কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বোপরি ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন–

بَلَغَنَا اَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ فَتُرِكَ (موطا محمد ص ١ص)

অর্থাৎ আমরা জানতে পেরেছি যে, পাগড়ীর উপর মাসাহের আমল প্রথমে ছিল, পরে তা পরিহার করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল হাই লাখনভী (র) লিখেছেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর এ উক্তি দ্বারা পাগড়ীর উপর মাসাহের বিষয়টির চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যায়। (দরসে তিরমিযী-১/৩৩৬-৩৩৭, ইলাউস সুনান ১/৩৭-৩৮)

سوال : هل يجوزُ المسحُ عَلَي الخِمار لِلْمرأة

প্রশ্ন ঃ মহিলাদের জন্য মাথার ওড়নার উপর মাসেহ করা কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ خمار এ উপর মাসেহ প্রসঙ্গ ঃ মেয়েদের ওড়নার উপর মাসেহ জায়েয কি না, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের অভিমত নিম্নরূপ। মহিলাদের ওড়না বিধানগতভাবে পাগড়ীর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে।

১. ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আবু হানীফা (র) এর অভিমত ঃ ইমামত্রয় ও তাঁদের অনুসারীরা বলেছেন যে, শুধু পাগড়ীর উপর সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করলে যেমন মাসেহ বিশুদ্ধ নয় তেমনি শুধু ওড়নার উপর দিয়ে গোটা মাথা মাসেহ করলেও মাসেহ বিশুদ্ধ হবে না, তবে একগুচ্ছ চুল পরিমাণ মাথা মাসেহ করার পর পাগড়ী বা ওড়নার উপর মাসেহ করলে মাসেহ এর ফরযিয়্যাত ও সুন্নত উভয়টি আদায় হয়ে যাবে। কারণ কুরআনের নির্দেশ হলো মাথা মাসেহ করা। অতএব, মাথার অংশ থাকতেই হবে।

২. ইমাম আহমদ ও তার অনুসারীদের অভিমত ঃ ইমাম আহমদ ও তাঁর অনুসারীরা বলেন, মাথার মাসেহ শুধু পাগড়ীর উপর সীমাবদ্ধ রাখলে যেমন মাসেহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তেমনি শুধু ওড়নার উপর মাসেহ সীমাবদ্ধ রাখলেও মাসেহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, হাদীসে এসেছে–

عن بِلالٍ انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ والخِمار وفِى رِوايةٍ عَلى العِمامَةِ فَالْخِمارُ فى حكمِ العِمامة .

হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা

আলোচ্য রেওয়ায়াতের মধ্যে يمسح على الخمار উল্লেখ আছে। এখানে خمار দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাগড়ী। এখন কথা হলো পাগড়ীর উপর মাসেহ করা বৈধ কি বৈধ না? এব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

১. আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম সাওরী ও ইবনুল মুবারক (র) বলেন, মাথা মাসেহ করার ফরজিয়্যাত শুধুমাত্র পাগড়ীর উপর মাসেহ করার দ্বারা আদায় হবে না। ইমাম খাত্তাবী ও ইমাম মাওয়ারদী (র) এটাকেই অধিকাংশ উলামার বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, জুমহুর সাহাবা ও তাবেয়ীদেরও মাযহব এটাই।

জুমহুর উলামার দলীল ঃ তারা আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ

আয়াতে স্পষ্টভাবে মাথা মাসেহ করার নির্দেশ এসেছে। যা উভয় পা ধৌত করার থেকেও বেশী স্পষ্ট। কারণ পা

ধৌত করার ক্ষেত্রে দুটি ক্বিরাত রয়েছে। কিন্তু মাথা মাসেহ করার ক্ষেত্রে এমনকোন সম্ভাবনা নেই। এর দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, মাথা মাসেহ করার বিষয়টি কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই প্রমাণিত। হাতের আদ্রতা মাথায়ই পৌঁছাতে হবে। আর যেহেতু পাগড়ী মাথা নয়। তাই পাগড়ীর উপর মাসেহকারীকে মাথা মাসেহকারী হিসাবে ধরা হবে না যেমনিভাবে পায়ের উপর মাসেহকারীকে মোজার উপর মাসেহকারী ধরা হয় না।

মোটকথা, মাথা মাসেহ করার বিষয়টি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে এটা সুন্নাতে মুতাওয়াতিরা দ্বারাও প্রমাণিত। কিন্তু পাগড়ীর উপর মাসেহ করার বিষয়টি খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং খবরে ওয়াহিদ মুতাওয়াতির হাদীসের মোকাবেলা কি ভাবে করবে? দ্বিতীয়ত: মাথা হলো উযূর অঙ্গসমূহের অন্তর্গত। তাই তার পবিত্রতা হলো মাসেহ। কাজেই মাথা ব্যতীত শুধুমাত্র পাগড়ীর উপর মাসেহ বৈধ নয়। কেউ যদি তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে চেহারা ও হাতের উপর কাপড় বা আবরণ রেখে তার উপর মাসেহ করে। তাহলে সকল ইমামের ঐক্যমতে মাসেহ সহীহ হয় না। তদ্রূপ এ ক্ষেত্রেও পাগড়ীর উপর মাসেহ বৈধ হবে না।

মাথা হলো এমন একটি অঙ্গ যাতে পানি লাগালে কোন ক্ষতি হয় না। কাজেই মাথা থেকে পৃথক কোন বস্তুর উপর মাসেহ বৈধ হবে না। যেমন তায়াম্মুমে হাতের পরিবর্তে আস্তীনে এবং চেহারার পরিবর্তে বোরকার নেকাবের উপর মাসেহ জায়েয নেই। মোটকথা, উক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেলো শুধুমাত্র পাগড়ীর উপর মাসেহ বৈধ নয়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) মুয়াত্তার মধ্যে বলেন, হযরত জাবের (র) কে যখন পাগড়ীর উপর মাসেহ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হল। তখন তিনি উত্তর দিলেন– لَا حَتّٰى يُمَسَّ الشَّعْرُ الْمَاءُ

যতক্ষণ পর্যন্ত চুলে পানি না পৌঁছে মাসেহ বৈধ হবে না। এর দ্বারা বুঝা যায় শুধুমাত্র পাগড়ীর উপর মাসেহ করা যথেষ্ট নয়। কেননা, কুরআনে কারীমে মাথা মাসেহ করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পাগড়ীর উপর নয়। কাজেই জাবের (র) এর ফতওয়া কুরআনের অনুকূলে ছিল। এখন প্রশ্ন হলো মাথা মাসেহ এর ফরযের পরিমাণের ব্যাপারে আবু হানীফা (র) এর নিকট মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয। আর ইমাম শাফেয়ী (র) এর নিকট দুই তিন চুল পরিমান মাসেহ করার দ্বারাই মাসেহ এর ফরজিয়্যাত আদায় হয়ে যাবে। এখন কথা হলো এ পরিমাণ মাসেহ করার পর পাগড়ীর উপর মাসেহ করা বৈধ কি না?

১. ইমাম শাফেয়ী (র) এর নিকট ফরয পরিমান মাথা মাসেহ করার পর যদি পাগড়ীর উপর দিয়ে পূর্ণ মাথা মাসেহ করা হয় তাহলে পরিপূর্ণ সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু এ বিধি প্রযোজ্য হবে ঐ সময় যখন পাগড়ী খোলা কষ্টদায়ক হবে। অন্যথায় পূর্ণ মাথার উপরেই মাসেহ করতে হবে এবং এর দ্বারাই মাসেহ পূর্ণ হবে।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে এ ব্যাপারে কোন উক্তি উল্লেখ নেই। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে শুধুমাত্র একথা উল্লেখ আছে যে, পাগড়ীর উপর ইসলামের শুরুতে মাসেহ বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে গেছে। কতক ব্যাখ্যাকার বলেন, মূলতঃ নবী (স) নাসিয়া তথা মাথার অগ্রভাগে মাসেহ করেছেন। অতঃপর মাসেহ পূর্ণ করছেন পাগড়ীর উপর মাসেহ করে। কাজেই বুঝা গেলো মাসেহ পূর্ণ করার জন্য পাগড়ীর উপর মাসেহ করা বৈধ।

৩. ইমাম আওযায়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক, আবু ছাওর প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ বলেন, পাগড়ীর উপর মাসেহ করা-ই যথেষ্ট। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শর্তহীন ভাবে এটা বৈধ বলেন, কিন্তু ইমাম আহমদ ও অন্যান্যগণ শর্ত সাপেক্ষে তাকে বৈধ বলেন। শর্ত হল– ১. পাগড়ীটা খুব মজবুতভাবে বাঁধা থাকতে হবে যে, তাকে খুলতে চাইলে খোলা কষ্টকর হয়ে যায়।

২. পূর্ণ পবিত্রতার পরে পরিধান করা হতে হবে।

৩. পাগড়ীটা পূর্ণ মাথাকে বেষ্টন করে নেবে; মাথায় কোন অংশ খোলা থাকবে না। এ সকল শর্তের মাধ্যমে পাগড়ীর উপর মাসেহ করা বৈধ।

তাদের দলীল হলো আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস যা হযরত বেলাল (রা) হতে বর্ণিত। এতে তিনি مسح على الخمار। শব্দ বৃদ্ধি করেছেন। আর خمار দ্বারা পাগড়ী উদ্দেশ্য। এর দ্বারা বুঝা যায় নবী (স) পাগড়ীর উপর মাসেহ করছেন।

এ ব্যাপারে আল্লামা সিন্ধী (র) এর বক্তব্য ঃ আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, জুমহুর উলামায়ে কিরাম পাগড়ীর উপর মাসেহ এর প্রবক্তা নন। তিনি অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসের জবাব প্রদান করেন যে–

১. এ হাদীসটি হলো খবরে ওয়াহিদ। কাজেই তাকে আল্লাহ তাআলার কিতাবের মুকাবেলায় দাঁড় করানো যাবে না। কেননা, কুরআনে কারীমে امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ বলেছেন। এর দ্বারা মাথা মাসেহ করা যে ফরয তা প্রমাণিত হয়। কাজেই পাগড়ীর উপর মাসেহকে মাথার উপর মাসেহ বলা সহীহ নয়।

২. অথবা, এর দ্বারা حكايت حال বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। সুতরাং এটা সম্ভব যে, যে পাগড়ীর উপর রাসূল (স) মাসেহ করেছিলেন তা এতো ছোট এবং পাতলা ছিল যে, তার উপর মাসেহ করার দ্বারা আদ্রতা মাথা পর্যন্ত পৌঁছাতো। خمار শব্দটি এটাই বুঝায়। কেননা, خمار কাপড়কে বলা হয় যা মহিলারা মাথা ঢাকার জন্য ব্যবহার করে থাকে। বা মাথায় বেঁধে থাকে। আর সাধারণত তা পাতলা ও ছোট হয়ে থাকে। ফলে তার উপর মাসেহ করলে আদ্রতা মাথা পর্যন্ত পৌঁছান অসম্ভব নয়। এ কারণেই রাবী তাকে خمار শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

৩. অথবা, এ ঘটনা হলো সূরা মায়েদাহ এর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। সুতরাং মায়েদার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দ্বারা তা মানসূখ হয়ে গেছে।

আল্লামা যফর আহমদ উসমানীর বক্তব্য ঃ আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (র) উক্ত জবাব শক্তিশালী করার জন্য তার সমর্থন পেশ করেন। প্রথম জবাবের সমর্থন হল, হযরত বেলাল (র) এর রেওয়ায়াত যা ইমাম আহমদ عبد الرحمن بن عوف এর সূত্রে নকল করেছেন।

উক্ত রেওয়ায়াতে مسح على خُفَّيْهِ وعَلَى خِمار العِمَامَة শব্দ এসেছে। অধ্যায়ে বর্ণিত এ রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় خمار পাগড়ী ভিন্ন অন্য কোন বস্তু। সম্ভবত: এখানে خمار দ্বারা ঐ কাপড় উদ্দেশ্য যা পাগড়ীর নিচে এবং মাথার উপরে ব্যবহার করা হত। যাতে করে পাগড়ীতে তেল না লাগে। আর সেটা এ পরিমাণ পাতলা হতো যে, তার উপর মাসেহ করলে আদ্রতা মাথা পর্যন্ত পৌঁছতো। এখানে এ সম্ভাবনা বিদ্যমান, তাই এর দ্বারা পাগড়ীর উপর মাসেহ করার উপর প্রমাণ পেশ করা সহীহ নয়; বরং বাতিল। আর তৃতীয় জবাবের সমর্থনে ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর উক্তি উল্লেখ করেছেন, যা মুয়াত্তায় রয়েছে, তিনি বলেন– بَلَغَنَا اَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَتْ فَتُرِكَ

পাগড়ীর উপর মাসেহ পূর্বে বৈধ ছিল। অতঃপর তা মানসূখ হয়ে গেছে। এ জবাবই হযরত সাওবান (র) এবং মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদের কওলী হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

যে হাদীস পাগড়ীর উপর মাসেহ করা বৈধ হওয়ার উপর স্পষ্টভাবে দালালত করে। এর দ্বারা সাওবানের হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা আবু দাউদ শরীফে রয়েছে। আর "তার সনদ বিশুদ্ধ মেনে নিলেও" এর দ্বারা মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদের হাদীস امْسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَار এর সনদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(ইত্তেদরাকুল হাসান প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১১-১২)

আল্লামা খাত্তাবীর বক্তব্য ঃ আল্লামা খাত্তাবী (র) মাআরিফুস সুনানে বলেন, মূলতঃ হুকুম হলো আল্লাহ তাআলা মাথা মাসেহকে ফরয করেছেন। আর এ অনুচ্ছেদে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তা তাবীলের অবকাশ রাখে। তাই এতে ব্যাখ্যা করার ইহতেমাল বিদ্যমান। আর কায়দা আছে– اَلْيَقِيْنُ لَايَزَالُ بِالشَّكِّ।

নিশ্চিত জিনিস সংশয়যুক্ত জিনিস দ্বারা রহিত হয় না। কাজেই সংশয়যুক্ত হাদীসের কারণে অকাট্য বিষয় পরিত্যাগ করা যাবে না।

আল্লামা মাওয়ারদির বক্তব্য ঃ আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন, ইমাম বুখারী হযরত বেলালের উক্ত হাদীসের সনদে যেহেতু اضطراب রয়েছে। তাই তিনি তাকে বর্জন করেছেন।

কেউ কেউ উক্ত হাদীসকে কোন মাধ্যম ছাড়া عَنْ ابى لَيْلَى عَنْ بِلاَلٍ এর সূত্রে রেওয়ায়াত করেছেন। কেউ কেউ মাধ্যমসহ বর্ণনা করেছেন। ঐ মাধ্যমটি কে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে–

১. কেউ কেউ ইবনে আবী লায়লা ও বেলালের মধ্যে كعب بن عجرة কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২. কেঁউ কেউ (তাকে) বারা ইবনে আযেব (র) কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৩. কেউ কেউ উক্ত হাদীসকে عَنْ عَلِى بْنِ ابى طالبِ عَنْ بلالٍ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৪. ইন্তেদরাকুল হাসানের ১/৫ পৃষ্ঠায় আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (র) লেখেন– কেউ কেউ উক্ত হাদীসকে عبد الرحمٰن بن عوفٍ رض عن بلال সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (মুসনাদ আহমদ ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১২)

৫. মুসনাদের ভিতরে উক্ত হাদীসকে عن نعيم بن حماد عن بلال محمد بن راشد মাকহুল এর মাধ্যমে রেওয়ায়াত করেছেন। উক্ত হাদীসের মতনেও قولا اضطراب বিদ্যমান ।

১. হযরত বেলাল (রা) কখনো বলেছেন– مَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰه صلّى اللّٰهُ عليه وسلّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ والخِمار এটা সহীহ মুসলিমে আছে।

২. কখনো তিনি বলেছেন– رأيتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عليه وسلمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَار নাসায়ী শরীফে এমন আছে।

৩. কোথাও বলেছেন– مَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ وعَلٰى خِمارِ العِمامَةِ (كما هُوَ عند احمد بطريق عبد الرحمن بن عوف)

৪. কখনো তিনি বলেছেন। كانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّين والخِمار (مسند احمد)

এ সকল রেওয়ায়াতে মতনের বিভিন্নতা ও সনদের اضطراب এর সাথে রাসূল (স) এর فعل বর্ণনা করেছেন। এটা রাসূলের কথা নয়। কেননা, সকল হুফফাজে হাদীস যারাই বেলাল থেকে উক্ত রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন সকলেই রাসূলের فعل উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে রাশেদের একটি রেওয়ায়াত যা সকল রেওয়ায়াতের পরিপন্থী এবং তিনি সকল নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীতে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন–

امْسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ (مسند احمد ج٦/ص١٣)

যা হোক উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, অনুচ্ছেদের বর্ণিত হাদীসে অনেক اضطراب রয়েছে। আর এ ধরণের اضراب যুক্ত রেওয়ায়াতের اضطراب দূর করা ব্যতীত তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সহীহ নয়।

ইমাম নববী (র) বলেন, হযরত বেলাল (রা) এর রেওয়ায়াত মুসলিম শরীফে যেমন আছে অধিকাংশ রেওয়ায়াতে এমন বর্ণনা করা হয়েছে। এটাই এ কথার প্রমাণ যে, ইমাম মুসলিম (র) যে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন সেটাই অগ্রগণ্য এবং ত্রুটিমুক্ত। এ কারণেই তো মুসলিম গ্রন্থকার মুসলিম শরীফে উক্ত রেওয়ায়াতকে এনেছেন তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এ হাদীসটি হলো فعلى হাদীস। কেননা, সকল সিকা রাবীগণ হযরত বেলাল (রা) থেকে উক্ত হাদীসকে রাসূল (স) এর فعل এর কথা উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ ব্যতীত। কেননা, তিনি উক্ত হাদীসকে قولى হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু محفوظ ঐ ফেলী হাদীস যা মুহাদ্দিসগণের এক জামাত বলেছেন।

قولى হাদীসের জবাব ঃ قولى হাদীস যা মুহাম্মদ ইবনে রাশেদ (র) বর্ণনা করেছেন, তার উত্তর হল–

১. হাফেজ ইবনে আব্দুল বার মালেকী (র) বলেন, এ হাদীসটি হলো منقطع কেননা, মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ মাকহুল থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অথচ তার শ্রবণ نعيم بن حماد থেকে প্রমাণিত নেই। উভয়ের মধ্যে কাছির ইবনে মুররা একজন রাবী উহ্য রয়েছে। কাজেই হাদীসটি منقطع

২. منقطع এর ত্রুটি থাকা সত্বেও উক্ত হাদীসটি বিশেষ মাজুর ব্যক্তিদের জন্য বলা হয়েছে। এটাও সম্ভাবনা আছে যে, এটা ব্যাপকভাবে সকলের জন্যে বলেছেন এবং এরও সম্ভাবনা আছে যে, হযরত বেলাল (রা) এর فعلى حديث যা ইমাম মুসলিম এবং আসহাবুস সুনান বর্ণনা করেছেন। এটাকেই কোন কোন রাবী পরিবর্তন করে قولى হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। والله اعلم

فعلى حديث এর জবাব ঃ এখানে فعلى حديث সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। মাথা ব্যতীত শুধুমাত্র পাগড়ীর উপর মাসেহ সহীহ আছে কিনা। এর জবাবে আমরা বলি যে, যদি পাগড়ীর উপর মাসেহ করা বৈধ হতো তাহলে এ ব্যাপারে হাদীসে মুতাওয়াত্তির বর্ণিত থাকতো। যেমন মোজা মাসেহ এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে. ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, সুন্নাহ দ্বারা কুরআনের বিধানকে মানসুখ করা বৈধ। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো মোজা মাসেহ করার ব্যাপারে যে ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে সে ধরনের হাদীস বর্ণিত হতে হবে। কিন্তু পাগড়ীর উপর মাসেহ করার বিষয়টি রাসূল (স) থেকে মুতাওয়াত্তির সূত্রে বর্ণিত হওয়া প্রমাণিত নেই। কাজেই দু'টি কারণে পাগড়ীর উপর মাসেহ করা বৈধ নয়–

১. কুরআনে কারীমে وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ তথা মাথা মাসেহ করতে বলেছেন। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন অকাট্য হাদীস পাওয়া যাবে। مسح على الخفين এর ম   ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মাসেহ করার অকাট্য হুকুম এড়িয়ে চলা বৈধ হবে না। আর পাগড়ীর উপর মাসেহ সংক্রান্ত যত হাদীস বর্ণিত আছে। চাই তা হযরত বেলাল থেকে হোক কিংবা অন্য কোন রাবী থেকে হোক তার সনদে اضطراب বিদ্যামান। হাফেজ আব্দুল বার মালেকী (র) বলেন, এ সম্পর্কিত সব হাদীস معلول আর যদি তার সনদ সহীহও মেনে নেয়া হয়। তাহলেও তা আল্লাহ তাআলার কিতাবের মুকাবেলায় আসতে পারে না। কেননা, এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো খবরে ওয়াহিদ যার মধ্যে তাবীলের ইহতেমাল বিদ্যমান। কাজেই কুরআনের মুকাবেলায় উক্ত হাদীসগুলো পরিত্যাজ্য হবে।

২. **দ্বিতীয়ত ঃ** কেউ পাগড়ীর উপর মাসেহ করলে ওরফে বলা হয় না যে, সে মাথা মাসেহ করেছে। কারণ মাথা বাস্তবে একটি প্রসিদ্ধ অঙ্গকে বলা হয় যা চুল দ্বারা বেষ্টিত। এটা পাগড়ী থেকে ভিন্ন হওয়াটা স্পষ্ট। কাজেই পাগড়ীর উপর মাসেহ করলে মাথা মাসেহ করেছে তা বলা হয় না। কাজেই তা আয়াতের মর্মের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে ইমাম বায়হাকীর বক্তব্য ঃ ইমাম বায়হাকী (র)সহ প্রমূখ মুহাদ্দেসীনে কিরাম বলেন, হযরত বেলাল (রা) এর রেওয়ায়াত আলোচ্য অধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণে عمامة . ناصية উভয়ের উপর মাসেহ করার কথা উল্লেখ আছে। এ কারণেই মুজমাল রেওয়ায়াতে ঐটাই উদ্দেশ্য হবে যা বিস্তারিত রেওয়ায়াতে আছে, এই তাবীলের বিশুদ্ধতা বায়হাকীর রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, বেলালের হাদীসের কোন সনদে উভয়টার কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং ইমাম বায়হাকী ইদরিস এর মাধ্যমে বেলালের হাদীসকে مسح عَلى الْخُفَّيْنِ وَنَاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ শব্দে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনার পর তিনি বলেছেন, উক্ত হাদীসের সনদ হাসান। মুগীরা বিন শো'বার থেকেও এ ধরণের হাদীস বর্ণিত আছে। তিনিও عمامة ও ناصية এর উপর মাসেহ করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বেলালের হাদীস দ্বারা হনাবেলাদের রদ করা উদ্দেশ্য। রাসূল (স) মাথা ব্যতীত শুধু পাগড়ীর উপর মাসেহ করছেন এর উপর প্রমাণ পেশ করা সহীহ নয়। বরং বাহ্যত এটাই বুঝে আসে যে, রাসূল (স) عمامة ও ناصية উভয়টার উপর মাসেহ করেছেন। কিন্তু হাদীসের রাবী সংক্ষেপে শুধুমাত্র পাগড়ীর কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা, এটা অপরিচিতি ও অপ্রসিদ্ধ বিষয় ছিল। আর কোন কোন রাবী উভয়টাকে উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ শুধুমাত্র মাথা মাসেহ করার বিষয়ীটিও বর্ণনা করেছেন। পাগড়ীর উপর মাসেহ করার বিষয়টি উল্লেখ করেননি। যেমন সামনে باب المسح على الخفين এর অধীনে আসছে। সেখানে বেলাল (রা) থেকে এ শব্দ উল্লেখ রয়েছে। ومسح برأسه ومَسَح عَلى الْخُفَّيْن ثم صَلّى

মোটকথা উল্লিখিত হাদীসটি হলো মুজমাল। এ হাদীসের সমস্ত সনদ এর রেওয়ায়াতের শব্দাবলীকে সামনে রাখলে দেখা যায় যে, আলোচ্য ঘটনায় অবশ্যই মাথা মাসেহ সংঘটিত হয়েছে। পূর্ণ মাথায় না হলেও মাথার এক চুতর্থাংশে তো অবশ্যই হয়েছে। যা কোন কোন রাবী উল্লেখ করেছেন। কাজেই এ হাদীস দ্বারা হানাবেলাদের শুধুমাত্র পাগড়ীর উপর মাসেহ করার উপর প্রমাণ পেশ করা সহীহ নয়।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন ফাতওয়ায়ে শামী এবং ই'লাউস সুনান প্রথম খণ্ড।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ النَّاصِيَةِ

١٠٧. اخبرنا عمرو بن عليّ قال حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال حدّثنا سليمان التيمى قال حدّثنا بكرُ بنُ عبدِ اللّٰه المُزَنِيّ عن الحسنِ عنِ ابنِ المُغيرة بنِ شعبةَ عنِ المُغيرة ان النبيّ ﷺ توضّأ فمسح ناصيتِه وعِمامتِه وعلى الخفّين -

١٠٨. اخبرنا عمرو بنُ عليّ وحُميدِ بنِ مسعدةَ عن يزيدَ وهو ابنُ زُريعٍ قال حدّثنا حميدٌ قال حدّثنا بكرُ بنُ عبدِ اللّٰه المُزَنيُّ عن حمزةَ بنِ المغيرة بنِ شعبةَ عن ابيهِ قال تخلّفَ رسولُ الله ﷺ فتخلّفتُ معه فلمّا قضى حاجتَه قال امعكَ ماءٌ فاتيتُه بمطهرةٍ فغسلَ يديهِ وغسلَ وجهَه ثمّ ذهبَ يحسُرُ عن ذِراعيهِ فضاقَ كمُّ الجُبّة فالقاهُ على منكبيهِ فغسلَ ذِراعيهِ ومسحَ بناصيتِه وعلى العِمامةِ وعلى خُفّيهِ -

অনুচ্ছেদ ঃ কপালসহ পাগড়ির উপর মাসেহ করা

অনুবাদ ঃ ১০৭. আমর ইবনে আলী (র) মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) উযূ করেন। (উযূতে) কপাল, পাগড়ি ও মোজার উপর মাসেহ করেন।

১০৮. আমর ইবনে আলী ও হুমায়দ ইবনে মাসআদাহ (র).........মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) (এক সফরে কাফেলা হতে) পেছনে থেকে যান। আমিও তাঁর সঙ্গে পেছনে থেকে যাই। তিনি পায়খানা-পেশাবের কাজ সমাধা করলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিকট কি পানি আছে? আমি তাঁর নিকট একটি পানির পাত্র নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করেন। তারপর কনুই থেকে আস্তিন উপরে উঠাতে চাইলেন। কিন্তু জামার হাতা চিকন হওয়াতে তা পারলেন না। তাই জামার হাতা খুলে কাঁধের উপর রেখে কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করেন এবং মাথার অগ্রভাগ ও পাগড়ির উপর মাসেহ করেন এবং মোজার উপর মাসেহ করেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله عَنِ ابنِ المُغِيرَة بْنِ شُعْبَة ঃ উরওয়া ও হামযা উভয়ে হযরত মুগীরা বিন শো'বা (র) এর সন্তান এবং উভয়ের থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু এ রেওয়ায়াতে ইবনে মুগীরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হামজা। যেমন অন্য একটি রেওয়ায়াতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

কাযী আয়াজ (র) বলেন, ابن مغيرة দ্বারা আলোচ্য হাদীসে حمزه ابن مغيرة উদ্দেশ্য। মুহাদ্দিসীনের নিকট এটাই সহীহ। অবশ্য উরওয়া ইবনে মুগীরা অন্য হাদীসের রাবী উভয়জন হযরত মুগীরা (র) এর সন্তান। উভয়ে স্বীয় পিতা থেকে রেওয়ায়াত করেছেন।

قوله فمَسَحَ نَاصِيَتَهُ وعِمَامَتَهُ وعَلَى الخُفَّيْنِ ঃ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (র) মাথার উপর মাসেহ করার আমল বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) নাছিয়া পরিমাণ মাথা মাসেহ করেন। অতঃপর পাগড়ীর উপর মাসেহ করেন এবং মোজার উপরেও মাসেহ করেন। পূর্বের অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে যে, জুমহুর উলামার নিকট মাথা ব্যতীত শুধুমাত্র পাগড়ীর উপর মাসেহ বৈধ নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এ হাদীসে হযরত মুগীরা (রা) নাছিয়াকে পাগড়ী মাসেহ এর সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন। এখন কথা হলো এ সূরতটি সহীহ কি না–

১. ইমাম শাফেয়ী (র) এর নিকট এ সূরতটি জায়েয। তিনি বলেন, ওয়াজিব পরিমাণ মাথা মাসেহ করার পর অবশিষ্টাংশ পাগড়ীর উপর মাসেহ করার দ্বারা পরিপূর্ণ সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। এটা ইমাম খাত্তাবী (র) এর কথা দ্বারাও বুঝা যায়। তিনি বলেন, পাগড়ীর উপর মাসেহ করা বৈধ হওয়াকে অধিকাংশ ফুকাহা অস্বীকার করেন। তারা পাগড়ীর উপর মাসেহ করার হাদীসের এ ব্যাখ্যা করেন যে, সম্ভবত কোন সময় হুজুর (স) মাথার কিছু অংশ মাসেহ এর উপর ক্ষ্যান্ত করেছেন। তিনি পূর্ণ মাথায় মাসেহ করেননি এবং মাথা থেকে পাগড়ীও খোলেননি।

হযরত মুগীরা (রা) এর হাদীসকে (উক্ত সুরতকে) ব্যাখ্যা ধরতে হবে যে, তিনি হুজুর (স) এর উযূর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, فَمَسَحَ نَاصِيَةً وَعِمَامَةً হুজুর (স) নাছীয়া পরিমান মাসেহ করার পর পাগড়ীর উপর মাসেহ করেছেন, আর হযরত মুগীরা (রা) مَسَحَ نَاصِيَة কে مَسَحَ عِمَامَةً এর সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন। এ সূরতে মাথার যতটুকু অংশ মাসেহ করা ওয়াজিব তা নাছীয়া পরিমাণ মাসেহ করার দ্বারাই আদায় হয়ে যায়। কেননা, নাছীয়াও মাথার একটি অংশ এবং পাগড়ীর উপর আনুসাঙ্গিকভাবে মাসেহ করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে যে, হুজুর (স) মোজার উপর মাসেহ করেন এবং আনুসঙ্গিক হিসাবে তার নিচের অংশেও মাসেহ করেন। (মা'আরিফুস সুনান প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৫৭)

মোটকথা, ফরয পরিমান মাথা মাসেহ করার পর যদি পূর্ণ পাগড়ীর উপর মাসেহ করে তাহলে শাফেয়ী মাযহাবে পূর্ণ মাথা মাসেহ করার সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের বক্তব্য

কেউ যদি ফরয পরিমাণ মাথা মাসেহ করার পর পূর্ণ পাগড়ীর উপর মাসেহ করে তাহলে পূর্ণমাথা মাসেহ করার সুন্নত আদায় হবে কি না? এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের ইমামদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। তবে হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ উলামা পাগড়ীর উপর মাসেহকে অস্বীকার করেন।

অবশ্য ইমাম জাসসাস (র) আহকামুল কুরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যদি ফরয পরিমাণ মাথা মাসেহ করার পর পূর্ণ পাগড়ীর উপর মাসেহ করে তাহলে আমাদের নিকট তা জায়েয আছে এবং এর দ্বারা পূর্ণ মাথা মাসেহ করার সুন্নতও আদায় হয়ে যাবে। কারণ যদি পূর্ণ মাথা মাসেহ করার সুন্নত আদায় না হয় তাহলে এ সুরতকে বৈধ বলা অনার্থক হবে। মোটকথা, যদি উভয়টা মাসেহ করে তাহলে ইমাম জাসসাসের উক্তি মুতাবেক এটা বৈধ হবে। তবে যদি মাথা মাসেহ ব্যতীত শুধু পাগড়ীর উপর মাসেহ করে তাহলে তার মতে এ মাসেহ যথেষ্ট হবে না।

ইমাম মালেক (র) এর বক্তব্য

ইমাম মালেক (র) মাথার অগ্রভাগে মাসেহ করাকে মাথা মাসেহ এর জন্য যথেষ্ট মনে করেন না এবং পাগড়ীর উপর মাসেহ করাকেও বৈধ বলেন না। কেননা, তার নিকট কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত পূর্ণ মাথা মাসেহ করা জরুরী। ইমাম মালেক (র) এর অনুসারীগণ আলোচ্য হাদীসের জবাবে বলেন, সে সময় রাসূল (স) এর মাথায় কোন সমস্যা থাকতে পারে যে কারণে তিনি পাগড়ীর উপর মাসেহ করেছেন যাতে করে রোগ বেড়ে না যায়। কাযী আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ ইবনে রুশদ বলেন, ইমাম মালেক (র) এর নিকট পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়েয নেই। তবে যদি কোন ওজর থাকে তাহলে পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়েয আছে।

দ্বিতীয় মাসআলা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র) পূর্ণ মাথা মাসেহ করা যে ফরয নয় তার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন।

এ হাদীস দ্বারা হানাফীগণ মাথার অগ্রভাগ তথা মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেন। এ কারণে এ হাদীসটি মালেকী ও শাফেয়ীদের বিপক্ষে প্রমাণ বহন করে।

ইমাম জাসসাস (র) আহকামুল কুরআনে লেখেন, একথা নিশ্চিত যে, হুজুর (স) ফরয পরিমাণ মাসেহ কখনো ত্যাগ করতেন না, তবে غير مفروض অংশকে সুন্নত হিসাবে মাসেহ করতেন। এখন যখন উভয় প্রকার আমল

রাসূল (স) থেকে পাওয়া গেলো এবং কতক সময় নাছিয়া তথা মাথার অগ্রভাগে মাসেহ করার উপর সন্তুষ্ট থাকার বিষয়টি বর্ণিত আছে। অন্য রেওয়ায়াত দ্বারা এটাও প্রমাণিত আছে যে, তিনি পূর্ণ মাথা মাসেহ করেছেন। তাই আমরা উভয় প্রকার হাদীসের উপর আমল করেছি এবং ناصية পরিমাণকে মাসেহ করাকে ফরয সাব্যস্ত করেছি। কেননা, এর থেকে কম পরিমাণ মাথা মাসেহ করার বিষয়টি কারো থেকে প্রমাণিত নেই। এবং ناصية ব্যতীত মাথার অন্য অংশ মাসেহ করাকে আমরা সুন্নত বলি। হ্যাঁ, ناصية এর পরিমাণ থেকে কমের উপর মাসেহ করাটি যদি ফরয হতো তাহলে নবী করীম (স) ঐ পরিমাণকে অবশ্য বর্ণনা করে দিতেন। অথবা তা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে তার উপর মাসেহ করে ক্ষান্ত করতেন। যেমন কোন কোন সময় ناصية এর উপর মাসেহ করে ক্ষান্তছেন বা সেটাকে যথেষ্ট মনে করেছেন। যেহেতু তাঁর থেকে ناصية থেকে কমের উপর মাসেহ করা প্রমাণিত নেই। এটাই এ কথার প্রমাণ যে ناصية পরিমাণ মাসেহ করাই ফরয। এর থেকে কম মাসেহ করলে মাসেহ এর ফরযিয়্যাত আদায় হবে না।

উক্ত বক্তব্যের উপর ইবনে রুশদের বক্তব্য

ইবনে রুশদ আমাদের প্রমাণের জবাবে বলেন, এখানে সম্ভাবনা আছে যে, রাসূল (স) ওজরের কারণে নাছিয়া বা মাথার অগ্রভাগের উপর মাসেহ করেছেন। অথবা নবী (স) উযূ থাকা অবস্থায় পুনরায় উযূ করার সময় এমন করেছিলেন, কাজেই এর উপর ভিত্তি করে ناصية পরিমাণ মাথা মাসেহ করা ফরয বলা বিশুদ্ধ নয়।

ইমাম জাসসাস (র) ইবনে রুশদের জবাবে বলেন, যদি এ অবস্থায় কোন ওজর বা সমস্যা থাকতো তাহলে অবশ্যই তিনি সেটা উল্লেখ করতেন। যেমন পাগড়ীর উপর মাসেহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন। আর এটা বলা যে, নবী (স) যে, নাছিয়ার উপর মাসেহ করেছেন উযূ থাকা অবস্থায় পুনরায় উযূ করার সময়, এটা আমরা মানি না। কেননা হযরত মুগীরা (রা) এর হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, ইস্তিঞ্জা করার পর উযূ করেছেন এবং নাছিয়া তথা মাথার অগ্রভাগে মাসেহ করেছেন। এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রাসূল (স) হদসের পরই উযূ করেছিলেন। যদি ناصية পরিমাণ মাসেহ করার ব্যাপারে উক্ত ব্যাখ্যাকে মেনে নেয়া হয় তাহলে মোজার উপর মাসেহ করার ব্যাপারেও মেনে নিতে হবে (যে, রাসূল (স) অসুস্থতার কারণে মোজার উপর মাসেহ করেছেন অথচ কেউ এর প্রবক্তা নন।) কেননা, তিনি উক্ত উযূতেই মোজার উপর মাসেহ করেছেন, তাহলে কি মালেকীগণ এ ক্ষেত্রেও উক্ত কথার প্রবক্তা হবেন না যে, হুজুর (স) ওযর বা জরুরতের কারণে মোজার উপর মাসেহ করেছেন, অথবা হদস হওয়া ব্যতীত উযূ থাকা সত্ত্বেও পুনারায় উযূ করেছেন। অথচ কেউ একথার প্রবক্তা নন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যখন মাথার এক চতুর্থাংশের কম মাসেহ করা সম্পর্কে কোন রেওয়ায়াত বিদ্যমান নেই। কাজেই হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার রেওয়ায়াতকেই কুরআনের আয়াত وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ এর ইজমালের বয়ান সাব্যস্ত করে উদ্দেশ্যে স্থির করা হয়েছে যে, মাথা মাসেহ করার ফরয পরিমাণ হলো ربع رأس বা মাথার এক চতুর্থাংশ। ناصية ও মাথার এক চতুর্থাংশ হয়ে থাকে, কাজেই মাথা মাসেহ করার ফরয পরিমাণ হবে এক চতুর্থাংশ।

আবু দাউদ শরীফেও হযরত আনাস ইবনে মালেক (র) থেকেও তার পরিমাণ ربع رأس বলা হয়েছে, فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة الخ শব্দ এসেছে এবং আবু দাউদ (র) এ ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছেন। আর যে জায়গায় তিনি সুকুত অবলম্বন করেন সেটা তার নিকট গ্রহণযোগ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। এখন কুরআনের আয়াতের মর্ম নির্দিষ্ট হয়ে গেলো। আর তাহলো ربع رأس আর যে সকল রেওয়ায়াতে পূর্ণমাথা মাসেহ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। সেটা সুন্নত ও পূনাঙ্গতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

بابُ كيفَ المَسْحُ عَلى العِمامَةِ

١٠٩. اخبرَنا يعقوبُ بْنُ ابراهيمُ قال حدّثنا هشيمٌ قال اخبرَنا يونسُ بْنُ عُبيدٍ عنِ ابْنِ سِيْرِينَ قالَ اَخْبرنِىْ عمرو بْنُ وهبِ الثّقفِي قال سَمِعْتُ المُغيرة بْنِ شعبةَ قال خَصْلَتانِ لَااَسْاَلُ عَنْهُمَا احدًا بعْدَ مَاشَهِدْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَهُ فِى سَفَرٍ فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ثمّ جَاءَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وجَانِبَىْ عِمَامَتِهِ ومَسَحَ عَلىٰ خُفَّيْهِ وقَال وصَلوٰةُ الْاِمامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ فشَهِدتُّ مِنْ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ فِىْ سَفَرٍ فحَضَرَتِ الصَّلوٰةُ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهِم النبىُّ ﷺ فاَقَامُوا الصَّلوٰةَ وقَدمُوا بْنَ عوفٍ فصَلّى بِهِم فجَاءَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ فصَلّى خَلْفَ ابنِ عَوْفٍ مَابَقِىَ مِنَ الصَّلوٰةِ فلَمّا سَلّمَ ابْنَ عَوفٍ قامَ النبيُّ ﷺ فقَضىٰ مَاسَبَقَ بِهِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ পাগড়ির উপর কিভাবে মাসেহ করতে হবে?

অনুবাদ ঃ ১০৯. ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)........আমর ইবনে ওয়াহাব সাকাফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইবনে শু'বা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, দু'টি বিষয়ে আমি কারো নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করব না। কেননা, এ দু'টি কাজের সময় আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। (একটি হলো মাসেহ) তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। সেখান থেকে এসে উযূ করেন এবং মাথার অগ্রভাগ ও পাগড়ীর দু'পার্শ্ব এবং মোজার উপর মাসেহ করেন। আর (দ্বিতীয়টি হল) অধঃস্তনের পেছনে ইমামের (নেতার) নামায আদায় করা। রাসূলুল্লাহ (স) এক সফরে গিয়েছিলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। (তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধার জন্য) দূরে চলে গিয়েছিলেন। এদিকে নামাযের সময় হয়ে যায়। (নামাযের সময় শেষ হচ্ছে দেখে) লোকেরা নামায শুরু করে দিল। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-কে তারা ইমাম নিযুক্ত করল। তিনি তাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। (এমন সময়) রাসূলুল্লাহ (স) ফিরে আসেন এবং ইবনে আউফের পেছনে অবশিষ্ট নামায আদায় করেন। ইবনে আউফ সালাম ফিরালে নবী (স) দাঁড়িয়ে যান এবং যতটুকু নামায ছুটে গিয়েছিল তিনি তা আদায় করেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله كُنَّا مَعَهُ فِى سَفَرٍ ... ঃ এখানে যে সফরের কথা উল্লেখ রয়েছে এর দ্বারা গাযওয়ায়ে তাবুক এর সফর উদ্দেশ্য। যেমন আবু দাউদে উবাদা ইবনে যিয়াদের রেওয়ায়াতে তা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর এ যুদ্ধ নবম হিজরীতে সংঘঠিত হয়েছিল। হাদীসে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা সফর থেকে ফিরে আসার সময় সংঘঠিত হয়েছিল, হযরত মুগীরা এর হাদীস অনেক সূত্রে বর্ণিতরয়েছে। এমনকি "বাজ্জার গ্রন্থকার" স্বীয় মুসনাদে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত মুগীরার হাদীসকে তার থেকে ৬০ জন রাবী রেওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু শব্দ ভিন্ন ভিন্ন–

১. পেছনের অনুচ্ছেদে فَمَسَحَ نَاصِيَةً وعِمَامَةً শব্দ এসেছে।

২. কোন কোন রেওয়ায়াতে وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِمَامَتِه শব্দ এসেছে।

৩. আবু দাউদের বর্ণনায় وَمَسَحَ فَوْقَ الْعِمَامَةِ শব্দ এসেছে।

৪. এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসে এসেছে যে, وَمَسَحَ جَانِبَيْ عِمَامَتِه ইত্যাদি।

মোটকথা, হযরত মুগীরা (রা) এর হাদীসের শব্দ দ্বারা একথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হুজুর (স) উযূতে সমস্ত মাথা মাসেহ করেননি, বরং মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে نَاصِيَة পরিমাণ মাসেহ করেছেন। অর্থাৎ মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করেছেন। অতঃপর সুন্নত আদায় করার লক্ষ্যে পাগড়ীর উপর দিয়ে পূর্ণ মাথা মাসেহ করেছেন।

পাগড়ীর উপর কিভাবে মাসেহ করবে তার বর্ণনা আলোচ্য হাদীসে এসেছে। যাকে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) وَجَانِبَى عِمَامَتِه এর শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। হুজুর (স) পাগড়ীর উভয় কিনারার উপর মাসেহ করেন, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সমস্ত মাথা মাসেহ করা ফরয নয়।

ফতহুলবারী ও আইনী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করাই যথেষ্ট এবং এর দ্বারাই ফরয আদায় হয়ে যায়।

হযরত ইবনে উমর (রা) যখন মাথা মাসেহ করতে ইচ্ছা করতেন, তখন رَفَعَ الْقَلَنْسُوَةَ وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِه তথা টুপি খুলে মাথার অগ্রভাগ মাসেহ করতেন। এটাকে দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন। মুগনীর টীকায় আছে যে, سَنَدُهُ صَحِيْح উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ এবং সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হতে কেউ এটাকে অস্বীকার করেননি, যেমন ইবনে হযম এর বক্তব্য। তার বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় মাথা পূর্ণটা মাসেহ করা সালফদের নিকটও ফরয ছিল না। এ হাদীস সম্পর্কিত অন্যান্য মাসআলা পূর্বে صِفَةُ الْوُضُوْءِ এর অধীনে অতিবাহিত হয়েছে।

মাথাহ্ মাসেহ সম্পর্কীত কুরআন-হাদীস ও বৈজ্ঞানিক তথ্য

ফ্রান্সের এক ডাক্তার বলেন, অনেক দিন যাবত অনুসন্ধান করেছি যে, মানুষ কেন পাগল হয়, পরে তিনি বললেন, আমার গবেষণা অনুযায়ী তার কারণ হল, মানুষের মস্তিষ্ক থেকে সিগন্যাল পূর্ণ শরীরে বিস্তৃত হয়ে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্মক্ষম হয়। আর আমাদের মস্তিষ্ক সর্বক্ষণ Fluid এর মধ্যে Float করতে থাকে। যার কারণে আমরা চলাফেরা করি, হাটি, দৌড়াই, লাফালাফি করি। অথচ মস্তিষ্কের কোনই ক্ষতি সাধিত হয় না। আর যদি সেটা কোন Rigid জিনিস হতো তাহলে ততদিনে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা তাকে Fluid এর মধ্যে রেখেছেন। এ মস্তিষ্ক থেকে কতিপয় সূক্ষ্ম শিরা Conductor হয়ে আসতে থাকে। আর সেই শিরাগুলো গর্দানের পৃষ্ঠ থেকে পূর্ণ শরীরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, আমার রিচার্স অনুযায়ী চুল যদি বৃদ্ধি করা হয় এবং গরদানের পৃষ্ঠ শুষ্ক রাখা হয় তাহলে সেই শিরার মধ্যে শুষ্কতা সৃষ্টি হয়। তার প্রভাব মানবদেহে পড়ে কখনো এমনও হয় যে, মানুষের মস্তিষ্ক কর্মহীন হয়ে পড়ে। এজন্য প্রত্যহ মাসেহ এর স্থানটুকু ২/৪বার অবশ্যই ভিজাতে হবে। তিনি আরো বলেন, মাসেহ করার দ্বারা বাতাস লাগা ও ঘাড় ভাঙ্গা জ্বরের অবসান ঘটে।

গরদান মাসেহ করার দ্বারা মানবদেহে এক শক্তি সঞ্চারিত হয়। যার সম্পর্ক রয়েছে মেরুদণ্ডের মধ্যকার অস্থি মজ্জা এবং মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। নামাযী ব্যক্তি যখন গরদান মাসেহ করে তখন হাতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে মেরুদণ্ডে পুঞ্জিভূত হয়ে যায় এবং মেরুদণ্ডের হাড়কে স্বীয় গমনপথ বানিয়ে পূর্ণ দেহের মাংসপেশী ও স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে, যদ্বারা মাংসপেশীগুলোতে শক্তি সঞ্চারিত হয়।

١١٠. اخبرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قال حَدَّثَنَا يزيد بْنُ زُرَيعٍ عَنْ شُعْبَةَ ح واخبرنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيرَةَ قال قال ابُو القَاسِمِ رَسُولُ الله ﷺ وَيْلٌ لِلْعَقِبِ مِنَ النَّارِ -

١١١. اخبرنا محمود بْنُ غَيْلاَنَ قال حدَّثنا وكيعٌ قال حدَّثنا سُفيان ح واخبرنا عمرو بْنُ عليّ قال حَدَّثَنَا عبدُ الرحمٰن قال حدَّثنا سفيانُ واللفظُ لهٗ عن منصورٍ عَنْ هلالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ ابى يَحْيى عَنْ عبدِ اللّٰهِ بْنِ عمرٍو قال رَأى رسولُ اللّٰهِ ﷺ قومًا يَتَوَضَّئُونَ فرأى أَعْقَابَهُمْ تَلُوحُ فقال وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ -

---

অনুবাদ ঃ কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)......... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম (রাসূলুল্লাহ) (স) বলেছেন, যার পায়ের গোড়ালী শুষ্ক থাকবে তার জন্য জাহান্নামের ভীষণ শাস্তি রয়েছে।

১১১. মাহমুদ ইবনে গায়লান (র).......... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদল লোককে উযূ করতে দেখেন। তাদের পায়ের গোড়ালীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখেন যে, তা শুষ্ক রয়েছে। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, যাদের পায়ের গোড়ালীর শুষ্ক থাকবে, তাদের জন্য জাহান্নামের ভীষণ শাস্তি রয়েছ। তোমরা পরিপূর্ণরূপে উযূ কর।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : ما معني وَيْلٌ وما الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَيْلِ والْوَيْحِ

প্রশ্ন ঃ وَيْلٌ **শব্দের অর্থ কি? এবং** وَيْلٌ **ও** وَيْحٌ **এর মধ্যে পার্থক্য কি? বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ ويل **শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ** ويل এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। এর আসল অর্থ ধ্বংস ও আযাব, কঠিন শাস্তি। সহীহ ইবনে হিব্বানে আছে এটা জাহান্নামের একটি ঘাটির নাম যার আযাবের কাঠিন্যের কারণে স্বয়ং জাহান্নাম তার থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট পানাহ চায়।

ويل **ও** ويح **এর মধ্যে পার্থক্য ঃ** ويل ও ويح নিকটবর্তী শব্দ হিসাবে আরবীতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু উভয়টার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

১. ويل সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয় যে শাস্তিযোগ্য, আর ويح সে ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে শাস্তিযোগ্য নয়।

২. ويل সে ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে ধ্বংসে পতিত হয়েছে, আর ويح সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয় যে ধ্বংসের নিকটবর্তী।

سوال : ويلٌ مبتدأٌ، كَيْفَ يَكُونُ مبتداء، وهو نَكِرَةٌ

প্রশ্ন ঃ ويل **শব্দটি কিভাবে** مبتداء **হল, অথচ শব্দটি** نكرة ?

উত্তর ঃ ويل اى ويل كائِنٌ مِنَ النَّار শব্দটি نكرة হওয়া সত্ত্বে مبتداء হতে পারে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হল–

১. দুয়া ও বদ দুয়ার ক্ষেত্রে نكرة মুবতাদা হতে পারে।

২. ويل এর মধ্যে যে تنوين রয়েছে সেটা تعظيم এর জন্য। তাই এর মধ্যে تخصيص পাওয়া গেলো। এ কারণে مبتداء হতে পারবে।

৩. বাক্যটি যদি مفيد হয় তাহলে نكرة মুবতাদা হতে পারে, আর এখানে এটাই হয়েছে। সুতরাং نكرة মুবতাদা হওয়া সহীহ আছে।

سوال : ما مَعْنَى اَعْقَابِ وَلِأَيِّ وَجْهٍ خُصَّ الْعَذَابُ بِالْأَعْقَابِ؟

প্রশ্ন ঃ اَعْقَابِ **এর অর্থ কি? এবং** عَذَاب **কে** اعقاب **এর সাথে খাস করার কারণ কি বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ اعقاب **এর অর্থ ঃ** اعقاب শব্দটি عَقِبٌ এর বহুবচন, অর্থ হলো পায়ের টাখনু।

عذاب **কে** اعقاب **এর সাথে খাস করার কারণ ঃ**

১. এখানে একটি مضاف উহ্য রয়েছে অর্থাৎ ক. لذوى الاعقاب খ. لاصحاب الاعقاب গ. لاهل الاعقاب

২. আর কেউ কেউ বলেছেন, উহ্যের প্রয়োজন নেই। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো এ গুণাগুণের শাস্তি স্বয়ং পায়ের টাখনুর উপর আপতিত হবে।

৩. আর যদিও পূরা শরীর আযাব ভোগ করবে কিন্তু মূলতঃ শাস্তি শুরু হবে ঐ অঙ্গ থেকে যা থেকে গোনাহ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন গোনাহ করলে কেঁচি দ্বারা ঠোঁট কাটা হবে।

৪. শাস্তি তো সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর হয়, আর اعقاب যেহেতু বেশীর ভাগ সময় শুকনো থাকে। এ কারণে اعقاب কে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. বেশীর ভাগ সময় اعقاب এর অংশটা শুকনো থাকার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে اعقاب এর সাথে শাস্তিকে খাস করেছেন যাতে লোকেরা এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায়।

سوال : بماذا متعلق من النار؟ اوضح

প্রশ্ন ঃ من النار **এর সম্পর্ক কোন শব্দের সাথে ব্যাখ্যা কর?**

উত্তর ঃ من النار **এর সম্পর্ক ঃ** من النار এর সম্পর্ক ويل এর সাথে। আসলে ছিল للاعقاب ويل من النار এ হাদীসের ইবারাতুন নস দ্বারা যে বিষয়টি প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে উযূতে পায়ের টাখনু শুকনো না থাকা চাই। এ হাদীসটির دلالة النص এ কথার প্রমাণ যে, দু পায়ের হুকুম হলো ধৌত করা; মাসেহ করা নয়।

سوال : اذكر الْاِخْتِلَافَ فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوْءِ وَمَسْحِهِمَا بَيِّنْ مُدَلَّلًا مُرَجِّحًا

প্রশ্ন ঃ উযূতে উভয় পা ধৌত করা ও মাসেহ করা সম্পর্কে আলিমগণের মাঝে মতানৈক্য কি? দলীল প্রমাণ সহকারে তা ব্যক্ত কর।

উত্তর ঃ উযূতে উভয় পায়ে এর হুকুম কি? ধৌত করতে হবে না মাসেহ করতে হবে, এ ব্যাপারে আলিমগণের মাঝে মতানৈক্যে রয়েছে। নিম্নে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল–

১. শিয়া ও রাওয়াফেজদের মতে, উভয় পা মাসেহ করা ফরয। ধৌত করা জায়েয নেই।

(আমানিউল আহবার ১/১৮৩, ফাতহুল মুলহিম ১/৪০৩, মাআরিফুস সুনান ১/১৮৯, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/১৫, মুগনী ১/৯১, বাহরুর রায়েক ১/১৪)

২. আহলে জাওয়াহের ও ইমাম যুহরী (র) এর মতে উভয় পা ধৌতও করবে এবং মাসেহও করবে। উভয়টা ওয়াজিব। (আমানিউল আহবার ১/১৭৬)

৩. ইমাম হাসান বসরী, ইবনে জারীর ও তাবারী এবং আবু আলী জুব্বাঈ এর মতে, মাসেহ ও গোসল উভয়ের মধ্যে ইখতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছা করলে ধৌত করবে, ইচ্ছা করলে মাসেহ করবে।

(বাদায়িউস সানায়ে ১/৫, আমানিউল আহবার ১/১৭৬, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/১৫, মাআরিফুস সুনান ১/১৮৯)

৪. ইমাম চতুষ্ঠয় ও জুমহুর ফুকাহা ও মুহাদ্দেসিনের এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের মতে, উভয় পায়ে মোজা না থাকা অবস্থায় তা ধৌত করা ওয়াজিব, মাসেহ করা জায়েয নেই। (ইযাহুত ত্বহাবী ১/১৪৫) তবে শায়খ মহিউদ্দীন আরাবী (র) বলেন, উভয়টা করার অবকাশ আছে, তবে উভয়টা একত্রে করাই উত্তম।

শিয়াদের দলীল ঃ ১

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ ধৌত কর ও তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং উভয় পা টাখনুসহ। (মায়েদাহ, ৬)

উক্ত আয়াতে তারা ارجلكم। শব্দটি ل ম হরফে যের দিয়ে পড়ে। তাদের যুক্তি হল, এ শব্দটির পূর্বের শব্দ برؤسكم এর উপর আতফ হয়েছে। অতএব, মাথা মাসেহ করা যেমন ফরয তেমনি পদদ্বয় মাসেহ করাও ফরয।

দলীল-২ : আবু নুআইম উবাদা ইবনে তামীম সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন—

قال رَأيتُ رَسُوْلَ اللّٰه صَلّى اللّٰه عليه وسَلّم تَوَضَّأَ ومَسَحَ عَلٰى لِحُيَتِه ورِجْلَيْهِ

অর্থাৎ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে দেখেছি তিনি উযূ করেছেন এবং তাঁর দাড়ি ও উভয় পা মাসেহ করেছেন। (মাজমাউল ফাওয়ায়েদ ১/২৩৪, কানজুল উম্মাল ৫/১০২)

দলীল-৩ :

٣. حديث على فانّ فيه ثم أُتِىَ بِمَاءٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِه وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِه وَرِجْلَيْهِ وفى رواية عنه انّه تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلٰى ظَهْرِ الْقَدَمِ ـ

অর্থাৎ আলী (রা) এর হাদীসে এসেছে যে, তার কাছে পানি আনা হয়েছে। তারপর তিনি সে পানি দ্বারা চেহারা ও হাত মাসেহ করলেন। অতঃপর সে পানি দ্বারাই মাথা ও পা মাসেহ করেছেন। অপর রেওয়ায়াতে এসেছে যে, তিনি পানি দ্বারা উযূ করেছেন, তার পর পায়ের সম্মুখ ভাগ মাসেহ করেছেন।

৪র্থ দলীল : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم فَاَخَذَ مَلْئَ كَفِّه مَاءً فَرَشَّ بِه عَلٰى قَدَمَيْهِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) উযূ করেছেন, তারপর হাত ভর্তি পানি নিয়ে তা উভয় পায়ের উপরে ছিটিয়েছেন।

৫ম দলীল : عن عبّاد بْن تميم عن عمّه انّ النبىّ صلعم تَوَضَّأَ ومَسَحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

অর্থাৎ হযরত আব্বাদ ইবনে তামীম তার চাচা থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, নবী কারীম (স) উযূ করেছেন এবং উভয় পা মাসেহ করেছেন।

৬ষ্ঠ দলীল : عن عبّاد بْنِ عمرَ رضى الله عنه انّه كانَ اذا تَوَضَّأَ ونَعْلاً فِى قَدَمَيْه مَسَحَ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهِ

ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি একদা উযূ করেছেন, আর উভয় জুতা তার পায়ে ছিল, তিনি পায়ের উপরি ভাগের উপরেই মাসেহ করেছেন।

আকলী দলীল : তাদের যৌক্তিক দলীল হল, যদি কোন ব্যক্তি পানি না পায়, তাহলে সে তার চেহারা ও হাত তায়াম্মুম করে। সে কখনও তার মাথা ও পা তায়াম্মুম করে না। সুতরাং পানি না থাকা অবস্থায় মাথার ন্যায় পায়ের হুকুম হয়ে থাকে। তাই পানি থাকা অবস্থায়ও মাথার ন্যায় পায়ের হুকুম হবে। তথা মাথা মাসেহ করার ন্যায় পাও মাসেহ করতে হবে।

আবু আলী জুব্বায়ী এর দলীল :

তারাও উক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন, আয়াতে বর্ণিত ارجلكم। শব্দটি যেহেতু যবর কিংবা যের উভয় কিরাআতে পড়া জায়েয আছে এবং উভয়টি মুতাওয়াতির কিরাআত। কাজেই যে কোনটি পড়ার ইখতিয়ার আছে। সুতরাং পা ধৌত করা ও মাসেহ করার ক্ষেত্রে ইখতিয়ার থাকবে, যেটির উপর আমল করুক পূর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং বুঝা যায় উযূকারী যে কোন একটির উপর আমল করলেই যথেষ্ট হবে।

আহলে জাওয়াহের এর দলীল :

তাদের দলীলও কুরআনের উক্ত আয়াত। তিনি বলেন, যেহেতু ارجلكم। শব্দটিতে যবর যোগে এবং যের যোগে উভয় ক্বিরাআতে পড়া সুপ্রসিদ্ধভাবে বর্ণিত আছে। সুতরাং উভয় ক্বিরাতের বিধানের উপর আমল করতে হবে। আর ধৌত ও মাসেহ উভয়টি করলে কোন মতানৈক্য থাকবে না। শায়খ ইবনুল আরাবী বলেন, যেহেতু উভয় প্রকার ক্বিরাত। আছে তাই উভয়টি একত্রে করাই উত্তম। তবে যে কোন একটি করারও ইখতিয়ার আছে।

আহলে হকের দলীল

আমাদের প্রথম দলীল হলো, আল্লাহ তাআলার আয়াত–

وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

এখানে اَرْجُلَكُمْ শব্দটি وُجُوْهَكُمْ এর উপর আতফ হিসাবে নসব পড়তে হবে যা اغسلوا এর معمول আর নসব পড়াটাই আসল, এর উপর আমাদের অসংখ্য দলীল আছে। নিম্নে মোট তিন প্রকারের দলীল বর্ণনা করা হল–

১. حديث متواترة ২. اجماع صحابه

১. হুজুর (স) থেকে চার প্রকারের হাদীস পাওয়া যায়–

ক. হুজুর (স) এর আমল ঃ যত সাহাবায়ে কিরাম থেকে হুজুর (স) এর উযূ সম্পর্কে রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে তাদের সকলের বর্ণনায় غسل رجلين এর কথা পাওয়া যায় কারো বর্ণনায় হুজুর (স) এর আমল مسح رِجْلَيْن পাওয়া যায় না। যদি পায়ের উপর মাসেহ করা বৈধ হতো তাহলে রাসূল (স) জীবনে একবার হলেও করতেন। যেমন তিনি অনেক মাকরূহ বিষয়ের বৈধতা বর্ণনার জন্য তার উপর আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন, এতে বুঝা যায় পা মাসেহ করা ফরয তো দূরের কথা মাকরূহ এর সাথেও জায়েয নেই। যেমন আলী (রা) এর বর্ণনা রয়েছে–

عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا وَقَالَ هٰكَذَا كَانَ طُهُوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليه وسلم وامثال هذه الرِّوَايَة كَثِيْرَة

তিনি (রাসূল স.) পা তিন তিন বার ধৌত করেছেন, এটি ছিল রাসূল (স) এর পবিত্রতা হাসিলের পদ্ধতি। অনুরূপ আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

খ. قولى حديث ঃ রাসূলের হাদীস هٰذَا وُضُوْءٌ لَايَقْبَلُ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ اِلَّابِهِ

রাসূল (স) একবার করে উযূর অঙ্গগুলো ধৌত করে উক্ত বাক্য বলেছিলেন। আর এটাই ফরয। এর কম ধৌত করলে উযূ হবে না। আর مسح رجلين তো এর চেয়ে অনেক কম। সুতরাং বুঝা গেলো পা মাসেহ করা বৈধ নয়।

গ. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস যাতে উযূকারীর গোনাহ মাফ হওয়ার আলোচনা এসেছে। সেখানেও পা ধৌত করার কথা আলোচিত হয়েছে। তা হলো–

١. فى اخره : فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْ اِلَيْهَا رِجْلَاهُ

٢. وَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ

যখন উযূকারী তার পা ধৌত করে তখন ঐ সমস্ত গোনাহ বের হয়ে যায় যা তার পা দ্বারা হয়েছে।

عن عبدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رسولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم رَاٰى قومًا واَعْقَابُهُم تَلُوحُ فقالَ وَيلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ .

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) এমন এক সম্প্রদায়কে দেখলেন যাদের পায়ের গোড়ালি (পানি ভালভাবে না পৌঁছার কারণে) ঝকঝক করছে। তিনি বলেন, এরূপ পায়ের গোড়ালি সম্পন্নদের জন্য দোযখের শাস্তি রয়েছে। তোমরা পরিপূর্ণভাবে উযূ কর।

আলোচ্য হাদীসে পা ধোয়ার মধ্যে ত্রুটি থাকার কারণে শাস্তির হুমকীর কথা এসেছে। কাজেই ধৌত করার মধ্যে সামান্য ত্রুটিতেই যখন এত শাস্তির কথা বলা হয়েছে তাহলে পা মাসেহ করলে কি ভয়াবহ অবস্থা হতে পারে?

দলীল-২ ঃ আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা বলেন, এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, উযূতে মোজাবিহীন অবস্থায় পা ধৌত করা ফরয। তাইতো লক্ষাধিক সাহাবা এর কারো থেকে ও غسل رجلين এর বিপরীত আমল পাওয়া যায় না। এতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, পা ধৌত করা ফরয।

উম্মতে মুসলিমার ধারাবাহিক আমল ঃ

সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে'তাবেয়ীন এবং পরবর্তী সর্ব যুগেই غسل رجلين এর উপর আমল চলে আসতেছে, এর বিপরীত কারো আমল পাওয়া যায় না। এর দ্বারা বুঝা যায় غسل رجلين ফরয, مسح رجلين নয়।

(দরসে মিশকাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৬৩-১৬৪)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ

১. উক্ত আয়াতে أَرْجُلَكُمْ এর মধ্যে যের দেয়া হয়েছে। কাছাকাছি শব্দে بِرُؤُسِكُم যের হওয়ার কারণে, অন্যথায় ارجلكم এর আতফ হয়েছে ايديكم এর উপর। আর যবরের কিরাআতটি প্রযোজ্য সাধারণ অবস্থায়।

২. প্রকৃতপক্ষে ارجلكم শব্দটি উহ্য ক্রিয়ার কর্ম (مفعول) হিসেবে যবর হয়েছে। আসলে বাক্যটি ছিল- وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاغْسِلُوْا أَرْجُلَكُمْ কিন্তু পাশাপাশি দুটি عامل এর পৃথক পৃথক مفعول থাকলে একটি আমেল উহ্য রেখে এর مفعول কে প্রথম মামুলের উপর আতফ করে দেয়া যায়। আর এর ভিত্তিতেই ارجلكم কে بروسكم এর উপর আতফ করে ارجلكم পড়া জায়েয আছে।

৪. আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, কুরআনের বিবরণ বুঝার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথ হলো রাসূলুল্লাহ (স) এর আমল। আর তিনি মোজাবিহীন অবস্থায় পা মাসেহ করেছেন এমন একটি রেওয়ায়াতেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব ঃ

১. হযরত নবী করীম (স) তখন মোজা পরিহিত ছিলেন, তাই তিনি মাসেহ করেছেন।

২. ইজমা ও মুতাওয়াতির হাদীসের বিরোধিতার কারণে এই হাদীসটি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। আর তা হলো এখানে মাসেহ শব্দটি হালকা ধোয়ার সাথে সাথে ঘষা বা ডলা অর্থে প্রযোজ্য হয়। যার প্রমাণ হল, দাড়ি সম্পর্কে মাসেহ শব্দ ব্যবহার হয়েছে, অথচ এটাও ধোয়ার অঙ্গ।

৩. যে সমস্ত হাদীসে মাসেহ করার কথা উল্লেখ রয়েছে ঐ সমস্ত হাদীস রহিত হয়ে গেছে।

৪. ইবনে ওমর (রা) এর রেওয়ায়াতে আছে যে, মানুষেরা রাসূল (স) এর নিকট থেকে ধৌত করার হুকুম আসার পূর্বে মাসেহ করতো তারপর যখন রাসূল (স) পরিপূর্ণভাবে ধৌত করার হুকুম করলেন এবং না ধৌত করার ক্ষেত্রে ভীতি প্রদর্শন করে বললেন, "শুকনো টাখনুগুলো আগুনে ধ্বংস হোক" তখন মানুষেরা মাসেহ করা বাদ দিয়ে ধৌত করা আরম্ভ করলো। এতে বুঝা যায় মাসেহ করার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

৫. অথবা, দুই হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে, মাসেহ দ্বারা ধৌত করাই উদ্দেশ্য। কেননা, এক রেওয়ায়াতে আছে যে, انه مسح وجهه অর্থাৎ তিনি চেহারা মাসেহ করেছেন, এখানে মাসেহ দ্বারা সকলের নিকটেই ধৌত করার অর্থ উদ্দেশ্য। সুতরাং পা মাসেহ করার ব্যাপারেও একই সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ পা মাসেহ করা এর অর্থ হলো পা ধৌত করা।

৬. অথবা, মাসেহ এর রেওয়ায়াত মোজা পরিহিত অবস্থায় গণ্য হবে, আর ধৌত করার বর্ণনা মোজাহীন অবস্থায় ধর্তব্য হবে।

৭. অথবা, বলা যেতে পারে। রাসূল (স) বিশেষ কোন ওজরের কারণে ধৌত করার পরিবর্তে মাসেহও করতেন তবে এটা সব সময় করতেন না। তাই এটা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ পূর্বোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায় উযূতে পদদ্বয় ধৌত করার সময় এগুলো থেকে গুনাহ বেরিয়ে যায়। আর যদি উভয় পায়ে মাসেহ করা ফরয হত, তবে ধৌত করার সময় পা থেকে গোনাহ বের হত না। যেমন– মাথার ফরয হলো মাসেহ করা। যদি কেউ মাসেহ এর পরিবর্তে ধৌত করে তবে তা থেকে গোনাহ ঝরবে না। কাজেই পদদ্বয় থেকে ধৌত করার সময় গুনাহ ঝরে পড়া এ কথার প্রমাণ যে, পদদ্বয়ের মধ্যে ফরয হলো ধৌত করা; অন্য কিছু নয়।

মাসেহ প্রবক্তাদের একটি প্রশ্নও তার উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, যুক্তির দাবী হলো উভয় পা মাসেহ করা। কারণ হুকুমের ক্ষেত্রে মাথার সাথে পায়ের সাদৃশ্য বেশী। একারণে পানি না পাওয়া গেলে উযূর ফরয যখন তায়াম্মুম হয়ে যায়। আর তখন শুধু চেহারা ও হাত মাসেহ করতে হয়; মাথা ও পা নয়। অতএব, পানি না থাকলেও চেহারা ও হাতের ফরয অন্য একটি বদলের দিকে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু মাথা ও পায়ের ফরয বদলের দিকে স্থানান্তরিত হয় না। বরং এ দুটি বাদ পড়ে যায়। কাজেই পানি না থাকলে যেহেতু পায়ের হুমুম মাথার ন্যায় বিবেচিত, সেহেতু পানি থাকলে এর হুকুম মাথার হুকুমের ন্যায় হবে। যেরূপভাবে মাথা মাসেহ করা হয় সেরূপভাবে পদদ্বয়ও মাসেহ করা উচিত।

উত্তর ঃ প্রশ্নকারীর বক্তব্য আমরা মানি না। কারণ আমরা এরূপ অনেক জিনিস দেখেছি যে, পানির বর্তমানে সেগুলোতে ফরয ছিল ধৌত করা কিন্তু পানি না থাকলে এই ফরয বদলহীনভাবে বাতিল হয়ে যায়, যেমন গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তির পূর্ণ শরীর পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব। যখন পানি পাওয়া যায়। কিন্তু যদি পানি না পাওয়া যায় তখন চেহারা ও হাত মাসেহ করে তায়াম্মুমের নির্দেশ রয়েছে। অবশিষ্ট দেহের হুকুম বিনা বদলে বাতিল হয়ে যায়, সেখানে কিছুই করতে হয় না। অতএব, এরূপ বলা হবে যে, চেহারা ও হাত ছাড়া অবশিষ্ট দেহের হুকুম পানি না পেলে যেহেতু বদলহীনভাবে বাতিল হয়ে যায়। সেহেতু পানি পেলে এর মধ্যে ফরয হবে মাসেহ করা। তথা গোসল ফরয বিশিষ্ট ব্যক্তি পানি পেলে শুধু চেহারা এবং হাত ধৌত করবে, অবশিষ্ট দেহ মাসেহ করবে, প্রশ্নকারীর এই মূলনীতিই ভুল।

স্পষ্টভাবে পা ধৌত করার কথা উল্লেখ না করার হিকমত

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, উযূতে ধোয়াই যদি আল্লাহ তাআলার কাম্য হয় তাহলে উল্লেখিত আয়াতে এমন অস্পষ্ট রাখা হলো কেন? পা কে স্পষ্টভাবে ধোয়ার আওতায় কেন উল্লেখ করা হলো না? যাতে কোন রকম বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কয়েকটি ফায়দা ও হিকমত নিম্নে প্রদত্ত হল–

১. কোন কোন সময় পায়ের উপরেও মাসেহ করার বিধান রয়েছে। যেমন মোজা পরা অবস্থায়। যদি এই শব্দে যের যোগে পড়ার অবকাশ না থাকত, তাহলে আয়াত দ্বারা সর্বাবস্থায় ধোয়াই সাব্যস্ত হত এবং মোজার উপর মাসেহ এর রেওয়ায়াতগুলো এ আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হত। এ কিরাআতের কারণে এই বৈপরীত্বের অবসান ঘটেছে।

২. মাথা মাসেহ এবং পা ধোয়ার বিষয়টি কোন কোন হুকুমে যৌথ। যেমন তায়াম্মুমে উভয়টি বাদ পড়ে যায়।

৩. ارجل শব্দটিকে رؤوس এর পরে উল্লেখ করে মাসনুন তারতীবের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথচ, এর উল্টো তারতীবে এ ফায়দা অর্জিত হত না।

৪. মাথা মাসেহ এবং পা ধোয়া এ দুটি বিষয়ের মাঝে মাসঞ্জস্য হল, উভয়টি শরীয়ত প্রবর্তকের বিধি প্রবর্তনের কারণে জানা গেছে, অথচ চেহারা ও হাত ধোয়ার বিধান উযূর পূর্বেও আরবদের নিকট ছিল। এ হিসাবেও এ দুটি বিষয়কে এক সাথে উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। তাছাড়া আরো অনেক অজ্ঞাত হিকমত থাকতে পারে। (দরসে তিরমিযী ১/২৫১–২৫৭, দরসে মিশকাত ১/১৬৪-১৬৫)

হাদীস সম্পর্কে তাত্ত্বিক কিছু আলোচনা

অনুচ্ছেদের হাদীসটি আমাদের মুখ্য বিষয়ের উপর দালালত করে যে, উভয় পা ধৌত করা ফরয, ইমাম নাসায়ী (র) এ উদ্দেশ্যে আলোচ্য শিরোনাম কায়েম করেছেন যাতে করে রাওয়াফেজদের বক্তব্য খণ্ডিত হয়ে যায় যারা পা মাসেহ করার প্রবক্তা।

দ্বিতীয় হাদীস যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত নাসায়ী শরীফের বর্ণনায় তা হলো সংক্ষিপ্ত। ইমাম মুসলিম (র) পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র) থেকে এ ব্যাপারে এ শব্দ এসেছে যে,

قال رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ عليه وسلّم مِنْ مَكَّةَ الي الْمَدِيْنَةِ حتّي اِذا كُنَّا بِمَاءِ الطَّرِيْقِ ..... الخ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র) বলেন, আমরা হুজুর (স) এর সাথে মক্কা থেকে মদীনায় ফিরে আসি। আমরা পানির নিকট পৌঁছলে একটি দল সামনে অগ্রসর হল। তখন আসরের সময় সংকীর্ণ ছিল। লোকেরা সময় সংকীর্ণ হওয়ার কারণে দ্রুত উযূ করল। অতঃপর আমরা নবী করীম (স) এর নিকট হাজির হলে তিনি দেখলেন দ্রুত উযূ করার ফলে কারো কারো পায়ের গোড়ালি শুকনো রয়েছে। তখন রাসূল (স) কঠোর ধমকী শুনালেন–

وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ..... الخ

হাফেজ ইবনে হাজার (র) ফাতহুল বারীতে লেখেন যে, বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) উক্ত সফরে হুজুর (স) এর সাথে ছিলেন। তবে সঠিক কথা এটাই যে, বিদায় হজ্বের সফরে তিনি হুজুরের সাথী ছিলেন। কেননা, তিনি যদিও মক্কা বিজয়ের সফরে শরীক ছিলেন কিন্তু তিনি উক্ত সফরে মক্কা থেকে মদীনায় সফর করেননি বরং "জি'রানাহ" নামক স্থানে সফর করেছেন অথচ এখানে তিনি নিজেই বলছেন আমি হুজুর (স) এর সাথে মক্কা থেকে মদীনায় সফর করেছি। এ ক্ষেত্রে তাহকীকী কথা এটাই যা পূর্বে বলা হয়েছে। তার এ সফরটি عمرة القضاء হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। কেননা, তার হিজরত ঐ সময় বা তার নিকটবর্তী সময়ে হয়েছিল।

ويل-এর তাহকীক ঃ

ويل শব্দটি অপছন্দ ও ধমক সূচক শব্দ। উলামায়ে কিরাম এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন।

১. কেউ কেউ এর অর্থ লেখেন কঠিন শাস্তি।

২. জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম।

৩. কেউ বলেন, একটি জাহান্নামের নাম।

৪. কেউ বলেন, এটি একটি শাস্তিসূচক শব্দ যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার খবর দেয়।

৫. কাজী আয়াজ (র) বলেন, এটি জাহান্নামের একটি উপত্যাকা–

৬. হাফেজ ইবনে হাজার (র) বলেন, এ ব্যাপারে সব থেকে বিশুদ্ধ কথা হলো যা ইবনে হিব্বান (র) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আর তা হল, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (র) মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এটি জাহান্নামের একটি উপত্যকা।

ويل এর তারকীব ঃ তারকীবের ভিত্তিতে ويل শব্দটি মুবতাদা, আর للاعقاب হলো খবর। আর ويل শব্দটি مبتدا হওয়া সহীহ হয়েছে এভাবে যে ويل শব্দটি نكرة কিন্তু তা দুআর জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় তা مبتدا হওয়া শুদ্ধ হয়েছে।

প্রথম হাদীসে عقب একবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং দ্বিতীয় হাদীসে اعقاب বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর মধ্যে মিল পাওয়া যায়। এভাবে যে, عقب হলো جنس আর দ্বিতীয় হাদীসে اعقاب হলো বহুবচন। কেননা সে সব লোকদের প্রতি লক্ষ্য করেই রাসূল একথাটি বলেছেন যারা পা ধৌত করার ব্যাপারে গাফলতি করেছিল।

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান ঃ

প্রশ্ন ঃ শাস্তি কি শুধুমাত্র পায়ের গোড়ালিতে দেয়া হবে না কি ঐ ব্যক্তির দেয়া হবে যার পা শুষ্ক ছিল? হাদীসের শব্দ দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় পায়ের গোড়ালিতে আযাব হবে।

উত্তর ঃ ১. কাজী আয়াজ উক্ত প্রশ্নের সমাধানে বলেন, আযাব গোড়ালিতে দেয়া হবে। অথবা, অলসতাবশত শুষ্ক অবস্থায় পা কে ছেড়ে দেয়ায় ব্যক্তির উপরেই শাস্তি আরোপিত হবে।

গ. অথবা, পূর্ণ গোড়ালিতে শাস্তি দেয়া হবে না বরং যতটুকু অংশ শুষ্ক রেখেছে সেখানে শাস্তি হবে বাকী অংশ জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। এটা আহমদ ইবনে নসর এর উক্তি। আর বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় পায়ের গোড়ালিতে আযাব হবে।

২. যায়নুল আরব বলেন, দোযখের আগুন (মানুষের) গোড়ালির ঐ অংশে পৌঁছাবে যেখানে পানি পৌঁছেনি। এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় শাস্তি শুধুমাত্র গোড়ালির সাথে খাস; যে অংশ ধৌত করার ব্যাপারে অলসতা হয়েছে।

৩. ইমাম বাগবী বলেন রাসূলের বাণীর মমার্থ হলো এই যে, وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْأَعْقَابِ الْمُقَصِّرِيْنَ فِي غَسْلِهَا

ঐ গোড়ালি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য কঠিন শাস্তি যারা গোড়ালি ধৌত করার ব্যাপারে অলসতা করে। এ কওল অনুযায়ী শাস্তি মানুষের সমস্ত শরীরে হবে। মোটকথা এখানে جزء উল্লেখ করে كل উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। যেমন رقبة বলে পূর্ণ গোলাম উদ্দেশ্য নেয়া হয়।

৪. আল্লামা যুরকানী (র) বলেন, শাস্তির ক্ষেত্রে গোড়ালির সাথে অন্যান্য অঙ্গগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে যেগুলো ধৌত করার ব্যাপারে লোকেরা কোতাহী করে থাকে এবং অলসতা বশত অঙ্গগুলোকে পূর্ণাঙ্গরূপে ধৌত করে না। তবে উক্ত রেওয়ায়াতে বিশেষভাবে اعقاب এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে سبب এর ভিত্তিতে। এর দ্বারা বুঝা যায় গোড়ালি ব্যতীত যদি উযূর অন্যান্য অঙ্গ নখ পরিমাণ ও শুষ্ক থাকে তাহলে সে শাস্তিযোগ্য হবে। এর সমর্থন পাওয়া যায় ত্বহাবী শরীফের বর্ণনা দ্বারা– وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ وَبُطُوْنِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ

কাজেই যারা রাওয়াফেজদের মত উযূ করে তথা উভয় পায়ের গোড়ালী ও অভ্যন্তরীণ অংশে মাসেহ করে (ধৌত করা বাদ দিয়ে তাহলে) তাদের উপর জাহান্নামের কঠিন শাস্তি আরোপিত হবে।

মোটকথা, আলোচ্য হাদীস এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উযূতে পা ধৌত করা ফরয এবং এটা ত্যাগকারীর উপর কঠিন শাস্তি আরোপিত হবে। এটাই জুমহূর ফুকাহায়ে কিরাম এবং সাহাবায়ে কিরামের অভিমত। ফেরকায়ে ইসমিয়্যা এর বিপরীত মত পোষণ করে।

জুমহুরের দলীল ঃ ১. হযরত আলী, হযরত উসমান, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ, জাবের, আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর প্রমূখ সাহাবায়ে কিরাম যারা নবী (স) এর উযূর বিবরণ দিয়েছেন তারা সকলে একথার উপর একমত যে, নবী (স) উযূতে পা ধৌত করতেন। তবে মোজা পরিহিত হলে ভিন্ন কথা। এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে উপনীত। অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীস যা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত তার শব্দগুলোও একথার স্বীকৃতি দেয় যে, পা খালী থাকলে পূর্ণ পা ধৌত করা জরুরী। পক্ষান্তরে যারা পা মাসেহ করার প্রবক্তা তারা কেউ পূর্ণ পা মাসেহ করার প্রবক্তা নন। অথচ আলোচ্য হাদীসে ধমকি এসেছে পূর্ণাঙ্গরূপে পা ধৌত না করার কারণে। আর এটা দশজন সাহাবী থেকে বর্ণিত।

পা শুষ্ক থাকার কারণ ঃ সময় ছিল সংকীর্ণ। কাজেই নামায ফউত হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। তাই তারা দ্রুত ও তাড়াহুড়া করে উযূ করেছিল। ফলে তাদের পা শুষ্ক ছিল। অথবা, গুরুত্ব সহকারে না ধোয়ার কারণে পা শুষ্ক ছিল, অথবা, অলসতা ও গাফলতির কারণে তাদের পা শুষ্ক ছিল। অথবা, পানি কম থাকার কারণে পায়ের গোড়ালি শুষ্ক ছিল। অথবা, তাদের পায়ের গোড়ালিতে যে পানি পৌঁছেনি এটা তাদের জানা ছিল না, অথবা, তারা ধারণা করেছিল যে, পায়ের অধিকাংশ ধৌত করলেই পূর্ণ পা ধৌত করা হয়ে যাবে ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই তারা পায়ের অধিকাংশ ধৌত করার উপর ক্ষান্ত করে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, পা ধৌত করতে হবে এবং পূর্ণ পা ধৌত করা ফরয।

জুমহুরের দলীল- ২ঃ পায়ের উপর মাসেহ করা যথেষ্ট হলে হুজুর (স) বৈধতা বর্ণনা করার জন্য কমপক্ষে একবার হলেও পূর্ণ জিন্দেগীতে আমল করে দেখাতেন। অথচ এতদা সংক্রান্ত হাদীস কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত নেই। তবে মোজার উপর মাসেহ করার বিষয়টি ভিন্ন। এটাই একথার উপর প্রমাণ যে, পা মাসেহ করতে হবে।

ইজমা ঃ পা ধৌত করার উপর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইজমা রয়েছে। কাজেই রাওয়াফেজদের বক্তব্য এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

تَوَاتُرِ عمل বা আমল পরম্পরা ঃ সাহাবায়ে কিরাম থেকে আজ পর্যন্ত সকলের থেকে পা ধৌত করার আমলটি مُتَوَاتِر হিসাবে চলে আসছে। কাজেই এক্ষেত্রে রাওয়াফেজদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

جر এর ক্বিরাতের জবাব ঃ রাওয়াফেজরা حرف جار এর ক্বিরাতের উপর ভিত্তি করে পা মাসেহ করার প্রবক্তা হয়েছে। অথচ قراة جر দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সহীহ নয়। কারণ এটা قراة نصب এর সাথে সাংঘর্ষিক। বস্তুতঃ وَاَرْجُلَكُمْ এর মধ্যে جر হয়েছে مُجَاوَرة এর কারণে। যেমন- عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে عذابُ يَوْمٍ مُحِيْطٍ এখানে اَلِيْمِ শব্দটি عذاب এর ছিফত এবং مفعول হওয়ার ভিত্তিতে। اليم শব্দটিতেও নসব হওয়া উচিত ছিল কিন্তু يوم এর مُجاورة এর কারণে جر পড়া হয়েছে। ঠিক অদ্রুপভাবে مُحِيْط শব্দটি عذاب এর সিফাত হওয়া সত্ত্বেও يوم এর مُجاورة এর কারণে جر পড়া হয়। মোটকথা, উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা জানা যায় اَرْجُلَكُمْ এর পূর্বে যে جر রয়েছে তা مُجاورة এর কারণে। اعراب এর ভিন্নতার কারণে অর্থের মধ্যে কোন ভিন্নতা আসবে না। এর সমর্থন হলো احاديث متواتر ও احاديث مشهورة যেখানে غسل رِجْلَيْن এর কথা এসেছে। (বজলুল মাজহুদ ১/৬২)

আলোচ্য মাসআলার ব্যাপারে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) এর বক্তব্য

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) বলেন, রাওয়াফেজদের অন্তরে আত্মঅভিলাষ ও কুপ্রবৃত্তির অনুকরণ এ পরিমাণ বদ্ধমূল যে, তারা আয়াতের ظاهر দ্বারা প্রমাণ পেশকরত: غَسْلِ رِجْلَيْن কে অস্বীকার করেছে। তিনি বলেন, غَسْلِ رِجْلَيْن কে অস্বীকার করা আমার নিকট বদর ওহুদ যুদ্ধকে অস্বীকার করার নামান্তর।

উভয় ক্বিরাতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ঃ

কেউ কেউ কিরাতদ্বয়কে দুই অবস্থার উপর প্রয়োগ করেন : كسرة এর ক্বিরাত হলো মোজা পরিহিত অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত, আর মোজাবিহীন অবস্থাটা فتح এর ক্বিরাতের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- الم ۔ غُلِبَتِ الرُّوْمُ মারূফ ও মাজহুল দু ধরণের ক্বিরাত দু অবস্থায় প্রযোজ্য। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ২০২-২০৩)

بَابُ بِاَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْغَسْلِ

١١٢. اخبرنا محمدُ بْنُ عبدِ الاَعْلٰى قال حدَّثنا خالدٌ قال حدَّثنا شعبةُ قال اَخْبَرنِى الْاَشْعَثُ قال سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ مَسروقٍ عَنْ عَائشةَ وذكرتْ اَنَّ رسولَ اللّٰهِ ﷺ كان يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِى طُهورِه ونَعْلِه وتَرَجُّلِهِ -

قال شعبةُ ثم سمعتُ الْاَشْعَثَ بِوَاسِطٍ يقولُ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فذَكَرَ شانَه كُلَّهُ ثم سَمِعْتُه بِالْكُوفَةِ يقولُ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ -

غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ بِالْيَدَيْنِ

١١٣. اخبرنا محمدُ بْنُ بَشَّارٍ قال حَدَّثنا محمدٌ قال حدَّثنا شعبةُ قال اخبرنا اَبُو جعفرَ الْمَدَنِىُّ قال سَمِعْتُ ابنَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ يَعْنِى عُمَارَةَ قال حَدَّثَنِى الْقَيْسِىُّ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى سَفَرٍ فَاُتِىَ بِمَارَةَ قال حَدَّثَنِى الْقَيْسِىُّ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى سَفَرٍ فَاُتِىَ بِمَاءٍ فَقَالَ عَلٰى يَدَيْهِ مِنَ الْاِنَاءِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّةً وَغَسَلَ وَجْهَهُ وذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا -

---

অনুচ্ছেদ ঃ কোন পা প্রথমে ধৌত করতে হবে?

অনুবাদ ঃ ১১২. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) উযু করা, জুতা পরিধান করা ও চুল আঁচড়ানোতে যথাসম্ভব ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। হাদীসের অন্যতম রাবী শো'বা বলেন, ওয়াসিত শহরে আমি আশআছ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সকল কাজ ডান দিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। তারপর কুফাতে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি (রাসূল স.) যথাসাধ্য ডান দিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

হাত দ্বারা পা ধৌত করা

১১৩. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার (র)........ (আবদুর রহমান ইবনে আবদ) কায়সী (রা) থেকে বর্ণিত। এক সফরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে তিনি ছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য পানি আনা হলে তিনি পাত্র থেকে হাতে পানি ঢালেন এবং উভয় হাত একবার ধৌত করেন। এক একবার করে মুখমণ্ডল ও দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে উভয় হাত দ্বারা পদদ্বয় ধৌত করেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ ধারাবাহিকভাবে উযূ করে যখন পা পর্যন্ত পৌঁছবে তখন সর্ব প্রথম ডান পা ধৌত করবে অতঃপর বাম পা ধৌত করবে। تَيَامُنٌ শব্দ ব্যবহার করে হাদীসে একথাই বুঝানো হয়েছে। কারণ تَيَامُنٌ অর্থ হল ডান দিক থেকে শুরু করা। কেননা, ডানদিক বাম দিক হতে শক্তিশালী এবং অগ্রগণ্য। তাই ডান দিকের প্রতি লক্ষ্য

রাখা উচিত। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) সকল ভালো কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন, চাই তা পবিত্রতা অর্জন করার ক্ষেত্রে হোক কিংবা জুতা পরিধান করা কিংবা মাথা আঁচড়ানো হোক। অবশ্য তিনি নিম্নমানের কাজে বাম হাতকে আগে ব্যবহার করতেন। যেমন– নাক পরিষ্কার করা, পায়খানায় প্রবেশ করা ইত্যাদি।

শরহে বেকায়ায় আছে যে, ডান দিক থেকে কাজ শুরু করা হুজুর (স) এর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি এর উপর স্থিতিশীল ছিলেন। এ কারণে এর দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়। ফয়যুলবারীর মধ্যে হযরত আনোয়ার শাহ (র) বলেন, মুসলমান ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন সম্প্রদায় ডান দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখে না।

মেশকাত শরীফের এক হাদীসে আছে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.কে পছন্দ করার অধিকার প্রদান করেন। তখন আদম আ. يمين (ডান দিক) কে নির্বাচন করেন।

وكلتا يدى الرحمن يمين আল্লাহ তাআলার উভয় হাত ডান। মোটকথা, হযরত আদম আ. এর এ নির্বাচন অত্যন্ত পছন্দনীয় ও উত্তম ছিল। ফলে তার সন্তান সন্ততির মধ্যেও এর প্রচলন পায়। যেমন– আদম (আ) সালাম প্রদান করেন এবং ফেরেশতারা তার উত্তর দেন। ফলে তার এ সুন্নত তার সন্তানদের মধ্যেও চালু হয়ে যায়। এ ছাড়াও আরো অনেক বস্তু আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বান্দাগণ গ্রহণ করেন ফলে সেগুলো নবীদের শরীয়তে সুন্নত হয়ে গেছে। সর্বোপরি সকল প্রকার পছন্দীয় ও ভালো কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা মুসলমানদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং এটা ধর্মের প্রতীক।

قوله قال شعبة سَمِعْتُ الْاَشْعَثَ بِوَاسِطِ الخ ঃ শো'বা বলেন, আমার শায়খ আশআস ইবনে আব্দুল্লাহ ما استطاع শব্দও বর্ণনা করেছেন, যখন তিনি ওয়াসিত শহরে ছিলেন তখন শুধুমাত্র يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِى شَانِهِ كُلِّهِ। বলতে শুনেছি। অতঃপর যখন তিনি কুফায় গমন করলেন তখন يُحِبُّ التَّيَامُنَ في طُهور ...الخ এর পরে ما اسْتَطَاعَ। শব্দও বর্ণনা করতে শুনেছি ما استطاع শব্দে تيامن এর প্রতি তাকিদ সৃষ্টি করা হয়েছ এবং হাদীসটি উত্তমরূপে সংরক্ষিত হওয়ার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যথাসম্ভব বিশেষ কোন ওজর বা প্রতিবন্ধকতা না থাকলে ডান দিক থেকে শুরু করাটাকে পছন্দ করতেন। হাদীসে তিনটি জিনিস উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যথায় হুজুর (স) উযূ, গোসল, মাথা আঁচড়ানো, জুতা পরিধান করা এবং প্রত্যেক ভাল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন এবং এটাই ডান হাতের জন্য সৌন্দর্য। আর যে সকল জিনিস যেমন মসজিদ থেকে বের হওয়া, পায়খানায় প্রবেশ করা, নাক পরিষ্কার করা, জুতা খোলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাম দিকের প্রতি লক্ষ্য করতেন, তথা বাম দিক থেকে শুরু করতেন।

তবে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় কিংবা কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় তাহলে تيامن এর প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী নয় বরং تيامن কে ত্যাগ করবে যেমন সাওয়ারিয় থেকে অবতরণ করা। কেননা, এ ক্ষেত্রে বাম পা ব্যবহার করাই অধিক সহজ।

قوله وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِيَمِيْنِهِ كِلْتَاهُمَا الخ ঃ অন্য এক নুসখায় আছে وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا পয়গাম্বরগণ উযূতে পদদ্বয়কে উভয় হাত দ্বারা ধৌত করতেন এর দ্বারা বুঝে আসে উভয় পা ডান হাত দ্বারা ঘষে ধৌত করতেন অবশ্য বাম হাতকে পায়ের নিচের অংশে লাগাতেন যাতে করে তার উপর ভর করে ধোয়া যায়। অন্যথায় পদদ্বয় ধৌত করার ক্ষেত্রে বাম হাতের কোন ভূমিকা নেই। রাবী খেয়াল করেছেন পা ধৌত করার ক্ষেত্রে, বাম হাতও যেহেতু এতে শরীক রয়েছে তাই بِيَدَيْهِمَا كِلْتَيْهِمَا বলেছেন। (والله اعلم بالصواب)

اَلْاَمْرُ بِتَخْلِيْلِ الْاَصَابِعِ

١١٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ وَكَانَ يُكْنٰى اَبَاهَاشِمٍ ح وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّاْتَ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ -

---

আঙ্গুল খিলাল করার নির্দেশ

অনুবাদ ঃ ১১৪. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)..........লাকীত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তুমি যখন উযূ কর পরিপূর্ণরূপে উযূ কর এবং আঙ্গুল খেলাল কর।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস ও এ ধরণের অন্যান্য বর্ণনা রেওয়ায়াত করেছেন। ইবনে আব্বাস সহ বহু সাহাবায়ে কিরাম এগুলো দ্বারা আঙ্গুল খেলাল করা শরীয়ত অনুমোদিত হওয়াকে প্রমাণ করেন। আর যেহেতু এই হাদীসটি মুতলাক তাই হাতও পায়ের সকল আঙ্গুলকে অন্তর্ভুক্ত করবে। উক্ত হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে একথা বুঝে আসে যে, ফরজ গোসলে আঙ্গুল খেলাল করে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। আর যদি আঙ্গুল খিলাল করা ব্যতীতই পানি পৌঁছে যায় তাহলে আঙ্গুল খেলাল করা জরুরী নয় বরং মুস্তাহাব।

১. ইবনে রুশদ মালেকী مقدمات এর মধ্যে উযূতে হাত পায়ের আঙ্গুল খেলাল করাকে মুস্তাহাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২. ইমাম শাফেয়ী (র) এর নিকট আঙ্গুল খেলাল করা মুস্তাহাব। (شرح المهذب للنووى দ্রষ্টব্য)

৩. বাদাইয়ুস সানায়ে এবং বাহরুর রায়েক এর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র) এর নিকট হাত পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা সুন্নত।

৪. ইমাম আহমদ (র) এর নিকটও সুন্নত। যেমন- ইবনে কুদামা "মুগনী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি বলেন, হাতের তুলনায় পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা বেশী শক্তিশালী। এর কারণ হয়তোবা এটা যে, পায়ের আঙ্গুল অধিকাংশ সময় মিলিত অবস্থায় থাকে। মোটকথা, উলামায়ে আহনাফ ও অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম আঙ্গুল খেলাল করাকে সুন্নত বলেন। তারা বলেন হাদীসের মধ্যে যে আমরের সীগা ব্যবহার করা হয়েছে এটা ওয়াজিব এর জন্য নয়, বরং মুস্তাহাব সাব্যস্ত করার জন্য। কেননা, ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আর তা হল গ্রাম্য ব্যক্তিটির উযূর বিধান শিক্ষা দেয়া। কারণ তাতে আঙ্গুল খেলাল করার কথা নেই। অনুরূপভাবে যে সকল হাদীসে রাসূলের উযূর বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেখানেও আঙ্গুল খেলাল করার কথা উল্লেখ নেই। কাজেই আমরের সীগাকে মুস্তাহাবের উপর প্রয়োগ করা হবে। অনুরূপভাবে রিফাআ ইবনে রাফে এর যে হাদীস ত্বহাবী শরীফে রয়েছে তার দ্বারাও আঙ্গুল খেলাল করা ওয়াজিব হবে না। আল্লামা শাওকানী হাদীসের বাহ্যিক অবস্থার উপর দৃষ্টি করে যে ওয়াজিব হওয়ার দাবী করেছেন তা অমূলক মনে হয়। (والله اعلم بالصواب)

আঙ্গুল খেলাল করার ধরন কি হবে এ ব্যাপারে রাসূল সা. থেকে সহীহ সনদে কোন নিয়ম পাওয়া যায় না। তবে ফুকাহায়ে কিরাম আঙ্গুল খেলাল করার এ পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যে, ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে খেলাল করা শুরু করবে এবং বাম পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলিতে শেষ করবে, এমন করার দ্বারা تيامن এর উপরেও আমল হয়ে যাবে। আর হাতের আঙ্গুল খেলাল করার ক্ষেত্রে কতক আঙ্গুলকে কতক আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করায়ে খেলাল করবে। (বাহরুর রায়েক, শরহুল মুহাজ্জাব, মুগনী, ফাতহুল কাদীর)

عَدَدُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

١١٥. اخبَرَنا محمدُ بْنُ اٰدمَ عن ابنِ ابى زائدةَ قال حَدَّثنى ابى وغيرُه عَن ابى اسحٰقَ عَن ابىْ حَيَّةَ الوَادِعِىِّ قال رَاَيْتُ عليًّا توضَّا فغسَل كَفَّيهِ ثلٰثا وتمضمضَ ثلٰثا واَسْتَنْشَقَ ثلٰثا وغسَل وَجْهَه ثلٰثا وذِراعَيْهِ ثلٰثا ثلٰثا ومَسَحَ بِرأسِهِ وغسَل رِجْلَيْهِ ثلٰثا ثلٰثا ثم قال هٰذا وُضوءُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ

بابُ حَدِّ الغَسْلِ

١١٦. اخبَرَنا احمدُ بْنُ عمرو بْنِ السَّرْحِ والحارثُ بْنُ مِسكينٍ قِراءَةً عليهِ وانا اَسْمَعُ واللفظُ لَه عَنِ ابنِ وَهْبٍ عَن يُونُسَ عن ابنِ شِهابٍ اَنَّ عَطاءَ بْنَ يزيدَ اللَّيْثِىَّ اخبرَه اَنَّ حُمْرانَ مَوْلَى عثمانَ اخبرَه اَنَّ عثمانَ دعا بِوَضُوءٍ فتوَضَّاَ فغسَلَ كَفَّيهِ ثلاثَ مَرّاتٍ ثمّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثمّ غسَل وَجْهَه ثلٰثَ مَرّاتٍ ثمّ غَسَلَ يدَه اليُمْنى اِلَى المِرفَقِ ثلٰثَ مَرّاتٍ ثم غسَل يدَه اليُسْرى مِثلَ ذٰلك ثمّ مَسَحَ بِراسِه ثمّ غسَل رِجلَه اليُمْنى اِلى الكَعْبَيْنِ ثلٰثَ مَرّاتٍ ثم غسَل رِجلَه اليُسْرى مثلَ ذٰلك ثم قال رايتُ رسولَ اللّٰهِ ﷺ توَضّا نَحْوَ وُضُوئى هٰذا ثم قالَ قالَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ مَن تَوضّاَ نَحْوَ وُضُوئى هٰذا ثم قامَ فركَعَ رَكْعَتَيْنِ لايُحَدِّثُ فِيهِما نَفْسَهُ غُفِرَلَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

---

পা কতবার ধৌত করবে

অনুবাদ ঃ ১১৫. মুহাম্মদ ইবনে আদম (র) ....আবু হাইয়াহ্ ওয়াদিয়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি তিনবার উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন, তিনবার কুলি করেন, তিনবার নাক পরিষ্কার করেন। তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং তিনবার করে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে মাথা মাসেহ করেন এবং উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন, এটাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর উযূ।

অনুচ্ছেদ ঃ হাত -পা ধৌত করার সীমা

১১৬. আহমদ ইবনে আমর (র) ও হারিস ইবনে মিসকীন....... হুমরান (র) থেকে বর্ণিত যে, উসমান (রা) উযূর পানি আনতে বলেন। প্রথমে তিনি তিনবার উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। এরপর তিন তিনবার ডান ও বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। এরপর মাথা মাসেহ করেন এবং তিন তিনবার ডান ও বাম পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এরূপ উযূ করতে দেখেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করবে এবং দাঁড়িয়ে একাগ্রচিত্তে দু'রাকাত নামায আদায় করবে তার পেছনের গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (দ্রষ্টব্য ঃ ৮৪ নং হাদীসের অধীনে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ অতিবাহিত হয়েছে।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله عن ابن ابى زائدة **ঃ** তার নাম ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া হামদানী কূফী। همدانى শব্দের ميم বর্ণে সাকিন। হামদান একটি গোত্রের নাম। তার দিকে নিসবত করে তাকে হামদানী বলা হয়। তিনি সিকা/নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন এবং পূর্ণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি ১৮৩ হিজরীতে ইনতেকাল করেন। আলোচ্য হাদীসে রাবীর শ্রবনের সম্বন্ধ তাঁর দাদার দিকে করা হয়েছে। বাস্তবে তিনি উক্ত হাদীস তার দাদা থেকে শোনেননি। বরং তিনি তার পিতা যাকারিয়া থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। আর তিনি যে হাদীসটি তার পিতা থেকে শ্রবণ করেছেন এটা আবু ইসহাক থেকে প্রমাণিত এবং তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী।(দ্রষ্টব্য ঃ ৯৬ নং হাদীসের অধীনে এ সম্পর্কিত বিবরণ অতিবাহিত হয়েছে।)

بَابُ الْوُضُوْءِ فِى النَّعْلِ

١١٧. اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رايتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوضأ فيها قال رايت رسول الله ﷺ يلبسها ويتوضأ فيها -

অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পরিহিত অবস্থায় উযূ করা

অনুবাদ ঃ ১১৭. মুহাম্মদ ইবনে আ'লা (র)..............উবায়দ ইবনে জুরায়াজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-কে বললাম, আমি দেখেছি আপনি এই সিবতী জুতা পরিধান করেন এবং এগুলো পরিধান করেই উযূ করেন। (এর কারণ কি?) আবদুল্লাহ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ সিবতী জুতা পরিধান করতে এবং তা পায়ে রেখে উযূ করতে দেখেছি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

ইমাম নাসায়ী (র) وضوء শব্দ দ্বারা غسل رجل অর্থাৎ পা ধৌত করার বিষয় উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেননা, শিরোনামে وضوء শব্দ এনেছেন যা ধৌত করার অর্থে ব্যবহার হওয়াটাই প্রসিদ্ধ। মাসেহ করার অর্থে নয়। আর فى النعل দ্বারা উদ্দেশ্য হল যদি উযূকারী জুতা পরিহিত অবস্থায় থাকে এবং পায়ে মোজা না থাকে তাহলে এক্ষেত্রে পা ধৌত করা অপরিহার্য বা ফরয। মোজার উপর মাসেহ করার ন্যায় জুতার উপর মাসেহ করা কোনক্রমেই বৈধ নয় এবং কেউ জুতার উপর মাসেহ বৈধ হওয়ার প্রবক্তা নন, বরং মোজাবিহীন সকল সুরতে পা ধৌত করার হুকুম দেন, তবে উযূকারীর এ ব্যাপারে এখতিয়ার আছে ইচ্ছা করলে সে জুতা খুলে পূর্ণ পা ধৌত করতে পারে, আবার জুতা পরিহিত অবস্থায়ও পূর্ণ পা ধৌত করতে পারে তবে জুতাটা আরবীয় জুতা হতে হবে। কেননা, সেখানকার জুতা চামড়ারই হয়ে থাকে। কাজেই জুতা পরিহিত অবস্থায়ও পূর্ণ পায়ে পানি পৌঁছানো দুষ্কর নয়।

ويتوضأ فيهما **সম্পর্কে আলোচনা ঃ** হাদীসের শব্দ ويتوضأ فيهما দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, নবী সা. জুতা পরিহিত অবস্থায় জুতার মধ্যে পা ধৌত করতেন। কেননা, فيهما শব্দটি ظرف এবং يتوضأ এর সাথে متعلق এটাই আল্লামা আইনীসহ প্রমুখ মুহাদ্দিস বলেছেন। আবু দাউদ শরীফে باب صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم এর শিরোনামের অধীনে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেখানে এসেছে وفيهما النعل ففتلها بهما ثم الأخرى مثل ذالك ... الخ

হুজুর (স) জুতা পরিহিত অবস্থায় ছিলেন, একদা এ অবস্থাই উযূ করতে আরম্ভ করেন এবং পা ধৌত করার পালা এলে তখন তিনি জুতাকে খুলে জুতার ভিতরেই পানি ঢেলে দেন এবং জুতাদ্বয় কে এদিক ওদিক উলট পালট করতে থাকেন, যাতে করে পানি পায়ের সর্বাংশে পৌঁছে যায় এবং কোথাও শুষ্ক না থাকে। এর থেকে বুঝা যায় যে, জুতার উপর কোনক্রমেই মাসেহ বৈধ নয়। যদি মাসেহ করার কোন অবকাশ থাকতো তাহলে নবী (স) তাতে পানি ঢেলে তাকে এদিক সেদিক ঘুরাতেন না এবং এ বিষয়ে গুরুত্বও প্রদান করতেন না।

মোটকথা, অধ্যায়ের হাদীস দ্বারা জুতার মধ্যে পা ধৌত করার বৈধতা সাব্যস্ত হয়। ইমাম নাসায়ী (র) সংক্ষেপ করার লক্ষ্যে হাদীসের ঐ অংশই বর্ণনা করেছেন যার দ্বারা তার দাবী সাব্যস্ত হয়। যে নবী (স) ছাবতী চামড়ার জুতা পরিধান করতেন। سبت বলা হয় দাবাগাতকৃত চামড়াকে। দাবাগত করার কারণে যার পশম পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি শুধু সাবীত পরিধানই করেননি বরং তিনি তাতে উযূও করতেন। হযরত ইবনে ওমর (রা) তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণার্থে সাবীত জুতা পরিধান করতেন এবং জুতা খুলা ব্যতীতই তাতে পা ধৌত করতেন। ইবনে উমর (রা) রাসূলের অনুরণে বাকী যে কাজগুলো করতেন তা ইমাম বুখারী (র) বুখারী শরীফে غسل الرجلين فى النعلين এর শিরোনামে পূর্ণ হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। (শরহে উর্দু নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ২০৬-২০৭)

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

١١٨. اخبرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيدٍ قال حَدَّثَنا حفصٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عن إبراهيم عن هَمَّامٍ عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ انّه تَوَضَّأَ ومَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فقيلَ له أتَمْسَحُ فقال قد رأيتُ رسولَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ وكانَ اَصْحابُ عَبْدِ اللّٰهِ يُعْجِبُهُم قولُ جَرِيرٍ وكانَ إسلامُ جَرِيرٍ قبلَ مَوْتِ النبيِّ ﷺ بيَسِيرٍ -

١١٩. اخبرنا العَبَّاسُ بْنُ عبدِ العَظِيمِ قالَ حَدَّثَنا عبدُ الرحمٰن قال حَدَّثَنا حربُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ أبى كَثِيرٍ عن أبى سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عن ابيه أنّه رَأى رسولَ اللّٰه ﷺ تَوَضَّأَ ومَسَحَ عَلٰى الخُفَّيْنِ -

١٢٠. اخبرنا عبدُ الرحمٰنِ بنُ إبراهيمَ دُحَيْمٌ وسُلَيمانُ بْنُ دَاوُدَ واللفظُ له عَنِ ابْنِ نافعٍ عن داوُدَ بنِ قَيْسٍ عَن زيدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيدٍ قال دَخَلَ رسولُ اللّٰه ﷺ وبلالٌ الْاَسْوافَ فذَهَبَ لِحاجَتِه ثم خَرَجَ قال أُسامَةُ فسَألتُ بلالاً ماصَنَعَ فقالَ بلالٌ ذَهَبَ النبيُّ ﷺ لِحاجَتِه ثم توضّا فغَسَلَ وَجْهَه ويَدَيْه ومَسَحَ بِرأسِه ومَسَحَ عَلٰى الخُفَّيْنِ ثم صَلّٰى -

١٢١. اخبرنا سُلَيمانُ بْنُ داوُدَ والحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِراءةً عليه وأنا اسمَعُ واللفظُ له عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارِثِ عَنْ أبِى النَّضْرِ عن أبى سَلَمَةَ بْنِ عبدِ الرحمٰنِ عن عبدِ اللّٰه بنِ عُمَرَ عن سعدِ بْنِ أبِى وَقّاصٍ عَنْ رسولِ اللّٰهِ ﷺ أنَّهُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ -

١٢٢. اخبرنا قُتَيْبَةُ قال حَدَّثَنا اسمٰعِيلُ وهُوَ ابنُ جعفرَ عن مُوسٰى بنِ عُقْبَةَ عَنْ أبِى النَّضْرِ عن أبى سَلَمَةَ عَن سعدِ بْنِ أبِى وَقّاصٍ عن رسولِ الله ﷺ في المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ انّه لابأسَ به -

١٢٣. اخبرنا عَلِيُّ بْنُ خُشْرُمٍ قالَ حَدَّثَنا عِيسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَن مَسْرُوقٍ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ خَرَجَ النبيُّ ﷺ لِحاجَتِه فلمّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُه بإداوَةٍ فصَبَبْتُ عليه فغَسَلَ يَدَيْهِ ثمّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثمّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِراعَيْهِ فضاقَتْ بِهِ الجُبَّةُ فأخْرَجَهُما مِن اَسْفَلِ الجُبَّةِ فغَسَلَهُما ومَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثم صَلّٰى بِنا-

١٢٤. اخبرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيدٍ قال حَدَّثَنا لَيْثُ بْنُ سعدٍ عَنْ يَحْيٰى وهُوَ ابْنُ سعيدٍ عَن سعدِ بْنِ ابراهيمَ عَن نافعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ عَنْ أبِيهِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَن رسولِ اللّٰهِ ﷺ انّه خَرَجَ لِحاجَتِه فأتْبَعَهُ المُغِيرَةُ بإداوَةٍ فيها ماءٌ فصَبَّ عليه حتّٰى فَرَغَ مِنْ حاجَتِه فتَوَضَّأَ ومَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ --

---

অনুচ্ছেদ ঃ মোজার উপর মাসেহ করা

অনুবাদ ঃ ১১৮. কুতায়বা ইবনে সা'ঈদ (র)....... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উযূ করেন এবং মোজার উপর মাসেহ করেন। তাঁকে বলা হল, কি ব্যাপার! আপনি মোজার উপর মাসেহ করেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে মাসেহ করতে দেখেছি। আবদুল্লাহর সাথীগণ

জারীরের এ কথা পছন্দ করতেন। আর জারীর রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের কিছুকাল পূর্বে ইসলাম কবুল করেছিলেন।

১১৯. আব্বাস ইবনে আবদুল আযীম (র)......আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে উযূ করতে দেখেছেন এবং (উযূতে) মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছেন।

১২০. আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম দুহায়ম (র) ও সুলায়মান ইবনে দাউদ (র)......উসামা ইবনে যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এবং বিলাল (রা) হারামে মদীনায় (আসওয়াফ) প্রবেশ করেন। রাসূল (স) তাঁর পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে বাইরে যান এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে আসেন। উসামা (রা) বলেন, আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে কি করেছিলেন? বিলাল (রা) বলেন, নবী (স) প্রকৃতির ডাকে বাইরে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে উযূ করেন। তাঁর মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করেন এবং মাথা ও মোজার উপর মাসেহ করেন। তারপর নামায আদায় করেন।

১২১. সুলায়মান ইবনে সাউদ ও হারিস ইবনে মিসকীন (র).......সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মোজার উপর মাসেহ করেছেন।

১২২. কুতায়বা (র).......সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত যে, মোজার উপর মাসেহ করাতে কোন অসুবিধা নেই।

১২৩. আলী ইবনে খাশ্‌রাম (র)..........মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (একদা) পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন। তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমি পানির পাত্র নিয়ে উপস্থিত হই। আমি তাঁকে পানি ঢেলে দেই, তিনি উযূ করেন। (প্রথমে) হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে মুখমণ্ডল ধৌত করেন। তারপর কনুই পর্যন্ত হাত ধুইতে চান। কিন্তু জামার হাতা চিকন হওয়াতে তা পারেন নি। তাই জুব্বার (জামার) নিচের দিক দিয়ে হাত বের করে কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন এবং মোজার উপর মাসেহ করেন। এরপর আমাদের সঙ্গে নিয়ে নামায আদায় করেন।

১২৪. কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)........ মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর প্রয়োজনে বাইরে যান। মুগীরা (রা) পানির পাত্র নিয়ে তাঁর অনুগমন করেন। নবী (স) তাঁর প্রয়োজন সমাধা করার পর উযূ করেন এবং মোজার উপর মাসেহ করেন। উযূ করার সময় মুগীরা (রা) তাঁকে পানি ঢেলে দেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

ইমাম নাসায়ী (র) এর উদ্দেশ্য ঃ আলোচ্য শিরোনাম কায়েম করার দ্বারা ইমাম নাসায়ী (র) এর উদ্দেশ্য হল, মোজার উপর মাসেহ করার বৈধতা প্রমাণ করা এবং খারেজী ও ফিরকায়ে ইমামিয়্যাদের মতকে খণ্ডন করা, যারা মোজার উপর মাসেহকে অস্বীকার করেন। এটাকে সাব্যস্ত করার জন্য তিনি অনেক রেওয়ায়াত পেশ করেছেন যা তার দাবি/ উদ্দেশ্যের উপর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। দ্বিতীয়ত ঃ মোজার উপর মাসেহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীন ও উলামায়ে মুতাআখখীরীন ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তাদের মতে মাসেহ এর বিধান "মুহকাম" যা সর্বদা বাকী থাকবে।

سوال : ما مَعْنَى الخُفِّ؟ وَمَا هِيَ شَرَائِطُ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ بَيِّنْ مُوَضِّحًا

প্রশ্ন ঃ خُفٌّ এর অর্থ কি? মোজার উপর মাসেহ বৈধ হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ পূর্বক বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ خُفٌّ এর আভিধানিক অর্থ ঃ خُفٌّ শব্দটি একবচন এর বহুবচন হল اَخْفَافٌ . خِفَافٌ এর শাব্দিক অর্থ হল হালকা বা পাতলা। শব্দটি خفة থেকে নির্গত হয়েছে। মোজাকে خف এজন্য বলা হয় যে, এটি জুতার তুলনায় হালকা ও পাতলা। কেউ কেউ বলেন, خف অর্থ হল ঢেকে ফেলা, এটিকে خف এ জন্যেই বলা হয়, যেহেতু এটি পাকে ঢেকে রাখে।

خف এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ পরিভাষায় خف বলা হয় هُوَ مَا يُلْبَسُ فِي الرِّجْلِ مِنْ جِلْدٍ رَقِيْقٍ অর্থাৎ পায়ের মধ্যে যে চামড়া পরিধান করা হয় তাকে خف বলে।

২. আল-কামুসুল ফিক্হী গ্রন্থকার বলেন– هُوَ السَّاتِرُ لِلْكَعْبَيْنِ فَاكْثَرُ مِنْ جِلْدٍ وَنَحْوِهِ

৩. কারো কারো মতে خف ঐ মোজাকে বলা হয়, যার তলদেশে বা চতুর্দিকে চামড়া লাগানো থাকে।

মোজার উপর মাসেহ করার শর্তাবলী

মোজা মাসেহ জায়েয হওয়ার জন্যে কতিপয় শর্ত রয়েছে। যথা–

১. এমন মোজা হওয়া চাই যা كَعْبَيْنِ সহ উভয় পা কে ঢেকে রাখে।

২. মোজা মোটা হওয়া চাই, যাতে ভেতরে পানি প্রবেশ না করে।

৩. এমন মজবুত হওয়া, যা পায়ে দিয়ে কমপক্ষে তিন মাইল হেঁটে যাওয়া যায়।

৪. এতটুকু ছেঁড়া হতে পারবে না, যাতে পায়ের তিন আঙ্গুল পরিমান দেখা যায়।

৫. মোজা পবিত্র হতে হবে।

৬. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, মোজা طهارة كاملة এরপর পরিধান করতে হবে। আবু হানীফা (র) বলেন, সাধারণ ভাবে طهارة كاملة এরপর মোজা পরিধান শর্ত নয় তবে حدث হলে طهارة كاملة শর্ত।

৭. মোজা এতটুকু লম্বা হওয়া যা কমপক্ষে টাখনু পর্যন্ত ঢেকে রাখে।

سوال : الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَفْضَلُ أَمْ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ؟ بَيِّنْ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِيْهِ .

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর মাসেহ করা উত্তম,নাকি পা ধোয়া উত্তম? ইমামদের মতামতসহ আলোচনা কর।

উত্তর ঃ পা ধৌত করা উত্তম, নাকি মোজার উপর মাসেহ উত্তম?

মোজা থাকা অবস্থায় মোজার উপর মাসেহ করা উত্তম, নাকি পা ধৌত করা উত্তম। এ ব্যাপারে ইমামদের মতামত নিম্নরূপ–

১. ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত ঃ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমদ (র) এর মতে, ধৌত করার চেয়ে মোজার উপর মাসেহ করা উত্তম। কেননা, নবী (স) মোজা থাকা অবস্থায় মোজার উপর মাসেহ করেছেন।

২. ইমাম মালেক (র) এর অভিমত ঃ ইমাম মালেক (র) থেকে এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়–

ক. মাসেহ বৈধ নয়, ধৌত করতে হবে।

খ. ধৌত করা উত্তম, তবে মাকরূহ এর সাথে তার উপর মাসেহ করা বৈধ।

গ. বিনা শর্তে জায়েয আছে।

৩. ইমাম শাফেয়ী ও আওযায়ী (র) এর অভিমত ঃ ইমাম শাফেয়ী ও আওযায়ী (র) এর মতে, পা ধৌত করা উত্তম। কারণ– الْعَمَلُ عَلَى الْعَزِيْمَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ عَلَى الرُّخْصَةِ

سوال : مَا الْاِخْتِلَافُ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ بَيِّنْ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِيْهِ مَعَ دَلَائِلِهِمْ وَتَرْجِيْحِ مَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَكَ بِالْاَدِلَّةِ -

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর মাসেহ করার ব্যাপারে মতভেদ কি? তোমার নিকট গ্রহণযোগ্য মত উল্লেখপূর্বক আলিমদের মতামত উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ মোজার উপর মাসেহ করার ব্যাপারে ইমামদের অভিমত

মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ কি না এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে।

১. খারেজী, রাফেজী ও ফেরকায়ে ইমামিয়্যাদের মতে, মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নেই।

২. জুমহুর আয়েম্মায়ে কিরাম এবং ইমাম চতুষ্ঠয় ও সকল ফুকাহার মতে, মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ।

খারেজীদের দলীল ঃ ১. তাদের প্রথম দলীল হল আল্লাহ তাআলার বাণী–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ -

অবশ্যই হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াও তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ কনুইসহ ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসেহ কর ও পদযুগল টাখনুসহ ধৌত কর। (মায়েদা ঃ ৬)

উক্ত আয়াতে যেহেতু পদযুগলকে ধৌত করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সুতরাং মাসেহ করা জায়েয নয়। কারণ হুজুর (স) এবং সাহাবায়ে কিরাম থেকে মাসেহ সম্পর্কিত যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে এর সবগুলোই সূরায়ে মায়েদার উযূ সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

দলীল ঃ ২. رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللّٰهُ عنه قَالَ لاَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নেই।

জুমহুরের দলীল ঃ ১

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ قال بَلْ اَنْتَ نَسِيْتَ بِهٰذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থাৎ মুগীরা ইবনে শোবা (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লা (স) মোজার উপর মাসেহ করেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ভুলে গেছেন? তিনি বলেন, বরং তুমিই ভুলে গেছ, আমাকে আমার প্রভু এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দলীল ঃ ২

عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِوبْنِ جرير اَنّ جريرًا بَالَ ثم توضّأ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وقال ما يَمْنَعُنِىْ اَنْ اَمْسَحَ وقد رأيتُ رسولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ قَالُوْا اِنَّمَا كَانَ ذٰلك قبلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ قال ما اَسْلَمْتُ اِلاَّ بعدَ نُزولِ الْمَائِدَةِ -

অর্থাৎ আবু যুরআ ইবনে আমর ইবনে জারীর (র) হতে বর্ণিত। একদা হযরত জারীর (র) পেশাবের পর উযূ করার সময় মোজা মাসেহ করেন এবং বলেন, (মোজার উপর) আমাকে মাসেহ করতে নিষেধ করা হয়নি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে স্বচক্ষে এভাবে মাসেহ করতে দেখেছি। উপস্থিত লোকেরা বলেন, এটা সূরা মায়েদা নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। জবাবে তিনি বলেন, আমি সূরা মায়েদাহ নাযিল হওয়ার পরই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি।

দলীল ঃ ২

ما رُوِىَ عَنْ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ مسعودٍ رضي اللّٰه عنه قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللّٰه عليه وسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ مُرادٍ يُقَالُ لَهٗ صَفْوانُ بْنُ عَسَّالٍ فقالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُسافِرُ بَيْنَ مَكَّةَ والْمَدِيْنَةِ فَاَفْتِنِىْ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فقال ثَلاثةُ ايَّامٍ لِلْمُسَافِرِ يومٌ وليلةٌ لِلْمُقِيْمِ.

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি হুজুর (স) এর নিকট বসাছিলাম। এ সময়ে সাফওয়ান ইবনে আছছাল নামক এক ব্যক্তি এসে হুজুর (স) কে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মক্কা এবং মদীনায় সফর করি। কাজেই আমাকে মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে ফতোয়া দিন। তিনি বললেন, মুসফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত।

দলীল ঃ ৩

مَا رُوِىَ عَنْ صَفْوَانَ ابنِ عَسَّالٍ قال بَعَثَنِى النبىُّ صلى الله عليه وسلم فِى سَرِيَّةٍ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثلاثةٌ ولِلْمقيمِ يومٌ وليلةٌ مَسْحًا على الْخُفَّيْنِ.

অর্থাৎ হযরত সাফওয়ান ইবনে আছছাল (র) বলেন, হুজুর (স) আমাকে একটি সারিয়ায় প্রেরণ করে বললেন,

দলীল ঃ ৪

وقد رُوِىَ عن ابْنِ عبَّاسٍ رضى الله عنه وَعُرْوَةَ بْنِ الْمُغيرةِ وابنِ عبَّاسٍ وانسٍ اَشْبَاهُ هٰذه الروايات الَّتِى تَدُلُّ عَلَى جَوازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইবনে ওমর (রা) আনাস (রা) উরওয়া ইবনুল মুগীরা প্রমুখ থেকে এ সম্পর্কিত হাদীস রয়েছে যেগুলো দ্বারা মোজার উপর মাসেহ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

ইজমা-৫ ঃ মোজার উপর মাসেহ জায়েয হওয়ার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ১. হাসান বসরী (র) বলেন–

حَدَّثَنِيْ سَبْعُونَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم اَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

অর্থাৎ আমাকে রাসূলুল্লাহ (স) এর ৭০ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (স) মোজার উপর মাসেহ করতেন (মাআরিফুস সুনান ১/৩৩১)

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন– ما قلتُ بِالْمَسْحِ عَلي الخفّين حتّٰى جَائَنِيْ مِثْلَ ضَوْءِ النَّهَارِ

অর্থাৎ আমার নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি মোজার উপর মাসেহ এর প্রবক্তা হইনি। (তানযিমুল আশতাত ১/১৯৮)

৩. আবুল হাসান কারখী বলেন– اخاف الكفر علي من لايرى المسح অর্থাৎ যে মোজার উপর মাসার করার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে, আমি তার কুফরীর আশংকা করি। (বাহরুর রায়েক ১/১৬৫)

٤. وقَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ (رض) مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ سائرُ اَهْلِ الْبَدْرِ والحُدَيْبِيَّةِ وغيرُهم مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وسائرُ الصَّحَابَةِ والتابعين وفُقَهَاءِ الْاَمْصَارِ وعَامَّةِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْاَثَرِ.

৪. হাফেজ ইবনে আব্দুল বার (র) বলেন, আহলে বদর, আহলে হুদায়বিয়া সমস্ত মুহাজিরীন, আনসার, সাহাবী ও তাবেঈন মোজার উপর মাসেহ করেছেন।

৫. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন–

مِنْ شَرَائِطِ اَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ اَنْ تُفَضِّلَ الشَّيْخَيْنِ وتحب الخَتَنَيْنِ ونَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ .

অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের শর্ত হল, হযরত আবু বকর, হযরত ওমর (রা) কে সমস্ত উম্মতের উপর মর্যাদা দান করা; হযরত ওসমান ও আলী (রা) কে মহব্বত করা এবং মোজার উপর মাসেহকে জায়েয মনে করা।

٦. وقَالَ الحافظُ ابْنُ حَجرٍ قد صرّح جمعٌ مِّنَ الحُفَّاظِ بِاَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مُتَوَاتِرٌ وجَمَعَ بَعْضُهُمْ روايةً فجَاوَزُوا الثَّمَانِيْنَ ومِنْهُم العَشَرَةُ الْمُبَشَّرَةُ .

৮. আল্লামা আইনী (র) বলেন ৮০ জনেরও অধিক সাহাবী মোজার উপর মাসেহ এর রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ

জুমহুর তাদের দলীলের জবাবে বলেন, হযরত জারীর (রা) সূরায়ে মায়েদা নাযিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অথচ তার থেকে বর্ণিত যে, তিনি হুজুর (স) কে মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছেন। অদ্রূপ হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত যে, হুজুর (স) মক্কা বিজয়ের দিন এবং তাবুকের যুদ্ধের সময় মোজার উপর মাসেহ করেছেন। পক্ষান্তরে সূরায়ে মায়েদাহ এর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে গাযওয়ায়ে মুরাইসির সময় যা মক্কা বিজয়ের এবং তাবুকের যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। অতএব, বুঝাগেলো যে, সূরায়ে মায়েদা নাযিল হওয়ার পরও হুজুর (স) মোজার উপর মাসেহ করেছেন। কাজেই মোজার উপর মাসেহ করার হুকুম রহিত হয়েছে বলাটা সহীহ নয়। আর ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা মাসেহ না জায়েয হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করা যাবে না। কারণ তাঁর থেকে এর বিপরীত বর্ণনাও রয়েছে। যেমন মূসা ইবনে সালামা হতে বর্ণিত–

رُوِىَ عن مُوسَى بْن سَلَمَةَ قال سَالْتُ ابنَ عبّاسٍ رضي عنه عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قال لِلْمُسَافِرِ ثلاثةُ ايّامٍ ولَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يومٌ وليلةٌ.

তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা) কে মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত, আর মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত।

২. আবু বকর জাসসাস (র) বলেন, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতে বর্ণিত ارجلكم। (তোমাদের পদযুগল) কে رؤسكم (তোমাদের মাথা) এর উপর আতফ করে যের দ্বারা পড়াও জায়েয আছে। (আহকামুল কুরআন)

৩. জুমহুরের প্রদত্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মোজার উপর মাসেহ করার হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির। আর মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াতও রহিত করা জায়েয আছে। আর তাই জুমহুরের দ্বিতীয় দলীলে দেখা যায় যে, সূরা মায়েদার আয়াতটি নাযিল হওয়ার পরেও হযরত জারীর (রা) মোজার উপর মাসেহ করেছেন.এবং নবী করীম (স) এর আমলও যে এরূপ ছিল তা বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল মুলহিম ১/ ৪৩১ আইনী ১/৮৫১)

سوال : كيف يُتْرَكُ حُكْمُ الكتابِ بِغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بالحديثِ وهُوَ مُخَالِفٌ لما تَقَرَّرَ فِي الأُصُولِ؟

প্রশ্ন ঃ কুরআনের নির্দেশানুযায়ী পা ধোয়ার বিধানটি কিভাবে হাদীস দ্বারাপরিত্যাগ করা যায় অথচ তা মূলনীতি বিরোধী?

উত্তর ঃ হাদীস দ্বারা কুরআনের বিধানাবলী বর্জনের বিধান ঃ পবিত্র কুরআনে উযূর ফরয হিসেবে পা ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে হাদীস দ্বারা কুরআনের হুকুম বর্জন করা হল কিভাবে?

ইমামগণের পক্ষ থেকে এর সমাধান ঃ ১. খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কুরআনের হুকুমকে বর্জন করা যায় না। তবে খবরে মাশহুর ও খবরে মুতাওয়াতির দ্বারা কুরআনের হুকুমকে রহিত করা যায়। আর মোজার উপর মাসেহ এর হাদীসটি تواتر এর সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে, فَتَجُوزُ بِهِ الزِّيَادَةُ عَلَى القُرآنِ

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন, খবরে ওয়াহিদ যদি مُحْتَف بالقرآن তথা নিদর্শন সম্বলিত হয়। তাহলে তা ইয়াকীনের উপকারিতা দেয়। আর মোজার উপর মাসেহ এর হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ায় তার মধ্যে দৃঢ়তা এসে গেছে। তাই তা দ্বারা আয়াতের বিধান রহিত করা জায়েয আছে।

৩. বাস্তবে আয়াতের হুকুম পরিত্যাগ করা হয়নি, বরং তা যথাস্থানে বহাল রয়েছে। কেননা, মোজা না থাকলে শুধু ধৌত করতে হবে। আর মোজা থাকলে মাসেহ করতে হবে।

৪. ইমাম আবু বকর জাসসাস (র) বলেন, এখানে কুরআনের নির্দেশকে রহিত করা হয়নি। কেননা, আয়াতের মধ্যে جر جوار তথা নিকটবর্তী যেরের অনুগমণ হিসাবে মাসেহ সাব্যস্ত হয়।

৫. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, মাশহুর হাদীস দ্বারা কুরআন মানসূখ করা যায়।

سوال: لِمَ كانَ اصحابُ عبدِ اللهِ يُعْجِبُهُم قولُ جريرٍ ـ

প্রশ্ন ঃ হযরত জারীর (রা) এর কথায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এর সঙ্গীরা কেন বিস্মিত হয়েছেন?

উত্তর ঃ বিস্মিত হওয়ার কারণ ঃ বর্ণনাকারী বলেন, হযরত জারীর (রা) যখন বললেন, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح এ হাদীস শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এর সঙ্গীরা বিস্মিত হয়ে গেলেন। কেননা, তাদের ধারণা ছিল মোজার উপর মাসেহ এর কোন বৈধতা নেই। কিন্তু জারীরের হাদীস শুনে তাঁদের ভুল ভেঙ্গে গেল। কেননা, জারীর (রা) নবম হিজরীর রমযান মাসে ইসলাম কবুল করেছেন, তাতে বুঝা যায় মোজার উপর মাসেহ এর হাদীসটি পরবর্তী যুগের। কেননা, পা ধৌত করার হুকুম মাদানী জীবনের প্রথম দিকে প্রবর্তিত হয়েছে। অতএব, মোজার উপর মাসেহ এর হাদীসটি নাসেখ। যদি তার ইসলাম গ্রহণ করা পা ধৌত করার বিধান প্রবর্তনের আগে হতো তাহলে তাঁর হাদীসটি মানসূখ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই মোজার উপর মাসেহ এর বিধানটি ঠিক বলে প্রমাণিত হল।

سوال : مَنْ خَالَفَ فِي جَوازِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ وما هُوَ حكمُ مَنْ خالفَ وأنْكَرَ المَسْحَ على الخُفَّيْنِ؟

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর মাসেহ এর বিরোধিতা করেন কারা? বিরোধিতা কারীদের বিধান কি হবে?

উত্তর ঃ মোজার উপর মাসাহের বিধানকে যারা অস্বীকার করেন ঃ মোজার উপর মাসেহ এর বিধানকে দাউদে যাহেরী, রাফেজী, ও খারেজী সম্প্রদায় অস্বীকার করে থাকেন। তারা বলেন, পা ধৌত করার পরিবর্তে মোজার উপর মাসেহ জায়েয নয়।

মোজার উপর মাসেহ এর বিধান অস্বীকারকারীদের বিধান ঃ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে, যে ব্যক্তি মোজার উপর মাসেহকে অস্বীকার করবে তাকে বিদয়াতী বলা হবে, সে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন—

إنَّ مِنْ عَلامَةِ اهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ تفضيلُ الشَّيْخَيْنِ وحُبُّ الخَتَنَيْنِ والمَسْحُ على الخُفَّيْنِ ـ

তবে এ কারণে তাকে কাফির বলা যাবে না।

ইমাম কারখী (র) বলেন– اخافُ الكفرَ علَى مَنْ لاَيرَى المَسْحَ عَلَى الخُفَّيْنِ

سوال : هَلِ المَسْحُ عَلَى الخُفِّ مِنْ اَسْفَلِه ام لاَ؟ وما اَقْوالُ الفُقَهَاءِ فيه؟

প্রশ্ন ঃ মোজা মাসেহকালে পায়ের উপর অংশে মাসেহ করবে না কি নিম্নের অংশে? এ ব্যাপারে ফকীহদের মতামত কি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মোজার উপরে না নিচে মাসেহ করতে হবে ঃ মোজার উপরিভাগে মাসেহ করতে হবে, না তলদেশে? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতামত নিম্নরূপ–

১. ইমাম শাফেয়ী, মালেক, ইসহাক ও ইবনে মুবারক এরমতে মোজার উপর ও তলদেশ উভয় দিক মাসেহ করা ওয়াজিব। তাদের দলীল হল– ক. হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার হাদীস–

تَوَضَّأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم فِى غَزْوَة تَبُوْكَ فَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ واَسْفَلِهَا.

নবী (স) তাবুক যুদ্ধে উযূ করেন এবং মোজার উপর ও তলদেশ মাসেহ করেন।

খ. غسل যে ভাবে উপর ও নিম্নে উভয় দিকে হয়, অনুরূপ মাসেহ ও উভয় দিকে হবে।

গ. মোজার তলদেশে সাধারণত নাপাক লেগে থাকে। তাই তলদেশে মাসেহ করা যুক্তি সঙ্গত।

২. ইমাম আবু হানীফা, আহমদ ও সুফিয়ান সাওরী (র) এর অভিমত

ইমাম আবু হানীফা, আহমদ ও সুফিয়ান সাওরী (র) এর মতে, মোজার উপরিভাগ মাসেহ করা শরীয়তের বিধান, তলদেশ মাসেহ করা জরুরী নয়। তাঁদের দলীল হচ্ছে।

١. عَنْ مُغِيْرَةَ انّه قال رَاَيْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ على ظاهِرِ هِما.

মুগীরা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (স) কে মোজার উপরিভাগে মাসেহ করতে দেখেছি।

٢. وقال علىّ رض لوكانَ الدِّيْنُ بِالرَّاى لَكانَ اَسْفَلُ الخُفِّ اولى بالمَسْحِ مِنْ اَعْلاَهُ

ধর্ম যদি যুক্তির উপরই নির্ভর করত তাহলে মোজার উপরাংশে নয় বরং তার তলদেশে মাসেহ করাই উত্তম হত।

হযরত আলী (রা) এর এই বাণী দ্বারাও বুঝা যায় যে মোজার উপরিভাগে মাসেহ করতে হবে তলদেশে নয়।

٣. عَنْ اَنَسٍ رض انّه صلى اللّه عليه وسلم مَسَحَ ظاهِرَ خُفَّيْهِ بِكَفَّيْهِ مَسْحَةً واحدةً

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) মোজার উপরাংশে স্বীয় উভয় পাঞ্জা দ্বারা একবার মাসেহ করেছেন।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র) এর দলীলসমূহের জবাবে বলা যায়–

১. ইমাম আবু দাউদ বলেন, প্রথম হাদীসটি মুনকাতি। তাই তা মুত্তাসিল হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়।

২. ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, প্রথম হাদীসটি معلول।

৩. ধৌত করার উপর মাসেহকে কিয়াস করা সঙ্গত হবে না। কেননা,

بناءُ الغَسْلِ عَلَى الثِّقْلِ وبناءُ المَسْحِ عَلَى الخِفَّةِ

৫. কিয়াসটি হযরত আলী (রা) এর উক্তি দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। অপরদিকে নাপাকীর কারণে নিম্নভাগ মাসেহ করা হলে নাপাক দূর হবে না। বরং তা মোজায় ছড়িয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে আলোচনা

سوال : ماهى الحكمةُ فِى مَشْرُوعِيَّةِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর মাসেহকে শরয়ী বিধানের অন্তর্ভুক্ত করার পেছনে হেকমত কি?

উত্তর মোজার উপর মাসেহ করার শরয়ী তাৎপর্য ঃ মোজার উপর মাসেহ করার তাৎপর্য হলো–

১. বান্দার জন্যে তার কষ্ট নিবারণকল্পে এর বিধান দেয়া হয়েছে। কারণ মোজা বার বার খোলা ও পরা একটা ঝামেলা। বিশেষত শীতপ্রধান দেশগুলোতে এটা বেশ কষ্টকর। অথচ আল্লাহ তা'আলার বাণী রয়েছে–

يريدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ

২. মোজার উপর মাসেহ করলে পানির অপচয় রোধ হয় এবং অল্প পানিতে উযূ সম্পন্ন করা যায়।

৩. প্রত্যেক বার পা ধূয়ে মোজা পরলে চামড়ার ক্ষতি হতে পারে এবং স্যাঁতস্যাঁতেজনিত দুর্গন্ধও হতে পারে।

এসব কারণে উযূর ক্ষেত্রে মোজার উপর মাসেহ এর বিধান দেয়া হয়েছে এ জন্যেই বলা হয়-

فِعْلُ الْحَكِيْمِ لا يَخْلُوْ عَنِ الْحِكْمَةِ

سوال : بَيِّنْ كَيْفِيَّةَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَعَ اخْتِلَافِ الائمةِ

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর মাসেহ এর পদ্ধতি ইমামদের মতভেদসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ মোজার উপর মাসেহ এর পদ্ধতি ঃ সাধারণ নিয়ম হল, হাতের আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুল থেকে শুরু করে পায়ের কব্জির দিকে টেনে আনতে হবে। তবে কি পরিমাণ মাসেহ করতে হবে। এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে অভিমত রয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত হল-

১. ফাতহুল কাদীর, দুররুল মুখতার, বাদয়িউস সুনায়ী, প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষ্যানুযায়ী হানাফীদের অভিমত হল পায়ের পিঠের দিকে হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ স্থান একবার মুছে ফেলতে হবে।

২. ইমাম মালেক (র) এর মতে পায়ের পিঠের দিকে যতটুকু মুছে ফেলতে হবে সাথে সাথে মোজার নিম্নের অংশও সে পরিমাণ মুছে ফেলা মুস্তাহাব।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে, মোজার উপরিভাগের অধিকাংশ স্থান মুছে ফেলতে হবে।

سوال : هل يجوزُ الْمَسْحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ كما يجوزُ الْمَسْحُ على الْخُفَّيْنِ؟ فَصِّلْ.

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর মাসেহ এর মত জুতার উপর মাসেহ করা বৈধ হবে কি- না? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ জুতার উপর মাসাহের বিধানঃ জুতার উপর মাসেহ করা বৈধ কি না, এ ব্যাপারে ইমামদের মতামত-

১. একদল আলিমের মতে, মোজার উপর মাসেহ এর মত জুতার উপরও মাসেহ জায়েয আছে। তারা নিম্নোক্ত হাদীসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেন- عَنِ الْمُغِيْرَةِ انَّه تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

২. জুমহুর আলেমদের মতে, জুতার উপর মাসেহ জায়েয নেই। কেননা, জুতার উপর মাসেহ এর হাদীস تواتر এর সীমা পর্যন্ত পৌঁছেনি। অপরদিকে ইমাম ত্বহাবীর বক্তব্য অনুযায়ী যদি মোজা ফেটে যাওয়ার কারণে অধিকাংশ পা দেখা যায় তাহলে তার উপর মাসেহ জায়েয হয় না, তাহলে জুতার উপর মাসেহ কিভাবে জায়েয হবে? কেননা, সাধারণত জুতা পরলে পায়ের উপরের অনেকাংশ খোলা থেকে যায়।

জবাব ঃ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) এর হাদীসের জবাবে বলা যায়। তাতে শুধু জুতা মাসেহ এর কথা বলা হয়নি। বরং جورب সহ জুতার উপর মাসেহ এর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ جوربين এর উপর মাসেহ করার সময় نعلين এর উপরেও হাত পড়ে থাকবে। তবে বাস্তব কথা হচ্ছে যদি জুতা দ্বারা সমস্ত পা ঢাকা সম্ভব হয়, যেমন বর্তমানে সু বা চামড়ার মোজার ক্ষেত্রে দেখা যায় তাহলে সে জুতার ওপর মাসেহ করা যেতে পারে। তখন মোজার উপর কিয়াস করে এ মাসআলা নিষ্পন্ন হবে। (শরহে নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ১৯২)

তৃতীয় রেওয়ায়াত সম্পর্কে আলোচনা

তৃতীয় রেওয়ায়াতে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা হল মদীনা ও মুকীমের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, তাতে এসেছে- دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عليه وسلم وبِلَالٌ الْاَسْوَاقَ الخ এখানে যে اسواق শব্দ এসেছে এটা ق যোগে নয় বরং বিশুদ্ধ মত হল শব্দটি ن - اسوان যোগে এটা মদীনার একটি প্রাচীর বা মদীনার একটি বাগিচা। এর দ্বারা বুঝা যায় মোজার উপর মাসেহ করার বিধান শুধু মাত্র মুসাফিরদের জন্য নয়, বরং মুকীমের জন্যও মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ।

কেউ কেউ বলেন মোজার উপর মাসেহ করার বিধান ঐ সকল লোকদের জন্যই খাস যাদের প্রতি সহজ করণার্থে মোজার উপর মাসেহ বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা হাদীসে এসেছে-

بُعِثْتُ بِالْمِلَّةِ الْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَاءِ.

মোটকথা, জুমহুর উভয়টার উপর আমল করে থাকেন। মোজাহীন অবস্থায় পদযুগল ধৌত করতেন। আর মোজা পরিহিত অবস্থায় মোজার উপর মাসেহ করতেন। তথা عزيمة ও رخصت উভয়টার উপর আমল করতেন। (শরহে উর্দু নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ২১১)

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِى السَّفَرِ

١٢٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ إِسْمٰعِيلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى سَفَرٍ فَقَالَ تَخَلَّفْ يَا مُغِيرَةُ وَامْضُوا أَيُّهَا النَّاسُ فَتَخَلَّفْتُ وَمَعِى إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ وَمَضَى النَّاسُ فَذَهَبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ ذَهَبْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ يَدَهُ مِنْهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ সফরে মোজার উপর মাসেহ করা

অনুবাদ ঃ ১২৫. মুহাম্মদ ইবনে মানসুর (র)..........মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, হে মুগীরা! তুমি পেছনে থাক এবং (লোকদের বললেন,) হে লোক সকল! তোমরা চলতে থাক। আমি (কাফেলার) পেছনে থাকলাম, আমার সঙ্গে পানির একটি পাত্র ছিল। লোকেরা চলে গেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (স) পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে যান। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন আমি তাঁকে (উযূর জন্য) পানি ঢেলে দিতে থাকি। তাঁর পরনে চিকন হাতাবিশিষ্ট একটি রুমী জুব্বা ছিল। তিনি তাঁর হাত বের করতে চাইলেন, কিন্তু জামার হাতা চিকন হওয়ার কারণে পারলেন না। ফলে জুব্বার নিচের দিক দিয়ে হাত বের করেন। তারপর মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করেন এবং মাথা ও মোজার উপর মাসেহ করেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : مَا الْإِخْتِلَافُ فِى مُدَّةِ الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ؟ حَرِّرْ مُدَلَّلًا

প্রশ্ন ঃ মুকীম ও মুসাফিরদের জন্য মোজার উপর মাসেহ করার সময় সীমা এর ব্যাপারে মতানৈক্য কি? দলীল সহকারে উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ মুকীম ও মুসাফিরের জন্য মাসেহ করার সময়সীমা ঃ

১. ইমাম মালেক (র) এর মাযহাব হল, মোজার উপর মাসেহ করার নির্দিষ্ট কোন মেয়াদ নেই। চাই সে মুকীম হোক কিংবা মুসাফির।

২. ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম শাফেয়ী (র) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, মুকীম ব্যক্তি একদিন একরাত এবং মুসাফির ব্যক্তি তিনি দিন তিনরাত মাসেহ করতে পারবে।

ইমাম মালেক (র) এর দলীল ঃ ১.

رُوِىَ عَنْ أُبَىِّ بْنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَيَوْمَيْنِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَثَلٰثٌ وَثَلَاثٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعًا ثُمَّ قَالَ امْسَحْ مَا بَدَا لَكَ

অর্থাৎ হযরত উবায় ইবনে ওমারাতা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি হুজুর (স) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আমি কি মোজার উপর মাসেহ করব? তিনি বললেন হ্যাঁ, তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এক দিন? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন হ্যাঁ। আবার জিজ্ঞাসা করলেন দুই দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, হ্যাঁ দুই দিন। তিনি বললেন, তিন দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, হ্যাঁ। এভাবে সাত দিন পর্যন্ত পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি বললেন, যত দিন তোমার মনে চায় মাসেহ কর।

দলীল ঃ ২.

رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ابردتُ مِنَ الشَّامِ الى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَخَرَجْتُ مِن الشام يومَ الجُمُعَةِ ودَخَلْتُ المدينةَ يومَ الجُمُعَةِ فدخلتُ عَلَى عمرَ وعليّ رض... خُفَّانِ جُرْمُقَانِيانِ فقالَ لِي مَتَى عهدُكَ يَا عقبةُ بخَلْعِ خُفَّيْكَ قلتُ لَبِسْتُهما يومَ الجُمُعةِ وهٰذه الجُمعةِ فقال لِي اصبتَ السُّنَّةَ ـ

দলীল ঃ ৩.

رواهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثابتٍ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه جَعَلَ المسحَ عَلَى الخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثلاثةُ ايَامٍ ولَيالِيهِنَّ وللمُقِيمِ يَوْم وليلةٌ قال ولو أطْنَبَ لهُ السائلُ مَسْئَلَه لزَادَهُ

অর্থাৎ খোযাইমা ইবনে সাবিত (রা) হুজুর (স) হতে বর্ণনা করেন। তিনি মোজার উপর মাসেহ করার মেয়াদ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন জিজ্ঞাসাকারী যদি আরো লম্বা করতে চাইত তাহলে তিনি বাড়িয়ে দিতেন।

দলীল ঃ ৪. قال الحسنُ البَصْرِيُّ كانُوا اَىِ الصَّحَابَةُ لاَيُوَقِّتُونَ

অর্থাৎ সাহাবীগণ মাসেহ এর ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ করতেন না।

জুমহুরের দলীল ঃ ১.

رُوِيَ عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عنه قالَ كُنْتُ جالِسًا عِنْدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فجاءَ رجلٌ من مُرادٍ يُقَالُ لَه صَفْوانُ بْنُ عَسَّالٍ فقالَ يا رسولَ الله إنِّي أسافِرُ بَيْنَ مكّةَ والمدينةِ فأفْتِنِي عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ فقال ثلاثةُ ايّامٍ لِلْمُسافِرِ ويومٌ وليلةٌ لِلْمُقِيمِ ـ

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন। আমি হুজুর (স) এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময়ে "মুরাদ" এর সাফওয়ান ইবনে আছছাল নামক এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মক্কা এবং মদীনার মাঝে সফর করি। কাজেই মোজার উপর মাসেহ করার ব্যাপারে আমাকে ফতোয়া দিন। তিনি বললেন, মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত।

দলীলঃ ২.

رُوِيَ عَنْ صَفْوانَ بْنِ عَسَّالٍ قالَ بَعَثَنِي رسولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم فِي سريةٍ فقال للمُسافِرِ ثلاثةٌ وللمُقِيمِ يومٌ ولَيلةٌ مَسْحًا عَلَى الخُفَّيْنِ

অর্থাৎ হযরত সাফওয়ান ইবনে আছছাল (রা) বর্ণনা করেন, হুজুর (স) আমাকে একটি সারিয়াতে পাঠিয়ে বললেন, মোজার উপর মুসাফির তিন দিন তিন রাত মাসেহ করবে এবং মুকীম ব্যক্তি করবে এক দিন এক রাত।

দলীল ঃ ৩.

روى عن موسى بن سَلَمَةَ قالَ سَألْتُ بْنَ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنه عنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ فقالَ لِلْمُسافِرِ ثلاثةُ ايّامٍ ولَيالِيهِنَّ وللمُقِيمِ يومٌ ولَيْلَةٌ وقد رُوِيَ اشباهُ هٰذه الرواياتِ عنِ المُغيرة بن شُعْبَةَ وعمرِو بْنِ الحارثِ وابنِ عُمَرَ و انسٍ رضوان الله تعالى عنهم اجمعين ـ

অর্থাৎ হযরত মূসা ইবনে সালাম বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা) কে মোজার উপর মাসেহ করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত, আর মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত। মুগীরা ইবনে শো'বা, আমর ইবনুল হারেছ, ইবনে উমর, আনাস (রা) এ ধরনের রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মালেক (র) এর দলীলের জবাব

উবাই ইবনে উমারা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি দ্বয়ীফ। ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নববী সহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এটাকে দ্বয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। অথবা, এটাও বলা যেতে পারে যে, ইসলামের প্রথম যুগের বিধান এরূপ ছিল, পরবর্তীতে মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা তার মেয়াদ নির্ধারিত হয়ে যাওয়ায় তা রহিত হয়ে গেছে। আর হযরত খুযাইমা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস– জিজ্ঞাসাকারী যদি আরো লম্বা করতে চাইতো তাহলে তিনি বাড়িয়ে দিতেন, এটি তার ধারণা মাত্র। এর দ্বারা কোন কিছু প্রমাণিত হতে পারে না– اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

উকবা ইবনে আমের কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জবাব হল, উক্ত হাদীসে بِالسُّنَّةِ দ্বারা রাসূলের সুন্নত উদ্দেশ্য নয়। কেননা سُنَّةٌ কখনো খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের ক্ষেত্রেও বলা হয়ে থাকে। যেমন–

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليكم بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ .

সুতরাং হতে পারে উমর (রা) নিজের মতামতকে সুন্নত দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কেননা, তিনি প্রথমদিকে মোজার উপর মাসেহ করার নির্ধারিত কোন সময়সীমা বর্ণনা করতে শোনেন নি। তাই তিনি এ কথার প্রবক্তা ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তার উক্ত মত থেকে রুজু করেন। কাজেই তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা কোনক্রমেই বিশুদ্ধ নয়।

উক্ত আলোচনার সমর্থন হযরত সুয়াইদ ইবনে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াত দ্বারা লাভ হয়। তিনি বলেন, আমাদের নিকট ওমর (রা) আসেন। অতঃপর "নাবাতা" মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে ওমর (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন। উমর (রা) বলেন, لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ কাজেই তার বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সহীহ নয়।

হাসান বসরী (র) এর বর্ণনার উত্তর

كَانُوْا لَا يُوَقِّتُوْنَ যেহেতু তিনি অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামের আমল দেখেননি, তাই তিনি এটা বলেছেন। এরও সম্ভাবনা আছে যে, لَا يُوَقِّتُوْنَ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহাবীগণ শেষ সময় পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করতেন না, তথা তৃতীয় দিনের শেষ পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করতেন না বরং তিন দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তারা তাদের পদযুগল থেকে মোজা খুলে ফেলতেন এবং পা ধুয়ে নিতেন। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, মোজার উপর মাসেহ করা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ। আর এটাই জুমহুরের মত।

(শরহে ত্বহাবী- ৭২৭-৭২৮)

بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ

١٢٦. اخبرنا قُتَيْبَةُ قال حَدَّثَنَا سفيانُ عن عاصمٍ عَن زِرٍّ عن صَفْوانَ بْنِ عسّالٍ قال رَخَّصَ لنا النبيُّ ﷺ اذا كنّا مُسافِرِيْنَ اَن لاَنَنْزِعَ خِفافَنا ثلثةَ ايّامٍ ولَيالِيهِنَّ -

١٢٧. اخبرنا احمدُ بْنُ سلمانَ الرّهاوِيُّ قال حدّثنا يحيى بن آدمَ قال حدّثنا سفيانُ الثّوريُّ ومالكُ بْنُ مِغْوَلٍ وزُهَيْرٌ وابُو بكرِ بْنِ عَيّاشٍ وسُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن عاصمٍ عن زِرٍّ قال سَالتُ صفوانَ بْنَ عَسّالٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فقال كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَامُرُنا اذا كنّا مُسافِرِيْنَ اَنْ نَمْسَحَ علَى خِفافنا ولا نَنْزِعَها ثلثةَ ايّامٍ مِنْ غائطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ اِلاّ مِن جَنَابَةٍ -

অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসহের সময় নির্ধারণ

অনুবাদ ঃ ১২৬. কুতায়বা (র)......... সফওয়ান ইবনে আস্‌সাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন সফরে থাকি তখন নবী (স) আমাদেরকে, আমাদের মোজা তিন দিন তিন রাত না খোলার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।

১২৭. আহমদ ইবনে সুলায়মান রাহাভী (র)......... যির্র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফ্‌ওয়ান ইবনে আস্‌সালকে মোজার উপর মাসেহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে আদেশ করতেন, আমরা যখন সফররত অবস্থায় থাকি তখন যেন তিন দিন পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করি জানাবতের অবস্থা ব্যতীত, পায়খানা-পেশাব অথবা নিদ্রার কারণে তা না খুলি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : ما هِى مُدّة المَسْحِ عَلَى الخُفَّين؟ فصِّل واضحا .

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর মাসেহ এর সময়সীমা কত? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ মোজার উপর মাসেহ এর সময়সীমার ব্যাপারে ইমামদের অভিমত ঃ চামড়ার মোজার উপর মাসেহ এর সময়সীমা কয় দিন? এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১. ইমাম মালেক, হাসান বসরী, লাঈস ইবনে সাদ এর মতে, মাসেহ এর কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নেই; বরং যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা পরিহিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর উপর মাসেহ করতে পারবে। মুসাফির হোক কিংবা মুকীম। (তা'লীকুস সবীহ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৪৪)

২. ইমমা আবু হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে মুবারক, সাহেবাইন, আওযায়ী, দাউদে জাহেরী ও ইসহাক (র) এর মতে, মুকীম একদিন এক রাত মাসেহ করবে। আর মুসাফির করবে তিন দিন তিন রাত।

প্রথম মাযহাবের দলীল ঃ ১

عن خزيمةَ بْنِ ثابتٍ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال المَسْحُ علَى الخُفَّيْنِ للمُسافرِ ثلاثةَ ايّامٍ وللمُقيمِ يومًا وليلةً و وفى روايةٍ ولَو اسْتَزَدْناهُ لَزادَنا .

অর্থাৎ খুযাইমা ইবনে সাবিত (র) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহ করার নির্ধারিত সময়সীমা হল তিন দিন এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত। অন্য এক বর্ণনায় আছে। আমরা যদি তার নিকট অধিক সময়সমীমা চাইতাম, তবে তিনি আমাদের জন্য সময় আরো বাড়িয়ে দিতেন।

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় তিন দিনের বেশী সময় মাসেহ করা জায়েয আছে। অর্থাৎ একই মাসেহ দ্বারা তিন দিনেরও অধিক কাল নামায পড়া জায়েয। (তিরমিযী ১/২৮ ইবন মাজাহ পৃষ্ঠা নং ৪১)

দলীল নং ২

عن أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ يَحْيَى بْنِ ايُّوبَ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَتَيْنِ انَّهُ قال يا رَسُولَ اللّٰهِ أَأَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَال يومًا قالَ يومًا قال يَوْمَيْنِ قال ويَوْمَيْنِ قال وثَلاثَةً قال نعم وما شِئْتَ ... قال فيه حتّٰى بَلَغَ سبعًا ـ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم ما بَدَا لَكَ.

অর্থাৎ উবাই ইবনে উমারা (রা) হতে বর্ণিত ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ূব বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে উভয় কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি কি মোজার উপর মাসেহ করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, রাবী তাঁকে এক, দুই ও তিন দিন পর্যন্ত মাসেহ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তিনি তাঁকে এর অনুমতি দিয়ে বলেন, তুমি যতদিনের ইচ্ছা কর.... অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি প্রশ্ন করতে করতে সাত দিন পর্যন্ত পৌছান। এ রেওয়ায়াতে সময় অনির্দিষ্ট থাকার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। (আবু দাউদ ১/২১, ইবনে মাজাহ ৪২)

কিয়াসী দলীল ঃ মাথা মাসেহ এর ক্ষেত্রে যেহেতু কোন সময়সীমা নেই। তাই মোজা মাসেহ এর ক্ষেত্রে ও সময়সীমা না থাকা উচিৎ।

দ্বিতীয় মাযহাবের দলীল ঃ ১

.... عن شُرَيْحِ بْنِ هانِي قال أَتَيْتُ عائشةَ أَسْأَلُها عن الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فقالتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طالِبٍ فاسْأَلْهُ فانَّه كانَ يُسافِرُ مع رسولِ اللّٰه صلى الله عليه وسلم فسَأَلْناه فقال جَعَلَ رسولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ ايامٍ ولَيالِيَهُنَّ لِلْمُسافِرِ ويومًا وليلةً لِلْمُقِيمِ.

অর্থাৎ শুরাইহ ইবনে হানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়শা (রা) এর কাছে এলাম। মোজার উপর মাসেহ করার মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আবু তালিবের পুত্র (আলী) এর কাছে গিয়ে এ মাসআলা জিজ্ঞেস কর। কারণ তিনি রাসূল (স) এর সাথে সফর করতেন। অতঃপর আমরা তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত। (মুসলিম ১/১৩৫, নাসায়ী ১/৩২)

দ্বিতীয় দলীল ঃ

عن صفوانَ بْنِ عَسَّالٍ قال كانَ رَسُولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم يأمُرُنا اذا كُنّا سَفَرًا انْ لاَ نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ ايّامٍ ولَيالِيَهُنَّ الاَّ مِنْ جَنابَةٍ.

অর্থাৎ সাফওয়ান ইবনে আসসাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, আমরা যখন মুসাফির হতাম তখন যেন গোসল ফরয হওয়া ব্যতীত আমাদের মোজা তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত না খুলি। (তিরমিযী ১/২৭, নাসায়ী ১/৩২, ইবনে মাজাহ ৪১-৪২)

তৃতীয় দলীল ঃ

... عن خزيمةَ بْنِ ثابتٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسافِرِ ثلاثةَ ايامٍ ولِلْمُقيمِ يومًا وليلةً.

অর্থাৎ খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহ করার নির্ধারিত সময়সীমা হল তিন দিন এবং মুকীমের জন্য একদিন এক রাত। (তিরমিযী ১/২৭, ইবনে মাজাহ ৪১)

প্রতিপক্ষের প্রথম দলীলের জবাব

১. ولو استنزدناه لزادنا হাদীসে বর্ণিত (আমরা যদি তাঁর নিকট অধিক সময়সীমা চাইতাম, তবে তিনি আমাদের জন্য সময় আরো বাড়িয়ে দিতেন) এই অতিরিক্ত অংশটুকু সহীহ নয়. আল্লামা যায়লাঈ ও আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ এটাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।

২. কেউ কেউ বলেন, এটা হযরত খুযাইমা (রা) এর নিজস্ব ধারণা যা শরঈ মতের প্রমাণ নয়।

৩. কতিপয় আলিম বলেন, এটি প্রথম দিকের ঘটনা। (দরসে তিরমিযী ১/৩৩০)

৪. যদি এ অতিরিক্ত অংশটি প্রমাণিতও হয় তবুও এর দ্বারা সময়ের অনির্দিষ্টতা প্রমাণিত হবে না। কেননা, এতে বলা হয়েছে যদি আমরা নবী করীম (স) এর নিকট সময় আরো বেশী চাইতাম তাহলে তিনি আরো সময় বাড়িয়ে দিতেন; যেহেতু আরোও অধিক সময় চাওয়া হয়নি, তাই সময় বৃদ্ধিও করা হয়নি। (নাইলুল আওতার ১/১৭৯)

দ্বিতীয় দলীলের জবাব ঃ উক্ত হাদীসটি সনদগতভাবে দুর্বল। স্বয়ং আবু দাউদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন-

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ (ابوداود ج ص ٢١)

অর্থাৎ এর সনদে মতানৈক্য রয়েছে, এটি শক্তিশালী নয়। অতএব, এমন একটি দুর্বল হাদীস দ্বারা মুতাওয়াতির হাদীস বর্জন করা উচিত হবে না।

২. অথবা, রাসূল (স) এর বাণী– نَعَمْ وَمَا شِئْتَ . نَعَمْ مَا بَدَا لَكَ এর দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হল সফর অবস্থায় তিনদিন তিনদিন করে এবং মুকীম অবস্থায় একদিন একদিন করে যতদিন ইচ্ছা শরয়ী নিয়মানুষায়ী মাসেহ কর।

৩. অথবা, প্রথম দিকে মাসেহ এর সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। পরবর্তীতে সময় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।

কিয়াসী দলীলের জবাব ঃ

১. কোন বিষয়ে কিয়াস তো তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন এ ব্যাপারে কুরআন হাদীসে কোন সহীহ বর্ণনা না পাওয়া যায়। কিন্তু মোজা মাসেহ এর ক্ষেত্রে তো একাধিক সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। সুতরাং সহীহ হাদীসসমূহের মুকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়।

২. তা ছাড়া কিয়াসটি শুদ্ধ হয়নি। কেননা, মাথা মাসেহ করা এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ফরয, যার বিকল্প অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। আর মোজার উপর মাসেহ করা এটি পা ধৌত করার পরিবর্তে একটি বিকল্প পদ্ধতি। সুতরাং উভয়টির হুকুমও ভিন্ন হবে এটিই যুক্তিসঙ্গত।

سوال : مَتَى يَصِحُّ الْمَسْحُ بَيِّنْ وَقْتَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ مَعَ بَيَانِ وَقْتِ عَدِّ التَّوْقِيْتِ لِلْمَسْحِ .

প্রশ্ন ঃ মাসেহ কখন শুদ্ধ হয়? কখন থেকে মাসেহ এর সময় গণনা শুরু করবে তা বর্ণনাসহ মোজা পরিধান করার সময় বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মাসেহ কখন শুদ্ধ হয় ঃ হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এমন হদস যা উযূ ভঙ্গকারী, কেবলমাত্র সে হদস এর পরে পবিত্রতাবস্থায় মোজা পরিধান করা হয়ে থাকলে সে মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয। মোজার উপরিভাগে মাসেহ করা ফরয। নিচের অংশ মাসেহ করা ইমমা শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র) এর মতে, সুন্নত বা মোস্তাহাব। ইমাম আবু হনীফা ও আহমদ (র) এর মতে, মোস্তাহাব নয়।

আদ দুররুল মুখতার গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, কোন কোন হানাফী ইমামদের মতে, এটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি কেবলমাত্র মোজার নিচের অংশে মাসেহ করা হয় তবে কারো মতেই তা শুদ্ধ হবে না। যেহেতু মোজার উপর মাসেহ সংক্রান্ত হাদীসগুলো متواتر পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেহেতু ইমাম কারখী (র) এর মতে মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি কাফির হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মোজা পরিধান করার সময় ঃ ফিকহবিদগণের সর্ব সম্মত মতে, অজু না থাকা অবস্থায় মোজা পরিধান করে তার উপর মাসেহ করা জায়েয হবে না; বরং এর জন্য প্রয়োজন পূর্ণ পবিত্রতার। পূর্ণ পবিত্র হয়ে উযূ করলেই মোজা পরিধান করতে পারবে।

কখন থেকে মাসেহ এর সময় গণনা শুরু করবে ঃ

মাসেহ এর সময়সীমা কখন থেকে গণ্য করা হবে সে সম্পর্কে ইসলামী আইনশাস্ত্র বিশারদগণের মতপার্থক্য নিম্নে উপস্থাপিত হল–

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে, পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করার সময় হতে মুকীম ও মুসাফির নিজ নিজ সময়ের হিসাব করবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে, যখন উযূ নষ্ট হবে এবং প্রথমবার মাসেহ করবে তখন হতে সময়ের হিসাব করতে হবে। কারণ হদসের পূর্বে এটা পরিধান করা বা না করা সমান। (শরহে মেশকাত পৃষ্ঠা নং ৩৮৪)

سوال : اكتب شرائط جواز المسح على الخفين؟

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর মাসেহ বৈধ হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ মোজার উপর মাসেহ করার শর্তসমূহ নিম্নরূপ–

১. মুকীম হলে এক দিন ও এক রাতের বেশী মাসেহ না করা।

২. মুসাফির হলে তিন দিন ও তিন রাতের অতিরিক্ত মাসেহ না করা।

৩. এমন মোজা হওয়া যা كعبين তথা টাখনুদ্বয়সহ পা ঢেকে রাখে।

৪. এমন মোজা হওয়া যা কোন কিছু দিয়ে না বাঁধলেও পায়ের সাথে লেগে থাকে।

৫. মোজা এমন মজবুত হওয়া যা পায়ে দিয়ে কমপক্ষে তিন মাইল হেঁটে যাওয়া যায়।

৬. মোজা এত মোটা হওয়া যে, ভিতর থেকে পায়ের চামড়া দেখা না যায়।

৭. মোজা এতটুকু পুরু হওয়া যে, উপর দিয়ে পানি ঢেলে দিলে পানি চুষতে না পারে।

৮. মোজা পায়ে দিয়ে চলতে গিয়ে যদি ফেটে যায় তাহলে ফাটার পরিমাণ যেন এতটুকু না হয় যে, এক আঙ্গুল প্রকাশ হয়ে পড়ে।

৯. পরিপূর্ণ পবিত্র শরীরে মোজা পরিধান করা।

১০. মোজা পবিত্র থাকা।

১১. পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন পূর্বক মোজা পরিধান করা ইত্যাদি।

سوال : اكتب اقوال الائمة فى المسح اعلى الخفين واسفله

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর ও নিচে মাসেহ করা সম্পর্কে ইমামদের মতামত কি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মোজর উপর ও নিচে মাসেহ করা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ ঃ

১. ইমাম মালেক, শাফেয়ী, ইসহাক, যুহরী, ও ইবনে মুবারক এর মতে, মোজাদ্বয়ের উপর ও নিচে উভয় দিকে মাসেহ করতে হবে। অতঃপর ইমাম মালেক বলেন, উভয় দিকে মাসেহ করা ওয়াজিব, আর নিচের দিকে মাসেহ করা সুন্নত বা মুস্তাহাব।

২. ইমাম আবু হানীফা, আহমদ ও সুফিয়ান সাওরী (র) এর মতে, মোজার উপরের অংশ মাসেহ করা আবশ্যক। নিচের অংশ মাসেহ করা বিধানসম্মত নয়।

প্রথম মাযহাবের দলীল ঃ

عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبى صلعم فى غزوة تبوك فمسح اعلى الخفين واسفلهما

অর্থাৎ মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবুকের যুদ্ধে নবী করীম (স) কে উযূ করিয়েছি, তখন তিনি মোজার উপরের ও নিচের অংশ মাসেহ করেন।

(আবু দাউদ ১/২২, তিরমিযী ১/[illegible] ইবনে মাজাহ [illegible])

২. এছাড়াও পা যেমন উপরে ও নিচে উভয় দিকে ধৌত করা হয় তেমনি মাসেহও উপর নিচে উভয় দিকে হওয়া আবশ্যক।

৩. আর নিম্নাংশে ময়লা থাকার সম্ভাবনা বেশী। তাই নিচের অংশ মাসেহ করাই উত্তম বা মোজার তলদেশেই সাধারণত নাপাক লেগে থাকে তাই তলদেশে মাসেহ করা যুক্তিসঙ্গত।

দ্বিতীয় মাযহাবের দলীল ঃ ১

.... عن عليٍّ قال لو كانَ الدِّيْنُ بالرَّأيِ لكانَ أسفلَ الخُفِّ أولى بالمَسْحِ مِنْ أعلاه وقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظاهِرِ خُفَّيْهِ

অর্থাৎ-হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দ্বীনের মাপকাঠি যদি যুক্তির উপর নির্ভরশীল হত তবে মোজার উপরের অংশে মাসেহ না করে নিম্নাংশে মাসেহ করা উত্তম গণ্য হত। রাবী হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে মোজার উপরের অংশে মাসেহ করতে দেখেছি।

দলীল ঃ ২

عن المغيرة بن شعبةَ قال رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ علىٰ ظَهْرِهِما .

অর্থাৎ মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (স) কে দেখেছি। তিনি মোজার উপরের দিকে মাসেহ করেছেন। (তিরমিযী ১/২৮)

দলীল ঃ ৩

عن المغيرة رض قال إنَّه عليه الصلوة والسلام كانَ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ الخُفَّيْنِ (رواه ابوداود)

এর দ্বারাও বুঝা যায় যে, মোজার উপরিভাগে মাসেহ করতে হবে।

দলীল ঃ ৪ عن انس رض انه مَسَحَ ظاهِرَ خُفَّيْهِ مَسْحَةً واحِدَةً (رواه البيهقى)

এ হাদীস দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, মোজার উপরাংশে মাসেহ করতে হবে, নিম্নাংশে নয়।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

১. উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করার পর স্বয়ং আবু দাউদ (র) হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন–

بَلَغَنِى أنَّه لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هٰذا الحديثَ مِنْ رَجاءٍ

অর্থাৎ আমার নিকট একথা পৌঁছেছে যে, সাওর এই হাদীসটি রজা নামক ব্যক্তি থেকে শোনেন নি।

২. ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে معلول বা ত্রুটিযুক্ত বলেছেন।

৩. হাদীসের সনদে রাবী ওলীদ মুদাল্লিস। অতএব, যঈফ, মা'লুল ও মুদাল্লিস রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রদত্ত দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. সর্বোপরি বলা যায়, যদি এটাকে প্রমাণযোগ্য মেনেও নেয়া হয়। তখন উত্তর হল হয়ত নবী করীম (স) মোজার নিচের অংশ ধরে শুধু উপরের অংশে মাসেহ করেছেন। আর নিচের অংশে ধরাকে রাবী মাসেহ মনে করেছেন।

৫. এ মাসেহকে ধৌত করার উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা, ধৌত করার তুলনায় মাসেহ হল সহজ কাজ। তাই এটা হবে قياس مع الفارق

৬. আর তাঁদের তৃতীয় যুক্তিমূলক দলীলের উত্তর হলো, মোজার নিচে যদি ময়লা থেকে থাকে তবে মাসেহ দ্বারা তা আরো ব্যাপক হয়ে যাবে। ফলে তখন মোজার তলদেশ ধৌত করাই আবশ্যক হবে।

উবায় ইবনে উমায়ার হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য

১. ইমাম মালেক (র) বলেন, উক্ত হাদীসের রাবীগণ মাজহুল।

২. আবু ফাতাহ আজদী বলেন, لَيْسَ بِالْقَائِمِ

৩. ইবনে হিব্বান বলেন, لستُ اَعْتَمِدُ عَلٰى اِسْنَادِهِ

তার সনদের উপর আমার আস্থা নেই।

৪. দারাকুতনী বলেন لَايَثْبُتُ তার সনদ সাবেত নেই।

৫. ইবনে আব্দুল বার বলেন, لايثبتُ وَلَيْسَ لَهُ اِسْنَادٌ قَائِمٌ

৬. ইমাম নববী (র) শরহে মুহাজ্জাব গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি দ্বয়ীফ হওয়ার উপর সকল উলামার ঐক্যমত উল্লেখ করেছেন।

৭. ইমাম জাওযাজানী উক্ত হাদীসকে موضوعات এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

৮. ইমাম আবু দাউদ উক্ত হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ এটা বলে তিনি তা দলীল হওয়ার অনুপযুক্তর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

(মাআরিফুস সুনান ১/ ৩৩৫, তালখীসুল হাবীর পৃষ্ঠা- ৬০)

আলোচ্য হাদীসের ব্যাপারে শাব্বির আহমদ উসামানী (র) এর বক্তব্য

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী উবায় ইবনে উমারার হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে প্রদান করেছেন যে, এটা অন্য হাদীসের মুআরিজ বা সাংঘর্ষিক নয়। কেননা, উক্ত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, উক্ত সময়ের মধ্যে কখনো মোজা খোলেননি বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল এ ধারাবাহিকতা তিন দিনের কোন সময় পর্যন্ত থাকবে এর কোন সময় নির্ধারিত নেই। যেমন অমুক সময় পর্যন্ত করবে এর পরে নয়, একথারই জবাব দিয়েছেন نعم وما شئت বলে।

আর মোজার উপর মাসেহ করার মূলনীতি হল তিন দিন পর মোজা খুলে ফেলতে হবে। অতঃপর পূর্ণ পবিত্রতার পর আবার পরিধান করবে। এটা এমন যে, কোন ব্যক্তি বলল, আমি মক্কা মুকাররামায় চার মাস জুমার নামায পড়েছি। এর দ্বারা কি এটা উদ্দেশ্য যে, সে প্রত্যেক দিন জুমার নামায পড়েছে। কখনো নয় বরং জুমার দিন আসলেই কেবলমাত্র জুমার নামায পড়েছে। অনুরূপভাবে বলা হয় সে সব সময় সবকে উপস্থিত থাকে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সে চব্বিশ ঘণ্টা ক্লাস করে বরং উদ্দেশ্য হল ক্লাসের সময় শুধু ক্লাস করে। অনুরূপভাবে কুরআনের বাণী– وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ دَائِمُوْنَ এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, চব্বিশ ঘণ্টা নামায পড়ে। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল নামাযের ওয়াক্ত আসলেই নামায পড়েছিল। ঠিক তদ্রুপ এখানে সর্বদা মাসেহ করতে থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত মাসেহ করতে মনে চায় দ্বারা এমন উদ্দেশ্য নিতে হবে। অর্থাৎ শরীয়তের নীতি মোতাবেক প্রত্যেক তিন দিন অন্তর মোজাকে খুলে পা ধৌত করবে এবং পূর্ণ পবিত্রতা অর্জনা করার পর পুনরায় আবার পরিধান করবে এ অর্থ উদ্দেশ্য (শরহে উর্দূ নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ২১৪)

اِلَّامِنْ جَنَابَةٍ **সম্পর্কে আলোচনা ঃ** اِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হল জানাবাতের পর মোজা খুলে পা ধৌত করা। কেননা, ঐ অবস্থায় মাসেহ করা বিশুদ্ধ নয়। এখানে استثناء টা استثناء منقطع ও হতে পারে। আবার استثناء متصل ও হতে পারে। প্রথম সূরতে الا শব্দটি لكن এর অর্থে হবে। অর্থাৎ لكن تَنْزِعُ مِنْ جَنَابَةٍ তথা কিন্তু জানাবাতের সময় মোজা খুলে নিবে। দ্বিতীয় সূরতে الخ ... مِن غَائِطٍ وَبَوْلٍ এর অর্থে হবে। তথা مِنْ كُلِّ حَدَثٍ اِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ অর্থাৎ আমরা তিন দিন পর্যন্ত পেশাব পায়খানা ও অন্যান্য হদসের কারণে মোজা খুলতাম না বরং তার উপর মাসেহ করতাম। কিন্তু জুনুবী হলে মোজা খুলে ফেলতাম। কেননা, এ অবস্থায় মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ নয়, বরং পা ধৌত করতে হয়। (শরহে উর্দু নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ২১৫)

التَّوْقِيْتُ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيْمِ

١٢٨. اخبرنا اسحٰقُ بْنُ ابراهيْمَ اخبرنا عبدُ الرَّزّاق اخبرنا الثَّوريُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الملائيِّ عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ القاسمِ بْنِ مُخَيْمَرَةِ عن شُرَيحِ بْنِ هانِئٍ عن عَلِيٍّ رضى الله عنه قال جَعَلَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُسافِرِ ثَلٰثَةَ ايّامٍ ولَيالِيَهِنّ ويومًا وليلةً لِلْمُقِيْمِ يَعْنِى فِى الْمَسْحِ -

١٢٩. اخبرنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِى مُعاوِيةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنِ الحَكَمِ عَنِ القاسمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ عن شُرَيحِ بْنِ هانِئٍ قال سَالتُ عائشةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فقالتْ اِئْتِ عليًّا فانَّه اَعْلَمُ بذٰلك مِنِّى فاتَيْتُ عليًّا فسألتُه عن المسح فقال كان رسول الله ﷺ يأمُرُنا اَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيْمُ يومًا وليلةً والْمُسافِرُ ثَلٰثًا -

মুকীমের জন্য মোজার উপর মাসেহর সময় নির্ধারণ

অনুবাদ ঃ ১২৮. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)............ আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) মাসেহের ব্যাপারে মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য একদিন এক রাত সময় নির্ধারণ করেছেন।

১২৯. হান্নাদ ইবনে সারী (র)............শুরাইহ্ ইবনে হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে মোজার উপর মাসেহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, আলী (রা)-এর নিকট যাও, তিনি এ ব্যাপারে আমার থেকে অধিক জ্ঞাত। তারপর আমি আলী (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে মাসেহর ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের আদেশ করতেন এ মর্মে যে, মুকীম এক দিন এক রাত এবং মুসাফির তিন দিন তিন রাত মাসেহ করবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

ব্যাখ্যা ঃ জুমহুর উলামার মাযহাব পরে বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য শিরোনামের অধীনে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারাও জুমহুরের মাযহাব দৃঢ় হয় এবং জুমহুরের মাযহাবের সমর্থন পাওয়া যায়। এ হাদীসটি ইমাম মালেক (র) এর বিপক্ষে দলীল। কেননা, তাঁর এক কওল মুতাবেক মোজার উপর মাসেহ এর বিধান শুধুমাত্র মুসাফিরদের জন্য, মুকীমের জন্য নয়।

২. দ্বিতীয় কওল মুতাবেক মাসেহ এর বিধানটি ব্যাপক তথা এর জন্য নির্ধারিত সময়সীমা নেই। বরং সর্ব সময় তার উপর মাসেহ বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা পায়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর মাসেহ বৈধ হবে। মোটকথা, আলোচ্য অধ্যয়ের হাদীস তার বিপক্ষে প্রমাণ। কেননা, নবী (স) স্পষ্ট ভাষায় মুসাফিরদের জন্য তিন দিন তিন রাত, আর মুকিমের জন্য এক দিন এক রাত পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ দ্বিতীয় হাদীসটি শুরাইহ ইবনে হানী থেকে বর্ণিত। ইবনুল মালিক মানার গ্রন্থে বলেন, তিনি হল তাবেয়ী। তিনি যদিও রেসালাতের যুগ পেয়েছেন। কিন্তু নবী (স) এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হতে পারেননি। বরং হযরত আলী (রা) এর সাগরেদদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইমাম আহমদ, ইবনে মাঈন, ইমাম নাসায়ী (র) তাঁকে সিকা

সাব্যস্ত করেছেন। যখন তিনি হযরত আয়েশা (রা) কে মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, انت عليا الخ তথা এ বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই। এটা জানার জন্য হযরত আলী (রা) এর নিকট যাও, কেননা, এ সম্পর্কে আলী (রা) আমার থেকে বেশী জ্ঞান রাখে। আলোচ্য আলোচনা থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, যদি কোন মাসআলার ব্যাপারে পূর্ণ বুৎপত্তি ও জ্ঞান না থাকে তাহলে কোন আলেম যেন তার সমাধান না দেয় বরং তার সমাধানের জন্য একজন নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞ আলেমের সন্ধান দেবে, যে তার সমাধান দিতে পরে। কেননা, যেহেতু সে উক্ত মাসআলা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে ও তার সমাধান জানে। তাই এর দ্বারা ফেতনা ফাসাদ ও মতানৈক্য সৃষ্টি হবে না। অন্যথায় ফেতনা ফাসাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত আয়েশা (রা) এর সম্পর্কে একটি অবান্তর কথা ও তার জবাব

যারা মোজার উপর মাসেহ কে অস্বীকার করেন তারা বলেন, হযরত আয়েশা (রা) মোজার উপর মাসেহ করাকে অস্বীকার করেছেন। অথচ তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ অমূলক যা সহীহ মুসলিম ও নাসায়ীর রেওয়ায়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসে যে, হযরত আয়েশা (রা) মোজার উপর মাসেহকে অস্বীকার করেননি। বরং তিনি বলেছেন হযরত আলীর নিকট মাসআলার সমাধান জেনে নাও। কেননা, সে উক্ত বিষয়ে আমার থেকে বেশী জ্ঞান রাখে। মুহাম্মদ ইবনে মুহাজির বাগদাদী হযরত আয়েশা (রা) একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন নিম্নোক্ত শব্দাবলী দ্বারা–

لَاَنْ اَقْطَعَ رِجْلِىْ بِالْمُوْسٰى اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

আমার নিকট মোজার উপর মাসেহ করার তুলনায় অধিক পছন্দনীয় হল কেঁচি দ্বারা আমি আমার পা কেটে ফেলব। আলোচ্য রেওয়ায়াতটি সম্পূর্ণ বাতিল। হুফফাজে হাদীসগণ এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

আলোচ্য হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য

শুরাইহ ইবনে হানী হযরত আলী (রা) কে মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তিনি তার উত্তরে বলেন, মুসাফির মোজার উপর তিন দিন তিন রাত আর মুকীম এক দিন এক রাত মাসেহ করবে। মোটকথা মোজার উপর নির্ধারিত সময়সীমার ভিতরে মাসেহ করতে হবে। কারণ শরীয়ত প্রণেতা এটাই নির্ধারণ করে গেছেন। (শরহে উর্দূ নাসায়ী পৃষ্ঠা নং ২১৫-২১৬০)

سوال : ماالفرقُ بَيْنَ الخُفِّ والجُوْرَبِ؟ هل يجوزُ المسحُ عَلَى الجُوْرِ بَيْنِ؟ حَقِّقِ المَسْئلةَ

প্রশ্ন ঃ خُفّ ও جَوْرَبْ এর মধ্যে পার্থক্য কি? جورب এর উপর মাসেহ করা বৈধ কি না? বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ঃ خف ও جورب এর মধ্যে পার্থক্য ঃ ১. خف এমন মোজাকে বলা হয়, যা পসম্পূর্ণ চামড়ার তৈরী। আর جورب এমন মোজাকে বলা হয়, যা সুতা অথবা উলের দ্বারা তৈরী।

২. خف এর মধ্যে সুতা, পশম, তুলা ইত্যাদির কোন সংমিশ্রণ থাকে না, কিন্তু جورب এর মধ্যে সুতা পশম তুলা ইত্যাদির সংমিশ্রণ থাকে।

৩. خف টাখনু পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং বাঁধা ছাড়াই তা পায়ের সাথে লেগে থাকে কিন্তু جورب কখনো টাখনু পর্যন্ত হয়, আবার কখনো হয় না। جورب পায়ের সাথে লেগে থাকে না, বরং মোজার সাথে লেগে থাকে।

৪. خف এর মধ্যে পানি প্রবেশ করতে পারে না, কিন্তু جورب এর মধ্যে পানি প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে।

৫. جورب পায়ে পরিধান করা হয় মোজা বা শীত ইত্যাদি থেকে হেফাজতের জন্য।

৬. সম্পূর্ণ মোজাটি চামড়া দ্বারা তৈরী করা হলে তাকে خف বলে। আর যদি পূর্ণটা চামড়ার তৈরী না হয় তাহলে তাকে جورب বলে।

৭. خف এর বিধান এত্তেফাকী, পক্ষান্তরে جورب এর বিধান এখতেলাফী।

جوربين এর উপর মাসেহ এর বিধান

جُوْرَبَيْن যদি মুজাল্লাদ (যার মোজার দুদিক থেকে চামড়া লাগানো থাকে) মুনা'আল (যার নিচের অংশে চামড়া লাগানো থাকে) তাহলে এ দু'প্রকার جوربين উপর সর্বসম্মতিক্রমে মাসেহ করা জায়েয আছে। আর جوربين যদি مُجَلَّدَيْن অথবা مُنَعَّلَيْن না হয় এবং পাতলা হয়। তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে তার উপর মাসেহ করা নাজায়েয। অবশ্য যদি جوربين মুজাল্লাদ ও মুনা'আল না হয় এবং তা মোটা হয় তবে এরূপ মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও জুমহুর উলামার নিকট নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে جوربين এর উপর মাসেহ করা বৈধ। সাহেবাইনের নিকট মাসেহ সহীহ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত। ক. যদি তার উপর পানি ঢালা হয় তবে তা পা পর্যন্ত পৌঁছে না।

ঘ. বাঁধা ব্যতীত পায়ে লেগে থাকে।

ঙ. স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করা সম্ভব হয়। ইমাম শাফেয়ী (র) এর নিকট দুটি শর্ত মোজার উপর মাসেহ বৈধ হওয়ার জন্য।

ক. এমন পাতলা হবে না, যাতে চলতে ফিরতে অসুবিধা হয় এবং বাহ্য বস্তু নির্বিঘ্নে প্রবেশ করতে পারে।

খ. নিম্নের অংশ চামড়াযুক্ত হতে হবে।

ইমাম আহমদের মতে, মোজার উপর মাসেহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে দুটো শর্ত রয়েছে।

ক. মোট হতে হবে যাতে পদচর্মের অংশ দেখা না যায়।

খ. এটা পরিধান করা হয় যাতে জুতা ছাড়া যেন নির্বিঘ্নে চলাফেরা করা যায়।

প্রতিপক্ষের দলীল

তাদের দলীল রাসূল (স) এর হাদীস –

عَنْ مُغِيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجُوْرَبَيْنِ وَالْمُنَعَّلَيْنِ ـ

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় হুজুর (স) جورب এর উপর মাসেহ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় جورب এর উপর মাসেহ বৈধ।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, جوربين এর উপর মাসেহ বৈধ নয়। কিন্তু হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, যে ইমাম সাহেব জীবনের শেষ দিকে সাহেবাইন ও জুমহুরের মাযহাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। অতএব, এই মাসআলার ব্যাপারে ঐক্যমত হল যে, মোটা সুতা অথবা পশমী মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয। এটার উপরেই ফাতওয়া।

৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা, ইবনে হযম ও ইবনে হাজার আসকালানী (র) এর মতে নিঃশর্তে جورب এর উপর মাসেহ করা বৈধ। (শরহে তিরমিযী ৩৩৪)

صِفَةُ الْوُضُوْءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

١٣٠. اخبرنا عمرو بْنُ يزيدَ قال حَدَّثنا بهزُ بْنُ اَسَدٍ قال حَدَّثنا شعبةُ عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قال سَمِعْتُ نَزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ قال رَايتُ عليًّا صلّى الظُّهرَ ثم قَعَدَ لِحَوائِجِ النَّاسِ فلمّا حضَرتِ العصرُ اُتِىَ بِتَوْرٍ مِّن مَاءٍ فاَخَذَ مِنْه كَفًّا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وذِراعَيْهِ وَراسَهُ ورِجْلَيْهِ ثم اَخَذَ فَضْلَهُ فَشَرِبَ قائِمًا وقالَ اِنّ نَاسًا يَكْرَهُوْنَ هٰذا وقد رايتُ رسولَ اللّٰه ﷺ يَفْعَلُهُ وهٰذا وُضُوْءُ مَن لَّمْ يُحْدِثْ -

উযূ ভঙ্গ হওয়া ছাড়াই উযূ করার বিবরণ

অনুবাদ ঃ ১৩০. আমর ইবনে ইয়াযীদ (র).......আবদুল মালিক ইবনে মাইসারা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নায্‌যাল ইবনে সাবরাহ্‌কে বলতে শুনেছি যে, আমি আলী (রা)-কে দেখলাম, তিনি জোহরের নামায আদায় করলেন এবং জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণার্থে বসলেন, যখন আসরের সময় উপস্থিত হল তখন তাঁর নিকট একটি পানির পাত্র আনা হল। তিনি তা হতে এক কোষ পানি নিলেন এবং তা দ্বারা মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়, মাথা এবং উভয় পা মাসেহ করলেন। পরে দাঁড়িয়ে উদ্বৃত্ত পানি পান করলেন এবং বললেন, অনেক লোক এরূপ পান করাকে খারাপ মনে করে। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এরূপ করতে দেখেছি। আর এটা হল ঐ ব্যক্তির উযূ যার উযূ ভঙ্গ হয়নি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ নায্‌যা ইবনে সাবুরা যিনি হযরত আলী (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেন। আবু মাসউদ ও হুমাইদী প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ তাকে সাহাবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু ইমাম মুসলিম, দারাকুতনী, ইবনুস সাআদ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ তাকে তাবেয়ীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইবনে মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। তার মত নির্ভরযোগ্য সচার-আচার হয় না। তিনি বুখারী, নাসায়ী সহ অনেক কিতাবের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

শিরোনামের উদ্দেশ্যের উপর হাদীসের মর্ম স্পষ্ট। আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, غير محدث ব্যক্তির জন্য ধৌত করা অঙ্গগুলোর উপর মাসেহ করলেই যথেষ্ঠ হবে। কোন কোন সাহাবী থেকে পদযুগল মাসেহ করার কথা যা উল্লেখ করা হয় তা সহীহ। তবে সাহাবারা পদযুগল মাসেহ করতেন তখন যখন তাদের থেকে হদস প্রকাশিত না হত, অথবা তারা পা নয় বরং মোজার উপর মাসেহ করতেন।

শিয়া সম্প্রদায় আকল ও নকলের পরিপন্থী হযরত আলী (র) এর ঐ আমল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, উযূতে পদযুগল মাসেহ করার বিধান ধৌত করা নয়, তাদের এ প্রমাণ স্বয়ং আলী (রা) এর ভাষ্য দ্বারাই মিথ্যা প্রতীয়মান হয়। কেননা, তিনি মাসেহ করার পর বলেছেন, هٰذا وُضُوْءُ مَن لم يُحْدِثْ এটা ঐ ব্যক্তিদের উযূ যাদের সাথে হদস সম্পৃক্ত হয়নি। এ ভাষ্য দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, উযূ হল মুহদিস এর জন্য। কাজেই উক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণ পেশ করে এ কথা বলা যে, উযূতে পা মাসেহ করতে হবে ধৌত করতে হবে না এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যদি হদস সম্পৃক্ত না হয় তাহলে পায়ের উপর মাসেহ করার ব্যাপারে আমরাও দ্বিমত পোষণ করি না। এক উযূর পর অপর উযূ করলে এটার অনুমতি আছে।

سوال : اذكر نبذةً مّن حياةِ سيّدنا علىٍ رض

প্রশ্ন ঃ হযরত আলী (রা) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।

উত্তর ঃ হযরত আলী (রা) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ তাঁর নাম আলী, উপনাম আবুল হাসান ও আবু তোরাব। উপাধি আসাদুল্লাহ ও হায়দার।

পিতার নাম আবু তালিব। তিনি রাসূল (স) এর চাচাত ভাই। তিনি ১১ বছর বয়সে ইসলাম কবুল করেন। বালকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। ২য় হিজরীতে নবী কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) এর সাথে তার বিয়ে হয়।

হিজরত ঃ প্রিয় নবী (স) মদীনায় হিজরতের সময় হযরত আলী (রা) কে স্বীয় বিছানায় শায়িত রেখে যান, যাতে তাঁর কাছে গচ্ছিত আমানত তিনি মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। রাসূল (স) এর হিজরতের তিন দিন পর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে তিনি মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন।

জিহাদ ঃ তাবুকের যুদ্ধে মহানবী (স) এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ যুদ্ধ ছাড়া তিনি রাসূল (স) এর সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। খায়বার অভিযানে তিনিই ইয়াহুদীদের দূর্গগুলো জয় করেন। তাছাড়া বদর,উহুদ, আহযাব ইত্যাদি যুদ্ধে মহাবীরত্ব সহকারে জিহাদ করেন।

ফাযায়েল ঃ হযরত আলী (রা) এর অন্যতম মর্যাদা হচ্ছে–

১. তিনি বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

২. তিনি আশরায়ে মুবাশশারার অন্যতম সাহাবী।

৩. তিনি মহানবী (স) এর চাচাত ভাই, জামাতা ও চতুর্থ খলীফা।

৪. বীরত্বের জন্য মহানবী (স) তাকে আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধি দিয়েছিলেন।

৫. তার সম্বন্ধে নবী (স) ইরশাদ করেন–

ক. আমি জ্ঞানের শহর আর আলী হল তার দরজা।

খ. তুমি আমার পক্ষ থেকে তেমন যেমন হযরত হারুন (আ) মূসা (আ) এর পক্ষ থেকে।

গ. আল্লাহ তাআলা আলীর প্রতি রহম করুন। আল্লাহ! আলী যে দিকে যাবে তুমি হককে সে দিকে ঘুরিয়ে দাও।

ঘ. সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফায়সালাদাতা হল আলী।

ঙ. আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূল তাকে ভালবাসেন, সেও আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলকে ভালবাসে।

চ. আমি বিশ্বনেতা, আর আলী আরব নেতা।

খলীফারূপে দায়িত্ব পালন ঃ হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রা) এর খিলাফত আমলে তিনি মন্ত্রী ও উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা) এর শাহাদাতের পর ৩৫ হিজরীতে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল ৪ বছর ৯ মাস।

হাদীস বর্ণনা ঃ হযরত আলী হতে সর্বমোট ৫৮৬ টি হাদীস বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে বুখারী, মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২০টি। আবার এককভাবে বুখারীতে ৯টি এবং মুসলিমে ১৫টি হাদীস রয়েছে।

ওফাত ঃ হযরত আলী (রা) ৪০ হিজরীতে ১৮ই রমযান শুক্রবার প্রত্যুষে কুফা নগরীতে ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার সময় আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম খারেজী নামক দুর্বৃত্ত কর্তৃক মারাত্মক আহত হন। এর তিন দিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন। তাকে কুফার জামে মসজিদের পার্শ্বে কারো মতে নাজফে আশরাফে দাফন করা হয়।

سوال : ما حكمُ شُرْبِ فَضْلِ الوَضُوْءِ وَمَاءِ زَمْزَمَ قَائِمًا .

প্রশ্ন ঃ উযূ করার পর অবশিষ্ট পানি এবং যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করার বিধান কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ উযূ করার পর বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নত। তদ্রূপ অধিকাংশ ওলামার নিকট জমজমের পানিকেও দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নত। পক্ষান্তরে এক দল উলামায়ে কেরামের মতে এটা সুন্নত নয়, বরং জায়েয। যেমন- আল্লামা শামী বলেন, দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয আছে। সুতরাং রাসূল (স) থেকে বর্ণিত দাঁড়িয়ে পান করা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ দ্বারা তারা জায়েয সাব্যস্ত করেন; সুন্নত সাব্যস্ত করেন না। কেননা, রাসূল (স) এরূপ করেছেন। লোকদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বা অধিক ভিড়ের কারণে। তবে বিশুদ্ধ মত হল অধিকাংশ আলেমদের মতটি। ইমাম তিরমিযী হযরত আলী (রা) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি বেঁচে যাওয়া পানিকে নিতেন এবং তা দাঁড়িয়ে পান করতেন। সুতরাং এটা যদি সুন্নত না হতো তাহলে এক্ষেত্রে তিনি রাসূল (স) এর অনুকরণ করতেন না। (শরহে ত্বহাবী পৃষ্ঠা নং ৭৪৩-৪৪)

الوُضُوءُ لِكُلِّ صَلوٰةٍ

١٣١. اخبرنا محمدُ بْنُ عبدِ الأعلى قال حَدَّثنا خالدٌ قال حدّثنا شعبةُ عن عمرو بْنِ عامرٍ عن انسٍ رضى الله عنه ذَكَرَ انَّ النبىَّ ﷺ اُتىَ بِاناءٍ صَغيرٍ فتوضَّأ قلتُ اَكانَ النبىُّ ﷺ يتوضَّأُ لِكُلِّ صلوٰةٍ قال نعَمْ قال فأنتم قال كُنَّا نُصَلِّى الصلواتَ مالم نُحْدِثْ قال وقد كُنَّا نُصَلِّى الصَّلواتِ بِوُضُوءٍ -

١٣٢. اخبرنا زيادُ بْنُ ايوبَ قال حَدَّثنا بنُ عُلَيَّةَ قال حدّثنا ايوبُ عن ابنِ ابى مُلَيكةَ عن ابْنِ عبَّاسٍ رضِى اللهُ عنهُما انّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِن الخَلاءِ فقُرِّبَ اليه طعامٌ فقالُوا اَلاَ نَاتِيكَ بِوَضوءٍ فقال انّما اُمِرْتُ بِالوُضوءِ اِذا قمتُ اِلى الصَّلوٰةِ -

١٣٣. اخبرنا عبيدُ اللّٰهِ بنُ سعيدٍ قال حدّثنا يحيىٰ عن سفيانَ قال حدّثنا عَلقمةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنِ ابنِ بُرَيدةَ عَنْ اَبِيهِ قال كانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يتوضَّأُ لِكُلِّ صلوٰةٍ فلمّا كانَ يَوْمُ الفَتْحِ صلّى الصلواتِ بِوُضوءٍ واحدٍ فقال عمرُ فعلتَ شيئًا لم تكُنْ تَفْعَلُه قال عَمْدًا فعلتُه ياعمرُ -

প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করা

অনুবাদ ঃ ১৩১. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র) .... আমর ইবনে আমির (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পানির একটি ছোট পাত্র আনা হল এবং রাসূলুল্লাহ (স) উযূ করলেন। আমি (আমর) বললাম, নবী (স) প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমর বললেন, আর আপনারা (সাহাবীগণ)? তিনি বললেন, আমরা উযূ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করতাম। তিনি (আমর) বলেন, আমরা একই উযূ দ্বারা একাধিক নামায আদায় করতাম।

১৩২. যিয়াদ ইবনে আইয়ুব (র)..... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) শৌচাগার হতে বের হলে তাঁর নিকট কিছু খাদ্য আনা হল। উপস্থিত লোকেরা বলল, আপনার জন্য উযূর পানি আনব কি? তিনি বললেন, আমাকে তো উযূ করার আদেশ করা হয়েছে যখন আমি নামাযের জন্য প্রস্তুত হই তখন।

১৩৩. উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)........ বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করতেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন তিনি একই উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করলেন, তখন উমর (রা) তাঁকে বললেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আজ আপনি এমন কাজ করলেন যা এর পূর্বে করেননি। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন উমর! ইচ্ছা করেই আমি এরূপ করেছি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : هل يجب الوضوءُ لكلّ صلوة؟ بيّن بالدلائل مُفصَّلا

প্রশ্ন ঃ প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ আবশ্যক কি না বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূর বিধান ঃ প্রত্যেক নামায়ের জন্য উযূ জরুরী কি না এ ব্যাপারে দুটি মাযহাব রয়েছে। এ ব্যাপারে সকল উলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেন যে, মুসাফিরের জন্য প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করা আবশ্যক নয়। তবে মুকীমের জন্য প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করা আবশ্যক কি না এ ব্যাপারে আলিমগণের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। নিম্নে এ ব্যাপারটি দুটি মাযহাব উল্লেখ করা হল–

১. শিয়া সম্প্রদায় ও আসহাবে জাওয়াহেরের নিকট মুকীমের জন্য প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করা ওয়াজিব। চাই সে পবিত্র থাকুক কিংবা অপবিত্র।

২. ইমাম চতুষ্টয়, জুমহুর ফুকাহা ও মুহাদ্দেসীন উলামায়ে কিরামের মতে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করা ওয়াজিব নয় চাই সে মুকীম হোক কিংবা মুসাফির। তবে উযূ দ্বারা এক ওয়াক্ত নামায আদায় করার পর পুণরায় অপর ওয়াক্তের জন্য উযূ করা মুস্তাহাব। (আমানিউল আহবার ১/২১৭, ইযাহুত্ত্বহাবী ১/১৫৮-১৮৯)

আহলে জাহেরদের দলীল : ১. তাদের প্রথম দলীল হল হযরত বুরায়দা (র) এর রেওয়ায়াত, তিনি বলেন–

انه عليه السلام يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ

নবী (স) প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করতেন। আর তিনি যে মক্কা বিজয়ের সময় এক উযূ দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলেন এর কারণ হল তখন তিনি মুসাফির ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের সফরে হযরত ওমর (রা) রাসূল (স) কে জিজ্ঞেস করলেন আপনি আপনার অভ্যাসের বিপরীত এক উযূতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায কেন আদায় করেছেন? তখন নবী (স) বলেন, আমি জেনে বুঝেই এমনটি করেছি। এই হাদীস দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (স) মুকীম অবস্থায় প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন করে উযূ করতেন। আর মুসাফির অবস্থায় এক উযূ দ্বারা অনেক নামায আদায় করতেন। কাজেই এটাই বলতে হবে যে, প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন করে উযূ করা ওয়াজিব। (ইযাহুত ত্বহাবী ১/১৫৯)

তাদের দ্বিতীয় দলীল : আল্লাহ তাআলার বাণী–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ ... الاٰية

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হও তখন সর্বপ্রথম তোমরা উযূ করে নাও। এ আয়াতের দ্বারা প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন করে উযূ করার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। (ইযাহুত ত্বহাবী ১/১৫৯)

তৃতীয় দলীল : তাদের তৃতীয় দলীল হল হযরত আনাস (রা) এর রেওয়ায়াত। তিনি বলেন,

انّه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ

নবী (স) প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন করে উযূ করতেন চাই তিনি পবিত্র অবস্থায় থাকুন কিংবা অপবিত্র। এর দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, নবী (স) প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করতেন।

জুমহুরের দলীল

عن جابر بْنِ عبدِ اللّٰه قال ذَهَبَ رسولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلّم اِلٰى امْرَأَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَمَعَهٗ اَصْحَابُهٗ فَقَرَّبَتْ لَهُمْ شَاةً مَصْلِيَّةً فَاَكَلَ وَكَلْنَا ثُمَّ حَانَتِ الظُّهْرُ فَتَوَضَّأَ وَصَلّٰى ثم رَجَعَ الى فَضْلِ طَعَامِهٖ فَاَكَلَ ثُمَّ حانتِ العَصْرُ فصَلّٰى ولَمْ يَتَوَضَّأْ

অর্থাৎ এক আনসারী মহিলা নবী (স) কে দাওয়াত দিলেন, তাঁর সাথে সাহাবায়ে কিরামের একটি দলও ছিল। উক্ত আনসারী মহিলা একটি ভুনা করা বকরী পেশ করলেন। নবী (স), ও সাহাবায়ে কিরাম তা হতে ভক্ষণ করলেন। অতঃপর যখন যোহরের সময় হল তখন উযূ করে যোহরের নামায আদায় করে নিলেন। অতঃপর নামায শেষ করে থেকে যাওয়া বকরীর অবশিষ্ট গোশত ভক্ষণ করলেন। অতঃপর যখন আসরের সময় হল তখন উযূ করা ব্যতীত আসরের নামায আদায় করেন। যেহেতু নবী (স) যোহর ও আসরের নামায একই উযূ দ্বারা আদায় করেছেন। এর দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন নতুন উযূ করা ওয়াজিব নয়। বাকী হযরত আবু হুরায়রা, বুরায়দা ও আনাস (রা) এর বর্ণিত রেওয়ায়াত ফাযায়েলের উপর প্রযোজ্য হবে, ওয়াজিব এর উপর নয়।

(ইযাহুত ত্বহাবী ১/১৬১)

দ্বিতীয় দলীল ঃ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقُلْتُ لِاَنَسٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صلوةٍ قال نَعَمْ قلتُ فَاَنْتُمْ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الصلواتِ بِوُضُوْءٍ

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করা হুজুর (স) এর বৈশিষ্ট ছিল। উম্মতে মুহাম্মাদী ও সাহাবায়ে কিরামের ক্ষেত্রে এটা জরুরী নয়, আনাস (রা) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা এটা স্পষ্ট হয় যে, হুজুর (স) প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করতেন। আর সাহাবায়ে কিরাম এক উযূ দ্বারা অনেক নামায পড়তেন। (ইযাহুত ত্বহাবী ঃ ১/১৬২)

তৃতীয় দলীল ঃ

٣. قَوْلُهٗ كُنَّا نُصَلِّى الصَّلَواتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ واحدٍ مالَمْ نُحْدِثْ اَنَّهٗ صَلَّى الصلواتِ بِوُضُوْءٍ واحدٍ وَمَسَحَ خُفَّيْهِ.

প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন উযূ করা ইসলামের শুরু যুগে ছিলো, পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে। এর দলীল হল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা ইবনে আবী আমেরের রেওয়ায়াত যে, হুজুর (স) কে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূর হুকুম দেয়া হয়েছে; চাই তিনি পবিত্র অবস্থায় থাকুন কিংবা অপবিত্র অবস্থায়। অতপর যখন প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করা মুশকিল হল তখন প্রত্যেক নামাযের জন্য মিসওয়াকের নির্দেশ প্রদান করেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) প্রত্যেক নামাযে নতুন উযূ করার উপর সক্ষম ছিলেন, তাই তিনি নতুন উযূ পরিত্যাগ করতেন না। এ হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করার বিধান প্রথমে ছিল, পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে। কাজেই এক উযূ দ্বারা যত ইচ্ছা নামায আদায় করা বৈধ হবে।

(বজলুল মাজহুদ ১/ ১০৪; কাওকাবুদ দুররী ১/৮৩; মাআরিফুস সুনান ঃ ১/২১৩)

যৌক্তিক দলীল-১ ঃ প্রত্যেক নামাযের জন্য যে উযূ করতে হবে না এর যৌক্তিক প্রমাণ নিম্নরূপ–

উযূ হল অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতার্জন। অতএব চিন্তা করতে হবে যে, অপবিত্রতা থেকে অন্যান্য পবিত্রতার কি হুকুম? কি বিষয় এসব পবিত্রতা নষ্ট করে? আমরা দেখলাম, পবিত্রতা দু'প্রকার।

১. বড় পবিত্রতা। যেমন– গোসল।

২. ছোট পবিত্রতা। যেমন– উযূ।

এরূপভাবে যে সব অপবিত্রতার কারণে পবিত্রতা ওয়াজিব হয়, সেগুলোও দু'প্রকার–

১. حدث اكبر তথা বড় অপবিত্রতা। যেমন জানাবাত বা গোসল ফরয হওয়া। যথা স্বপ্নদোষ, সহবাস ইত্যাদি।

২. حدث اصغر তথা ছোট অপবিত্রতা। যেমন- প্রস্রাব-পায়খানা করা ইত্যাদি। বস্তুত: বড় পবিত্রতা শুধু বড় অপবিত্রতা যেমন- গোসল ফরয হওয়া, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির কারণে নষ্ট হয়। এটা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে নষ্ট হয় না। অপবিত্রতা ছাড়া এমনিতেই একটি নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে গোসল ভেঙ্গে যাবে ও নতুন গোসল ফরয হবে এমন হয় না বরং বড় পবিত্রতা শুধু বড় অপবিত্রতা দ্বারাই নষ্ট হয়। এতে কারও কোন মতবিরোধ নেই। কাজেই বড় পবিত্রতার মত ছোট পবিত্রতাও শুধু ছোট অপবিত্রতার কারণেই নষ্ট হবে, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে নষ্ট হবে না। কাজেই এক উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করা সহীহ হবে। (ইযাহুত ত্বহাবী ঃ ১/১৬৫-১৬৬)

যৌক্তিক দলীল- ২ ঃ প্রত্যেক নামাযের জন্য যে, নতুন নতুন উযূ করা ওয়াজিব নয় এর দ্বিতীয় যৌক্তিক প্রমাণ এই যে, মুসাফির সম্পর্কে সবার ঐক্যমত রয়েছে যে, এক উযূ দ্বারা যত ইচ্ছা নামায পড়তে পারে, যতক্ষণ না অপবিত্র হয়। কিন্তু মুকীম স্পর্কে মতবিরোধ হয়ে গেছে তার উপর প্রতিটি নামাযের জন্য উযূ করা আবশ্যক কি না?

আমরা দেখছি যে সব অপবিত্রতা যেমন- সহবাস, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদি) এর কারণে মুকীমের উপর পবিত্রতা আবশ্যক হয়। এ সব অবিত্রতার কারণেই মুসাফিরের উপরও পবিত্রতা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ পবিত্রতা ভঙ্গের ক্ষেত্রে মুকীম ও মুসাফিরের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এরূপভাবে আমরা আরেকটি পবিত্রতাকে দেখি, সেটি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর ভঙ্গ হয়ে যায়। তা হল মোজার উপর মাসেহ করার মাধ্যমে যে পবিত্রতা অর্জিত হয়, এটা সময়

অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এতে মুকীম ও মুসাফির উভয়েই সমান। অবশ্য পার্থক্য হল মুসাফিরের মেয়াদ কিছুটা দীর্ঘ, আর মুকীমের মেয়াদ কিছুটা সংকীর্ণ।

সারকথা, পবিত্রতা ভঙ্গের ক্ষেত্রে মুকীম ও মুসাফির, সমান। কাজেই সময় অতিক্রমন যেহেতু আপনাদের মতানুযায়ীও মুসাফিরের উযূ ভঙ্গ করে না। সেহেতু মুকীমের উযূও ভঙ্গ করবে না, যুক্তির দাবী এটাই।

(ইযাহুত ত্বহাবী ঃ ১/১৬৬-১৬৭ আমানিল আহবার ঃ ১/২১৭)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ ১

হযরত বুরায়দা (রা) এর রেওয়ায়াত দ্বারা প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করার আবশ্যকতা সাব্যস্ত হয় না। বরং প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন উযূ করার ফযীলত সাব্যস্ত হয়। জাবের (রা) এর রেওয়ায়াত দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, নবী সা. জনৈক আনসারী মহিলার দাওয়াতে গিয়ে সেথায় যোহর ও আসরের নামায এক উযূতে আদায় করেন। যদি প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করা ওয়াজিব হতো তাহলে নবী সা. মুকীম অবস্থায় এক উযূ দ্বারা যোহর ও আসরের নামায আদায় করতেন না।

২ ও ৪ নং আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন উযূ করা কোন ক্রমেই সাব্যস্ত হয় না। কেননা, যেমনি আল্লাহ তাআলা অত্র আয়াতে উযূর হুকুম প্রদান করেছেন, ঠিক তদ্রূপ উযূর আয়াতের শেষে উযূ করার কারণও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে– وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ .... الخ

আয়াতে উযূর দ্বারা উম্মাতের সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং পবিত্রতা অর্জন উদ্দেশ্য। সুতরাং যদি প্রথমে উযূ করার দ্বারা পবিত্রতা বহাল থাকে তাহলে নতুন উযূ করার দ্বারা কোন ফায়দা নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র পবিত্রতাকে চান, আর তা প্রথম থেকেই বিদ্যমান রয়েছে, কাজেই পবিত্রতা বাকী থাকার পর পুনরায় পবিত্রতা অর্জন করার দ্বারা تحصيل حاصل তথা অর্জিত বস্তুকে পুনরায় অর্জন করা অনিবার্য হয়। আর এর নির্দেশ প্রদান করা আল্লাহ তাআলার শান নয়। কাজেই আয়াত দ্বারা প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন উযূ করা সাব্যস্ত হয় না। (ইযাহুত ত্বহাবী ঃ ১/১৬০)

খ. অথবা, আয়াতে হুকুমটি ওয়াজিব ও মুস্তাহাব এর মধ্যে মুশতারাক অর্থাৎ যখন নামায আদায়কারী ব্যক্তি অপবিত্র হবে তখন তার জন্য উযূ করা ওয়াজিব এবং যখন পবিত্র হবে তখন নতুন উযূ করা মুস্তাহাব।

গ. অথবা, প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন উযূ করার বিধান ইসলামের শুরু যুগে ছিল। মক্কা বিজয়ের সময় নবী (স) এর কর্মের মাধ্যমে তা রহিত হয়ে গেছে। (শরহে তিরমিযী ঃ ৩৯)

৩. হাদীসের জবাব ঃ ক. নবীজী (স) যে আমল করেছেন তা তিনি عزيمة এর উপর আমল ছিল।

খ. অথবা, হাদীসে রাসূলের অভ্যাসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।

গ. অথবা, এটা প্রথমে ওয়াজিব ছিল, পরবর্তীতে এটা রহিত হয়ে গেছে। (শরহে তিরমিযী ঃ ৩৯)

হাদীস সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা

প্রথম হাদীস সম্পর্কে আলোচনা

নবী সা. যে প্রত্যেক নামাযে উযূ নবায়ন করতেন এটা নবী সা. এর অভ্যাস ছিল কিন্তু সাহাবাদের আমল এমন ছিল না। বরং তাদের আমল ছিল এক উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করা। যেমন– আনাস (রা) এর রেওয়ায়াত كُنَّا نُصَلِّى الصَّلٰوةَ مَالَمْ نُحْدِثْ হদস না হওয়া পর্যন্ত আমরা এক উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করতাম। (শরহে উর্দূ নাসায়ী-২১৮)

দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে আলোচনা

দ্বিতীয় হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে ইবনে আবী মুলাইকা রেওয়ায়াত করেন। তার নাম হল– عبد الله بن عبيد الله بن ابى مُلَيْكَة زُهَيْر بن عبد الله بن جُدْعان ابوبكر তাকে আবু মুহাম্মদ আইনী মক্কী ও বলা হয়। ইনি ইবনে জুহাইরের কাজী এবং মুয়াযযিন ছিলেন। তিনি ৩০ জন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী ও ফকীহ ছিলেন। ১১৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

قوله إنما أمرت بالوضوء .... الخ : পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর হুজুর (স) এর সামনে খানা উপস্থিত করা হল, সাহাবাদের কোন একজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনার জন্য উযূর পানি আনবো না? তখন হুজুর (স) বললেন, إنما أمرت بالوضوء .... الخ হদস হওয়ার পর যখন নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করব তখন উযূ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যথায় কুরআন স্পর্শ করা, তেলোয়াতের সিজদা করা এবং কাবা তাওয়াফ করার সময় উযূ করা ওয়াজিব। আলোচ্য হাদীসে وضوء দ্বারা নামাযের উযূ উদ্দেশ্য, وضوء طعام নয়। হাদীসের অগ্র-পশ্চাৎ এর উপরেই প্রমাণ বহন করে।

তৃতীয় হাদীসের رجال সম্পর্কে আলোচনা ঃ তৃতীয় হাদীসটি হল, হযরত বুরায়দা ইবনে হুসাইন (রা) এর। তার ছেলে ইবনে বুরায়দা অর্থাৎ সুলায়মান ইবনে বুরায়দা তার থেকে রেওয়ায়াত করেন। তিনি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দার ভাই। আজালী বলেন, তারা দুইজন জমজ ভাই, তারা একত্রে ভূমিষ্ট হয়েছে। উভয় তাবেয়ী এবং নির্ভরযোগ্য ছিলেন। কিন্তু সুলায়মান তার ভাই, আব্দুল্লাহ থেকে বেশী নির্ভরযোগ্য ছিলেন এবং অধিক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। ইবনে মাঈন, আবু হাতেম প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ তাকে সিকা সাব্যস্ত করেছেন।

অভ্যাসের পরিপন্থী এক উযূতে কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করার কারণ

১. মক্কা বিজয় এর সময় নবীজী (স) এক উযূতে কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন।

খ. মদীনায় এক আনসারী মহিলার দাওয়াতে গিয়ে যোহরও আসর এর নামায এক উযূ দ্বারা আদায় করেছেন।

গ. খায়বারের যুদ্ধে সাহ্‌বা নামক স্থানে আসর ও মাগরিব এক উযূতে পড়েছেন। এসবের কারণ নিম্নরূপ–

এটা হয়তোবা ভুলবশত হয়েছে। তাই ওমর (রা) কে স্মরণ করানোর ও সংশয়কে দূর করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেন, عمداً فعلته يا عمر এটা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এক উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্তে নামায আদায় করা যায়। অথবা, এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি নামায আদায় করার ইচ্ছা করবে অপবিত্র হওয়া ব্যতীত তার জন্য উযূ করা ওয়াজিব নয়। এটাই জুমহুরের মাযহাব, কেউ কেউ এর উপর ইজমার দাবী করেছেন। সাহাবীদের আমল দ্বারা জুমহুরের মাযহাব সমর্থিত হয়।

প্রত্যেক নামাযের সময় উযূ করার ব্যাপারে সাহাবাদের বক্তব্য ও হুজুরের আমল

১. হযরত আনাস (রা) কে প্রত্যেক নামাযের সময় উযূ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হদস সংঘটিত না হলে এক উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করা যায়। এর দ্বারা বুঝা যায় প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করা জরুরী নয়। তবে এক্ষেত্রে হুজুর (স) এর আমল যে, তিনি প্রত্যেক নামাযের সময় উযূ করতেন এর উত্তর হল এটা তার অধিকাংশ সময়ের অভ্যাসের উপর প্রযোজ্য। এটাই ইবনে হাজারের বক্তব্য।

২. ইমাম ত্বহাবী বলেন, এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, নবী (স) এর উপর প্রত্যেক নামাযের শুরুতে উযূ করা ওয়াজিব ছিল। অতঃপর তা মানসূখ হয়ে গেছে। এর দলীল হল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা প্রমূখের বর্ণনা যেমন– انّ النبىّ صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكلّ صلوة فلمّا شقّ عليه امر بالسّواك

প্রত্যেক নামাযের সময় উযূ আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি হুজুর (স) থেকে রহিত করা হয়েছে তবে অপবিত্র থাকার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করার ইচ্ছা করলে উযূ করা ফরয।

৩. অথবা, এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, নবী (স) মুস্তাহাব হিসাবে প্রত্যেক নামাযের শুরুতে উযূ করতেন। অতঃপর যখন এ আশংকা করলেন যে, হয়তোবা এটাকে উম্মত ওয়াজিব হিসাবে গ্রহণ করবে। ফলে তিনি بيان جواز তথা এক উযূতে কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করা বৈধ এটা বর্ণনা করার জন্য কখনো প্রত্যেক ওয়াক্তে উযূ করাকে বর্জন করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় এক উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করা বৈধ। ইবনে হাজার বলেন– هذا اقرب إلى الصّواب (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ২১৯)

সারকথা ঃ পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি হদস সম্পৃক্ত হয় তাহলে নামায আদায় করতে চাইলে উযূ করা ওয়াজিব। অন্যথায় ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ২১৯) [বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

بَابُ النَّضْحِ

١٣٤. اخبرنا اسمعيلُ بْنُ مسعودٍ قال حَدَّثَنا خالدُ بنُ الحارثِ عَنْ شُعبةَ عن منصورٍ عَنْ مُجاهدٍ عَنِ الحكمِ عَنْ ابيهِ اَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ اِذا تَوَضَّأَ اَخَذَ حَفْنَةً مِّنْ ماءٍ فقال بِها هٰكذا ووَصَفَ شُعبةُ نَضَحَ به فَرْجَهُ فذكرتُه لابراهيمَ فاَعْجَبَه قال الشيخُ ابنُ السُّنِّي الحكمُ هُو ابنُ سفيانَ الثَّقَفِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

١٣٥. اخبرنا العبّاسُ بْنُ محمّدٍ الدُّوري قال حَدَّثَنا الاَحْوَصُ بْنُ جواب حَدَّثَنا عمّار بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ مَنْصُورٍ ح واَخْبَرَنا احمدُ بْنُ حربٍ حَدَّثَنا قاسمٌ وهو ابنُ يزيدَ الجَرْمِيُّ قال حَدَّثَنا سفيانُ قال حدّثنا منصورٌ عن مُجاهدٍ عَنِ الحكمِ بْنِ سفيانَ قال رايتُ رسولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ ونَضَحَ فَرْجَهُ قال احمدُ فنَضَحَ فَرْجَه -

---

অনুচ্ছেদ ঃ পানি ছিটানো

অনুবাদ ঃ ১৩৪. ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)....... হাকাম (র)-এর পিতা সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) যখন উযূ করতেন তখন এক কোষ পানি নিতেন এবং তা এরূপ ছিটাতেন। শো'বা (বিশিষ্ট রাবী) তা স্বীয় পুরুষাঙ্গের উপর ছিটাতেন। আমি এটা ইবরাহীমের নিকট উল্লেখ করলে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন। শায়খ ইবনে সুন্নী বলেন, হাকাম সুফিয়ান সাকাফীর পুত্র।

১৩৫. আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ দূরী ও আহমদ ইবনে হারব (র)...... হাকাম ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছি, তিনি উযু করলেন এবং তাঁর লজ্জাস্থানের উপর পানি ছিটালেন। আহমদ বলেছেন, পরে তাঁর লজ্জাস্থানের উপর পানি ছিটালেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

পানি ছিটানোর অর্থ ও হিকমত ঃ অধিকাংশ আলিম এর অর্থ নিয়েছেন উযূর পর জামার নিচে ছিটানো, এর হিকমত সাধারণতঃ এই বর্ণনা করা হয় যে, এর ফলে পেশাবের ফোঁটা বের হওয়ার কুমন্ত্রণা আসে না।

* হযরত শাইখুল হিন্দ (র) এর আরেকটি সূক্ষ্ম হিকমত বর্ণনা করেছেন যে, উযূ দ্বারা আসল উদ্দেশ্য তো আধ্যাত্মিক পবিত্রতা, কিন্তু কার্যত ঃ তাতে বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করা হয় বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য। আর

[পূর্বের পৃষ্ঠার বাকী অংশ]

اَلْوُضُوْءُ عَلَى الْوُضُوْءِ এর বিধান ঃ

১. কেউ কেউ বলেন, উযূ থাকা অবস্থায় পুনরায় উযূ করা মুস্তাহাব। এর দলীল হল ইবনে উমরের হাদীস হুজুর (স) বলেছেন যে ব্যক্তি অযূ থাকা সত্ত্বেও উযূ করে তার আমলনামাই ১০ নেকী লেখা হয়। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে দ্বয়ীফ বলেছেন। আর ফাযায়েলে আমালের ক্ষেত্রে দ্বয়ীফ হাদীস গ্রহণীয়। তবে আবু দাউদ এ হাদীসের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছেন। আর নিরব থাকাটাই হাদীস তার নিকট গৃহীত হওয়ার প্রমাণ।

২. হানাফী উলামায়ে কিরাম উযূ থাকা অবস্থায় পুনরায় উযূ করার জন্য মজলিসের ভিন্নতা অথবা উভয় উযূর মধ্যে কোন আমল করার শর্ত লাগান। সুতরাং যদি উভয় উযূর মধ্যে কোন ইবাদত সংঘটিত না হয় এবং মজলিসও ভিন্ন না হয় তাহলে উযূ থাকা অবস্থায় উযূ করা মাকরূহ।

শায়খ আব্দুল গণী (র) বলেন, উযূ থাকা অবস্থায় পুনরায় উযূ করার ব্যাপারে যে হাদীস এসেছে তা মুতলাক এবং শরীয়ত অনুমোদিত। তাই তাকে اسراف এর মধ্যে গণ্য করা যথার্থ নয়। (রদ্দুল মুহতার ১/৩৯৪ ফাতহুল মুলহিম)

এ থেকে অবসর হওয়ার পর এরূপ দু'টি আমল মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেগুলো দ্বারা বাতেনী পবিত্রতার কথা মনে সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হয়। তা হল-১. উযূর অবশিষ্ট পানি পান করা। ও ২. লজ্জা স্থানে পানি ছিটিয়ে দেয়া। এতে এ হিকমত রয়েছে যে, মানুষের সমস্ত গুনাহের উৎস হল শরীরের এ দু'টি বস্তু (ক) মুখ, ও (খ) লজ্জা স্থান। পেটের প্রবৃত্তির প্রভাব দূর করার জন্য উযূর অবশিষ্ট পানি পান বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। আর লজ্জাস্থানের অবৈধ কাম চাহিদা নিবাবরন করার জন্য লুঙ্গির উপর দিয়ে লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেয়াকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

মোটকথা, এ হুকুমটি আবশ্যকীয় নয়; বরং উত্তমতামূলক। আর এবিষয়ক সমস্ত রেওয়ায়াত সূত্রগতভাবে দূর্বল। এ কারণে এ অনুচ্ছেদের হাদীসটিকেও হাসান ইবনে আলী হাশেমীর কারণে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রের কারণে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিষয়টি ফাযায়িল সংক্রান্ত। এ জন্য এতটুকু দুর্বলতা ক্ষতিকর নয়। (শরহে আবু দাউদ ১৫১, দরসে তিরমিযী ১/৩৪৭)

প্রথম হাদীস সম্পর্কে আলোচনা ঃ শিরোনামের উদ্দেশ্যের উপর হাদীসের দালালত স্পষ্ট যে, নবী (স) উযূ করার পর এক কোষ পানি নিয়ে লজ্জাস্থানের উপর ছিটিয়ে দিতেন।

এ ব্যাপারে রাবী বলেন, فقال بها هكذا اى فعل بها অর্থাৎ তিনি তা হাতে নিয়ে এরূপ ছিটাতেন, কিন্তু এটা স্পষ্ট কথা নয়, তাই শো'বা (রা) বর্ণনা করেন نضح به فرجه অর্থাৎ তা স্বীয় পুরুষাঙ্গের উপর ছিটাতেন, হাদীসের রাবী খালেদ ইবনে হারেস বলেন আমি এটাকে ইব্রাহীমের নিকট উল্লেখ করলে তিনি খুব খুশী হন।

দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে আলোচনা ঃ হাকাম ইবনে সুফিয়ান দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেন। কোন কোন মুহাদ্দেস বলেন, নবী (স) থেকে হাকামের শ্রবন ছাবেত নেই। কিন্তু হাফেজ ইবনে আব্দুল বার বলেন, আমার মতে হুজুর থেকে তার শ্রবণ ছাবেত রয়েছে।

نضح এর অর্থ ঃ ১. আল্লামা খাত্তাবী نَضْحُ فَرْجٍ এর এ অর্থ বর্ণনা করেন যে, উযূর পূর্বে পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করে নিতে হবে যাতে করে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যখন নবী (স) উযূ করার ইচ্ছা করতেন তখন সর্ব প্রথম পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে নিতেন।

২. কোন কোন আলিম বলেন, এখানে نضح দ্বারা ধৌত করা উদ্দেশ্য নয় বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল উযূ করার পর পায়জামা কিংবা কাপড়ের উপর পানি ছিটায়ে দেয়া। এটাই অগ্রগণ্য মত। কেননা, ইমাম আহমদ (র) এর রেওয়ায়াতে فنضح فرجه উল্লেখ রয়েছে, যেমন আলোচ্য অধ্যায়ে স্বয়ং ইমাম নাসায়ী তা রেওয়ায়াত করেছেন।

এর সমর্থন পাওয়া যায় হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) এর রেওয়ায়াত দ্বারা, তিনি নবী করীম (স) থেকে রেওয়ায়াত করেন যে, জিব্রাইল (আ) নবী করীম (স) এর নিকট অবতরণ করেন এবং উযূ শিক্ষাদেন। অতঃপর উযূ থেকে ফারেগ হয়ে এক চিল্লু পানি নিয়ে লজ্জা স্থানে ছিটিয়ে দেন।

فكانَ رسولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم يَرُشُّ بعدَ وُضوئِه

উক্ত হাদীসকে ইমাম আহমদ রেওয়ায়াত করেছেন। এ সূত্রের মধ্যে رشد بن بن سعد নামাক একজন রাবী রয়েছেন যাকে هشيم بن خارجه নির্ভরযোগ্য বলেছেন। এক রেওয়ায়াতে ইমাম আহমদও সিকা বলেছেন, অন্যরা দ্বয়ীফ বলেছেন। কিন্তু এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, এ ধরণের মতানৈক্য প্রমাণ পেশের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর নয়। কাজেই এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ বিশুদ্ধ হবে। (ইয়াহইয়াউস সুনান প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৪৪)

এধরনের হাদীস দারাকুতনী ও অন্যান্য কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় উযূ করার পর পানি ছিটিয়ে দেয়া, যাতে করে ওয়াসওয়াসা সন্দেহ দূর হয়ে যায়, অর্থাৎ পেশাবের ফোঁটা লাগার সংশয় দূর হয়। নবী (স) এমন করেছেন উম্মতের শিক্ষা দেয়ার জন্য। কারণ নবী (স) ওয়াসওয়াসা থেকে পূর্ণাঙ্গরূপে মুক্ত ছিলেন। অনেকে পানি ছিটিয়ে দেয়াকে মুস্তাহাব বলেন, তবে যদি বিশেষ অঙ্গ থেকে পেশাবের ফোঁটা বের হয় তাহলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং নতুনভাবে পুনরায় উযূ করা আবশ্যক। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ২২১)

بَابُ الاِنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْوُضُوْءِ

١٣٦. اخبَرَنا ابو داوُدَ سليمانُ بْنُ سيفٍ قال حَدَّثَنا ابو عتّابٍ قال حدّثنا شعبةُ عن ابى اسحٰقَ عَن اَبِى حَيَّةَ قال رايتُ عليًّا تَوَضَّاَ ثلثًا ثلثًا ثم قامَ فشَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِه وقال صَنَعَ رسولُ اللهِ ﷺ كَما صَنَعْتُ -

١٣٧. اخبَرَنا محمّدُ بْنُ منصورٍ عَن سفيانَ حدّثنا مالكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِى جُحَيْفَةَ عَن اَبِيْه قالَ شَهِدتُّ النبيَّ ﷺ بالبَطحاء فاَخرَج بلالٌ فَضْلَ وَضُوئِه فابْتَدَرَه النّاسُ فنِلْتُ مِنه شيئًا ورَكَزْتُ لهُ العَنَزَةَ فصَلّى بالنّاسِ والحُمُر والكِلابُ والمَرأةُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ -

١٣٨. اخبَرَنا محمّدُ بْنُ منصورٍ عَنْ سُفيانَ قال سَمِعْتُ ابنَ الْمُنكَدِرِ يقولُ سَمِعْتُ جابرًا يقولُ مَرِضْتُ فاَتانِى رسولُ اللّٰهِ ﷺ وابو بكرٍ يَعُوْدانِى فوَجَدانِى قد اُغْمِىَ عَلَىَّ فتَوَضّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فصَبَّ عَلَىَّ وَضُوْءَهُ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ উযুর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা উপকৃত হওয়া

অনুবাদ ঃ ১৩৬. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে সায়ফ (র).........আবু হাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে দেখলাম, তিনি তিন তিন বার করে (উযুর অঙ্গগুলো ধৌত করে) উযূ করলেন, পরে দাঁড়ালেন এবং উযূর উদ্বৃত্ত পানি পান করলেন, আর বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) যেরূপ করেছিলেন আমি সেরূপ করেছি।

আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাতহা ১৩৭. মুহাম্মদ ইবনে মনসুর (র)....... নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তারপর দেখলাম বিলাল (রা) তাঁর উযূর অবশিষ্ট পানি বের করলেন, আর লোক সে দিকে দৌড়াচ্ছে। আমিও তার কিছু পেলাম। তারপর তাঁর সম্মুখে একটি লাঠি স্থাপন করা হল, তিনি লোকদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করলেন। আর গাধা, কুকুর এবং স্ত্রীলোক তাঁর সম্মুখ দিয়ে চলাহলো করছিল।

১৩৮. মুহাম্মদ ইবনে মানসুর (রা)......, তিনি ইবনুল মুনকাদির (র)-কে বলতে শুনেছেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি একবার অসুস্থ হলাম। রাসূলুল্লাহ (স) এবং আবু বকর (রা) আমাকে দেখতে আসলেন। তাঁরা দেখলেন, আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছি। এরূপ দেখে রাসূলুল্লাহ (স) উযূ করলেন এবং আমার উপর তাঁর উযূর পানি ছিটিয়ে দিলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

দু'প্রকার পানিকে فضل وضوء বলা হয়।

১. উযূ করার পর পাত্রে বেঁচে থাকা অবশিষ্ট পানিকে فضل وضوء বলা হয়।

২. উযূ করার সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে ঝড়ে পড়া পানি যাকে ماء مستعمل বলা হয়।

এ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ধরণের রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা প্রথম প্রকারের সাথে সম্পৃক্ত তথা উযূ করার পর বেঁচে থাকা অতিরিক্ত পানির সাথে সম্পৃক্ত যা পবিত্রতা ও উপকার হাসিল করার যোগ্য।

হযরত আলী (রা) উযূর উদ্বৃত্ত পানিকে দাঁড়িয়ে পান করেন। অতঃপর বলেন হুজুর (স) এর আমল এমন ছিল। এর দ্বারা বুঝা যায় এ পানি দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব।

আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী লেখেন, فضل الوضوء তথা উযূর অতিরিক্ত পানি দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ পানি যাতে হাত ঢুকিয়ে পানি নেয়া হয়েছে, অত:পর উযূ করার পর কিছু পানি বেঁচে গেছে, তখন এই পানি দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব এবং এটাকে فضل وضوء বলা হয়। সুতরাং কেউ যদি বদনার নল দ্বারা উযূ করে এবং তাতে হাত না ঢুকায় আর উযূ করার পর কিছু পানি বেঁচে যায় তাহলে এটাকে فضل وضوء বলা হবে না এবং এটা দাঁড়ায়ে পান করা মুস্তাহাব নয়। (ই'লাউস সুনান ঃ ১/৪৩)

দ্বিতীয় রেওয়ায়াত ঃ দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে এসেছে যে, বেলাল (রা) নবী (স) এর উযূর অতিরিক্ত পানি বের করলেন, এ রেওয়ায়াত প্রথম সুরতের সাথেও সম্পৃক্ত হতে পারে, আবার দ্বিতীয়টির সাথেও সম্পৃক্ত হতে পারে।

১. আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, হযরত বেলাল (রা) যে পানি বের করে সাহাবাদের মাঝে বণ্টন করেছিলেন বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় এর সম্পর্ক প্রথম প্রকারের সাথে তথা উযূ পূর্ণ করার পর পাত্রে যে পানি অবশিষ্ট থাকে। এটার ও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এর দ্বারা ماء مستعمل উদ্দেশ্য। মোটকথা, উক্ত পানি উপকার লাভের যোগ্য কাজেই উক্ত পানি বণ্টন করার পর সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের শরীরে উক্ত পানি ঢালতেন।

বুখারীতে فيتمسحون যে বরকত লাভের আশায় উক্ত পানিকে তারা চেহারায় মাখতেন। মুসান্নিফ (র) যেহেতু এর কোন নির্ধারিত পদ্ধতি বর্ণনা করেননি। কাজেই এর যত প্রকার সুরত হতে পারে انتفاع। শব্দটি তার সবকয়টিকেই অন্তর্ভুক্ত করবে। আলোচ্য রেওয়ায়াতে এসেছে যে, নবী (স) এর সম্মুখে সুতরা স্বরূপ একটি লাঠি গেঁড়ে দেয়া হল। কোন কোন রেওয়ায়াতে এসেছে– হযরত বেলাল (রা) উক্ত লাঠি গেঁড়ে দিলেন। অতঃপর হুজুর (স) সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে যোহরের দ'রাকাত নামায আদায় করলেন। অতঃপর আসরের দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। বুখারীর রেওয়ায়াতে এসেছে যে, তাদের নামায আদায় করা অবস্থায় গাধা ও অন্যান্য প্রাণী সুতরার ওপারে চলাহলো করছিল, এর দ্বারা বুঝা যায় সুতরা স্থাপন করা অবস্থায় যদি মানুষ কিংবা অন্যান্য প্রাণী সম্মুখ দিয়ে চলাহলো করে তাহলে এটা নামাযকে ফসেদ করে দিবে না।

তৃতীয় হাদীস ঃ তৃতীয় হাদীসে হযরত জাবির (রা) এর অসুস্থতা এবং শুশ্রুষার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, যখন আবু বকর (রা) ও নবী (স) তার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য আগমন করলেন তখন রোগের প্রচণ্ডতায় তিনি বেহুস ছিলেন। সুতরা ং রাসূল (স) উযূ করলেন এবং উক্ত পানি আমার উপর ছিটায়ে দিলেন, বুখারীর রেওয়ায়াতে এসেছে فعقلت অতঃপর আমি হুঁশ ফিরে পাই, তখন জাবির হুজুর (স) এর নিকট মিরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার মিরাসের অধিকারী কে হবে? আমার তো পিতামাতা ও সন্তানাদি নেই। তখন ফারায়েজ সম্পর্কিত আয়াত অবতির্ণ হয়। আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, হযরত জাবির (রা) এর হাদীসে فضل وضوء তার উপর ঢেলে দেয়ার যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল ব্যবহৃত পানি। কেননা, এখানে বরকত স্বরূপ ব্যবহার করা উদ্দেশ্য। আর যে পানি নবী (স) এর পবিত্র শরীর মুবারক হতে ঝরে পড়েছে এর মধ্যে বরকত অধিক বেশী। এ জন্য ওর দ্বারা ماء مستعمل হওয়াই স্পষ্ট। (শরহে উর্দূ নাসায়ী) ঃ ২২২-২২৩)

بَابُ فَرْضِ الْوُضُوْءِ

١٣٩. اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن ابى المليح عن ابيه قال قال رسول الله ﷺ لايقبل الله صلوة بغير طهور ولا صدقة من غلول -

অনুচ্ছেদ ঃ উযূর ফরয

অনুবাদ ঃ ১৩৯. কুতায়বা (র).........উসামা ইবনে উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা ব্যতীত কোন নামায কবুল করেন না এবং অবৈধভাবে অর্জিত মালের সদকা গ্রহণ করেন না।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : اَوْضِحْ قَوْلَه عليه السلام لا تُقْبَلُ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

প্রশ্ন নবী (স) এর বাণী لاتُقْبَلُ صلوةٌ بغَيْرِ طُهورٍ এর ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ لاتُقْبَلُ صلوةٌ بِغَيْرِ طُهورٍ **এর ব্যাখ্যা ঃ** উক্ত হাদীসের এ অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল হয় না। অথচ সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, পবিত্রতা ব্যতীত নামায শুদ্ধই হয় না। যখন নামায বিশুদ্ধই হয় না, তখন তা কবুল হওয়ার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। সুতরাং এখানে পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল হয় না বলার কি কারণ? এর জবাবে বলা যায় যে, قبول দুই প্রকার। যথা–

১. قُبولِ اصابت এটা হল اداءُ الحُكمِ مَعَ الشّرائِطِ وَالأرْكَانِ এ কবুলকে قبول صحة ও বলা হয়। আর উক্ত হাদীসে لاتقبل দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ لا تَصِحُّ صلوةٌ بِغَيْرِ طُهورٍ

২. قبولِ اِجَابت ঃ যার উপর সাওয়াব নির্ভর করে। এটাকে قبول اثابت ও বলা হয়। এটা না হলে নামায হয়ে যাবে তবে সওয়াব পাওয়া যাবে না। যেমন অন্যান্য হাদীসে এসেছে–

١. لاتُقْبَلُ صَلٰوةُ الْاٰبِقِ حَتّٰى يَرْجِعَ -
٢. مَنْ اَتٰى عَرّافًا لا تُقْبَلُ صَلٰوتُهٗ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا

উক্ত হাদীসদ্বয়ে قبول দ্বারা সওয়াব না পাওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। (শরহে মিশকাত ঃ ১/২৫৮)

سوال : اكتُبِ الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَ جُمْلَتَيِ الْحَدِيْثِ

প্রশ্ন ঃ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে যোগসূত্র বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ হাদীসের দুটি অংশের মধ্যে মুনাসাবাত ঃ নামায একটি শারিরীক ইবাদত, তাই শারিরীক পবিত্রতা হাসিল করতে হবে। অনুরূপ সদকা হল একটি مالى ইবাদত, তার জন্য مالى পবিত্রতা হাসিল করতে হবে। এছাড়াও উযূ শরীরকে পবিত্র করে। যেমন– সদকা ধন সম্পদকে পবিত্র করে। (শরহে তিরমিযী ঃ ৩০১)

سوال : كَم قِسمًا لِلقَبولِ وَمَاهِى وَمَا المُرادُ هٰهُنَا

প্রশ্ন ঃ قبول কয় প্রকার ও কি কি? এবং এখানে কোনটা উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ قبول শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. قبول اصابت ঃ এটা হল–

كونُ الشّيْءِ مُسْتَجْمِعًا لِجَمِيعِ الشّرائِطِ وَالأرْكَانِ ـ واداءُ الحُكمِ مَعَ الشّرائطِ وَالأركانِ

অর্থাৎ কোন কিছু সমস্ত শর্ত ও রোকনের সমন্বয়কারী হওয়া। এ প্রকারকে قبول صحة ও বলা হয়। এর দ্বারা

যিম্মা থেকে দায়মুক্তি হয়। কিন্তু সওয়াবের আশা করা যায় না। আর এ হাদীসে لاتقبل দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ لَاتَصِحُّ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

২. قبول اجابت ঃ যার উপর সওয়াব নির্ভর করে। وقوعُ الشَّيْءِ فِي حَيِّزِ مَرْضَاةِ الرَّبِّ سُبْحَانَه وتَعَالىٰ তথা কোন কিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির যোগ্য হওয়া। এটাকে قبول اثابت ও বলা হয়। এটা না হলে নামায আদায় হয়ে যাবে তবে সওয়াব পাওয়া যাবে না। যেনম অন্যান্য হাদীসে এসেছে–

১. لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ الْاٰبِقِ حَتّٰى يَرْجِعَ

২. مَنْ اَتٰى عَرَّافًا لَاتُقْبَلُ صَلٰوتُه اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا

উক্ত হাদীসদ্বয়ে قبول দ্বারা সওয়াব না পাওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।

অত্র হাদীসে اصابت قبول উদ্দেশ্য। (শরহে মিশকাত ঃ ১/২৫৯, শরহে তিরমিযী ৩০২)

سوال : فَاقِدُ الطَّهُوْرَيْنِ مَنْ هُوَ؟ مَاهِيَ مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ فَاقِدِ الطَّهُوْرَيْنِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا ومُدَلَّلًا.

প্রশ্ন ঃ فَاقِدُ الطَّهُوْرَيْنِ কি? এর হুকুমের ব্যাপারে ফকীহগণের মতামত কি? বিস্তারিত দলীল প্রমাণসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ فَاقِدُ الطَّهُوْرَيْنِ এর পরিচয় ও সূরত ঃ

পরিচয় ঃ فَاقِدُ الطَّهُوْرَيْنِ তথা যে ব্যক্তির নিকট এমন পবিত্র মাটি বা পানি নেই যা দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে, অথবা যে, পানি ও মাটি ব্যবহারে অক্ষম। এর কয়েকটি অবস্থা হতে পারে–

১. কেউ উড়োজাহাজে ভ্রমন করছে যেখানে কোন পানি বা তায়াম্মুম করার মত মাটির ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

২. যে ব্যক্তি হিংস্র জন্তু যেমন-বাঘ, কুমির ইত্যাদির ভয়ে কোন গাছে আরোহন করেছে।

৩. সামুদ্রিক যানবাহনে ভ্রমণ করছে যে বাহনে সমূদ্র থেকে পানি উত্তোলনের কোন ব্যবস্থা নেই।

৪. যাকে কাফিররা বন্দি করে রেখেছে, ফলে তার তাহারাত হাসিল করার মত পানি বা মাটির ব্যবস্থা নেই।

৫. এমর মারাত্মক অসুস্থ যে, সে মাটি ও পানি ব্যবহার করতে অক্ষম, পানি ব্যবহার করলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কয়টি অবস্থায় যদি নামাযের সময় এসে যায়। তখন তাকে فاقد الطهورين বলা হবে।

فاقد الطهورين এর ব্যাপারে ইমামদের মতামত

যদি কেউ উযূ বা তায়াম্মুম করার জন্য পানি বা মাটি কিছুই না পায়। তখন সে কিভাবে নামায পড়বে এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে তা নিম্নরূপ–

১. ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তখন সে নামায পড়বে না। বরং সে পরে কাযা আদায় করবে। এটাই **ইমাম** মালেক (র) এর প্রসিদ্ধ অভিমত।

দলীল ঃ ১. রাসূলের বাণী – لَاتُقْبَلُ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

পবিত্রতা ব্যতীত নামায গৃহীত হবে না। এর দ্বারা বুঝা যায় যে এ অবস্থায় নামায পড়লে নামায আদায় হবে না।

দলীল ঃ ২. مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ

পবিত্রতা নামাযের চাবি। সুতরাং পবিত্র না হলে নামায সহীহ হবে না। এর দ্বারাও বুঝা যায় পবিত্রতা ব্যতীত নামায সহীহ হবে না।

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এর মতে অবস্থায় তাহারাত ব্যতীত নামায আদায় করবে, কাযা করবে না।

৩. ইমাম মালেক (র) এর মতে, এরূপ ব্যক্তি হতে নামায রহিত হয়ে যায়, তার উপর তখন নামায পড়া বা তার কাযা আদায় করা জরুরী নয়। কারণ পবিত্রতা হাসিলে অক্ষম হওয়ায় তার উপর নামায আদায় করা ওয়াজিব নয় এবং কাযা করাও জরুরী নয়।

৪. ইমাম নববী (র) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র) হতে এ ব্যাপারে পাঁচটি উক্তি বর্ণিত রয়েছে–

ক. তখন নামায পড়া তার উপর আবশ্যক তবে পুনরায় আদায় করতে হবে। এমতের উপরেই ফাতওয়া।

খ. সে অবস্থায় নামায পড়া তার জন্য হারাম, তার উপর কাযা করা ওয়াজিব।

গ. তখন নামায পড়া মুস্তাহাব তবে পরে কাযা করা ওয়াজিব।

ঘ. সে অবস্থায় নামায পড়া ওয়াজিব এবং কাযা পড়া আবশ্যক নয়।

ঙ. এরূপ ব্যক্তি হতে নামায রহিত হয়ে যায়। তার উপর তখন নামায পড়া বা তার কাযা আদায় করা জরুরী নয়।

৫. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) বলেন, এ ব্যক্তি তখন শুধু মুসল্লীর সাথে সামঞ্জস্য অবলম্বন করবে। পরবর্তীতে তার কাযা করা আবশ্যক। শরীয়তে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন–

কোন শিশু যদি রমযানের দিনে বালেগ হয় অথবা কাফির মুসলমান হয় অথবা মহিলা পবিত্র হয় তাহলে অবশিষ্ট দিনে খানা-পিনা, সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে এবং রোজাদারের সাথে সামঞ্জস্য অবলম্বন করতে হবে অতঃপর তার কাযা আদায় করতে হবে। তেমনি এরূপ ব্যক্তি নামাযির মতো রুকু সিজদা করবে, তবে নামাযের নিয়ত করবে না এবং পরে কাযা করে নেবে। এ মতের উপরই ফতোয়া। ইমাম আবু হানীফা (র) পরে এ অভিমত গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। (শরহে মিশকাত ঃ ১/২৫৯, শরহে তিরিমিযী ঃ ৩০৪)

سوال : مَا مَعْنَى الغُلُوْلِ وَما حُكْمُ الْمُتَصَدِّقِ مِنْ غُلُولٍ؟ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ مِّنْ حَرامٍ فَمَا هُوَ الْمَخْلَصُ لَهُ؟

প্রশ্ন ঃ الغلول শব্দের অর্থ কি? হারাম মাল সদকা করার বিধান কি? যার কাছে হারাম সম্পদ রয়েছে তার বাঁচার উপায় কি?

উত্তর ঃ الغُلول শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ غَلول শব্দটির আভিধানিক অর্থ سرقة الابل তথা উট চুরি করা।

পারিভাষিক অর্থ ঃ পরিভাষায় غلول **বলা হয়–** الخِيَانَةُ فِى مَالِ الغَنِيْمَةِ

গণীমতের সম্পদে খিয়ানত করা। পরবর্তীতে শব্দটি প্রত্যেক অবৈধ, অপবিত্র সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে থাকে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে– وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

হারাম সম্পদ সদকা করার বিধান

হারাম সম্পদ অর্জন করা যেমনি হারাম, তেমনি সম্পদটিও হারাম। আবার ঐ সম্পদকে সদকা করাও হারাম, এর দ্বারা সওয়াবের আশা করাও হারাম ও কুফুরী। দুররুল মুখতার গ্রন্থে রয়েছে–

اِنَّ التَّصَدُّقَ بِالْمَالِ الْحَرامِ ثُمَّ رَجَاءَ الثَّوابِ مِنْهُ حرامٌ وكُفْرٌ অর্থাৎ পুণ্য লাভের ইচ্ছায় যে ব্যক্তি অবৈধ মাল সদকা করল। আশঙ্কা রয়েছে যে, সে কাফির হয়ে যাবে।

হারাম সম্পদ থেকে বাঁচার উপায়

আলোচ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হারাম সম্পদ সদকা করা হারাম অথচ ঐ সম্পদকে ফেলে দেয়া বা নষ্ট করে ফেলাও হারাম, যেহেতু তাতে সম্পদ নষ্ট হয়। এখন প্রশ্ন হল, যার কাছে হারাম সম্পদ রয়েছে, তার বাঁচার উপায় কি? এর জবাবে হেদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, যদি কারো কাছে কোন অবৈধ সম্পদ গচ্ছিত থাকে বা সঞ্চিত থাকে আর যদি মালিকের নাম জানা যায় তবে সাথে সাথে মালিকের কাছে তা ফেরত দিবে। কিন্তু যদি মালিকের পরিচয় জানা না যায় তাহলে সে সম্পদ নিতান্ত ফকীর মিসকীনকে বিলিয়ে দিবে। কিন্তু কোন সওয়াবের আশা করা যাবে না। যদিও এতে দানের সওয়াব পাওয়া যাবে না। তবে শরীয়তের এ নির্দেশ পালনের সওয়াব অবশ্যই পাবে। আল্লামা ইবনে কাইয়ুম তার বাদায়েউল ফাওয়ায়েদে বলেছেন যার নিকট অবৈধ মাল সঞ্চিত থাকে, যদি সে তা সদকা করে দেয়, তবে সে সওয়াব পাবে। এ সওয়াব সদকার কারণে নয়; বরং শরীয়তের নির্দেশ পালনের কারণে। (শরহে মিশকাত ১/২৫৯, শরহে নাসায়ী ১/১৯৭-১৯৮)

سوال : مَا مَعْنَى الغُلُوْلِ؟ وَلِمَ خَصَّهُ بِالذِّكْرِ؟

প্রশ্ন ঃ غلول শব্দের অর্থ কি? এর কথা কেন নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ غلول শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ غلول শব্দটির আভিধানিক অর্থ سرقة الابل তথা উট চুরি করা।

غلول এর পারিভাষিক অর্থ ঃ পরিভাষায় غلول অর্থ হল الخِيَانَةُ فِى مَالِ الغَنِيْمَةِ তথা গণীমতের সম্পদে

খিয়ানত করা। পরবর্তীতে শব্দটি প্রত্যেক অবৈধ, অপবিত্র মালের ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে থাকে। কুরআনে বলা হয়েছে- وما كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

غلول কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ ঃ غلول শব্দকে নির্দিষ্ট করার কারণ হচ্ছে যাতে একথা বুঝা যায় যে, গনীমতের মালের মধ্যে যে ব্যক্তি খিয়ানত করেছে তারও অংশ রয়েছে, উক্ত গনীমতের মালের ভেতর তার অংশ থাকা সত্ত্বেও যখন এ ধরনের মাল থেকে সদকা করলে কবুল হচ্ছে না। তখন যে মালে ব্যক্তির কোন অংশ নেই। সেই মাল থেকে সদকা করলে তা কিভাবে কবুল হবে? (শরহে নাসায়ী ১/১৯৯)

سوال : ما معنى الطُّهور لُغَةً واصْطِلاحًا؟ ومَا المُرادُ بِهِ؟

প্রশ্ন ঃ الطهور। শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ الطهور **এর আভিধানিক অর্থ ঃ** الطهور শব্দটি طا বর্ণে হরকতের ব্যবধানে অর্থের মধ্যেও ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। যেমন-الطهور (بضم الطاء) الطُّهُوْر মাসদার। অর্থ পবিত্র হওয়া। الطَّهُوْر (بفتح الطاء) অর্থ مَا بِهِ الطَّهَارةُ তথা পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ। যেমন পানি, মাটি। الطِّهُوْر (بكسر الطاء) অর্থ- الة الطَّهارة তথা পবিত্রতা অর্জন করার পাত্র। যেমন- জগ, বদনা বা পানি রাখার যে কোন ধরনের পাত্র।

الطهور **এর পারিভাষিক অর্থ ঃ** ১. ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন-

نَظَافَةُ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخُبُثِ

অর্থাৎ শরীর, পরিধেয় বস্ত্র এবং স্থানকে নাপাকী থেকে মুক্ত রাখার নামই পবিত্রতা। ইবনে কুদামা বলেন-

الطهورُ فِي الشَّرْعِ رفعُ ما يَمْنَعُ الصلوٰةَ وَمَا فِي مَعْنَاها مِن حَدَثٍ ونَجَاسَةٍ بالمَاءِ ومَا فِي حُكْمِه كالتُّرابِ

অর্থাৎ শরীয়তের পরিভাষায় যে সব বিষয় নামায সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন উযূবিহীন হওয়া ও অপবিত্রতা। এ সব থেকে পানি বা তার বিকল্প মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে طهور বলে।

طهارة **দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ** আলোচ্য হাদীসে তাহারাত দ্বারা সে সব বিষয় থেকে পবিত্রতা অর্জন উদ্দেশ্য যে সব বিষয় নামায সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন উযূ বিহীন হওয়া। অপবিত্রতা ইত্যাদি। (শরহে নাসায়ী ১/১৯৯)

سوال : كَمْ قِسْمًا لِلطَّهَارَةِ؟ بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ

প্রশ্ন ঃ طهارة কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

উত্তর ঃ الطهارة **এর প্রকারভেদ ঃ** আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র) এর মতে, তাহারাত দুই প্রকার। যেমন-

১. طهارة ظاهرى ঃ বাহ্যিক পবিত্রতা। যেমন মলমূত্র ইত্যাদি নাপাকী থেকে শরীর, পরিধেয় বস্ত্র ও স্থানকে উযূ গোসল বা ধৌত করার মাধ্যমে পবিত্র করা।

২. طهارة باطنى ঃ অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, যেমন- শরীয়ত বিরোধী আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা থেকে আত্মাকে পবিত্র ও মুক্ত রাখা।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) বলেন, তাহারাত তিন প্রকার। যথা-

১. দেহের বা কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করা।

২. শরীর থেকে নিঃসৃত অপরিচ্ছন্নতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা।

৩. হদস থেকে পবিত্রতা অর্জন করা।

ইমাম গাযালী (র) এর মতে, তাহারাত ৪ প্রকার। যেমন-

১. অপবিত্র বস্তু ও ময়লা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা।

২. শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে রাখা।

৩. কু-চিন্তা থেকে মনকে পবিত্র রাখা।

৪. শিরক থেকে মনকে পবিত্র রাখা।

হাদীস সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা

ابى والمليح **এর পরিচয় :** কেউ কেউ বলেন, তার নাম আমের। কেউ বলেন তার নাম যায়েদ। তার পিতার নাম উসামা ইবনে উমায়ের হুযালী রাসবী। তিনি সিকা (নির্ভরযোগ্য) রাবী ছিলেন। আলোচ্য হাদীসটি তার পিতা উসামা ইবনে উমায়ের সাহাবী থেকে রেওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি এ ব্যাপারে মুতাফার্রিদ বা একক রাবী।

سوال : ما هو حكم الصلاة بغير الطهارة؟

প্রশ্ন : পবিত্রতা বিহীন নামাযের বিধান কি?

উত্তর : পবিত্রতা বিহীন নামাযের হুকুম : এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, নামায শুদ্ধ হবার জন্য পবিত্রতা অতীব জরুরী। কেননা, এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে নিম্নোক্ত নির্দেশ লক্ষণীয়-

١. اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين .
٢. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا جنبا
٣ . لا تقبل صلاة بغير طهور
٤. مفتاح الصلوة الطهور

ইমাম মালেক (র) বলেন, তার বিবেচনায় কেউ পবিত্রতা ব্যতীত নামায আদায় করলে সে বাহ্যিকভাবে দায়মুক্ত হবে কিন্তু তা কবুল হবে না। আসলে ইমাম মালেক (র) একথা বুঝাতে চাননি যে, পবিত্রতা ব্যতীত নামায হবে বরং তার দৃষ্টিতে بغير طهارة কোন ব্যক্তি সালাতে দাঁড়াতে পারবে না। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, একান্ত ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি বিনা উযূতে নামায আদায় করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। (শরহে নাসায়ী : ১/২০১)

سوال : هل تجوز صلاة الجنازة وسجدة التلاوة بغير طهور ام لا؟ وما الاختلاف فيه؟

প্রশ্ন : উযবিহীন জানাযার নামায ও সাজদায়ে তিলাওয়াত বৈধ কি না? এ ব্যাপারে মতভেদ কি?

উত্তর : জানাযার নামায ও তিলাওয়াতের সাজদা উযূ ব্যতীত বৈধ কি-না : জানাযার নামায ও তিলাওয়াতের সাজদা উযূবিহীন আদায় করা বৈধ কি না এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

জানাযার নামাযের ব্যাপারে ইমামদের মতপার্থক্য : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, বুখারী তথা জুমহুর আলেমদের নিকট জানাযার নামায পবিত্রতা ছাড়া আদায় করা বৈধ হবে না।

দলীল : হাদীসে মুতলাকভাবে صلاة শব্দ উল্লেখ রয়েছে যা সকল নামাযকে বুঝায়। যেমন-
لاتقبل صلاة بغير طهور
কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে- اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم

কারো কারো মতে জানাযার নমাযের জন্যে طهارة শর্ত নয়। কেননা, এ নামায দুয়ার মত। দুয়া যেমন পবিত্রতা ছাড়াই করা যায় তেমনি জানাযার নামাযও পবিত্রতা ছাড়া আদায় করা যায়। তারা ইমাম শাফেয়ী (র) এর দিকে একথার নিসবত করে থাকেন, এটা তাদের ধারণা মাত্র। তবে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে الجنازة على الغائب এর জন্যে পবিত্রতা শর্ত নয়।

তিলাওয়াতের সাজদা সম্পর্কে মতভেদ

১. ইমাম বুখারী ও শাবী (র) এর মতে, তিলাওয়াতের সাজদা তাহারাত ছাড়াই শুদ্ধ হবে। তাদের দলীল হল-
عن ابن عمر (رض) انه كان يسجد على غير وضوء

২. ইমাম চতুষ্টয় বলেন, তিলাওয়াতের সাজদার জন্যে তাহারাত ওয়াজিব। তাহারাত ছাড়া তিলাওয়াতের সাজদা আদায় করা বৈধ হবে না। কেননা, সাজদা হল নামাযের একটি বিশেষ অংশ। নামায যেমন তাহারাত ছাড়া বৈধ নয়। তদ্রুপ তিলাওয়াতের সাজদাও তাহারাত ছাড়া বৈধ নয়। তারা ইমাম বুখারীর দলীলের জবাবে বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এর হাদীসটি মাওকুফ, যা কুরআন ও হাদীসে মারফূ এর মোকাবেলায় গ্রহণযোগ্য নয়। (শরহে নাসায়ী : ১/১৯৫)

সাহেবাইনের কিয়াস ঃ সাহেবাইন (র) তাদের মতকে দুটি ইজমায়ী মাসআলার উপর ভিত্তি করে পেশ করেছেন।

১. হায়েযা মহিলার রোযার উপর কিয়াস ঃ এটা একটি ইজমায়ী মাসআলা যে, যদি রমযান মাসে কোন মহিলা হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তাহলে সে রমযান মাসের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস থাকবে। এটা রোজাদার ব্যক্তিদের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য। অতঃপর পরবর্তীতে তার কাযা আদায় করবে। যেমন– রাসূলের বাণী– فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ দ্বারা বুঝা যায়।

২. হজ্জের উপর কিয়াস ঃ এ ব্যাপারে সকল ইমামগণ একমত যে, যদি কেউ ইহরাম অবস্থায় সহবাস করে ফেলে তাহলে তার হজ্জ ফাসেদ হয়ে যাবে। এর দলীল হল ইবনে ওমরের ফাতওয়া, তাকে জিজ্ঞাসা করা হল ইহরাম অবস্থায় কেউ যদি তার বিবির সাথে সহবাস করে ফেলে তাহলে তার হজ্জের হুকুম কি হবে? তিনি বলেন, তার হজ্জ ফাসেদ হয়ে যাবে। কিন্তু সে অন্যান্য হজ্জ পালনকারী লোকদের ন্যায় হজ্জের বিধানাবলী পালন করবে এবং আগামি বৎসর হজ্জের কাযা আদায় করে নিবে। এটাই হযরত আলী, হযরত উমর, ইবনুল আস, আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস (রা) এর বক্তব্য। মোটকথা, রমযানে যদি কোন মহিলা হায়েজা হয় এবং কোন নাবালেগ বালেগ হয় তাহলে তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযাদার ব্যক্তিদের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষার্থে উপবাস থাকবে। অনুরূপভাবে হাজী ব্যক্তির সহবাসের কারণে হজ্জ নষ্ট হলে হজ্জের বাকী কাজ অন্যান্য হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তির ন্যায় পালন করবে। তবে আগামী বৎসর পুনরায় তার কাজা আদায় করে নেবে, ঠিক অদ্রূপ فَاقِدَةُ الطَّهُورَيْن ব্যক্তি ও মুসল্লির সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে এবং পরবর্তীতে তা কাযা করে নেবে। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ২২৫)

لَا يُقْبَلُ صَلَاةٌ ঃ আলোচ্য হাদীসে صلوة শব্দটি নাকেরা যা নফীর অধীনে এসেছে, আর নাকেরা যখন নফীর অধীনে আসে তখন عموم এর ফায়দা দেয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল অপবিত্র অবস্থায় কোন ধরণের নামাযই বৈধ নয়। চাই এটা فاقد الطهورة এর সুরতে হোক কিংবা অন্য কোন সুরতে হোক।

পরে কাযা আদায় করতে বলার কারণ ঃ আহনাফগণ পরবর্তীতে কাযা করতে বলার কারণ হল রাসূলের হাদীস دَيْنُ اللّٰهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضٰى - যেহেতু সে ঐ সময় নামায আদায় করেনি। অথচ নামায আদায় করা তার জন্য অপরিহার্য ছিল। এ জন্য কাযা আদায় করতে হবে।

একটি আপত্তি ও তার সমাধান ঃ

প্রশ্ন ঃ আপনারা بناء صلوة এর মাসআলার ক্ষেত্রে যখন নামায আদায়কারী ব্যক্তি হদসগ্রস্থ হয় তখন আপনারাও বলেন পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত নামায শুদ্ধ হবে। অথচ উল্লেখ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় নামাযের কোন অংশ পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত শুদ্ধ হবে না?

উত্তর ঃ بناء على الصلوة এর সূরতে অপবিত্র অবস্থায় তো কোন নামায আদায় করা হচ্ছে না, কারণ সে যতটুকু নামায আদায় করেছে তা পবিত্র অবস্থায়ই করেছে এবং بناء ও পবিত্রতার সাথে হয়েছে। কাজেই অপবিত্র অবস্থায় কোন নামায আদায় করা হল না। কিন্তু কেউ আসা যাওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে। এর উত্তর হল আসা-যাওয়া জরুরতের কারণে বৈধ। যেমন صلوة خوف এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর এ ব্যাপারে হাদীসও রয়েছে ।

عن عائشة ... مَنْ أَصَابَهُ قَيْئٌ أَوْ رُعَافٌ .... فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلٰى صَلٰوتِهِ وَهُوَ فِي ذٰلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ

আব্দুর রাজ্জাক, ইবনে আবী হাতেম, দারাকুতনী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। হাদীসটি মুরসাল। আর প্রমাণের ক্ষেত্রে ইমাম মালেক ও আবু হানীফা (র) এর নিকট মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য। (মাআরিফুস সুনান ঃ ১/৩২)

বৈপরীত্যের সমাধান ঃ ফকীহগণ বলেন, হারাম সম্পদ সদকা করে সাওয়াবের আশা রাখা হারাম। আর কেউ বলেন তাকে সওয়াব দেয়া হবে। এর সমাধান হল যারা বলেন, সওয়াবের আশা রাখা হারাম তাদের উদ্দেশ্য হল হারাম সম্পদ সদকা করা। আর এটা বাস্তবিকই হারাম। আর যারা বলেন, সওয়াব দেয়া হবে তাদের উদ্দেশ্য হল শরীয়তের বিধান পালনের কারণে সওয়াব দেয়া হবে, হারাম সম্পদ সদকা করার কারণে নয়। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ২২৬)

الْاِعْتِدَاءُ الْوُضُوْءِ

١٤٠. اخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيانُ عن موسى بنِ ابى عائشة عن عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جده قال جاء أعرابيٌّ الى النبيّ ﷺ يسئله عن الوضوءِ فأراه الوضوءَ ثلثًا ثلثًا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساءَ وتعدى وظلم -

উযূতে সীমালঙ্ঘন

অনুবাদ ঃ ১৪০. মাহমুদ ইবনে গায়লান (র)...........আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাঁকে উযূ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে উযূর অঙ্গ তিন তিনবার ধৌত করে দেখালেন। আর বললেন, উযূ এরূপেই করতে হয়। যে ব্যক্তি এর উপর বাড়ালো সে অন্যায় করল, সীমালঙ্ঘন ও জুলুম করল।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

উযূর কার্যাবলী আমলীভাবে পালন করার হিকমত ঃ বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার থেকে বাস্তবে শিক্ষা দিলে সহজে বুঝে আসে এবং জেহেনে খুব উত্তমরূপে গেঁথে যায়। কারণেই নবী (স) গ্রাম্য ব্যক্তিকে আমলের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন এবং মাথা মাসেহ ব্যতীত উযূর প্রত্যেক অঙ্গকে তিন তিনবার করে ধৌত করেছেন। অতঃপর বলেন, যেটা তুমি অবলোকন করলে এটাকেই পূর্ণাঙ্গ অযু বলা হয়।

উযূর কার্যাবলীতে হ্রাস বৃদ্ধি ঃ হুজুর (স) বাস্তবে উযূর বিধান শিক্ষা দিয়ে বলেন, এটাই পূর্ণাঙ্গ উযূ। সুতরাং কেউ যদি তাতে কোন কিছু বৃদ্ধি করে তাহলে সে নিন্দনীয় কাজ করলো কেননা, সে সুন্নতকে ত্যাগ করে নির্ধারিত সীমা ছেড়ে গেছে। পূণ্য কম হওয়ার কারণে নিজের উপর জুলুম করেছে এবং নবী (স) উযূর বিধান হ্রাস বৃদ্ধিকারী ব্যক্তির তিরস্কার করার জন্য তিনটি শব্দ উল্লেখ করেছেন। اساء . تعدى . ظلم মোটকথা, হাদীস থেকে জানা গেলো যে, উযূতে ধৌত করা অঙ্গগুলোকে তিনবার ধৌত করা উচিৎ। কেননা এর থেকে অতিরঞ্জনকারীর জন্য সতর্কবাণী এসেছে।

উলুমে হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসের মতন নিয়ে পর্যালোচনা

মাহমুদ ইবনে গয়লান এর সূত্রে নাসায়ী শরীফের মধ্যে যে রেওয়ায়াত এসেছে এটা সংক্ষিপ্ত। এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে আবু দাউদ সহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবসমূহে। নাসায়ীতে শুধুমাত্র فمن زاد এর উপর ক্ষান্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজাহও অনুরূপ রেওয়ায়াত করেছেন। ইবনে খুযাইমাও এটাকে সহীহ সাব্যস্ত করে স্বীয় সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মোটকথা نقص শব্দটি তাদের রেওয়ায়াতে নেই। কিন্তু আবু দাউদ সহ অন্যান্য কিতাবে نقص শব্দটি বর্ধিত রয়েছে। উলামায়ে কিরামের অনেকেই এটাকে মুশকিল মনে করেছেন। কারণ তিনবারের কম ধৌত করার দ্বারা গোণাহগার হতে হয়। অথচ অংসখ্য হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, হুজুর (স) কখনো কখনো উযূতে অঙ্গগুলো একবার ধৌত করেছেন। অন্য দিকে কোনো রেওয়ায়াতে এসেছে যে, যে ব্যক্তি অঙ্গগুলোকে দুই বার ধৌত করবে তাকে দ্বিগুন সওয়াব প্রদান করা হবে। এদিকে نقص সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়াতে এসেছে যে, অঙ্গগুলো তিন বারের কম ধৌতকারী ব্যক্তি জালেম, সীমালঙ্ঘনকারী ও অন্যায়কারী হিসাবে বিবেচিত হবে। এক, দুই বার ধৌত করার বিধান হাদীসে উল্লেখ থাকাই এই ধমক সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়াতের আলিমগণ বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা করেছেন।

বৈপরিত্যের সমাধানে আলিমগণের বক্তব্য

আলোচ্য হাদীস দ্বারা জানা যায় তিনবারের কম উযূর অঙ্গ ধৌতকারী ব্যক্তি জালিম, সীমালঙ্ঘনকারী ও অন্যায়কারী অথচ হাদীসের অন্যান্য রেওয়ায়াত দ্বারা প্রামাণিত যে, রাসূল (স) কখনো কখনো উযূর অঙ্গগুলোকে একবার, কখনো দুইবার ধৌত করেছেন। এই বৈপরীত্ব সমাধান কল্পে উলামাগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে থাকেন।

১. ইমাম মুসলিম (র) আলোচ্য হাদীসের সনদ সহীহ বলা সত্ত্বেও আমর ইবনে শোয়াইবকে মুনকার রাবীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা, আলোচ্য হাদীস দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝে আসে যে, যদি কেউ তিনবারের কম দুই অথবা একবার আঙ্গুলগুলো ধৌত করে তাহলে তার ক্ষেত্রেও উল্লেখিত তিরস্কার প্রযোজ্য হবে। অথচ স্বয়ং নবী (স) এমনটা করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী সহ মুহাক্কিক উলামার এক জামাত বলেন, হাদীসে ইবারত উহ্য রয়েছে। মূলতঃ বাক্যটি হল فَمَنْ نَقَصَ شَيْئًا مِّنْ وَاحِدَةٍ অর্থাৎ ফরয আদায়ের যে স্তর রয়েছে তথা একবার একবার করে ধৌত করা কেউ যদি এর থেকে কম করে উদাহরণ স্বরূপ নখ বরাবর জায়গা উযূতে শুষ্ক রেখে দেয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে উল্লেখিত ধমক প্রযোজ্য হবে। এর সমর্থন হয় নুয়াইম ইবনে হাম্মাদের রেওয়ায়াত দ্বারা। তিনি مطلب بن حنطب এর সূত্রে مرفوعا বর্ণনা করেন–

الوضوءُ مَرَّةٌ مرةٌ ومَرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ وثلاثًا فإنْ نَقَصَ مِن وَاحِدَةٍ او زَادَ عَلَى ثَلاثٍ فَقَدْ أَخْطَأَ

এটা মুরসাল রেওয়ায়াত তবে এর রাবীগণ সকলে নির্ভরযোগ্য, এই রেওয়ায়াত দ্বারা দুটি জিনিস বুঝা যায়।

১. তিনের থেকে বেশিবার ধৌত করলে সীমালঙ্ঘন হবে। আর এক বারের কম ধৌত করার দ্বারা জুলুম ও অন্যায়কারী হিসাবে বিবেচিত হবে।

২. এ হাদীস থেকে আমর ইবনে শোয়াইবের রেওয়ায়াতের আরেকটি জিনিস ও বুঝে আসে আর তা হল زاد এর সম্পর্ক হল تَعَدَّى এর সাথে। আর نقصان এর সম্পর্ক হল ظلم এর সাথে।

৩. এটাও বলা যেতে পারে যে نَقَصَ সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়াতটি হল معلول কেননা, সকল রাবী نقص শব্দ উল্লেখ করার ব্যাপারে একমত নয়। পক্ষান্তরে فَمَنْ زَادَ শব্দ উল্লেখ করার ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবী একমত এবং ইমাম আহমদ, ইবনে খুযাইমা, ইবনে মাজাহ প্রমূখ এটাকে রেওয়ায়াত করেছেন।

কে শাস্তির যোগ্য ঃ উল্লেখ্য তাকরীর দ্বারা বুঝা যায় হ্রাস-বৃদ্ধিকারী তিরস্কারের উপযুক্ত, এখন এ হ্রাস-বৃদ্ধি করার সম্পর্ক ১. উযূর অঙ্গগুলোর ক্ষেত্রেও হতে পারে। আবার ২. সংখ্যার ক্ষেত্রেও হতে পারে।

প্রথম সুরত যেমন উযূর অঙ্গগুলো যতটুকু পরিমাণ ধৌত করার বিধান। কেউ যদি উক্ত পরিমাণের থেকে কম পরিমাণ ধৌত করে অথবা বেশী পরিমাণ ধৌত করে যেমন– কেউ হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলো না বরং তার থেকে কম পরিমাণ ধৌত করল অপরদিকে আরেকজন বগল পর্যন্ত ধৌত করলো, তাহলে উভয় হ্রাস বৃদ্ধিকারীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

দ্বিতীয় সুরত সংখ্যার ক্ষেত্রে অর্থাৎ কেউ উযূর অঙ্গগুলো তিনবারের বেশী ধৌত করলো। আবার কেউ একবারের কম ধৌত করলো তাহলে সে হ্রাস-বৃদ্ধিকারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে শাস্তির যোগ্য হবে।

কিন্তু "বাদায়ে" গ্রন্থকার বলেন, বিশুদ্ধ কথা এটাই যে, এটা اعتقاد এর উপর প্রযোজ্য نفس عمل এর উপর নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি তিনবার থেকে বেশী ধৌত করে অথবা এর থেকে কম ধৌত করে এই ধারণায় যে, সে তিনবার ধৌত করাকে সুন্নত মনে করেনা। তাহলে সে শাস্তিরযোগ্য হবে। কেননা, সে এটাকে সুন্নত মনে করে না। আর যে ব্যক্তি রাসূল (স) এর সুন্নত এর উপর ই'তিকাদ রাখে না সে বেদআতি। আর বেদআতি ব্যক্তি ধমকী ও শাস্তির যোগ্য। কিন্তু কেউ যদি তিনবার ধৌত করা সুন্নত এর ই'তিকাদ রাখে কিন্তু আমল করার সময় কখনো তিন বার থেকে বেশী আবার কখনো কম করে তাহলে, সে শাস্তি ও ধমকির যোগ্য হবে না। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ১২৭-১২৮)

الامرُ بِاسْبَاغِ الوُضُوءِ

١٤١. اخبرَنا يحيى بنُ حبيبِ بنِ عَرَبِيٍّ قال حَدَّثَنا حمَّادٌ قال حدَّثَنا ابو جَهْضَمٍ عَن عبدِ اللّٰه بنِ عُبيدِ اللّٰه بنِ عبّاسٍ قال كُنّا جُلُوسًا إلى عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عبّاسٍ فقال واللّٰهِ ما خصَّنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ الاّ بِثَلٰثَةِ اَشْيَاءَ فانّه امَرَنا اَن نُسْبِغَ الوُضُوءَ ولا نَاكُلَ الصَّدَقَةَ ولا نُنزِي الحُمُرَ على الخَيْلِ -

١٤٢. اخبرَنا قُتَيْبَةُ قال حدَّثنا جريرٌ عَن منصورٍ عَن هلالِ بنِ كسَّافٍ عَن اَبي يحيى عَنْ عَبْدِ اللّٰه بنِ عمرٍو قال قالَ رسولُ اللّٰه ﷺ اَسْبِغُوا الوُضُوءَ -

পূর্ণরূপে উযূ করার আদেশ

অনুবাদ ঃ ১৪১. ইয়াহইয়া ইবনে হাবীব (র)....... আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, অন্য লোকদের বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স) তিনটি বিষয় ব্যতীত আমাদের বিশেষভাবে কোন বিষয়ে বলেননি– ১. তিনি আমাদের পূর্ণরূপে উযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন, ২. আমাদের সাদ্‌কা খেতে নিষেধ করেছেন, এবং ৩. নিষেধ করেছেন গাধাকে ঘোড়ার উপর পাল দিতে।

১৪২. কুতায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা পূর্ণরূপে উযূ করবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : حكم إسباغِ الوُضوء مُختصٌّ بِاهلِ البَيْتِ امْ لا بَيِّنْ مفصّلاً

প্রশ্ন ঃ পূর্ণাঙ্গরূপে উযূ করার বিধান নবী পরিবারের সাথে খাস না কি অন্যান্য লোকও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ اسباغ الوضوء **এর সংজ্ঞা ঃ** اسباغ الوضوء বলা হয়, ঐ উযূকে যাতে উযূর সমস্ত ফরয, নফল, ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। নবী (স) আহলে বাইতের প্রতি লক্ষ্য করে পূর্ণাঙ্গরূপে উযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এ নির্দেশটা وجوبى না استحبابى ?

১. আহলে বাইতের জন্য পূর্ণাঙ্গরূপে উযূ করার নির্দেশ উজুবী ছিল এবং এটা তাদের সাথে খাস আর অন্যদের জন্য মুস্তাহাব।

২. অথবা, এ নির্দেশ দ্বারা মুস্তাহাবই উদ্দেশ্য কিন্তু আহলে বাইতের জন্য এটা মুস্তাহাবে মুওয়াক্কাদ। আর অন্যদের জন্য মুস্তাহাবে গাইরে মুওয়াক্কাদ, এর দ্বারাও আহলে বাইতের اختصاص। সাব্যস্ত হয়। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ২২৯)

سوال : حكمُ إنزاء الحِمَار عَلَى الفَرَسِ مختصٌّ بِاَهْلِ البَيْتِ ام لا بيِّن موضِحًا

প্রশ্ন ঃ গাধাকে ঘোড়ার উপর পাল দেয়া নিষেধের বিধানটি আহলে বাইতের সাথে খাস না কি খাস নয়? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ إنزاء الحِمار على الفَرَس **এর বিধান ঃ** ১. গাধাকে ঘোড়ার উপর পাল দেয়ার বিধান আহলে বাইতের সাথে খাস। কাজেই তাদের জন্য এটা মাকরূহ অন্যদের জন্য নয়।

২. কেউ কেউ বলেন, এটা সকলের জন্য মাকরূহ, তবে অন্যদের তুলনায় আহলে বাইতের জন্য বেশী মাকরূহ তথা মাকরূহে তাহরীমী।

[বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

بَابُ الْفَضْلِ فِىْ ذٰلِكَ

١٤٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ -

অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণরূপে উযূ করার ফযীলত

অনুবাদ ঃ ১৪৩. কুতায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদের এমন বস্তুর সন্ধান দিব না যা দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা গুনাহসমূহ দূর করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? তাহলো কষ্টদায়ক অবস্থায়ও পূর্ণরূপে উযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা করা, আর এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষায় থাকা। এটাই রিবাত, এটাই রিবাত, এটাই রিবাত।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : شَرْحُ مَعْنَى الرِّبَاطِ بِحَيْثُ يَتَّضِحُ الْمَرَام

প্রশ্ন ঃ رباط শব্দের মর্মার্থ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ الرباط **এর অর্থ ও তার দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ** শব্দটি فعال এর ওযনে اسم مصدر - এর আভিধানিক অর্থ বাঁধা। যেমন বলা হয়। رَبَطَ الشَّيْءَ সুদৃঢ় করা, মজবুত করা। যেমন আল্লাহর বাণী- لَوْلَا اَنْ رَبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا কোন জিনিসের উপর অটল থাকা। যেমন বলা হয়- رَابَطَ عَلَى الشَّيْءِ اى وَاظَبَ

الرباط **এর পারিভাষিক অর্থ ঃ** জুমহুর মুহাদ্দেসীনের মতে رباط বলা হয়-

اَلْوُقُوْفُ فِى الْحُصُوْنِ وَمَوْضِعَ الْمَخَافَةِ بِالْاَسْلِحَةِ وَالْاَمْتِعَةِ مُقَابَلَةَ الْاَعْدَاءِ

অর্থাৎ রসদ ও অস্ত্র-শস্ত্রসহ শত্রুর মোকাবেলায় দূর্গ এবং ভীতিসঙ্কুল স্থানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করাকে رباط বলে। যেমন- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا

(পূর্বের পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

ইবনে আব্বাস (রা) এর হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, এ নিষেধাজ্ঞা আহলে বাইতের জন্য খাছ। অন্যদের জন্যও মাকরূহ তবে তা তাহরীমী নয় বরং তানযিহী।

এটাকে মাকরূহ বলার কারণ ঃ ১. কেউ কেউ বলেন, গাধাকে ঘোড়ার উপর পাল দিতে নিষেধ করার কারণ হল قطع نسل তথা ঘোড়ার বংশ শেষ হওয়ার আশংকা।

২. নিম্নমানের জিনিস খচ্চরের বিনিময়ে উন্নতমানের জিনিস ঘোড়া গ্রহণ করা।

প্রশ্ন ঃ গাধাকে ঘোড়ার উপর পাল দিয়ে খচ্চর তৈরী করতে নবী (স) নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় খচ্চর নিকৃষ্ট প্রাণী। অথচ নবী (স) খচ্চরের উপর আরোহণ করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াতে ইহসান ও অনুগ্রহের স্থানে খচ্চরের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন- وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ

এর দ্বারা বুঝা যায় গাধাকে ঘোড়ার উপর পাল দেয়া এবং খচ্চর বানানো মাকরূহ নয়।

উত্তর ঃ উক্ত মাসআলা হল ছবির ন্যায় তথা ছবি তৈরী করা হারাম। কিন্তু ছবিযুক্ত চাদর ইত্যাদি ব্যবহার করা বৈধ। ঠিক তদ্রূপ গাধাকে ঘোড়ার উপর পাল দেয়া তো মাকরূহ কিন্তু তার উপর আরোহণ করা মাকরূহ নয়। এ হাদীস দ্বারা শিয়া মতবাদ খণ্ডিত হয়ে যায়। কেননা, তারা বলে হুজুর (স) আহলে বাইতকে علوم مخصوصة এর সাথে খাস করেছেন। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ২২৯-২৩০)

২. অথবা, শরীয়তের পরিভাষায় رباط বলা হয়–

هُوَ مَوْضِعٌ مِنَ الثَّغْرِ يَلْزِمُهُ جَيْشُ الْمُسْلِمِيْنَ بِالْاَسْلِحَةِ وَالْاَمْتِعَةِ مُقَابِلَةَ الْاَعْدَاءِ . .

অর্থাৎ রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রসহ শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ কৃত সীমান্তের ঘাটিকে رباط বলা হয়।

رباط এর মর্মার্থ ঃ رباط শব্দটি رعاء এর ওযনে اسم اله سماعى এর সীগাহ। অভিধানে এর অর্থ হল-. مايربط به তথা বন্ধন উপকরণ, যেমন মৃত্যু নিশ্চিত ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়- اِنْقَرَضَ رِبَاطُهُ

২. সুরক্ষিত অবস্থান। যেমন কারো টলমল অবস্থায় তাকে বলা হয়- اِسْتَرْخَى رِبَاطُهُ

৩. পাঁচ বা ততোধিক উটের খোয়াড়। যেমন বলা হয় رِبَاطُ الابل

৪. ضمادة তথা পটি বন্ধন।

৫. موضع المخافة তথা ভয়াল স্থান, যেমন– رباط الجَيْش

আলোচ্য হাদীসে رباط দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে

১. আলোচ্য হাদীসে رباط বলে শয়তান এবং نفس امارة কে দমনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকারতে বলা হয়েছে।

২. অথবা, মসজিদের দিকে বেশি যাওয়া এবং এক নামাযের পর অপর নামাযের প্রতীক্ষায় থাকা। এ তিনটি কাজ করার ক্ষেত্রে শয়তান ও কু প্রবৃত্তির প্ররোচনার বিরুদ্ধে জিহাদ করার অর্থকেই رباط বলা হয়।

৩. অথবা এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের প্রতীক্ষায় থাকাকে বুঝানো হয়েছে।

৪. মসজিদের পানে অধিক হারে গমন করা।

৫. مَوضع المخافة তথা ভয়াল স্থান, যেমন– رباطُ الجَيْشِ

৬. অথবা, নীচের তিনটিকেই বুঝানো হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই فذٰلكم الرِّباط বহুবচন আনা হয়েছে। এগুলোকে এ জন্যেই رباط বলা হয়েছে যে, বাস্তবে এগুলোর মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি তার সবচেয়ে বড় শত্রু কাম, ক্রোধ, লালসা ও শয়তানের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ পূর্বক আত্মরক্ষা করতে পারে। (শরহে মিশকাত ঃ ১/২৪৪)

سوال : بيِّن اقوالَ الْاَئِمَّةِ فِى كَوْنِ الْوُضُوْءِ مُكَفِّرًا لِلذُّنُوْبِ

প্রশ্ন ঃ উযূ দ্বারা গুণাহ মোচন হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতামত বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ উযূ পাপ মোচনকারী হওয়া প্রসঙ্গে মনীষীদের বক্তব্য ঃ উত্তমরূপে উযূ করা, মসজিদে অধিক গমনাগমন এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্য প্রতীক্ষায় থাকার দ্বারা সকল গুণাহ মাফ হয়ে যায় কি না? এ বিষয়ে আলেমদের মতামত নিম্নরূপ–

১. জুমহুর উলামার অভিমত ঃ তাঁরা বলেন, উযূর মাধ্যমে কেবলমাত্র সগীরা গুণাহ মাফ হয়ে থাকে, যদি উযূ সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়। বস্তুত: اسباغ الوضوء দ্বারা এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, কবীরা গুণাহ তওবা করা ছাড়া ক্ষমা করা হয় না। যেমন ইরশাদ হয়েছে– اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ

অর্থাৎ যদি তোমরা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের মধ্য হতে কবীরা গুণাহসমূহ থেকে বিরত থাক তবে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবো। আরো হাদীসে ইরশাদ হয়েছে।

اَلصَّلٰوتُ الْخَمْسُ وَالْجمعةُ اِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ الى رَمَضَانَ مُكَفِّرات لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرِ .

হাফেজ ইবনে আব্দুল বার্র বলেন, উম্মতের ইজমা মতে উযূ দ্বারা শুধুমাত্র সগীরা গোণাহ মাফ হয়ে যায়।

২. কেউ কেউ বলেন, উযূ দ্বারা সগীরা গোণাহ এর সাথে কবীরা গোণাহও মাফ হয়। তাদের দলীল–

قال رسولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُوا اللّٰه بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرجات قَالُوا بَلٰى يا رسولَ الله قال اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

আলোচ্য হাদীসে কোন বিভাজন ছাড়া الخطايا শব্দ দ্বারা সর্বপ্রকার গুণাহকে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য حقوق العباد এর গোণাহ এর ব্যতিক্রম। কেননা, আল্লাহ তাআলা হলেন, ন্যায় বিচারক। তিনি বান্দার দাবী সম্পৃক্ত কোন গোনাহ স্বয়ং বান্দার মাফ করা ছাড়া কখনো ন্যায় বিচারের ব্যতিক্রম ঘটাবেন না।

দ্বিতীয় পক্ষের দলীলে জবাব ঃ দ্বিতীয়পক্ষের দলীলের জবাবে বলা যায় যে, আলোচ্য হাদীস ও এরূপ অন্যান্য রেওয়ায়াতকে عام مَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ এবং مَالَمْ يُؤْتَ كَبِيْرَةً সংযুক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা খাস করা হয়েছে। অর্থাৎ কবীরা গোণাহ হতে বিরত থাকলে তার দ্বারা সগীরা গোণাহ মাফ হয়ে যায়। (শরহে মিশকাত ১/২৪৩)

سوال : حَقِّق معنَى اِسْبَاغِ الوُضُوْء مَعَ بيانِ تقسيمِ الْاِسْبَاغِ ثم اكْتُبْ مرادَ اِسْبَاغِ الوُضُوْء علَى المَكَارِه

প্রশ্ন ঃ اِسْبَاغُ الوضوء **এর প্রকারভেদ সহ এর অর্থ বিশ্লেষণ কর। অতঃপর** اسباغُ الوُضُوء علَى المَكَارِه **এর মর্মার্থ বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ اسباغ الوضوء **এর শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ** اسباغ শব্দটি سبغ ধাতু শব্দ থেকে গঠিত, বাবে افعال এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ।

১. কাপড় প্রশস্ত করা, যেমন– الثوب।
২. কোন বস্তু সম্প্রসারিত করা। যেমন– أَسْبَغَ الشَّيْءَ
৩. কোন বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করা। যেমন– أَسْبَغَ الغُسْلَ
৪. কারো জন্যে প্রশস্ততার সাথে খরচ করা। যেমন– أَسْبَغَ لَهُ النَّفَقَةَ
৫. কাউকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুদান প্রদান করা। যেমন– أَسْبَغَ عَلَيْهِ النِّعْمَةَ

اِسْبَاغُ الوُضُوْء **এর অর্থ ঃ** উল্লেখিত আভিধানিক অর্থসমূহের অনুকূলে اِسْبَاغُ الوضوء এর অর্থ হল উযূর যাবতীয় ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত কার্যাবলী আদায় করার মাধ্যমে তা পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পাদন করা।

اسباغ الوضوء নিম্ন লিখিত পর্যায়ে বিভক্ত–

১. إسباغ الوضوء فى الغسل ঃ প্রতিটি অঙ্গ যথাযথ প্রক্ষালন করত: এমনভাবে ধৌত করা যাতে কোন অঙ্গ শুকনো না থাকে।

২. اسباغ الوضوء فى تعداد الغسل ঃ প্রতিটি অঙ্গ একবার ধৌত করা ফরয এবং দুবার ধৌত করা সুন্নত, আর তিনবার ধৌত করা اسباغ الوضوء গণ্য।

৩. اسباغ الوضوء فى التطويل ঃ প্রতিটি অঙ্গ ধৌতকরণে একটি সীমারেখা নির্ধারিত আছে। কিন্তু কোন আংশ বাদ পড়া থেকে সাবধানতা বশতঃ অঙ্গসমূহের উর্ধ্বে বাড়তি ধৌত করা اسباغ الوضوء এর অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত আছে হযরত আবু হুরায়রা রা. হাত ধোয়ার সময় বাহুদেশের নিম্ন পর্যন্ত ধৌত করতেন।

৪. اسباغ الوضوء باداء الاحكام ঃ অর্থাৎ উযূর যাবতীয় ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত কার্যাদি যথাযথ পালন করা। (শরহে নাসায়ী ১/২০-৩-২০৪)

اسباغ الوضوء عَلَى المَكَارِه **এর মর্মার্থ ঃ** আলোচ্য হাদীসে اسباغ الوضوء على المكاره অর্থ হল কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে উযূ করা। উযূর প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য মহানবী (স) এ কথাটি বলেছেন। এখানে اسباغ শব্দটি বাবে افعال এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ পরিপূর্ণ করা, যথাযথভাবে পালন করা। এর মর্মার্থ নিম্নরূপ–

১. اسباغ الوضوء হচ্ছে উযূর সমস্ত ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব কাজগুলোকে যথাযথভাবে আদায় করা। অর্থাৎ উযূর সময় প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে তিন তিন বার ধৌত করা।

২. আবার কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেন, যে পরিমাণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত না করলে নামায আদায় হয় না তাই اِسْبَاغُ الوُضُوء আর المَكَارِهُ শব্দটি বহুবচন, এর একবচন مَكْرَهٌ মূল বর্ণ হচ্ছে (ك . ر . ه) শাব্দিক অর্থ المَشَقَّة।

বা কষ্ট, ব্যাথা, যন্ত্রণা। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা তীবী বলেন, পানি খুব সহজে পাওয়া যাচ্ছে না বা পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু চড়া দাম, এ অবস্থায় তায়াম্মুম না করে উযূ করা مَكَارِه এ শামিল।

কারো কারো মতে, পানি যদি খুব ঠান্ডা হয় এবং তা ব্যবহার খুব কষ্টসাধ্য হয়, কিংবা যদি শীতের মৌসূমে হয় তাহলে এ অবস্থাসমূহকে مَكَارِه বলে। মোটকথা, উল্লেখিত সকল অবস্থায় কষ্ট শিকার করে ভালভাবে উযূ করাকে إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِه বলা হয়। (শরহে মিশকাত ঃ ১/২৪৩)

سوال : مَاالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ؟

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) এর উক্তি كثرة الخُطَا الى المَسَاجِد **এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?**

উত্তর ঃ كثرة الخطى الى المساجد **দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ** এর শাব্দিক অর্থ হল মসজিদের দিকে গমনাগমনে অধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। হাদীস বিশারদগণ كَثْرَةُ الْخُطٰى إِلَى الْمَسَاجِدِ এর নিম্নোক্ত অর্থ পেশ করেছেন– ১. মসজিদ থেকে দূরাবস্থানে বসবাস করে তথা হতে যথাসময়ে মসজিদে যাতায়াত করা। এ জন্যেই বনী সালামার লোকেরা যখন মসজিদের নিকটে স্থানান্তরিত হতে চেয়েছিল তখন রাসূল (স) তাদেরকে বললেন دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ অর্থাৎ তোমাদের যাতায়াতের পদক্ষেপসমূহ আমলনামায় লেখা হচ্ছে।

২. বাড়ী কাছে হলে মসজিদের দিকে ঘুর পথে যাতায়াত করা যাতে পদক্ষেপ ও সওয়াব বেশী হয়।

৩. ফরয ও নফল নামাযের জন্যে ঘন ঘন যাতায়াত করা।

৪. জামায়াতের সময় হাতে রেখে ধীর কদমে অধিক পদক্ষেপে মসজিদে যাতায়াত করা এবং এক পথে আসা ও অন্য পথে বাড়ী ফিরে যাওয়া।

৫. নামায কিংবা অন্য কোনো ইবাদতের জন্য বেশী বেশী মসজিদে গমন করা।

৬. দূর থেকে মসজিদে আসা। কারণ এতে কদম বেশী পড়ে। এ ব্যাপারে মেরকাত প্রণেতা বলেন–

كَثْرَةُ الْخُطٰى إِلَى الْمَسَاجِدِ إِمَّا لِبُعْدِ الدَّارِ او عَلَى سَبِيلِ التَّكْرَارِ وَلَادَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى فَضْلِ الدَّارِ الْبَعِيدَةِ عنه وَالْقَرِيبَةِ منه كَمَا ذَكَرَه ابْنُ حجر فانّه لا فَضِيلَةَ لِلْبُعْدِ فِي ذَاتِه بَلْ فِي تحمُّلِ الْمَشَقَّةِ

অর্থাৎ দূর হতে মসজিদের দিকে গমন করা অথবা পুনঃ পুনঃ মসজিদে যাওয়া। তবে ঘর বাড়ী মসজিদ হতে দূরে হলেই যে সাওয়াব বেশী পাওয়া যাবে এমনটি নয়। ইবনে হাজার আসাকালানীও এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মূলত ঘর হতে মসজিদের পথ দূরের কারণে অধিক পথ অতিক্রম করলে যেরূপ অধিক সওয়াব হতো তদ্রুপ ঘর বাড়ি মসজিদের কাছে হলেও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করার লক্ষ্যে মন্থরগতিতে পথ অতিক্রম করলে অনুরূপ সওয়াব পাওয়া যাবে। (শরহে মিশকাত ঃ ১/২৪৩)

سوال : ما المرادُ بِقَوْلِه عليه السلام إِنْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بعدَ الصَّلٰوةِ

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) এর বাণী إِنْتِظَارُ الصلوة بعدَ الصلوة **দ্বারা উদ্দেশ্য কি?**

উত্তর ঃ এক নামায শেষে অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকার দ্বারা উদ্দেশ্যএই নয় যে, মসজিদে বসে বসে নামাযের অপেক্ষা করতে হবে, বরং এর অর্থ হল আল্লাহর ফরয আদায় করার জন্য সর্বদা তৎপর থাকা। যেন কোনো অবস্থায় নামায ছুটে যেতে না পারে। নামায শেষে মসজিদের বাইরে দুনিয়ার কাজ কর্মে লিপ্ত হলেও মন সর্বদা মসজিদের দিকে লেগে থাকতে হবে। إِنْتِظَارُ الصلوٰة بعدَ الصَّلوٰة বলতে এটাকেই বুঝানো হয়েছে। (শরহে মিশকাত : ১/২৪৪)

ثوابُ مَنْ توضَّأ كما أُمِرَ

١٤٤. اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابى الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي انهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا الى معاوية وعنده ابو ايوب وعقبة بن عامر فقال عاصم يا ابا ايوب فاتنا الغزو العام وقد اخبرنا انه من صلى في المساجد الاربعة غفر له ذنبه فقال يا ابن اخي ادلك على ايسر من ذلك اني سمعت رسول الله ﷺ يقول من توضأ كما امر وصلى كما امر غفر له ماتقدم من عمل اكذلك ياعقبة؟ قال نعم!

١٤٥. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن ابان اخبر ابا بردة في المسجد انه سمع عثمان يحدث عن رسول الله ﷺ يقول من اتم الوضوء كما امره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن -

١٤٦. اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن حمران مولى عثمان ان عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول مامن امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلوة الا غفر له مابينه وبين الصلوة الاخرى حتى يصليها -

١٤٧. اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا ادم بن ابى اياس قال حدثنا الليث هو ابن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال اخبرني ابو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وابو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا ابا امامة الباهلي يقول سمعت عمرو بن عبسة يقول قلت يا رسول الله ﷺ كيف الوضوء قال اما الوضوء فانك اذا توضأت فغسلت كفيك فانقيتهما خرجت خطاياك من بين اظفارك وانامِلك فاذا مضمضت واستنشقت منخريك وغسلت وجهك ويديك الى المرفقين ومسحت راسك وغسلت رجليك الى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فان انت وضعت وجهك لله عزوجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك امك قال ابو امامة فقلت ياعمرو بن عبسة انظر ما تقول اكل هذا يعطى في مجلس واحد فقال اما والله لقد كبرت سني ودنا اجلي وما بي من فقر فاكذب على رسول الله ﷺ ولقد سمعته اذناي ووعاه قلبي من رسول الله ﷺ

নির্দেশ মুতাবিক উযূ করার সওয়াব

অনুবাদ ঃ ১৪৪. কুতায়বা ইবনে সা'ঈদ (র)......... আসিম ইবনে সুফিয়ান সাকফী (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা 'সালাসিল' যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন কিন্তু যুদ্ধ করার সুযোগ পান নি। পরে তাঁরা শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত রইলেন এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তাঁর নিকট আবূ আইয়ূব এবং উকবা ইবনে আমির ছিলেন। তখন আসিম বললেন, আবু আইয়ুব! এ বৎসর আমরা যুদ্ধের সুযোগ

পেলাম না। আর আমাদের সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি চারটি মসজিদে নামায আদায় করবে তার পাপ মার্জনা করা হবে। তিনি বললেন, ভাতিজা! আমি কি তোমাকে এর চেয়ে সহজতর পন্থা বলে দেব না? আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি নির্দেশ মুতাবিক উযূ করবে, আর নির্দেশ মুতাবিক নামায আদায় করবে তার পূর্বেকার পাপ ক্ষমা করা হবে। সত্যিই কি তাই উক্‌বা? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাই।

১৪৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আ'লা (র)........ হুমরান ইবনে আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু বুরদা (র)-কে মসজিদে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি উসমান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবেক উযূ সম্পন্ন করবে, তার পাঁচ ওয়াক্ত নামায এর মধ্যবর্তী সময়ের পাপসমূহের জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ গণ্য হবে।

১৪৬. কুতায়বা (র).........উসমান (রা)-এর আযাদকৃত দাস হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে উযূ করে এবং পরে নামায আদায় করে তার এ নামায ও পরবর্তী নামায আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ের পাপ মাফ করে দেয়া হবে।

১৪৭. আমর ইবনে মনসুর (র)..........মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু ইয়াহয়া সুলাইম ইবনে আমির, যমরাহ ইবনে হাবীব এবং আবু তালহা নুয়াইম ইবনে যিয়াদ (র) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমরা আবু উমামা বাহিলী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি আমর ইবনে আবাসা (রা)-কে বলেন; আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উযূ কিরূপে করতে হয়? তিনি বললেন, উযূ! তুমি যখন উযূ কর এবং তোমার হস্ত তালুদ্বয় ধৌত কর এবং পরিষ্কার করে ধৌত কর তখন তোমার পাপসমূহ তোমার নখের ভেতর হতে এবং তোমার অংগুলির অগ্রভাগ হতে বের হয়ে যায়। আর যখন তুমি কুলি কর ও নাকের ভেতরাংশ ধৌত কর, তোমার মুখমণ্ডল ধৌত কর, আর কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং মাথা মাসেহ্ কর ও গোড়ালী পর্যন্ত পা ধৌত কর, তখন তুমি তোমার সাধারণ পাপসমূহ ধুয়ে ফেললে। আর যখন তুমি তোমার মুখমণ্ডল আল্লাহ্ তাআলার প্রতি রুজু কর, তখন তুমি পাপ হতে ঐ দিনের মত মুক্ত হয়ে যাও, যেদিন তোমার জননী তোমাকে জন্ম দিয়েছিল। আবু উমামা বলেন, আমি বললাম, হে আমর ইবনে আবাসা! দেখ তুমি কি বলছ। একই মজলিসে কি এসব কিছু দান করা হয়? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছি। আর আমার মৃত্যু নিকটবর্তী, আমার কোন অভাবও নেই, এমতাবস্থায় কি রাসূল-ল্লাহ (স)-এর সম্পর্কে মিথ্যা বলবো? রাসূলুল্লাহ (স) থেকে আমার উভয় কান তা শ্রবণ করেছে, আর আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

প্রথম হাদীস সম্পর্কে আলোচনা

সালাসিল যুদ্ধ ঃ غزوة শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হল غزوات অর্থ যুদ্ধ, অভিযান, আক্রমণ অথবা এটা باب نصر এর মাসদার অর্থ হল, আক্রমণ করা। অভিযান চালানো। আর গাযওয়ার প্রসিদ্ধ পারিভাষিক সংজ্ঞা হল যে যুদ্ধে নবী (স) অংশগ্রহণ করতেন পরিভাষায় তাকে গাযওয়া বলা হয়। তবে আলোচ্য হাদীসে যে গাযওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এখানে গাযওয়া দ্বারা আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য।

৮ হিজরীর জুমাদাল উখরায় গাযওয়ায়ে সালাসিল সংঘটিত হয়। এটা ওয়াদিউল কুরার আগে। সেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারা দশ দিনের রাস্তা।

নবী করীম (স) শুনেছিলেন, কুযা'আ এর একটি জামাত মদীনায় আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছে। এটা শুনে নবী (স) তিন শত সৈন্য বাহিনী সেখানে পাঠান তার সেনাপতি ছিলেন আমর ইবনুল আস।

অতঃপর হুজুর (স) জানতে পারলেন যে, শত্রু বাহিনীর দল অধিক ভারি। তাই হযরত আবু উবায়দা ইবনুল

জাররাহ এর নেতৃত্বে আরো ২০০ সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীতে হযরত আবু বকর ও ওমর রা. ছিলেন। তারা সম্মুখপানে অগ্রসর হতেই শত্রু বাহিনীর একটি দল মুসলমানদের সম্মুখে এসে যায়। ফলে মুসলমানরা তাদের উপর আক্রমণ করেন। পরিশেষে শত্রুবাহিনী পলায়ন করে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। যুদ্ধকালীন সময় মুসলিম বাহিনী একটি পানির কিনারায় অবস্থান করছিলেন। যার নাম হল সালসাল, এ কারণেই উক্ত গাযওয়াকে যাতুস সালাসিল বলা হয়।

মসজিদ চতুষ্টয় কোথায় অবস্থিত সেগুলোতে নামায আদায় করার বিশেষত্ব কি?

হাদীসে চারটি মসজিদে নামায আদায় করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। সেগুলোতে নামায আদায় করলে পাপ মোচন হবে। উক্ত মসজিদগুলো হলো–

১. মসজিদে মক্কা ২. মসজিদে মদীনা ৩. মসজিদে কু'বা। ৪. মসজিদে আকসা। এগুলোতে নামায আদায় করল গোণাহ মাফ হয়ে যায়।

চার মসজিদে নামায আদায় করার সুসংবাদ প্রদানের কারণ

জিহাদ ফউত হওয়ার কারণে যে ক্ষতি ও ক্রটি হয়েছে সেটাকে কাটিয়ে উঠার (বা পূর্ণ করার) জন্য চার মসজিদে নামায আদায় করলে পাপ মোচন হবে বলে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। কারণ এর দ্বারা উক্ত ঘাটর্তি পুরণ করা সম্ভব। কিন্তু দীর্ঘ সফরের সীমাহীন কষ্ট সহ্য করা ব্যতীত তা অর্জন করা সম্ভব নয়। ফলে আবু আইয়্যুব আনসারী তার থেকে অধিক সহজ পন্থা বর্ণনা করলেন যে, হুজুর (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি উযূর ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব ও আদাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে পুর্ণাঙ্গরূপে উযূ করবে অতঃপর খুব শান্তভাবে খুশু-খুযূ এর সাথে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল উযূর নামায আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (শরহে উর্দু নাসায়ী ২৩৩)

দ'রাকাত নামায দ্বারা উদ্দেশ্য

উযূ করার পর যে দু' রাকাত নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে তা হল তাহিয়্যাতুল উযূ। এ দু'রাকাত নামায যে কোনো অজুর পরই পড়া যায়। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো ওয়াক্ত নেই। কেউ কেউ একে জুমার নামাযের অন্তর্ভুক্ত করেন। এটি একেবারেই ভুল ধারণা। যে কোনো সময় উযূর পরে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল উযূ এবং যে কোন সময় মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায মুস্তাহাব হিসাবে পড়া যায়। এর জন্য অসংখ্য সওয়াব রয়েছে। (শরহে মিশকাত ঃ ১/২৪৭)

তৃতীয় রেওয়ায়াত সম্পর্কে আলোচনা

قوله يُصَلِّي الصَّلٰوةَ اِلَّا غُفِرَلَهُ ... الخ ঃ এখানে صلوة اخرى দ্বারা উদ্দেশ্য হল পরবর্তী (ওয়াক্তের) নামায, আলোচ্য হাদীসের দাবী হল, তাহিয়্যাতুল উযূর নামায আদায় করার দ্বারা পরবর্তী ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত যত গোণাহ সংঘটিত হবে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। এখানে গোণাহ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তার গোণাহ কিভাবে ক্ষমা করা হল? অথচ গোণাহ সংঘঠিত হওয়ার পরেই ক্ষমা করা হয়।

আল্লামা সিন্ধী (র) এর উদ্দেশ্য এটা বর্ণনা করেছেন যে, ধরে নিলাম যদি গোণাহ সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে তার কারণে তাকে আযাব দেয়া হবে না। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ২২৩-২২৪)

চতুর্থ রেওয়ায়াত সম্পর্কে আলোচনা

قوله كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ اُمُّكَ ঃ নবজাতক শিশু যেমন পাপ পংকিলতা থেকে নিস্পাপ থাকে ঠিক তদ্রুপ যে ব্যক্তি পুর্ণাঙ্গরূপে উযূ সম্পন্ন করার পর দু'রাকাত নামায আদায় করে, তার সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যায় এবং সে নিস্পাপ হয়ে যায়।

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান

প্রশ্ন ঃ উল্লেখিত আলোচনার উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর তা হল, خروج من الخطا এটা পূর্বে গোণাহ সংঘঠিত হওয়াকে প্রমাণ করে। অথচ বাচ্চা ভুমিষ্ঠ হওয়ার সময় গোনাহের কল্পনাই করা যায় না। তাহলে তাশবীহ দ্বারা কিভাবে ফায়দা হাসিল হল? দ্বিতীয়ত: নবজাতক সন্তান (যেমন-সগীরা কবীরা সমস্ত ধরনের গোণাহ থেকে নিষ্পাপ থাকে তার সাথে উযূকারী ব্যক্তিকে তাশবীহ দেয়ার দ্বারা বুঝা যায় পূর্ণাঙ্গরূপে উযূ করার দ্বারা উযূকারী ব্যক্তিও সকল ধরনের সগীরা ও কবীরা গোণাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, অথচ উলামায়ে কিরাম একথার প্রবক্তা নন, বরং তারা বলেন, শুধুমাত্র সগীরা গোণাহ মাফ হবে, কবীরা গোণাহ নয়।

উত্তর ঃ এখানে সমস্ত গোণাহ বের হয়ে যাবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সমস্ত সগীরা গোণাহ বের হয়ে যাবে। অর্থাৎ সদ্য ভুমিষ্ট নবজাতক শিশু যেমন সমস্ত ধরণের সগীরা গোণাহ থেকে মুক্ত থাকে ঠিক তদ্রুপ পূর্ণাঙ্গরূপে উযূ করে দুই রাকাত নামায আদায় করার দ্বারা তার সমস্ত সগীরা গোণাহ মাফ হয়ে যায়। অর্থাৎ এখানে সগীরা গোণাহ থেকে মুক্ত থাকার দিক দিয়ে তাশবীহ দেয়া হয়েছে। (শরহের উর্দু নাসায়ী: ২৩৪)

قوله فقال اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كَبِرَتْ ঃ হযরত আমর ইবনে আবাসা রা. সাধারণ আমলের উপর এ বৃহৎ সওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। হযরত আবু উমামা (র) বলেন, হে আমর ইবনে আবাসা! তুমি ভেবে চিন্তে কথা বলো। কেননা, শ্রোতাদের অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে যে, কাজটা এত ছোট অথচ এর জন্য এমন বৃহৎ পুণ্যের প্রতিশ্রুতি হয়তো বা মুবালাগা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অথ'.া রাবীর বর্ণনায় ভুল হয়েছে।

এই হাদীসটি সাধারণ লোকদের সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টির কারণ হবে। তাই হযরত আমর ইবনে আবাসা দৃঢ়তার সাথে বলেন, اما والله। আমি এটা মুবালাগা হিসাবেও বলছিনা, আর এটা বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুলও সংঘঠিত হয়নি। আল্লাহর কসম! আমি হুজুর (স) থেকে যেভাবে হাদীসটি শুনেছি সেটাকে সেভাবেই সংরক্ষণ করেছি এবং ইলম গোপন করার ক্ষেত্রে যে হুমকি বর্ণিত হয়েছে তা থেকে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য সেটাকে হুবহু বর্ণনা করেছি। এখন এ বিধানের উত্তরে আমল করার বিষয়টি সাধারণ লোকদের ইখতিয়ারাধীন। তারা তার উপর আমল করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। আমি আমার দায়িত্ব আদায় করেছি। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ২৩৪)

গোণাহ দেহ বিশিষ্ট কি না?

আলোচ্য হাদীসে خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ বা বাক্যাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, গুণাহেরও শরীর আছে। কেননা বের হওয়ার জন্য শরীর আবশ্যক। এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ নিম্নরূপ–

১. ইবনুল আরাবী (র) এর মতে, এখানে রূপকার্থে গুণাহ বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে, এটার দ্বারা গুণাহ মাফের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে গুণাহের কোন শরীর নেই।

২. ইমাম সুয়ুতী (র) এটাকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, গুণাহেরও আঙ্গিক রূপ আছে। আর তা হল গুণাহের ফলে অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তা ছাড়া হজরে আসওয়াদ মূলত সাদা ছিল। বান্দার পাপরাশি টেনে নেওয়ার কারণে তা কালো হয়ে গেছে।

ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) অন্তর চক্ষু দ্বারা উযূ গোসলে ব্যবহৃত পানিতে গুণাহ দেখতে পেতেন। এজন্য তারা ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলেছেন। (শরহে মিশকাত ঃ ১/২৪৪)

القَوْلُ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الوُضُوْءِ

١٤٨. اخبرنا محمدُ بْنُ عليِّ بْنِ حَرْبِ المِرْوَزِيُّ قال حَدَّثنا زيدُ بْنُ الحُبَابِ قال حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الخَوْلَانِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قال قال رسولُ اللّٰه ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ -

উযূ শেষে যা বলতে হয়

অনুবাদ ঃ ১৪৮. মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হারব মারওয়াযী (র)..........উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে আর বলে–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : كَمْ نَوْعًا مِّنَ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ ثَبَتَ بِالحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ بَعْدَ الوُضُوْءِ؟

প্রশ্ন ঃ উযূর পর হুজুর (স) থেকে কত প্রকারের দোআ ও যিকির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে?

উত্তর ঃ উযূর পরবর্তী দোয়া ঃ উযূর পরে তিন প্রকারের যিকির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লামা তীবী (র) বলেন, উযূর পর শাহাদাতাইন (তথা তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য) পড়া, এর দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পায়খানা পেশাব এবং হদস থেকে উযূর অঙ্গগুলো পবিত্র করার পর নিজের অন্তরকে শিরক এবং রিয়া থেকে পবিত্র করে নেয় ও আমলকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই খালেস বানিয়ে নেয়া। ইমাম নববী (র) বলেন, এ মাসআলায় সকলে একমত যে, উযূর পরে শাহাদাতাইন পড়া মুস্তাহাব। আর উত্তম হল শাহাদাতাইন এর সাথে এ দোয়াও পড়া– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

এটা তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে। ইমাম মুসলিমের (র) ও সহীহ মুসলিম ১/১২২ পৃষ্ঠায় كتاب الطهارة باب الذِّكْرِ المُسْتَحَبِّ عَقِبَ الوُضُوْءِ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তবে তাতে শুধু শাহাদাতাইন রয়েছে, দোয়ার পরবর্তী অংশটুকু নেই।

আর অপর দু'টি দোআ হল– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

এ দোয়াটি ইমাম নাসায়ী (র) عمل اليوم والليل গ্রন্থে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এ তিনটি দোয়া ব্যতীত উযূর সময় প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করাকালে যে সব দু'আ প্রচলিত আছে কুরআন হাদীসে সেগুলোর প্রমাণ নেই। এজন্য কোন কোন আহলে জাহির এগুলোকে كَذِبٌ مُخْتَلَفٌ তথা জাল-মিথ্যা বলে দিয়েছেন, এর উদ্দেশ্য হল, হাদীস দ্বারা এগুলো প্রমাণিত নয়। এর অর্থ এই নয় যে, এগুলো পড়া নাজায়েয। এজন্য উলামায়ে কিরাম লিখেছেন– إِنَّهُ مِنْ دَأْبِ الصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ এগুলো নেককারদের অভ্যাস। (শরহে আবু দাউদ ১৫৪)

উযূর পরে যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়বে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে।

প্রশ্ন ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় পূর্ণরূপে উযূ সম্পাদনকারীর জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। অথচ জান্নাতের আটটি দরজাকে তৈরী করা হয়েছে أَعْمَالٌ مَخْصُوْصَةٌ এর অধিকারী আট শ্রেণীর লোকদের

জন্য। উদাহরণস্বরূপ যে সর্বদা ভক্তি সহকারে রোযা রাখে এবং এটা তাকে আনন্দ দেয়, এর দ্বারা সে মজা অনুভব করে সে بَابُ الرَّيَّان দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অনুরূপ ভাবে নামায আদায়কারী ব্যক্তি بَاب الصلوة এবং মুজাহিদ بَابُ الجهاد এভাবে অন্যান্যরাও তাদের নির্ধারিত দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর উযূকারীর জন্য তো জান্নাতের কোন দরজা নির্ধারিত নেই অথচ আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। ফলে রেওয়ায়াতগুলোর মধ্যে পরস্পর বৈপরীত্য মনে হচ্ছে, এর সমাধান কি?

উত্তর ঃ উযূকারীর সম্মান ও মর্যাদার কারণে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। কিন্তু সে ঐ দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে যে আমলের রং তার উপর প্রবল হয়েছে। অর্থাৎ যে উত্তমরূপে নামায আদায় করেছে ফলে নামাযের রং যার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে সে بَاب الصلوة দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার জন্য জিহাদ করেছে সে بَاب الجهاد দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। وعلى هٰذا القِيَاس অন্যান্য আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন বলা হয় أَرْحَمُ أُمَّتِىْ بِأُمَّتِىْ أَبُوبَكر সাহাবাদের মধ্যে رحم এর গুণ তার মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তাই তাকে ارحم امتى বলা হয়েছে। যেমন–শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হককে শায়খুল হাদীস বলা হয় তিনি ব্যতীত কি কেউ শায়খুল হাদীস নেই? অবশ্যই আছে কিন্তু তাকে শায়খুল হাদীস বলা হয় কারণ তার মধ্যে এগুনটি প্রাধান্য পেয়েছে।

অনুরূপভাবে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) কে "শাহ" বলা হয় মাওলানা বলা হয় না, তাহলে তিনি কি আলেম ছিলেন না? অবশ্যই ছিলেন। তবে তাকে শাহ বলা হয় তার মধ্যে দরবেশীর গুণটি প্রবল থাকার কারণে ছিল। আর যার মধ্যে "দরবেশীর" গুণ প্রধান্য পায় তাকে শাহ বলা হয়। ঠিক তদ্রূপভাবে আমলকারীর ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য কোন ব্যক্তি এমন আছে যে, সমস্ত রাতে সদা ইবাদত করে, কিন্তু জিহাদ ইত্যাদি গুণ তার মধ্যে নেই। অপর জন পূর্ণ রাত ইবাদত করে না। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের খেলাফ কিছু দেখলে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

মোটকথা, যার উপর নামাযের গুণ প্রবল হয়ে যাবে সে بَاب الصلوة দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যার উপর অন্যান্য গুণ প্রাধান্য পাবে সে সে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. রাসূল (স) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি কি এমন আছে যে সকল দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে? রাসূল (স) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ وَأَرْجُو أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ আমি আশাবাদি যে, তুমি তাদের মধ্য হতে একজন। অর্থাৎ তুমি বিভিন্ন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটা তার মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য বলেছেন। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ২৩৫)

এ ব্যাপারে শাহ আব্দুল কাদের (র) এর অভিব্যক্তি ঃ হযরত শাহ আব্দুল কাদের (র) লেখেন, জাহান্নামের দরজা সাতটি, আর জান্নাতের দরজা আটটি। এর হিকমত কি?

তিনি এ ব্যাপারে একটি সুচিন্তিত ও সূক্ষ্ম কথা লিখেছেন। আর তা হল এমন একটি দল থাকবে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু জাহান্নামের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, হিসাব-নিকাশ ও কারণ দর্শানো ব্যতীত এমনিই কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। এ জন্য জাহান্নামের দরজা সাতটি, আর জান্নাতের দরজা ৮টি রাখা হয়েছে। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ২৩৫-২৩৬)

اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ এর ব্যাখ্যা ঃ মহানবী (স) উক্ত হাদীসে فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ বলে বেহেশতের দরজাসমূহ খোলা থাকার যে কথা উল্লেখ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা দ্বারা জান্নাত অবধারিত হওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। যেহেতু তার জন্য জান্নাত অবধারিত, তাই সে যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এমন কোনো কথা নয় এবং হাদীসের অর্থও তা নয়।

اسماء الجنة الثمانية আটটি জান্নাতের নাম ঃ মহান স্রষ্টা তার অনুগত বান্দাদের পুরস্কৃত করার জন্য যে আটটি চির শান্তির স্থান তৈরী করেছেন সেগুলোর নামসূমহ নিম্নে উপস্থাপিত হল–

১. دَارُ السَّلام [দারুস সালাম] ২. دَارُ الْقَرار [দারুল ক্বারার] ৩. دَارُ الْمَقام [দারুল মাকাম] ৪. جَنَّةُ النَّعِيم [জান্নাতুন নাঈম, ৫. جَنَّةُ الخُلْد [জান্নাতুল খুলদ], ৬. جَنَّةُ المَاوٰى [জান্নাতুল মাওয়া] ৭. جنة عَدْن [জান্নাতু আদন] ৮. جَنَّةُ الفِردَوْس [জান্নাতুল ফিরদাউস] (শরহে মিশকাত ঃ ১/২৪৯)

حِلْيَةُ الْوُضُوْءِ

١٤٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ خَلَفٍ وَهُوَ ابْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلٰوةِ وَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْلُغَ اِبْطَيْهِ فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا هٰذَا الْوُضُوْءُ فَقَالَ لِىْ يَابَنِىْ فَرُّوْخَ اَنْتُمْ هٰهُنَا لَوْعَلِمْتُ اَنَّكُمْ هٰهُنَا مَاتَوَضَّاْتُ هٰذَا الْوُضُوْءَ سَمِعْتُ خَلِيْلِىْ ﷺ يَقُوْلُ تَبْلُغُ حِلْيَةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ -

١٥٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَدِدْتُ اَنِّىْ قَدْ رَاَيْتُ اِخْوَانَنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَسْنَا اِخْوَانَكَ ؟ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ وَاِخْوَانِىَ الَّذِيْنَ لَمْ يَاْتُوْا بَعْدُ وَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَاْتِىْ بَعْدَكَ مِنْ اُمَّتِكَ؟ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُّحَجَّلَةٌ فِىْ خَيْلٍ بُهْمٍ دُهْمٍ اَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَاِنَّهُمْ يَاْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ فَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ -

---

উযূর জ্যোতি

অনুবাদ ঃ ১৪৯. কুতায়বা ইবনে সা'ঈদ (র)....... আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (র) নামাযের জন্য উযূ করছিলেন। আর আমি তাঁর পেছনে ছিলাম, তিনি বগল পর্যন্ত তাঁর হস্তদ্বয় ধৌত করছিলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবু হুরায়রা! এ কোন্ ধরনের উযূ? তিনি আমাকে বললেন, হে ফর্‌রুখের বংশধব! তোমরা এখানে? যদি আমি পূর্বে জানতাম যে, তোমরা এখানে আছ তাহলে আমি এরূপ উয্ করতাম না। আমি আমার বন্ধু রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি যে, মুমিনের জ্যোতি ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে, যে পর্যন্ত উযূর পানি পৌঁছে।

১৫০. কুতায়বা ইবনে সা'ঈদ (র).......... আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) একবার কবরস্থানে গেলেন। তিনি বললেন, হে মুমিন সম্প্রদায়ের ঘরের অধিবাসী! তোমাদেরকে সালাম, আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমি আশা করি আমার ভ্রাতৃবৃন্দকে দেখতে পাব। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভ্রাতা নই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বরং তোমরা আমার আসহাব। আর আমার ভ্রাতৃবৃন্দ হল যারা পরবর্তীকালে আসবেন, আর আমি হাউযে কাউসারে তাদের অগ্রবর্তী হবো। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার যে সকল উম্মত পরবর্তীকালে আগমন করবে আপনি তাদের কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন, তোমরা বলো যদি কোন ব্যক্তির একদল কালো ঘোড়ার মধ্যে সাদা চেহারা ও হস্তপদ বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে তবে কি সে ব্যক্তি তার ঘোড়া চিনে নিতে পারবে না? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন উযূর দরুণ তাদের হস্তপদ উজ্জ্বল হবে। আর আমি হাউযে কাউসারের নিকট তাদের অগ্রগামী হবো।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : بَيِّن معنى غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثارِ الوُضوء.

প্রশ্ন ঃ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثارِ الوُضوء. **এর অর্থ বর্ণনা কর?**

উত্তর ঃ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثارِ الوُضوء. **এর অর্থ ঃ** দু'হাত, দু'পা ও কপাল শুভ্র বা সাদা বর্ণ হওয়াকে غر محجل বলে। বিশেষ করে যে ঘোড়া এ ধরনের হয় তাকে غر محجل বলা হতো। একদা নবী করীম (স) বললেন, কিয়ামতের দিন আমি আমার উম্মতকে হাশরের মাঠে চিনবো। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এত লোকদের মধ্যে আপনি তাদেরকে কিরূপে চিনবেন? এর জবাবে তিনি বললেন, উযূর প্রভাবে তাদের অঙ্গগুলো উজ্জ্বল দীপ্তিময় হবে, তা দেখে আমি তাদেরকে চিনতে পারব। মোটকথা, উযূর কারণে তাদের কপাল এবং অন্যান্য অঙ্গ যা উযূর মধ্যে ধোয়া হয়েছে তা ঝলমলে শুভ্র বর্ণের হবে, এটা হবে এ উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফলে তা হবে সনাক্তের প্রতীক। অথবা তাদেরকে উক্ত غر محجل নামেই আহ্বান করা হবে এবং বলা হবে যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য এদিকে ছুটে এসো। (শরহে মিশকাত : ১/২৪৯)

سوال : كَيْفَ سَلَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِم وهُمْ مَيِّتُوْنَ؟

প্রশ্ন ঃ কিভাবে নবী করীম (স) মৃতদেরকে সালাম করলেন?

উত্তর ঃ হাদীস কুরআনের মধ্যে বৈপরীত্য ও তার সমাধান ঃ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, নবী করীম (স) কবরস্থানে এসে মৃতদেরকে সালাম দিয়েছেন। অথচ তারা মৃত এবং কিছুই শুনতে পায় না। কুরআন মজীদেও বলা হয়েছে যে, فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى অতএব, হাদীস ও কুরআনের মধ্যে বিরোধ দেখা যাচ্ছে এর সমাধান কল্পে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন।

১. কুরআন মজীদের ভাষ্যটি কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ কাফিরগণকে আপনি দ্বীনের কথা শুনাতে পারবেন না। কারণ, তার মৃতদের ন্যায়।

২. অথবা, আয়াতের মর্ম হল আপনি সে মৃতদেরকে কথা শুনাতে পারবেন না যখন তারা মৃত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ পাক নবীর কথা শুনার জন্য তাদের জীবিত করেছেন।

৩. অপর এক হাদীসে পাওয়া যায়, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সা.! তারা (মৃতগণ) কি শুনতে পায়? হুজুর (স) বললেন, তোমাদের ন্যায় তারাও শুনতে পায়, কিন্তু জবাব দিতে পারে না।

৪. অথবা, আয়াতে মৃত বলে জীবিত কাফিরগণকে বুঝানো হয়েছে। তাদের চেতনা ও অনুভূতি ঠিকই রয়েছে, কিন্তু উপকার গ্রহণ না করার এবং কল্যাণের পথ অনুসরণ না করার জন্য তাদেরকে মৃত ও কবরের লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৫. অথবা, আলোচ্য হাদীসটি নবী করীম (স) এর জন্য খাস।

৬. আল্লামা কাশ্মীরী (র) বলেছেন– فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى এর অর্থ হল তারা আপনার কথা দ্বারা উপকৃত হবে না। কেননা, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি বিপুল সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে।

সর্বোপরি কথা হল, মৃতরা জীবিতদের কথা শুনতে পায় এবং তাদের আমল দেখতে পায় তবে জীবিতদের কথায় তারা আমল করতে পারবে না। সুতরাং আলোচ্য হাদীস ও পবিত্র কুরআনের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই এবং রাসূল (স) এর মৃতদের সালাম দেওয়া অসঙ্গত নয়। (শরহে মিশকাত ঃ ১/২৫৫)

سوال : حَرِّر مَسْئلَةَ سِمَاعِ الْمَوْتٰي مع بَيانِ اَقْوالِ الْعُلَماء. فِيْه بالاَدِلَّةِ وتَرْجِيْحِ الرَّاجِح

প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তির শ্রবণের মাসআলা উল্লেখ কর। এক্ষেত্রে আলিমগণের বক্তব্য কি? উল্লেখ কর এবং অগ্রগন্য মত কোনটি লিখ।

উত্তর ঃ প্রকাশ থাকে যে, মৃত্যু ব্যক্তিরা শুনা বা না শুনা সংক্রান্ত মতভেদ নবীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, নবীগণ মৃত্যু অবস্থায় ও শুনতে পান। নবীগণ ছাড়া অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের শুনা বা না শুনার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। (কাশফুল বারী)

১. ইবনে উমর রা. এর মত হল মৃত ব্যক্তিরা শুনতে পায়।

২. হযরত আয়েশা (রা) এর মত হল মৃত্যু ব্যক্তিরা শুনতে পায় না।

যেহেতু এ বিষয়টা নিয়ে সাহাবাদের মাঝেই মতভেদ ছিল, একারণে পরবর্তীদের মধ্যে ও এ ব্যপারে মতভেদ হয়ে গেছে। সুতরাং ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবু হানীফা (র) (সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী) এর মত হল মৃত ব্যক্তিরা শুনতে পায়। আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) এর মত হল, মৃত ব্যক্তিরা শুনতে পায় না।

মৃতরা শুনতে পায় এ মতের প্রবক্তার দলীল

١ ـ عن انس رضى الله عنه انّ النبىّ صلى الله عليه وسلم قال انّ المَيِّتَ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِم

২. বদরের যুদ্ধের পর হুজুর (স) কাফেরদের লাশকে সম্বোধন করে কিছু কথা বলেছিলেন, তখন হযরত ওমর রা. মৃত ব্যক্তির সাথে কথা বলা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে হুজুর (স) বলেছিলেন তারা তোমাদের থেকেও ভাল শুনে।

৩. তারা ঐ সমস্ত রেওয়ায়াত দ্বারাও দলীল পেশ করে থাকেন, যেগুলোর ভিতরে কবরস্থানে গিয়ে السلامُ عَلَيْكُمْ يا اَهْلَ القُبور বলতে বলা হয়েছে। কারণ তারা যদি না শুনত, তাহলে তাদেরকে এভাবে সম্বোধন করতে বলা হত না।

৪. সর্ব সম্মতিক্রমে একথা স্বীকৃত যে, মৃত ব্যক্তিরা বুঝতে পারে। আর যার ভিতরে বুঝার যোগ্যতা আছে, তার শুনতে পারাটা অসম্ভব নয়।

যারা বলেন মৃত্যু ব্যক্তি শুনতে পায় না, তাদের দলীল

١. قوله تعالى : اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتَى

٢. قوله تَعالى وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ

৩. হযরত আয়েশা রা. এর সামনে যখন মৃত ব্যক্তিরা শুনতে পারে এ সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ করা হল। তখন তিনি এটিকে অস্বীকার করলেন এবং একথা বললেন যে, তারা বুঝতে পারে।

যারা মৃত ব্যক্তির শ্রবণকে অস্বীকার করে তাদের দলীলের জবাব

কুরআনের আয়াতের উত্তর ঃ ১. কুরআনের আয়াতের ভিতরে اسماع কে নফী করা হয়েছে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি নিজে শুনতে পায় না, তবে আল্লাহ যদি শুনানোর ইচ্ছা করেন তাহলে সে শুনতে পায়।

২. কাসেম নানুতুবী (র) বলেন, মানুষের যে কাজটি স্বাভাবিক হয় সেটাকে মানুষের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। আর যে কাজটা অস্বাভাবিক হয় সেটাকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়, মৃত ব্যক্তির কথা শুনা এটা যেহেতু কোন স্বাভাবিক বিষয় নয়। এ কারণে আয়াতের ভিতরে মানুষের থেকে এটাকে নফী করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে মানুষ শুনাতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ নিজ ক্ষমতায় তাকে শুনিয়ে থাকেন।

হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীসের জবাব ঃ

১. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, যে, জুমহুর হযরত ইবনে ওমর (রা) এর রেওয়ায়াতকেই গ্রহণ করেছেন এবং আয়েশা (রা) এর রেওয়ায়াতকে গ্রহণ করেননি। কারণ হযরত আয়েশা (রা) এর মত হাদীস অন্য কেউ বর্ণনা করেনি। কিন্তু হযরত ইবনে উমর (রা) এর মত হাদীস অন্যান্য সাহাবাও বর্ণনা করেছেন। যেমন ওমর (রা) আবু তালহা ও ইবনে মাসউদ (রা)।

২. আল্লামা সুহাইলী (র) বলেন, হুজুর (স) এর মৃত ব্যক্তিদের সাথে কথা বলার সময় বদরের ময়দানে হযরত আয়েশা (রা) উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং যে সমস্ত সাহাবী উপস্থিত ছিলেন, তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

(কাশফুল বারী, নাসরুল বারী, ইনআমুল বারী)

سوال : الموتُ حقٌّ مُتَيَقَّنٌ فكيفَ قالَ اِنْشاءَ اللّٰهُ ..

প্রশ্ন ঃ মৃত্যু অনিবার্য হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (স) ইনশা আল্লাহ বললেন কেন?

উত্তর ঃ প্রত্যেক প্রাণী যা আল্লাহ তাআলা এ জগতে সৃষ্টি করেছেন সবই মরণশীল। মানুষ এবং সকল প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং এটা সর্বজন স্বীকৃত। আল্লাহ তাআলাও বলেছেন– كلّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ এ সত্ত্বেও নবী করীম (স) ইনশা আল্লাহ কেন বললেন? এর উত্তরে বলা যায়।

১. মৃত্যু নিশ্চিত হলেও কেউ জানে না তা কখন হবে? সুতরাং যখনই আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তখনই তোমাদের সাথে মিলিত হব, তাই ইনশা আল্লাহ বলেছেন।

২. সন্দেহের জন্য রাসূল (স) ইনশা আল্লাহ বলেননি; বরং বরকত লাভের জন্য বলেছেন। অতএব এতে কোনো সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্য নয়।

৩. প্রত্যেক কাজে ইনশা আল্লাহ বলার মধ্যে বরকত ও আল্লাহর অনুগ্রহ নিহিত থাকে। এটা এ জন্য বলেছেন।

৪. অথবা, ইনশা আল্লাহ বলার পর بكم শব্দটি বলে হুজুর (স) তাদের অর্থাৎ মৃত প্রাণী ও মৃত অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। (শরহে মিশকাত ঃ ১/২৫৫)

سوال : قوله عليه السلام وَدِدْتُ اَنَا قَدْ رَأَيْنَا اِخْوَانَنَا مُوضحًا .

প্রশ্ন ঃ নবী (স) এর বাণী وَدِدْتُ اَنَا قَدْ رَأَيْنَا اِخْوَانَنَا **এর ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর ঃ وَدِدْتُ اَنَا قَدْ رَأَيْنَا اِخْوَانَنَا **এর ব্যাখ্যা ঃ** মহানবী (স) এর উক্ত বাণীর অর্থ হল وَدِدْتُ اَنَا قَدْ رَأَيْنَا اِخْوَانَنَا আমরা যেন আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পাই। রাসুল (স) যখন একবার জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে এ বাক্যটি বলেছিলেন তথায় গিয়ে কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আসসালামু আলাইকুম, হে মুমিন সম্প্রদায়ের আসল নিবাসের অধিবাসীগণ! ইনশা আল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। আর যারা ভবিষ্যতে ঈমান আনবে বা আনার পর্যায়ে আছে তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন- وَدِدْتُ اَنَا قَدْ رَأَيْنَا اِخْوَانَنَا তখন উপস্থিত সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ভাইগণ? আমরা কি আপনার ভাই নই? তখন রাসূল (স) বলেছিলেন, তোমরা আমার সাহাবী। আমার ভাইয়েরা এখনো পৃথিবীতে আসেনি। এর দ্বারা আসলে তিনি সাহাবীদের ভ্রাতৃত্ব অস্বীকার করেননি। এ সম্পর্কে ফাতহুল মুলহিমে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা সাহাবীদের ভ্রাতৃত্ব অস্বীকার করা হয়নি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ বরং সাহাবীদের জন্য অতিরিক্ত আরো একটি মর্যাদা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। ইমাম নববী ও কাযী আয়ায (র) এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, সাহাবীদের জন্য ভ্রাতৃত্ব এবং সুহবত এ দুটি গুণ রয়েছে। আর পরবর্তী ঈমানদারদের জন্য শুধু ভ্রাতৃত্বের গুণটি থাকবে। (শরহে মিশকাত : ১/২৫৫)

سوال : بَيِّنْ معنى قوله عليه السلام اَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ .

প্রশ্ন ঃ নবী (স) এর বাণী اَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ **এর অর্থ- বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ اَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ **অর্থ ঃ** فَرَطٌ অর্থ- অগ্রগামী, যিনি দলের অগ্রে থেকে তাদের সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন, তদ্রূপ মহানবী (স) হাশরের ময়দানে উম্মাতকে হাউজে কাউছারের পানি পান করানোর জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। আর সেদিন কাউছারের মালিকও হবেন তিনি, এ মর্মে পবিত্র কুরআনের বাণী- اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

সে দিন মহানবী (স) উম্মতের জন্য হাউজে কাউছারের তীরে অবস্থান করবেন, আর মুমিনগণ পিপাসায় কাতর হয়ে মহানবী (স) কে খুঁজতে থাকবে। তখন নবী করীম (স) আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে তাঁর উম্মতদেরকে হাউজে কাউছারের পানি পান করাবেন। অথবা, এ কথাটির মর্মার্থ হল, আমি দুনিয়া হতে অগ্রে বিদায় গ্রহণ করে হাশরের ময়দানে হাউজে কাউছারের নিকট উপস্থিত থাকব। (শরহে মিশকাত: ১/২৫৫)

হাদীসদ্বয় সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা

প্রথম হাদীস সম্পর্কে আলোচনা

قوله فقال لى يابنى فروخ ঃ কোন কোন হাদীসের ব্যাখ্যাকার লেখেন, فروخ হলো এক ব্যক্তির নাম, যিনি হযরত ইবরাহীম (আ) এর সন্তান ছিলেন। তার বংশই সব থেকে বেশী প্রচার প্রসার লাভ করে। তার থেকে আজমীদের জন্ম, তারা পৃথিবীর মধ্যভাগে বসবাস করত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) উযূ করছিলেন। আর আবু হাযেম তার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। অতঃপর যখন হযরত আবু হুরায়রা (রা) উভয় হাতের নির্ধারিত অংশ ধৌত করার পর সামনে বেড়ে বগল পর্যন্ত ধৌত করলেন। তখন আবু হাযেম প্রশ্ন করে বসলেন. ما هذا الوضوء এটা আবার কি ধরনের উযূ?

এ প্রশ্নকারী হল আবু হাযেম, আবু সুলায়মান যিনি عزة اشجعى এর মাওলা ছিলেন। তারা উভয়ে একই ব্যক্তি। আর আবু হাযেম সালামা ইবনে দিনার যিনি ফকীহ ও জাহেদ ছিলেন এবং বনী মাখজুম গোত্রের মাওলা ছিলেন। তিনি এখানে উদ্দেশ্য নয়। উভয় থেকে বুখারী ও মুসলিম হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন।

আবু হাযেমের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যদি তোমার উপস্থিতির বিষয়ে আমি পুর্বে জানতে পারতাম তাহলে এ পদ্ধতিতে উযূ করতাম না, তথা উভয় হাতকে বগল পর্যন্ত ধৌত করতাম না।

আবু হুরায়রা (রা) এর উদ্দেশ্য ঃ কাযী আয়ায বলেন, আবু হুরায়রা (রা) এর উক্ত কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি গোত্রের অনুসরণীয় হয় সে, যদি প্রয়োজন বশত কোন বৈধ বিষয়ের উপর আমল করতে চায়। অথবা, মনের ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্য কোন আমল করতে চায়, অথবা কোন মাসআলার ব্যাপারে নিজের মাসআলার উপর আমল করতে চায়। এমন ব্যক্তির জন্য উচিত হল, সাধারণ জনসাধারণ ও অজ্ঞদের থেকে পৃথক হয়ে নির্জন স্থানে ইবাদত করা। কেননা, তার অনুসারিরা যদি তাকে উক্ত আমল করতে দেখে তাহলে তারা মনে করবে তিনি যে আমলটি করেছেন সেটাই আসল আমল এবং এটাকেই তারা অপরিহার্য মনে করবে। আর তাদের প্রতিপক্ষরা দেখে বলবে গোত্রের নেতার অবস্থা দেখো, সে উযূর মাসআলা সম্পর্কেই অবগত নয়। যার ফলশ্রুতিতে সে বগল পর্যন্ত হাত ধৌত করেছে। এজন্য গোত্রের অনুসরণীয় ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য হল, সে জনসম্মুখে এমন কোন কাজ করবে না, যার দ্বারা লোকদের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার বন্ধু হুজুর (স) কে বলতে শুনেছি জান্নাতে মুমিন ব্যক্তির অলংকার পরিধান করানো হবে সে পর্যন্ত যে পর্যন্ত তার উযূর পানি পৌঁছেছে। এর দ্বারা বুঝা গেলো আবু হুরায়রা (রা) যে বগল পর্যন্ত হাত ধৌত করেছেন এটা নবী (স) এর বাণীর কারণে যে, فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهٗ فَلْيَفْعَلْ মহানবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ নিদর্শনকে বৃদ্ধি করার ক্ষমতায় রাখে সে যেন তা করে।(শরহে উর্দূ নাসায়ী ২৩৭)

আলোচ্য আলোচনা থেকে শিক্ষা ঃ পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, কেউ যদি এ জ্যোতি বৃদ্ধি করতে গিয়ে ফরয পরিমাণ অতিক্রম করে অতিরিক্ত অংশ ধৌত করে তাহলে সে জুলুম ও সীমালঙ্ঘনকারী বিবেচিত হবে না। বরং সে উক্ত হুকুম থেকে বাদ থাকবে, কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে এমনটা প্রযোজ্য নয়।

حليه দ্বারা কি উদ্দেশ্য ঃ আলোচ্য হাদীসে যে حليه শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল تَحْجِيْل তথা হাত পা শুভ্র বা জ্যোতির্ময় হওয়া, যেটা কিয়ামতের দিন উযূর নিদর্শন হবে।

অথবা حليه কে زينت এর উপর ব্যবহার করা হবে। তখন এর দ্বারা সে বস্তু উদ্দেশ্য হবে যার দিকে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, يُحَلَّوْنَ فِيْهَا اَسَاوِرَ তথা জান্নাতে তাদেরকে কংকন বা অলংকার পরিধান করানো হবে যে পর্যন্ত উযূর পানি পৌঁছেছে। والله اعلم, (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ২৩৭)

একটি বৈপরীত্য ও তার সমাধান ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, سَمِعْتُ خَلِيْلِىْ আমি আমার বন্ধুকে বলতে শুনেছি, অপর হাদীসে রাসূল (স) বলেন, لَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ خَلِيْلًا যদি আমি কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় হুজুর (স) কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেননি। ফলে উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যে বৈপরীত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধান নিম্নরূপ–

আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীস سَمِعْتُ خَلِيْلِىْ এটা রাসূলের হাদীস لَوْكُنْتُ خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ الخ এর সাথে বিরোধপূর্ণ নয়। কেননা, আলোচ্য হাদীসের মাফহুম হল হুজুর (স) আল্লাহ তাআলাকে ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেননি, কেমন যেন নবী (স) এর জন্য আল্লাহ তাআলাকে ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অন্য কেউ হুজুরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নয়। এর উপর ভিত্তি করেই হযরত আবু হুরায়রা (রা) سَمِعْتُ خَلِيْلِىْ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে আলোচনা ঃ হুজুর (স) জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে কবরবাসীদের প্রতি লক্ষ্য করে সালাম প্রদান করেন। এখান থেকে বুঝে আসে যে, গোরস্থানের অধিবাসী কবর যিয়ারতকারীদেরকে চিনতে পায় এবং

তাদের সালাম কথাবার্তা বুঝতে পারে। এর থেকে এটাও বুঝে আসে যে, السلام শব্দটি عليكم এর উপর মুকাদ্দাম করার দিক দিয়ে জীবিত ও মৃত উভয়ের ক্ষেত্রে বরাবর।

الخ.... ان شاء الله সম্পর্কে আলোচনা ঃ ১. হুজুর (স) ان شاء الله শব্দটি বরকত স্বরূপ এবং আল্লাহ তাআলার বাণী, لاتقولن لشيء انى فاعل ذالك এর উপর আমলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন।

২. আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, বান্দাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য استثناء শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে করে মাখলুক ঐ সমস্ত বিষয় যে ব্যাপারে তাদের জ্ঞান নেই সে ক্ষেত্রে استثناء শব্দ ব্যবহার করবে।

৩. কথাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে استثناء শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন মানুষ কথাকে সজ্জিত করার লক্ষ্যে এমন করে থাকে।

৪. অথবা استثناء মদীনায় মৃত্যুবরণ করা এবং পবিত্র স্থান জান্নাতে বাকীতে সমাহিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী– وما تدرى نفس باى ارض تموت

৫. অথবা, হুজুর (স) এর সাথে ঐ সময় এমন কতক লোক ছিল যাদের ব্যাপারে মোনাফেকির সম্ভাবনা ছিল। استثناء তাদের দিকে ফিরেছে।

৬. হাফেজ আব্দুল বার্র বলেন, مشيئت কয়েদ مؤمنين শব্দের অর্থের দিকে ফিরেছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল لاحقون فى حال الايمان অর্থাৎ انشاء الله আমরাও ঈমান অবস্থায় তোমাদের সাথে মিলিত হবো, ফলে মৃত্যুর সময় ঈমানের উপর বড় ধরণের পরীক্ষা হয়, আল্লাহ যাকে বাঁচাতে চান সে ব্যতীত কেউ তা থেকে বাঁচতে সক্ষম নয়, যেমন আল্লাহর নিকট ইব্রাহীম (আ) এর দোয়া اجنبنى وبنى ان تعبد الاصنام

হযরত ইউসুফ (আ) এর দোয়া, توفنى مسلما والحقنى بالصالحين

হুজুর (স) এর দোয়া اللهم اقبضنى اليك غير مفتون (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ২৩৮)

قوله وددت انى قد رأيت .... الخ

আল্লামা তীবী বলেন, রাসূল (স) এর পূর্ববর্তীদের কথা ভাবতেই পরবর্তীদের কথা স্মরণ হয়ে যায় এবং কাশফ স্বরূপ আলমে আরওয়াহকে তাঁর সামনে প্রকাশ করা হয়। তখন নবী (স) পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের রূহকে দেখেন, যখন তিনি কাশফের মাধ্যমে পরবর্তীদের রূহকে উপস্থিত করা হয় তখন তাদেরকে দেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যেটাকে তিনি وددت انى رأيت اخواننا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। হায়! আমি যদি আমার ভাইদেরকে দেখতাম এর দ্বারা পরবর্তীদের প্রশংসার সাথে সাথে তাদের মহব্বতও প্রকাশ পেয়েছে।

তাহকীক ঃ محجلة : শব্দটি باب تفعيل এর تحجيل মাসদার থেকে গঠিত। اسم مفعول এর সীগা। অর্থ হল পায়ে মালা পরিহিত শুভ্র পা-বিশিষ্ট, উজ্জ্বল, শুভ্র, প্রাণীর পা উজ্জ্বল শুভ্র হলে এ শব্দটি বলা হয়।

بهم ঃ শব্দটির باء ও ه বর্ণ পেশ বিশিষ্ট এটা بهيم এর বহুবচন, অর্থ হল কালো, গাঢ় কালো।

دهم ঃ دال বর্ণটি পেশ বিশিষ্ট। শব্দটি ادهم এর বহুবচন, অর্থ কালো, গাঢ়ো কালো। দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দের তাকীদ স্বরূপ।

আলোচ্য হাদীসে غرة এবং تحجيل দ্বারা ঐ নূর উদ্দেশ্য যা কিয়ামতের দিন উযূর অঙ্গসমূহে প্রকাশিত হবে। আর এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট। যদিও অন্যান্য নবীর উম্মতগতণ উযূ করেছেন কিন্তু তাদের হাত, পা, মুখ কিয়ামতের দিন উজ্জল হবে না, (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ২৪০)

পূর্ববর্তী শরীয়তে উযূর বিধান

নাসায়ী শরীফের রেওয়ায়াতে এসেছে যে, বণী ইসরাইলের উপর দুই রাকাত নমায পড়ছিল। বুখারীতে হযরত সারা (রা) এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন অত্যাচারী শাসক তার সাথে কুকর্ম করার ইচ্ছা করল। তখন দাঁড়ালেন এবং উযূ করে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন, এর দ্বারা বুঝা যায় পূর্ববর্তী শরীয়তে উযূর বিধান ছিল। উযূ কোন উম্মতের বৈশিষ্ট নয়। কেননা, পবিত্রতা ব্যতীত কোন শরীয়তেই ইবাদত সহীহ ছিল না। তবে এ দীপ্তিটা একমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীর বৈশিষ্ট্য। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ২৪০)

بَابُ ثَوَابِ مَنْ اَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ

١٥١. اخبَرنا موسى بن عبدِ الرحمٰن المَسْرُوقِيُّ قال حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الحُبَابِ قال حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قال حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يزيدَ الدِّمَشْقِيُّ عَن ابى ادريس الخَوْلَانِيّ وابى عثمانَ عَنْ جُبَيرِ بْنِ نُفَيرِ الحَضْرَمِيِّ عَن عُقْبَةَ بْنِ عامرِ الجُهَنِيِّ قالَ قال رسولُ اللّٰه ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثمّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِما بِقَلْبِه ووَجْهِه وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে দু'রাকাত নামায আদায় করে তার সওয়াব

অনুবাদ ঃ ১৫১. মূসা ইবনে আবদুর রহমান মাসরূকী (র)..........উক্‌বা ইবনে আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে তারপর দু'রাকাত নামায আদায় করে নিষ্ঠার সাথে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ঃ অন্যান্য রেওয়ায়াতে اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ يَا اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ শব্দ এসেছে যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর আলোচ্য হাদীসে فاحسن الوضوء শব্দ এসেছে। যদিও রেওয়ায়াতগুলোর শব্দের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা, فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ এর অর্থ ঐটাই যাকে اسباغ الوضوء বলা হয়, যাতে ইসরাফ বা অপচয় হয় না এবং উযূর ফরয, সুন্নত, মুস্তাহাব, আদাব এর প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা হয়। অর্থাৎ সংখ্যার দিক দিয়ে ترتيب ـ تثليث ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। সুতরাং কেউ যদি এভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে উযূ করে দু'রাকাত নামায আদায় করে তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর এ নামাযকে তাহিয়্যাতুল উযূ বলা হয়।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এটাকে شكر الوضوء দ্বারা ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু বর্ণিত বৃহৎ সওয়াবের অধিকারী তখনই হবে যখন সেটাকে রাসূল (স) এর নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী আদায় করা হয়। কেননা হাদীসে এসেছে– يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ

অর্থাৎ খুশু-খুযূ সহকারে নামায আদায় করে خشوع সম্পর্ক হল কলবের সাথে, আর خضوع এর সম্পর্কে হল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে। خشوع এর হাকীকত হল স্থীর ও শান্ত অন্তর অর্থাৎ দুনিয়াবী শোগল ও চিন্তা ফিকির পরিত্যাগ করে একনিষ্ঠতার সাথে ইবাদত করা এবং বাহ্যিক অঙ্গগুলোকেও তার সাথে ফিট করবে, এদিক সেদিক তাকাতাকি করবে না। এটা خضوع এর মূলকথা।

মোটকথা, নামায ও ইবাদতকে ওয়াসওয়াসা ও বিভিন্ন ধরনের কল্পনা-জল্পনা থেকে মুক্ত রেখে নিজের সাধ্য অনুপাতে অন্তরকে নামাযে উপস্থিত করার চেষ্টা করা। তবে অনিচ্ছাই কোন কল্পনা যদি এসে যায় এটা নামাযের خشوع এর জন্য প্রতিবন্ধক নয়। তবে শর্ত হল তার দিকে অন্তরের ঝোক বা দৃষ্টি না থাকতে হবে।

পরিপূর্ণ উযূ করার পর দুই রাকাত নামায আদায় করলে যে মহা সওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে এটা ঐ সময় প্রাপ্ত হওয়া যাবে যখন উক্ত নামায রাসূল (স) এর নির্দেশ মুতাবেক খুশু-খুযূ ও একনিষ্ঠ সহকারে আদায় করা হবে। আর সেই মহা সুসংবাদ হল উক্ত ব্যক্তির জান্নাত ওয়াজিব হওয়া।

আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, এটা সম্ভব যে, অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীসটি হযরত উসমান (রা) এর হাদীস من توضأ نحو وضوئى ... الخ এর তাফসীর যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে বলা যায় যে, مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ এবং فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ উভয়ের উদ্দেশ্য এক। কেননা, احسن وضوء ঐ সুরতেই হবে যখন উযূকারী ব্যক্তি হুজুর (স) এর উযূর ন্যায় উযূ করবে যার বিবরণ হযরত উসমান (রা) এর হাদীসে এসেছে। হযরত উসমান (রা) এর হাদীস لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا তথা উক্ত রাকাতদ্বয়ে আজে বাজে খিয়াল না হওয়া চাই। আলোচ্য হাদীসে উক্ত বাক্যের তাফসীর করা হয়েছে يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ দ্বারা, আর غُفِرَلَهُ ... الخ যে শব্দ এসেছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হওয়া এবং প্রথমেই প্রবেশ করা। কেননা, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এখানে মুতলাকভাবে জান্নাতে প্রবেশ করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ মুতলাকভাবে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য শুধুমাত্র ঈমান আনাই যথেষ্ট। কাজেই বুঝা গেলো এখানে জান্নাতে প্রবেশের দ্বার দ্বারা প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করা উদ্দেশ্য। তবে এটা সগীরা ও কবীরা সকল ধরনের গোণাহ ক্ষমা হওয়ার উপর নির্ভর করে। ৩. তবে এজন্য শর্ত হল মৃত্যু সুন্দরভাবে হতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ঈমানের উপর মৃত্যুকে করুন। আমীন! (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ২৪১-২৪২)

سوال: اذكر نبذة من حياة سيدنا عقبة بن عامر رض

প্রশ্ন ঃ হযরত উকবা ইবনে আমির (রা) এর জীবনী উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ হযরত উকবা ইবনে আমির (রা) এর জীবনী ঃ

পরিচিতি ঃ নাম উকবা। তার উপনামের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন আবু হাম্মাদ, কারো মতে আবু সা'দ, কারো মতে আবু আমির, কারো মতে, আবু আমর, কেউ বলেন, আবু আরস, কেউ বলেন আবু আসাদ, কারো মতে, আবুল আসওয়াদ। পিতার নাম আমির। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী সাহাবী ছিলেন।

বংশধারা ঃ উকবা ইবনে আমির ইবনে আব্বাস ইবনে আমর ইবনে আদী ইবনে রিফায়া ইবনে মারদুয়া ইবনে আদী ইবনে গানাম ইবনে রিবয়া ইবনে বিশদীন ইবনে কায়স ইবনে জুহাইনা আল-জুহানী।

জন্ম ঃ তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায়নি।

ইসলাম গ্রহণ ঃ কিন্দী বলেন, তিনি ছিলেন প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী।

জিহাদে অংশ গ্রহণ ঃ তিনি রাসূল (স) এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর মতবিরোধের সময় তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

গুণাবলী ঃ আবু সাঈদ ইবনে ইউনুস (র) বলেন, হযরত উকবা ইবনে আমির (রা) একজন প্রখ্যাত কারী, ফারায়েযবিদ, ফিকাহবিদ, বিশিষ্ট কারী লেখক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কুরআন মজিদ সংকলকদের একজন ছিলেন। তিনি স্বীয় হস্তে কুরআন মজিদের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন, তাছাড়া তিনি সুললিত কণ্ঠের অধিকারী এবং একজন খ্যাতনামা তীরন্দাজও ছিলেন।

হাদীস রেওয়ায়াত ঃ তিনি হাদীস শাস্ত্রে বিরাট অবদান রেখেছেন। রাসূল (স) ও হযরত ওমর (রা) থেকে সর্বমোট ৫৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু সাহাবী ও তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন- হযরত আবু উমামা, ইবনে আব্বাস, কায়েস ইবনে আবু হাযেম, জুবাইর ইবনে নুফাইর, রজা ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুহানী, দুখাইন ইবনে আমির, রিবয়ী ইবনে হিরাশ, আবু আলী সুমামা, আব্দুর রহমান ইবনে শামাসা, আলী ইবনে রাবাহ, আবুল খায়ের মারছাদ আল-ইয়ামানী, আবু ইদরীস আল-খাওলানী, আবু উশশানা আল-মাআফিয়ী, কাসীর ইবনে মুররা আল-হাযরামী প্রমুখ।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ঃ তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর সময় হিজরী ৪৪ সনে তিন বছর মিসরের গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্দী বলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাঁকে ধর্ম ও অর্থ এ দু'টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন, পরে তাঁকে এ পদ থেকে অপসারণ করা হয়।

ওফাত ঃ আল্লামা হাজী খলিফা বলেন, তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর শাসনামলে হিজরী ৫৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন। কারো কারো মতে, তিনি ৬০ হিজরী সনে ওফাত লাভ করেন।

(তাহযীবুত তাহযীব, আল-ইকমাল, আল ইশতিয়াক)

بَابُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ وَمَالاَ يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ مِنَ الْمَذِيِّ

١٥٢. اخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عثمان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال قال علي كنت رجلا مذاء وكانت ابنة النبي ﷺ تحتي فاستحييت أن أسأله فقلت لرجل جالس إلى جنبي سله فسأله فقال فيه الوضوء -

١٥٣. اخبرنا اسحق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قلت للمقداد إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع فسئل النبي ﷺ عن ذلك فإني أستحيي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي فسأله فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلوة -

١٥٤. اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمرو عن عطاء عن عائش بن انس رضي الله عنه أن عليا قال كنت رجلا مذاء فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله ﷺ من أجل ابنته عندي فقال يكفي من ذلك الوضوء -

١٥٥. اخبرنا عثمان بن عبد الله قال أنبأنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع أن روح بن القاسم حدثه عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله ﷺ عن المذي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ -

١٥٦. اخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي عن مالك وهو ابن أنس عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن عليا أمره أن يسأل رسول الله ﷺ عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلوة -

١٥٧. اخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال استحييت أن أسأل النبي ﷺ عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء

অনুচ্ছেদ ঃ মযী কখন উযূ নষ্ট করে এবং কখন করে না

অনুবাদ ঃ ১৫২. হান্নাদ ইবনে সার্‌রী (র)...........আবু আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি এমন ছিলাম যে, প্রায় আমার মযী নির্গত হতো, আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা আমার সহধর্মিণী হওয়ায় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করতাম। অতএব আমি আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করতে বললাম। সে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এতে উযূ করতে হবে।

১৫৩. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র).........আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিকদাদকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করুন যে, যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে আমোদ করে এবং তদ্দরুন তার মযী নির্গত হয় অথচ সে সহবাস করেনি, তাহলে সে কি করবে? কেননা তাঁর কন্যা আমার সহধর্মিণী হওয়ায় আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করি। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করবে।

১৫৪. কুতায়বা ইবনে সা'ঈদ (র)......... আয়িশ ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) বলেছেন, আমার প্রায় মযী নির্গত হতো, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা আমার সহধর্মিণী হওয়ায় আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে অনুরোধ করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, এর জন্য উযূ করলেই চলবে।

১৫৫. উসমান ইবনে আবদুল্লাহ (র)....... রাফি ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) আম্মারকে অনুরোধ করলেন, সে যেন রাসূলুল্লাহ (স)-কে মযীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বললেন, সে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং উযূ করবে।

১৫৬. উতবা ইবনে আবদুল্লাহ মারওয়াযী (র)....... মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাকে অনুরোধ করলেন যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হলে যদি তদ্দরুন তার মযী নির্গত হয়, তাহলে তার কি করতে হবে? কারণ তাঁর কন্যা আমার সহধর্মিণী থাকায় আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করি। তারপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞসা করলাম। তিনি বললেন, যদি তোমাদের কারও এরূপ হয় তাহলে সে যেন স্বীয় লজ্জাস্থান ধৌত করে আর নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করে।

১৫৭. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)....... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) আমার বিবাহাধীন থাকায় মযী সম্বন্ধে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করতাম। অতএব, আমি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদকে অনুরোধ করলাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এতে উযূ করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال عرِّفِ الْمَنِيَّ وَالْمَذِيَّ وَالْوَدِيَّ - مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَذِى؟ بَيِّنْ دَفْعَ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْأَحَادِيث فيه.

প্রশ্ন ঃ মনী, মযী ও অদীর সংজ্ঞা দাও, নবী করীম (স) কে মযী সম্পর্কে কে জিজ্ঞাসা করে? এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোর মধ্যকার বিরোধের সমাধান দাও।

উত্তর ঃ মনী, মযী ও অদীর সংজ্ঞা ঃ মনী-বা বীর্যের ব্যাপক সংজ্ঞা হল−

هو مَاءٌ أَبْيَضُ ثَخِيْنٌ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْوَلَدُ وهُوَ يَتَدَفَّقُ فِى خُرُوْجِه وَيَخْرُجُ بِشَهْوَةٍ مِنْ بَيْنِ صُلْبِ الرَّجُلِ وَتَرَائِبِ الْمَرْأَةِ وَيَسْتَعْقِبُهُ الْفُتُوْرُ وله رائحةٌ كَرَائِحَةِ الطِّلْعِ (ورائحةُ الطِّلع قريبةٌ مِنْ رائحةِ الْعَجِيْنِ)

'সাদা' ঘন রস, যা দ্বারা সন্তান জন্ম নেয়। এটি সবেগে বের হয়, যৌন চাহিদা সহকারে পুরুষের পৃষ্ঠ দেশ ও মহিলাদের বক্ষ ও পাঁজরের মধ্য থেকে বের হয়। এরপর দূর্বলতা নেমে আসে, এটা খেজুরের রসের দূর্গন্ধের ন্যায় দূর্গন্ধ বিশিষ্ট। আর এর দূর্গন্ধ আটার দূর্গন্ধের কাছাকাছি।

হাফিজ ইবনে হাজার (র) বলেছেন−

وَمَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَاءٌ أَبْيَضُ لَامِثْلَ بَيَاضٍ مَائُه رَقِيْقٌ وَلَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ

নারীর বীর্য হল সাদা কামরস, তবে পুরুষের ন্যায় নয়। এটি তরল, তাতে দুর্গন্ধ নেই।

এটাকে কোন কোন ফকীহ এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

وَمَنِيُّ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ وَقَدْ يَبْيَضُّ لِفَضْلِ قُوَّتِهَا তথা নারীর বীর্য হলুদ তরল। কখনও সাদা হয়, নারীর শক্তির দাপটে।

মযীর সংজ্ঞা ঃ ইবনে হাজার ও ইবনে নুজাইম বলেন–

هو ماءٌ أَبْيَضُ رقيقٌ وقد لَزِجٌ يَخْرُجُ عندَ المُلاعَبَةِ اوتَذَكُّرِ الجِمَاعِ او ارادَتِه مِن غيرِ شهوةٍ ولا دَفْقٍ ولا يَعْقِبُه فُتُورٌ ورُبَما لايُحَسُّ بخُرُوجِه وهُو أغلَبُ فِي النِّسَاءِ مِنَ الرجُلِ ـ

এটি সাদা তরল লাসা জাতীয় রস। এটি নির্গত হয় শৃঙ্গারের সময় অথবা সঙ্গমের কল্পনা করলে বা তার ইচ্ছা করলে যৌন চাহিদা ও বেগ ব্যতীত। এর পর দুর্বলতা নেমে আসে না, অনেক সময় তা নির্গত হওয়ার বিষয়টি অনুভূতও হয় না। এটি পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে বেশী ও প্রবল হয়ে থাকে।

ওয়াদীর সংজ্ঞা ঃ

هو ماءٌ أَبْيَضُ كَدِرٌ ثَخِينٌ يُشْبِهُ المَنِيَّ فِي الثَّخَانَةِ ويُخالِفُه فِي الكُدُورَةِ ولَا رَائِحةَ لهُ يخرُجُ عَقِيبَ البَوْلِ إذا كانتِ الطَّبِيعةُ مُسْتَمْسِكةً وعندَ حمل شيءٍ ثقيلٍ ويَخْرُجُ قطرةً او قطرتَين ونحوِهما ـ

এটি হল মলিন সাদা ঘন রস। ঘণত্বের দিক দিয়ে এটি বীর্যের মত, কিন্তু মলিনতার দিক দিয়ে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এর কোন দুর্গন্ধ নেই। এটি প্রস্রাবের পর নির্গত হয়। যখন মেজাজ স্বাভাবিক থাকে, ভারী জিনিস বহন করার সময় ও এটি বের হয়। এটি এক ফোঁটা বা অনুরূপ করে নির্গত হয়।

অদী কখনো পেশাবের পূর্বে আবার কখনও পেশাবের সাথে বের হয়। এ জন্য কোন কোন ফকীহ বলেছেন, পেশাবের সাথে বের হয়। আবার কেউ বলেছেন, পেশাবের আগে বের হয় এদুটোতে কোন বৈপরীত্য নেই।

বীর্য যখন যৌন কামনাসহ বের হবে তখন সর্ব সম্মতিক্রমে তা গোসল ওয়াজিবের কারণ হয়। আর যদি যৌন আবেদন ছাড়া বের হয়, তবে তাতে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীদের মতে তা গোসল ওয়াজিবকারী নয়। কোন কোন ফকীহের মতে গোসল ওয়াজিবকারী।

এরূপভাবে বীর্যের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। এ মযীর অপবিত্রতা এবং উযূ ভঙ্গের কারণ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। অবশ্য পবিত্র করার পদ্ধতিতে মতানৈক্য রয়েছে। আর অদী যে নাপাক এবং উযূ ভঙ্গকারী এবং এর পবিত্রকরণের পদ্ধতি সবগুলোতে ঐকমত্য রয়েছে। (বাহরু রায়েক ১/৬২, শরহুল মুহাজ্জাব ২/১৪০, শরহে আবু দাউদ ঃ ১৭৯-১৮০)

মযী সংক্রান্ত হাদীসগুলোর বিরোধাবসান

এখানে এ বিষয়টি লক্ষণীয় যে, হাদীসে বর্ণিত হযরত আলী (রা) এর উক্তি–

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه وسَلّمَ عَنِ الْمَذِيِّ দ্বারা বুঝা যায় যে, মযী সম্পর্কে তিনি নিজেই প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াতে এসেছে أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ আমি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। নাসায়ীর এক রেওয়ায়াতে হযরত আম্মার (রা) কে, আর দ্বিতীয় এক রেওয়ায়াতে হযরত মিকদাদ (রা) কে প্রশ্নকারী বলা হয়েছে এ সব রেওয়ায়াতও বিশুদ্ধ। এরূপভাবে আবু দাউদের (র) রেওয়ায়াতগুলোতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ (রা) এবং হযরত সাহলো ইবনে হুনাইফ কে এবং তাবরাণীর রেওয়ায়াতে হযরত উসমান (রা) কে প্রশ্নকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে, কিন্তু এ তিনটি রেওয়ায়াতই দুর্বল। অতএব, এগুলোর ইখতিলাফ গ্রহণযোগ্য হবে না, অবশ্য পূর্বের সহীহ রেওয়ায়াতগুলোতে বৈপরীত্ব লক্ষ্যণীয়।

১. ইবনে আব্বাস (রা) এর উত্তর এই দিয়েছেন যে, মূলত, প্রশ্নকারী হযরত আলী (রা) এবং প্রশ্নের মজলিসে হযরত আম্মার ও মিকদাদ (রা)ও ছিলেন। এজন্য কখনো তাদের দিকে ও সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজার (র) এই উত্তরটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন এ উত্তরটি নাসায়ীর রেওয়ায়াতের বিপরীত যাতে হযরত আলী (রা) বলেন, আমি প্রচুর মযী বিশিষ্ট ছিলাম।

রাসূল (স) এর কন্যা ছিলেন আমার স্ত্রী। অতএব, আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছিলাম। ফলে আমার পাশে বসা এক ব্যক্তিকে বললাম, তুমি জিজ্ঞেস কর। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বয়ং তিনি প্রশ্ন করেননি।

২. হাফিজ আসকালানী (র) বলেন, ইমাম নববী (র) এর উত্তরটি বিশুদ্ধ যে, হযরত আলী (রা) এ মাসআলাটি হযরত মিকদাদ এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) উভয়ের মাধ্যমে হয়তো জিজ্ঞেস করেছিলেন, যেহেতু হযরত আলী (রা) নির্দেশদাতা, আর ক্রিয়ার সম্বোধন যেরূপভাবে আদিষ্ট ব্যক্তির দিকে হয়, তদ্রূপভাবে নির্দেশদাতার দিকেও হয়, এ জন্য প্রশ্নের সম্বোধন হযরত আলী (রা) হযরত আম্মার (রা), হযরত মিকদাদ (রা) তিনজনের দিকে একই সময়ে সঠিক এবং বিশুদ্ধ। অতএব কোন বৈপরীত্য রইল না। (শরহে আবু দাউদ : ১৮০-১৮১)

سوال : اكتب الفرق بين المنيّ والمذيّ والوديّ؟

প্রশ্ন ঃ মনী, মযী ও অদীর মধ্যকার পার্থক্য লে'?

উত্তর ঃ মনী, মযী ও অদীর মধ্যকার পার্থক্য ঃ এ তিনটি বস্তুর পার্থক্য নিম্নরূপ-যৌন উত্তেজনা পূর্ণ অবস্থায় পুরুষাঙ্গ হতে যে, গাড় বা তরল পদার্থ নির্গত হয় এবং যা দ্বারা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মলাভ করে তাকে منى বা বীর্য বলা হয়। স্ত্রী সঙ্গম, স্বপ্নদোষ, কল্পনা প্রসূত কাম উত্তেজনা যে কোনো কারণেই এটা নির্গত হোক না কেন, তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব হবে।

১. সাধারণ কামভাব উদ্রেক হওয়ার ফলে চরম কামোত্তেজনা ব্যতীত খানিকটা আঠালো যে তরল পদার্থ বের হয় তাকে مذى বলে ।এটা বের হওয়ার পর শরীরে দূর্বলতা আসেনা; বরং কামস্পৃহা বৃদ্ধি পায়।

২. ফাতহুল মুলহিম এ রয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী জড়া-জড়ি, সঙ্গমের কল্পনা বা ইচ্ছার সময় যা বের হয় তাই مذى ।

৩. ইবনে হাজার একে ماء اصفر বলেছেন।

৪. এটা বের হলে পুরুষাঙ্গ এবং কাপড়ে বা শরীরের অন্য কোন স্থানে লাগলে তা ধৌত করে নিলেই তা পবিত্র হয়ে যায়।

৫. আর কোনরূপ উত্তেজনা ছাড়াই পেশাবের আগে বা পরে কিংবা কোথ দিলে বা বুঝা বহন করলে অথবা রোগের কারণে যে সাদা ও গাড় পদার্থ বিনা বেগে বের হয় তাকে ودى (অদী) বলে, এটা বের হওয়ার ফলেও গোসল ওয়াজিব হয় না। শুধুমাত্র উযূ ভঙ্গ হয়। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ধৌত করে অজু করে নিলেই পবিত্রতা অর্জিত হয়।

[এ প্রশ্নের উত্তর পূর্বের প্রশ্নোত্তরের অধীনেও অতিবহিত হয়েছে] (শরহে মিশকাত : ১/২৬০)

سوال : اذكر نبذةً مّن حياة سيّدنا مِقداد

প্রশ্ন ঃ হযরত মিকদাদ (র) এর জীবনী উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ হযরত মিকদাদ (র) এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি ঃ নাম মিকদাদ, উপনাম আবু আমর, আবু মা'বাদ। তার আসল পিতার নাম আমর। তাঁর পিতা বনু কিন্দা সম্প্রদায়ের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। আর তিনি আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুস যুহরীর সাথে মৈত্রীতে আবদ্ধ ছিলেন। আসওয়াদ মিকদাদ (র) কে পোষ্যপুত্র ঘোষণা দেন। আর এ কারণে তাকে ইবনে আসওয়াদ বলা হয়।

বংশধারা ঃ মিকদাদ ইবনে আমর ইবনে সা'লাবা ইবনে মালিক ইবনে রবীয়া ইবনে সুমামা ইবনে মতরুদ বাহরানী কিন্দী।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ৬ষ্ঠ মুসলমান।

জিহাদ ঃ বদর যুদ্ধসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি রাসূল (স) এর সাথে অংশ গ্রহণ করেছেন।

কামালাত ও গুণাবলি ঃ যির্র ইবনে হুবাইশ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইসলামের প্রথম যুগে যে সাত জন নিজেদের মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি তাদের মধ্যে একজন।

তিনি ছিলেন রাসূল (স) এর প্রিয় ভাজন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা) এর পিতা রাসূল (স) এর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, তিনি চার জনকে ভালবাসেন, তারা হল হযরত আলী, মিকদাদ, আবু যর, ও সালমান ফারেসী (রা)। তিনি ঝামেলামুক্ত জীবন পছন্দ করতেন, দায়িত্ব নিতে পছন্দ করতেন না। তাকে নামাযের ইমামতির জন্য বলা হলে তিনি তা অস্বীকার করতেন। একবার রাসূল (স) তাঁকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি দায়িত্ব নেননি।

হাদীস রেওয়ায়াত ঃ তিনি হাদীসের বিরাট খেদমত করে গেছেন। রাসূল (স) থেকে সর্বমোট ৪৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে বহু সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন হযরত আলী (রা), হযরত আনাস (রা), হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসর (রা), সুলাইমান ইবনে আমির (রা), আবু মা'মার আব্দুল্লাহ ইবনে সাখবারা আযদী (রা), আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (রা), জুবাইর ইবনে নুফাইর, আমর ইবনে ইসহাক, তাঁর কন্যা কারীমা, তাঁর স্ত্রী যুবাআ বিনতে যুবাইর ইবনে আব্দুল মুত্তালিব প্রমূখ।

ওফাত ঃ খলীফা ইবনে খাইয়াতের মত, তিনি হিজরী ৩৩ সনে মদীনা হতে তিন মাইল দূরে জুরুফ নামক স্থানে ওফাত লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল৭০ বছর। লোকজন তাঁর লাশ বহন করে মদীনায় নিয়ে আসেন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি সাতজন পুত্র কন্যা রেখে ইহকাল ত্যাগ করেন।

(ইকমাল : ৬১৬, উসদুল গাবাহ ৫/২৪২-২৪৩)

سوال : اَلْمَذِىّ طَاهِرٌ ام لا وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيه بَيِّنْ -

প্রশ্ন ঃ মযী পবিত্র নাকি পবিত্র না এ ব্যাপারে মতানৈক্য কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মযীর বিধান ঃ মযী পবিত্র কি পবিত্র না এ ব্যাপারে আল্লামা শাওকানী দুটি মাযহাব বর্ণনা করেছেন।

১. শিয়া সম্প্রদায়ের ফিরকায়ে ইসমিয়্যার নিকট মযী পবিত্র।

২. চারো ইমামসহ জুমহুর ও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের নিকট মযী অপবিত্র।

(নাইলুল আওতার ১/৫২, আওজাজুল মাসালেক ১/৯০, আমানিল আথবার ১/২৩৫)

سوال : ما حكمُ الَّذِى لَوْكَانَ نَجِسًا فَكَيْفَ يُطَهَّرُ مِنه بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন ঃ মযীর হুকুম কি? যদি অপবিত্র হয় তাহলে তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করার পদ্ধতি কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ মযী কাপড়ে লাগলে তা পাক করার পদ্ধতি ঃ কাপড়ে মযী লাগলে তা পাক করার পদ্ধতি কি হবে এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে তিনটি মাযহাব রয়েছে–

১. ইমাম আহমদ ও আহলে যাহিরের মতে, কাপড় ধৌত করার কোন প্রয়োজন নেই; বরং সংশ্লিষ্ট স্থানে শুধু পানি ছিটিয়ে দিলেই কাপড় পাক হয়ে যাবে।

২. ইমাম মালেক, শাফেয়ী এবং ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এর নিকট পানি দ্বারা ধৌত করে পবিত্র করা ওয়াজিব। পানির ছিটা দেয়া ও ঢেলার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হবে না।

৩. ইমাম আবু হানীফা (র) এর নিকট কাপড়ে যদি মযী লাগে তাহলে তা পেশাবের মত ঢিলা ও পানি উভয়টা দ্বারা পবিত্রতা হয়। (নায়লুল আওতার ঃ ১/৫২, আওযাজুল মাসালেক ১/৯০, আমানিল আহবার : ১/১৩৫)'

প্রথম মাযহাবে দলীল

عن سَهْلِ بْنِ حنيفٍ قال كنتُ اَلْقَى مِنَ الْمَذِى شِدَّةً وكنتُ اُكْثِرُ مِنه الْاِغْتِسَالَ فسألتُ رَسُولَ اللّٰه صلى وسلمَ عَنْ ذٰلك فقال اِنَّما يَجْزِيْكَ عَنْ ذٰلك الوضوءُ قلتُ يا رَسول الله فكيفَ بما يُصِيْبُ ثَوْبِى مِنه قال فَكَفِى لَكَ بِاَنْ تَاْخُذَ كَفًّا مِّنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِن ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى انه اَصَابَهُ.

অর্থাৎ....সাহলো ইবনে হুনাইফ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার অত্যাধিক মযী নির্গত হত, তাই আমি অধিক গোসল করতাম। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, মযী বের হওয়ার

পর উযূ করাই যথেষ্ট। তখন আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাপড়ে মযী লাগলে কি করব? তিনি বলেন, তোমার জন্য যথেষ্ট হবে কাপড়ের যে অংশে মযী লেগেছে তাতে এক আজলা পানি ছিটিয়ে দেবে। যাতে তা দূরীভূত হয়। (আবু দাউদ ১/২৮, তিরমিযী ১/৩১, ইবনে মাজাহ ৩৯) উক্ত হাদীসে نضح শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হল পানি ছিটিয়ে দেয়া। সুতরাং ধোয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাযহাবের দলীল

..... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ اَغْتَسِلُ حَتّٰى تَشَقَّقَ ظَهْرِىْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذُكِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَفْعَلْ اِذَا رَاَيْتَ الْمَذْىَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ وَاِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ ـ

অর্থাৎ .... হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার প্রায়ই মযী নির্গত হত, তাই আমি গোসল করতাম। এমনকি এ কারণে আমার পৃষ্ঠদেশ ব্যথাতুর বানিয়ে দিল। অতঃপর আমি বিষয়টি নবী করীম (স) এর খিদমতে উল্লেখ করি অথবা (রাবী বলেন) অন্য কারো দ্বারা পেশ করি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তুমি এরূপ করবে না। বরং যখনই তুমি মযী দেখবে, তখনই যৌনাঙ্গ ধৌত করবে এবং নামায আদায়ের জন্য উযূ করবে। অবশ্য যদি কোন সময় উত্তেজনা বশত: বীর্য নির্গত হয় তবে গোসল করবে। (বুখারী ১/৪১, মুসলিম ১/১৪৩, নাসায়ী ১/৩৬) উক্ত হাদীসে নবী করীম (স) হযরত আলী (রা) কে নির্দেশ দেন যে, اِغْسِلْ ذَكَرَكَ (তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত কর) পুরুষাঙ্গ ধৌত করার হুকুমের কারণ হল, মযী লাগা। অতএব, কাপড়ের হুকুমও তাই হবে।

আকলী দলীল ঃ মযী নাপাক। সুতরাং নাপাক বা পেশাব কাপড়ে লাগার কারণে যদি কাপড় ধৌত করা জরুরী হয়, তাহলে মযী কাপড়ে লাগলেও তা পবিত্র করার জন্য ধৌত করা জরুরী হবে।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

যে সমস্ত হাদীসে نضح শব্দ এসেছে এর দ্বারা পানি ছিটানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এর অর্থ হল হালকাভাবে ধুয়ে নেয়া। যার ইঙ্গিত হযরত আলী (রা) এর হাদীসেও প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া আরবী ভাষা ভাষীরা نضح দ্বারা গোসল বা ধৌত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

سوال : مَا الْحُكْمُ فِى غَسْلِ الذَّكَرِ اذا خَرَجَ مِنَ الذَّكَرِ الْمَذْىُ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الائمة بَيِّنْ مُفَصَّلًا؟

প্রশ্ন ঃ লিঙ্গ হতে মযী নির্গত হলে, ধৌত করার বিধান কি? এবং এ ব্যাপারে ইমামদের মতামত কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ মযী নির্গত হলে লিঙ্গ ধৌত করার বিধান ঃ মযী নির্গত হলে লিঙ্গ ধৌত করার বিধান কি এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম মালেক (র) এর মতে, মযী বের হলে পূর্ণ যৌনাঙ্গ ধৌত করা ওয়াজিব।

২. ইমাম আহমদ, আওযায়ী কোন কোন হাম্বলী ও কোন কোন মালেকীর মতে পূর্ণ যৌনাঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধৌত করা ওয়াজিব।

৩. হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে শুধু অপবিত্র স্থান ধৌত করাই যথেষ্ট, এর বেশী ধোয়া ওয়াজিব নয়।

(ফাতহুল মুলহীম ১/১৬১, বজলুল মাজহুদ ১/১৩১, আওযাজুল মাসালেক ১/৯০, আমানিল আহবার ১/২৫২, ১/২৩৭, ১/২৩৮, মাআরিফুস সুনান ১/৩৭৯)

দ্বিতীয় মাযহাবের দলীল ঃ ১

... عن عُرْوَةَ ... قَالَ فَسَاَلَهُ الْمِقْدَادُ فقال رسولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَاُنْثَيَيْهِ

অর্থাৎ .... উরওয়া (র) হতে বর্ণিত ..... রাবী বলেন, মিকদাদ (র) নবী করীমকে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঐ ব্যক্তির স্বীয় লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধৌত করা উচিত। (আবু দাউদ ১/২৮, নাসায়ী ১/৩৮)

দলীল ঃ ২

.... عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيدِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلم عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَالَ ذَاكَ الْمَذِيُّ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِى فَتَغْسِلُ مِنْ ذٰلِكَ فَرْجَكَ وَاُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْئَكَ لِلصَّلٰوةِ۔

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে গোসল ফরয হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করি এবং পেশাবের পর মযী নির্গত হওয়ার ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, এটা হল মযী। যৌনাঙ্গ থেকে যখন মযী নির্গত হয়, তখন তুমি তোমার লজ্জাস্থান ও অণ্ডকোষ ধৌত করবে। অতঃপর নামায আদায়ের জন্য উযূ করবে। (আবু দাউদ ঃ ১/২৮)

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধৌত করার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র) এর দলীল

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَجَعَلْتُ اَغْتَسِلُ حَتّٰى تَشَقَّقَ ظَهْرِى فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه وسلم او ذُكِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم لاتَفْعَلْ اِذَا رَأَيْتَ الْمَذِىَّ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ وَاِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ

অর্থাৎ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার প্রায়ই মযী নির্গত হত। তাই আমি গোসল করতাম। এমনকি এটা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে গেল, অতঃপর আমি বিষয়টি নবী করীম (স) এর খিদমতে উল্লেখ করি অথবা (রাবী বলেন) অন্য কারো দ্বারা পেশ করি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন তুমি এরূপ করবে না। বরং তুমি তোমার লিঙ্গাগ্রে মযী দেখলে তা ধৌত করবে এবং নামায আদায়ের জন্য উযূ করবে। অবশ্য যদি কোন সময় উত্তেজনাবশত: বীর্য নির্গত হয় তবে গোসল করবে। (বুখারী ঃ ১/৪১ মুসলিম ঃ ১/১৪৩ নাসায়ী ১/৩৬)

উক্ত হাদীসে নবী করীম (স) হযরত আলী (রা) কে শুধু লিঙ্গ ধৌত করার হুকুম দিয়েছেন, অণ্ডকোষ ধৌত করার হুকুম দেননি।

যৌক্তিক প্রমাণ ঃ মযী বের হওয়া এক প্রকার অপবিত্রতা। অন্যান্য অপবিত্রতা সম্পর্কে সবার ঐকমত্য রয়েছে যে, সেখানে শুধু অপবিত্র স্থান ধৌত করাই যথেষ্ট। অতিরিক্ত কোন অংশ ধৌত করা জরুরী নয়। যেমন পায়খানা বের হওয়া এক প্রকার অপবিত্রতা এতে শুধু নাপাক স্থান ধৌত করাই ওয়াজিব হয়। এমনিভাবে রক্ত বের হলেও যারা এটাকে অপিবিত্রতা সাব্যস্ত করেন, তাদের মতে শুধু নাপাক স্থানটি ধৌত করা আবশ্যক। কাজেই অন্যান্য অপবিত্রতার ন্যায় মযী নির্গত হলেও শুধু অপবিত্র স্থান ধৌত করাই জরুরী হবে। এর চেয়ে অতিরিক্ত কোন অংশ ধৌত করা জরুরী নয়। অবশ্য অপবিত্রতার পর নামাযের জন্য উযূ করা যেখানে অপবিত্র স্থান ছাড়া অন্য জায়গাও ধৌত করা আবশ্যক হয় এটি একটি আলাদা বিষয় (আমানিল আহবার ঃ ১/২৩৫ নায়লুল আওতার ঃ ১/৫২ আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/৯০, ইযাহুত ত্বহাবী ১/১৬৯, ১৭৫)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ ১. যে সকল হাদীসে পুরো যৌনাঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধৌত করার কথা বলা হয়েছে এর দ্বারা ওয়াজিব উদ্দেশ্য নয়; বরং মুস্তাহাব উদ্দেশ্য।

২. ইমাম ত্বহাবী (র) বলেন, অণ্ডকোষদ্বয় ধোয়ার হুকুম শরঈ নয়; বরং চিকিৎসার্থে। কারণ ঠাণ্ডা পানি যেরূপভাবে পেশাব ও দুধ বন্ধ করে দেয়, এরূপভাবে মযী ও বন্ধ করে। কারণ অণ্ডকোষের সাথেই মযীর সম্পর্ক।

হাদীসগুলো সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা

মাসআলাটি কে জিজ্ঞাসা করেছে ঃ

১. তিরমিযী শরীফের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় স্বয়ং আলী (রা) মাসআলাটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

২. বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় হযরত আলী (রা) হযরত মিকদাদকে উক্ত মাসআলাটি জিজ্ঞেস করতে বলেন।

৩. অন্য এক রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় হযরত আলী (রা) আম্মার ইবনে ইয়াসার কে উক্ত মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে বলেন। বাহ্যিকভাবে রেওয়ায়াতগুলোর মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা যায় তার সমাধান নিম্নরূপ–

১. আলী (রা) এর দিকে জিজ্ঞাসার সম্বন্ধ করা হয়েছে রূপকভাবে। কেননা, তিনি মিকদাদ ও আম্মারকে মাসআলাটি জিজ্ঞেস করতে বলেন, আর নির্দেশদাতার দিকে কাজের সম্বন্ধ করলে সেটা রূপকার্থে হয়। যেমন– بنى الامير المدينة। এখানে বাদশাহ শহর তৈরী করেনি কিন্তু সে নির্দেশদাতা হওয়ার কারণে রূপকভাবে তার দিকে কাজের সম্বন্ধ করা হয়েছে।

২. আলী (রা) সর্ব প্রথম আম্মার ও মিকদাদ এর কোন একজনকে জিজ্ঞাসা করতে বলেন, অতঃপর অপরজনকে জিজ্ঞেস করতে বলেন, কিন্তু তারা জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে দেরী করে, ফলে বিষয়টি তার অত্যন্ত জরুরী হওয়ার কারণে পরবর্তীতে তিনি স্বয়ং নিজেই মাসআলা সম্পর্কে হুজুরকে জিজ্ঞেস করেন।

৩. অথবা, প্রথমে বিষয়টি জানতে লজ্জাবোধ হচ্ছিল কিন্তু পরবর্তীতে লজ্জা পরিত্যাগ করে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। কেননা, সময়ের পরিবর্তনে মানুষের মনমানসিকতাও পরিবর্তন হয়।

৪. অথবা, প্রথমে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে বলেন, কিন্তু এর দ্বারা তার অন্তর পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ করেনি বিধায় ইয়াকিন ও পূর্ণ প্রশান্তির জন্য নিজেই জিজ্ঞেস করেন। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ২৪৩-২৪৪)

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান ঃ

প্রশ্ন ঃ হযরত আলী (রা) এর বক্তব্য فَانِّى اَسْتَحْيِى اَنْ اَسْاَلَهُ عَنْ ذَالِكَ . . . الخ হুজুর (স) এর কন্যা তার ঘরে থাকায় তিনি উক্ত মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করেন। কাজেই এটা আলী (রা) এর বক্তব্য فَانِّى اَسْتَحْيِى اَنْ اَسْاَلَهُ .... এর বিপরীত মনে হয়।

উত্তর ঃ স্বয়ং তিনি মাসআলাটি রাসূলের নিকট জিজ্ঞেসা করেন, কিন্তু তিনি কোন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেননি অর্থাৎ এ সমস্যায় কে পড়েছে তা উল্লেখ না করে মুতলাকভাবে জিজ্ঞেস করেছেন। আর এটা حياء এর বিপরীত নয়। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ২৪৪)

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান

প্রশ্ন ঃ লিঙ্গ তো একটি তাহলে হাদীসে নবী (স) কিভাবে مذاكير বহুবচন শব্দ ব্যবহার করলেন?

উত্তর ঃ ১. আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, مَذَاكِير শব্দটি খিলাফে কিয়াস ذكر এর বহুবচন,

২. এটা স্বয়ং বহুবচন, এর কোন একবচন নেই।

৩. কেউ বলেন, مذاكير এর একবচন হল مذكار। مذاكير বহুবচন শব্দ ব্যবহার করার কারণ হল লিঙ্গ ও দুই অণ্ডকোষ এই তিনটির সমন্বয়ে বা اجزاء। এর এতেবারে جمع এর সীগা ব্যবহার করা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে কোন কোন ইমাম বলেন, লিঙ্গ ও অণ্ডকোষদ্বয় ধৌত করা ওয়াজিব। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারণ সবগুলোকে ধৌত করার কথা বলা হয়েছে মুস্তাহাব হিসাবে যাতে করে অণ্ডকোষদ্বয় সংকুচিত হয়ে যায় এবং মযী বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই মুস্তাহাব হিসাবে এটা ধৌত করার কথা বলা যায়, পবিত্রতা হিসাবে ওয়াজিব এর জন্য নয়।

(ইযাহুত ত্বহাবী ঃ ১/১৭১)

অথবা, مذاكير দ্বারা অঙ্গত্রয় ধোয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করা সহীহ নয়। কেননা, মূলত নাপাকযুক্ত স্থান ধৌত করা ওয়াজিব, তবে সতর্কতা স্বরূপ অণ্ডকোষদ্বয়কেও ধৌত করা মুস্তাহাব। কেননা, কখনো মযী এদিক সেদিক লেগে যায় এমনকি অণ্ডকোষেও লাগার সম্ভাবনা আছে, তাই সেটাকে মুস্তাহাব হিসাবে ধৌত করতে হবে। কাজেই ধৌত করার হুকুম ওয়াজিব বলা বিশুদ্ধ নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ অণ্ডকোষ ধৌত করার হুকুম শরীয়তের বিধান হিসাবে নয়। বরং চিকিৎসা স্বরূপ ছিল। কেননা, অণ্ডকোষে পানি লাগার দ্বারা অণ্ডকোষ সংকুচিত হবে এবং মযী বের হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ওয়াজিব হওয়ার কথা বলা সহীহ নয়। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ২৪৫)

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

١٥٨. اخبرنا محمدُ بْنُ عبدِ الاَعْلٰى قالَ حدّثنا خالدٌ حدّثنا شعبةُ عَنْ عاصمٍ انّه سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ قالَ اَتَيْتُ رجلاً يُدْعٰى صَفْوانُ بْنُ عَسَّالٍ فقعدتُ على بابِه فخرجَ فقالَ مَا شَانُكَ؟ قلتُ اَطْلُبُ العِلْمَ قالَ اِنَّ المَلٰئِكَةَ تَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطالبِ العِلمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ فقالَ عَنْ اَيِّ شَيْئٍ تَسْاَلُ؟ قلتُ عَنِ الخُفَّيْنِ قالَ كُنَّا اِذا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى سفرٍ اَمَرَنَا اَنْ لاَّ نَنْزِعَهُ ثَلٰثًا اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ولٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ ونَوْمٍ -

অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব-পায়খানার পর উযূ

অনুবাদ ঃ ১৫৮. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)........আসিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যির্র ইবনে হুবায়শকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান ইবনে আস্সাল নামক এক ব্যক্তির নিকট আসলাম এবং তার দরজায় বসে রইলাম। তিনি বের হয়ে বললেন, তোমার খবর কি? আমি বললাম, ইলমের সন্ধানে এসেছি। তিনি বললেন, ইলম অন্বেষণকারীদের সন্তুষ্টির উদ্দেশে ফেরেশতাগণ ডানা বিছিয়ে দেন। তারপর তিনি বললেন, কোন বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা করতে চাও? আমি বললাম, মোজা পরিধান সম্বন্ধে। তিনি বললেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সফরে থাকতাম, তিনি আমাদের আদেশ করতেন, আমরা যেন একমাত্র জানাবত ব্যতীত পায়খানা-পেশাব এবং নিদ্রার কারণে তিন দিন পর্যন্ত তা না খুলি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله قَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَضَعُ اَجْنِحَتَهَا الخ ঃ যখন সফরের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসার জবাবে হযরত যির ইবনে হুবাইশ যখন বললেন, আমি ইলমে দ্বীন অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছি। তখন হযরত সাফওয়ান রা. তার ব্যাপারে যে মহা ফযীলত বর্ণিত হয়েছে সেটা শুনান। যাতে দ্বীন অন্বেষণের গুরুত্ব ও ফযীলত উপলব্ধি করে। দ্বীনি শিক্ষা অন্বেষণে আগ্রহী হয়। আর সে ফযীলত হল, اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ .... الخ নিশ্চয় ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল এই ফযীলতের অধিকারী ঐ সকল লোকেরাই হবেন, যারা দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা লাভ করেন, অন্যান্য ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য এ ফযীলত নয়। কারণ অন্যান্য ইলম এর ক্ষেত্রে এ মর্যাদা নেই।

ইবনুল কাইয়ূম আহমদ ইবনে শোয়াইব থেকে নকল করেছেন, যে আমরা বসরার কোন এক মুহাদ্দিস এর দরসে বসে ছিলাম। তখন তিনি অনুচ্ছেদের হাদীসটি আমাদের সামনে বর্ণনা করেন। উক্ত মজলিসে এক মু'তাজিলা ছিল। সে ঠাট্টাছলে বলল, আগামিকাল জুতা পরিধান করে চলাচল করব এবং উক্ত জুতা দ্বারা ফেরেশতাদের পর পা দ্বারা মাড়িয়ে দেব। সে যখন জুতা পরিধান করে ঠাট্টা ছলে চলতে শুরু করল তখন তার উভয় পা বিকলাঙ্গ ও অবাস হয়ে গেল এবং তার পা এমন এক কঠিন ব্যধিতে আক্রান্ত হল যা পাকে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলল। আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে এমন পরিস্থিতি থেকে হিফাজত করুন।

এ অনুচ্ছেদের হাদীসে এসেছে الا مِن جنابة -এই استثناء مفرغ টা হল -তাকদীরী ইবারত হল, اَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا مِنْ حَدَثٍ مِنَ الْاَحْدَاثِ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ কেননা, জানাবাতের কারণে যার উপর গোসল ওয়াজিব হয়েছে তার জন্য মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ নয়। বরং মোজা খুলে অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় ধৌত করা আবশ্যক। যখন পূর্ববর্তী বাক্য اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ দ্বারা বুঝা গেলো যে, জানাবাতের কারণে মোজা খুলে পা ধৌত করা আবশ্যক। অতঃপর وَلٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ বলে একটি সংশয় নিরসন করেছেন, যে সংশয় পূর্ববর্তী বাক্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে; আর তা হল মোজা খোলার বিধান শুধুমাত্র জানাবাতের সাথে খাস। এটা ছাড়া হদসের অন্যান্য সবাব যেমন- পায়খানা-পেশাব ইত্যাদি কারণে মোজা খুলতে হবে না।

[বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْغَائِطِ

١٥٩. اخبرنا عمرو بْنُ عَلِيّ واسماعيل بْنِ مسعود قالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شعبة عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ كُنَّا اِذَا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى سَفَرٍ اَمَرَنَا اَنْ لاَّ نَنْزِعَهُ ثَلٰثًا اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلٰكِنْ مِّنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ -

অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানার পর উযূ

অনুবাদ ঃ ১৫৯. আমর ইবনে আলী ও ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)........যির্র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফওয়ান ইবনে আস্সাল (রা) বলেছেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে সফরে বের হতাম তখন তিনি আমাদের আদেশ করতেন আমরা যেন একমাত্র জানাবাত ব্যতীত পায়খানা-পেশাব এবং নিদ্রার কারণে তিন দিন পর্যন্ত তা না খুলি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

এ হাদীস দ্বারা ও এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মোজার উপর মাসেহ বৈধ হওয়ার বিধান এমন হাদীসের সাথে খাস যার কারণে শুধু উযূ ওয়াজিব হয়, গোসল নয়। কেননা, কেউ যদি পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা অর্জন করার পর মোজা পরিধান করে। অতঃপর তার সাথে এমন হদস সংশ্লিষ্ট হল যা গোসলকে অপরিহার্য করে যেমন- জুনুবী হওয়া। তাহলে এ ক্ষেত্রে মোজার উপর মাসেহ বৈধ হবে না। বরং মোজা খুলে পদযুগল ধৌত করতে হবে। মোটকথা, এমন কারণ যার দ্বারা উযূ নষ্ট হয়ে যায় যেমন পায়খানা-পেশাব, ঘুম ইত্যাদি শরীয়ত এ ক্ষেত্রে মোজা খুলে পদযুগল ধৌত করার হুকুম দেয়নি। বরং তার উপর মাসেহ করার হুকুম দিয়েছে। اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ কিন্তু জানাবাতের কারণে মোজাদ্বয়কে খোলা জরুরী। কেননা, জানাবাত বারংবার হয় না। কাজেই জানাবাতের কারণে মোজাদ্বয় খুলে পদযুগল ধৌত করার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে হদস এমন নয়। কেননা, তা বারংবার সংঘটিত হয়। তাই জটিলতা রোধের লক্ষ্যে এ ক্ষেত্রে মোজার উপর মাসেহ বৈধ করা হয়েছে। কিন্তু জানাবাতের অবস্থা এমন নয়। কাজেই দুটি বিধান ভিন্ন হওয়া যুক্তিরও দাবী। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ২৪৮)

[পূর্বের বাকী অংশ]

বরং তার উপর মাসেহ করবে, আর لكن এর আতফ হল উহ্য বাক্যের উপর যার উপর اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ প্রমাণ বহন করে। আর من غائط উহ্য فعل এর সাথে متعلق তাকদিরী ইবারত হল نَنْزِعُ مِنْ جَنَابَةٍ وَلٰكِنْ لاَّ نَنْزِعُ مِنْ غَائِطٍ...الخ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল لكن এর পূর্ববর্তী বিষয় পরবর্তী বিষয়ের বিপরীত এবং لكن এর পরবর্তী বিষয় একটি সংশয় এর জবাব যা لكن এর পূর্ববর্তী বিষয় দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- বলা হয় যায়েদ এসেছে কিন্তু তার ভাই আসেনি। যেমন এখানে لكن এর পূর্ববর্তী বিষয় পরবর্তী বিষয় এর বিপরীত। ঠিক তদ্রূপ উক্ত হাদীসের পূর্ববর্তী বিষয় এর এবং পরবর্তী বিষয়ের হুকুমের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য এই যে, শরীয়ত জানাবাতের কারণে মোজা খোলার বিধান দিয়েছে। কিন্তু পেশাব পায়খানার কারণে মোজা খোলার বিধান দেয়নি। বরং মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি প্রদান করেছে। এখন তাকদীরী ইবারত হবে-

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلّم اِذَا كُنَّا سَفَرًا اَنْ نَنْزِعَ خِفَافَنَا مِنَ الْجَنَابَةِ فِى الْمُدَّةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَلٰكِن لاَنَنْزِعُ فِيْهَا مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ وَغَيْرِهَا .

এ হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ২৪৬-২৪৭)

الْوُضُوْءُ مِنَ الرِّيْحِ

١٦٠. اخبرنا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَاَخْبَرَنِى محمدُ بْنُ منصورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُسَيَّبِ وعَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ وَهُوَ عبدُ اللّٰهِ بنُ زيدٍ قَالَ شَكٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرجلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتّٰى يَجِدَ رِيْحًا اَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا -

বাতাস নির্গমনে উযূ

অনুবাদ ঃ ১৬০. কুতায়বা (র)........আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অভিযোগ করল, সে নামাযে কিছু অনুভব করে। তিনি বললেন, সে নামায পরিত্যাগ করবে না যতক্ষণ না গন্ধ ও শব্দ শুনতে পায়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله الرجلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِى الصَّلٰوةِ الخ ঃ রাসূল (স) এর নিকট এক ব্যক্তির শিকায়াত পেশ করা হল, যে তার নামাযরত অবস্থায় মাঝে মাঝে মনে হয় হদস সংঘটিত হয়েছে। অথচ বাস্তবে তার হদস হয়নি। যখন এ ধরনের ওয়াসওয়াসা নামাযরত অবস্থায় সংঘটিত হয়। তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কি করবে এর জবাব রাসূল (স) বলেন لا ينصرف যখন এমন অবস্থার সম্মুখিন হবে তখন নামাযকে ছেড়ে দিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয় নিশ্চিত ধারণা না হয় যে, বায়ু বের হয়েছে বা আওয়াজ শুনেছে অথবা সে গন্ধ পেয়েছে।

আলোচ্য বিধান ঐ সুরতে প্রযোজ্য হবে, যখন বায়ু নির্গত হওয়ার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয়। আর যদি নিশ্চিতভাবে জানে যে, বায়ু নির্গত হয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে আওয়াজ শোনা বা গন্ধ পাওয়া উযূ ভঙ্গের জন্য শর্ত নয়। কাজেই যখন বায়ু নির্গত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতরূপে জানা যাবে তখন উযূ ভেঙ্গে যাবে। চাই আওয়াজ শোনা যাক কিংবা না যাক, নাকে গন্ধ আসুক কিংবা না আসুক।

আল্লামা আইনী (র) বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এবং ইমাম নববী মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লেখেন, যে আলোচ্য হাদীসটি থেকে ইসলামী বিধানের একটি বড় ধরনের নীতি বের হয়ে আসে। আর তা হল, প্রত্যেক বস্তুকে তার স্ব-স্ব উসূলের উপর বাকী রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এর বিপরীত কোন বিষয়ের নিশ্চিত ধারণা না হয়। আর এ ব্যাপারে যে সংশয় পেশ আসে তা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এ ধরণের একটি মাসআলা হল যদি কোন ব্যক্তির পবিত্র থাকার বিষয়টি নিশ্চিত থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও হদস সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয় তাহলে তার পবিত্রতা বাকী আছে বলে ফাতওয়া দেয়া হবে। চাই এই সংশয়টা নামাযের মধ্যে সৃষ্টি হোক, কিংবা নামায ভিন্ন অন্য অবস্থায় সংঘটিত হোক। এটাই জুমহুর ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীন এর বক্তব্য এবং সলফ ও খলফ এর মাযহাবও এটা। অবশ্য সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি যদি নিশ্চিত হয় আর পবিত্রতা বাকী থাকা না থাকার বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়, তাহলে এক্ষেত্রে উম্মতের ইজমা হল উযূ নষ্ট হয়ে যাবে পুনরায় উযূ করা তার উপর আবশ্যক হবে। (দুররুল মুখতার প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৫৬)

وَلَوْ اَيْقَنَ بِالطَّهَارَةِ وَشَكَّ بِالْحَدَثِ اَوْ بِالْعَكْسِ اَخَذَ بِالْيَقِيْنِ .

উপরোক্ত আলোচনার সারকথা হল, উযূ বাকী না থাকার চেয়ে থাকার বিষয়টি যদি নিশ্চিত হয়, তাহলে উযূ নষ্ট হবে না। অবশ্য যদি আওয়াজ শুনতে পায় বা গন্ধ পায় তাহলে উযূ নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা,সাধারণত শোনা ও গন্ধ পাওয়ার দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান হাসিল হয়। আর যদি উযূ বাকী থাকার চেয়ে না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয় তাহলে উযূ নষ্ট হয়ে যাবে। যদি কোন বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান না হয় তাহলে ظن غالب এর উপর আমল করবে। আর যদি পবিত্রতা বাকী থাকা সত্ত্বেও উযূ নষ্ট হওয়ার বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি হয় তাহলে উযূ নষ্ট হবে না। কাজেই কেউ যদি এ অবস্থায় নামাযকে ভেঙ্গে দেয় তাহলে সে আমলকে বাতিল করলো, আর আমলকে বাতিল করতে নিষেধ করা হয়েছে। একথার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে আলোচ্য হাদীসে। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ২৪৮-২৪৯)

الْوُضُوْءُ مِنَ النَّوْمِ

١٦١. اخبرنا اسمعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قالا حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابى سلمة عن ابى هريرة رض ان رسول الله ﷺ قال اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها ثلاث مرات فانه لايدري اين باتت يده -

নিদ্রার কারণে উযূ

অনুবাদ ঃ ১৬১. ইসমাঈল ইবনে মাসউদ ও হুমায়দ ইবনে মাসআদাহ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কেউ যখন নিদ্রা হতে জাগ্রত হয় তখন সে যেন তার হাত পানির পাত্রে প্রবিষ্ট না করায় যতক্ষণ না তার উপর তিনবার পানি ঢালে, কেননা সে জানে না তার হাত রাত্রে কোথায় ছিল।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

মুসান্নিফ (র) نواقض وضوء সম্পর্কে আলোচনা করছেন। এর মধ্য হতে একটি হল ঘুম এটাও উযূ ভঙ্গকারী এটাকে সাব্যস্ত করার জন্য হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস এনেছেন। এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে।

হাদীসে যে, اناء শব্দ এসেছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল পাত্র, যাতে উযূ করার জন্য পানি ভর্তি করে রাখা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় যে في الوضوء শব্দ এসেছে, এর واو বর্ণটি যবরযোগে, অর্থ উযূর পানি। এ থেকে বুঝা যায় যে, যখন কোন মানুষ ঘুম থেকে জাগ্রত হবে এবং উযূ করতে ইচ্ছা করবে। তখন তার উভয় হাত পানি ভর্তি পাত্রে প্রবেশ করানোর পূর্বে হাতকে কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে। অতঃপর পাত্র থেকে পানি নিয়ে উযূ করবে। استيقاظ এর কয়েদ দ্বারা কেউ যেন এটা না বুঝে যে, হাদীসের মধ্যে যে, নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা ঘুম হতে জাগ্রত ব্যক্তির সাথে খাস। আর অপবিত্রতা হাতে লাগার সম্ভাবনা থাকেল হাত ধৌত করার বিধান অকাট্য, সুন্নতে মুয়াক্কাদা। অন্যথায় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া না হওয়া সকল অবস্থায় হাত ধৌত করা সুন্নত। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের বক্তব্য এটাই। আর হাদীসের মধ্যে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তার দ্বারা নাহিয়ে তানযীহী উদ্দেশ্য, তাহরিমী নয়। কাজেই যদি হাতে নাপাক না থাকে এবং হাত ধৌত করা ব্যতীত পাত্রে হাত ঢকিয়ে দেয় তাহলে পানি নাপাক হবে না। দ্বিতীয় কথা হল হাদীসের মুখাতাব হল জ্ঞান সম্পন্ন, বালেগ মুসলমানগণ। সুতরাং ঘুম হতে জাগ্রত ব্যক্তি যদি ছোট বাচ্চা কিংবা পাগল হয় অথবা কাফের হয়। আর সে পানির পাত্রে হাত ঢুকায়ে দেয়, কিন্তু তাদের হাতে নাপাকের কোন আছর না থাকে, অথবা নাপাক থাকাটা নিশ্চিত নয়। তাহলে এ ব্যাপারে দু'ধরণের মতামত রয়েছে–

১. তাদের বিধানও জ্ঞান সম্পন্ন, বালেগ মুসলমানদের ন্যায়। কেননা, তার হাত রাত্রে কোথায় কোথায় লেগেছে তা জানা নেই।

২. দ্বিতীয়ত: হাত ঢুকানোর দ্বারা তেমন কোন সমস্যা হবে না। বরং পানি পবিত্রই থাকবে। কেননা সন্দেহের ভিত্তিতে কোন কাজের নিষিদ্ধতা সাব্যস্ত হয় না। আর ঐ সকল ব্যক্তি আলোচ্য হাদীসের মুখাতাব নয়।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) كيفيت وضوء অনুচ্ছেদে الخ .... فانه لايدري এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করত: বলেন, হাত ধৌত করার পর দীর্ঘ সময় বে-খবর থাকায় এ সংশয় সৃষ্টি হয় যে, হয়তোবা হাতে ময়লা বা নাপাক লেগেছে যার ফলে এখন যদি পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে দেয় তাহলে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে এবং পানিকে নষ্ট করা হবে। আর হুজুর (স) এ কারণে পানিতে হাত ঢুকাতে নিষেধ করেছেন। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ২৪৯০২৫০)

سوال : مَا اِخْتِلَافُ الائمَّةِ فِى نَقْضِ الوُضُوءِ بالنَّوْمِ بيِّن موضحا ـ

প্রশ্ন ঃ নিদ্রায় উযূ ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ নিদ্রায় উযূ ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ ঃ ঘুম উযূ বিনষ্টকারী, তবে কোন অবস্থায় উযূকে বিনষ্ট করে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা পেশ করা হচ্ছে–

১. ইমাম মালেক (র) বলেন, চীৎ হয়ে কিংবা সাজদা অবস্থায় ঘুমালে তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, তখন নতুনভাবে উযূ করতে হবে। চাই ঘুম কম হোক কিংবা বেশী হোক। সুতরাং বসা অবস্থায় অধিক ঘুমে বিভোর হলেও উযূ ওয়াজিব হবে না। তবে নিদ্রা যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তবে উযূ ওয়াজিব হবে।

২. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বসা অবস্থায় যদি নিতম্ব মাটির সাথে লাগা থাকে, যদিও ঘুম বেশী হয় তবু উযূ ভাঙ্গবে না। এটা ব্যতীত যেভাবেই ঘুমাক না কেন, নিদ্রায় উযূ ভেঙ্গে যাবে।

৩. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, চীৎ হয়ে নিদ্রা যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনভাবে নিদ্রা গেলে উযূ ওয়াজিব হবে না। ফিকহের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে, চীৎ হয়ে ঘুমালে, ঠেস লাগিয়ে ঘুমালে, অথবা এমন বস্তুর সাথে হেলান দিয়ে ঘুমালে যা সরালে ঘুমন্ত ব্যক্তি পড়ে যাবে তবে এমন ঘুমে উযূ ভেঙ্গে যায়, আর যদি নামাযের মধ্যে এমনভাবে ঘুমায় যে, নামাযের কোনো সুন্নত তরক হয় না। বরং যথা যথভাবে পালিত হয় তাতে নামায কিংবা উযূ কিছুই নষ্ট হবে না। কাজেই দাঁড়ানো অবস্থায় হোক বা বসা অবস্থায় হোক, কোন কিছুর সাথে হেলান দেওয়া ব্যতীত ঘুমালে অথবা রুকু সাজদাগুলো যথা নিয়মে পালন করা অবস্থায় ঘুমালেও উযূ নষ্ট হবে না। যদিও ঘুম দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

হানাফীদের দলীল ঃ নবী করীম (স) বলেছেন–

لاَيَجِبُ الوُضُوْءُ عَلَي مَنْ نَامَ جَالِسًا اوقَائِمًا او قَاعِدًا حتّى يَضَعَ جَنْبَهُ فَاِنَّهُ اِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُه وفى رِوايَةٍ اِنَّمَا الوُضُوْءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا ـ

যে ব্যক্তি দাঁড়ানো বা বসাবস্থায় কিংবা রুকু ও সাজদা অবস্থায় ঘুমালে তার উযূ বাধ্যতামূলক নয় বরং উযূ বাধ্যতামূলক সে ব্যক্তির জন্য যে চীৎ হয়ে শুয়ে ঘুমায়, এমননিভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর হাদীস দ্বারাও তা পরিষ্কার বুঝা যায়। (শরহে মিশকাত ঃ ১/২৬৭–২৬৮)

بَابُ النُّعَاسِ

١٦٢. اخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ اذا نعس الرجل وهو يصلي فلينصرف لعله يدعوا على نفسه وهو لا يدري -

অনুচ্ছেদ : তন্দ্রার বর্ণনা

অনুবাদ : ১৬২. বিশর ইবনে হিলাল (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তির নামাযে তন্দ্রা আসে, তবে সে যেন হালকাভাবে নামায শেষ করে চলে যায়। কেননা অজ্ঞাতসারে সে নিজের উপরই বদদোয়া করে বসবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

নামাযরত অবস্থায় কোন ব্যক্তির উপর যদি তন্দ্রা আচ্ছাদিত হয়। তাহলে তার করনীয় কি? সে কি নামায অব্যাহত রাখবে না কি অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করবে? হাদীস দ্বারা বুঝা যায় তন্দ্রাবস্থায় নামায আদায় করার অনুমতি নেই। কেননা, হাদীসে فلينصرف শব্দ এসেছে, যার দ্বারা বুঝা যায় তন্দ্রাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযকে অব্যহত না রাখা উচিৎ। এর কারণ হল, তন্দ্রা অবস্থায় পূর্ণ অনুভূতি ও বোধশক্তি থাকে না। কাজেই হতে পারে এই অবস্থায় তার মুখ থেকে এমন বদ দুআমূলক শব্দ বের হবে যার দ্বারা তার নিজের উপরেই শাস্তি নেমে আসবে। অথবা অজ্ঞাতসারে সে নিজের জন্যই বদ দোয়া করে ফেলবে। কাজেই এ অবস্থায় নামায অব্যাহত রাখা শরীয়তে পছন্দনীয় নয়। সুতরাং এ অবস্থায় ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত। যাতে করে ঘুমানোর ভাবটা শেষ হয়ে যায়।

রাসূলের বাণী فلينصرف এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তন্দ্রা অবস্থায় যে নামায আদায় করা হয় তা ভেঙ্গে দেওয়া চাই। কারণ এ রকম করলে আমল বাতিল করা অনিবার্য হয়। আর এটা করতে নিষেধ করা হয়েছে, বরং হুজুর (স) এর বাণীর উদ্দেশ্য হল, এমন অবস্থার সম্মুখীন হলে নামাযকে দীর্ঘায়িত না করে দ্রুত নামায কে পূর্ণ করে নেবে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেলো কাউকে তন্দ্রা আচ্ছাদিত করে ফেললে উযূ নষ্ট হয় না। কেননা, যদি ঐ অবস্থায় উযূ নষ্ট হয়ে যেত তাহলে শরীয়ত প্রণেতা এই হুকুম আরোপ করতেন না যে, হতে পারে তন্দ্রাগ্রস্থ ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে নিজের জন্য বদ দোয়া করে ফেলবে বরং এরূপ হুকুম করতেন যে, তন্দ্রাগ্রস্থ ব্যক্তির উযূ নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং এ অবস্থায় তার নামায সহীহ হবে না। কিন্তু নবী (স) এমন বলেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় তন্দ্রা উযূ বিনষ্টকারী নয়। (শরহে উর্দু নাসায়ী : ২৫০/২৫১)

হযরত ইবনে উমর (রা) এর এ হাদীস শর্তের সীগার সাথে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ এতে اَفَاَتَوَضَّأُ শব্দ এসেছে আর আগের অধ্যায়ের হাদীসে যে ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তাতেও صيغة امر এসেছে। এর দ্বারা ইবনে হুবাইব মালেকী এবং দাউদে জাহেরী প্রমাণ পেশ করেন। তারা বলেন, যদি জুনুবী ব্যক্তি গোসলের পূর্বে শোয়ার ইচ্ছা করে তাহলে তার জন্য উযূ করা ওয়াজিব। জুমহুর ইমামগণ উযূ করাকে ওয়াজিব বলেন না। তাদের নিকট উযূ করা মুস্তাহাব, জুমহুরের মাযহাবের সমর্থন মারফূ হাদীসে পাওয়া যায় যা ইবনে আব্বাস (রা) রেওয়ায়াতে করেছেন। এখানে এসেছে إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ إِذَا أَقِمْتُ إِلَى الصَّلٰوةِ رواه أَصْحَابُ السُّنَنِ অর্থাৎ হুজুর (স) বলেন যে, ওয়াজিব হিসাবে আমাকে উযূ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যখন নামায আদায়ের ইচ্ছা করি এই হাদীসে শোয়ার পূর্বে জুনুবীর উপর গোসল ওয়াজিব না হওয়ার উপর স্পষ্ট প্রমাণ শরীয়ত প্রণেতা নবী (স) হসরের সাথে উল্লেখ করেছেন। কাজেই শুধুমাত্র নামাযের ইচ্ছা করলেই উযূ ওয়াজিব হবে, অন্যাথায় নয়। অনুরূপভাবে ইবনে উমরের হাদীস দ্বারা ও জুমহুরের মাযহাব শক্তিশালী হয়। ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে এটা রেওয়ায়াতে করেছেন, এই হাদীসে এসেছে যে, জনাব নবী করীম (স) কে জিজ্ঞেস করা হল আমাদের মধ্যে কেউ কি জানাবতের অবস্থায় শুইতে পারে? তিনি জবাব দিলেন, نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ হ্যাঁ, শুইতে পারে এবং ইচ্ছা করলে উযূ করতে পারে। এর দ্বারা বোঝা যায় জুনুবীর উপর উযূ ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব।

الْوُضُوْءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

١٦٣. اخبرنا هارونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قال حدّثنا معنٌ حدّثنا مالكٌ ح والحارثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِراءةً عليه وانا اسمعُ عن ابنِ القاسمِ قال حدّثنا مالكٌ عن عبدِ اللّٰه بْنِ اَبِى بكرِ بْنِ محمدِ بن عمرِو بْنِ حَزْمٍ اَنّه سَمِع عُرْوَةَ بْنَ الزُّبيرِ يقولُ دخلتُ عَلٰى مروانَ بْنِ الحَكَمِ فذكرْنَا مايكونُ منه الوضوءُ فقال مَرْوانُ مَن مَسِّ الذكرِ الوضوءُ فقال عروةُ ما عَلِمْتُ ذٰلكَ فقال مَرْوانُ اَخْبرَتْنِى بُسْرةُ بنتِ صَفْوانَ اَنّها سَمِعَتْ رسولَ اللّٰهِ ﷺ يقولُ اذا مسّ احدُكم ذكره فَلْيَتوضّأْ-

١٦٤. اخبرنا احمدُ بْنُ محمدِ بْنِ المُغِيرةِ قال حدّثنا عثمانُ بْنُ سعيدٍ عَن شُعَيبٍ عَنِ الزّهرِىّ قال اَخبرَنِى عبدُ اللّٰهِ بنُ اَبِى بكرِ بْنِ عمرِو بْنِ حزمٍ انّه سَمِع عُرْوةَ بنَ الزُّبَيرِ يقولُ ذكرَ مروانُ فِى اِمارَتِه عَلَى المَدِيْنَةِ انّه يَتَوضَّأُ مِن مَسِّ الذَّكَرِ اِذا اَفْضَى اِلَيهِ الرَّجُلُ بِيَدِه فَانْكَرْتُ ذٰلكَ وقلتُ لاَ وُضوءَ عَلٰى مَنْ مَسّه فقال مَرْوانُ اَخْبرَتْنِى بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوانَ اَنّها سَمِعَتْ رَسولَ اللّٰهِ ﷺ ذكر مَايَتَوضَّأُ مِنْه فَقال رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَيَتَوضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ قال عُرْوَةُ فَلَمْ اَزَلْ اُمارِى مَرْوانَ حتّٰى دَعا رجلاً مِن حَرَسِه فَاَرْسَلَه اِلٰى بُسْرَةَ فَسَالَها عَمّا حَدَّثَتْ مَرْوانَ فَاَرْسَلَتْ اِلَيه بُسْرَةُ بِمِثْلِ الّذِى حَدَّثَنِى عَنْها مَرْوانُ -

পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে উযূ

অনুবাদ ঃ ১৬৩. হারূন ইবনে আবদুল্লাহ ও হারিছ ইবনে মিসকীন (র).........আব্দুলালাহ ইবনে আবু বকর ইবনে আমর ইবনে হাযম থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়া ইবনে যুবায়রকে বলতে শুনেছেন যে, আমি মারওয়ান ইবনে হাকাম-এর নিকট এসে কোন্ কোন্ কারণে উযূ করতে হয় তা জিজ্ঞাসা করলাম। মারওয়ান বললেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযূ করতে হবে। উরওয়া বললেন, আমি তা অবগত নই। মারওয়ন বললেন, বুসরা বিনতে সফওয়ান (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন তোমাদের কেউ স্বীয় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তখন তার উযূ করা উচিত।

১৬৪. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুগীরা (র)......... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে আমর ইবনে হায্ম (র) আমাকে বলেছেন, তিনি উরওয়া ইবনে যুবায়রকে বলতে শুনেছেন যে, মাওয়ান তাঁর মদীনায় শাসনকালে উল্লেখ করেছেন– কোন ব্যক্তি স্বীয় হস্ত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে সে উযূ করবে। আমি অস্বীকার করলাম এবং বললাম, যে ব্যক্তি তা স্পর্শ করে তার উযূ করতে হবে না। তখন মারওয়ান বললেন, বুসরা বিনতে সফওয়ান আমাকে বলেছেন যে, তিনি যে যে কারণে উযূ করতে হয় রাসূলুল্লাহ (স)-কে তা উল্লেখ করতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যে, আর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযূ করতে হবে। উরওয়া বলেন, অতএব আমি এ ব্যাপারে মারওয়ানের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হইলাম। অবশেষে তিনি তাঁর দেহরক্ষীদের একজনকে ডেকে বুস্রার নিকট প্রেরণ করলেন। বুস্রা তার নিকট ঐরূপই বলে পাঠালেন যেরূপ মারওয়ান আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন বুস্রা থেকে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : اكتُب اِختلافَ العُلماءِ فِى مَسْئلةِ الوُضُوءِ بِمَسِّ الفَرْجِ

প্রশ্ন ঃ লিঙ্গ স্পর্শ করার মাসআলার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য কি? লেখ।

উত্তর ঃ লিঙ্গ স্পর্শ করার বিধানের ব্যাপারে ইমামদের অভিমত ঃ হাত ছাড়া দেহের অন্য কোন উযূর সাথে পুরুষাঙ্গের স্পর্শ হলে উযূ ভাঙ্গবে না। এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু হাতের দ্বারা নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযূ ভঙ্গ হবে কি না এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে এবং মালিক এর সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযূ ভেঙ্গে যাবে। ইসহাক, আওযাঈ, যুহরী ও মুজাহিদ (র) এর অভিমতও অনুরূপ। তবে এ ব্যাপারে তিন ইমামের মাঝে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে।

ক. ইমাম মালিক (র) বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শে উযূ ভঙ্গের তিনটি শর্ত রয়েছে–

* হাতের তালু দ্বারা স্পর্শ করা।

* কোন পর্দা ছাড়া সরাসরি স্পর্শ করা।

* স্বাদ বা উপভোগের উদ্দেশ্যে স্পর্শ করা।

খ. ইমাম আহমদ (র) বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ নিঃশর্তে উযূ ভঙ্গকারী।

গ. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যদি খোলা হাতের তালুতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তবে তা উযূ ভঙ্গকারী হবে। তাঁর মতে মহিলাদের লজ্জাস্থান স্পর্শ করার হুকুমও তাই।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) সাহেবাইন, ইবনে মুবারক, সুফিয়ান সাওরী, ইব্রাহীম নাখয়ী ও হাসান বসরী (র) এর মতে, পুরুষাঙ্গ, মহিলাদের লজ্জাস্থান ও পায়ু পথ স্পর্শ করা উযূ ভঙ্গকারী নয়। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইমাম মালেক (র) এর অভিমতও তাই।

ইমামত্রয়ের দলীল

عَنْ عُرْوَةَ يَقُوْلُ دَخَلْتُ عَلٰى مَرْوَانَ ابنِ الحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَايَكُوْنُ مِنْهُ الوُضُوْءُ فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ عروةُ ما عَلِمْتُ ذٰلك فقال مَروانُ اخبرتْنِيْ بُسْرَةُ بِنتِ صَفوانَ انّها سَمِعَتْ رسولَ اللّٰه صلى الله عليه وسلم مَنْ مَسَّ ذَكَرَه فَلْيَتَوَضَّأْ .

অর্থাৎ..... উরওয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি কারণে উযূ করার প্রয়োজন হয়? জবাবে মারওয়ান বললেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে। তখন উরওয়া জিজ্ঞাসা করেন আপনি তা কিরূপে জানলেন? মারওয়ান বলেন, বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) আমাকে জানিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে সে যেন অবশ্যই উযূ করে নেয়। (তিরমিযী : ১/২৫, নাসায়ী ১/৩৮, ইবনে মাজাহ ৩৮)

(٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيرَةَ رض عَنْ رسولِ اللّٰه صلى الله عليه وسلم قَالَ اذا اَفْضٰى احدُكُم بِيَدِه الى ذَكَرِه لَيْسَ بَيْنَه وبَيْنَها شيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ.

(٣) ان النبي صلعم قالَ مَنْ اَفْضٰى بِيَدِهِ الى ذَكَرِه لَيْسَ دُوْنَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوْءُ

আবু হানীফা (র) এর দলীল

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قالَ قَدِمْنَا عَلٰى نَبِيِّ اللّٰه صلعم فَجَاءَ رجلٌ كانّهُ بَدَوِيٌّ فقال يَانَبِيَّ اللّٰهِ ما تَرٰى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بعدَ مَايَتَوَضَّأُ فقال رسولُ اللّٰه صلعم هَلْ هُوَ اِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ او بُضْعَةٌ مِنْه .

অর্থাৎ .... কায়েস ইবনে তলক থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, একদা আমরা নবী করীম (স) এর নিকট গমন করি। এমন সময় সেখানে একজন গ্রাম্য লোক আগমন করে মহানবী (স) কে জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহর নবী! উযূ করার পর যদি কোন ব্যক্তি নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তবে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? রসূল (স) বললেন, পুরুষাঙ্গ তো তার দেহের গোশতের একটি টুকরা বা খণ্ড ব্যতীত কিছু নয়।

(আবু দাউদ : ১/২৪, তিরমিযী : ১/২৫, নাসায়ী: ১/৩৮, ইবনে মাজাহ :৩৭)

উক্ত হাদীসে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ করার কারণে যেমন উযূ নষ্ট হয় না। অনুরূপ পুরুষাঙ্গ ও শরীরের অন্যান্য উযূর ন্যায় একটি অঙ্গ মাত্র। তাই এটাকেও স্পর্শ করলে উযূ ভঙ্গ হবে না।

২. হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা ও আলী (রা) এর উক্তি। তারা প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে বলেন– مَا اُبَالِيْ ذَكَرِيْ مَسَسْتُ فِي الصَّلٰوةِ اَوْ اُذُنِيْ او اَنْفِيْ

অর্থাৎ আমি নামাযে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলাম না কি আমার কান বা নাক স্পর্শ করলাম, তা নিয়ে আমার কোন ভাবনা নেই। (ত্বহাবী : ১/৪৭)

৩. عن بسرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره او انثييه او رفغيه (اى اصول فخذيه) فليتوضأ للصلوة -

অর্থাৎ বুসরা বিনতে সাফওয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (স) কে বলতে শুনেছি, যে তার পুরুষাঙ্গ বা অণ্ডকোষ অথবা উরুর মূল অংশ স্পর্শ করবে সে যেন নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ঃ ১/২৪৫)

উক্ত হাদীসে পুরুষাঙ্গের সাথে অণ্ডকোষ ও উরুর মূল অংশ স্পর্শ করার কারণে উযূ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। অথচ অণ্ডকোষ ও উরুদ্বয়ের মূল অংশ স্পর্শ করার কারণে কেউ উযূ ভঙ্গের কথা বলেন না। এ সকল হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার দ্বারা উযূ ভঙ্গ হবে না। এছাড়া আরো অনেক রেওয়ায়াত এর সমর্থন করে।

যৌক্তিক প্রমাণ-১

হাতের বহিরাংশ অথবা হাতের কব্জি দ্বারা স্পর্শ করলে তাদের মতে উযূ ভঙ্গ হবে না। অতএব, এগুলোর ন্যায় হাতের তালুর ভিতরাংশ দিয়ে স্পর্শ করলেও উযূ ভাঙ্গবে না। ইমাম ত্বহাবী (র) এর মতে, এ যৌক্তিক প্রমাণ ইমাম শাফেয়ী ও মালিক (র) এর বিরুদ্ধে দলীল হতে পারে। কিন্তু ইমাম আহমদ এর বিরুদ্ধে প্রমাণ হতে পারে না। এ কারণে আরেকটি যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করা হল–

যৌক্তিক প্রমাণ-২

উরু একটি গোপন অঙ্গ এবং সতর। যদি উরু পুরুষাঙ্গের সাথে লাগে যেমনটা সর্ব সময় লেগেই থাকে। তবে সর্ব সম্মতিক্রমে উযূ ভঙ্গ হয় না। অতএব, হাতের তালু যেটি সতর এবং গোপন অঙ্গ নয় তা পুরুষাঙ্গের সাথে লাগলে আরো উত্তমরূপে উযূ ভঙ্গ হবে না। এটাই যুক্তির দাবী। (ইযাহুত্ব ত্বহাবী- ১/২২২-২৩৬)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

১. আহনাফের হাদীস বর্ণনাকারী হযরত তালক (রা) হল, একজন পুরুষ। পক্ষান্তরে তিন ইমামদের হাদীসের রাবী বুসরা কিবতে সাফওয়ান হল একজন মহিলা। আর এক্ষেত্রে মহিলার চেয়ে পুরুষের বর্ণিত হাদীস অধিক শক্তিশালী। কেননা, একথা তো সর্বজন বিদিত যে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য দু'জন মহিলার সাক্ষ্যের সমান। অতএব, তালকের হাদীস অধিক গ্রহণযোগ্য। (দরসে মিশকাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৪২)

২. বুসরার হাদীসে মারওয়ান নামক একজন রাবী রয়েছেন। যিনি খলীফা হওয়ার পূর্বে নির্ভরযোগ্য ছিলেন। কিন্তু খলীফা হওয়ার পর বিভিন্ন কারণে তিনি অনির্ভরযোগ্য হয়ে যান। তাছাড়া তিনি বুসরার নিকট এক পুলিশ পাঠিয়ে উক্ত হাদীস জেনে নেন। আর সে পুলিশ অজ্ঞাত। সুতরাং তা দলীলযোগ্য নয়। (ত্বহাবী ১/৪৩)

৩. তালকের হাদীস বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, هذا الحديث احسن

অর্থাৎ এই হাদীসটি সর্বোত্তম (তিরমিযী ১/২৫)

৪. এ হাদীস দ্বারা পরোক্ষভাবে পেশাব করা উদ্দেশ্য।

৫. এর দ্বারা আভিধানিক উযূ বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ শুধু হাত ধৌত করা। যেমন– হাদীসে এসেছে। الوضوء قبل الطعام অর্থাৎ খাবার পূর্বে উযূ কর। (তানযিমুল আশতাত ঃ ১/১৩৩, তিরমিযী : ২/৬)

৬. এটাকে প্রকৃত উযূ ধরে নেওয়া হয়। তখন এটা মুস্তাহাব গণ্য হবে। অতএব, আর কোন সমস্যা থাকে না।

৭. হাদীসগুলোর মাঝে পারস্পরিক বিরোধের সময় কিয়াসের শরণাপন্ন হতে হয়। কিয়াস দ্বারাও হানাফীদের মাযহাবের সমর্থন হয়। কারণ মল-মূত্র ইত্যাদি যা সরাসরি নাপাক সেগুলো স্পর্শ করলে যেহেতু কারো মতেই উযূ ভঙ্গ হয় না। তাই সুনির্দিষ্টভাবে যেসব উযূর পবিত্রতা সর্ব সম্মত সেগুলো স্পর্শ করলে তো উযূ ভঙ্গ না হওয়ারই কথা।

৮. সাহাবীদের বিভিন্ন বর্ণনা হযরত তালক (র) এর হাদীসের সমর্থন করে। যেমন হযরত আলী থেকে বর্ণিত আছে– আমি আমার নাক স্পর্শ করি অথবা কান স্পর্শ করি কিংবা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করি তাতে ক্ষতির কিছু নেই।

৯. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (র) বলেছেন তিনটি হাদীস বিশুদ্ধ নয়। প্রথমত: সকল নেশাকারক বস্তুই মদ। দ্বিতীয়ত: যে নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তাকে উযূ করতে হবে। তৃতীয়ত: অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

১০. আর হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীস ও হযরত তালক (র) ও অন্যান্য সাহাবীদের হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

১১. ফুকাহায়ে কেরাম উযূ ভঙ্গের ৮টি কারণ লিখেছেন, তন্মধ্যে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযূ ভঙ্গ হবে এমন কোনো কারণের উল্লেখ নেই। (শরহে মিশকাত ১/২৬৯)

سوال : يُفْهَمُ مِنَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ أَنَّ مَسَّ الذَّكَرِ نَاقِضٌ لِلْوُضُوْءِ وَمِنَ الثَّانِي خِلَافُهُ؟ فَمَا هُوَ التَّوْفِيْقُ؟

প্রশ্ন ঃ প্রথম হাদীস দ্বারা বুঝা যায় লিঙ্গ স্পর্শ করলে উযূ ভঙ্গ হবে। অথচ দ্বিতীয় হাদীসটি তার বিপরীত উভয়ের মধ্যকার সামঞ্জস্য কি?

উত্তর ঃ হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার বৈপরীত্যের সমাধান ঃ হযরত বুসরা বিনতে সাফওয়ান এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, লিঙ্গ স্পর্শ দ্বারা উযূ নষ্ট হবে। আর হযরত তলক ই নে আলী (রা) এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় লিঙ্গ স্পর্শ দ্বারা উযূ নষ্ট হবে না। তাই উভয় হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান। এ বৈপরীত্যের সমাধানে মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতামত নিম্নরূপ–

১. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন– أَحَادِيْثُ الرِّجَالِ أَقْوَى لِأَنَّهُمْ أَحْفَظُ لِلْعِلْمِ وَأَضْبَطُ

অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস মহিলা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের চেয়ে অধিক মজবুত বিধায় বুসরার হাদীসের উপর হযরত তালক এর হাদীস প্রাধান্য লাভ করবে। অতএব, লিঙ্গ স্পর্শের কারণে উযূ ভঙ্গ হবে না।

২. অথবা, বলা যায়, হযরত বুসরা এর হাদীস মানুসূখ হয়ে গেছে।

৩. ইমাম ত্বহাবী (র) বলেন, হযরত উরওয়া (র) বুসরার হাদীসকে মারফু সূত্রে বলেননি, কিন্তু হযরত তলক এর হাদীসটি মারফু। তাই বুসরার হাদীসটি হাদীসে মারফুর মোকাবেলায় গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪. ইমাম তিরমিযী বলেন, বুসরার হাদীসের সনদে বিভ্রান্তি রয়েছে। তাই তা প্রত্যাখ্যাত।

৫. হযরত বুসরা (র) এর হাদীসটি মুনকার। তাই এটা হযরত তালক এর হাদীসের মুকোবেলা করতে পারে না।

৬. ইবনে হুমাম বলেন, বুসরার হাদীসে مَسّ الذكر দ্বারা بول এর প্রতি কিনায়া করা হয়েছে। যেহেতু লিঙ্গ স্পর্শের ফলে পেশাবের ফোটা কিংবা মযী বা বীর্যপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সন্দেহের ফলে উযূর কথা বলা হয়েছে। আর সন্দেহ না হলে উযূর প্রয়োজন নেই। এটাই তলক এর হাদীস দ্বারা ইশারা করা হয়েছে।

৭. অথবা, এখানে وضوئی لغوی উদ্দেশ্য وضوء شرعی নয়। (শরহে নাসায়ী ১/২০৯/২১০)

سوال : حَقِّقْ كَلِمَةَ مُضْغَةٍ وَبُضْعَةٍ

প্রশ্ন ঃ مُضْغَةً ও بُضْعَةً শব্দদ্বয়ের বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ঃ مُضْغَةً শব্দের তাহকীক ঃ مضغة শব্দটি একবচন, বহুবচনে مُضَغٌ শব্দটি مَضْغٌ মাসদার থেকে নির্গত হয়েছে। যেমন– قِطْعَةُ اللَّحْمِ গোশতের টুকরা। طَعَامٌ يَسِيْرٌ ঐ পরিমাণ খাদ্য যা দ্বারা জীবন বাঁচে। যেমন– হারীরী গ্রন্থকার বলেন– وَلَا أَمْلِكُ مُضْغَةً

بضعة শব্দের তাহকীক ঃ بُضْعَةٌ শব্দটি একবচন, ب যবর ও যের উভয় হরকত দিয়ে পড়া যায়। বহুবচনে بضع ـ بضع ـ بضاع ـ بضاعات শব্দটি اَلْبَضْعُ بِمَعْنَى الْقَطْعِ থেকে নির্গত হয়েছে। অর্থ হচ্ছে–

১. قطعة اللحم তথা গোশতের টুকরা।

২. ب বর্ণে পেশ হলে অর্থ হবে الفرج তথা যৌনাঙ্গ। আলোচ্য হাদীসে এটা উদ্দেশ্য নয়। (শরহে নাসায়ী ১/১১১)

سوال : أَيْنَ وَمَتَى دَخَلَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ

প্রশ্ন ঃ উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) কখন মারওয়ান ইবনে হাকাম এর নিকট গমন করেন?

উত্তর ঃ মারওয়ান এর নিকট উরওয়ার গমনের সময় ঃ মারওয়ান ইবনে হাকাম যখন মদীনার গভর্ণর ছিলেন, তখন হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা) তার নিকট গমন করেন। তখন তাঁরা উভয়ে مس ذكر সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। (শরহে নাসায়ী ১/২১২)

سوال : مَتٰى قَدِمَ سَيِّدُنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدِيْنَةَ الْمُنَوَّرَةَ؟ اذكر نبذًا مِّنْ اَحْوَالِه .

প্রশ্ন ঃ তলক ইবনে আলী কখন মদীনায় আগমন করেন, তাঁর জীবনী সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর ঃ হযরত তলক ইবনে আলীর আগমন কাল ঃ হযরত তলক ইবনে আলী প্রথম হিজরীতে মসজিদে নববী নির্মাণকালে ইয়ামেন থেকে একটি প্রতিনিধি দলসহ মদীনায় রাসূলের নিকট আগমন করেন।

হযরত তলক ইবনে আলীর জীবনী ঃ নাম তলক, পিতার নাম আলী, উপনাম اَبُو عَلِى الْيَمَانِى তাকে তলক ইবনে ছুমামাও বলা হয়। তিনি হিজরতের পর একটি প্রতিনিধি দল সহ মদীনার আগমণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি আজীবন ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। হাদীসের প্রসারে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাঁর থেকে তাঁর পুত্র কাইস অনেক হাদীস বর্ণনা করেন।

سوال : مَنْ هِىَ بُسْرَة اكتب نبذةً مِّنْ حَيَاتِهَا .

প্রশ্ন ঃ বুসরা (রা) কে? তার জীবনী সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর ঃ বুসরা (রা) এর জীবনী ঃ নাম বুসরা, পিতার নাম সাফওয়ান। এজন্য তাকে বুসরা বিনতে সাফওয়ান বলা হয়। তিনি (মহিলা সাহাবীয়া) ইসলামের প্রথম দিকে ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম কবুলের পর থেকে তিনি মহিলাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করেন। তার দাওয়াতের ফলে অনেক মহিলা ইসলাম কবুল করেন। যে কোন মাসআলায় আটকে গেলে রাসূল (স) এর দরবারে চলে আসতেন। মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দেয়া হলে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। সারা জীবন ইসলামের খেদমতে কাটানোর পর ঈমানের উপর ইন্তিকাল করেন।

سوال : ما مَعْنَى الْوَفْدِ؟ ومتى شُرِعَ الْوُضُوْءُ؟ حَقِّقْ كَلِمَةَ الْوُضُوْءِ .

প্রশ্ন ঃ وَفْد শব্দের অর্থ কি? কখন উযূ ফরজ করা হয়? উযূ শব্দটির তাহকীক কর।

উত্তর ঃ وفد শব্দের আভিধানিক অর্থঃ وفد শব্দটি وافد এর বহুবচন। যেমন صَاحِبٌ এর বহুবচন হচ্ছে صَحْبٌ এটা وَفَدَ يَفِدُ وَفْدًا থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে اَلْقُدُوم رَسُوْلًا তথা প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করা। অতএব, وفد এর অর্থ হচ্ছে প্রতিনিধি। পবিত্র কুরআনে শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে এভাবে–

وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا

وفد এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ ১. মু'জামুল ওয়াসীতে আছে- الوَفْدُ جَمَاعَةٌ مُخْتَارَةٌ لِلتَّقَدُّمِ فِى لِقَاءِ ذِى الشَّانِ অর্থাৎ ওয়াফদ এমন নির্বাচিত দলকে বলে যাদেরকে পদস্থজন ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রতিনিধিরূপে পাঠান হয়।

২. ইমাম নববী (র) বলেন– هُوَ عِصَابَةٌ اُرْسِلَتْ نِيَابَةً عَنِ الْقَوْمِ

অর্থাৎ এমন দল যা কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হয়।

৩. তাহরীর গ্রন্থকার বলেন–

اَلْجَمَاعَةُ الْمُخْتَارَةُ مِنَ الْقَوْمِ لِيَتَقَدَّمُوْاهُمْ فِى لِقَاءِ الْعُظَمَاءِ وَالْمَصِيْرِ اِلَيْهِمْ فِى الْمُهِمَّاتِ .

আধুনিক পরিভাষায় শব্দটি প্রতিনিধি দল ও মিশন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

উযূ ফরয হওয়ার সময়কাল ঃ উযূ কখন ফরয হয়েছে। এ ব্যাপারে একাধিক মত পাওয়া যায়। যেমন–

১. ইবনে জাহশ (র) এর মতে কুরআন নাযিলের প্রথম দিকে উযূ সুন্নত ছিল। হিজরতের এক বছর পূর্বে যখন নামায ফরয হয় তখন উযূও ফরয করা হয়েছে। যেমন– সূরা আল-মায়িদায় ইরশাদ হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ ... الخ

২. কেউ কেউ বলেন, হিজরতের পর মদীনায় উযূ ফরয হয়েছে।

৩. জুমহুর ফকীহদের মতে, **ইসলামের প্রথম থেকেই উযূ ফরয ছিল। নামায ফরয হওয়ার পর সেই হুকুমকে** পুনরাবৃত্তি করা হয়। وضوء এর তাহকীক পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। (শরহে নাসায়ী ১/২১২)

بابُ تَرْكِ الوُضُوْءِ مِنْ ذٰلِكَ

١٦٥. اخبرنا هنّادٌ عَنْ مُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو قال حدّثنا عبدُ اللّٰهِ بنُ بَدْرٍ عن قَيْسِ بْنِ طَلْقِ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ قال خَرَجْنا وفْدًا حتّى قَدِمْنا على رسولِ اللّٰهِ ﷺ فبايَعْناه وصَلَّيْنا معَه فلمّا قَضَى الصلوةَ جاءَ رجلٌ كانّه بَدَوِيٌّ فقال يا رَسُوْلَ اللّٰهِ ما تَرٰى فِىْ رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَه فِى الصَّلوةِ قال وهَلْ هُوَ اِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْكَ او بُضْعَةٌ مِنْكَ -

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করায় উযূ না করা

অনুবাদ ঃ ১৬৫. হান্নাদ (র)........তলক ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এলাম, তারপর তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করলাম এবং তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করলাম। নামায শেষ হলে এক ব্যক্তি আসলো, মনে হল যেন সে একজন গ্রাম্য লোক। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি নামাযে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে তার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, এটা তোমার শরীরের এক টুকরা গোশ্‌ত বৈ আর কি? অথবা তিনি বললেন, তা তোমার শরীরের একটি অংশ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله هَلْ هُوَ اِلاَّ مُضْغَةٌ .... الخ ঃ এটা রাবীর সংশয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যেমনি ভাবে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ করার দ্বারা উযূ নষ্ট হয় না লিঙ্গ স্পর্শের দ্বারাও উযূ নষ্ট হয় না। মেশকাত শরীফের সংকলক তলক এর হাদীস উল্লেখ করার পর মহিউস সুন্নাহ এর বক্তব্য নকল করেছেন। আর তা হল তলক এর হাদীস আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীস এর মাধ্যমে মানসূখ হয়ে গেছে। কেননা, আবু হুরায়রা (রা) তলক এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর তলক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কাজেই আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসটি হল ناسخ আর তা হল- اِذا اَفضَى احدُكُم بِيَدِهِ اِلَى ذَكَرِه لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْئٌ فَلْيَتَوَضَّأْ

কিন্তু আল্লামা তুরপুশতী উক্ত দাবীর উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন, যে তাদের দাবী অমূলক, ভিত্তিহীন। এর ভিত্তি হল ধারণার উপর। হ্যাঁ, আমরা তার দাবীকে মানতে পারি যদি সে এটা প্রমাণ করতে পারে যে, আবু হুরায়রা (রা) এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। অথবা, সে তার দেশে ফিরে গিয়েছেন পরবর্তীতে সে আর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসেননি। অন্যথায় নয়। সম্ভবত আবু হুরায়রা (রা) এর জানা ছিল না যে, আবু হুরায়রা (রা) এর ইসলাম গ্রহণের পর তলক হাদীসটি শুনেছেন। লেখক বলেন, ওয়াকেদীসহ প্রমূখ ব্যক্তিদের বক্তব্য দ্বারা তুরপুশতীর মতটি শক্তিশালী হয়েছে।

ওয়াকেদী ও ইবনে সা'দ স্পষ্ট করে বলেন যে, হযরত তলক বনী হানীফার সাথে উপস্থিত ১০ জন ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন। তারা নবম হিজরীতে আগমন করেন। হাফেজ ইবনে কাছির ও আল্লামা আইনী একথা ওয়াকীদী থেকে নকল করেন এবং এটাকেই অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন। এ বক্তব্য অনুসারে বুসরা ও আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীস মানসূখ মানতে হবে। কেননা, হযরত বুসরা ইসলামের শুরু যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুজুরের সাহচর্য লাভ করেন। আর আবু হুরায়(রা) সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং হযরত তলক (র) তার রেওয়ায়াতকৃত হাদীস হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর দুই বৎসর পরে শোনেন।

মোটকথা, শাফেয়ী মাযহাবপন্থীগণ যদি নসখের বক্তব্য গ্রহণ করেন। তাহলে বুসরা ও অন্যান্যদের হাদীস শুরু যুগের হওয়ার কারণে তলকের হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়ে যাবে। আর যদি ترجيح এর পদ্ধতি গ্রহণ করেন তাহলে এ ব্যাপারে কিছু বক্তব্য রয়েছে- একটি وجه ترجيح হল যারা লিঙ্গ স্পর্শ করার কারণে উযূ ভাঙ্গার প্রবক্তা। তাদের নিকট উযূ ভঙ্গকারী হাদীসের محل সুনির্দিষ্ট নয়। কারণ তার মেসদাক এর ব্যাপারে কঠিন ইযতেরাব রয়েছে। ইমাম শাফেয়ীসহ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ বলেন, তার মেসদাক হল باطن كف হাতের অভ্যান্তর অংশ। কাজেই যদি হাতের উপরাংশ দ্বারা স্পর্শ করে তাহলে উযূ নষ্ট হবে না। ইমাম আহমদ (র) ظاهر كف ও باطن كف উভয়টাকে মেসদাক সাব্যস্ত করেন। কাজেই যে কোনটার দ্বারা স্পর্শ করলেই উযূ নষ্ট হয়ে যাবে। *[বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]*

تركُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَاتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ

١٦٦. اخبرَنا محمدُ بْنُ عبدِ اللّٰهِ بْنِ عبدِ الحَكَمِ عَن شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قالَ اَخبرَنا ابنُ الهَادِ عَنْ عَبْدِ الرحمٰنِ بْنِ القَاسِمِ عَنِ القَاسِمِ عَن عائِشَةَ قالتْ اِنْ كانَ رسولُ اللّٰه ﷺ يُصَلِّي وَانّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اِعْتِراضَ الجَنازةِ حتّٰى اِذا ارادَ انْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِه -

١٦٧. اخبرَنا يعقوبُ بنُ ابراهيمَ قال حدّثنا يَحيٰى عَن عُبيدِ اللّٰهِ قال سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ محمّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قالتْ لَقَدْ رَايْتُمُوْنِي مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّٰه ﷺ ورَسُولُ اللّٰه ﷺ يُصَلِّي فَاِذا اَرادَ اَن يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُهَا اِلَيَّ ثم يَسْجُد -

١٦٨. اخبرَنا قُتَيْبَةُ عَن مالِكٍ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَن ابي سَلمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قالتْ كُنْتُ اَنامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِه فَاِذا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي فَاِذا قَامَ بَسَطْتُهُمَا والبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ -

١٦٩. اخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللّٰه بْنِ المُبَارَكِ ونُصَيْرُ بْنُ الفَرَجِ واللفظُ لَه قالا حَدّثَنا ابُو اُسَامَةَ عَن عُبيدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ محمدِ بْنِ يحيٰى بنِ حَبَّانَ عَنِ الاَعْرَجِ عَن اَبِي هُرَيرةَ رَضِيَ اللّٰهُ عنه عَنْ عَائِشَةَ قالتْ فَقَدتُّ النبيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَجَعَلْتُ اَطْلُبُه بِيَدِي فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلٰى قَدَمَيْهِ وهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وهُوَ سَاجِدٌ يقولُ اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ واَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَما اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ۔

কামভাব ব্যতীত কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে স্পর্শ করলে উযূ না করা

অনুবাদ ঃ ১৬৬. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নামায আদায় করতেন, আর আমি জানাযার ন্যায় তাঁর সামনে শায়িত থাকতাম। এমনকি তিনি যখন সাজদা দিতে ইচ্ছা করতেন তখন আমাকে তাঁর পা দ্বারা স্পর্শ করতেন।

১৬৭. ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে আড়াআড়ি শুয়ে থাকতে দেখেছি, আর রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত অবস্থায় নামায আদায় করতেন। যখন তিনি সাজদা করতে মনস্থ করতেন আমার পা স্পর্শ করতেন তখন আমি তা আমার দিকে টেনে নিতাম।

[পূর্বের বাকী অংশ]

ইমাম মালেক (র) এর বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত ও ইমাম আহমদ এর এক বর্ণনা অনুযায়ী যদি উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করে তাহলে উযূ নষ্ট হবে, অন্যথায় নয়। কোন কোন ব্যক্তি বলেন, উযূ ভঙ্গের জন্য উত্তেজনা ও আনন্দ এর কোন শর্ত নেই স্পর্শ করলেই উযূ নষ্ট হবে, কেউ কেউ লিঙ্গ স্পর্শ করা উযূ ভঙ্গকারী হওয়ার জন্য بالقصد এর কয়েদ বৃদ্ধি করেছেন। কেউ বিষয়টিকে আম রেখেছেন। যা হোক, উযূ ভঙ্গ হওয়ার প্রবক্তাদের নিকট বুসরার হাদীসের محمل ই নির্দিষ্ট হয়নি। তার বিপরীত তলক এর হাদীস স্পষ্টরূপে উযূ ভঙ্গ না হওয়ার উপর দালালত করে। আর উযূ ভঙ্গ না হওয়ার প্রবক্তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। কাজেই তলক এর হাদীস বুসরার হাদীসের উপর অগ্রগণ্য সাব্যস্ত হল। সুতরাং তলক এর হাদীসের উপর আমল করাই উচিত।

তৃতীয় ঃ সব সময় যে সকল মুআমালার সম্মুখীন হতে হয় সেসব ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা দলীল পেশ গ্রহণযোগ্য নয়। আর বুসরার হাদীস এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই তলক এর হাদীসের উপর আমল করা শ্রেয়। (শরহে উর্দু নাসায়ী ২৫৭)

১৬৮. কুতায়বা (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে শায়িত থাকতাম আর আমার পদদ্বয় তাঁর কিবলার দিকে থাকত। যখন তিনি সাজদা করতেন আমাকে স্পর্শ করতেন। আমি তখন আমার পদদ্বয় টেনে নিতাম। আর যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন আমি তা মেলে দিতাম। আর তখনকার সময়ে ঘরে কোন বাতি থাকত না।

১৬৯. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও নুসায়র ইবনে ফারাজ (র)..........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিছানায় পাচ্ছিলাম না। তখন আমি আমার হাত দ্বারা তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। তখন আমার হাত তাঁর পদযুগলের উপর পতিত হল। তখন তাঁর পা দুটি খাড়া ছিল, আর তিনি ছিলেন সাজদারত। তিনি বলছিলেন–

أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ـ

"(হে আল্লাহ!) 'তোমার আশ্রয় কামনা করছি তোমার সন্তুষ্টির দ্বারা তোমার অসন্তুষ্টি হতে, আর তোমার ক্ষমা দ্বারা তোমার শাস্তি থেকে, তোমার ক্রোধ থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই। তোমার প্রশংসা করে আমি শেষ করতে পারব না, তুমি নিজে ঐরূপ যেরূপ তুমি নিজের প্রশংসা করেছ।"

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : مَا الاختلافُ فِى مَسِّ المَرأةِ وتَقْبِيْلِهَا فِى وُجُوْبِ الوُضُوْءِ بَيِّنْ مُفَصَّلاً ـ

প্রশ্ন ঃ নারীস্পর্শ বা চুম্বনের দ্বারা উযূ আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ নারীস্পর্শ ও চুম্বনের দ্বারা উযূ আবশ্যক হবে কি না।

নারী স্পর্শ ও চুম্বন উযূ ভঙ্গের কারণ কি না এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে –

১. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, সুফিয়ান সাওরী ও যুফর (রা) এর মতে নারী স্পর্শ করা উযূ ভঙ্গের কারণ নয়।

২. ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকের মতে মহিলাকে স্পর্শ করা বা চুম্বন উযূ ভঙ্গের কারণ। তবে ইমামগণ এতে কিছুটা শর্তারোপ করেছেন।

ইমাম মালিক (র) বলেন, তিনটি শর্তের সাথে তা উযূ ভঙ্গ হবে।

ক. মহিলা বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্কা হতে হবে।

খ. গায়রে মাহরাম (যাদেরকে বিয়ে করা হারাম নয় এমন) মহিলা হতে হবে।

গ. শাহওয়াত বা কামোত্তেজনার সাথে স্পর্শ করতে হবে।

* ইমাম শাফেয়ী (র) এর নিকট শুধু একটি শর্ত রয়েছে। তা হচ্ছে স্পর্শ করাটা আবরণহীন হলে উযূ নষ্ট হবে। অতএব, আবরণহীনভাবে কোন ছোট কিংবা বড় মেয়ে মাহরাম কিংবা গায়রে মাহরাম কামোত্তেজনার সাথে হোক কিংবা কামোত্তেজনা ছাড়া সর্বাবস্থায় উযূ নষ্ট হয়ে থাকে। কোন কোন শাফেয়ী মতাবলম্বী বলেন, যদি কেউ মহিলাকে চড় থাপ্পড় দেয় অথবা তার জখমের চিকিৎসা করে, তাহলেও তার উযূ ভেঙ্গে যাবে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে আল্লামা ইবনে কুদামা তিনটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।

১. হানাফীদের অনুরূপ, ২. শাফেয়ীদের অনুরূপ, ৩. মালেকীদের অনুরূপ। (বজলুল মাজহুদ ঃ ১/১০৭)

ইমামত্রয়ের দলীল ঃ ১.

اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ مِنَ الغَائِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا ـ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যখন ইস্তিঞ্জা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি নারী স্পর্শ করে থাক, কিন্তু পরে পানি না পাও তবে পাক পবিত্র পানি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। (নাসায়ী ৪৩)

এ আয়াতে উল্লিখিত لمس এর অর্থ হল হাত দ্বারা স্পর্শ করা। আর আয়াতে নারী স্পর্শ করার পর পানি না পেলে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করার কথা বলা হয়েছে। অতএব, বুঝা যায় যে, নারী স্পর্শ বা চুম্বন উযূ ভঙ্গকারী।

عن ابن عمر رض كان يقول من قبل امرأته او مسها بيده فعليه الوضوء.

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, কেউ তার স্ত্রীকে চুমু দিলে অথবা স্বীয় হাত দ্বারা স্পর্শ করলে তার উপর উযূ আবশ্যক।

হানাফীদের দলীল ঃ ১

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج الى الصلوة ولم يتوضأ قال عروة فقلت لها من هي الا انت فضحكت.

অর্থাৎ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুম্বন করে উযূ করা ব্যতিরেকে নামায পড়তে যান। উরওয়া বলেন, আমি তাঁকে বললাম তিনি আপনি ছাড়া কেউ নন? এতে তিনি হেসে ফেললেন। (তিরমিযী ১/২৫, নাসায়ী: ১/৩৯, ইবনে মাজাহ : ৩৮–৩৯)

২. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا معترضة بين يديه فاذا اراد ان يسجد غمز رجلي فضممتها الي ثم يسجد.

অর্থাৎ আমি রাসূল (স) কে এরূপ অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি যে, আমি তার সম্মুখে শুয়ে থাকতাম, যখন তিনি সাজদা করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি আমার পায়ে ছোঁয়া দিলে আমি পা টেনে নিতাম, আর তিনি সাজদায় যেতেন। (আবু দাউদ ১/১০৩, বুখারী ঃ ১/১৬১, মুসলিম ১/১৯৮, নাসায়ী: ১/৩৮)

عن عائشة رض قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك.

অর্থাৎ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমি আমার বিছানা থেকে রাসূলুল্লাহ (স) কে হারিয়ে ফেললাম। অতঃপর আমি তাঁকে তালাশ করতে গিয়ে আমার হাত তার পায়ের তালুতে পড়ল। তখন মসজিদে ছিলেন, তাঁর পদদ্বয় ছিল খাঁড়া। তখন তিনি দোয়া পড়ছিলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তোষের আশ্রয় গ্রহণ করছি। (মুসলিম ঃ ১ /১৯২, নাসায়ী ১/৩৮)

৪. নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীস–

عن عائشة رض قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي واني لمعترضة اعتراض الجنازة حتى اذا اراد ان يوتر مسني برجله.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূল (স) নামায পড়তেন, আর আমি সামনে লম্বালম্বিভাবে জানাযার ন্যায় শুয়ে থাকতাম। অতঃপর তিনি যখন বিতর পড়ার জন্য মনস্থ করতেন। তখন তাঁর পা দ্বারা আমাকে স্পর্শ করতেন। (নাসায়ী ঃ ১/৩৮)

তাবারানী আওসাতের বরাতে হযরত আবু মাসউদ আনসারী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন–

ان رجلا اقبل الى الصلوة فاستقبلته امرأته فاكب عليها فتناولها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ذلك له فلم ينهه.

অর্থাৎ এক ব্যক্তি নামাযের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন তার স্ত্রী সামনের দিক থেকে তার কাছে এগিয়ে এলে লোকটি স্ত্রীর গায়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। অতঃপর লোকটি নবী করীম (স) এর নিকট এ বিষয় আলোচনা করল। কিন্তু নবী করীম (স) তাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করলেন না। (মাজউয যাওয়ায়িদ : ১/২৪৭)

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, নারী স্পর্শ উযূ ভঙ্গের কারণ নয়। যদি স্পর্শ উযূ ভঙ্গের কারণ হত, তাহলে আয়েশা (রা) এর স্পর্শের কারণে নবী করীম (স) নামায ছেড়ে দিতেন।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) উক্ত আয়াতে বর্ণিত اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ কে সহবাস দ্বারা তাফসীর করেছেন। আর হযরত আলী, আবু মুসা আশআরী, আতা, তাউস, হাসান বসরী, শাবী ও সুফিয়ান সাওরী (র) প্রমুখের অভিমতও অনুরূপ। যদিও শাফেয়ী ও মালেকীগণ হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর (রা) এর তাফসীরকে গ্রহণ করে বলেন, যে এর দ্বারা উদ্দেশ্য স্পর্শ করা নয়। কিন্তু এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, সহবাস উদ্দেশ্য। তাফসীরের ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস (রা) এর তাফসীর অধিক নির্ভরযোগ্য যা হানাফীগণ গ্রহণ করেছেন।

২. যখন لمس বা مس এর নিসবত মহিলার দিকে করা হয়, তখন এর অর্থ হবে সহবাস। যেমন- وان طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ অর্থাৎ যদি তোমরা তাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দাও উক্ত আয়াতে সর্বসম্মতিক্রমে مس দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য, হাতে স্পর্শ করা উদ্দেশ্য নয়। (তানযীমুল আশতাত প্রথম পৃষ্ঠা নং ১৩৫)

৩. তাছাড়া কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রদত্ত দলীলে لمستم শব্দটি باب مفاعلة থেকে এসেছে, যা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ থেকে অংশীদারিত্ব বুঝায়। আর এই অংশীদারিত্ব সহবাস ও স্ত্রী মিলনেই হতে পারে।

৪. আর ইবনে ওমর (রা) এর হাদীসে চুম্বন ও স্পর্শ দ্বারা যেহেতু মযী বের হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই সতর্কতা অবলম্বনের জন্য উযূ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৫. এ ছাড়া মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, চুম্বনের পরে উযূ নেই।

মূলকথা হল, স্পর্শ বা চুম্বনের পরে যদি মযী বের হয় তবে উযূ আবশ্যক, আর মনী বের হলে গোসল ফরয, আর কিছুই বের না হলে উযূ-গোসল কোনোটাই আবশ্যক নয়। (শরহে মিশকাত ১/২৭১)

দ্বিতীয় ঃ অন্যান্য স্পষ্ট সহীহ হাদীসের বিপরীত হওয়ার কারণে প্রামাণ্যও নয়, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যদি ملامسة অথবা لمس দ্বারা হাতে স্পর্শ করা বুঝাতো তাহলে প্রিয়নবী (স) এর জীবনে কোন একটি ঘটনা এরূপ পাওয়া যাওয়ার কথা ছিল, যাতে তিনি মহিলাকে স্পর্শ করার কারণে উযূ করেছেন কিংবা এর নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ পুরো হাদীস ভাণ্ডারে এরূপ একটি দুর্বল রেওয়ায়াতও পাওয়া যায় না। (শরহে আবু দাউদ : ১৬৫)

سوال : قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ النَّبِيَّ صلى اللّٰهُ عليه وسلم كَمَا جَاءَ فِى الْقُرْاٰنِ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَ لِمَاذَا اسْتَعَاذَ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم اِلَى اللّٰهِ مِنَ الذَّنْبِ -

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তাআলা রাসূল (স) এর পূর্বেকার ও পরের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন, যেমন কুরআনের ভাষ্য- لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ

তবুও কেন তিনি নামাযের মধ্যে আল্লাহর নিকট এতো ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন?

উত্তর ঃ পবিত্র কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, রাসূল (স) নিষ্পাপ। কুরআনের আয়াতটি হচ্ছে لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ এর দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা তদীয় রাসূল (স) এর পূর্বাপর সব ধরনের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং নামাযের মধ্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রয়োজন কি? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম যে সব উত্তর দিয়েছেন, তার মর্মার্থ নিম্নরূপ-

ক. তিনি উম্মতের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, নিজেন জন্য নয়।

খ. তিনি ছিলেন উম্মতের জন্য শিক্ষকস্বরূপ। তাই শিক্ষা দেয়ার নিমিত্তে তা করেছিলেন। অন্য এক হাদীসে এসেছে- ١. بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ٢. بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ -

গ. তিনি ক্ষমার ঘোষণা পাওয়ার পরও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন যাতে আল্লাহর নৈকট্য লাভে আরো বেশী অগ্রগামী হওয়া যায়।

সিদ্ধান্তে বলা যায় যে, রাসূল (স) ছিলেন সকল দিক দিয়ে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ইবাদতের দিক দিয়ে কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি, হবেও না। তিনি ছিলেন, যেমনি যোদ্ধা, সাওম পালনকারী, নফল আদায়কারী

তিলাওয়াতকারী, পরোপকারী। তেমনিভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও ক্ষমা প্রার্থনা করার ব্যাপারে ও অগ্রগামী। সুতরাং তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হলেও তিনি ইবাদত থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। তাই কুরআনে ঘোষিত হয়েছে- وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (শরহে নাসায়ী : ১/২২)

سوال : مَن هُوَ مَرْوَانُ؟ هَلْ هُوَ صَحَابِيٌّ أَمْ تَابِعِيٌّ؟

প্রশ্ন : মারওয়ান কে? তিনি সাহাবী ছিলেন, না-কি তাবেয়ী?

উত্তর : হযরত মাওয়ানের জীবনী :

পরিচিতি : নাম মারওয়ান, পিতার নাম হাকাম, উপনাম আবু আব্দুল মালেক। তিনি পঞ্চম খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র) এর দাদা ছিলেন। তিনি ছিলেন উমাইয়া গোত্রের লোক।

জন্ম : জুমহুর আলেমদের মতে, তিনি দ্বিতীয় হিজরীতে জন্মলাভ করেন। কেউ কেউ বলেন, পঞ্চম হিজরীতে খন্দক যুদ্ধের সময় জন্মলাভ করেন।

জীবন বৃত্তান্ত : তার পিতা হাকামকে মুনাফিকীর কারণে রাসূল (স) তায়েফে নির্বাসন দেন। তিনি পিতার সাথে সেখানেই লালিত-পালিত হন। হযরত ওসমান (রা) যখন খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন, তখন হাকাম মুনাফিকী থেকে তাওবা করে খলীফার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হযরত ওসমান (রা) তাকে মদীনায় পূনর্বাসন করেন। পিতার সাথে মারওয়ান মদীনায় ফিরে আসেন।

দায়িত্ব লাভ : মারওয়ান অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। ইলমে ফিকহ ও রাজনীতিতে খুবই দক্ষ ছিলেন। এজন্যে হযরত ওসমান (রা) তাকে ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে নিযুক্ত করেন, বলা বাহুল্য মারওয়ান এর দূরদর্শিতার অভাবে হযরত উসমান (রা) বিভিন্ন ধরনের বিপদে পড়েন।

ইন্তিকাল : মারওয়ান ৭৫ হিজরীতে দামেশকে ইন্তিকাল করেন।

মারওয়ান সাহাবী-নাকি তাবেয়ী : মারওয়ান তাবেয়ী ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত সাহাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি সাহাবী ছিলেন। তবে এটি বিশুদ্ধ নয়।

سوال : قِيْلَ إِنَّ مَرْوَانَ فَاسِقٌ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ عَنْ مَرْوَانَ فَكَيْفَ صَحَّ نِسْبَةُ الْفِسْقِ إِلَى الْمَرْوَانِ؟

প্রশ্ন : বলা হয় মারওয়ান ফাসিক ছিলেন, অথচ ইমাম বুখারী (র) তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাহলে কিভাবে মারওয়ান এর প্রতি ফিসকের দোষারোপ করা যায়?

উত্তর : মারওয়ান থেকে ফাসিক ব্যাখ্যা দেয়ার কারণ : হযরত উসমান (রা) এর আমলে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। তার জন্যে অনেকেই মন্ত্রী মারওয়ানকে দায়ী করে থাকেন। বিশেষ করে খলীফা কর্তৃক মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে দেয়া চিঠিতে فاقبلوه এর স্থলে فاقتلوه লেখার জন্যেও তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। তাই অনেকেই তাকে ফাসিক বলে থাকেন। তাহলে ইমাম বুখারী র. তাঁর থেকে কিভাবে হাদীস বর্ণনা করেলেন। এর সমাধানে আমরা বলবো, মারওয়ানের উপর আরোপিত অভিযোগগুলো অনুমানভিত্তিক। হযরত উসমান (রা) এর শাসনামলে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, সে জন্যে তাকে দায়ী করার পেছনে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই তার উপর আনীত অভিযোগগুলো মিথ্যা। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। এ জন্যে ইমাম বুখারী তাঁর সনদে হাদীস বর্ণনা করছেন। (শরহে নাসায়ী ১/২১৭)

سوال : ما معنى الثناء؟ بيّن طريق الثناء لله عزّوجلّ.

প্রশ্ন : الثناء শব্দের অর্থ কি? আল্লাহর প্রশংসা করার পন্থা বর্ণনা কর।

উত্তর : ثناء এর অর্থ : الثناء এক বচনের শব্দ। বহুবচনে اثنية ব্যবহৃত হয়। অর্থ হল প্রশংসা করা, তোষামোদ করা, পরিভাষার বলা হয়- الثناء هو المدح لا قرار النعمة والرحمة

অর্থাৎ নিয়ামত বা অনুকম্পায়র স্বীকৃতি হিসেবে প্রশংসা করাটা ছানার অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর প্রশংসা করার পন্থা : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) আল্লাহর প্রশংসা করার বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রশংসাবাণী উচ্চারণ না করে বললেন, لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ এতে আল্লাহর প্রশংসা করার মানদণ্ড নির্ধারিত হয়। এটাই সুন্নত তরিকা। যেমনিভাবে حديث الشفاعة এ রাসূল (স) বলেছিলেন– فَاَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا اَقْدِرُ عَلَيْهَا الْاٰنَ

ইমাম মালেক (র) আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন– لَا أُحْصِى نِعْمَتَكَ وَاِحْسَانَكَ কেননা, বাস্তবে আল্লাহর নিয়ামতসমূহের বিস্তৃতি এতে ব্যাপক, যা আমাদের কল্পনারও বাইরে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে– وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا আর আল্লাহর প্রশংসা করে মানুষের পক্ষে শেষ করা সম্ভব নয়।

সূরা কাহাফ, এর ১০৯ নং আয়াতে এসেছে–

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىْ

সুতরাং প্রশংসার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য প্রশংসাবাণী উচ্চারণ এবং আত্মসমর্পণই সর্বোচ্চ পন্থা। (শঃ নাসায়ী ১/ ২২৩)

سوال : بَيِّنْ اَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ عَنْ مِقْدَارِ التَّسْبِيْحِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسَّجْدَةِ هَلْ يَجُوْزُ الدُّعَاءُ فِى السَّجْدَةِ بِغَيْرِ التَّسْبِيْحِ؟

প্রশ্ন : রুকু সাজদার মধ্যে তাসবীহের পরিমাণ উলামাদের মতামতসহ বর্ণনা কর। সাজদার মধ্যে তাসবীহ পড়া ব্যতীত শুধুমাত্র দুআ করা সঙ্গত হবে কি?

উত্তর : রুকু সাজদার মধ্যে তাসবীহর পরিমাণ : রুকু ও সাজদার মধ্যে তাসবীহ পাঠ করা ফরয। কেননা, রুকু ও সাজদা নামাযের অন্যতম দুটি রুকন। একবার তাসবীহ পাঠ করলে রুকু বা সাজদা আদায় হয়ে যাবে। তবে সর্বনিম্ন তিনবার পাঠ করা সুন্নত। এভাবে পাঁচবার, সাতবার, নয়বার বেজোড় সংখ্যক তাসবীহ পাঠ করা যায়।

তাসবীহর কোন নির্দিষ্ট শব্দ নেই। রাসূল (স) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করেছেন। প্রসিদ্ধ রুকুর তাসবীহ হল, سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ সাজদার মধ্যকার তাসবীহ হল سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى দুই সাজদার মধ্যকার তাসবীহ হল– اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَاشْفِنِىْ

সাজদার মধ্যে দুআ প্রার্থনা : রুকু সাজদার মধ্যে সাধারণত তাসবীহ পাঠ করা হয়। যাতে আল্লাহর প্রশংসামূলক শব্দাবলি উচ্চারিত হয়। কিন্তু তাসবীহ ব্যতীত অন্য কোন দুআ পাঠ করা জায়েয নয়। তবে নফল নামাযের মধ্যে রুকু ও সাজদায় তাসবীহ পাঠের পর দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনার দুআমূলক বাক্য পাঠ করা যাবে। যেমনটি রাসূল (স) অত্র হাদীসে করেছেন। (শরহে নাসায়ী ১/২২১)

তাত্ত্বিক আলোচনা

প্রশ্ন : হুজুর (স) সাজদায় যাওয়ার সময় বারংবার আয়েশা (রা) এর পা স্পর্শ করছিলেন আয়েশা (রা) কি হুজুর (স) এর সাজদা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, থাকলে কেনো সাজদার পূর্বে পা সরায়ে নিলেন না?

উত্তর : এর উত্তর সম্পর্কে তৃতীয় রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে– وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ فِيْهَا لَيْسَ مَصَابِيْحُ ঐ দিনে ঘরে বাতি ছিল না, তাই হুজুর (স) এর সাজদা সম্পর্কে তার জানা ছিল না। তথা অন্ধকারের কারণে নবী (স) কোন সময় সাজদা করছিলেন তা বুঝা যাচ্ছিল না। তাই তাঁকে স্পর্শ করার প্রয়োজন হচ্ছিলো এবং তিনিও বুঝতে পেরে পা টেনে নিচ্ছিলেন। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ২৫৮)

কামভাবে যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে উযূ ভাঙবে কি না?

রাসূল (স) আয়েশা (রা) কে স্পর্শ করেন। অতঃপর উযূ করা ছাড়াই নামায আদায় করেন। এর দ্বারা বুঝা যায় শাহওয়াত বিহীন স্পর্শ করলে উযূ ভাঙ্গবে না। আর শাহওয়াত এর সাথেও স্পর্শ করলে উযূ ভাঙ্গবে না। রাসূল (স) চুমু দেয়া সত্ত্বেও উযূ বিহীন নামায আদায় করেছেন। আর এটা স্বীকৃত বিষয় যে, চুমু শাহওয়াতের সাথেই হয়ে থাকে। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ২৫৮)

تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

١٧٠. اخبرنا محمدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُفيانَ قالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْرَوْقٍ عَنْ ابراهيمَ التَّيْمِىِّ عَنْ عائشةَ اَنَّ النبىَّ ﷺ كانَ يُقَبِّلُ بعضَ اَزْواجِهِ ثم يُصَلِّى ولا يَتَوَضَّأُ قال ابو عبدِ الرحمٰن لَيْسَ فِى هٰذا البابِ حديثٌ اَحْسَنُ مِنْ هٰذا الحديثِ وانْ كانَ مرسلًا وقد رَوٰى هٰذا الحديثَ الْاَعْمَشُ عَنْ حبيبِ بْنِ اَبِى ثابتٍ عَنْ عُرْوةَ عَنْ عائشةَ قال يَحْيٰى الْقَطَّانُ حديثُ حبيبٍ عَنْ عُرْوةَ عَنْ عائِشةَ هٰذا وحديثُ حَبيبٍ عَنْ عُرْوةَ عَنْ عائِشةَ تُصَلِّى وانْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ لَاشَئَ -

চুম্বনের পরে উযূ না করা

অনুবাদ ঃ ১৭০. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর জনৈক স্ত্রীকে চুম্বন করে পরে নামায আদায় করেছেন। কিন্তু তিনি উযূ করেননি। আবু আবদুর রহমান বলেন, এ অনুচ্ছেদে এর চেয়ে উত্তম হাদীস আর নেই, যদিও হাদীসটি মুরসাল। এ হাদীসটি আ'মাশ-হাবীব ইবনে আবু সাবিত থেকে এবং তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্য়া কাত্তান বলেন, যা হাবীব উরওয়া থেকে এবং উরওয়া আয়েশা (রা) থেকে হাদীস এবং হাবীব উরওয়া থেকে এবং উরওয়া আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস যার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, "মুস্তাহাযা মহিলা নামায আদায় করবে যদিও রক্তের ফোঁটা বিছানায় টপকায়"-এ হাদীস দু'টি দুর্বল।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : القُبْلَةُ مِنَ الشَّهْوَةِ وكَيْفَ صَلّٰى رسولُ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليه وسلم بعدَ القُبْلَةِ ولمْ يَتَوَضَّأْ .

প্রশ্ন ঃ চুম্বন ও স্পর্শ সাধারণত যৌনাবেগের কারণে হয়ে থাকে। তাহলে রাসূল (সা) চুম্বনের পরে উযূ ব্যতিরেকে নামায আদায় করেছিলেন কেন?

উত্তর ঃ সাধারণত: চুম্বন ও স্পর্শের কার্য শাহওয়াত বা আবেগের বশেই হয়ে থাকে। কিন্তু আলোচ্য হাদীসে দেখা যায়, রাসূল (স) তাঁর স্ত্রীদেরকে স্পর্শ ও চুম্বন করার পরেও উযূ ব্যতিরেকে নামায আদায় করেছিলেন এর কারণ কি? এর জ বাব নিম্নরূপ।

প্রথমত ঃ পূর্বের হাদীসের শিরোনামে রয়েছে- بابُ تَرْكِ الوُضوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ اِمْرَاتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ যাতে বুঝা যায়, স্পর্শটা কোন যৌনাবেগ ছাড়া স্বাভাবিকভাবেও হতে পারে। যেমনটি রাসূল (স) করেছেন।

দ্বিতীয়ত : স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী স্পর্শ ও চুম্বন আবেগের কারণে হলেও তাতে যদি মাত্রাতিরিক্ত আবেগ না থাকে তবে কোন সমস্যা নেই যা রাসূল (স) এর বেলায় হয়েছিল।

তৃতীয়ত: অথবা, বিষয়টি ছিল উযূর সাথে সম্পর্কিত। উযূ ভঙ্গের ৭টি কারণের মধ্যে স্পর্শ বা চুম্বন নেই। তাই এত উযূ করার প্রয়োজন নেই। (শরহে উর্দূ নাসায়ী: ১/২২২)

سوال : نواقِضُ الوُضُوءِ مَاهِىَ؟ وكَمْ هِىَ؟

প্রশ্ন ঃ উযূ ভঙ্গের কারণ বলতে কী বুঝো? উযূ ভঙ্গের কারণ কয়টি ও কি কি বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ ঃ ইমাম আবুল হুসাইন আল-কুদূরীর বর্ণনানুযায়ী . نواقض وضو তথা উযূ ভঙ্গের কারণ মোট সাতটি যথা-

১. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া, যথা পায়খানা, পেশাব, বীর্য, বায়ু ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী- أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ

২. দেহের কোন অংশ থেকে রক্ত, পুঁজ বা পানি ইত্যাদি নির্গত হয়ে গড়িয়ে পড়া. যেমন রাসূল সা. এর বাণী- الوضوء من كل دم سائل

৩. মুখ ভরে বমি করা। যেমন- রাসূল (স) এর বাণী-

مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ او رُعَافٌ او قَلَسٌ اوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ إِلَى الْوُضُوْءِ.

৪. বিছানায় শুয়ে ঘুমানো অথবা এমন কোন বস্তুর উপর ভর দিয়ে ঘুম যাওয়া, যা সরিয়ে নিলে সে পড়ে যাবে।

৫. রুকু ও সেজদা বিশিষ্ট নামাযে অট্টহাসি দেয়া। যেমন রাসূল (স) এর বাণী-

مَنْ ضَحِكَ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ

৬. অজ্ঞান হওয়া বা মস্তিষ্ক বিকৃত ও অন্য কোন কারণে জ্ঞান লোপ পাওয়া।

৭. পাগল হওয়া।

سوال : حديثُ عائشةَ مُعارِضٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فكيفَ التَّفَصِّيْ عَنْهَا بَيِّنْ.

প্রশ্ন ঃ আয়েশা (রা) এর হাদীস ইবনে উমরের হাদীসের বিপরীত এ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি কিভাবে হবে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ দুটি হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান ঃ

হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূল (স) তার স্ত্রীকে চুম্বন করার পর উযূ না করে নামায আদায় করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীকে স্পর্শ বা চুম্বন করার দ্বারা উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। এতে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরূপ-

১. স্ত্রী স্পর্শকরণ বা চুম্বন দান তখনই উযূ ভঙ্গকারী হবে যখন তদ্বারা উযূ ভঙ্গকারী মযী বের হবে।

২. অথবা, হযরত ইবনে উমর (রা) এর হাদীসে فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ দ্বারা উযূ করা মুস্তাহাব, এটাই বুঝানো হয়েছে। ওয়াজিব হওয়া বুঝানো হয়নি।

৩. অথবা, হযরত ইবনে উমরের হাদীসটি موقوف যা مرفوع এর মুকাবেলা বা সাংঘর্ষিক হতে পারে না।

৪. অথবা, ইবনে উমরের হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। (শরহে মিশকাত ; ১/২৭৪)

তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله لَيْسَ فِي هٰذَا الْبَابِ حَدِيثٌ أَحْسَنُ الخ ঃ চুম্বনের দ্বারা যে উযূ নষ্ট হয় না। এর প্রমাণের স্বপক্ষে আলোচ্য হাদীস থেকে অধিক উত্তম কোন হাদীস বিদ্যমান নেই। যদিও হাদীসটি মুরসাল। কিন্তু তার সনদ অত্যন্ত মজবুত। এটা মুসান্নিফের বক্তব্য দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়।

মুরসাল হওয়ার কারণ ঃ

হাদীসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণিত। কেননা, হাদীসের রাবী হল ইব্রাহীম তাইমী। তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, অথচ আয়েশা (রা) থেকে তার শ্রবণ প্রমাণিত নেই। আহনাফ উক্ত বক্তব্যের জবাবে বলেন, প্রথমত: জুমহুর ও আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণিত মুরসাল হাদীস হুজ্জত তথা তার দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায়।

দ্বিতীয়ত: হযরত আয়েশা (রা) এর এ রেওয়ায়াতটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত। কোন সূত্রে এটি মুরসাল আবার কোন সূত্রে এটি মুত্তাসিল ও মারফূ। আর কিবারে তাবেয়ীদের মুরসাল হাদীসও শাফেয়ী (র) এর নিকট হুজ্জত বা দলীল যখন উক্ত হাদীসটি অন্য সূত্রে মারফূভাবে বর্ণিত হয়। অথবা, কোন সাহাবীর কওল মুরসাল হাদীসের মুওয়াফেক হয়। অথবা, কোন ফকীহ তার উপর আমল করে। আল্লামা মাওয়ারদি বায়হাকী থেকে এটা নকল করেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ দারাকুতনী বলেন, এ হাদীসকে মুআবিয়া ইবনে হিশাম, সাওরী থেকে তিনি আবু রওক থেকে, আর তিনি ইব্রাহীম তাইমী থেকে, তিনি তার পিতা ইয়াজিদ ইবনে শুরাইক তামীমী থেকেবর্ণর্ণনা করেছেন। এ সূত্রে হাদীসের সনদটি মুত্তাসিল এবং এর সকল রাবী সিকা। এখন হাদীসটি মুনকাতে হওয়ার প্রশ্ন শেষ হয়ে গেলো।

হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে ইব্রাহীম তাইমী ব্যতীত বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। কেননা, আবু বকর বাজ্জার নিজের মুসনাদে উক্ত হাদীসকে ইসমাইল ইবনে ইয়াকুব ইবনে মুবাইহ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে মুসা ইবনে আয়ুব থেকে, তিন তার পিতা মুসা থেকে, তিনি আব্দুল কায়স জাসারী থেকে, তিন আতা থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তার শব্দ নিম্নরূপ–

اِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهٖ وَلَا يَتَوَضَّأُ

এ হাদীসের সকল রাবী সিকা। হাফেজ আব্দুল হক উক্ত সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে বলেন–

لَا اَعْلَمُ عِلَّةً تُوجِبُ تركه الخ

উক্ত বক্তব্য উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল এ কথা বুঝানো যে, হযরত আয়েশা (রা) এর এ হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত। কাজেই এটা হুজ্জত হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নেই। (আল জাওহারুন নুকা ১/৩১)

আল্লামা শাওকানী নায়লুল আওতার এর মধ্যে লেখেন, যারা বলেন, নারীচুম্বন উযু ভঙ্গের কারণ তাদের পক্ষ হতে উক্ত হাদীসের জবাব এই দেয়া হয় যে, হাদীসটি যয়ীফ ও মুরসাল। কিন্তু তার এ জবাবকে খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা, উক্ত হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে তার দূর্বলতা দূর হয়ে গেছে। আর এ قبلة তথা চুম্বন সম্পর্কিত হাদীস মারফু ও মাওকুফ উভয় সুত্রে বর্ণিত রয়েছে। আর মারফু রেওয়ায়াতই বেশী। কাজেই আহলে উসূলের মাযহাব অনুযায়ী তার দিকে রুজু করতে হবে। (শরহের উর্দু নাসায়ী : ২৬০-২৬১)

قوله وقَدْ رَوٰى هٰذا الحديثَ الْاَعْمَشُ ঃ এই বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অধ্যায়ের হাদীসের অন্যান্য সূত্রকে দূর্বল সাব্যস্ত করা। এ হাদীসকে আমাশ হুবাইব ইবনে আবী ছাবেত, তিনি উরওয়া থেকে তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেন। কিন্তু ইমাম নাসায়ী ও অন্যান্যদের নিকট এ হাদীসটি দুর্বল, যার সমর্থনে ইবনে কাত্তানের বক্তব্যকে নকল করা হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে কাত্তান এ ব্যাপারে বিরুপ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, হুবাইব ইবনে আবী ছাবেত এর এ হাদীস যা তিনি عن عروة عَنْ عَائِشَةَ এর সনদে রেওয়ায়াত করেন। তার দ্বিতীয় হাদীস যাকে সামনে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে মুস্তাহাযা এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে-

تُصَلِّى وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ কিন্তু উভয়টা لاشئ অর্থাৎ যয়ীফ।

এটাকে দু'টি কারণে যয়ীফ সাব্যস্ত করা হয়েছে-

১. সনদে যে উরওয়া এর কথা বলা হয়েছে সে উরওয়া দ্বারা যদি উরওয়া ইবনে যুবায়ের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার শ্রবণ হুবাইব ইবনে আবী ছাবেত থেকে প্রমাণিত নেই। যেমন– ইমাম তিরমিযী ও ইমাম বুখারী এর বক্তব্য। তারা বলেন, হুবাইব ইবনে আবী ছাবেত উরওয়া থেকে উক্ত হাদীস শোনেন নি। কাজেই হাদীসটি মুনকাতে যা শাফেয়ী মাযহাবে হুজ্জত নয়।

২. যদি উরওয়া দ্বারা উরওয়ায়ে মুযানী উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার শ্রবণ হযরত আয়েশা থেকে প্রমাণিত নেই। কাজেই হাদীসটি মুনকাতে যা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা বিশুদ্ধ নয়।

পূর্বোক্ত বক্তব্যের জবাব

বিশুদ্ধ কথা হল, উরওয়া দ্বারা এখানে উরওয়া ইবনে যুবায়ের উদ্দেশ্য। কেননা, মুসনাদে আহমদ এবং ইবনে মাজাহ ইবনে যুবায়ের এর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে দারাকুতনীর রেওয়ায়াতেও স্পষ্টভাবে ইবনে যুবায়ের এর নাম উল্লেখ রয়েছে। তারা حديث قبله কে ইবনে আবী শায়বা এবং আলী ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা

করেন। তারা দু'জন অকী থেকে তিনি আমাশ থেকে তিনি হুবাইব ইবনে আবী ছাবেত থেকে তিনি উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে তিনি আয়েশা (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেন–

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلوة وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

এ সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। (জাওহারুল নুকা আলাল বায়হাকী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১২৫)

উক্ত হাদীস থেকে স্পষ্টরূপে বুঝা যাচ্ছে যে, উরওয়া দ্বারা এখানে উরওয়া ইবনে যুবায়ের উদ্দেশ্য।

অন্য متن حديث তার করীনা বিদ্যমান রয়েছে যে, তিনি হল উরওয়া ইবনে যুবায়ের। কেননা, হযরত আয়েশা (রা) এর উক্তি قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ বলার পর উরওয়া বলেন, তিনি কে? (رواه ابوداو) إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ নিশ্চয় তিনি আপনিই।

উক্ত কথোপকথন দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, একথার প্রবক্তা হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের, যি নিআয়েশা (রা) এর বোনের ছেলে (ভাগ্নে) ছিলেন। তিনি তার খালার সাথে এভাবে কথা বলতে পারেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ যে আশেয়া (রা) এর সাথে কোন ধরনের আত্মিয়তার সম্পর্ক রাখে না তার পক্ষে এ ধরনের কথা বলার চিন্তাই করা যায় না। এটাই আয়েশা (রা) এর সাথে উরওয়ার সাক্ষাত ও শ্রবণ সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ। কাজেই এক্ষেত্রে আর কোন ধরনের সংশয় থাকলো না যে, আলোচ্য হাদীসে উরওয়ার দ্বারা উরওয়া ইবনে যুবায়ের উদ্দেশ্য। উরওয়া ইবনে মুযানী উদ্দেশ্য নয়।

তাদের দাবী হুবাইবের শ্রবণ উরওয়া থেকে প্রমাণিত নেই এর জবাব হল, স্বয়ং ইমাম আবু দাউদ ও সুফিয়ান সাওরী ও মানতে রাজি নন যে, হুবাইরের শ্রবণ উরওয়া থেকে প্রমাণিত নেই। কেননা, ইমাম আবু দাউদ সাওরীর কওল নকল করার পর বলেন, حمزة الزيات হুবাইব থেকে তিনি উরওয়া থেকে তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে সহীহ হাদীস রেওয়ায়াত করেন। অতঃপর সাওরীর কথাকে খণ্ডন করেন যারা তারা বলেন, হুবাইবের শ্রবণ উরওয়া থেকে ছাবেত নেই। কিন্তু উক্ত সহীহ হাদীস ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন না। ইমাম তিরমিযী جامع الدعاء এর আজারে নকল করেছেন। আর তা হল, হুজুর সা. বলেন– اللّٰهُمَّ عَافِنِى فِى جَسَدِى وَعَافِنِى فِى بَصَرِى

অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম (র) তার কিতাবের মুকাদ্দামায় লেখেন যে, সনদ মুত্তাসিল হওয়ার জন্য سماع শর্ত নয় বরং সমযুগ সমসাময়ীক ও সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকাই যথেষ্ট। আর এটা উক্ত রেওয়ায়াতে বিদ্যমান, কাজেই ইমাম মুসলিমের মুলনীতি মোতাবেক হুবাইব ইবনে আবী আবী ছাবেতের سماع এর উপর প্রয়োগ করা হবে।

হাফেজ আব্দুল বার মালেকী বলেন যে, حديث قبلة বিশুদ্ধ। হাফেজ আব্দুল বার অন্যত্র বলেন, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, উরওয়ার সাথে হুবাইবের সাক্ষাত হয়েছে। এটাকে সাব্যস্ত করার জন্য দলীল হিসাবে তিনি আবু দাউদের কওল উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইবনে التركماني বলেন, আবু দাউদের বক্তব্য দ্বারা سماع সাব্যস্ত হয়। আর সাওরীর বক্তব্য দ্বারা سماع এর নফী হয়। আর مثبت নফীর উপর মুকাদ্দাম হয়। তাই এখানেও মুকাদ্দাম হবে। ইমাম যায়লায়ীও এ সনদকে সমর্থন করেছেন। মোটকথা, পূর্বের আলোচনা দ্বারা হুবাইবের কথা সাব্যস্ত হয় এবং انقطاع এর ইল্লত ও দূর হয়ে হাদীস মুত্তাসিল হয়ে যায়। এর থেকে বুঝা যায় হানাফীদের দলীল শক্তিশালী এবং শাফেয়ী ও অন্যান্যদের দলীল শক্তিশালী নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

بابُ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

١٧١. اخبرنا اسحٰق بن ابراهيم قال انبانا اسماعيل وعبد الرزاق قالا حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن ابراهيم بن عبد الله بن قارظ عن ابي هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول توضؤا مما مست النار.

١٧٢. اخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد يعني ابن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان عبد الله بن قارظ اخبره ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول توضئوا مما مست النار-

١٧٣. اخبرنا الربيع بن سليمان بن داؤد قال حدثنا اسحٰق بن بكر وهو ابن مضر قال حدثني ابي عن جعفر بن ربيعة عن بكر عن سوادة عن محمد بن مسلم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن ابراهيم بن قارظ قال رايت اباهريرة يتوضأ على ظهر المسجد فقال اكلت اثوار اقط فتوضأت منها اني سمعت رسول الله ﷺ يامر بالوضوء مما مست النار-

١٧٤. اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي عن حسين المعلم قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الرحمٰن بن عمرو الاوزاعي انه سمع مطلب بن عبد الله بن حنطب يقول قال ابن عباس أأتوضأ من طعام اجده في كتاب الله حلالا لان النار مسته فجمع ابو هريرة حصى فقال اشهد عدد هذا الحصى ان رسول الله ﷺ قال توضأوا مما مست النار-

١٧٥. عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال توضئوا مما مست النار اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو

١٧٦. اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا اخبرنا ابن ابي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو قال محمد القارى عن ابى ايوب قال قال النبي ﷺ توضئوا مما غيرت النار-

١٧٧. اخبرنا عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله قالا حدثنا حرمي وهو ابن عمارة بن ابي حفصة قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت يحيى بن جعدة يحدث عن عبد الله بن عمرو القارى عن ابي طلحة سمعت يحيى بن جعدة يحدث عن عبد الله بن عمرو القارى عن ابى طلحة ان النبى ﷺ قال توضئوا مما غيرت النار -

١٧٨. اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا جرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابى

بكرِ بْنِ حفصٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَبِى طَلْحَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ تَوَضَّئُوا مِمَّا انْضَجَتِ النَّارُ -

١٧٩. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ اَبِى بَكْرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ -

١٨٠. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْاَخْنَسِ بْنِ شَرِيْقٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ وَهِىَ خَالَتُهُ فَسَقَتْهُ سَوِيْقًا ثُمَّ قَالَتْ لَهُ تَوَضَّأْ يَا ابْنَ اُخْتِى فَاِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ -

١٨١. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِى بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْاَخْنَسِ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ لَهُ وَشَرِبَ سَوِيْقًا يَا ابْنَ اُخْتِى تَوَضَّأْ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ আগুনে জ্বাল দেয়া বস্তু আহার করে উযূ করা

অনুবাদ ঃ ১৭১. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি যে, আগুনে জ্বাল দেয়া বস্তু আহার করলে উযূ করবে।

১৭২. হিশাম ইবনে আবদুল মালিক (র)........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা আগুনে জ্বাল দেয়া বস্তু আহার করলে উযূ করবে।

১৭৩. রবী ইবনে সুলায়মান (র)....... আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইবরাহীম ইবনে ক্বারিয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে মসজিদের ছাদে উযূ করতে দেখেছি। তিনি বললেন, আমি কয়েক টুকরা পনীর খেয়েছি, তাই আমি উযূ করলাম। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে আগুনে জ্বাল দেয়া বস্তু আহার করাতে উযূ করার নির্দেশ দিতে শুনেছি।

১৭৪. ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব (র) ...... আবদুর রহমান ইবনে আমর আল-আওযায়ী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আগুন স্পর্শ করার কারণে আমাকে কি ঐ খাদ্যের জন্য উযূ করতে হবে? যাকে আমি আল্লাহ্‌র কিতাবে (কুরআনে) হালাল পেয়েছি। এতদশ্রবণে আবু হুরায়রা (রা) কতকগুলো পাথর টুকরা একত্রিত করলেন এবং বললেন, আমি এই কংকর পরিমাণ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা উযূ করবে ঐ সকল বস্তু হতে যা আগুন স্পর্শ করেছে।

১৭৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার (র).........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা উযূ করবে ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুন স্পর্শ করেছে।

১৭৬. আমর ইবনে আলী ও মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার (র) আবু আইয়্যুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, তোমরা উযূ করবে ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুন পরিবর্তন করেছে।

১৭৭. উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'ঈদ ও হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)..... আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা উযূ করবে ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুন পরিবর্তন করেছে।

১৭৮. হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)..........আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা উযূ কর ঐ সকল বস্তু আহার করার জন্য যা আগুন দ্বারা রান্না করা হয়েছে।

১৭৯. হিশাম ইবনে আবদুল মালিক (র)....... যায়দ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা ঐ সকল বস্তু আহার করলে উযূ করবে যা আগুন স্পর্শ করেছে।

১৮০. হিশাম ইবনে আবদুল মালিক (র).........আবু সুলায়মান ইবনে সাঈদ ইবনে আখনাস ইবনে শরীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার তাঁর খালা নবী (স)-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা)-এর নিকট গেলেন, তিনি (উম্মে হাবীবা) তাঁকে ছাতু খাওয়ালেন। পরে তাকে বললেন, হে ভাগ্নে! উযূ করে নাও। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা উযূ কর ঐ সকল বস্তু আহার করে যা আগুন স্পর্শ করেছে।

১৮১. রবী ইবনে সুলায়মান ইবনে দাউদ (র).........আবু সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ইবনে আখনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা) তাকে ছাতু খাওয়ার পর বলেছিলেন, হে ভাগ্নে, তুমি উযূ করে নাও। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা উযূ কর ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুনে স্পর্শ করে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : مَا الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِى الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ بَيِّنْ مُوضِحًا .

প্রশ্ন ঃ আগুনে পাকানো খাদ্য ভক্ষণে উযূর বিধান সম্পর্কে আলিমদের মতপার্থক্য কি? বর্ণনা কর

উত্তর ঃ আগুনে পাকানো বস্তু খাওয়ার পর উযূ করার বিধান

আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযূ ভেঙ্গে যাবে কিনা তথা অযূ করা ওয়াজিব কি-না, এ ব্যাপারে প্রথম দিকে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য ছিল। নিম্নে তা প্রদত্ত হল-

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, ওযায়েদ ইবনে সাবিত (র) এর মতে, আগুনে পাকানো কোন বস্তু খেলে উযূ ভেঙে যাবে। তাই নামায আদায়ের জন্য নতুন করে উযূ করা ওয়াজিব।

২. খোলাফায়ে রাশেদা, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, জাবির, আনাস (রা) ও চার ইমামসহ জুমহুর সাহাবা ও তাবেয়ীনের মতে, আগুনে পাকানো বস্তু খেলে উযূ ভাঙবে না।

প্রথম মাযহাবের দলীলঃ ১.

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَلْوُضُوْءُ مِمَّا اَنْضَجَتِ النَّارُ .

অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেন, রন্ধনকৃত দ্রব্যাদি আহার করলে উযূ করতে হবে। (আবু দাউদ ১/২৬, মুসলিম : ১/১৫৭, তিরমিযী : ১/২৪, নাসায়ী ১/৩৯, ইবনে মাজাহ : ৩৮)

২ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স) ইরশাদ করেন- تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ অর্থাৎ আগুনে রান্না করা খাদ্য আহারের পর তোমরা উযূ কর।

৩. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ الْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

অর্থাৎ যায়েদ ইবনে ছাবিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স) কে বলতে শুনেছি যে, আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণের পর তোমরা উযূ কর। উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এক্ষেত্রে উযূ করা ওয়াজিব।

জুমহুরের দলীল ঃ ১

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وسلم اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) বকরীর রান খাওয়ার পর উযূ না করেই নামায আদায় করেন। (মুসলিম ১/১৫৭, ইবনে মাজাহ: ৩৮)

দলীল ঃ ২.

عن ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْتَهَسَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ صَلَّى ولم يَتَوَضَّأْ .

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স) তার সামনের দাঁত দিয়ে বকরীর ঘাঁড়ের গোশত খান, অতঃপর তিনি উযূ না করেই নামায পড়েন।

দলীল ঃ-৩

عن جابرٍ قال كان اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلم تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

অর্থাৎ জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) এর দুটি আমলের সর্ব শেষ আমল এই ছিল যে, তিনি রান্না করা খাদ্য আহারের পর উযূ করেননি।

দলীল নং -৪

عَنْ جابرٍ رض قال اكلتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه وسلم وَمَعَ اَبِى بكرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ خُبْزًا ولَحْمًا فصَلَّوْا ولَمْ يَتَوَضَّؤُوْا .

অর্থাৎ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (স), আবু বকর, উমর ও উসমানের সাথে গোশত-রুটি ভক্ষণ করেছি, অতঃপর তারা উযূ করা ছাড়াই নামায আদায় করেছেন। উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা এবং আরো অন্যান্য অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এতে উযূ ভাঙবে না, তাই উযূ করা ওয়াজিব নয়।

যৌক্তিক প্রমাণ

আগুনে পাকানো জিনিস সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মতবিরোধ রয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সে জিনিসটি যদি আগুনে পাকানোর পূর্বে ভক্ষণ করা হত, তবে উযূ ভাঙত না। এবার আমাদের দেখতে হবে আগুনেরও কোন ক্রিয়া এমন আছে কিনা, যার ফলে কোন জিনিসের হুকুম পরিবর্তন হয়ে যায়। আমরা দেখেছি, খালেছ পানি পবিত্র। এর দ্বারা নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা যায়। এবার যদি এটিকে আগুন দ্বারা গরম করা হয়, তবে এই পানি তার প্রথম অবস্থাতেই বহাল থাকে, আগুন তাতে কোন নতুন হুকুম সৃষ্টি করে না। অতএব, যুক্তির দাবী হল, পবিত্র খাবার আগুনে রান্না করার পরও তা প্রথম অবস্থায় বহাল থাকে, যেরূপভাবে পাকানোর পূর্বে তা খেলে অপবিত্রতা আসবে না। এরূপভাবে রান্নার পরেও খেলে অপবিত্রতার কারণ হবে না।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

১. আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযূ করতে হবে, এর হুকুম যদি থেকেও থাকে তবে তা রহিত হয়ে গেছে। এর দলীল হল, উপরে বর্ণিত হযরত জাবির (রা) এর হাদীস।

২. হাদীসে বর্ণিত উযূ দ্বারা শরঈ বা পারিভাষিক উযূ উদ্দেশ্য নয়; আভিধানিক উযূ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ খাওয়ার পর হাত মুখ ধৌত করা। যেমন ইকরাশ ইবনে যুবাইর (র) এর দাওয়াত সংক্রান্ত এক হাদীসে বর্ণিত আছে—

ثم اُتِيْنَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ رسولُ اللّٰه صلى الله عليه يَدَيْهِ ومَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَه وذِرَاعَيْهِ ورَأْسَه وقال يا عِكْرَاشُ! هٰذا الوضوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ .

অর্থাৎ ... অতঃপর আমাদের কাছে পানি আনা হল, রাসূল (স) তার হস্তদ্বয় ধৌত করলেন। আর পানিতে ভেজা হাতের তালুর দ্বারা তাঁর চেহারা দুহাত ও মাথা মাসেহ করলেন। আর বলেন, হে ইকরাশ! এ উযূ হল আগুনে রান্নাকৃত খাদ্য ভক্ষণের কারণে।

৩. ইমাম নববী (র) বলেন, এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আগুনে পাকানো দ্রব্য খেলে উযূ করা ওয়াজিব নয়।

৪. অথবা, হাদীসে বর্ণিত উযূর হুকুম মুস্তাহাবরূপে পরিগণিত, ওয়াজিব হিসেবে নয়। এর প্রমাণ হল নবী করীম (স) থেকে উযূ করা ও না করা উভয়টি প্রমাণিত থাকা, যা মুস্তাহাব হওয়ার পরিচায়ক।

৫. হাফেজ ইবনে কায়্যিম (র) বলেন, যেহেতু আগুনে পাকানোর ফলে বস্তুতে আগুণের একটি প্রভাব থেকে যায় আর আগুন হল শয়তান সৃষ্টির মূল উপাদান। আর আগুন পানি দ্বারা নিভে যায় এ হিকমতের জন্যই উযূর হুকুম দেয়া হয়েছে। যেমন রাগান্বিত অবস্থায় উযূর হুকুম দেয়া হয়েছে। আর এটা মুস্তাহাব।

৬. ইমাম মহাল্লি (র) বলেন, যেহেতু সাহাবাগণ জাহেলী যুগে লোক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় কম অভ্যাস্ত ছিল, তাই ইসলামের প্রাথমিক যুগে পরিচ্ছন্নতার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে এমন হুকুম দেয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, নবী করীম (স) এর হায়াত মুবারকের শেষের দিকে মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টিও রহিত করে দেয়া হয়েছে। (ইলাউস সুনান: ১/১৭৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা: ১/৪৮, মাজউয যাওয়ায়েদ: ১/২৫১)

৭. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) বলেন, এখানে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য উযূ করা মুস্তাহাব, সবার জন্য নয়।

৮. অথবা, উযূ করার আদেশ সম্বলিত হাদীসসমূহের উযূ দ্বারা وضوء شرعى উদ্দেশ্য নয়: বরং তা দ্বারা وضوء لغوى অর্থাৎ হাতমুখ ধৌত করা উদ্দেশ্য। (শরহে মিশকাত; ১/২৬১)

سوال : مَا الاختلافُ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِى لُحُوْمِ الْإِبِلِ انّه نَاقِضٌ لِلْوُضُوْءِ أَمْ لَا؟

প্রশ্ন ঃ উটের গোশত খাওয়ার পর উযূ করার ব্যাপারে আলিমদের মত পার্থক্যের বর্ণনা দাও। এটা কি উযূ ভঙ্গের কারণ।

উত্তর ঃ উটের গোশত খাওয়ার পর উযূ করা জরুরী কি না এ ব্যাপারে আলিমদের মতামত নিম্নরূপ–

১. ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবু বকর ইবনে খুযাইমা ইয়াহইয়া, ইবনে মুনযির প্রমূখের মতে, উটের গোশত খাওয়ার পর উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই উযূ করা আবশ্যক।

২. ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেকী (র) সহ জুমহুর উলামাদের মতে, উটের গোশত খাওয়ার ফলে উযূ ভঙ্গ হয় না। কেননা, উট ও বকরীর গোশতের হুকুম ও অন্যান্য রান্না করা খাবারের মতই। অতএব, এটা খেলেও উযূ ভাঙ্গবে না। তাই উযূ করা ওয়াজিব নয়।

প্রথম মাযহাবের দলীল- ১ ঃ

عَنْ جابِرٍ رض أنَّه قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ عليه السلام نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ .

অর্থাৎ.. হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একটি লোক জিজ্ঞাসা করল আমরা কি উটের গোশত খেয়ে উযূ করবো? রাসূল (স) বললেন হ্যাঁ, উটের গোশত খেয়ে উযূ কর। (মুসলিম)

দলীল- ২ ঃ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض قال سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ عليه السلام تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا .

অর্থাৎ.. বারা ইবনে 'আযেব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উটের গোশত ভক্ষণ করার পর উযূ সম্পর্কে রাসূল (স) কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূল (স) বললেন, তোমরা উযূ কর। (আবু দাউদ)

জুমহুরের দলীল- ১ ঃ

عن سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَان ثم دَعَا بالأَزْوادِ فلَمْ يُؤْتَ إلَّا بِالسَّوِيقِ فَثُرِّىَ فَأَكَلَ وأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إلى المَغْرِب فَتَمَضْمَضَ وتَمَضْمَضْنَا ثم صَلّى ولَمْ يَتَوَضَّأْ .

২. কেননা, উটের গোশত مَسَّتِ النَّارُ এর অন্তর্ভুক্ত। আর তাতে যখন উযূ বিনষ্ট হয় না, তখন উটের গোশত খাওয়ার ফলেও উযূ বিনষ্ট হবে না।

৩. হযরত শায়খুল আদব বলেন, কোন হারাম বস্তু খেলেও উযূ বিনষ্ট হয় না, তবে সে গুনাহগার হয়। আর উটের গোশত তো হালাল, কাজেই এখানে তো উযূ ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

যৌক্তিক প্রমাণ ঃ উট ও বকরী সমস্ত আহকামে সমান। যেমন-এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয, দুধ হালাল, গোশত পবিত্র ইত্যাদি। কাজেই যুক্তির দাবী হল, গোশত খাওয়ার ফলে উযূ ভাঙ্গা না ভাঙ্গার ক্ষেত্রেও উভয়ের হুকুম একরকম হবে। সুতরাং বকরীর গোশতের ন্যায় উটের গোশত খেলেও উযূ ভাঙবে না।

(ইবাহুত ত্বহাবী ১/২০৯-২২১, বজলুল মাজহুদ: ১/১১৭)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

১. আপনাদের উল্লিখিত হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব উযূ উদ্দেশ্য।

২. অথবা, তা দ্বারা وضوء لغوى তথা হাত ধোয়া ও কুলি করা উদ্দেশ্য।

৩. হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম (র) বলেন- اَنَّ عَلٰى ذَرْوَةِ كُلِّ بَعِيْرٍ شَيْطَانٌ তাই لحومُ الإبل এর মধ্যে শয়তানের কিছুটা প্রভাব রয়েছে। শয়তান আগুনের তৈরী, আর আগুন পানি দ্বারা নির্বাপিত হয়ে যায়। এজন্যে উটের গোশত খাওয়ার পরে উযূ করার বিধান দেয়া হয়েছে। উটের গোশত ناقض وضوء হওয়ার কারণে এ হুকুম দেয়া হয়নি। মোটকথা, উটের গোশত খাওয়ার পর উযূ করা ওয়াজিব নয়।

৪. শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) বলেন, উটের গোশত বনী ইসরাঈলদের জন্য হারাম ছিল। আর উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য তা যখন হালাল হল তখন শুকরিয়া স্বরূপ উযূ করতে বলা হয়েছে, ناقض وضوء হিসেবে নয়।

(শরহে মিশকাত ১/২৬২)

سوال : الحَدِيْثَانِ مُتَعَارِضَانِ فَكَيْفَ التوفِيْقُ بَيْنَهُمَا؟

প্রশ্ন ঃ উল্লেখিত হাদীস দুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। উভয়ের মধ্যকার সমাধান কী?

উত্তর ঃ হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার বৈপরীত্যের সমাধান ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, আগুনে পাকানো খাদ্য খেলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং নতুন করে উযূ করা ওয়াজিব। আর হযরত সুয়াইদ ইবনে নু'মান এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আগুনে পাকানো খাদ্য ভক্ষণ করলে উযূ নষ্ট হবে না। তাই উভয় হাদীসে খাদ্য ভক্ষণ করলে উযূ নষ্ট হবে না। তাই উভয় হাদীসে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। এ দ্বন্দ্বের সমাধান নিম্নরূপ-

১. হাফেজ ইবনে কায়্যিম বলেন, مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ নাকিযে উযূ। এ কারণে উযূর নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং খাদ্য আগুন দ্বারা পাকানো হয়েছে। আর আগুন হচ্ছে শয়তানের হাকীকত। এজন্যে মুস্তাহাব স্বরূপ উযূর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন হাদীসে আছে- اِنَّ الغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ

২. ইমাম শাওকানী (র) বলেন, যেহেতু আগুন দ্বারা কাফির ও ফাসিকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে সেহেতু আগুনে পাকানো খাদ্য খেয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়া শোভনীয় নয়। এজন্যে উযূর হুকুম দেয়া হয়েছে। ناقض وضوء হিসেবে এ হুকুম দেয়া হয়নি।

৩. ইমাম মুহাল্লি (র) বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা পবিত্রতার প্রতি তেমন গুরুত্ব দিত না। এজন্যে তাদেরকে اَكْل مَمَّا مَسَّتِ النَّارُ এর পর উযূ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর যারা পবিত্রতা হাসিলে অভ্যস্ত ছিল। তাদেরকে উযূ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৪. শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) বলেন, উম্মতের বিশেষ শ্রেণীর জন্যে মুস্তাহাব হিসেবে উযূর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বাস্তবে এটা ناقض وضوء নয়। তাই দু'হাদীস দু'দিকে ইঙ্গিত করছে।

৫. কতিপয় আলিমের মতে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে-

لِقَوْلِ جَابِرٍ كَانَ اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ـ

৬. অথবা, হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসে وضوء لغوى তথা কুলি করা ও হাত ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। আর হযরত সুয়াইদ (রা) এর হাদীসে কুলি করা ও হাত ধোয়াকে نفى করা হয়নি। বরং শরঈ উযূকে نفى করা হয়েছে। তাই কোন বৈপরীত্য নেই। (শরহে নাসায়ী ঃ ১/২২৮)

سوال : مَتٰى وَقَعَتْ غَزْوَةُ خَيْبَرَ؟ فَصِّلِ الْوَاقِعَةَ هَلْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ عَنْوَةً اَمْ صُلْحًا؟

প্রশ্ন ঃ খায়বার যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? ঘটনাটি বর্ণনা কর। খায়বার বিজিত হয় যুদ্ধের মাধ্যমে না কি সন্ধির মাধ্যমে?

উত্তর ঃ খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময়কাল ঃ খায়বারের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছে, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হল-

ক. ইবনে ইসহাক (র) বলেন, এ যুদ্ধ ৭ম হিজরীর মুহাররম মাস মোতাবেক ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে সংঘটিত হয়েছে।

খ. ইমাম মালেক (র) এবং ইবনে হযম বলেন, এ যুদ্ধটি ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পরেই হয়েছে।

গ. কেউ কেউ এর সমাধানে বলেন, উভয় অভিমত সত্য। কেননা, যাদের মতে মুহাররম হচ্ছে বছরের প্রথম মাস। তাদের মতে সপ্তম হিজরীতে। আর যাদের মতে রবিউল আউয়াল হচ্ছে প্রথম মাস, তাদের মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে হয়েছে।

খায়বর যুদ্ধের কারণ

মদীনা থেকে বিতাড়িত ইয়াহুদী সম্প্রদায় বনুনযীর ও বনু কুরাইযা খায়বরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা গাতফান গোত্রসহ খায়বরের ইয়াহুদীদেরকে মদীনায় হামলা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। এ উদ্দেশ্যে তারা বিরাট দুর্গ নির্মাণ করে। তারা ৪০০০ সৈন্যের একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে।

রাসূল (স) এর কাফেলা ঃ রাসূল এ খবর পেয়ে সিবা ইবনে উরফাতাকে মদীনার খলীফা মনোনীত করে ২০০ অশ্বারোহীসহ ৬০০ মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে খায়বরের দিকে যাত্রা করেছেন। রাসূল (স) رجيع নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। আর সাহাবায়ে কিরাম এ ছন্দ আবৃতি করতে লাগলেন-

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا × وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

وَاَنْزِلْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا × وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا

মুসলমানদের বিজয় ঃ খায়বারে মুসলমানরা তাদেরকে মোট ১৫ দিন অবরোধ করে রাখেন। এরপর খায়বার মুসলমানদের হস্তগত হয়। বিশেষ করে এ যুদ্ধে হযরত আলী (রা) খুব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এ যুদ্ধে ইয়াহুদীগণ চরমভাবে পরাজয়বরণ করে। অনেক ইয়াহুদী মারা যায়। অবশেষে তারা মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করে সন্ধি চুক্তি করতে বাধ্য হয়। জিযিয়া দানের শর্তে তাদেরকে সেখানে থাকার অনুমতি দেয়া হয়। (শরহে নাসায়ী: ১/ ২২৯)

খায়বার মুসলমানদের হস্তগত হওয়া সম্পর্কিত বর্ণনা

খায়বার বিজয় কি সন্ধির মাধ্যমে হয়েছে না যুদ্ধের মাধ্যমে? এ মাসআলায় মতানৈক্য রয়েছে। যেমন-

১. একদল ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন, খায়বার যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে। তাদের দলীল হচ্ছে-

١ـ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلٰى خَيْبَرَ اَرَادَ اِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا وَكَانَتِ الْاَرْضُ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ ـ

٢ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِنِ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم اِلْتَقٰى هُوَ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا

২. দ্বিতীয় দল বলেন, খায়বার সন্ধির মাধ্যমে বিজয় হয়েছে। কেননা, যদি যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে বিজয় হতো

তাহলে তাদেরকে গোলাম বানানো হতো অথচ তাদেরকে জিযিয়া দেয়ার শর্তে সেখানে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাঁরা দলীল হিসেবে নিম্নে বর্ণিত হাদীস দুটি পেশ করেছেন-

١ ـ عَن ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَاتَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ او زَرْعٍ

٢ـ قال رسولُ اللهِ صلى اللّٰهُ عليه وسلم لِاَهْلِ خَيْبَرَ اقركم كَمَا اَقَرَّ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

৩. তৃতীয় দল মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে বলেন, কিছু অংশ যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে। যেমন- নাঈম ও কামূসদুর্গ। এগুলো হযরত আলী (রা) নেতৃত্বে মুসলমানদের দখলে আসে। যেমন রাসূল (স) বলেছেন,

لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ

আর কিছু অংশ সন্ধির মাধ্যমে বিজয় হয়েছে। তাদেরকে অবরোধ করে রাখার পর তারা সন্ধি করতে বাধ্য হয়। যেমন কাতিবা ও সালালিম দুর্গ। ইমাম নববী (র) এ অভিমতকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। (শরহে নাসায়ী ১/২৩১)

سوال : كَمْ قِلْعَةً كَانَتْ فِى خَيْبَرَ؟ سَمِّ اَسْمَائَهُمْ ثُمَّ بَيِّنْ مَحَلَّ الْاِعْرَابِ لِقَوْلِهِ وَهِىَ مِنْ اَدْنٰى خَيْبَرَ ـ

প্রশ্ন ঃ খায়বরে মোট কতটি দুর্গ ছিল? এগুলোর নাম লিখ। অতঃপর হাদীসের ভাষ্য وَهِىَ مِنْ اَدْنٰى خَيْبَرَ **এর মহল্লে ই'রাব বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ খায়বরে দুর্গের সংখ্যা ঃ খায়বরে ইয়াহুদীদের দুর্গের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৮টি। সেগুলো হচ্ছে-

১. النَّاعِم (আন-নায়িম) ২. اَلنَّطَاط (আন-নেতাত) ৩. اَلشَّقُّ (আশশাক) ৪. اَلْكَتِيْبَةُ আল কাতিবা) ৫. الوَطِيْح (আল-ওয়াতীহ) ৬. السَّلَالِم (আস-সুলালিম) ৭. القَمُوْص (আল-কামুস) ৮. صَعَب (সায়াব, এটা সায়াব ইবনে মুয়াযের কেল্লা)। [ইনআমুল বারী]

وَهِىَ مِنْ اَدْنٰى خَيْبَرَ **এর মহল্লে ই'রাব :** হাদীসের এ বাক্যটি وَهِىَ مِنْ اَدْنٰى خَيْبَرَ মানসুবের মহল্লে রয়েছে। কেননা, এটা الصَّهْبَاء শব্দের حال হয়েছে, আর حال সর্বদা মানসূব হয়। অথবা, এটা جملة مستانفة হয়েছে। প্রশ্ন হয়েছে مَاهِىَ الصَّهْبَاء আর এর উত্তরে বলা হয়েছে وَهِىَ مِنْ اَدْنٰى خَيْبَرَ এ তারকীব হিসেবে তার কোন محل নেই। (শরহে নাসায়ী ১/২৩১)

سوال : ما الحِكمةُ فِى الوُضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟

প্রশ্ন ঃ আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণের পর উযূ করার হিকমত কি?

উত্তর ঃ আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণের পর উযূ করার হিকমত ঃ

হাদীস শরীফে আগুনে পাকানো খাদ্য ভক্ষণ করলে উযূ করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এর পেছনে হিকমত নিম্নরূপ-

১. আল্লামা শা'রানী (র) বলেন, আগুন আল্লাহ তাআলার ক্রোধের প্রতীক, যা দ্বারা কাফির ও গুণাহগার মুমিনদেরকে আযাব দেয়া হবে। অতএব, ক্রোধ বহ্নি প্রকাশক আগুনে পাকানো খাদ্য খাওয়ার পর পরিচ্ছন্ন না হয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়া ঠিক নয়। এ হুকুম সেসব সূক্ষ্মদর্শী লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট যারা এ সম্পর্কে অবহিত। সর্ব সাধারণের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়।

২. হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম (র) বলেন, আগুনে পাকানো খাদ্য খেলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যায় এ দৃষ্টিভঙ্গিতে উযূ করার হুকুম দেয়া হয়নি। বরং হুকুম এজন্যে দেয়া হয়েছে যে, আগুন দ্বারা তা পাকানো হয়েছে ঐ আগুন তো শয়তানেরই মূল সৃষ্টি উপাদান। আর পানি দ্বারা আগুন নিভে যায়। তাই উযূর হুকুম দেয়া হয়েছে।

৩. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, আগুন দ্বারা পাকানো খাদ্য জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই ঐ খাদ্য খাওয়ার পর উযুর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে ঐ খাদ্য গ্রহণের কারণে মন সে দিকে মগ্ন হয়ে না পড়ে।

৪. জুমহুর আলিমগণ মনে করেন, এখানে বিশেষ কোন হিকমত নেই, রাসূল (স) হয় তো ভেবেছিলেন আগুনে পাকানো খাবার খেলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখলেন, উম্মতের উপর এ বিধান কঠিন হয়ে যায়। তাই তিনি নিজেই আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণ করে পুনরায় উযূ না করেই নামায আদায় করেছেন।

(শরহে নাসায়ী : ১/২৩২)

তাত্ত্বিক আলোচনা

উপরোক্ত শিরোনাম ধার্য করার দ্বারা উদ্দেশ্য

ইমাম নাসায়ী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের নিয়ম হল তারা সর্ব প্রথম ঐ সকল হাদীস উল্লেখ করেন, যেগুলোকে তাঁরা মানসূখ মনে করেন। তারপর নাসেখ হাদীস উল্লেখ করেন। এ রীতি এখানেও প্রতিফলিত হয়েছে। আলোচ্য অনুচ্ছেদে প্রথমে ঐ সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন যার বিধান হল আগুনে পাকানো জিনিস ভক্ষণ করলে উযূ করতে হবে। অতঃপর অন্য আরেকটি শিরোনাম কায়েম করেছেন তার অধীনে ঐ সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার বিধান হল আগুনে পাকানো জিনিস ভক্ষণ করলে উযূ করতে হবে না। এ বিন্যাসে হাদীস উল্লেখ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আগুনে পাকানো বস্তু ভক্ষণ করলে যে উযূ করার বিধান ছিল তা ইসলামের শুরু যুগের ছিল, পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে গেছে।

ইসলামের শুরু যুগে উযূর বিধান দেয়ার রহস্য

জাহেলীযুগের লোকেরা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবান ছিল না বরং অপরিস্কার অবস্থায় থাকাটাই ছিল তাদের অভ্যাস। নবী (স) অত্যন্ত বিচক্ষনতার সাথে তাদের এ অশালীন কাজ থেকে ফিরিয়ে আনেন। যখন তারা আগুনে পাকানো কোন কিছু ভক্ষণ করতেন তখন তারা হাত ধৌত করাকে প্রয়োজন মনে করতেন না। ফলে তাদের তৈলাক্ত হাতে ময়লা মাটি লাগতো, তাই নবী (স) যারা ইসলাম গ্রহণ করতো তাদেরকে উযূ করার নির্দেশ দিতেন যাতে করে তারা এ খারাপ অভ্যাসকে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর যখন তাদের অভ্যাস ঠিক হয়ে গেলো এবং শালীনতাবোধ ও উত্তম আচরন শিখলো, তখন আর উযূর প্রয়োজন থাকলো না, ফলে উক্ত বিধান কে রহিত করে উযূ না করার বিধান দেন। (শরহে উর্দু নাসায়ী: ২৬৪)

আলোচ্য অনুচ্ছেদের সারকথা ঃ আলোচ্য অনুচ্ছেদে যে সকল হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, তার সব কটিতেই উযূ ওয়াজিব হওয়ার বিধান এসেছে। এ ব্যাপারে জুমহুরদের বক্তব্য হল, উক্ত বিধান মানসূখ হয়ে গেছে, অথবা উক্ত হাদীসসমূহে যে উযূর কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা وضوء لغوى উদ্দেশ্য, وضوء شرعى নয়। এটাই একদল আলিম ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর বক্তব্য। কিন্তু আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী (র) দ্বিতীয় জবাবের উপর আপত্তি উত্তাপন করেন। তিনি বলেন, হাদীসে وضوء দ্বারা وضوء لغوى উদ্দেশ্য নেয়া একেবারে অমূলক ও বাস্তবতার পরিপন্থী, কেননা, হযরত জাবের (রা) এর উক্তি–

كَانَ اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلّى اللّٰهُ عليه وسلم تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ـ

এর পরিপন্থী দ্বিতীয় জবাবটি। কারণ উক্ত হাদীসে وضوء দ্বারা وضوء لغوى উদ্দেশ্য নেয়া বহু দূরবর্তী ব্যাখ্যা. কারণ এটা কখনই হতে পারে না যে, নবী (স) আগুনে পাকানো জিনিস ভক্ষণ করার পর ইসলামের শুরু যুগে হাত মুখ ধৌত করতেন, অতঃপর পরবর্তীতে হাত মুখ ধোয়া ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই বুঝা যাচ্ছে এখানে উযূ দ্বারা শরঈ উযূ উদ্দেশ্য। আর একথা " মুহাওয়ারা" তথা চলিত পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিদের অজানা নয়। সুতরাং উত্তম জবাব এটাই যে. এখানে যে উযূর নির্দেশ এসেছে. এ উযূ দ্বারা মুস্তাহাব উযূ উদ্দেশ্য। এটাই আল্লামা খাত্তাবী (র) এর বক্তব্য। (ই'লাউস সুনান ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৬৩)

তবে এ মুস্তাহাব উযূর বক্তব্যটাও পূর্ণাঙ্গ সঠিক জবাব নয়। কাজেই আল্লামা যুরকানী (র) এ বক্তব্যকে দৃঢ়তার সাথে খণ্ডন করেছেন। হযরত আনাস (রা) এর কওল لَيْتَنِى لَمْ اَفْعَلْ ও ইমাম আহমদ এর রেওয়ায়াত–

ثم دَعَوْتُ بِوَضُوْءٍ فقالا لم تَتَوَضَّأْ فقلتُ لِهٰذا الطَّعَامِ الَّذِى اَكَلْنَا ـ

একথারই সমর্থক। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ২৬৬–২৬৭)

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

١٨٢. اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة ان رسول الله ﷺ اكل كتفا فجاءه بلال فخرج الى الصلوة ولم يمس ماءا -

١٨٣. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على ام سلمة فحدثتني ان رسول الله ﷺ كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم وحدثنا مع هذا الحديث انها حدثته انها قربت الى النبي ﷺ جنبا مشويا فاكل منه ثم قام الى الصلوة ولم يتوضأ -

١٨٤. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس قال شهدت رسول الله ﷺ اكل خبزا ولحما ثم قام الى الصلوة ولم يتوضأ-

١٨٥. اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان اخر الامرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار -

---

অনুচ্ছেদ ঃ আগুনে সিদ্ধ বস্তু খাওয়ার পর উযূ না করা

অনুবাদ ঃ ১৮২. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র)......উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (স) কাঁধের গোশ্‌ত আহার করলেন, তারপর বিলাল (রা) আসলে তিনি নামায আদায় করতে গেলেন। অথচ তিনি পানি স্পর্শ করলেন না।

১৮৩. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)....... সুলায়মান ইবনে ইয়াসির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামার নিকট গেলাম। তিনি আমার নিকট বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) সহবাসজনিত কারণে (স্বপ্নদোষ ব্যতীত) জানাবত অবস্থায় ভোর করতেন এবং সিয়ামও পালন করতেন। বর্ণনাকারী রাবীদের মধ্যে খালিদ বলেন, এ হাদীসের সাথে এ-ও বর্ণনা করেছেন যে, একদা উম্মে সালমা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ভুনা গোশত রাখলেন। তিনি তা হতে কিছু খেলেন। পরে নামাযের জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু উযূ করলেন না।

১৮৪. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)......... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলেন। তিনি রুটি ও গোশ্‌ত খেলেন। পরে নামাযের জন্য গেলেন কিন্তু উযূ করলেন না।

১৮৫. আমর ইবনে মনসুর (র)......... মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, যে সকল বস্তুকে আগুনে স্পর্শ করেছে তা আহার করার পরে উযূ করা ও না করার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শেষ কাজটি ছিল উযূ না করা।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

আগুন দ্বারা প্রস্তুতকৃত জিনিস ভক্ষণকরলে উযূ ওয়াজিব হওয়ার যে বিধান এসেছে এ সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বে تركُ الوُضُوء مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ অনুচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। সেগুলোর মধ্য হতে ইমাম নাসায়ী (র) ৪টি হাদীস আলোচ্য শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।

প্রথম হাদীস ঃ দ্বিতীয় হাদীসটিও উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। যার রাবী হল সুলায়মান ইবনে ইয়াসার। এখানে এসেছে- উম্মে সালমা (রা) একটি বকরী ভুনা করে রাসূলের সম্মুখে পেশ করলেন, তার কিছু অংশ খেয়ে তিনি দাঁড়ায়ে যান এবং পূর্ব থেকে উযূ থাকার কারণে উযূ করা ছাড়াই তিনি নামায আদায় করেন। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় আগুনে প্রস্তুতকৃত বস্তু ভক্ষণ করলে উযূ নষ্ট হয় না, বরং উযূ বহাল থাকে। কাজেই পূর্বের উযূ দ্বারা নামায আদায় করা যাবে,

তৃতীয় হাদীস ঃ তৃতীয় হাদীস ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত- নাসায়ীতে হাদীসটি সংক্ষেপে এসেছে। বায়হাকীর রেওয়ায়াতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনাকারী রাবী সুলায়মান ইবনে ইয়াসার বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি উযূ করছিলেন। ঘটনাক্রমে তথায় ইবনে আব্বাস উপস্থিত হল। তখন আবু হুরায়রা (রা) বলেন, ইবনে আব্বাস! তুমি কি জানো আমি কেন উযূ করছি? হযরত ইবনে আব্বাস জবাব দিলেন, না। তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি পনিরের টুকরা খেয়েছি তাই উযূ করছি। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, مَا اُبَالِيْ مِمَّا تَوَضَّأْتُ কথা আমার নিকট তোমার এ উযূর কোন গুরুত্ব নেই।

আল্লাহর শপথ আমি রাসূল (স)কে দেখেছি তিনি গোশত-রুটি ভক্ষণ করার পর উযূ করা ছাড়াই নামায আদায় করেছেন। এ হাদীসও স্পষ্টভাবে এ কথার ঘোষণা দেয় যে, আগুনে পাকানো জিনিস ভক্ষণ করলে উযূ করা ওয়াজিব নয়।

চতুর্থ হাদীস ঃ চতুর্থ হাদীসটি হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, ইমাম নববী (র) বলেন, জাবেরের হাদীসটি সহীহ। এটাকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ীসহ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে লেখেন, উক্ত হাদীসটিকে ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযাইমাও সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত জাবের বলেন, كَانَ اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ এখানে امر শব্দটি مامور এর অর্থে যার দ্বারা فعل উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আগুন দ্বারা প্রস্তুতকৃত জিনিস ভক্ষণ করার পর উযূ করা ও উযূ না করা উভয়টাই আছে। তবে উযূ না করা হুজুর (স)এর জীবনের সর্বশেষ আমল। আলোচ্য হাদীস এর উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ। কাজেই এ হাদীসটি ناسخ হবে।

হাফেজ ইবনে হাজার তালখীসুল হাবীরে উল্লেখ করেছেন, জাবেরের হাদীসের শাহেদ বিদ্যমান আছে। কেননা ইমাম বুখারী সাঈদ ইবনে হারিসের সূত্রে একটি হাদীস স্বীয় কিতাবে (كتاب الاطعمه) উল্লেখ করেছেন। এখানে এসেছে সাঈদ ইবনে হারিস হযরত জাবেরকে জিজ্ঞাসা করেন আগুনে তৈরীকৃত বস্তু ভক্ষণ করলে কি উযূ আবশ্যক হবে? তিনি জবাব দেন, না।

অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ ও ইবনে আবী শায়বা প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ হযরত জাবের (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেন, যে তিনি বলেন, আমি নবী (স) আবু বকর উমরের সাথে গোশত রুটি ভক্ষণ করেছি। অতঃপর আমরা সকলে উযূ না করেই নামায আদায় করেছি। নবী (স) আমাদের সাথে খাওয়ার মাঝে শরীক হন কিন্তু তিনি ও উযূ ছাড়াই নামায আদায় করেন। অতঃপর উক্ত হাদীসের বিস্তারিত বিবরণে তিনি বলেন, খলিফাগণ ও তাদের জামানায় আগুনে প্রস্তুতকৃত বস্তু ভক্ষণ করে উযূ করেননি।

এটাই একথার প্রমাণ যে, পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযূ করা না করা উভয়টি রাসূল (স) থেকে প্রমাণিত আছে। কিন্তু হুজুর (স) এর জীবনের শেষ আমল হল উযূ না করা। কাজেই হযরত জাবের (রা) এর হাদীস পূর্ববর্তী হাদীসের জন্য ناسخ হবে। এছাড়াও হযরত জাবের (রা) এর হাদীসের অনেক শাওয়াহেদ আছে যা বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, মুগীরা ইবনে শো'বা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। আবু হুরায়রা (রা) এর রেওয়ায়াত ত্বহাবী শরীফে আছে যে, তিনি শেষ বয়সে পাকানো জিনিস ভক্ষণ করলে উযূ করার অভিমত থেকে রুজু করেছেন। যেমন- ১. মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার রেওয়ায়াত-

ان النبيّ صلى الله عليه وسلم اَكَلَ اٰخِرَ عُمُرِهٖ لحمًا ثم صلّى ولمْ يَتَوَضَّأْ .

২. তাবরানী ও বায়হাকীতে এসেছে- اَكَلَ مِمَّا غَيَّرَتِ النارُ ثم صَلّى ولمْ يَتَوَضَّأْ وكانَ اٰخِرُ اَمْرِه

৩. হযরত মুগীরার রেওয়ায়াত- ولوْ فعلتُ فعلَ الناسُ ذالكَ بَعْدِى (امام احمد، طبرنى)

আমি যদি খানা খাওয়ার উপর উযূ করার প্রতি ধারাবাহিকতা রক্ষা করতাম তাহলে তা সমগ্র উম্মতের উপর আবশ্যক হয়ে যেত। এটাই এ কথার প্রমাণ যে, এখন আর আগুনে প্রস্তুতকৃত বস্তু ভক্ষণ করলে উযূ করা লাগবে না।

মোটকথা, উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেলো আগুনে পাকানো বস্তু ভক্ষণ করলে উযূ করতে হবে এ বিধান প্রথমে ছিল। পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে গেছে। কেননা, উযূ তরক করার আমল হুনাইনে সংঘটিত হয়েছে। আর এটা পরের আমল, কাজেই এর উপর ভিত্তি করে ইমামগণ বলেন, উযূ করার বিধান মানসূখ হয়ে গেছে। আর সাহাবা ও কিবারে তাবেঈনের ইজমা এ ব্যাপারে প্রমাণ। কেননা, তারা আগুনে পাকানো বস্তু ভক্ষণ করলে উযূ করতেন না।

আল্লামা কিরমানী ইমাম মালেক থেকে নকল করেন, হুজুর (স) থেকে দু' ধরণের আমল প্রমাণিত আছে। তাই আমরা এটার উপর আমল করবো যার উপর আবূ বকর ও ওমর (রা) আমল করেছেন এবং অপরটিকে ছেড়ে দিবো। কেননা, এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে সঠিক বিষয় ঐ টি যার উপর তারা দু' জন আমল করেছেন। কাজেই যদি উযূ সংশ্লিষ্ট হাদীসের উযূর বিধান যদি ওয়াজিব ধরা হয় তাহলে তা মানসুখ হয়ে যাবে। আর যদি মুস্তাহাব ধরা হয় তাহলে বহাল থাকবে। আল্লামা সিন্ধী বলেন, জাবের এর এ হাদীস যদি না থাকতো তাহলে হাদীস এর মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকে যেত। জাবের (রা) এর হাদীস একথার প্রমাণ যে,এটা পূর্বের হুকুম পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে গেছে। (শরহে নাসায়ী ঃ ২৬৭-২৬৯)

سوال : اذكر نبذة من حياة السيدة ام سلمة رض

প্রশ্ন ঃ হযরত উম্মে সালামার জীবনী লেখ

উত্তর ঃ হযরত উম্মে সালামা (রা) এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি ঃ নাম হিন্দ, উপনাম সালামা, পিতার নাম সুহাইল, মায়ের নাম আতিকা বিনতে আমির। তিনি ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। বদান্যতার জন্যে তাঁর পিতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

বংশ ধারা ঃ হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া ইবনে সুহাইল ইবনে মুগীরা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মাখযূম আল মাখযূমী।

দাম্পত্য জীবন ঃ তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল স্বীয় চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ এর সাথে তিনি আবু সালামা নামে অধিক পরিচিত। হযরত উম্মে সালামা হল মুগীরা বংশের। আর তাঁর স্বামী আবু সালামা হল আসাদ বংশের।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ রাসূল (স) এর নবূওয়াতের শুরুর দিকেই তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দীন ইসলামে দীক্ষিত হন।

প্রথম হিজরত ঃ পূর্বপুরুষদের দ্বীন পরিবর্তন করে নতুন দ্বীন গ্রহণ করার কারণে তাদের উপর অসহনীয় নির্যাতন হলতে থাকে। তাই তাঁরা স্বীয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে হাবশায় হিজরত করেন।

মদীনায় হিজরত ঃ হাবশা হতে মক্কায় ফিরে আসার পর কাফির-মুশরিক কর্তৃক নির্যাতনের মাত্রা যখন আরো তীব্র আকার ধারণ করে তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মদীনায় হিজরতের জন্য মনস্থ করেন। তাদের মদীনা হিজরতের করুণ কাহিনী হযরত উম্মে সালামা (রা) নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন আবু সালমা রা. হিজরতের সংকল্প করেন, তখন তাঁর নিকট একটি মাত্র উট ছিল, আমাকে এবং আমার পুত্রকে এর উপর বসিয়ে নিজে উটের লাগাম ধরে টেনে চললেন, আমার পিতৃ বংশীয়রা তা দেখে বাধা সৃষ্টি করল। তারা বলতে লাগল, আমাদের কন্যাকে আমরা যেতে দেব না, তারা আবু সালামার হাত হতে লাগাম কেড়ে নিল এবং আমাকে নিয়ে হলল। ইতিমধ্যে আমার স্বামীর বংশীয়গণ এসে পৌঁছল এবং আমার পুত্র সালামাকে হস্তগত করে আমার পিতৃবংশীয়দেরকে বলতে লাগল 'তোমরা যদি তোমাদের কন্যাকে তার স্বামীর সাথে যেতে না দাও, তাহলে আমরাও আমাদের বংশীয় সন্তানকে তার মায়ের সাথে যেতে দেব না' এভাবে আমি স্বামী ও পুত্র হতে বিচ্ছিন্ন হলাম।

স্বামী মদীনায় চলে গেলেন, পুত্র তার পিতৃ বংশীয়গণের নিকট এবং আমি আমার পিতৃবংশীয়গণের সাথে থাকতে বাধ্য হলাম। আমি প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠে এক উচ্চস্থানে বসে সারাদিন কাঁদতাম। এরূপে প্রায় এক বছর গেল। আমার এক আত্মীয় অনুগ্রহপূর্বক একদিন আমার পিতৃ বংশীয়দেরকে সমবেত করে এমন ভাষায় আমার সম্বন্ধে অনুরোধ করল যে, তারা আমাকে আমার স্বামীর নিকট যাওয়ার এখতিয়ার দিলেন, আর আমার স্বামীর বংশীয়গণও আমার ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়েদেন। অতঃপর একটি উটে করে পুত্রসহ ওসমান ইবনে তালহার সহায়তায় মদীনায় গিয়ে স্বামীর সাথে মিলিত হলাম।

মদীনায় গিয়ে স্বামীর সাথে মিলিত হলাম।

প্রথম স্বামীর ইন্তিকাল ঃ উম্মে সালামা (রা) ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। স্বামীও ছিলেন তেমনি। তাঁর প্রথম স্বামী তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন। হযরত উম্মে সালাম (রা) অন্যান্য মহিলার সাথে যুদ্ধে আসেন, হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি আমার মাতা উম্মে সালামা এবং হযরত আশেয়া (রা) কে দেখলাম তারা আস্তিন গুটিয়ে মশক ভরে পানি এনে আহত যোদ্ধাদেরকে পান করাচ্ছেন। মশক খালি হতে না হতে আবার মশক ভরে পানি আনছেন। (সহীহ বুখারী) উহুদ যুদ্ধের প্রায় তিন বছর পর উহুদের ক্ষতস্থানে আবু সালামার ঘা দেখা দেয়। অবশেষে এর যন্ত্রনায় ঐ বছরই তিনি ওফাত লাভ করেন।

রাসূল (স)এর সাথে বিবাহ ঃ এ উচ্চ বংশীয় স্বার্থ ত্যাগিনী মহিলাকে সম্মানিত এবং অভাব বিমুক্ত করণের উদ্দেশ্যে রাসূল (স) বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন উম্মে সালামা চারটি আপত্তি উত্থাপন করলেন। যেমন–

১. আমার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে।

২. আমার সন্তান-সন্তুতি রয়েছে।

৩. আমার বয়স হয়েছে।

৪. এখানে আমার কোন অভিভাবক নেই।

রাসুল (স) বললেন, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করবো, যেন তিনি তোমার আত্মমর্যাদাবোধ দূর করে দেন। আর তোমার সন্তানেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় থাকবে। বয়সের ব্যাপারে বললেন, তোমার চেয়ে আমার বয়স বেশী। এরপর উম্মে সালামা রাজী হলে ৪র্থ হিজরীতে বিবাহ হয়ে যায়। তখন হযরত উম্মে সালামার বয়স ছিল ২৬ বছর এবং রাসূল (স) এর বয়স ছিল ৫৭ বছর।

গুনাবলী ঃ তিনি বহু গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী রমনী। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তাঁর সৌন্দর্যের খ্যাতি যেমন শুনেছিলাম, তিনি তা হতেও বহুগুন বেশী সুন্দরী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে রূপে যেমন ধনী করেছিলেন, তা হতেও অধিক তাকে সৎগুণে এবং সুকর্মে ধনী করেছিলেন। হাদীস শাস্ত্রেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। রাসূল (স) থেকে হাদীস শ্রবণ করার তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল, তিনি একজন দানশীলা ছিলেন। তজ্জন্য স্বীয় কন্যাকেও উৎসাহিত করতেন। সুখ ভোগের দিকে তার অনুরাগ ছিল না। প্রত্যেক মাসে সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে রোজা রাখতেন। আল-ইসাবা গ্রন্থে আছে যে, হযরত উম্মে সালামা (রা) তার সৌন্দর্য, গভীর বুদ্ধি এবং দৃঢ় সংকল্পের জন্যে প্রশংসিতা ছিলেন। জ্ঞানে গুণে হযরত আয়েশা (রা) এর পরের স্থান হল- হযরত উম্মে সালামা (রা) এর।

সন্তান-সন্তুতি ঃ রাসূল এর ওরসে হযরত উম্মে সালামার কোন সন্তান হয়নি। পূর্বের স্বামী হযরত আবু সালামা থেকে চার জন সন্তান ছিল। দু'পুত্র সালামা ও ওমর এবং দু'কন্যা দুররা ও বাররা। রাসূল (স) বাররা নাম পরিবর্তন করে রাখেন যয়নব।

হাদীস বর্ণনা ঃ তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৫৮। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে ১৩টি, এককভাবে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে ৩টি করে হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর থেকে বহু মনীষী হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হল- তাঁর পুত্র ওমর, মেয়ে যয়নব, ক্রীতদাস নাবহান, ভাই আমির ইবনে আবু উমাইয়া, ভায়ের ছেলে মুসআব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া প্রমুখ। মুহাম্মদ ইবনে লবীদ বলেন, রাসূল (স) এর পত্নিগণের বহু হাদীস কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু এতদ্বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত উম্মে সালামার সমতুল্য কেউ ছিলেন না।

ইন্তিকাল ঃ তিনি কোন সনে মৃত্যুবরণ করেন এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন– ওয়াকিদী বলেন, তিনি হিজরী ৫৯ সনের শাওয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছেন। কারো মতে ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া এর রাজত্বকালে হিজরী ৬২ সনে মৃত্যুবরণ করেন। কারো মতে, ৬৩ হিজরীতে ৮৪ বছর বয়সে। কারো মতে, ৬১ হিজরীর শেষভাগে ওফাত লাভ করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। রাসূল (স) এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনি সর্বশেষ ইনতিকাল করেন। রাসূল (স) এর ওফাতের পর তিনি ৬০ বছর জীবিত ছিলেন। (ইকমাল; ৫৯৯ ইসাবা : ৪/৪২৬)

المَضْمَضَةُ مِنَ السَّوِيْقِ

١٨٦. اخبرنا محمدُ بنُ سلمةَ والحارثُ بنُ مِسكينٍ قِراءةً عليه وانا اسمعُ واللفظُ لهُ عَنِ ابنِ القاسمِ قال حدثني مالكٌ وهو ابنُ انسٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن بشيرِ بنِ يسارٍ مولى بني حارثةَ انَّ سُويدَ بنَ النُّعمانِ انه خرجَ مع رسولِ اللهِ ﷺ عامَ خيبرَ حتى اذا كانوا بالصَّهباءِ وهي مِن ادنى خيبرَ صلّى العصرَ ثم دعا بالازوادِ فلم يُؤتَ الا بالسويقِ فامر به فثُرِّيَ فاكلَ واكلنا ثم قالَ الى المغربِ فتمضمضَ وتمضمضنا ثم صلّى ولم يتوضّا -

ছাতু খাওয়ার পর কুলি করা

অনুবাদ ঃ ১৮৬. মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ্ ও হারিস ইবনে মিসকীন (র).........বুশায়র ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। সুয়াইদ ইবনে নো'মান (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি খায়বর যুদ্ধের বৎসর একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে বের হন, যখন তাঁরা সাহবা নামক স্থানে পৌঁছিলেন, আর তা হল খায়বরের শেষ সীমায় অবস্থিত। তখন তিনি আসরের নামায আদায় করলেন। পরে তিনি কিছু খাদ্যদ্রব্য চাইলে তাঁর নিকট কেবলমাত্র ছাতু পরিবেশন করা হল। তাঁর আদেশক্রমে তা পানির সাথে মিশানো হল, তারপর তিনি তা খেলেন, আর আমরাও তা খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের নামায আদায় করলেন অথচ আর উযূ করলেন না।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله صهباء ঃ এটা হল খায়বার ও মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী স্থান। যেখানে رَدُّ شَمْس তথা সূর্যকে স্থির ও তাকে পেছনে ফিরিয়ে আনার মু'জেযা প্রকাশ পেয়েছিল। এটাকে ইমাম ত্বহাবী (র) তার কিতাব مُشْكِلُ الآثار এর মধ্যে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন এবং নিজের শায়খ থেকে নকল করতে গিয়ে বলেন, আমাদের শায়খ এ শান্দার মু'জেযাকে স্মরণ রাখার জন্য বিশেষভাবে অসিয়ত করতেন এবং বলতেন আহলে ইলমদের জন্য মুনাসেব নয় যে, حديث اسماء কে যা রাসূল (স) থেকে রেওয়ায়াত করা হয়েছে এবং যাতে সূর্যকে স্থির ও তার গতি রোধ করে রাখার মু'জিযা বর্ণনা করা হয়েছে সেটা স্মরণ রাখার ব্যাপারে উদাসীন থাকবে। কেননা, এটা রাসূল (স) এর নবুওয়াতের আলামতসমূহ হতে বড় একটি আলামত। (ফয়জুল বারী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩০৭)

এক রেওয়ায়াতে এসেছে যে, রাসূল (স) ছাতু ভক্ষণ করেন, অতঃপর কুলি করেন। তারপর উযূ করা ছাড়াই মাগরিবের নামায আদায় করেন। অথচ ছাতুও আগুনে তৈরীকৃত খাদ্য। সুতরাং এর দ্বারা مَا غَيَّرَتِ النَّارُ তথা আগুনে পাকানো জিনিস ভক্ষণ করলে উযূ নষ্ট হয়ে যাবে এবং উযূ করে নামায আদায় করতে হবে। একথার প্রবক্তাদের বক্তব্য খণ্ডিত হল। পূর্ববর্তী শিরোনামের পর এ শিরোনাম উল্লেখ করার দ্বারা ইমাম নাসায়ী (র) এর একথাকে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। অতঃপর ইমাম নাসায়ী (র) এই শিরোনামের পর المضمضة مِنَ اللَّبَنِ শিরোনাম কায়েম করে সম্ভবত দ্বিতীয় জবাবের দিকে ইশারা করেছেন, যে রেওয়ায়াতে আগুনে পাকানো বস্তু খাওয়ার পর উযূ নির্দেশ এসেছে। এখানে وضوء দ্বারা وضوء لغوى উদ্দেশ্য وضوء اصطلاحى / وضوء شرعى নয়। কেমন যেন হুজুর (স) এর এ আমল তার قول এরই ব্যাখ্যা হল অর্থাৎ এ উযূ দ্বারা মুখ-হাত ধৌত করা উদ্দেশ্য।

ছাতু খেয়ে কুলি করার উপকারীতা ঃ ছাতু খাওয়ার পর কুলি করার রহস্য হল, ছাতু খেলে ছাতুর অংশ বিশেষ দাঁতের ফাঁকে ও মুখের কিনারায় লেগে থাকে। সেটাকে নামাযের মধ্যে বের করার চেষ্টা করলে নামাযের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে ও খুশু-খুযু বিনষ্ট হবে। কাজেই ছাতু খেয়ে কুলি করা চাই, যাতে করে মুখ পরিষ্কার থাকে এবং কিরাত ও নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। এ হাদীস থেকে আরো একটি কথা বুঝে আসে যে, সফরে নিজের খাদ্যদ্রব্য ও পাথেয় নেয়া বৈধ, যদিও একজন কম এবং অপরজন বেশী খায়। অনুরূপভাবে এটাও বুঝা গেলো যে, সফরে পাথেয় ও খাদ্য দ্রব্য নেয়া তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ২৬৯-২৭০)

الْمَضْمَضَةُ مِنَ اللَّبَنِ

١٨٧. اخبرنا قُتَيْبَةُ قال حدثنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ثم دعا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قال إِنَّ لَهُ دَسَمًا -

بَابُ ذِكْرِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لاَ يُوجِبُهُ وَغُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

١٨٨. اخبرنا عمرو بْنُ عَلِيٍّ قال حَدَّثَنَا يَحْيٰى قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغَرِّ وَهُوَ ابْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ انه اَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ـ

দুধ পান করার পর কুলি করা

অনুবাদ ঃ ১৮৭. কুতায়বা (র)........ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) দুধ পান করার পর পানি চাইলেন এবং তা দ্বারা কুল্লি করলেন এবং বললেন, ওতে চর্বি আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ গোসল কিসে ওয়াজিব হয় ও কিসে ওয়াজিব হয় না এবং মুসলমান হওয়ার জন্য কাফিরের গোসল করা

১৮৮. আমর ইবনে আলী (র)......কায়স ইবনে আসিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূল্লাহ (স) তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করতে আদেশ করলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

দুধ পান করার পর হুজুর (স) যে আমল করতেন ইবনে আব্বাস (রা) সেটাকে নকল করছেন যে, তিনি দুধ পান করে কুলি করতেন। কুলি করার কারণ হল, إِنَّ لَهُ دَسَمًا দুধে চর্বি বা তৈলক্ত বস্তু আছে। সেটা পরিষ্কার করার জন্য কুলি করা মুস্তাহাব।

উল্লেখিত ইল্লতের কারণে যেমনি দুধ পান করার পর وضوء لغوى [শাব্দিক উযূ] করা মুস্তাহাব ঠিক, তদ্রূপ গোশতের মধ্যেও যেহেতু চর্বি ও তৈলাক্ততা আছে, তাই সেক্ষেত্রেও তা ভক্ষণ করার পর তৈলাক্ততা দূর করার জন্য উযূ করা তথা হাত-মুখ ধৌত করা মুস্তাহাব। হযরত আনোয়ার শাহ (র) বলেন, খানা-পিনার পর কুলি করা (আমার নিকট) খানার আদব। তাই তারপর কুলি করা মুস্তাহাব। হ্যাঁ, কখনো উভয়টা একত্রে জমা হতে পারে। যেমন– খানা-পিনা শেষ না করতেই নামাযের সময় এসে গেলো, তাহলে এক্ষেত্রে হাত-মুখ ধৌত করা ও উযূ করা উভয়টা একত্রে হয়ে গেলো। তাহলে এক্ষেত্রে মুস্তাহাবটা বেশী দৃঢ় হবে। যেমন مستيقظ তথা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এর মূল সম্পর্ক হল পানির মাসআলার সাথে। আর উযূর পানি হিফাজত করা যেহেতু অত্যাধিক জরুরী, ফলে উযূর পূর্বেই হাত ধৌত করার বিষয়টি বেশী গুরুত্ব রাখে। বিশেষ করে সমষ্টিগত ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন উযূ করবে। শরীয়ত প্রণেতা إِنَّ لَهُ دَسَمًا বলে খানার পর কুলি করা আদব এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ দুধ পান করার পর মুখে তৈলাক্ততা লেগে থাকে। তাকে দূর করার জন্যই কুলি করা হয়। নামাযের সাথে কুলির কোন সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয় শিরোনাম সংক্রান্ত আলোচনা

قوله فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ঃ আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, বাহ্যিকভাবে হাদীস থেকে বুঝে আসে যে, হুজুর (স) কায়েসকে তার ইসলাম গ্রহণের পর গোসল করতে হুকুম দেন। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে নয়। আলোচ্য হাদীসকে যদি সামনের শিরোনামের হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে বলতে হবে اسلم শব্দকে اراد এর উপর প্রয়োগ করতে হবে, তথা যখন কায়েস বিন আসেম ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা করলো তখন হুজুর (স) তাকে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে গোসল করার হুকুম প্রদান করলেন, একথা বাস্তবতা ও ইনসাফ থেকে অনেক দূরে।

[বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

تَقْدِيْمُ غُسْلِ الْكَافِرِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُسْلِمَ

١٨٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اِنَّ ثُمَامَةَ بْنَ اُثَالٍ الْحَنَفِىَّ انْطَلَقَ اِلٰى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللّٰهِ مَا كَانَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ وَجْهٌ اَبْغَضَ اِلَىَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ اَصْبَحَ وَجْهُكَ اَحَبَّ الْوُجُوْهِ كُلِّهَا اِلَىَّ وَاِنَّ خَيْلَكَ اَخَذَتْنِىْ وَاَنَا اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرٰى فَبَشَّرَهُ النَّبِىُّ ﷺ وَاَمَرَهُ اَنْ يَعْتَمِرَ مُخْتَصَرٌ -

মুসলমান হওয়ার জন্য কাফিরের আগে ভাগেই গোসল করা

অনুবাদ ঃ ১৮৯. কুতায়বা (র)..........সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, সুমামা ইবনে উসাল হানাফী মসজিদে নববীর নিকটবর্তী একটি বাগানে গেলেন তথায় গোসল করার পর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা এবং রাসূল।" হে মুহাম্মদ (স)! আল্লাহর শপথ, পৃথিবীতে কোন চেহারাই আপনার চেহারা থেকে অধিক অপ্রিয় আমার নিকট ছিল না, এখন আপনার চেহারা আমার নিকট সকল চেহারা থেকে প্রিয়। আপনার লোকজন আমাকে গ্রেফতার করেছে অথচ আমি উমরার ইচ্ছা রাখি। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে সুসংবাদ দান করলেন এবং তাঁকে উমরা করার অনুমতি দিলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

ইমাম নাসায়ী (র) হাদীসটিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। পূর্ণ রেওয়ায়াত বায়হাকী ও মুসলিম শরীফে বিদ্যমান আছে। نجل শব্দটি نون ও جيم এর সাথে, এর অর্থ হল, ভূমি থেকে উদগত পানি এবং কেউ কেউ বলেন, প্রবাহমান পানিকে نجل বলা হয়। অথবা, শব্দটি نون ও خاء এর সাথে যা نخلة এর বহুবচন, অর্থ খর্জুর বৃক্ষ; কেননা, সাধারণত বাগিচা পানিশূন্য হয় না, সব সময় বাগানে পানি থাকে।

আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, কেউ কেউ جيم এর সাথে পড়াকে সঠিক মনে করেন, তাদের এধারণার কোন ধর্তব্য নেই। আর কিভাবেই বা তা হতে পারে অথচ অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, অধিকাংশ রেওয়ায়াতে خاء আছে। কাযী আয়াজ (র)ও বলেন, রেওয়ায়াতটি خاء যোগে পঠিত। *বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য/*

[পূর্বের বাকী অংশ] এটাই স্পষ্ট যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর তাকে কুফরির ময়লা ও অপবিত্রতা থেকে মুক্তকরার ও জানাবাত থেকে পবিত্র করার জন্যই গোসলের হুকুম দিয়েছেন। কেননা, কাফের এ থেকে মুক্ত নয়। আর জুমহুরের নিকট এ গোসল হল মুস্তাহাব। আর ইমাম আহমদ (র) হাদীসের বাহ্যিক শব্দের প্রতিলক্ষ্য রেখে গোসল করাকে ওয়াজিব বলেন।

জুমহুর এ কথার দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, হুজুর (স) যারা ইসলাম গ্রহণ করতে আসতো তাদের সকলকেই গোসল করার নির্দেশ দিতেন না। যদি গোসল করা ওয়াজিবই হতো তাহলে এ নির্দেশ দিতেন। আর এটা এমন একটি করীনা বা আলামত যা আমরের হুকুমকে استحباب এর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়। কাজেই বুঝা গেলো এখানে গোসলের হুকুম হল মুস্তাহাব হিসাবে। অতএব মুস্তাহাব এর উপর-ই হাদীসকে প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্য কোন কাফির যদি জুনুবী হয় অতঃপর সে যদি মুসলমান হতে চায়, তাহলে তার ব্যাপারে বিশুদ্ধ কথা হল তার উপর গোসল করা ওয়াজিব। কেননা, জানাবাত এমন জিনিস যা ইসলাম গ্রহণের পরেও বাকী থাকে। যেমন– অপবিত্র অবস্থা (صفت حدث) বাকী থাকে। কাজেই তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, আলোচ্য রেওয়ায়াতে গোসল শাহাদাতের উপর মুকাদ্দাম, কিন্তু এটাও সম্ভাবনা আছে যে, সে হুজুর (স) এর নিকট প্রথমে মুসলমান হয়েছেন। অতঃপর গোসল করেছেন এবং মসজিদে প্রবেশ করেছেন। অতঃপর شهادة কে ব্যক্ত করেছেন। এর দ্বারা উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে যায়।

الْغُسْلُ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

١٩٠. اخبرنا محمد بن المثنى عن محمد قال حدثني شعبة عن ابى اسحق قال سمعت ناجية بن كعب عن على رضى الله عنه انه اتى النبى ﷺ فقال ان ابا طالب مات فقال اذهب فواره قال انه مات مشركا قال اذهب فواره فلما واريته رجعت اليه فقال لى اغتسل -

মুশরিককে কবরস্থ করার পর গোসল

অনুবাদ ঃ ১৯০. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র).........আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এলেন এবং বললেন, আবু তালিব মরে গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যাও, তাঁকে কবরস্থ কর, আলী (রা) বললেন, তিনি তো মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) আবার বললেন, যাও তাঁকে কবরস্থ কর। যখন আমি তাঁকে কবরস্থ করে তাঁর নিকট ফিরে এলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, গোসল করে নাও।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, আবু তালেবকে কবরস্থ করার পর হযরত আলী (রা) এর শরীরে যে মাটি ইত্যাদি লেগেছিল সম্ভবত সেটাকে দুর করত: পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্যেই নবী (স) তাকে গোসল করার হুকুম দেন।

মোটকথা, এ হুকুমটা হল এস্তেহবাবী। কেননা, মৃতব্যক্তিকে দাফন করার পর গোসল করা জরুরী নয়;বরং মুস্তাহাব। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ২৭৩)

سوال : اكتب نبذة من حياة سيدنا ابى سعيد الخ .

প্রশ্ন ঃ সংক্ষেপে আবু সাইদ (রা) এর জীবনী লেখ।

উত্তর ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রা)এর জীবনী ঃ

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ নাম সা'দ, পিতার নাম মালিক, মাতার নাম উনাইসা বিনতে হারিস। তাঁর পূর্ব পুরুষ খুদরা ইবনে আওফের নামানুসারে তাঁকে খুদরী বলা হয়। তিনি আবু সাঈদ খুদরী উপনামে পরিচিত।

জন্ম ঃ তিনি হিজরতের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ ৬২২ খ্রিঃ তাঁর পিতা-মাতা দু'জনের সাথে মুসলমান হন।

জিহাদ ঃ বয়স কম থাকায় বদর ও উহুদের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি, বনী মুস্তালিক থেকে শুরু করে পরবর্তী ১২টি যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন।

হাদীস বর্ণনা ঃ ইবনে কাসীর (র) বলেন, هُوَ مِنَ الْمُكْثِرِيْنَ مِنَ الرُّوَاةِ তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১১৭০টি। তন্মধ্যে ৪৬টি বুখারী মুসলিমের এবং ১৬টি এককভাবে বুখারী শরীফে ও ৫২টি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

ওফাত ঃ তিনি ৭০ হিজরী সনে ৮৪ বছর বয়সে শুক্রবার দিন মদীনায় ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। (ইসাবা: ১/৩৫, ইকমাল: ৫৯৮)

[পূর্বের বাকী অংশ]

قوله ثم دخل المسجد الخ ঃ আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, এ রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় সুমামা ইবনে উসাল (র) গোসল করাকে ইসলামের উপর মুকাদ্দাম করেন। কারণ এর দ্বারা ইসলামের মহত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু ইসলামকে গোসলের উপর মুকাদ্দাম করাটাই অধিক উত্তম।

بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

١٩١. اخبرنا محمدُ بْنُ عبدِ الاَعْلٰى قال حدّثنا خالدٌ قال حدّثنا شُعْبَةُ عن قتادة قال سمعتُ الحسنَ يُحَدِّثُ عن ابى رافع عن اَبِىْ هُرَيرة رضى الله عنه اَنّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ اِذا جلس بَيْنَ شُعَبِها الاَرْبعِ ثمّ اجْتهدَ فقد وَجَبَ الغُسْلُ -

١٩٢. اخبرنا ابراهيمُ بْنُ يعقوبَ بنِ اسحٰقَ الجُوْزَجَانِىُّ قالَ حدّثنى عبدُ اللهِ بْنُ يوسف قال حدّثنا عيسَى بْنُ يونسَ قال حدّثنا اشعثُ بْنُ عبدِ المَلِكِ عن ابنِ سيرينَ عن اَبِىْ هُريرة اَنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ اِذا قعدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الاَرْبَعِ ثمّ اجْتَهدَ فقد وَجَبَ الغُسْلُ قال ابو عبدِ الرحمٰنِ هٰذا خطاءٌ والصَّوابُ اشعثُ عن الحَسَنِ عن ابى هريرة وقد رَوَى الحديثَ عن شعبةَ النّضرُ ابْنُ شُمَيْلٍ وغَيْرُه كما رَواه خالدٌ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ খাতনাস্থলদ্বয় পরস্পর মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব হওয়া

অনুবাদ ঃ ১৯১. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কেউ যখন স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সহবাসের চেষ্টা করে তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।

১৯২. ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যখন কেউ তার স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সঙ্গমের চেষ্টা চালায় তখন গোসল ওয়াজিব হয়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : حديثُ الباب مُتَعارِضٌ لِحديثِ ابى ايوب رض (عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الماءُ من الماء) فكيف التّوفيقُ بينهما

প্রশ্ন ঃ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস আবু আইয়্যুব (র) এর হাদীসের বিপরীত (الماءُ من الماء) উভয়ের মধ্যকার সামঞ্জস্য কী?

উত্তর ঃ হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার বৈপরীত্যের সমাধান ঃ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় স্ত্রী সহবাস করলেই গোসল ফরয হয়, চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক। কিন্তু দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, যতক্ষণ বীর্যপাত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোসল ওয়াজিব হবে না। এ বৈপরীত্বের সমাধান নিম্নরূপ–

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীস পরবর্তী সময়ের, আর اِنَّمَا الماءُ من الماء এবং এ জাতীয় হাদীস পূর্ববর্তী সময়ের। যেমন বলা হয়েছে- اِنَّما كان الماءُ من الماء رخصةً فِى اوّل الاسلام ثمّ نُهِىَ عنها

তাই সহবাস করলেই গোসল ফরয হবে, বীর্যপাত হোক বা না হোক।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, الماء من الماء اِنّما হাদীসটি احتلام এর ব্যাপারে প্রযোজ্য, অর্থাৎ যদি কারো স্বপ্নদোষ হয়, কিন্তু বীর্যপাত না হয়, তাহলে তার উপর গোসল ফরয হবে না। যেমন– ইবনে আব্বাসের ভাষায়– اِنّما الماءُ من الماء ذلك فى الاحتلام اذا رأى انّه جامع ثمّ لم يُنْزِلْ فلا غُسْلَ عليه -

অতএব, হাদীসগুলোর মাঝে আর কোন বৈপরীত্য থাকল না। (শরহে নাসায়ী : ১/২৩৪)

سوال : اَوْضِحْ قولَه صلى الله عليه وسلم اذا قعد بَيْنَ شُعَبِهَا الاَرْبَعِ -

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) এর বাণী اذا قعد بين شعبها الاربع **এর ব্যাখ্যা কি?**

উত্তর ঃ اذا قعدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الاَرْبَعِ **এর বিশ্লেষণ ঃ** شعب শব্দটি شعبة এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ القطع من الشيئ তথা যেকোন বস্তুর অংশ ও শাখা। শাখা-প্রশাখা, আর الاربع অর্থ চার। شعب এর প্রয়োগক্ষেত্রানুযায়ী

হচ্ছে স্ত্রী। হাদীসে উল্লিখিত شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ বা চার শাখা এর উদ্দেশ্যের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. ইবনে দাকীকুলঈদ মতে এর অর্থ হল স্ত্রীর দু'হাত ও দু'পা। এ অর্থ বাস্তবতার অতি নিকটবর্তী।

২. কারো কারো মতে স্ত্রীর দু'হাত ও দু' উরু।

৩. কেউ কেউ বলেন, স্ত্রীর দু' উরু ও দু' নিতম্ব।

৪. আবার কারো কারো মতে, স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের পার্শ্ব।

৫. অপর একদলের মতে স্ত্রীর দু' উরু ও জননেন্দ্রিয়ের দু'পার্শ্বে। কাজী আয়াজও এমন বলেছেন।

৬. কারো কারো মতে, পায়ের নলীদ্বয় ও উভয় রান উদ্দেশ্য। মোটকথা قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ দ্বারা স্ত্রী সহবাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব কেউ স্ত্রী সহবাস করলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে, বীর্যপাত হোক বা না হোক। যেমন হাদীসে এসছেছে- اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

سوال : متى يَجِبُ الْغُسْلُ -

প্রশ্ন ঃ গোসল কখন ফরয হয়?

উত্তর ঃ গোসল ফরয হওয়ার বর্ণনা ঃ ৪টি অবস্থার সম্মুখীন হলে গোসল ফরয হয়। যথা-

১. স্বপ্নোদোষ, সহবাস, স্পর্শ, দর্শণ ইত্যাদি যে কোনো কারণে কামভাবের সাথে বীর্যপাত হলে সকল ইমামের ঐক্যমতে গোসল ফরয হয়। যেমন- হাদীসে এসেছে- وَاِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ

তবে কামভাব বীর্যপাত না হলে গোসল ফরয নয়। কেননা, রাসূল (স) বলেছেন- اِذَا لَمْ يَكُنْ يَحْذِفِ الْمَاءِ تَغْتَسِلْ পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বীর্যপাত হলেই গোসল ফরয, কামভাব থাকুক বা না থাকুক। তিনি দলীল হিসাবে এ হাদীস পেশ করেন- اِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

২. উভয়ের লিঙ্গ মিলিত হয়ে বীর্যপাত হলেও গোসর ওয়াজিব। কেননা, হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত-

اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَغَابَتِ الْحَشْفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ

তবে যদি শুধু যৌনকর্ম করে, কিন্তু পুরুষাঙ্গ নারীর যৌনাঙ্গের ভিতর প্রবিষ্ট না করে। আর রেত:পাত না হয়, তখন কারো মতেই গোসল ফরয হয় না।

৩. হায়েয থেকে পবিত্র হলে। যেমন, রাসূল (স) জনৈক রমনীকে বলেছেন-

اِذَا اَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى

৪. নিফাস থেকে পবিত্র হলে। যেমন হাদীসে আছে-

اِنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ زَوْجَةَ اَبِى بَكْرٍ حِيْنَ نَفِسَتْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِاَبِى بَكْرٍ مُرْهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ

ইমাম মালেক (র) এর মতে, জুমআর দিন গোসল করা ওয়াজিব। কেননা, এরশাদ হয়েছে-

مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

سوال : هَلْ يَجِبُ الْغُسْلُ بِغَيْرِ اِنْزَالٍ اَمْ لَا ؟

প্রশ্ন ঃ বীর্যপাত হওয়া ব্যতীত গোসল ফরয হয় কি?

উত্তর ঃ বীর্যপাত ব্যতীত গোসল ফরয হওয়ার বর্ণনা ঃ গোসল ফরয হওয়ার জন্যে বীর্যপাত শর্ত কি-না, বা পুরুষের যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ নারীর যৌনাঙ্গের অগ্রভাগে প্রবেশ করার ফলে গোসল ওয়াজিব হয় কি না, এ নিয়ে ফকীহদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম দাউদে জাহেরীর মতে শুধু অগ্রভাগ মহিলার প্রবেশের দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে না; বরং গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য বীর্যপাত শর্ত। প্রথমদিকে হযরত উসমান, আলী, যুবাইর, তালহা ও উবাই ইবনে কাব (রা) এর অভিমত এটাই ছিল। (আল-আইনী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৮০৫)

২. ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখয়ী (র) ও জুমহুর সাহাবাদের মতে, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ মহিলার যোনির অগ্রভাগে প্রবেশ করলেই গোসল ওয়াজিব হবেঃ। বীর্যপাত হওয়া জরুরী নয়। (বজলুল মাজহুদ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৩৪, তা'লীকুস সবীহ ১/২১৭)

আহলে জাহেরের দলীল ঃ

عن ابى سعيد الخدري ان رسول الله صلعم قال الماء من الماء ـ وكان ابو سلمة يفعل ذلك ـ

অর্থাৎ ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, পানির (বীর্যপাতের) কারণেই পানি (গোসল) অপরিহার্য হয়। আবু সালামা (র) এরূপ ফাতওয়া দিতেন।

অপর এক বর্ণনায় রাসূল বলেন– قال صلى الله عليه وسلم اذا نزلت الماء فلتغسل

এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গোসল ফরয হওয়ার জন্য বীর্যপাত হওয়া জরুরী।

জুমহুরের দলীল ঃ ১

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ انَّ رسولَ اللّٰه صلى الله وسلم انّما جَعَل ذٰلكَ رخصةً للنّاسِ فِىْ اوّلِ الإسلام لِقِلّةِ الثِّيابِ ثمّ امَرَ بالغُسْلِ ونَهٰى عَنْ ذٰلك ـ

অর্থাৎ উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, ইসলামের প্রাথমিকযুগে মুসলমানদের কাপড় চোপড়ের স্বল্পতা হেতু রাসূলুল্লাহ (স) লোকদেরকে স্ত্রী সহবাসে বীর্যপাত না ঘটলে গোসল করার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি গোসলের নির্দেশ দেন এবং পুর্বোক্ত অনুমতি রহিত করেন। (বুখারী: ১/৪৩, মুসলিম: ১/১৫৫, তিরমিযী: ১/৩১)

দলীল ঃ ২

عَن ابى هريرةَ عَنِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم قال اذا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ والْزَقَ الخِتَانَ بالخِتَان فقد وَجَبَ الغُسْلُ

অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) এর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার কামস্পৃহা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর উপর উপগত হবে এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যোনীর অগ্রভাগে প্রবেশ করাবে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। (আবু দাদউদ : ১/২৮, বুখারী : ১/৪৩, মুসলিম ১/১৫৬, নাসায়ী: ১/৪১, ইবনেমাজাহ : ৪৫)

দলীল ঃ ৩

عَنْ عَائِشَةَ قالتْ اذا جَاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ وَجَبَ الغُسْلُ فَعَلْتُهُ انا ورسولُ اللّٰه صلعم فَاغْتَسَلْنَا ـ

অর্থাৎ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ রমনীর যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ অতিক্রম করে তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। আমিও রাসূল (স) এরূপ করে আমরা গোসল করেছি। (তিরমিযী: ১/৩০, ইবনেমাজাহ: ৪৫)

ইজমা ঃ ইমাম নববী (র) বলেন, প্রথম দিকে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে যদিও কিছুটা ইখতিলাফ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে হযরত উমর (রা) এর যুগে এ বিষয়ে নবী করীম (স) এর পবিত্র স্ত্রীগণের শরণাপন্ন হওয়ার পর সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, উভয়ের যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ মিলিত হলেই গোসল ওয়াজিব হবে, বীর্য বের হওয়া জরুরী নয়। (শরহে মুসলিম ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৫৫)

যৌক্তিক প্রমাণ-১ ঃ

বীর্যপাতহীন সঙ্গম সবার মতে অপবিত্রতার কারণ। কিন্তু এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এটি বড় অপবিত্রতা না ছোট অপবিত্রতা? একদলের মতে এটি বড় অপবিত্রতা। এর ফলে বড় পবিত্রতা তথা গোসল ওয়াজিব হয়। আর একদলের মতে এটি ছোট অপবিত্রতা। অতএব, এটি ছোট পবিত্রতাকে অর্থাৎ উযূকে আবশ্যক করবে।

এবার লক্ষণীয় বিষয় হল উভয়ের খাতনাস্থলের পারস্পরিক মিলনটা হালকা বিষয় না কঠোর বিষয়? যদি কঠোর হয় তবে পবিত্রতা হতে হবে বড়, আর হালকা হলে পবিত্রতা হতে হবে ছোট। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বীর্যপাতহীন সঙ্গম এবং সবীর্য সঙ্গম উভয়টি হুকুমের ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে সমান। যেমন–

১. রোযা অবস্থায় সবীর্য সঙ্গমের ফলে রোযা ফাসিদ হয়। এর ফলে কাযা কাফফারা ওয়াজিব হয়। এরূপভাবে শুধু উভয়ের খাতনাস্থল পরস্পর মিলিত হলেও কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়। যদিও বীর্যপাত না ঘটে।

২. হজ্জে সবীর্য সহবাসের কারণে দম এবং কাযা উভয়টি ওয়াজিব হয়। এরূপভাবে উভয়ের খাতনাস্থল পরস্পরে মিলিত হলেও দম ও কাযা উভয়টি ওয়াজিব হয়।

৩. সবীর্য যিনার ফলে যেরূপভাবে দণ্ডবিধি ওয়াজিব হয়। এরূপভাবে বীর্যপাত না হলেও শুধুমাত্র উভয়ের খাতনাস্থল পরস্পরে মিলিত হলেও দণ্ডবিধি ওয়াজিব হয়।

৪. সন্দেহ সহকারে সবীর্য সঙ্গম হলে দণ্ডবিধি ওয়াজিব হয় না। কিন্তু মহর ওয়াজিব হয়। এরূপভাবে সন্দেহের বশীভূত হয়ে বীর্যপাতহীন সঙ্গমের ফলে অর্থাৎ শুধু খাতনাদ্বয় পরস্পরে মিলিত হলেও মোহর ওয়াজিব হয়ে যায়।

৫. যোনি ছাড়া অন্যত্র সবীর্য সহবাস হলে দণ্ডবিধি ও মোহর ওয়াজিব হয় না। কিন্তু তাযীর (শাসন) ওয়াজিব হয়। যদি সন্দেহ না হয়, এরূপভাবে বীর্যপাতহীন সঙ্গম হলেও তাযীর ওয়াজিব হয়।

৬. যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীর সাথে যথার্থ নির্জনতা ছাড়া সহবাস করে অতঃপর তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার উপর পূর্ণ মহরওয়াজিব হয়। এমনিভাবে উপরোক্ত ছুরতে শুধু খাতনাদ্বয়ের পরস্পর মিলনের ফলেও পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হয়ে যায়। নির্জনতা না হবার শর্তায়নের কারণ হল যদি নির্জনতা হয়, তবে এ খালওয়াত তথা নির্জনতার কারণেই মহর ওয়াজিব হবে।

৭. সবীর্য সহবাসের পর তালাক দিলে মহিলার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হয়। এরূপভাবে শুধু খাতনাদ্বয়ের পারস্পারিক মিলনের ফলেও তালাক প্রদানের পর ইদ্দত ওয়াজিব হয়।

৮. স্বামী কর্তৃক তালাক দানের পর দ্বিতীয় স্বামীর সবীর্য সঙ্গমের ফলে এ মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়। এরূপভাবে শুধু খাতনাদ্বয় পারস্পারিক মিলিত হলেও হালাল হয়ে যায়।

৯. স্বীয় বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যত্র সবীর্য সহবাসের পর তালাক দিলে অর্ধেক মহর ওয়াজিব হয়, যদি মহর নির্ধারিত থাকে। আর যদি মোহর নির্ধারিত না থাকে, তবে ওয়াজিব হয় মুতআ। এরূপভাবে যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যত্র বীর্যপাতহীন সহবাসের ফলেও সেই অর্ধেক মোহর তথা মুতআ ওয়াজিব হয়।

মোটকথা, উপরোক্ত সবক্ষেত্রে সবীর্য সঙ্গম ও বীর্যহীন সঙ্গম উভয়টির হুকুম একই রকম। অতএব, অন্যান্য বিধানের ন্যায় বড় অপবিত্রতা হওয়া এবং গোসল ওয়াজিবের হুকুমের ক্ষেত্রেও উভয়টি সমান হবে। যেমনিভাবে বীর্যপাতসহ সঙ্গমের ফলে গোসল ওয়াজিব হয়। এরূপভাবে বীর্যপাতীন সঙ্গমের ফলেও গোসল ওয়াজিব হবে

উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত সবীর্য সঙ্গম ও বীর্যহীন সঙ্গমের আলোচনা ছিল যে, উভয়টি সমস্ত বিধি-বিধানে সমান। এবার আমরা বীর্যপাত সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করছি। যেটিকে কেউ কেউ গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য জরুরী সাব্যস্ত করেছেন। তাদের মতে শুধু নারী পুরুষের খাতনাস্থলদ্বয়ের পারস্পারিক মিলনের ফলে গোসল ওয়াজিব হয় না। চিন্তা-ফিকির করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খাতনাস্থলদ্বয় মিলিত হওয়া ছাড়া শুধু বীর্যপাত অপেক্ষা খাতনাস্থলদ্বয় মিলিত হওয়ার হুকুম আরো কঠোর, চাই বীর্যপাত হোক বা নাই হোক। একারণেই-

১. খাতনাস্থলদ্বয় বীর্যপাতহীনভাবে মিলিত হলেও এর ফলে হজ্জের কাযা ওয়াজিব হয়। কিন্তু খাতনাস্থলদ্বয় মিলিত হওয়া ব্যতীত বীর্যপাত হলে হজ্জে শুধু দম ওয়াজিব হয়; কাযা ওয়াজিব হয় না।

২. খাতনাস্থলদ্বয় বিনা বীর্যপাতে মিলিত হলেও রোযার কাফফারা ওয়াজিব হয়। কিন্তু খাতনাস্থলদ্বয় মিলিত হওয়া ব্যতীত বীর্যপাত হলে কেবল কাযা ওয়াজিব হয়, কাফফারা নয়।

৩. খাতনাস্থলদ্বয়ের বিনা বীর্যপাতে মিলনের ফলে যিনাতে দণ্ডবিধি ওয়াজিব হয়। কিন্তু খাতনাস্থলদ্বয় মিলিত হওয়া ব্যতীত বীর্যপাত হলে দণ্ডবিধি ওয়াজিব হয় না, বরং তাযীর ওয়াজিব হয়।

৪. বীর্যপাতহীন খাতনাস্থলদ্বয়ের মিলনের পরে তালাক দিলে পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হয়। আবার খাতনাস্থলদ্বয়ের মিলন ও বীর্যপাতের পরে তালাক দিলেও পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হয়। কিন্তু খাতনাস্থলদ্বয় মিলিত হওয়া ব্যতীত বীর্যপাতের পর নির্জনতা না হলে যদি তালাক দেয়া হয়। তবে পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হয় না, বরং মোহর নির্ধারিত হলে অর্ধেক আর নির্ধারিত না হলে মুতআ ওয়াজিব হয়। অতএব, খাতনাস্থলদ্বয় মিলিত হওয়া ব্যতীত বীর্যপাতের ফলে যখন খাতনাস্থলদ্বয় মিলিত হওয়ার হুকুম হজ্জ, রোযা, যিনা ও তালাকের ক্ষেত্রে অধিক কঠোর হয়ে থাকে। কাজেই অপবিত্রতার ক্ষেত্রেও এটা বেশী কঠোরতম হওয়া উচিত। অর্থাৎ শুধু খাতনাস্থলদ্বয়ের মিলন বীর্যপাতহীন হলে কঠোরতর অপবিত্র সাব্যস্ত করে বড় পবিত্রতা তথা গোসলকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে।

যৌক্তিক প্রমাণ-২ ঃ আমরা দেখি উপরোক্ত আহকামে ও যেগুলো ১নং যৌক্তিক প্রমাণে এসেছে। অর্থাৎ হজ্জ ও রোযা ফাসিদ হওয়া, দণ্ডবিধি ও মোহর ওয়াজিব হওয়া ইত্যাদি। এগুলো শুধু খাতনাস্থলদ্বয়ের পারস্পারিক মিলনের

ফলে ওয়াজিব হয়। কারণ খাতনাস্থলদ্বয়ের পরস্পরের মিলনের পর মহিলার উপর বেশিক্ষণ অবস্থানের ফলে এবং বীর্যপাতের ফলে অন্য কোন হুকুম সাব্যস্ত হয় না। উদাহরণস্বরূপ কেউ কোন মহিলার সাথে যেনা করলে তার উপর খাতনাস্থলদ্বয় পারস্পারিক মিলনের কারণেই দণ্ডবিধি ওয়াজিব হয়ে যাবে। এরপর আরও অতিরিক্ত সময় অবস্থান ও বীর্যপাতের ফলে তার উপর দণ্ডবিধি ছাড়া অন্য কোন শাস্তি আরোপিত হয় না। এরূপভাবে সন্দেহবশত সঙ্গমে শুধুমাত্র খাতনাস্থলদ্বয়ের মিলনের ফলেই মোহর ওয়াজিব হয়ে যায়। এরপর অতিরিক্ত সময় অবস্থান ও বীর্যপাতের ফলে অন্য কোন জিনিস ওয়াজিব হয় না।

সারকথা, সহবাস দ্বারা যত বিধিবিধান আরোপিত হয়, সবগুলো নির্ভর করে খাতনাস্থলদ্বয়ের মিলনের উপর এরপর বীর্যপাতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কজেই সবীর্য সঙ্গমের ফলে যে গোসল ওয়াজিব হয় এটা বীর্যপাতের কারণে নয়, বরং খাতনাস্থলদ্বয়ের পারস্পারিক মিলনের কারণেই ওয়াজিব হয়। অতএব, বলতে হবে যে, উভয়ের খাতনাস্থল মিলনের সাথে সাথেই গোসল ও জিব হবে। এরপর চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক তা দেখার বিষয় নয়। আমাদের দাবী এটাই।

যৌক্তিক প্রমাণ-৩ ঃ এ প্রমাণটি আনসারী মহিলাদের উপরোক্ত মাসআলা সংক্রান্ত একই ফাতওয়ার উপর নির্ভরশীল। এটি ইমাম ত্বহাবী (র) বর্ণনা করেছেন। আনসারী মহিলারা ফতওয়া দিতেন যে, বীর্যপাতহীন সহবাসের ফলে শুধু মহিলাদের উপরেই গোসল ওয়াজিব হয়, পুরুষের উপর নয়। ইমাম ত্বহাবী (র) বলেন, এ সব মহিলা পুরুষের জন্য গোসল ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সহবাসের সাথে বীর্যপাতকে আবশ্যক মনে করেন। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে শুধু খাতনাস্থলদ্বয়ের পারস্পারিক মিলনকে যথেষ্ট মনে করতেন। অথচ আমরা দেখেছি যে, বীর্যপাতের সুরতে গোসল ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি নারী পুরুষ উভয়ের বেলায় সমান। কাজেই উভয়ের খাতনাস্থল মিলনের ক্ষেত্রে উভয়ের হুকুম সমান হওয়া উচিত, যুক্তির দাবীও তাই। (বজলুল মাজহুদ ১/১৩৩, ফাতহুল মুলহিম ১/৫৮৪, মিরকাত ২/৩০, প্রভৃতি)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) এর হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। যার প্রমাণ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসটি।

২. অথবা, الماء من الماء এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল বীর্যের ব্যাপারে সতর্ক করা। অর্থাৎ মযী দ্বারা তো গোসল ওয়াজিব নয়। কেবল বীর্যের দ্বারাই গোসল ওয়াজিব হয়।

৩. অথবা, এ হাদীসটি স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ স্বপ্নে যা কিছুই দেখুক না কেন বীর্যস্খলন না হলে গোসল ওয়াজিব হবে না। (ত্বহাবী: ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ঃ ৩১)

৪. অথবা, এটাও বলা যায় যে, এ হাদীস স্বপ্নদোষ সংক্রান্ত অর্থাৎ স্বপ্নদোষ হয়েছে মনে করে কেউ যদি ঘুম থেকে উঠে কাপড়ে বা বিছনায় বীর্যের কোনো চিহ্ন না দেখে তখন তার উপর গোসল ফরয হয় না। যেমন তিরমিযী শরীফে ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে- إنما الماء من الماء في الاحتلام মোটকথা, জুমহরের অভিমতটিই গ্রহণযোগ্য। অতএব, বীর্যপাত হোক বা না হোক সহবাস হলেই গোসল ওয়াজিব।

তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসে إذا التقى الختانان وغابت الحشفة শব্দএসেছে এটাই একথার প্রমাণ যে, এখানে التقى الختانان এর প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এ ব্যাপারে ইমামগণের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যদি শুধু যৌনাঙ্গের মিলন ঘটে; প্রবেশ না করে তাহলে পুরুষ মহিলা কারো উপর গোসল ফরয হবে না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, প্রবেশটাই গোসলের কারণ। ইমাম নববী বলেন, গোসল ফরয হওয়া বীর্যপাতের উপর মাওকুফ নয়। উমর (রা) এর খিলাফতামলে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করলেই গোসল ফরয হবে।

قال ابو عبد الرحمن : ইমাম নাসায়ী বলেন, اشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين সনদটি ভুল, সঠিক হলে اشعث عن الحسن عن ابى هريرة এবং উক্ত হাদীসকে শো'বা থেকে নযর বিন শুমাইল সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বর্ণনা করেছেন। যেমন– খালেদ শো'বা থেকে বর্ণনা করেছেন। (শরহে উর্দু নাসায়ী ২৭৩ পৃঃ)

الغسل من المني

١٩٣. اخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر واللفظ لقتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مذاء فقال لي رسول الله ﷺ اذا رايت المذي فاغسل ذكرك وتوضا وضوءك للصلوة واذا فضخت الماء فاغتسل -

١٩٤. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن زائدة ح واخبرنا اسحق بن ابراهيم واللفظ له قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة عن ركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حصين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مذاء فسالت النبي ﷺ فقال اذا رايت المذي فتوضا واغسل ذكرك واذا رايت فضخ الماء فاغسل -

বীর্যপাতের দরুণ গোসল

অনুবাদ ঃ ১৯৩. কুতায়বা ইবনে সাঈদ ও আলী ইবনে হুজ্‌র (র)........আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অধিক মযী সম্পন্ন ছিলাম, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, তুমি মযী দেখলে তখন তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে এবং সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করবে। আর বীর্য নির্গত হলে গোসল করবে।

১৯৪. উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র) ও ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র).........আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অত্যাধিক মযী নির্গত হতো, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, যখন তুমি মযী দেখ তখন তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত কর ও উযূ কর, আর যখন বীর্যের ফোঁটা দেখবে তখন গোসল করবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : اكتب اختلاف العلماء في طهارة المني وتنجسه وما هو الراجح عندك .

প্রশ্ন ঃ বীর্য পবিত্র কিংবা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য কি? তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য অভিমত কোনটি লিখ।

উত্তর ঃ বীর্যের বিধান ঃ মানুষের বীর্য পবিত্র না অপবিত্র, এ বিষয়ে ইমামদের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, ইবনে রাহওয়াইহ ও দাউদ জাহিরী (র) এর মতে মানুষের বীর্য পবিত্র। এটাকে ধৌত করা হয় পবিত্র করার জন্য নয় বরং পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে।

২. ইমাম আবু হানীফা, মালিক, আওযায়ী, লাইস ইবনে সা'দ ও হাসান ইবনে সালেহ (র) এর মতে বীর্য অপবিত্র। একে দূর করা হয় পবিত্র করার জন্য। তবে ইমাম আবু হানীফা ও মালিক (র) এর মধ্যে পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালিক (র) এর মতে শুধু ধৌত করার ফলে পবিত্র হবে। অন্য কোন পন্থায় নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে যদি তরল অথবা আর্দ্র থাকে, তবে ধৌত করার প্রয়োজন রয়েছে। আর যদি গাড় এবং শুষ্ক হয় তবে যে কোনভাবে তা দূরীভূত করলে পবিত্র হয়ে যাবে। চাই ধোয়ার মাধ্যমে হোক, অথবা খুঁচিয়ে তোলার মাধ্যমে হোক, কিংবা অন্য কোন পন্থায় সর্বাবস্থায় পবিত্র হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল ঃ

١. عن عائشة قالت لقد رايتني وما ازيد على ان افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বীর্য পাক।

٢. في الدارقطني عن ابن مسعود قال انما هو بمنزلة المخاط انما يكفيك ان تمسحه بخرقة او باذخر .

ইবনে মাসউদ (রা) এর এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মনী শ্লেষ্মার মত, আর শ্লেষ্মা পবিত্র। তাই মনীও পবিত্র হবে। অতএব শুধুমাত্র ঘষে ফেলার দ্বারাই পবিত্র হয়ে যায়।

৩. ইরশাদ হয়েছে - وَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا যেহেতু বীর্যকে ماء বলা হয়েছে, সেহেতু পানির মত এটাও পবিত্র।
..... كُنْتُ افرك الْمَنِيَّ مِن ثَوبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فرك مني -

আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী (স) এর কাপড় থেকে মনি খুঁচিয়ে উঠাইতাম। এর দ্বারা বুঝা যায় মনী পবিত্র। কেননা, নবী (স) এর কাপড় থেকে তা উঠায়ে ফেলার পর তাকে আর ধৌত করা হত না, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কাপড় অপবিত্র হয়নি। তাই এমন কাপড় পরে নবী করীম (স) কখনো কখনো নামায আদায় করতেন।

যৌক্তিক দলীল ঃ আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবীকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মনী যদি নাপাক হয়। তাহলে আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, নবীগণকে নাপাক থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তাআলা এর থেকে বহু উর্ধ্বে। সুতরাং মনী নাপাক হতে পারে না।

জুমহুরের দলীল

١. قالت كنتُ اَغْتَسِلُ المنيَّ مِن ثوبِ رسولِ الله صلعم فيَخرُجُ اِلى الصَّلوة

এ হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) এর কাপড় থেকে বীর্য ধৌত করতাম, অতঃপর নবী (স) নামাযের জন্য বের হতেন। এর দ্বারা বুঝা যায় বীর্য অপবিত্র। কারণ অপবিত্র না হলে তিনি তা ধৌত করলেন কেন?

٢. رُوِىَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ سَأَلَهَا اختُ مُعَاوِيةَ عَنْهُم قال كانَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فِى الثَّوبِ الَّذى يُضَاجِعُكِ فِيْه فقالت نَعَمْ اذا لَمْ يُصِبْه اذىً

এর দ্বারাও বুঝা যায় যে, বীর্য অপবিত্র।

٣. انَّ رَسُوْلَ اللّٰه صلعم كَانَ يَغْسِلُ المنىَّ ثمَّ يَخرُجُ الىَ الصلاةِ فِى ذٰلك الثوبِ وانا انظُر الى اَثَرِ الغَسْلِ فِيه

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বীর্য অপবিত্র। কারণ যদি তা পবিত্র হতো তাহলে তা ধৌত করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ধৌত করা-ই একথার প্রমাণ যে, বীর্য অপবিত্র। এ ছাড়াও এ অনুচ্ছেদে হযরত জাবের ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে যাতেবীর্য নাপাক হওয়া প্রমাণিত হয়।

যৌক্তিক প্রমাণ ঃ বীর্য নির্গমন কঠিন অপবিত্রতা। কারণ এটি সবচেয়ে বড় পবিত্রতা গোসলকে আবশ্যক করে। অতএব, আমাদের সেসব জিনিসের প্রতি লক্ষ করা উচিত যেগুলোর নির্গমণ অপবিত্রতার কারণ হয় যে, তা সত্ত্বাগতভাবে পবিত্র না অপিবত্র? আমরা দেখলাম, পেশাব পায়খানা মাসিকের রক্ত, রক্ত প্রদর এবং প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদির নির্গমন অপবিত্রতার কারণ। অবশ্য রক্তপ্রদর সম্পর্কে ইমাম মালিক (র) এর মতবিরোধ রয়েছে। এ সব জিনিস সত্ত্বাগতভাবে নাপাক।এতে কারও কোন মতবিরোধ নেই। কাজেই আমরা বুঝতে পারলাম, যে সব জিনিসের নির্গমন অপবিত্রতার কারণ হয়, সেগুলো সত্ত্বাগতভাবে অপবিত্র হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বীর্য নির্গমন সর্বসম্মতিক্রমে অপবিত্রতা, বরং সবচেয়ে বড় অপবিত্রতা। সেহেতু বীর্য নাপাকই হওয়া উচিত। অবশ্য বীর্য যদি শক্ত এবং শুষ্ক হয়, তবে কোন কিছুর আঁচড়ে তুলে ফেললে কাপড় পবিত্র হওয়া যায়। এর দলীল সেসব হাদীস যেগুলোতে খুঁচিয়ে বা কিছুর আঁচড়ে তা তুলে ফেলার বিবরণ রয়েছে। যেমন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এর হাদীস রয়েছে- كُنتُ اَفْرُكُ المنِىَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰه صلعم اِذَا كَانَ يَابِسًا وَاَغْسِلُه اِذَا كَانَ رَطْبًا

(ইযাহুত ত্বহাবী: ১/১৭৭ – ১৭৮, ফাতহুল মুলহীম : ১/৪৫২, মাআরিফুস সুনান : ১/৩৮৩)

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের (রা) এর দলীলের জবাব

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের জবাব হল- তার বর্ণিত হাদীসটি বীর্য পবিত্র হওয়ার দলীল হতে পারে না, কেননা এ হাদীসটিতে এমন কাপড়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা পরিধান করে রাসূল বীর্য (স) ঘুমাতেন, এটা দিয়ে তিনি নামায পড়তেন না। সুতরাং যে কাপড় দ্বারা তিনি ঘুমাতেন এর দ্বারা বুঝা যায় না যে, মনি পবিত্র, আর যদি তারা বলেন যে, আয়েশা (রা) থেকে তো এ বর্ণনাও আছে যে, তিনি রাসূল (স) এর কাপড় থেকে বীর্য কোন কিছুর আঁচড়ে উঠিয়ে ফেলতেন যদি তা শুষ্ক হত। অতঃপর রাসূল (স) ঐ কাপড় না ধুয়ে তা পরিধান করে নামায আদায় করতেন। আমরা বলব, এ কথাটি বীর্য পবিত্র হওয়ার উপর দলীল হতে পারে না। কেননা, এটা জায়েয আছে যে, বীর্য নাপাক হওয়া সত্ত্বেও কাপড় থেকে উঠিয়ে ফেলার দ্বারা কাপড় পবিত্র হয়ে যায়। যেমন আয়না, চুড়ি ও জুতা থেকে নাপাককে মুছে ফেলার দ্বারা তা পবিত্র হয়ে যায়। যেমন– আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যখন কারো জুতা অথবা মোজায় নাপাকী লাগে তখন ঐ উভয়টাকে মাটিতে ঘষার দ্বারা তা পবিত্র

হয়ে যাবে। মোজার উপরের নাপাক যেরূপ মাটিতে ঘষার দ্বারা পবিত্র হয়ে যায় অদ্রূপ বীর্যও মুছে ফেলার দ্বারা কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। আর ইবনে আব্বাস (রা) এর রেওয়ায়াতের জবাব হল তার বর্ণনাটি দুর্বল। কেননা, তার সনদে ত্রুটি রয়েছে। অথবা বীর্যকে শ্লেষ্মার সাথে তুলনাকরাটা পিচ্ছিল হওয়ার দিক দিয়ে ছিল, পবিত্রতা হিসাবে নয়।

যৌক্তিক দলীলের জবাব ঃ নবীদেরকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করার দ্বারা বীর্য পবিত্র হওয়া অনিবার্য হয় না, তাছাড়া তাঁদেরকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করা কোন দোষণীয় বিষয় নয়। যেহেতু তাঁরা মায়ের পেটে থাকাবস্থায় রক্ত ভক্ষণ করেছেন। অথচ রক্ততো সকলের নিকট অপবিত্র। কেউ কেউ বলেন, একথাটি আলোচনা বহির্ভূত বিষয়। সুতরাং আমাদের আলোচনার দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে, বীর্য অপবিত্র। আর এটা যুক্তি ও কিয়াসের আলোকে ও প্রমাণিত হয়। আর তা হচ্ছে হদসে আছগার সাব্যস্ত হয় পেশাব পায়খানার কারণে। আর এটা সকলের নিকট নাপাক। সুতরাং বীর্য যার কারণে হদসে আকবর সাব্যস্ত হয় তাতো উত্তমরূপে নাপাক হবে। এ ছাড়া বীর্য সৃষ্টি হয় রক্ত থেকে, আর তা হচ্ছে নাপাক। সুতরাং এটাও নাপাক হবে। (শরহে ত্বহাবী : ৭১৭)

১. মানুষের বীর্যকে যেভাবে ماء বলা হয়েছে সেভাবে অন্যান্য প্রাণীর বীর্যকেও কুরআনে ماء বলা হয়েছে। যেমন– وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ এতে বীর্য পবিত্র হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

২. فرك منى দ্বারাও তার পবিত্রতা বুঝা যায় না।

৩. বীর্য দ্বারা নবী রাসূলদের মত ফিরাউন ও নমরূদ প্রমূখকেও তো সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই এ নিয়ে প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। মোটকথা মানুষের বীর্য অপবিত্র এটিই গ্রহণযোগ্য কথা। (শরহে নাসায়ী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৩৬)

سوال : ما هُو الحِكْمَةُ فِى وجُوبِ الغُسْلِ عندَ اِنزالِ المَنِىِّ وعَدَمِ وُجُوبِه عندَ البَول؟

প্রশ্ন ঃ পেশাবের কারণে গোসল ওয়াজিব না হওয়া ও বীর্যপাতের ফলে গোসল ওয়াজিব হওয়ার বিধানের রহস্য কি?

উত্তর ঃগোসল ওয়াজিব হওয়ার বিধানের রহস্য ঃ শরীয়তে বীর্যপাতের কারণে গোসল আবশ্যক করেছে, কিন্তু পেশাব করার কারণে গোসলকে আবশ্যক করেনি। অথচ বীর্য ও পেশাব উভয়ের নির্গমনস্থল একই।

হুকুমের মধ্যে পার্থক্য করার হিকমত ঃ

১. এটা امر تَعَبُّدِى তথা ধর্মীয় বিষয়। এখানে কিয়াস ও বিবেকের কোন দখল নেই। যেমন হযরত আলী (রা) বলেন– لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرأى لَكَانَ اَسْفَلُ الخفِّ اَولىٰ بِالمَسْحِ مِنْ اعلاه

২. বীর্যপাত সাধারণত সব সময় ঘটে না, আর পেশাব প্রত্যহ কমপক্ষে চার পাঁচবার করা হয়ে থাকে। তাই পেশাবের সময় গোসলের আদেশ দিলে উম্মতের জন্য তা কষ্টকর হবে, বিধায় এ নির্দেশ দেয়া হয়নি। কেননা, ইরশাদ হয়েছে–১. اِنَّمَا الدِّيْنُ يُسْرٌ .২. لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا .৩ - لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

৩. বীর্য নির্গত হলে শরীরে দুর্বলতা ও জড়তা সৃষ্টি হয়। গোসল করলে এ জড়তা ও দুর্বলতা দূর হয়। কিন্তু পেশাবের কারণে শরীরে কোন জড়তা সৃষ্টি হয় না। তাই গোসলের দরকার নেই।

৪. ইবনুল আরাবী (র) বলেন, বীর্য বের হওয়ার পেছনে কষ্ট-শ্রম এবং মনের আনন্দ-ফূর্তি ও সুখানুভূতি থাকে, যা পেশাবে থাকে না। এজন্যে গোসলের হুকুমে তারতম্য করা হয়েছে।

৫. ইমাম গাযযালী (র) বলেন, পেশাব পানকৃত পানির নির্যাস। আর বীর্য হচ্ছে সকল প্রকার খাদ্যের নির্যাস। তাই পেশাবের তুলনায় বীর্যে পবিত্রতা বেশী। মোটকথা, বিভিন্ন কারণে গোসলের বিধানে উভয়ের মধ্যে তারমত্য করা হয়েছে। (শরহে নাসায়ী : ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৩৭)

سوال : اكتُبْ اِخْتِلافَ العُلَماءِ فِى وُجوبِ الغُسْلِ عَلى الَّذِى يُجَامِعُ وَلاَيُنْزِلُ؟

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি সহবাস করে কিন্তু বীর্যপাত না ঘটে তাহলে এক্ষেত্রে গোসল ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে মতানৈক্য কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ইমাম দাউদে জাহেরী, আতা ইবনে রবাহ ও সোলায়মান ইবনে আ'মাশের মতে কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী সাথে সহবাস করে কিন্তু বীর্যপাত না ঘটে তাহলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না, কারণ গোসল ফরয হওয়ার জন্য বীর্যপাত শর্ত।

২. ইমাম আবু হানাফী, মালেক, আহমদ, শাফেয়ী ও জুমহুর ফুকাহার মতে গোসল করা ওয়াজিব, চাই বীর্যপাত হোক কিংবা না হোক।

আহলে জাহের এর দলীল ঃ ১

عن زيد بن خالد الجهنى قال انه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل قال ليس عليه الا الطهور ثم قال سمعته عن النبى صلى الله عليه وسلم وروى عنه قال سئلت على بن ابى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وابى بن كعب فقالوا ذلك وقال واخبرنى ابوسلمة قال حدثنى عروة انه سأل ابا ايوب فقال ذلك.

হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানীর বর্ণনা, তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফানকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে সহবাস করে কিন্তু তার বীর্য বের হয় না তার কি হুকুম।

তিনি বললেন, সে শুধু পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর তিনি বললেন, আমি এটা রাসূল (স) থেকে শুনেছি। এ অনুচ্ছেদে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব, যুবায়ের ইবনে আওয়াম তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ ও উবাই ইবনে কা'ব থেকেও অনুরূপ ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় দলীল ঃ

عن ابى بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فى الاكتسال الا الطهور وفى رواية عنه قال سئلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع فيكسل قال يغسل ما اصابه ويتوضأ وضوئه للصلوة.

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বীর্যপাতহীন সহবাসের দ্বারা শুধু তাহারাত আবশ্যক হয়। আরেক রেওয়ায়াতে আছে তিনি বলেন, আমি রাসূল (স) কে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি যে সহবাস করে কিন্তু তার বীর্য বের হয় না। তার কি হুকুম? তিনি বললেন, এমন ব্যক্তি তার লজ্জাস্থানকে ধৌত করবে এবং নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করবে।

তৃতীয় দলীল ঃ

عن ابى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء

অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)এক বর্ণনায় আছে তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব হয় নতুবা গোসল ওয়াজিব হয় না।

জুমহুরের দলীল-১

عن عائشة رضى الله عنها انها سئلت عن الرجل يجامع فلاينزل فقالت فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعا.

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা) এর বর্ণনা, তাকে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে সহবাস করে কিন্তু তার বীর্য বের হয় না। তিনি বললেন, আমি ও রাসূল (স) এমন করেছি কিন্তু আমরা উভয়ে পরে গোসল করিনি।

দ্বিতীয় দলীল ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد بين شعبها الاربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর বর্ণনা, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ স্বীয় স্ত্রীর চার জানুর মাঝে বসবে অতঃপর সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব।

তৃতীয় দলীল ঃ

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رسولَ اللّٰه صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ مَعَ اَهْلِهٖ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ غُسْلٍ وعَائِشَةُ جالسةٌ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فعلتُ ذٰلِكَ اَنَا وهٰذِهٖ ثُمَّ لَاغْتَسِلُ ـ

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল (স) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো যে, সে তার স্ত্রীর সাথে বীর্যপাতহীন সহবাস করে। এতে তার উপর কি গোসল আবশ্যক হবে? আয়েশা (রা) তথায় বসা ছিলেন। অতঃপর রাসূল (স) বললেন আমিও এমন করি, তারপর গোসল করি। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় বীর্যপাতহীন সহবাসে গোসল ওয়াজিব হয়।

চতুর্থ দলীল ঃ

رَوَاه نافعٌ عَن عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِذَا اخْتَلَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ـ

হযরত নাফে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যখন উভয় লজ্জাস্থান মিলিত হয়, তখন গোসল ওয়াজিব হয়।

পঞ্চম দলীল ঃ ইমাম চুতষ্ঠয় ও জুমহুর ফুকাহা ও উসূলবিদগণের মতে যে ব্যক্তি সহবাস করবে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব, যদিও বীর্যপাত না হয়।

দাউদে জাহেরীর দলীলের জবাব ঃ তিনি যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানীর বর্ণনা দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন তা সাহাবাদের ইজমা দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। এর প্রমাণ উবায়দুল্লাহ ইবনে রিফাআ ইবনে আল আনসারীর বর্ণনা। তিনি বলেন, আমরা একটি মজলিসে বসা ছিলাম সেখানে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) ছিলেন। তখন আমরা বীর্যের দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয় কিনা এই বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সহবাস করে আর যদি বীর্য বের না হয় তাহলে তার লজ্জাস্থানকে ধৌত করবে এবং নামাযের উযূর মত উযূ করবে। তখন মজলিসের মধ্যে একজন দাঁড়ালো এবং হযরত উমরের কাছে এসে এই বিষয়টি জানালো। হযরত উমর (রা) লোকটিকে বললেন, তুমি যাও এবং তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। যেন তুমি তার উপর সাক্ষী হতে পার। তখন সে গেল এবং যায়েদকে নিয়ে আসল। আর ঐ সময় হযরত উমরের নিকট অনেক সাহাবায়ে কিরাম উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব, মুয়ায ইবনে জাবালও ছিলেন। তখন যায়েদ বললেন, আল্লাহর কসম! এটি আমি আমার পক্ষ থেকে আবিস্কার করিনি। বরং এটা আমি আমার মামা রিফাআ ইবনে রাফে ও আবু আইয়ুব আনসারী থেকে শুনেছি। তখন উমর (রা) বললেন, হে রাসূলের সাথীগণ! তোমরা এ ব্যাপারে কি বল? তখন তারা এ বিষয়ে মতবিরোধ করলেন। তখন হযরত উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! এর পরে কেউ যদি তোমাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে যেহেতু তোমরা আহলে বদর। তখন হযরত আলী (রা) তাকে বললেন, আপনি রাসূলের স্ত্রীদের কাছে কাউকে পাঠান, যদি তাদের কাছে এ বিষয়ে কোন কিছু থেকে থাকে তাহলে তা তাদের থেকে নেওয়া যাবে। তখন তিনি হাফসার কাছে একজনকে পাঠালেন, লোকটি গিয়ে তাকে প্রশ্ন করল। হাফসা বললেন, আমি এ বিষয়ে কিছু জানিনা, অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) এর কাছে পাঠানো হলো, তখন তিনি বললেন, যখন উভয় লজ্জাস্থান একটি অপরটির ভিতর চলে যাবে তখন গোসল ওয়াজিব হবে। তখন হযরত উমর (রা) বললেন, এটা আমারও মত।

এছাড়া তাদের মতটি মানসূখ হওয়ার ব্যাপারে হযরত উবাই থেকেও বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে কাব মুহাম্মাদ ইবনে লাবি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি যায়েদ ইবনে সাবেতকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন যে ব্যক্তি তার পরিবারের সাথে সহবাস করে কিন্তু বীর্যপাত হয়নি তার কি হুকুম? যায়েদ বললেন, এমন ব্যক্তি গোসল করবে। তখন আমি তাকে বললাম, উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেন, এমন ব্যক্তি গোসল করবে না. তখন যায়েদ বললেন, উবাই মৃত্যুর পূর্বে তার এ মত থেকে রুজু করেছেন। আর হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এর বর্ণনা الماءُ مِنَ الماءِ। এটিও মানসূখ হয়ে গেছে। এর প্রমাণ হযরত ইবনে কা'বের বর্ণনা, তিনি বলেন, এই হাদীসটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা হুকুম নাযিল করলেন, তখন এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, এই হাদীসটি সহবাসের হুকুমে ব্যাপারে নয়। এটি শুধু স্বপ্নদোষের

ব্যাপারে। যেমন– ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, الماء من الماء হাদীসটি স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে সে কারো সাথে সহবাস করছে। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে দেখলো তার বীর্য বের হয়নি। তাহলে তার উপর গোসল আবশ্যক নয়। সুতরাং এ সকল রেওয়ায়াতের দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, বীর্যহীন সহবাসের দ্বারা গোসল আবশ্যক।

এটা যুক্তির আলোকেও প্রমাণিত হয়। আর তা হচ্ছে এই যে, যে সকল হুকুম সহবাসের সাথে খাস যেমন মহর, ইদ্দত, রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সহবাসের কারণে ওয়াজিব হয়, যদিও বীর্যপাত না হয়। সুতরাং এগুলোর উপর এটাকে কিয়াস করতে হবে এবং এটার হুকুম গোসলের হুকুমের মত হবে। (শরহে তুহাবী : ৭২১-৭২২)

হাদীস সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসের আলোচ্য বিষয় ঃ আলোচ্য অনুচ্ছেদে দুটি হাদীস আনা হয়েছে এবং উভয়টিতে বীর্য ও মযীর বিধান ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মযী নির্গত হওয়ার দ্বারা অযূ ভেঙ্গে যায় এবং অযূ করা আবশ্যক হয়। কিন্তু গোসল ওয়াজিব হয় না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ (بابُ مَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ .... الخ অনুচ্ছেদে) পিছে অতিবাহিত হয়েছে। বীর্যের ব্যাপারে নবী (স) ফাতওয়া দিয়েছেন– اذا فَضَخْتَ المَاءَ فَاغْتَسِلْ

فضخ الماء - এর তাহকীক ঃ কামুসে উল্লেখ আছে। فضخ الماء এর অর্থ হলো دفقه অর্থাৎ ক্ষিপ্রবেগে/সবেগে জোরে বীর্যপাত হওয়া।

কোন কোন বর্ণনায় اذا حذفت الماء فَاغْتَسِلْ مِنَ الجَنَابَةِ حذفت শব্দটি خاء ও حاء উভয়ভাবে পড়া যায় এর অর্থ হলো নিক্ষেপ করা।

الماء এর শুরুর الف দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ الماء এর শুরুতে যে الف لام আছে সেটি عهد ذهنى এর জন্য এর দ্বারা ঐ বীর্য উদ্দেশ্য যা ক্ষিপ্রবেগে ও কামভাবের সাথে বের হয়। কাজেই হাদীসটি কামভাবের সাথে বীর্যপাত হওয়ার উপর প্রযোজ্য হবে। কারো যদি কামভাবের সাথে ক্ষিপ্রবেগে বীর্যপাত হয় তাহলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। আর যদি শাহওয়াতের সাথে বীর্যপাত না হয়, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এর বক্তব্য ঃ

কামভাবের সাথে বীর্যপাত না হলে যেহেতু গোসল ফরজ হয় না। তাই আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেন, রোগজনিত কারণে যদি বীর্যপাত হয় তাহলে গোসল আবশ্যক হবে না। কেননা, এটা শাহওয়াত ও উত্তেজনার সাথে বের হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর বক্তব্য ঃ

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বীর্যপাত হওয়ার দ্বারা গোসল ফরয হবে। চাই সেটা শাহওয়াতের সাথে হোক কিংবা শাহওয়াত ছাড়া হোক। তিনি রাসূলের হাদীস الماءُ مِنَ المَاءِ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। এখানে এই হাদীসটি মুতলাকভাবে এসেছে। এতে শাহওয়াতের কোন কয়েদ নেই। কাজেই উভয় সুরতে গোসল ফরয হবে।

শাফেয়ী (র) এর দলীলের জবাব

১. উলামায়ে আহনাফ বলেন, উক্ত হাদীস শাহওয়াতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর কারণ হলো যাতে করে উক্ত হাদীসের সাথে অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আলী (রা) এর হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়।

২. ইমাম শাফেয়ী (র) উক্ত হাদীসকে কিভাবে উভয় অবস্থার উপর প্রযোজ্য করলেন, অথচ উক্ত হাদীসটি হলো মুতলাক। আর আলী (রা) এর হাদীস হলো মুকাইয়্যাদ। আর এ ব্যাপারে তার মাযহাব হলো, মুতলাককে মুকাইয়্যাদ এর উপর প্রয়োগ করা। আলোচ্য অনুচ্ছেদে এ স্বীকৃত নীতির উপর আমল না করা সত্যই আশ্চর্যকর বিষয়।

৩. জুমহুর সাহাবা ও তাবেয়ী এবং মুজতাহিদ ইমামদের মতানুসারে উক্ত হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে। এটা ইমাম নববীর বক্তব্য।

৪. حديثُ المَاءِ مِنَ المَاءِ এটা স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ২৭৪-২৭৫)

غُسْلُ الْمَرْاةِ تَرٰى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُل

١٩٥. اخبَرَنا اسحٰق بنُ ابراهيمَ قال حدّثنا عبدةُ قال حدّثنى سعيدٌ عَن قتادَةَ عَن انسٍ رضى اللّٰه عنه انّ امّ سُلَيمٍ سالتْ رسولَ اللّٰهِ ﷺ عَن الْمَراةِ ترٰى فِى مَنامِها مايَرَى الرجُلُ قال اِذا اَنْزَلَتِ الماءَ فلْتَغْتَسِلْ -

١٩٦. اخبَرَنا كثيرُ بنُ عبيدٍ عن محمدِ بنِ حربٍ عن الزُّبيدىِّ عن الزهرىِ عَن عُروةَ اَنّ عائشةَ اَخبَرتْه اَنّ امّ سُلَيمٍ كلّمتْ رَسولَ اللّٰهِ ﷺ وعائشةُ جالسةٌ فقالتْ لهٗ يا رسولَ اللّٰهِ اِنّ اللّٰهَ لايَسْتَحْيِى مِن الحقِّ ارايتَ المراةُ ترٰى فِى النّومِ مايَرَى الرجلُ افتغتَسِلُ مِن ذٰلك فقالَ لَها رسولُ اللّٰهِ ﷺ نعَمْ قالتْ عائشةُ فقلتُ لَها اُفٍّ لَكِ اوتَرَى المراةُ ذٰلك فالتفتَ اِلَىَّ رسولُ اللّٰهِ ﷺ فقالَ ترِبَتْ يمِينُكِ فمِنْ اَيْنَ يكونُ الشَّبَهُ -

١٩٧. اخبَرَنا شُعَيبُ بنُ يوسفَ قال حدّثَنا يحيٰى عَن هِشامٍ قال اخبَرنِى اَبِى عَن زينبَ بنتِ امِّ سلَمَةَ عَن امّ سلَمَةَ انّ امراةً قالتْ يا رَسولَ اللّٰهِ اِنّ اللّٰهَ لايَسْتَحيِى مِن الحقِّ هَل عَلَى المَراةِ غُسلٌ اِذا هِىَ احْتَلَمَتْ قال نعَمْ اذا رَاَتِ الماءَ فضَحِكَتْ امُّ سَلَمَةَ فقالت اَتَحْتَلِمُ المَراةُ فقال رسولُ اللّٰهِ ﷺ ففِيْمَ يُشْبِهُهَا الوَلَدُ -

١٩٨. اخبَرَنا يوسفُ ابنُ سعيدٍ قَال حدّثنا حجّاجٌ عَن شُعْبَةَ قالَ سَمِعْتُ عَطاءَ الخُراسانِىَّ عَن سعيدِ بنِ المُسَيّبِ عَنْ خَولَةَ بِنْتِ حكيمٍ قالتْ سالتُ رسولَ اللّٰهِ ﷺ عَن المراةِ تَحْتَلِمُ فِى مَنامِها فقال اِذا رأتِ المَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ -

---

পুরুষের ন্যায় নারী স্বপ্ন দেখলে তার গোসল

অনুবাদ ঃ ১৯৫. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র).........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। পুরুষের ন্যায় মহিলোর স্বপ্নে দেখা সম্পর্কে উম্মে সুলায়ম (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বীর্য নির্গত করলে গোসল করবে।

১৯৬. কাসির ইবনে উবায়দ (র).........উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, উম্মু সুলায়ম রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন আয়েশা (রা) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। উম্মু সুলায়ম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ সত্য সম্পর্কে লজ্জাবোধ করেন না, আমাকে বলুন! কোন নারী যদি স্বপ্নে ঐ সব দেখে যা পুরুষ দেখে থাকে এতে কি তারও গোসল করতে হবে? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন হ্যাঁ। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, উহ্! তুমি এ কি বলছ! নারীও কি তা দেখে? তখন রাসূলুল্লাহ (স) আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তাহলে (স্ত্রীলোক বীর্য ও স্বপ্নদোষ মুক্ত হলে) কিভাবে সন্তান মাতার মত হয়ে থাকে?

১৯৭. শু'আয়ব ইবনে ইউসুফ (র).........উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা সত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ

করেন না। নারীদের যখন স্বপ্নদোষ হয় তখন তার উপর কি গোসল ওয়াজিব হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখবে। এতে উম্মু সালামা হেসে দিলেন, তিনি বললেন, নারীরও কি স্বপ্নদোষ হয়? তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তা না হলে সন্তান মায়ের সদৃশ হয় কিরূপে?

১৯৮. ইউসুফ ইবনে সা'ঈদ (র)........খাওলা বিনতে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সে নারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যার স্বপ্নদোষ হয়। তিনি বললেন, সে যখন বীর্য দেখলে গোসল করবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : كيف سالت ام سليم بنفسها هذه المسئلة من رسول الله صلعم وهي تنا في الحياء ؟

প্রশ্ন : লজ্জাশীলতার পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও উম্মে সুলাইম (র.) কিভাবে রাসূল (স) কে এ মাসআলার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন?

উত্তর : নারীদের স্বপ্নদোষ সম্পর্কিত মাসআলা উম্মে সুলাইম (র) এর জিজ্ঞেস করার কারণ ঃ এ কথা ঠিক যে, লজ্জাশীলতা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেমন, রাসূল (স) এর বাণী রয়েছে- الحياء شعبة من الايمان এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত উম্মে সুলাইম নারী হয়ে কিভাবে রাসূল (স) কে নারীদের স্বপ্নদোষ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এটা কি লজ্জাশীলতার পরিপন্থী নয়? এর উত্তরে বলা যায়।

১. লজ্জাশীলতা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি অন্যায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভাল কাজের মধ্যে লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ নয়, বরং এক্ষেত্রে তা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। আর নারীদের স্বপ্নদোষ সম্পর্কে প্রশ্ন করা শরয়ী ও উত্তম কাজ। কাজেই এটা লজ্জাশীলতার পরিপন্থী নয়।

২. যেহেতু রাসূল (স) شارع তথা শরীয়ত প্রণেতা ছিলেন, সেহেতু প্রয়োজনীয় মাসআলা তাঁকেই জিজ্ঞেস করতে হবে। জিজ্ঞাসা করা দোষণীয় নয় বরং কর্তব্য। ইরশাদ হচ্ছে- فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون অতএব, উম্মে সুলাইম (র) কর্তৃক এ প্রশ্ন করা লজ্জাশীলতার পরিপন্থী হয়নি। (শরহে নাসায়ী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৩৪)

سوال : ما اسم ام سليم (رض) اذكر نبذة من سيرتها .

প্রশ্ন ঃ উম্মে সুলাইম (র) এর আসল নাম কি? তাঁর জীবনী সংক্ষেপে উল্লেখ কর?

উত্তর ঃ হযরত উম্মে সুলাইম (র) এর জীবনচরিত :

পরিচিতি : নাম সাহলো, আবার কারো কারো মতে রামলা, কারো মতে গামীসাহ, উপনাম উম্মে সুলাইম। পিতার নাম মিলহান, মায়ের নাম মালায়িকা। উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মালেক ইবনে নজর (র)এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। হযরত আনাস (র) তার পুত্র।

ইসলাম গ্রহণ : মদীনা শরীফে প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। স্বামী মালেক (র) মারা গেলে তিনি হযরত আবু তালহার সঙ্গে বিয়ে করেন। এ বিয়ের মহর ছিল আবু তালহার ইসলাম গ্রহণ।

৩. হাদীস শাস্ত্রে অবদান ঃ তিনি অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) ইবনে আব্বাস (রা) ও যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) সহ অনেক সাহাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তিকাল : তিনি হযরত উসমান (রা) এর শাসনামলে ইন্তিকাল করেন। (শরহে নাসায়ী : ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৩৫)

سوال : هل يجب الغسل على المرأة التي ترى مثل ما يرى الرجل؟ اذكر موضحا .

প্রশ্ন ঃ পুরুষ স্বপ্নে যা দেখে মহিলা যদি তা দেখে তাহলে তার উপর গোসল ফরয হবে কি?

উত্তর : মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে গোসল ফরয হয় কি?

এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে, স্বপ্নদোষে যৌন আবেদন সহকারে যদি মহিলা থেকে বীর্য বের হয়, তবে এর দ্বারা তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়। শুধু ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মতে গোসল ওয়াজিব নয়।

ইবনুল মুনযির (র) বলেছেন, যদি তাঁর প্রতি এই উক্তিটির সম্বোধন বিশুদ্ধ হয়, তবে এর খেলাফ হযরত উম্মে সুলাইম (র) থেকে বর্ণিত আছে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি এবং তিরমিযীর রেওয়ায়েতটি প্রমাণ।

আমাদের উলামায়ে কিরাম বলেছেন যে, ইমাম নাসায়ী (র) এর উক্ত হাদীস সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন বীর্য যৌনাঙ্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে না আসে বরং শুধু স্বাদ অনুভূত হয়। এ কারণে দুররে মুখতার" গ্রন্থকার বলেছেন, যদি মযী (যৌনরস) বের হবার বিষয় অনুভূত হয়, কিন্তু যৌনাঙ্গের বাইরের দিক পর্যন্ত না পৌছে তাহলে তখন কোন কোন হানাফীর মতে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু পছন্দনীয় উক্তি হলো, গোসল ওয়াজিব হয় না। কারণ মহিলার ক্ষেত্রে গোসলের আবশ্যকতা নির্ধারণ করে যৌনরস যৌনাঙ্গের বাইরে বেরিয়ে আসার উপর। (শরহে আবু দাউদ ঃ ২০২)

سوال : هل يكونُ المنيُّ لِلْمرأةِ ايضًا؟ مَنْ كانتْ سائلةُ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ بَيِّنْ حُكْمَ الإغْتِسالِ عندَ ما ترى مثلَ مايرى الرجلُ؟ وما هُوَ التطبيقُ بَيْنَ الاحاديثِ المُتعارِضةِ؟ ما هِيَ اراءُ الأطِبّاءِ القَدِيْمَةِ والحَدِيْثَةِ؟ ومَا هُوَ التطبيقُ؟

প্রশ্ন ঃ নারীদেরও কি বীর্য আছে? পুরুষ স্বপ্নে যা দেখে মহিলা যদি তা তা দেখে তাহলে গোসল ফরয হয় কি না এ সম্পর্কে রাসূল (স) এর নিকট প্রশ্নকারী কে ছিল? এবং বৈপরীত্বপূর্ণ হাদীসের সামঞ্জস্য বিধান কি? এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও আধুনিক চিকিৎসকগণের মতামত কি এবং তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ রমনীরও বীর্য হয়, ও এ ব্যাপারে চিকিৎসকদের বক্তব্য ঃ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস এবং অন্যান্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নারীদের মধ্যেও বীর্য উপকরণ বিদ্যমান আছে যা বেরও হয়। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক চিকিৎসাবিদদের একটি বিরাট দল বলেন যে, নারীদের বীর্য। আর তাদের বীর্যপাতের অর্থ হলো শুধুমাত্র পূর্ণাঙ্গরূপে স্বাদ উপভোগ করা। চিকিৎসাবিদগণ স্বীকার করেন যে, মহিলাদের মধ্যে এক প্রকার সিক্ততা রয়েছে। এই দুটি উক্তির মাঝে পরস্পর বিরোধ বুঝা যায়– কিন্তু মূলত: কোন বিরোধ নেই। মূলত: বাস্তব সত্য হলো, মহিলাদের বীর্য আছে, অবশ্য সেটি বাইরে বের হয় না; বরং সাধারণত: বীর্যপাত গর্ভাশয়ের মধ্যেই হয়ে থাকে। অবশ্য কোন কোন অস্বাভাবিক অবস্থায় এই বীর্য বাইরেও বের হয়ে থাকে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে এই অস্বাভাবিক সুরতই বর্ণিত হয়েছে।

আর চিকিৎসাবিদগণ যে বীর্য নেই বলে উল্লেখ করেছেন তার উদ্দেশ্য হলো নারীদের বীর্য পুরুষের বীর্যের মতো হয় না। শায়খ আবু আলী ইবনে সীনার উক্তি দ্বারা এ গবেষণার সমর্থন হয়। ইবনে সীনা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, রমণীর মধ্যে বীর্যপাত না হওয়ার অর্থ হলো, তার বীর্য বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে না। অন্যথায় নারীর বীর্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আমি স্বয়ং নারীর বীর্য জমা হওয়ার স্থানে তা দেখেছি।

প্রশ্নকারী কে ছিলেন? বৈপরিত্যের সমাধান কি ঃ তিরমিযীর রেওয়ায়াতে স্বপ্নদোষ গোসল ফরয কি না তা জিজ্ঞেসকারী হযরত উম্মে সালমা (র)কে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ মুয়াত্তার রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা (রা) কে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাযী ইয়ায এবং হাফিজ ইবনে হাজার (র) প্রমুখ এই বিরোধ অবসান এভাবে করেছেন যে, যখন এ বিষয়টি জিজ্ঞাসা করা হলো তখন হযরত আয়েশা এবং উম্মে সালামা (রা) উভয়েই উপস্থিত ছিলেন এবং উভয়েই এ কথা বলেছিলেন। অতএব, প্রত্যেক রাবী এরূপ কথা উল্লেখ করেছেন, যা অন্যজন উল্লেখ করেননি। তিরমিযীর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উম্মে সালামা (র) বলেন, قلتُ لها فَضَحْتِ النساءَ يا امَّ سُلَيْمٍ অর্থাৎ আপনি রাসূলে আকরাম (স) এর নিকট এমন একটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা নারীদের যৌন চাহিদার আধিক্য বুঝায়। এ জন্য আপনি নারীজাতিকে অপদস্ত করেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে গোপণীয়তা হলো মহিলাদের স্বভাব।

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, তিরমিযীতে باب فيمن يستيقظ ويرى بللاً এ আছে যে, স্বয়ং হযরত উম্মে সালামা (রা) ই এই প্রশ্ন প্রিয়নবী (স) এর নিকট করেছিলেন। অতএব, হযরত উম্মে সুলাইম (র) এর উপর প্রশ্ন উত্থাপনের বৈধতা কোথায়? এর উত্তর হলো, হযরত উম্মে সালামাহ (রা) কে এ প্রশ্নকর্ত্রী সাব্যস্ত

করা হয়েছে আব্দুল্লাহ এর রেওয়ায়াত দ্বারা। এ রেওয়ায়াতটি আব্দুল্লাহর কারণে দুর্বল। ইমাম তিরমিযী (র) এ জন্যই বলেছেন, আব্দুল্লাহকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র) তার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, সম্ভাবনা রয়েছে যে, সেখানেও মূল প্রশ্নকারিনী ছিলেন হযরত উম্মে সুলাইম (র) যাঁর নাম তার স্মরণ ছিল না. এর সমর্থন এভাবে হয় যে, উম্মে সালামা ও উম্মে সুলাইম দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ নাম যাতে দুর্বল রাবীর ভ্রমের বেশ সম্ভাবনা বিদ্যমান। (শরহে আবু দাউদ: ২০৩)

سوال : اكتُبْ مَعْنى تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ؟ ثُمَّ اَوْضِحْ قوله عليه السلام اَوْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ .

প্রশ্ন ঃ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ **এর অর্থ লেখ? অতঃপর নবী (স) এর বাণী** او تحتلم المرأة **এর ব্যাখ্যা দাও।**

উত্তর ঃ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ **এর অর্থ ঃ** রাসূল (স) হযরত উম্মে সালামা (র)কে বলেছেন যে, তোমার ডান হাত ধুলায় মলিন হোক, এটা দ্বারা বদ দোয়া করা উদ্দেশ্য নয়? এটা একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র। আরবের লোকেরা আশ্চর্য ও বিস্ময়ের স্থলে এ ধরণের বাক্য উচ্চারণ করে থাকে। রাসূল (স) এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমার মতো বয়স্কা ও প্রবীন নারীর এ বিষয়ে অনবিজ্ঞ থাকা আশ্চর্যের ব্যাপার। (শরহে মিশকাত : ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৩৩)

اَوْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ **এর ব্যাখ্যা ঃ** উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার উক্ত উক্তির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, তিনি মহিলাদের স্বপ্নদোষকে অস্বীকার করেন। এর উত্তর হলো স্বপ্নদোষ সাধারণত কু-চিন্তা থেকে হয়ে থাকে। আর রাসূল (স) এর বিবিগণকে সম্ভবত আল্লাহ তাআলা বিবাহের পূর্ব হতেই এই ধরণের কু-চিন্তা হতে বিশেষ হেফাজতে রেখেছেন। তাই এ ব্যাপারে অনবহিত থাকার কারণে এরূপ প্রশ্ন করেছেন। (শরহে মিশকাত : ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৩৩)

(ক) যদি পুরুষ বা নারীর স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকে, কিন্তু জাগ্রত হয়ে তার কোনো চিহ্ন বা আর্দ্রতা দেখতে না পায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না।

খ. যদি কেউ জেগে আর্দ্রতা দেখতে পায়, তবে তাতে ১৪টি অবস্থা রয়েছে। যথা ১. আর্দ্রতাটা বীর্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, ২. মযী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, ৩. ওদী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, ৪. মনী বা মযী হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হওয়া, ৫. মযী বা ওদী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া, ৬. মনী বা ওদী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া, ৭. মনী, মযী বা ওদী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া।

উপরোক্ত ৭টি অবস্থার প্রত্যেকটিতেই আবার দুটি অবস্থা রয়েছে। তথা (ক) স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ আছে , (খ) অথবা স্মরণ নেই। এহিসেবে সর্ব মোট (৭×২=১৪) চৌদ্দটি অবস্থা হয়।

এ চৌদ্দটি অবস্থার মধ্যে ৭টি অবস্থায় হানাফী ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে গোসল করা ফরয। সেই ৭টি অবস্থা এই- ১. আর্দ্রতা মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকা।

২. মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকা।

৩. মযী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকা।

৪.৫.৬ এবং ৭ নং এর চারটি অবস্থায় স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকা। আর নিম্ন চারটি অবস্থায় সর্বস্মমতিক্রমে গোসল করা ফরয নয়; ১ ও ২ নং অদী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, আর স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকা বা না থাকা।

৩. মযী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না থাকা।

৪. মযী ও ওদী সন্দেহ হওয়া কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে থাকা।

নিম্নের এ তিনটি অবস্থায় গোসল ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. যদি মযী ও মনী হওয়ার মধ্যে সন্দেহ হয়।

২. অথবা মনী ও ওদীর মধ্যে সন্দেহ হয় কিংবা ৩. তিনটির মধ্যেই সন্দেহ হয়, এমতাবস্থায় স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না পড়লে ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র) এর মতে, গোসল করা ফরয। আর আবু ইউসুফ (র) এর মতে, গোসল করা ফরয নয়। ইমাম আহমদ বলেন, উপরোক্ত চৌদ্দটি অবস্থাতেই গোসল করা ফরয। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, স্বপ্নদোষের কথা মনে থাকলে মযী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেই গোসল ফরয হবে।

(আনওয়ারুল মিশকাত ঃ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৩৮)

قوله وهل تجد بللا : সে কী শরীর অথবা কাপড়ে আর্দ্রতা পেয়েছে? উম্মে সুলাইম বলেন, সম্ভবত রাসূল (স) বলেছেন فلتغتسل অতঃপর তার গোসল করা উচিত শুধুমাত্র স্বপ্ন দেখার কারণে যে, সে কোন পুরুষের নিকট গমন করেছে, অতঃপর পুরুষটি তার সাথে সহবাস করেছে, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বীর্যপাত না হয়। (শরহে উর্দু নাসায়ী; ২৭৬)

উম্মে সুলাইমের মাসআলা জিজ্ঞেস করার পদ্ধতি

যেহেতু এতদসম্পর্কিত বিষয়ে প্রশ্ন করাটা সমাজে লজ্জাজনক মনে করা হয়। এ কারণে ভূমিকা স্বরূপ তিনি বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সত্যকে প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। উলামায়ে কিরাম এর উদ্দেশ্য এটা ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা সত্য বিষয় বর্ণনা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না বরং অবশ্যই তিনি সত্যকে বর্ণনা করেন, অনুরূপভাবে আমাদেরকে হুকুম করা হয়েছে- تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى তাই বান্দারও প্রশ্ন করতে লজ্জিত না হওয়া চাই। এ জন্য উম্মে সুলাইম বলেন, আমি সত্য কথা জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করি না। সুতরাং তিনি প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষ স্বপ্নে যা দেখে মহিলা যদি তা দেখে তাহলে সে কী করবে?

আয়েশা (রা) এর মহিলাদের স্বপ্নদোষ অস্বীকার করার কারণ

আয়েশা (রা) আশ্চর্যের সাথে জিজ্ঞেস করেন, মহিলাদের কি সপ্নদোষ হয়? স্বপ্নদোষকে অস্বীকার করার কারণ হলো তিনি অল্প বয়সী মেয়ে ছিলেন তাই তিনি মহিলাদের স্বপ্নদোষের কথা জানতেন না। অথবা, এটাও হতে পারে যে, মহিলাদের স্বপ্নদোষ হওয়ার ঘটনা একেবারেই বিরল। যেমন স্বপ্নদোষ না হওয়াটা পুরুষদের ক্ষেত্রে বিরল। তাই তিনি অস্বীকার করত: আশ্চার্যের সাথে জিজ্ঞেস করেন। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ২৭৭)

নবী (স) تَرِبَتْ يَمِينُكَ দ্বারা যা বুঝাতে চেয়েছেন

হে আয়েশা! তোমার ডান হাত ধুলায় মলিন হোক। যদি মহিলাদের বীর্য না থাকতো তাহলে বাচ্চা তাদের সদৃশ কিভাবে হয়, এর দ্বারা বুঝা যায় মহিলাদের বীর্য আছে? কেননা, বাচ্চা মায়ের সৃদশ ঐ সময় হবে যখন মহিলার বীর্য থাকবে। মোটকথা, বাচ্চা তাদের সদৃশ হওয়ায় একথার প্রমাণ যে মহিলাদের বীর্য আছে।

হাকীম এরিষ্টোটাল এটাকে স্বীকার করে নিয়ে বলেন, বাচ্চা উভয়ের বীর্যের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়, বাচ্চা পিতা-মাতার সাদৃশ্য লাভ করে কখনো প্রাধান্য পাওয়ার কারণে। আবার কখনো অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে। কখনো আবার উভয়টাই প্রাধান্য বিস্তার করে। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা মহিলাদের বীর্য থাকা সাব্যস্ত হলো। কাজেই স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে রেত:পাত হওয়া সম্ভব। সুতরাং যখন বীর্যপাত হবে তখন গোসল ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে যে একটি কওল পাওয়া যায় গোসল ওয়াজিব হবে না, এটা ঐ সুরতে প্রযোজ্য যখন স্বপ্নদোষ হয় কিন্তু বীর্য যৌনাঙ্গ থেকে বাহিরে বের না হয়।

হযরত আয়েশা (রা) এর প্রশংসা

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, লজ্জাবোধের কারণে শরীয়াতে মাসআলা জানা থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই। যে লজ্জাবোধ দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় তা নিন্দনীয়। আনসারী মহিলাদের লজ্জাবোধ এত বেশী থাকা সত্ত্বেও শরীয়তের মাসআলা জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে তা প্রতিবন্ধক হয়নি, এ মহা বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করত: হযরত আয়েশা (রা) আনসারী মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ আনসারী মহিলারা কতই না সুন্দর! তাদের লজ্জাবোধ দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না। (শরহে উর্দু নাসায়ী : ২৭৭)

তৃতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) এর কন্যা যয়নব (রা)। তার নাম বাররা ছিল, নবী (স) তা পরিবর্তন করে যয়নব রাখেন। তিনি অনেক বড় আলেমা ও ফিকহবিদ ছিলেন। তার পিতার নাম হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আসাদ মাখযুমী। তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধের সময় নবী (স) এর সাথে বিবাহ হয়। (শরহে উর্দু নাসায়ী : ২৭৭)

بَابُ الَّذِى يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

১৯৯. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُعَادٍ عَنْ اَبِى اَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ -

অনুচ্ছেদ ঃ যার স্বপ্নদোষ হয় অথচ বীর্য দেখে না

অনুবাদ ঃ ১৯৯. আবদুল জব্বার ইবনে আ'লা (র)........আবু আইয়ুব (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বীর্যপাত হলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

আলোচ্য হাদীসের প্রথম الماء দ্বারা গোসলের পানি এবং দ্বিতীয় الماء দ্বারা বীর্য উদ্দেশ্য। এখন পূর্ণ হাদীসের ভাষ্য হবে- اِنَّمَا وجوبُ اِسْتِعمالِ المَاءِ اى الغسلُ مِن اجلِ خُرُوجِ المَاءِ اى المَنِىِّ

অর্থ- বীর্যপাত হলে পানি দ্বারা গোসল করা ফরয হবে। উদ্দেশ্য হলো কামভাবের সাথে ক্ষিপ্রবেগে বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হবে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গোসল ফরয হওয়ার মূলভিত্তি হলো, বীর্যপাত ঘটা। সুতরাং স্বপ্নে বীর্যপাতহীন সহবাসের কারণে গোসল ওয়াজিব হবে না।

হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান ঃ আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসের সাথে পূর্ববর্তী একটি হাদীসের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর তা হলো, اذا قعد بَيْنَ شعبها الاَرْبع ...... الخ এর সমাধান নিম্নরূপ-

১. জুমহুর উলামায়ে কিরাম উক্ত বৈপরীত্যের সমাধানকল্পে বলেন, حديث المَاءُ مِنَ المَاءِ মানসূখ হয়ে গেছে। এর প্রমাণ হলো, আবু দাউদ ও ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত উবাই ইবনে কা'ব এর রেওয়ায়াত। উবাই ইবনে কা'ব বলেন, المَاءُ من المَاءِ এ বিধানটি ইসলামের শুরু যুগে ছিল। পরবর্তীতে এটা মানসূখ হয়ে গেছে এবং যখন অগ্রভাগ যৌনাঙ্গে প্রবেশ করবে তখনআমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে গোসল করার, যদিও রেত:পাত না হয়।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) অনুচ্ছেদের হাদীসের অপর একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, আর তা হলো এটা স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সহবাসের ক্ষেত্রে নয়। উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে দেখলো। কিন্তু জাগ্রত হওয়ার পর শরীর অথবা কাপড়ে কোন বীর্যের আছর পেলো না, তাহলে এক্ষেত্রে তার উপর গোসল ফরয হবে না। আর যদি শরীরে বা কাপড়ে বীর্যের আছর থাকে তাহলে তার উপর গোসল ওয়াজিব। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ বলেন। ইবনে আব্বাস (রা) এর ব্যাখ্যা আপত্তির উর্ধ্বে নয়।

আর সে আপত্তি হলো, حديث المَاءِ مِنَ المَاءِ এর উৎস হলো সহবাস, সপ্নদোষ নয়। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়াত দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হয়। উক্ত রেওয়ায়াতটা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি স্পষ্টভাবে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে। তাহলে ইবনে আব্বাস (রা) কিভাবে আলোচ্য হাদীসকে স্বপ্নদোষের উপর প্রয়োগ করলেন? এর দ্বারা বুঝা যায় তিনি নসখকে অস্বীকার করেছেন।

উত্তর ঃ উক্ত আপত্তির উত্তর হলো, ইবনে আব্বাস (রা) নসখকে অস্বীকার করেননি। বরং তিনি হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র বর্ণনা করেছেন যে, حديث المَاءُ مِنَ المَاءِ সহবাসের ক্ষেত্রে মানসূখ হতে পারে। কিন্তু স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে মানসূখ নয় বরং معمول به - এর সূরত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে আবী শায়বা (রা) ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ বলেন, তিনি উক্ত হাদীসকে বিশেষকরে স্বপ্নদোষের উপর প্রয়োগ করেছেন। তার এ ব্যাখ্যা অনুপাতে উভয় সুরতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। মোটকথা, উবাই ইবনে কা'ব ও ইবনে আব্বাসের মধ্যে কোন ধরণের বৈপরীত্য নেই।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব বলেন, حديث المَاءِ مِنَ المَاءِ এর হুকুম পূর্বে ছিল এখন মানসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখনও খাস সুরতে উক্ত হুকুম বাকী রয়েছে। যদিও সহবাসের ক্ষেত্রে হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে। নাসায়ী গ্রন্থকার উভয় সুরতের মধ্যে তাতবীকের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। (শরহে নাসায়ী : ২৭৮-২৭৯)

بَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

٢٠٠. اخبرنا اسحق بن ابراهيم قال اخبرنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر فايهما سبق كان الشبه -

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ এবং নারীর বীর্যের পার্থক্য

অনুবাদ ঃ ২০০. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পুরুষের বীর্য গাঢ় সাদা বর্ণের এবং নারীর বীর্য পাতলা হলোদে বর্ণের। এতদুভয়ের যেটিই পূর্বে নির্গত হয় সন্তান তার সদৃশ হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله فايهما سبق كان الشبه ঃ شبه শব্দটির ش বর্ণে কাছরা এবং با، বর্ণ সাকিন এর সাথে পঠিত। শব্দটির বহুবচন হলো اشباه। অর্থ আকৃতি, সাদৃশ্য, সামঞ্জস্য, অথবা ش ও با، বর্ণ উভয়টি ফাতাহ এর সাথে পঠিত, যার অর্থ মুশাবাহা, মিল, সাদৃশ্য। অর্থাৎ পুরুষ মহিলার উভয়ের বীর্যের মধ্য হতে যার বীর্যপাত আগে হবে এবং জরায়ুতে যার বীর্য আগে পৌছবে অথবা, যার বীর্য প্রাধান্য পাবে, অথবা যার বীর্যের পরিমান বেশী হবে বাচ্চার মেজাজ ও তার আকৃতিতে তার সঙ্গে সাদৃশ্যতা সৃষ্টি হবে।

আল্লামা তীবী (রহ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা এ কথার উপর প্রমাণ পেশ করা যায় যে, পুরুষের ন্যায় মহিলারও বীর্য আছে এবং বাচ্চা উভয়ের বীর্য দ্বারাই সৃষ্টি হয়। কেননা, যদি মহিলাদের বীর্য না থাকতো তাহলে বাচ্চা শুধুমাত্র পুরুষের বীর্য দ্বারাই সৃষ্টি হতো এবং তারই সাদৃশ্যতা ও আকৃতি লাভ করতো। মহিলার আকৃতি ও সাদৃশ্যতা পেত না। অথচ আমরা বাস্তবে মহিলার আকৃতিতেও তার সাদৃশ্যতাপূর্ণ সন্তান হতে দেখি। এটাই একথার প্রমাণ যে, মহিলাদের বীর্য আছে।

কেউ কেউ বলেন, মহিলাদেরও বীর্য আছে কিন্তু বাইরে নির্গত হয় না। বরং তা উলটা জরায়ুর দিকে ফিরে যায়। শায়খ তৃকী উদ্দীন এ মতকে খণ্ডন করত: বলেন, হযরত উরওয়া হযরত আয়েশা (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেন যে, এক মহিলা হুজুর (স) কে জিজ্ঞেস করল, মহিলাও কি গোসল করবে? اذا احتلمت وابصرت الماء। হুজুর (স) জবাবে বললেন, نعم হ্যাঁ, তার উপর গোসল ফরয হবে। এর দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বীর্য জরায়ুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। বরং বীর্য যৌনাঙ্গ থেকে বাহিরে বের হয়। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ২৮০)

ذِكرُ الاغْتِسال مِنَ الحَيْض

٢٠١. اخبرَنا عِمرانُ بْنُ يزيدَ قال حدّثنا اسمٰعِيل بنُ عبدِ اللّٰهِ العَدوىُّ قال حدّثنا الاوزاعىُّ قال حدّثنِى يحيٰى بنُ سعيدٍ قال حدّثنى هشام بنُ عروةَ عن عروةَ عن فاطمةَ رضى اللّه عنهما بنتِ قَيْسٍ مِن بَنِى اسدِ قريشٍ انّها اتَتِ النبىَّ ﷺ فذكرتْ انّها تُسْتَحاضُ فزَعِمَتْ انّه قال لَها إنّما ذلك عِرقٌ فاذا اقبَلتِ الحيضةُ فدَعِى الصلوةَ فاذا ادبرتْ فاغسِلى عنكِ الدمَ ثم صَلِّى -

٢٠٢. اخبرَنا هِشامُ بْنُ عمّارٍ قال حدّثنا سهلُ بْنُ هاشمٍ قال حَدّثنا الاوزاعىُّ عن الزُّهرى عن عروةَ عَن عائشةَ انّ النبىّ ﷺ قال اذا اَقبَلتِ الحيضةُ فَاترُكِى الصلوةَ واذا ادبرتْ فَاغْتَسِلى-

٢٠٣. اخبرَنا عمرانُ بْنُ يزيدَ قال حدّثنا اسمٰعيلُ بنُ عبدِ اللّٰهِ قال حدّثنا الاوزاعىُّ قال حدّثنا الزهرىُّ عَن عروةَ وعمرةَ عَنْ عَائِشةَ قالتْ أُسْتُحِيْضت امُّ حبيبةَ بنتِ جَحشٍ سبعَ سِنِيْنَ فَاشْتَكتْ ذٰلك الى رَسولِ اللّٰهِ ﷺ فقالَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ انّ هٰذِه لَيْسَتْ بِالحَيضةِ ولكن هٰذا عرقٌ فاغسِلِى ثم صَلِّى -

٢٠٤. اخبرَنا الربيعُ بنُ سليمانَ بْنِ داوٗد قال حدّثنا عبدُ اللّه بنُ يوسفَ قال حدّثنا الهيثمُ ابنُ حُميدٍ قال اخبرَنى النّعمان والاوزاعىُّ وابو معيدٍ وهو حفصُ بنُ غيلانَ عَن الزهرىِ قال اخبرَنى عُروة بنُ الزبيرِ وعَمْرةُ بِنْتِ عبد الرحمٰن عَن عائشةَ قالتْ أُسْتُحِيْضَت ام حبيبةَ بنتِ جحشٍ امراةُ عبد الرحمٰنِ بن عَوفٍ وهى اختُ زينبَ بنتِ جَحشٍ فَاستفتَتْ رسولَ اللّه ﷺ فقال لهَا رسولُ اللّه ﷺ إنّ هٰذه لَيْسَت بالحَيْضة ولكن هٰذا عرقٌ فاذا ادبرتِ الحيضةُ فَاغْتَسِلى وصَلِّى واذا اقبلتْ فَاترُكِى لَها الصلوةَ قالتْ عائشةُ فكانَت تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صلوةٍ وتُصَلِّى وكانتْ تَغْتَسِل اَحيانًا فِى مِركَنٍ فِى حُجرةِ اُختِهَا زينبُ وهى عندَ رَسُولِ اللّه ﷺ حتّى انّ حمرةَ الدمِ لتَعْلُوا الماءَ وتخرُجُ فتُصَلِّى معَ رسولِ اللّه ﷺ فما يَمْنَعُها ذٰلك مِن الصلٰوة -

٢٠٥. اخبرَنا محمدُ بْنُ سلمةَ قال حدّثنا ابنُ وُهبٍ عَن عمرِو بْنِ الحَارِثِ عَنِ ابنِ شهابٍ عَن عُرْوَةَ وعَمْرة عَن عائشةَ انّ أُمَّ حَبِيْبَةَ ختنةَ رسولِ اللّه ﷺ وتحتَ عبد الرحمٰن بن عوفٍ أُسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِينَ اِسْتَفتتْ رسولَ اللّه ﷺ فِى ذٰلك فقال رسولُ الله ﷺ اِنّ هٰذه لَيْسَتْ بِالحَيضةِ ولكن هٰذا عرق فَاغْتَسِلى وصلّى -

٢٠٦. اخبرَنا قتيبةُ قال حدّثنا الليثُ عن ابنِ شهابٍ عن عُروة عن عائشةَ قالَتْ اِسْتَفْتَتْ اُمُّ حبيبةَ بنتِ جحشٍ رسولَ اللّه ﷺ فقالتْ يَا رسولَ اللّٰهِ اِنّى أُستَحَاضُ فقَال انّما ذٰلك عرقٌ فاغْتَسِلى وصَلّى فكانتْ تَغتَسِلُ لِكلّ صلوةٍ -

٢٠٧. اخبرَنا قُتيبة قال حدّثنا الليثُ عن يزيدَ بنِ ابى حبيبٍ عن جعفرِ بْنِ ربيعةَ عن عراكِ بْنِ مالكٍ عن عروةَ عن عائشة اَنّ ام حبيبةَ سالتْ رسولَ اللّه ﷺ عن الدّمِ قالتْ

عائشة رايتُ مِركنها ملآنُ دَمًا فقال لها رسولُ اللّٰه ﷺ اُمكثِي قدرَ ما كانت تَحبِسُكِ حيضَتُكِ ثمَّ اغتَسِلِي -

٢٠٨. اخبرَنا قتيبةُ مرّةً أُخرَى ولمْ يذكُر جعفرًا -

٢٠٩. اخبرَنا قتيبةُ عَن مالكٍ عَن نافِعٍ عنْ سُليمانَ بْنِ يسارٍ عنْ امّ سلمَةَ تعْنِي انَّ امرأةً كانتْ تَهْرَاقُ الدمَ على عهدِ رسولِ اللّٰه ﷺ فاستَفتَت لها ام سلمةُ رسولَ اللّٰه ﷺ فقال لِتَنْظُر عددَ اللّيالِي والايّامِ الّتي كانتْ تحيضُ مِن الشّهرِ قبلَ ان يُصيبَها الذى اصابَها فلتَترُكِ الصلوةَ قدرَ ذٰلك مِن الشّهرِ فاذا خلفت ذٰلك فلتغتَسِل ثم لتَستَثْفِر ثم لتُصلّي -

হায়েযের পর গোসল

অনুবাদ ঃ ২০১. ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র).........কুরায়শ বংশের আসাদ গোত্রের ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে উল্লেখ করলেন যে, তার অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়। তাঁর ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বলেছেন যে, এটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব যখন হায়েয আরম্ভ হয় তখন নামায ছেড়ে দেবে– আর যখন হায়েযের নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয় তখন রক্ত ধৌত কর এবং গোসল কর। তারপর নামায আদায় কর।

২০২. হিশাম ইবনে আম্মার (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যখন হায়েয আরম্ভ হয় তখন নামায ছেড়ে দেবে, আর যখন তা বন্ধ হয়ে যায় (অর্থাৎ হায়েযের দিবসের পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়)তখন গোসল করবে।

২০৩. ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশ সাত বছর ইস্তেহাযায় ভুগছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এটা হায়েয নয় বরং এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব, তুমি গোসল কর এবং নামায আদায় কর।

২০৪. রবী ইবনে সুলায়মান (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশ (রা) যিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে জাহশ (রা)-এর বোন ইস্তিহাযায় আক্রান্ত ছিলেন, আয়েশা (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এ বিষয়ে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন, এটা হায়েয নয়। এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব যখন হায়েয বন্ধ হয়ে যায় তখন গোসল করবে এবং নামায আদায় করবে। আবার যখন হায়েয আরম্ভ হবে তখন নামায ছেড়ে দেবে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করতেন এবং নামায আদায় করতেন। কোন কোন সময় তিনি তাঁর বোন যয়নব রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থাকাকালীন সময়ও তার কক্ষে টবে গোসল করতেন। এমনকি রক্তের লাল রং পানির উপর উঠত। তিনি বের হতেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সালাতে শরীক হতেন। এটা তাকে সালাতে বাধা প্রদান করত না।

২০৫. মুহাম্মদ ইবনে সালামা (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর স্ত্রী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর শ্যালিকা উম্মে হাবীবা (রা) সাত বছর যাবত ইস্তেহাযায় ভুগছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এটা হায়েয নয়, বরং এটা একটি শিরার রক্ত। অতএব তুমি গোসল কর এবং নামায আদায় কর।

২০৬. কুতায়বা (রা).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইস্তেহাযায়

আক্রান্ত। তিনি বললেন, এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব, তুমি গোসল কর এবং নামায আদায় কর। এরপর উম্মে হাবীবা প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করতেন।

২০৭. কুতায়বা (র)...........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে (ইস্তেহাযার) রক্ত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাঁর টব রক্তে পূর্ণ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন, তোমার হায়েয যতদিন তোমাকে তোমার নামায হতে বিরত রাখত ততদিন বিরত থাক তারপর গোসল কর।

২০৮. কুতায়বা (র) থেকে অন্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি জাফরের নাম উল্লেখ করেননি।

২০৯. কুতায়বা (র).........উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে জনৈকা মহিলার অনর্গল রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, উম্মে সালামা তা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, (রক্তস্রাব বন্ধ না হওয়ার) যে রোগে সে আক্রান্ত, সে রোগ হওয়ার পূর্বে তার কতদিন কত রাত প্রত্যেক মাসে হায়য আসত সে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। মাসের সে দিন ও রাত্রিগুলোতে নামায আদায় করবে না। তারপর সে দিনগুলো অতিবাহিত হলে সে গোসল করবে ও লজ্জাস্থান কাপড় দিয়ে বেঁধে নেবে এবং নামায আদায় করবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : بَيِّنِ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِى مُدَّةِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْاِسْتِحَاضَةِ فِى حكمِ الصَّلَاةِ قضاءً واداءً؟

প্রশ্ন ঃ হায়েয ও নিফাস এর সময়সীমা সম্পর্কে আলেমদের মতামত বর্ণনা কর। নামায কাযা ও আদায় হওয়ার বিধানে হায়েয, নিফাস ও ইস্তিহাযাগ্রস্থ ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্য কী?

উত্তর ঃ হায়েয নিফাসের সময়সীমার ব্যাপারে আলেমদের মতামত ঃ হায়েযের নিম্নতম ও উর্ধ্বতম সীমা নির্ণয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম মালেক (র) এর নিকট হায়েযের সর্বনিম্ন কোন সময়সীমা নেই, এক ঘণ্টাও হতে পারে তবে এর উর্ধ্বতম সময়সীমা হচ্ছে ১৭ দিন।

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র) এর মতে হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা হলো ১ দিন এক রাত এবং উর্ধ্বতম সীমা ১৫দিন। কেননা, রাসূল (স) বলেছেন–

قولُه عليه السلام فِى نُقصانِ دينِ المَرأةِ تَقعُدُ إحداهُنَّ شطرَ عُمُرِها لا تَصُوم ولا تُصَلِّى

৩. ইমাম আবু ইউসুফ (র) এরমতে নিম্নতম সীমা আড়াই দিন।

৪. **ইমাম আবু হনীফা ও মুহাম্মাদের** (র) এর মতে, হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা হলো ৩দিন ৩ রাত। আর উর্ধ্বতম সময়সীমা ১০ দিন ১০ রাত। তাদের দলীল হচ্ছে–

عن ابى أُمامَةَ (رض) قال قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم اقلُّ الحَيْضِ لِلجاريةِ والبِكرِ والثَّيِّبِ الثلاثُ واكثرُ مَايكونُ عشرةُ ايامٍ فاذا زادَ فهى إستِحاضة (رواه دارقطنى)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

১. ইমাম মালেক (র) এর কথার কোন দলীল নেই। তাই গ্রহণযোগ্য নয়।

২. ইবনে নুমান এর মতে, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র) এর দাবীর অনুকূলে কোন বিশুদ্ধ হাদীস নেই।

৩. তাদের দাবীগুলো হাদীসের বিপরীত। আর হাদীসের বিপরীতে কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, هٰذا نقضٌ مِّن تَقديرِ الشَّرعِ

৪. আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, তাদের হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে ধরে নিলেও নারীদের نصف عمر বা অর্ধ জীবন বসে থাকা সাব্যস্ত হয় না। কেননা, বাল্যকালে, গর্ভাবস্থায় ও বৃদ্ধ বয়সে তো হায়েয আসে না। তাই شطر عمرها দ্বারা عين شطر উদ্দেশ্য নয় বরং مقارب للشطر উদ্দেশ্য। আর তা হচ্ছে দশ দিন। (শরহে মিশকাত ১ম খণ্ড)

নিফাস এর সময়সীমা সম্পর্কে আলেমদের বক্তব্য

নিফাস এর সর্বনিম্ন কোন সময়সীমা নেই এবং এ ব্যাপারে আলেমদের কোন মতামতও নেই। কেননা, তিরমিযী শরীফে উল্লেখ আছে–

اِنَّ النِّفَاسَ تَدَعُ الصَّلَاةَ اَرْبَعِيْنَ يومًا اِلَّا اَنْ تَرَى الطهرَ قبلَ ذلك فانّها تغتسلُ حِيْنَئِذٍ وتُصَلِّى .

এই হাদীসের الا ان ترى الطهر দ্বারা বুঝা যায়; নিফাসের নিম্নতম কোন সময়সীমা নেই। সিরাজিয়া নামক ফাতওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এক ঘণ্টা রক্ত বের হলেও তাকে নিফাস বলা হবে।

তবে নিফাসের সর্ব উর্ধ্ব সময়সীমা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে ৬০ দিন। তাদের দলীল হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীস– عن ربيعة انه قال ادركتِ الناسَ يقولُون اكثرُ مَا تَنْفَسُ المرأةُ سِتُّون يومًا –

২. ইমাম মালেক (র) এর মতে ৭০ দিন।

৩. ইমাম আবু হানীফা ও জুমহুরের অভিমত হলো ৪০ দিন। এ সীমার ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেয়ীদের ইজমাও রয়েছে, তাদের দলীল হচ্ছে

عن امّ سلمةَ قالت اِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ للنّساءِ اربعينَ يومًا –

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

১. ইমাম মালেক (র) এর মত, এ দলীলবিহীন দাবী, তাই গ্রহণযোগ্য নয়।

২. ইমাম শাফেয়ী ও মালেকী (র) ربيعة এর যে উক্তি নকল করেছেন তা সহীহ হাদীসের মোকাবিলায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। (শরহে নাসায়ী : ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৪১)

হায়েজ নিফাস ও ইস্তিহাযাগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যকার পার্থক্য ঃ

হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নামায পড়তে হবে না এবং পরবর্তীতে এর কাযাও আদায় করতে হবে না। যেমন হাদীসে এসেছে– قال صلى الله عليه وسلم تَقْضِى الحائضُ الصومَ ولاتَقْضِى الصَّلاةَ .

নবী (স) বলেন, হায়েযগ্রস্ত মহিলা রোযার কাযা করবে, নামাযের কাযা করবে না।

٢. اَلَيْسَ اذا حاضتْ لم تُصَلِّ ولَمْ تَصُمْ قلنَ بلى قال فذلك مِن نُقصانِ دِيْنِها

হায়েয ও নিফাস অবস্থায় রোযা না রেখে পরে এর কাযা করতে হবে। যেমন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন,

فنُؤمَرُ بقضاءِ الصّوم لا بقضاءِ الصَّلاةِ .

ইস্তিহাযা বা রোগজনিত রক্ত হলে নামায ছাড়া যাবে না। প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্যে নতুন করে অযূ করে নামায পড়তে হবে। কেননা, এটা শরয়ী অপারগতা নয়। তাই রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন–

تتوضأ المستحاضة لكل صلاة (শরহে নাসায়ী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৪২)

سوال : ما معنَى الحيضِ والْاِسْتِحاضةِ لغةً وشرعًا؟ اكتُبْ معَ بيانِ حُكمِهما .

প্রশ্ন ঃ হায়েয ও ইস্তিহাযার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা কি? তার হুকুমসহ লেখ?

উত্তর ঃ حيض এর আভিধানিক অর্থ ঃ حيض শব্দটি باب ضرب এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ– ১. السَّيلان বা প্রবাহিত হওয়া, ২. خروجُ الدمِ مِنَ الفرجِ তথা যৌনাঙ্গ থেকে রক্ত নির্গত হওয়া, ৩. ঋতুস্রাব, মাসিক।

حيض **-এর পারিভাষিক অর্থঃ**

هو ما تَراه المرءةُ اَقَلَّ مِن ثلثةِ ايامٍ او اكثرَ مِن عَشرة ايامٍ او زادَ علىٰ اربعين فى النِّفاس .

মহিলারা তিন দিনের চেয়ে কম এবং দশ দিনের চেয়ে বেশি সময় অথবা নিফাসের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিনের বেশি সময় যে রক্তস্রাব লক্ষ্য করে তাকে استحاضة বলে।

حيض-এর হুকুম ঃ

১. হায়েয অবস্থায় নামায বৈধ নয়, বরং নামায ছেড়ে দেবে এবং পরেও তার কাযা আদায় করা লাগবে না।

২. حيض অবস্থায় রোযা রাখা হারাম, পরে তার কাযা আদায় করতে হবে। এর মূল ভিত্তি হলো হায়েয এটা وجوب الصلوة এবং صِحَّة اداء الصلوة তথা নামায আদায় করা সহীহ হওয়া, উভয়ের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে রোযার نفس وجوب তখনো বহাল থাকে। শুধুমাত্র صِحَّة اداء الصوم তথা রোযা আদায় করাকে নিষেধ করে। তাই পরবর্তীতে তার কাযা আদায় করতে হবে।

৩. মসজিদ ও বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করা হারাম, এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করাও নিষিদ্ধ।

৪. যৌনমিলন নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে রান থেকে যৌনোপকার হাসিল করাও নিষিদ্ধ: তবে চুমু বৈধ। অনুরূপভাবে স্পর্শ ও করা বৈধ। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যে, লজ্জাস্থান ব্যতীত সবটাই হালাল।

৫. কুরআন তেলাওয়াত করা ও বৈধ নয়।

দলীল ঃ যেমন কুরআনের আয়াত ও হাদীস–

وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ، وَلَاتَقْرَءُ الحيض والجنب شيئًا مِن القراٰن

৬. গেলাফ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা হারাম। যেমন– لايمسه الا المطهرون

ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলার বিধান ঃ ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলার বিধান হায়েযগ্রস্ত মহিলা থেকে ব্যতিক্রম। কাজেই ইস্তিহাযা মহিলার জন্য নামায, রোযা ও সহবাস নিষেধ নয়, বরং সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য নতুনভাবে উযূ করে নিবে এবং এ অযূ দ্বারা যত ইচ্ছা ফরয ও নফল আদায় করবে। ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে সে প্রত্যেক ফরয নামাযের জন্য সময় হলে উযূ করবে। আর এই উযূ দ্বারা শুধু এক ওয়াক্তের ফরয নামায আদায় করতে পারবে, তবে নফল নামায যত ইচ্ছা আদায় করতে পারবে।

দলীল ঃ রাসূল (স) ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশকে বলেছেন– توضى لكلِّ صلوة حتّٰى يجيئ لكَ الوقتُ তুমি প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করবে। আহনাফের মতে ইস্তিহাযাগ্রস্থ প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের সময় অযূ করবে এবং এর দ্বারা যত ইচ্ছা নামায আদায় করবে।

আহনাফের দলীল ঃ

المُسْتَحاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوقتِ كلِّ صلوةٍ এই আয়াত ও হাদীসে আল্লাহর বাণী– اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ ل অক্ষরটি পুরো সময়কে বুঝানোর জন্য এসেছে। ওরফেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন–

اتيتُكَ لِصلوٰة الظُهرِ

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীলের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্লেষণের সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে আমরা এটাকে মুহকাম এর উপর প্রয়োগ করব। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ এর মতে ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে অযূ ভেঙ্গে যাবে, চাই নতুন ওয়াক্ত শুরু হোক বা না হোক। ইমাম যুফারের মতে, ওয়াক্ত আসা এবং শেষ হয়ে যাওয়া অযূ ভঙ্গের কারণ। আবু ইউসুফের মতে সর্বশেষ ওয়াক্তের আগমন অযূ ভঙ্গের কারণ। (শরহে তিরমিযী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৩১)

سوال : هل يجوزُ إتيانُ الحائضِ بالوَطيِ ام لَا؟ وما هو كفّارتُه؟

প্রশ্ন ঃ হায়েয অবস্থায় কি যৌন মিলন জায়েয ? এ অবস্থায় যৌন মিলন করলে তার কাফফারা কী?

উত্তর ঃ ঋতুবর্তী মহিলার সাথে সহবাস ঃ ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশার অবস্থা তিনটি।

ক. استمتاع بالجماع বা সঙ্গমের মাধ্যমে ফায়দা নেয়া।

খ. المُباشرة فيما فوقَ السُّرّة وتحتَ الرُكبة বা নাভির উপরে ও হাঁটুর নিচে মেলামেশার দ্বারা ফায়দা নেয়া।

গ. المباشرة فيما بين السرة الى الركبة فى غير القبل والدبر অর্থাৎ নাভির নিচে থেকে নিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত যৌনাঙ্গ এবং গুহ্যদ্বার ব্যতীত মেলামেশা করা।

প্রথম প্রকারের বিধান ঃ প্রথম প্রকার সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম, কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

অর্থাৎ আর তারা তোমার কাছে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এটা অশুচি, কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়।

২. وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

তোমরা হায়েযা মহিলাদের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়।

৩. عن انسٍ (رض) قالَ قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم اِصْنَعُوا كلّ شيئٍ اِلاّ النِّكَاحَ ـ

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে (হায়েয অবস্থায়) সহবাস ব্যতীত সবকিছু কর। ইমাম নববী (র) বলেন, হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন হারাম। এটাকে যে হালাল মনে করবে, সে কাফির। তবে হানাফীরা কুফুরীর ফতোয়া দেন না।

দ্বিতীয় সুরতের বিধান ঃ দ্বিতীয় প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে হালাল। এই মেলামেশা চাই পুরুষাঙ্গ দ্বারা হোক কিংবা চুমুর দ্বারা হোক অথবা স্পর্শ-আলিঙ্গন দ্বারা হোক এবং চাই কাপড়ের উপর দিয়ে হোক কিংবা কাপড় ছাড়া হোক সর্বাবস্থা জায়েয আছে।

সঙ্গম ছাড়া কাপড়ের উপর দিয়ে উপভোগ জায়েয। যেমন–

عن ميمونةَ قالت كانَ رسولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فوقَ الازارِ وهُنَّ حيضٌ (مسلم)

হযরত মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) হায়েয অবস্থায় তার স্ত্রীদের সাথে কাপড়ের উপর দিয়ে উপভোগ করতেন। কাপড়ের উপর দিয়ে উপভোগ করতে গেলে চরম মুহূর্তে সহবাসের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকা আছে বিধায় তা থেকে ও দূরে থাকাই উত্তম। যেমন–

عن مُعَاذ بن جَبَلٍ (رض) قال يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ما يَحِلُّ لِىْ مِنْ امرأتى وهى حَائِضَة قال مَا فوقَ الازارِ والتَّعَفُّفُ عَنْ ذٰلك اَفْضَلُ ـ

এর দ্বারা বুঝা যায় কাপড়ের উপর দিয়ে উপভোগ করা বৈধ। কিন্তু যেহেতু এর দ্বারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে গোণাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই এ থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

তৃতীয় অবস্থার বিধান ঃ তৃতীয় প্রকারটি হালাল কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক, আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী ও মুজাহিদ (র) এর মতে, কোন প্রকার কাপড় ছাড়াই নাভির নিচ থেকে নিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত যৌনাঙ্গ ও গুহ্যদ্বার ব্যতীত ফায়দা নেয়া জায়েয আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত আছে।

২. ইমাম আবু হানীফা (র), মালিক, শাফেয়ী, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, তাউস, আতা ও কাতাদা (র) প্রমূখের মতে, কোন প্রকার কাপড়ের অন্তরাল ছাড়া নাভির নিচ থেকে নিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত কোন স্থান থেকেই কোন প্রকার ফায়দা নেয়া জায়েয নেয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর একটি অভিমতও অনুরূপ।

ইমাম আহমদ (র) এর দলীল ঃ-১

عن انس بن مالكٍ رض قال اِنَّ اليهودَ كانتْ اذا حاضتْ منهم المرأةُ اَخْرَجُوْهَا مِن البَيْتِ ـ فقالَ رسولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم جَامِعُوهُنَّ فِى البُيُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شيئٍ غيرَ النِّكاحِ .... الخ ـ

অর্থাৎ.... আনাস ইবনে মালিক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীদের অবস্থা এই যে, তারা ঋতুবতী স্ত্রীদের সাথে ঋতুকালীন সময়ে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিত, অতঃপর রাসূল (স) বলেন তোমরা তাদেরকে নিয়ে একত্রে এক ঘরে বসবাস কর এবং সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই করতে পার। (আবু দাউদ: ১/৩৪, মুসলিমঃ ১/১৪৩, নাসায়ী ঃ ১/৫৫, ইবনে মাজাহ ঃ ৪৮)

এ হাদীসে আমভাবে বলা হয়েছে যে, শুধু সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই জায়েয। সুতরাং কাপড় দ্বারা অন্তরাল থাকতে হবে এমন কোন শর্তারোপ করা হয়নি। অতএব, কাপড় না থাকা অবস্থায়ও রান থেকে ফায়দা নেয়া জায়েয হবে।

দলীল নং - ২

উমারা ইবনে গুয়াব এর ফুফু হযরত আয়িশা (রা) এর নিকট হায়েয অবস্থায় স্বামীর সাথে সহবাসের সঠিক পদ্ধতি কি? তা জানতে চাইলে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

دَخَلَ لَيْلاً وانا حائِضٌ فمضى إلى مَسْجِدِه تعنى مسجدَ بَيْتِه فلم يَنصرفْ حتّى غلبتْنِى عَيْنِى وأوجعَهُ البَرْدُ فقال أدْنِىْ مِنِّى فقلتُ إنّى حائضٌ فقال وإنِ اكشِفِى عَن فَخِذَيكِ فكشفتُ فَخِذِى ووضعَ خدَّه وصدرَهُ على فخِذِى وحنيتُ عليه حتّى دفئَ ونامَ۔

অর্থাৎ... একদা রাতে নবী করীম (স) আমার ঘরে প্রবেশ করেন। তখন আমি ঋতুবর্তী ছিলাম। তিনি মসজিদে নববীতে যান। অতঃপর আমি ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তিনি শীতে কাতর অবস্থায় ফিরে আসেন। তিনি আমাকে বলেন, আমার নিকট এসো। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবর্তী। নবী করীম (স) বলেন, তুমি তোমার উরুদেশ উম্মুক্ত কর। তখন আমার উরুদেশ উম্মুক্ত করি, তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও বক্ষস্থল (গরম হওয়ার জন্য) আমার উরুদেশে স্থাপন করেন এবং আমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়ি। অতঃপর তিনি শীতের তীব্রতা হতে মুক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। (আবু দাউদ : ১/৩৬) এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, নবী করীম (স) নাভি ও হাঁটুর মাঝখানে কাপড়ের অন্তরাল ছাড়াই উম্মুক্ত অবস্থায় ফায়দা নিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তা জায়েয আছে।

তৃতীয় দলীল ঃ পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে যে হুকুম এসেছে, তাতে শুধুমাত্র উপভোগ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জুমহুরদের দলীল ঃ ১

عَنْ حَرام بن حكيم عَنْ عمّه انّه سأل رَسُولَ اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وسلم مايَحِلُّ لِى مِن امرأتى وهى حائِض قال لك مَا فوقَ الإزار وذكر مواكلة الحائِض ايضًا ۔

অর্থাৎ .... হারাম ইবন হাকীম থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত, তিনি (চাচা) রাসূলুল্লাহ (স) কে জিজ্ঞাসা করেন, আমার স্ত্রী যখন ঋতুবর্তী হয়, তখন সে আমার জন্য কতটুকু হালাল। তিনি (স) বলেন, তুমি কাপড়ের উপর দিয়ে যা কিছু করতে পার এবং ঋতুবর্তী স্ত্রীলোকের সাথে খানাপিনার বৈধতা সম্পর্কেও আলোচনা করলেন।

দলীল –২

عن مُعاذ بن جَبل قال سألتُ رَسُولَ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم عمّا يَحِلُّ لِلرَّجُل مِن امرأته وهى حائِض فقال ما فوقَ الإزار والتَّعفّفُ عَن ذلك أفْضَل ۔

অর্থাৎ মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে জিজ্ঞাসা করি যে, ঋতুবর্তী অবস্থায় স্ত্রীলোক পুরুষের জন্য কতটুকু হালাল তিনি বলেন, কাপড়ের উপর যতটুকু সম্ভব। তবে এটা থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম। (আবু দাউদ ঃ ১/২৮)

তৃতীয় দলীল ঃ

عَنْ عائِشة قالت كانَ رَسولُ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يَأمُرُ احدُنا اذا كانتْ حائضًا أن تَتّزِرَ ثم يُضاجِعُها زوجُها وقالت مرّة يُباشِرُها ۔

অর্থাৎ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাদের কেউ ঋতুবর্তী হলে তাকে পাজামা পরিধানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে একত্রে শয়ন করতেন। অন্য এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তিনি (স) কখনো কখনো তার সাথে রাত যাপন করতেন। (বুখারী ১/৪৪, মুসলিম : ১/১৪১, তিরমিযী ১/৩২, নাসায়ী ১/৫৪)

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ সহ আরো এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যেখানে পাজামা পরার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পাজামার উপর দিয়ে ফায়দা উঠানোর অনুমতি দিয়েছেন। যদি পাজামার নিচ দিয়ে ফায়দা উঠানো জায়েয হত, তাহলে কাপড় বাঁধার নির্দেশ দিতেন না, এতে বুঝা যায় যে, পাজামার নিচ দিয়ে ফায়দা উঠানো জায়েয নয়।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের দলীলের একটি সঠিক জবাব হলো প্রতিপক্ষের দলীলসমূহ হালাল বা জায়েয সংক্রান্ত। আর আমাদের দলীলসমূহ হারাম সংক্রান্ত। আর ফিকহের একটি মূলনীতি হলো, যখন একই বিষয়ে হালাল ও হারামে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন হারাম সংক্রান্ত দলীলসমূহ প্রাধান্য পাবে।

প্রথম দলীলের জবাব ঃ হযরত আনাস (রা) এর হাদীসে যে نكاح শব্দটি বর্ণিত হয়েছে এর দ্বারা শুধু সহবাস উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা সহবাস ও সহবাসের দিকে আকৃষ্টকারী বিষয় (دواعى وطى) উদ্দেশ্য। **প্রকৃতপক্ষে যে জিনিস হারাম তার আনুষঙ্গিক বিষয়ও হারাম।**

২. নবী করীম (স) নিকাহ বলে ইঙ্গিতে পাজামার নিচের কার্যাদিকে বুঝিয়েছেন।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব ঃ ১. উক্ত হাদীসে আব্দুর রহমান ইবন যিয়াদ নামক একজন রাবী রয়েছেন, যাকে ইয়াহইয়া ইবন মুঈন, ইমাম আহমদ, আবু যুরআ ও ইমাম তিরমিযী (র) সহ অনেকেই যঈফ বলেছেন। সুতরাং তার বর্ণিত হাদীস দলীলযোগ্য হতে পারে না। (বজলুল মাজহুদ ঃ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৬১)

২. অথবা এটি ছিল নবী করীম (স) এর জন্য খাস, যা অন্যের জন্য জায়েয নয়। কারণ নবী করীম (স) এর স্বীয় নফস পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে ছিল যা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। হযরত আয়েশা (রা) নিজেই বলেন–

..... أَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلّم يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কামোন্মাদনা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে কি? যেরূপ রাসূল (স)-এর ছিল (আবু দাউদ ঃ ১/৩৬, মুসলিম : ১/১৪১)

তৃতীয় দলীলের জবাব ঃ উক্ত আয়াতে فَاعْتَزِلُوا বলে সঙ্গম নিষেধ করা হয়েছে। আর وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ (তাদের নিকটবর্তী হয়ো না) বলে পাজামার নিচে যে সহবাসের কামোদ্দীপক কাজ থেকে পরহেয করতে বলা হয়েছে।

سوال : مَاهِى عَلَامَةُ دمِ الحَيْضِ وَالْاِسْتِحاضَةِ؟ هَل يَجِبُ غسلُ دَمِ الحَائِض فِى كُلِّ حالٍ.

প্রশ্ন ঃ হায়েয ও ইস্তিহাযার রক্তের নিদর্শন কী? হায়েযের রক্ত প্রত্যেক বার ধৌত করা কি ওয়াজিব?

উত্তর ঃ হায়েয ও ইস্তিহাযার রক্তের নিদর্শন ঃ হায়েয ও ইস্তিহাযার রক্ত নিরূপনে ইমামদের মতামত–

১. ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে, হায়েযের রক্ত কালো ও লাল রঙ্গের হয়। এছাড়া অন্য কোন রঙের হলে তা ইস্তিহাযার রক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে, তাঁর দলীল হচ্ছে উরওয়া (র) এর নিম্নোক্ত হাদীস–

انّه صلى اللّٰه عليه وسلم قَالَ اِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ فَانّه دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ.

২. ইমাম আবু হানীফা, ও ইমাম আহমদের মতে, এ ক্ষেত্রে রঙের কোন গুরুত্ব নেই। উভয়টির রং কালো, লাল, ধূসর, হলুদ ধরণের হতে পারে। তাই রঙের কোন ধর্তব্য হবে না ; বরং অভ্যাসের ধর্তব্য হবে। হায়েযের অভ্যাসের বাইরে যে রক্ত বের হয়, তাই ইস্তিহাযার রক্ত।

لِحَدِيثِ امّ سلمةَ انّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِتَنْظُر عِدَّةَ اللَّيالى والايام التى كانت تحيضهن مِنَ الشَّهرِ قَبلَ انْ يُصِيْبَهَا الّذى اصابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصلاةَ قدرَ ذلك مِنَ الشهرِ.

তাদের মতে, সাধারণত ইস্তিহাযার রক্ত ছয় প্রকার–

১. তিন দিনের কম যে রক্ত বের হয়।

২. দশ দিনের অধিক যে রক্ত বের হয়।

৩.সাবালিকা হওয়ার আগে যে রক্ত বের হয়।

৪. গর্ভবতীর ঋতুস্রাব।

৫. অতি বয়স্কার ঋতুস্রাব।

৬. প্রসূতি নারীর ৪০ দিনের উর্ধ্বে যে রক্তস্রাব হয়।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ

১. ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র) এর দলীলের জবাবে বলা যায় তাঁদের উদ্ধৃত হাদীসটি মুনকার হাদীস।

২. ইমাম [illegible]কী বলেন, এ হাদীসের মধ্যে ইযতিরাব রয়েছে (শরহে নাসায়ী: ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৪৬)

হায়েযের রক্ত ধৌত করার হুকুম ঃ কাপড়ে লেগে যাওয়া হায়েযের রক্ত ধৌত করার হুকুম, ইমামদের মতভেদসহ নিম্নে পেশ করা হলো–

১. ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে রক্ত বেশী হোক বা কম হোক, সর্বাবস্থায় তা ধৌত করা ওয়াজিব, ধৌত করা ব্যতীত ঐ কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করলে নামায সহীহ হবে না। যেমন– হাদীসে ইরশাদ হয়েছে।

قَالَ رَسولُ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلم اِذَا اصابَ ثوبَ احداكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقْرِصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثم لِتُصَلِّ فيه.

২. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ ও সুফিয়ান সাওরীর মতে, রক্ত সামান্য হলে ধৌত করা ওয়াজিব নয়; বরং ধৌত করা মুস্তাহাব। আর রক্ত বেশী হলে ধৌত করা ওয়াজিব। পরিসরে এক দিরহাম পরিমাণ হলে, তাকে কম এবং এক দিরহামের চেয়ে অধিক হলে তাকে বেশী ধরা হবে।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র) এর দীললের জবাবে বলা যায়, তাতে অধিক রক্তের কথা বলা হয়েছে। কেননা, আসমা বিনতে আবু বকর (রা) অধিক হায়েযা ছিলেন। অপরদিকে অল্প রক্ত সম্পর্কে সাধারণত প্রশ্ন হয় না। (শরহে নাসায়ী : ১/২৪৭)

سوال : ما هُوَ العِرْف؟ وما المُرادُ بِقولِهِ صلّى الله عليه وسلم إنّ ذٰلك عِرقٌ؟ ثم اكتُبْ أسْماءَ النِّساءِ اللّاتى ذكر أنّهُنَّ أُستُحِضنَ عَلى عَهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مَعَ ذكرِ عَدَدِهِنّ

প্রশ্ন ঃ عرق কি? রাসূল (স) এর বাণী ان ذلك عرق দ্বারা উদ্দেশ্য কি? অতঃপর যে সব নারী রাসূল (স) এর যুগে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদের নাম ও সংখ্যা লিখ।

উত্তর ঃ عرق এর সংজ্ঞা ঃ শব্দটি একবচন, বহুবচনে عروق ও اعراق - অর্থ রগ, وهُو فِى خَارِجِ الرَّحْمِ ويُقَال عاذل অর্থাৎ এ রগটি জরায়ুর বাইরে থাকে। আরবী ভাষায় একে عاذل বলা হয়।

রাসূলের বাণী– ان ذلك عرق এর ব্যাখ্যা ঃ রাসূল (স) এর উক্তি–

ان ذلك عرق এর অর্থ হচ্ছে এটা জরায়ুর বাইরের রগ থেকে নির্গত রক্ত। হায়েযের রক্ত নয়। কেননা, হায়েযের রক্ত বের হয় জরায়ুর ভেতর থেকে। ইস্তিহাযার রক্ত হচ্ছে রোগ জনিত রক্ত। এটা কোন শরয়ী ওযর নয়। তাই এ সময় নামায পড়বে, রোযা রাখবে এবং সহবাস করতে পারবে। রাসূল (স) এর উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, হায়েয ও ইস্তিহাযার উৎসস্থল দুটি ১. عرق ২. رحم যেমন– অন্য হাদীসে এসেছে।

فانما ذٰلك رِكْضَة مِن الشيطان او عرق انْقَطَعَ او داءٌ عَرَضَ لَها

তবে হায়েযের উৎসস্থল একটি, আর তা হচ্ছে رحم যখন رحم থেকে স্বাভাবিকভাবে রক্ত প্রবাহিত হয়, তখন তাকে হায়েয বলা হয়। আর যখন রোগ-ব্যাধির কারণে رحم থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় তখন তাকে ইস্তিহাযা বলা হয়। তাই ডাক্তারদের অভিমত মিথ্যা নয়, আবার হাদীসের সাথে এর কোন বিরোধ নেই। (শরহে নাসায়ী ১/ ২৪২-২৪৩)

রাসূল (স) এর যুগের ইস্তিহাযাগ্রস্ত রমনীদের নাম ঃ রাসূল (স) এর যুগে সে সব নারীর অধিক রক্তস্রাব হতো, তাদের সংখ্যা এগারো জন।

১. হামনা বিনতে জাহাশ
২. যয়নাব বিনতে জাহাশ
৩. সাওদা বিনতে খাযআ।
৪. ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ
৫. উম্মে হাবীবা বিনতে জাহাশ
৬. আসমা বিনতে হারিসিয়্যাহ
৭. সাহাল বিনতে সুহাইল,
৮. আসমা (রা) (মায়মুনা (রা) এর বোন)
৯. কাদিয়া বিনতে গাইলান
১০. যয়নাব বিনতে আবি সালমা
১১. যয়নব বিনতে খুযাইমা (শরহে ১ম তিরমিযী পৃষ্ঠা নং ৩৩২)

سوال : هَل تَجُوز لِلحَائِض أن تَقْرَءِ القرانَ؟ ومَا هو الخِلافُ فيه وما حكمُ المُعَلِّمَةِ الّتى حَاضَتْ اكتُب فِيه الاختِلافَ.

প্রশ্ন ঃ হায়েয অবস্থায় কি কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয আছে? এ ব্যাপারে কি মতভেদ রয়েছে? হায়েযা মহিলার কুরআন পড়ানোর হুকুম কি মতভেদসহ লিখ।

উত্তর ঃ হায়েয অবস্থায় কুরআন পাঠের বিধান ঃ ঋতুবর্তী নারীর জন্যে কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয আছে কি না, এ ব্যাপারে আলিমগনের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। নিম্নে দলীলসহকারে তা উল্লেখ করা হলো :

১. ইমাম বুখারী, দাউদে জাহেরী ও ইবনে মুনযির (র) এর মতে, হায়েয অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয। তারা নিম্নোক্ত হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করেন–

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِه

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় জুনুবী অবস্থায়ও যিকির করতেন, যদি জুনুবী অবস্থায় যিকির জায়েয হয়, তাহলে হায়েয অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত জায়েয হবে না কেন? কুরআন তেলাওয়াত তো যিকির বরং আরো উত্তম যিকির।

২. ইমাম আবু হানীফা শাফেয়ী, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে মুবারক ও অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীদের মতে ঋতুবর্তীর জন্যে কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয নেই, তবে আয়াতের একটি অংশ বা হরফ কিংবা অনুরূপ খণ্ড খণ্ড করে পড়তে পারবে। স্বাভাবিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবে না। তবে তাদের জন্যে তাসবীহ তাহলীল করা জায়েয আছে।

হানাফীগণ আর একটু অগ্রসর হয়ে বলেন, দোয়া বিশিষ্ট আয়াতগুলো কেবলমাত্র বরকত ও দোয়ার উদ্দেশ্যে পড়া জায়েয। তবে সূরা ফাতিহা দোয়া হিসাবে পড়া যাবে না। (শরহে মুহাজ্জাব দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৫৮)

দলীল ঃ তাদের দলীল হচ্ছে রাসূলের বাণী–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ لَا يَقْرَءُ الْحَائِضُ ولا الْجُنُبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ ـ

* **ইমাম মালেক থেকে এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়– একটি জায়েযের পক্ষে। অপরটি নাজায়েযের পক্ষে।**

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ তাদের পেশকৃত হাদীসের জবাবে বলা যায়, তা দ্বারা ذكر قلبى বা। اذكار متواردة উদ্দেশ্য। কাজেই হায়েয কে তার উপর কিয়াস করা সহীহ হবে না। এখানে উল্লেখ্য–

১. এক আয়াতের কম তিলাওয়াত করা জায়েয।

২. ইমাম নববী (র) বলেন, যে কোন কাজ শুরুর আগে বিসমিল্লাহ পড়া জায়েয।

৩. হানাফীদের মতে দোয়া ও বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে মুখস্থ আয়াত তেলাওয়াত করা জায়েয। তবে তেলাওয়াতের ইচ্ছা করা জায়েয নেই।

শিক্ষিকা মহিলার কুরআন পড়ানোর হুকুম ঃ

হায়েযা মহিলা শিক্ষিকার জন্য এক এক শব্দ করে কুরআন মজীদ পড়ানো জায়েয আছে। তবে দুই শব্দের মধ্যে কিছু সময় থামবে এটা ইমাম কারখী (র) এর অভিমত। আর ইমাম ত্বহাবী (র) এর মতে, প্রথমে অর্ধেক আয়াত পড়াবে অতঃপর বাকী অর্ধেক আয়াত পড়াবে।

(শরহে নাসায়ী : ১/২৪৫, সিকায়া: ১/১২১-১২২)

سوال : ما الحِكْمَةُ فِى سُقُوطِ الصَّلاةِ عَنِ الحائِضِ وعَدَمِ سُقُوطِها عَنِ المُسْتَحاضَةِ ؟ ونَقْضِ الحَائِضِ الصَّومَ وهِىَ تَصُومُ فِى حَالَةِ الاِسْتِحَاضَةِ وكَيفَ كان بدءُ الحَيْضِ ومَا هِىَ الأقْوالُ فِيهِ .

প্রশ্ন ঃ হায়েয অবস্থায় নামায রহিত করার ও ইস্তিহাযা অবস্থায় রহিত না করার মধ্যে কী রহস্য রয়েছে? অনুরূপভাবে হায়েয অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করার ও ইস্তিহাযা অবস্থায় রোযা রাখার মধ্যে কী রহস্য রয়েছে, কিভাবে হায়েয আরম্ভ হয়? এ ব্যাপারে মতামত কী?

উত্তর ঃ ঋতুবর্তী নারীর জন্যে নামায রহিত হওয়ার বিধান ঃ ইসলামী শরীয়তে ঈমানের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো নামায। এটা এমন একটা সর্বজনীন ও স্থায়ী ফরয যা সারা জীবনব্যাপী পালন করতে হয়। এটা ছাড়া ইসলামের অন্যান্য বিধান এবং রুকনসমূহ এ রকম নয়; যেমন, রোযা বছরে মাত্র একমাস ফরয। হজ্জ জীবনে একবার ও যাকাত বছরে একবার ফরয। তাও ধনীদের জন্যে। সুতরাং বুঝা গেল, নামায-ই একমাত্র রুকন, যা সারা বছর এমনকি দৈনিক পাঁচ বার করে আদায় করতে হয়। এ ক্ষেত্রে সুস্থ-অসুস্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু হায়েয অবস্থায় যেহেতু আল্লাহ নিজেই মহিলাদের জন্যে নামায ক্ষমা করে দিয়েছেন যা সাধারণ কিয়াসের বিপরীত। সুতরাং এ হুকুমটি এ বিষয়ের মধ্যে সীমিত থাকবে। অন্যের সাথে তুলনা করা যাবে না। এতদ্ব্যতীত ইস্তিহাযা রোগে

আক্রান্ত এমন অনেক মহিলা রয়েছে, যারা বালেগ হওয়া থেকেই ইস্তিহাযা রোগে আক্রান্ত। এখন যদি এমন মহিলার জন্যে নামায মাফ হয়ে যায় তাহলে তার জন্যে সারা জীবনে ইসলামের অন্যতম রুকন আদায়ের সুযোগ থাকে না, তাই ইস্তিহাযাগ্রস্ত রমনীর জন্যে নামায মাফ করা হয়নি।

পক্ষান্তরে, ঋতুবর্তী রমনী রোযা কাযা করবে, অথচ ইস্তিহাযা আক্রান্ত রমনীকে রোযা পালন করতে হবে এর পেছনেও একই কারণ রয়েছে। কেননা, কেউ যদি সারা জীবনেও ইস্তিহাযার রোগ থেকে মুক্ত না হয়। তাহলে সে তো আর রোযা আদায়ের সুযোগ পাবে না। তাই ইস্তিহাযাগ্রস্ত রমনীকে রোযা পালন করার, আর ঋতুবর্তীদেরকে রোযা কাযা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (শরহে নাসায়ী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৫৬)

হায়েয সূচনার ইতিবৃত্ত : হায়েয হওয়ার ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন–

১. হায়েয হযরত হাওয়া (আ) থেকে এর সূচনা হয়। যেমন– রাসূল (স) আয়েশা (রা)কে লক্ষ্য করে বলেছেন–
اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ

২. মোল্লা আলী ক্বারী (র-এর মতে হাওয়া (আ) যখন গন্দম গাছের ডাল ভাঙলেন এবং গাছ থেকে রস ও পানি বের হতে লাগলো, তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, لَاُدْمِيَنَّكِ كَمَا اَدْمَيْتِهَا অর্থাৎ গাছটিকে যেভাবে রক্তাক্ত করেছ আমিও তোমাকে অনুরূপ রক্তাক্ত করে দেবো, এরপর তার হায়েয প্রকাশ পায়–

৩. কেউ কেউ বলেন, كَانَ اَوَّلُ مَا اُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

অর্থাৎ সর্বপ্রথম বনী ইসরাঈলের রমনীদের মধ্যে হায়েয আরম্ভ হয়।

৪. কেউ কেউ বলেন, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ফলে শাস্তিস্বরূপ হাওয়া (আ) এর হায়েয আরম্ভ হয়। আর পুরুষের গলার হাড় উচুঁ হয়। (শরহে নাসায়ী : ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৫২)

سوال : كم قِسمًا لِلمُستَحاضَة وما هِى وفاطمةُ مِنْ اَىِّ قسمٍ؟ فَصِّل مع بَيانِ حكمِ كلِّ قسمٍ مُدَلَّلا . ومتى يُعَدُّ الدمُ إستِحاضَة .

প্রশ্ন ঃ ইস্তিহাযা কত প্রকার? এবং সেগুলো কি কি? ফাতেমা কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত দলীল সহকারে প্রত্যেক প্রকারের হুকুম বর্ণনা কর? কখন রক্তস্রাব ইস্তিহাযা বলে গণ্য হয়ে থাকে?

উত্তর ঃ ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারী তিন প্রকার। যথা–

১. الْمُبْتَدِئَة ২. الْمُعْتَادَة ৩. الْمُتَحَيِّرَة

১. الْمُسْتَحَاضَة الْمُبْتَدِئَة ঃ জীবনের সর্বপ্রথম হায়েয শুধু হওয়ার পর থেকেই যে নারীর রক্তের প্রবাহ অনবরত চালু রয়ে গেছে। তাকে مستحاضة المبتدئة বলা হয়।

مبتدئة **এর বিধান ঃ** ঐ নারী প্রথম ১০ দিনকে হায়েয হিসেবে ধরবে এবং তার পরবর্তী দিনগুলোর রক্তকে ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য করবে। অতঃপর গোসল করে পবিত্র হয়ে নামায পড়বে এবং রোয্যা রাখবে। মুবতাদিয়ার জন্য প্রতি মাসে দশদিন হায়েয এবং বিশ দিন তুহুর ধরা হবে।

২. المستحاضة المعتادة ঃ ঐ নারী যার হায়েয প্রথমে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পরে তা অনবরত হয়ে গেছে। এ ধরণের নারীকে مستحاضة المعتادة বলা হয়।

* ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ (স) বলেন, যে মহিলার দুই বা তার অধিকবার নিয়ম তান্ত্রিকভাবে হায়েয হওয়ার পর রক্তপ্রবাহ শুরু হয়েছে তাকে مستحاضة বলে। আর ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, নিয়মতান্ত্রিকভাবে একবার হায়েয হলেও হলোবে, তবে তরফাইনের মতের উপরেই ফাতওয়া।

معتادة **এর বিধান ঃ** যদি পূর্ব অভ্যাস ১০ দিনের চেয়ে কম হয় তাহলে ১০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি ১০ দিনের ভিতরে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সমুদয় রক্ত হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি ১০ দিনের পরেও রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলে ধরা হবে পূর্বের অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে গেছে। কাজেই পূর্বের অভ্যাসগত দিনগুলোকে হায়েয এবং পরবর্তী দিনগুলোকে ইস্তিহাযা ধরা হবে। (বা ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য করা হবে)

৩. المستحاضة المتحيرة ঃ যে নারীর হায়েয প্রথমে স্বাভাবিক ই ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অবিরাম রক্ত চালু হওয়ায় পূর্ব অভ্যাসগত নির্দিষ্ট সময় ভুলে গেছে। অথবা, হায়েযের দিনের সংখ্যা অথবা উভয়টা ভুলে গেছে, তাকে

مستحاضة متحيرة বলা হয়। এধরনের নারী আবার তিন প্রকার। যেমন–

ক. متحيرة بالعدد ঃ যে নারী পূর্ব অভ্যাসগত হায়েযের দিনের সংখ্যা ভুলে গেছে। কিন্তু সে তার হায়েয শুরু হওয়ার তারিখ ভুলেনি–

হুকুম ঃ এ ধরণের নারীরা প্রথম তিন দিনকে হায়েয হিসেবে গণ্য করবে এবং পরবর্তী ৭ দিন প্রত্যেক নামাযের জন্যে গোসল করবে। অতঃপর মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্যে অযূ করবে।

খ. متحيرة بالوقت ঃ যে নারীর মাসের প্রথম দিকে হায়েয হতো না- কি শেষ দিকে হায়েয হতো- তা ভুলে গেছে। এ ধরনের নারীরা প্রথম ৫ দিন নতুন করে অযূ করে নামায আদায় করবে। এরপর ২৫ দিন প্রত্যেক নামাযের জন্যে গোসল করবে।

গ. متحيرة بالعدد والوقت ঃ যে নারী দিন, সংখ্যা ও সময়কাল সব কিছুই ভুলে গেছে, এ ধরণের নারীরা প্রতি মাসে তিন দিন অযূ করে নামায আদায় করবে। বাকী ২৭ দিন প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্যে গোসল করবে। উপরোল্লিখিত তিন প্রকার ছাড়া আরো এক প্রকার ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর কথা কেউ কেউ বলেছেন এর বর্ণনা নিম্নরূপ–

المستحاضة المميزة : যে নারী রক্তের রং দেখেই বুঝতে পারে। তা হায়েযের রক্ত না কি ইস্তিহাযার রক্ত।

مميزة **এর বিধান ঃ** ইমাম শাফেয়ী (র) ও ইমাম মালেক (র) এর মতে, এ ধরণের মহিলারা রক্তের পার্থক্য অনুসারে কাজ করবে। সুতরাং যত দিন কালচে রঙের রক্ত দেখে ততদিনকে হায়েযের সময়রূপে গণ্য করবে। অন্যথায় নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আহমদ (র) এর মতে ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা রঙের পার্থক্য করতে সক্ষম হোক বা না হোক, সে তার পূর্ববর্তী নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে?

শাফেয়ীদের দলীল ঃ আবু হুবাইশের বর্ণনা–

إِنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فقال لَهُ النبيُّ صلى الله عليه اذا كانَ دمُ الحَيْضِ فانّه دمٌ اسودُ يُعْرَفُ فاذا كان ذٰلك فَأَمْسِكِي عَنِ الصلوٰة فاذا كان الأٰخرُ فتوضَّئِي وصَلِّي فانما هُوَ عرق ـ

তিনি সর্বদা ইস্তিহাযা অবস্থায় থাকতেন। অতঃপর নবী করীম (স) তাকে বললেন, যখন হায়েযের রক্ত হয় তখন তা কালো রঙের রক্ত চেনা যায়। অতএব, যখন এরূপ রক্ত হবে তখন তুমি নামায হতে বিরত থাকবে। আর এটা ব্যতীত যখন অন্যরূপ রক্ত হবে তখন [প্রত্যেক ওয়াক্তে] অযূ করে নামায পড়তে থাকবে, কেননা এটা শিরা বিশেষের রক্ত। আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) তাকে রক্তের রং দেখে হায়েয ও ইস্তিহাযার মাঝে পার্থক্য করে তার উপর আমল করার জন্য বলেছেন, এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রক্তের মাধ্যমেই হায়েয ইস্তিহাযা নির্ণয় করতে হবে।

হানাফীদের দলীল ঃ

عَنْ عائشة (رض) قالتْ جَاءَتْ فاطمةُ بنتِ أَبِى حُبَيْشٍ الى النبىِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ يا رسولَ اللّٰه إِنِّى امرأةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أَطْهُرُ فَادَعُ الصلوٰة فقال لا انّما ذٰلك عرقٌ وليسَ الحيضُ فاذا أَقْبَلَتْ حيضَتُكِ فدَعِى الصلوٰةَ واذا ادبرتْ فاغْسِلِى عنكِ الدمَ ثمّ صَلِّى ـ

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) রাসূল (স) এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন রক্ত স্রাবের রোগীনী মহিলা। আমি তা হতে পবিত্র হইনা। আমি কি নামায ছেড়ে দেব? জবাবে রাসূল (স) বললেন, না। এটি একটি রোগ যা শিরার রক্ত, হায়েয নয়। আর যখন তোমার ঋতুস্রাব দেখা দেবে। তখন তুমি নামায পরিত্যাগ করবে। যখন ঋতুস্রাবের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, তখন তুমি তোমার শরীর হতে রক্ত ধৌত করে ফেলবে অতঃপর নামায আদায় করবে।

আলোচ্য হাদীসে স্পষ্ট হয় যে নবী (স) অভ্যাসের দিনগুলিতে নামায পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেন।

দলীল -২

عن ام سلمةَ (رض) قالت إِنَّ امرأةً كانتْ تهراقُ الدمَ على عهدِ رسولِ اللّٰه صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْ لها امُّ سلمةَ النبىَّ صلى الله عليه وسلم فقال لِتَنْظُرْ عددَ اللَّيَالِى والأَيَّامِ الَّتِى كانتْ تَحِيضُهُن مِنَ الشهرِ قبلَ أَنْ يُصِيبَهَا الذى أَصَابَهَا فلتَتْرُكِ الصلوٰةَ قدرَ ذٰلك مِنَ الشَّهْرِ ـ

অর্থাৎ, হযরত উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) এর জামানায় এক মহিলার ব্যাপারে হযরত উম্মে সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে ফাতওয়া চাইলেন, উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তার এ ব্যাধি হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক মাসে তার যে ক'দিন ঋতুস্রাব হতো সে দিন ও রাতগুলোর সংখ্যা সে হিসাব করে রাখবে এবং প্রত্যেক মাসেই ততোদিন পরিমাণ সময় নামায ত্যাগ করবে। এ হাদীসে একথা স্পষ্ট যে, নবী (স) স্পষ্টরূপে অভ্যাসগত দিনগুলো ধর্তব্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

তৃতীয় দলীল :

كُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ الى عائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فيه الصُّفْرَةُ فتقول لاتَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القُصَّةَ البَيْضَاءَ تُرِيد بذلك الطهرَ مِن الحَيْضَةِ .

চতুর্থ দলীল :

عن عروةَ بْنِ الزُّبَيرِ قال حَدَّثَنِي فاطمةُ بنْتِ ابي حُبَيْشٍ انّها اَمَرَت انْ تَسْئَلَ رسولَ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليه وسلم فامَرَها ان تقعُدَ الايّامَ التِي كانت تقعُدُ ثم تغتسِلُ۔

সুতরাং এ সকল হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অভ্যাস ধর্তব্য হবে। বাকী তারা যে হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েছেন। তার সনদে আপত্তি আছে। ইমাম আবু দাউদের কথা হতে বুঝা যায়। তিনি বলেন আলা ইবনুল মুসয়াব থেকে হাদীসটি বর্ণিত মারফু সূত্রে, আর শু'বা থেকে বর্ণিত মাওকুফ সূত্রে, এভাবে হাদীসটি মুযতারিব। ইমাম বায়হাকী ও হাদীসটির সনদগত ইযতিযরাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আবু হাতেম বলেন, এটা মুনকার। ইবনুল কাত্তান বলেন, এটি মুনকাতে। সুতরাং এটি দলীল হতে পারে না। মোল্লা আলী ক্বারী (র) বলেন, হাদীসটি তখনকার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে যখন রং দেখে পার্থক্য করার বিষয়টি অভ্যাস সম্মত হবে।

سوال : امّ حَبِيْبَةَ مَنْ هِىَ؟ اذكُر ماتَعْلَمُ مِن سِيْرَتِها؟ مَعَ بَيانِ قِصَّةِ امّ حَبِيْبَةَ فِى الإِسْتِحاضَةِ ۔

প্রশ্ন : উম্মে হাবীবা কে? তার জীবনী সম্পর্কে যা জান বর্ণনা কর। উম্মে হাবীবা এর ইস্তিহাযার ঘটনা বর্ণনা কর।

উত্তর : উম্মে হাবীবা (র) এর জীবনী : হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে জাহাশ (র) হলো উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের বোন। রাসূল (স) এর যুগে যে সকল নারী ইস্তিহাযা রোগে আক্রান্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে হযরত ام حبيبة بنت جحش অন্যতম। তিনি একদা রাসূল (স) এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আসলেন। তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো যে, এ সময় নামায পড়তে হবে কি না? তখন রাসূল (স) এ সম্পর্কে তাঁকে সম্যক সমাধান দিয়েছেন। তিনি ইস্তিহাযা রোগে একাধারে সাত বছর ভুগছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তার এত রক্ত প্রবাহিত হত যে, গোসলকালে পানি রক্তিম হয়ে যেত।

كما جَاءَ فى الحديث وكانت تَغْتَسِلُ اَحْيانًا فِى مِرْكَنٍ فِى حُجْرَةِ اُخْتِها زينبَ وهى عندَ رسولِ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم حتّى أنّ حُمْرَةَ الدمِ لَتَعْلُو المَاءَ۔

হাদীস সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা : রাসূলের যে কয়জন স্ত্রী ইস্তিহাযা ছিলেন–

রাসূল (স) এর তিনজন স্ত্রী ইস্তিহাযাগ্রস্ত ছিলেন। ১. যয়নব বিনতে খুজাইমা (র) ২. যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) ৩. সাওদা বিনতে জামআ (রা)।

مِركَن এর তাহকীক :

مركن শব্দটি একবচন বহুবচনে مراكن মাদ্দাহ ر ـ ك ـ ن এখান থেকে বলা হয়।

ركَنَ يَرْكَنُ ركونًا اذا مَالَ الى شئ শব্দটির অর্থ হচ্ছে কাপড় ধোয়ার পাত্র।

تُهراق এর তাহকীক : تُهَراق শব্দের تا. বর্ণে জম্মা আর ها. বর্ণে ফাতাহ ও সুকুন উভয় ভাবে পড়া যায়। অথবা تُهَراق শব্দটি মূলত تهريق মারুফের সীগা ছিল। অতঃপর را. এর কাছরাকে ফাতাহ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এ তা'লীল ঐ সকল লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যারা ناصية কে ناصاة পড়ে। আবু মুসা বলেন, শব্দটিকে মাজহুল পড়াই বাঞ্ছনীয় মারুফ নয়। مصدر الإراقة - از إفعال

আলোচ্য রেওয়ায়াতে امرأة দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য রেওয়ায়াতের মধ্যে যে امرأة শব্দ এসেছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ। তার ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ذِكْرُ الأَقْرَاءِ

٢١٠. اخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن ابراهيم قال حدثنا اسحق بن بكر قال حدثني ابي عن يزيد بن عبد الله عن ابي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وانها استحيضت لاتطهر فذكر شانها لرسول الله ﷺ فقال انها ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلوة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلوة -

٢١١. اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة بنت جحش كانت تستحاض سبع سنين فسالت النبي ﷺ فقال ليست بالحيضة انما هو عرق فامرها ان تترك الصلوة قدر اقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلوة -

٢١٢. اخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة ان فاطمة بنت ابي حبيش حدثت انها اتت رسول الله ﷺ فشكت اليه الدم فقال لها رسول الله ﷺ انما ذلك عرق فانظري اذا اتاك قرءك فلا تصلي فاذا مر قرءك فتطهري ثم صلي ما بين القرء الى القرء هذا دليل على ان الاقراء حيض قال ابو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة ولم يذكر فيه ماذكر المنذر -

٢١٣. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبدة ووكيع وابو معاوية قالوا حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله ﷺ فقالت اني امراة استحاض فلا اطهر افادع الصلوة قال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلوة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي -

---

হায়েয সম্পর্কিত বর্ণনা

অনুবাদ ঃ ২১০. রবী ইবনে সুলায়মান (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশ যিনি আবদুর রহমান ইবনে আউফের সহধর্মিণী ছিলেন– ইস্তেহাযায় আক্রান্ত ছিলেন কখনো পাক হতেন না। তাঁর এ অবস্থা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, তা হায়েয নয় বরং তা জরায়ুর স্পন্দন মাত্র। অতএব, সে যেন তার হায়যের মুদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং সে দিনগুলোতে নামায আদায় হতে বিরত থাকে। হায়েযের মুদ্দত অতিবাহিত হলে সে যেন প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করে।

২১১. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্শ (রা) সাত বছর ইস্তেহাযায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,

এটা হায়েয নয়, বরং এটা একটা শিরাবাহিত রক্ত মাত্র (যা হতে রক্ত নির্গত হয়)। অতএব তিনি তাকে তার হায়েযের মুদ্দত পরিমাণ নামায ত্যাগ করতে আদেশ দিলেন। তারপর গোসল করতে ও নামায আদায় করতে বললেন। এরপর তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন।

২১২. ঈসা ইবনে হাম্মাদ (র).........উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনতে আবী হুবায়শ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাঁর রক্তক্ষরণ জনিত অসুবিধার কথা জানালেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন, এটা একটি শিরা মাত্র (যা হতে রক্ত নির্গত হয়)। অতএব লক্ষ্য রাখবে যখন তোমার হায়েয শুরু হয় তখন নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকবে। আর যখন তোমার হায়েয অতিবাহিত হয় এবং তুমি পবিত্র হও তখন তুমি নামায আদায় করবে এক হায়েয হতে অন্য হায়েয-এর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত। এ হাদীস হতে বুঝা যায় (الاقراء) 'আকরা' এখানে হায়েয অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আবু আবদুর রহমান বলেন, হিশাম ইবনে উরওয়া (র) এ হাদীসটি উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুনযির রাবী তাতে এ (হায়েয) সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তা তিনি উল্লেখ করেন নি।

২১৩. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)......... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবী হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বললেন, আমি একজন ইস্তেহাযায় আক্রান্ত মহিলা; আমি পাক হই না। এমতাবস্থায় আমি কি নামায ত্যাগ করব? তিনি বললেন না, এটা হায়েয নয়। এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। যখন তোমার হায়েয আরম্ভ হবে তখন নামায ছেড়ে দেবে। যখন তা অতিবাহিত হয় তখন রক্ত ধুয়ে নামায আদায় করবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

আলোচ্য রেওয়ায়াতে اقراء শব্দ উল্লেখ রয়েছে, তার উপর ভিত্তি করেই শিরোনাম কায়েম করা হয়েছে। শিরোনামের আন্ডারে প্রথম হাদীস এবং দ্বিতীয় হাদীসে উম্মে হাবীবা বিনতে জাহাশ এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে যে, তিনি ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হন। ফলে পবিত্র হতে পারতেন না। এ অবস্থা রাসূল (স) এর সামনে বর্ণনা করা হলো, রাসূল (স) ভূমিকা স্বরূপ বলেন, এটা হায়েয নয়। বরং এটা ولكنّها ركضة من الرّحم আবু দাউদ ও অন্যান্য কিতাবের রেওয়ায়াতে শব্দ এভাবে এসেছে- انّما هذه ركضة مِنْ ركضاتِ الشّيطان

শয়তানের রেহেমে লাথি মারা, যাতে করে রগ ফেটে যায়। এটা রেহেমের সাথে সংশ্লিষ্ট। রগ ফেটে যাওয়ার ফলে অবিরাম রক্ত নির্গত হতে শুরু করে যা বন্ধ হয় না, استحاضة এর বাহ্যিক সবাব হলো عاذل নামক রগ হতে রক্ত প্রবাহিত হওয়া কিন্তু আভ্যন্তরীন সবাব হলো শয়তানের পদাঘাতে রগ ফেটে যাওয়া।

আল্লামা ইবনুল আরাবী (র) ولكنّها ركضةٌ مِن الرّحم, হাকীকতের উপর প্রয়োগ করেন, যে বাস্তবেই শয়তান এমন লাথি মেরে থাকে। আল্লামা খাত্তাবী (র) উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেন, মহিলারা ইস্তিহাযা গ্রস্ত হলে শয়তান দ্বীনের ব্যাপারে (যেমন পবিত্রতা, নামায ইত্যাদি) সন্দেহ-সংশয়ে নিক্ষেপ করার সুযোগ পায় এবং বিভ্রান্ত, বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট করার রাস্তা খুলে যায়, তাকে সে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করতে থাকে। তার এ কু-চিন্তা ও কৌশলকেই রূপকভাবে ركضة شيطان, বলা হয়েছে। মোটকথা, উল্লেখিত বাক্যকে হাকীকী ও মাজাযী উভয় অর্থের উপর প্রয়োগ করা যায়। এর দ্বারা হায়েয ও ইস্তিহাযার মধ্যকার ব্যবধানের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, এটা হায়েয নয় বরং ইস্তিহাযা। ইস্তিহাযা অবস্থায় কি করতে হবে সে সম্পর্কিত মাসআলা মাসায়িল বর্ণনা করা হচ্ছে।

فَلْتَنْتَظِرْ قَدْرَ قُرْئِهَا الّتى ... الخ ঃ উম্মে হাবীবা বিনতে জাহাশ বলেন, ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা চাই যে সময় ইস্তিহাযার পূর্বে প্রতি মাসে হায়েয আসতো এবং হায়েযের সময়গুলোতে নামায ছেড়ে দেবে। অতঃপর যে রক্ত

দেখা যাবে তা নামাযের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। কেননা, সেটা ইস্তিহাযা। আর ইস্তিহাযায় আক্রান্ত মহিলা মাজুরের হুকুমে গণ্য। সুতরাং মাজুর ব্যক্তির ন্যায় প্রতি ওয়াক্তে তার গোসল করতে হবে। অতঃপর নামায আদায় করবে।

হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য ও তার সমাধান

আলোচ্য হাদীসে প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করার কথা উল্লেখ আছে। আর কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে যে, হায়েযের দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর একবার গোসল করবে অতঃপর প্রতি ওয়াক্ত নামাযের সময় উযূ করার কথা উল্লেখ আছে। কাজেই উভয় হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে। এর সমাধান নিম্নরূপ–

হায়েযের দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর একবার গোসল করা ওয়াজিব, আর প্রত্যেক ওয়াক্তে গোসল করা মুস্তাহাব। কাজেই আর কোন বৈপরীত্য থাকলো না। বিস্তারিত আলোচনা পেছনে অতিবাহিত হয়েছে।

তৃতীয় হাদীসে হযরত ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। যা পূর্বের শিরোনামের আওতারে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত হাদীসে ফাতেমা বিনতে কায়স এর কথা উল্লেখ আছে। উভয়টাই বিশুদ্ধ। কেননা, তার পিতার নাম হলো কায়স, আর কুনিয়াত হলো আবী হুবাইশ। কাজেই কখনো মূল নামের দিকে নিসবত করে ফাতেমা বিনতে কায়স বলা হয়েছে এবং কখনো তার কুনিয়াত এর দিকে মানসুব করে ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ বলা হয়েছে। এ মহিলাও ইস্তিহাযাগ্রস্ত ছিলেন এবং معتادة (রীতিসিদ্ধ) ছিলেন। আর রীতিসিদ্ধ মহিলার হুকুম কি? সে সম্পর্কে পেছনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বের সকল হাদীসে যে قرء শব্দ আছে, তার ব্যবহার হায়েযের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কেননা, মুসান্নেফ (র) হযরত ফাতেম বিনতে আবী হুবাইশ এর হাদীস বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে। هٰذَا الدَّلِيْلُ عَلٰى اَنَّ الْاَقْرَاءَ حَيْضٌ

এ রেওয়ায়াত একথার প্রমাণ যে, কুরআনে যে, قرء শব্দ এসেছে তার দ্বারা হায়েয উদ্দেশ্য। কিন্তু মুহাক্কিকদের ভাষ্য হলো قرء শব্দটিএর মধ্য থেকে কাজেই হায়েয ও তুহুর উভয়টার উপর قرء শব্দ প্রয়োগ হয়। والله اعلم بالصواب (শরহে উর্দু নাসায়ী : ২৮৬ –২৮৭)

سوال : اكتب نبذةً مِّن حَيَاةِ السَّيِّدة ام حبيبة رض و اسماء و فاطمة بنتِ ابى حُبَيْش (رض).

প্রশ্ন ঃ উম্মেহাবীবা (র) আসমা ও ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ হযরত আসমা (র) এর জীবনী ঃ

পরিচিতি ঃ নাম আসমা, উপাধি যাতুন নিতাকাইন, পিতার নাম আবু বকর (রা) (আব্দুল্লাহ) মাতার নাম কুতাইলা বিনতে আব্দুল উযযা। তিনি ছিলেন হযরত আয়েশা (রা)-এর বৈমাত্রেয় বোন।

জন্ম ঃ তিনি হিজরতের ২০ বছর পূর্বে তথা নবুওয়াতের ১৪ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ তিনি ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, মাত্র সতেরজন লোকের ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হলো ইসলামের ১৮তম মুসলমান। কিন্তু তাঁর মাতা কুতাইল এবং সহোদর ভাই আব্দুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করেননি।

বিবাহ ঃ হযরত জুবাইর ইবনে আওয়ামের সাথে তাঁর বিবাহ হয়, তিনি ছিলেন রাসূল (স) এর ফুফাত ভাই।

যাতুন নিতকাইন উপাধি ঃ হযরত আসমা (রা) কে ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ নামে ডাকা হত। نطاق অর্থ কোমরবন্দ। তাঁকে দু'কোমরবন্দ বিশিষ্ট নারী এ জন্যে বলা হত যে, যখন রাসূল (স) হযরত আবু বকর (রা) সহ হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনার পথে রওয়ানা হয়েছিলেন। তখন হযরত আসমা নিজের কোমরে বাঁধা কাপড় দু'টুকরা করে একখণ্ড দ্বারা তাদের পাথেয় খাদ্যদ্রব্য এবং অপর খণ্ড দ্বারা পানির মশকটি বেঁধে দিয়েছিলেন।

মায়ের সাথে তার সম্পর্ক ঃ যখন পবিত্র কুরআন মাজীদের এ আয়াত নাযিল হলো তোমাদের বিধর্মী স্ত্রীগণকে পত্নীত্বে আবদ্ধ করে রেখো না। ...... তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত আসমার মাতা কাতলাকে তালাক দেন। তখন সে মক্কায় চলে যায়। কিছু কাল পর সে কন্যা হযরত আসমাকে দেখার জন্যে মদীনায় আসে। কিন্তু হযরত আসমা (র) তার সাথে দেখা করলেন না এবং তাঁর প্রদত্ত উপহার দ্রব্যসমূহের দিকে চোখ তুলেও

তাকালেন না। মিনকি তাকে তাঁর বাড়ীতে থাকার জায়গাও দিলেন না। পরে রাসূল (স) উপহার গ্রহণ করতে আদেশ দেন এবং তাঁর মাতাকে স্বগৃহে স্থান দিতেও সমাদর করতে বলেন।

হিজরত ঃ রাসূল (স) এর মদীনায় হিজরতের কিছুকাল পর তিনি বোন আয়েশা এবং তাঁর মাতাসহ মদীনায় হিজরত করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের জন্ম ঃ হযরত আসমা (রা) যখন কুবা পল্লীতে বসবাস করতে থাকেন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) এর জন্ম হয়। তিনি হলো মুহাজিরদের প্রথম সন্তান। রাসূল (স) সর্বপ্রথম খেজুর চিবিয়ে মুখের থুথু মুবারক নবজাতকের মুখে দেন। রাসূল (স) এর পবিত্র থুথুর বরকতেই তিনি পরবর্তীতে মহৎপ্রাণ ব্যক্তিতে পরিগণিত হয়েছিলেন।

গুণাবলী ঃ হযরত আসমা (রা) নম্র, ভদ্র এবং শান্ত স্বভাবের এক মহিয়সী নারী ছিলেন। শারীরিক পরিশ্রম করতে লজ্জাবোধ করতেন না। তিনি অতি উদার প্রকৃতির দানশীলা নারী ছিলেন। তাঁর পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে বলতেন, অন্যের সাহায্য এবং উপকারের জন্যেই মানুষকে ধন-সম্পদ দেয়া হয়। তা জমা করে রাখার জন্যে দেয়া হয়নি, যদি তোমরা তোমাদের ধন অন্যের জন্যে ব্যয় না করে আবদ্ধ করে রাখ, তবে আল্লাহ ও তার অনুগ্রহ তোমাদের উপর হতে বন্ধ করবেন। হযরত আয়েশা (রা) এর ওফাতের পর তার ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে তিনি একখণ্ড ভূমি প্রাপ্ত হন। তা একলক্ষ দিরহামে বিক্রয় হয়, তিনি এ একলক্ষ দিরহামই তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বিতরণ করেদেন। তাঁর মধ্যে সকল গুণের সমাহার ছিল। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীলা, সত্যপ্রিয়। সত্যকথা বলার ব্যাপারে সাহসী ও সুদৃঢ় মনের অধিকারীনি। তাই হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে স্বীয় পুত্র আব্দুল্লাহ যুদ্ধের জন্যে রওয়ানার সময় তিনি বলেছিলেন আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি যুদ্ধ করে শহীদ হও, আমি ধৈর্য ধরবো; অথবা যুদ্ধ করে বিজয়ী হও; আমি চক্ষু শীতল করব। হযরত আব্দুল্লাহ রণাঙ্গনে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে অবশেষে শহীদের উচ্চপদ লাভ করেন। হাজ্জাজ তাঁর লাশ ঝুলিয়ে রেখেছিল।

হাজ্জাজ ও হযরত আসমা (রা) এর সাহসিকতা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের শাহাদাতের পর হাজ্জাজ হযরত আসমা (রা) এর নিকট এসে বলল, আপনার পুত্র আল্লাহর গৃহে (মক্কাতে) শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ বিস্তার করছিল এবং যুদ্ধ রক্তপাত ইত্যাদি নিষিদ্ধ কাজ করছিল। তাই আল্লাহ তার উপর কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করেছেন। হযরত আসমা (রা) প্রত্যুত্তরে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ, আমার পুত্র শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করেনি। সে নিত্য রোযা পালনকারী, রাত্রে ইবাদতে অতিবাহিতকারী, পাপ পরিহারকারী, ইবাদতে রত এবং মাতা পিতার আজ্ঞাবহ যুবক ছিল। আমি রাসূল (স) এর নিকট হতে একটি হাদীস শুনেছি– সাকীফ গোত্রে দু'ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে যে পরবর্তী সে পূর্ববর্তী ব্যক্তি হতেও অধিক মন্দ হবে। তাদের মধ্যে প্রথম মিথ্যাবাদী মুখতার সাকাফীকে আমি দেখেছি। আর তার চেয়ে অধিক মন্দ সে ব্যক্তিকে এখন দেখছি। সে ব্যক্তি নিশ্চয় তুমি।

সন্তান-সন্ততি ঃ তার ছেলে-মেয়েরা হলো, যথাক্রমে– ১. আবদুল্লাহ ২. মুনযির ৩. উরওয়াহ ৪. মুহাজির ৫. খাদিজ ও ৬. উম্মুল হাসান।

শারীরিক গঠন ঃ তিনি ছিলেন সুঠাম দীর্ঘ দেহের অধিকারিনী। শতবর্ষে উপনীত হওয়ার পরও তাঁর দন্তরাজি অক্ষুন্ন ছিল। শেষ জীবনে তাঁর চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

হাদীস রেওয়ায়াত ঃ তিনি হাদীস শাস্ত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৬টি, পবিত্র বুখারী, মুসলিমসহ প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে তার হাদীস বর্ণিত হয়েছে, বিভিন্ন মনীষী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেমন– আব্বাদ ইবনে আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে উরওয়াহ, ফাতিমা বিনতে মুনযির, ইবনে আব্বাস, ইবনে আবু মুলাইকা, ওহাব ইবনে কায়সান প্রমুখ।

ইন্তিকাল ঃ শূলি কাষ্ঠ হতে স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রা) এর লাশ নামিয়ে দাফন করার সাত দিন, অন্য বর্ণনায় বিশ দিন পর একশত বছর বয়সে হিজরী ৭৩ সনে মক্কায় ইন্তিকাল করেন। হযরত আসমা দোয়া করতেন– যতক্ষণ আমি আব্দুল্লাহর লাশ না দেখবো, ততক্ষণ যেন আমার মৃত্যু না হয়। আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করেন।

(ইকমাল ঃ ৫৮৭, ইসাবা ঃ ৪/২২৭)

হযরত উম্মে হাবীবা (রা) এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি ঃ নাম রমলা, উপনাম উম্মে হাবীবা, পিতার নাম আবু সুফিয়ান। মাতার নাম সাফিয়া বিনতে আবুল আস। তিনি হযরত উসমান (রা) এর ফুফু ছিলেন।

বংশধারা ঃ রমলা বিনতে আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস।

জন্ম ঃ তিনি রাসূল (স) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সতের বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক অবস্থা ঃ তাঁর প্রথম স্বামীর নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ। তিনি হযরত যয়নবের ভ্রাতা ছিলেন। ইসলামের উষালগ্নেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন আবু সুফিয়ান প্রমূখ নেতার প্ররোচনায় মুসলিমগণের উপর ঘোর অত্যাচার হলোছিল। তারা ইসলামের শত্রুদের পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে হিজরত করে আবিসিনিয়াতে হিজরত করতে বাধ্য হন। বিদেশে তাঁর উপর নতুন বিপদে পতিত হন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর স্বামী মদ্য পান ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু বিদেশে পুনঃ মদ্যপান শুরু করলেন এবং খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন। আবিসিনিয়ায় তাঁর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তাঁর নাম রাখা হয় হাবীবা। আর এ জন্যেই তাঁকে উম্মে হাবীবা বলে ডাকা হত। হযরত উম্মে হাবীবা এক রজনীতে স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর স্বামীর মুখ বিকৃত হয়ে গেছে এবং সে অতি বিশ্রী হয়ে গেছে। সকালে প্রকাশ্যে তাঁর স্বামী খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করল এবং তাকে এ জন্যে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করল। কিন্তু তিনি ইসলামে স্থির থাকলেন। অত্যাধিক মদ্য পানের ফলে তার স্বামী মারা গেল।

কষ্টের জীবন ঃ আবিসিনিয়া ছিল তখন খ্রিস্টানদের দেশ। তিনি সেখানে অন্ন-বস্ত্রের অভাবে অতিকষ্টে কালাতিপাত করতে লাগলেন। কিন্তু ইসলাম ও প্রিয় নবী (স) কে ত্যাগ করলেন না। অবশেষে তিনি মদীনা যাত্রীগণের সাথে মদীনায় আগমন করেন এবং রাসূল (স) এর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রাসূল (স) এর সাথে বিবাহ ঃ মুসনাদে আহমদের বিবরণ অনুযায়ী রাসুল (স) উম্মে হাবীবা (রা) এর করুণ অবস্থার কথা জ্ঞাত হওয়ার পর আমর ইবনে উমাইয়া দামেরীকে বিয়ের প্রস্তাব জানিয়ে আবিসিনিয়ায় বাদশাহ নাজ্জাশীর মাধ্যমে উম্মে হাবীবা (রা) এর কাছে পাঠান, তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৭ বছর, আর রাসূল (স) এর বয়স ছিল ৬০ বছর। আবিসিনিয়ায় (হাবশায়) ৬ষ্ঠ হিজরীতে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বাদশাহ নাজ্জাশী চারশত দীনার অপর এক বর্ণনায় চারলক্ষ্য দিরহাম মহর বাবদ নিজের পক্ষ হতে আদায় করে রাসূল (স) এর সাথে বিবাহ সম্পন্ন করে দেন। অতঃপর রাসূল (স) শুরাহবীল ইবনে হাসানকে হাবশায় প্রেরণ করেন। তিনি উম্মে হাবীবাকে মদীনায় আনেন।

রাসূল (স) এর প্রতি ভাল বাসা ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে নতুন চুক্তি করার বাসনা নিয়ে রাসূল (স) এর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্য আবু সুফিয়ান মদীনায় আগমন করলেন। কিন্তু রাসূল (স) তাঁর সাথে দেখা করলেন না। চলে আসার পূর্বে তিনি স্বীয় কন্যা উম্মে হাবীবার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তিনি তাঁর যথোপযুক্ত সমাদয় করলেন, কিন্তু যখন তিনি রাসূল (স) এর শয্যায় বসতে গেলেন তখন উম্মে হাবীবা (রা) তা উঠিয়ে ফেলেন। তাতে আবু সুফিয়ান অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হযরত উম্মে হাবীবা (র) বললেন, এটা নবী (স) এর বসার বিছানা। আপনি মুশরিক, আর মুশরিক অপবিত্র। কাজেই এখানে বসার অধিকার আপনার নেই। এটা শ্রবণ করে আবু সুফিয়ান বললেন, আমার সঙ্গ ত্যাগের পর তুমি অনেক খারাপ হয়ে গেছ।

গুণাবলী ঃ তিনি রাসূল (স) এর নিকট শুনেছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের বার রাকাআত নফল নামায ত্যাগ না করে, জান্নাতে সে স্থান পাবে। তাই তিনি তাহাজ্জুদ নামাযসহ এ বার রাকাআত নামায কখনো বর্জন করেননি। তিনি দ্বীনি শিক্ষায় সুশিক্ষিতা ও হাদীস বিশারদ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন, স্বয়ং পিতা আবু সুফিয়ান বলেন, আমার নিকট আরবের অপূর্ব সুন্দরী ও রুপসী কন্যা উম্মে হাবীবা রয়েছে।

হাদীস রেওয়ায়াত ঃ তিনি সর্বমোট ৬৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বহু লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনে উতবা, সালিম, হাবীবা, আবু সুফিয়ান কন্যা আকীলা, সুফিয়া, যয়নব প্রমূখ।

ইন্তিকাল ঃ তিনি ৭৩ বছর বয়সে হিজরী ৪৪ সালে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। (ইকমাল ঃ ৫৯২ : আল ইসাবা: ৪/২৭০)

ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (র) এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম ফাতিমা, পিতা আবু হুবাইশ। বংশ পরিক্রমা হলো ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে আসাদ ইবনে আব্দুল উযযা কুরাশিয়া আসাদিয়া (র)। তিনি রাসূল (স) এর নিকট রক্ত প্রদর সংক্রান্ত মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলেন। (ইকমাল ঃ ৬১৩, ইসাবা : ৪/৩৭১)

ذِكْرُ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

٢١٤. اخبرنا محمدُ بْنُ بشَّارٍ قال حدَّثنا محمَّدٌ قال حدَّثنا شعبةُ عَنْ عبدِ الرَّحمٰنِ بْنِ القاسمِ عَنْ أبيهِ عَنْ عائشةَ أنَّ امرأةً مُسْتَحاضةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قِيلَ لَهَا إنَّهُ عِرْقٌ عاندٌ وأُمِرَتْ أنْ تُؤخِّرَ الظُّهْرَ وتُعَجِّلَ العَصْرَ وتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا واحدًا وتَغْتَسِلَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ غسلًا واحدًا -

ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারীর গোসল

অনুবাদ ঃ ২১৪. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার (র).... .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময় একজন ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারীকে বলা হয়েছিল যে, এটা একটি শিরামাত্র যার রক্ত বন্ধ হয় না। তাকে আদেশ করা হয়েছিল, সে যেন জোহরের নামাযকে পিছিয়ে শেষ ওয়াক্তে এবং আসরের নামাযকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে। উভয় নামাযের জন্য একবারই গোসল করে এবং মাগরিবকে শেষ ওয়াক্তে ও ইশাকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে এবং এ দুই নামাযের জন্য একবারই গোসল করে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : هَل تَغْتَسِلُ المُسْتَحَاضَةُ لِكلِّ صَلٰوةٍ ام لا وما الإختلافُ فيه بَيْنَ العُلماءِ. بَيِّنْ مُوضِحًا .

প্রশ্ন ঃ ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলারা কি প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করবে না কি করবে না? এ ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর গোসলের ব্যাপারে মতভেদ ঃ ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলার গোসল সম্পর্কে বেশ মতানৈক্য রয়েছে। যথা– ১. শিয়া ইমামামিয়া, আহলে জাহির, ইকরামা, সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদা ও হযরত আতা ইবনে আবী-রবাহ (র) এর মতে ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করবে।

২. ইব্রাহীম নাখয়ী, আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ও মানসুর ইবনে মুতামির আলী ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখের মতে, মুস্তাহাযা নারী দু' নামাযকে এক সাথে করে একবার করে মোট তিনবার গোসল করবে। তবে প্রত্যেক ওয়াক্ত স্ব-স্ব ওয়াক্তের ভিতরে হতে হবে। যেমন- দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে একবার গোসল করবে। অর্থাৎ যোহর ও আসরের নামাযের জন্য একবার গোসল করে যোহরের নামাযকে শেষ সময়ে এবং আসরের নামাযকে একটু অগ্রসর করে আউয়াল ওয়াক্তে পড়বে। কিন্তু প্রত্যেক নামায ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে। অতঃপর মাগরিব ও এশার নামাযের জন্য একবার গোসল করে মাগরিবের নামাযকে শেষ সময়ে এবং ইশার নামাযকে প্রথম সময়ে আদায় করে নেবে। তবে প্রত্যেক নামায ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে। অতঃপর ফজরের নামাযের সময় আরেকবার গোসল করবে। অতএব, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মোট তিনবার গোসল করবে।

৩. সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব ও হাসান বসরী (র) প্রমুখের মতে, ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা প্রত্যেক দিন যোহরেরর সময় মাত্র একবার গোসল করবে।

৪. ইমাম চতুষ্ঠয় ও জুমহুরের মতে, ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলার হায়েযের সময়সীমা যখন চলে যায়, তখন বন্ধের সময় শুধু একবার গোসল করে নেয়াই যথেষ্ট। প্রত্যেক দিন প্রত্যেক নামাযের জন্য অথবা, দুই নামাযের মাঝখানে গোসল করার কোন প্রয়োজন নেই। ইবনে মাসউদ, আয়েশা, উরওয়া ইবনে যুবাইর, আবু সালামা (রা) প্রমুখের অভিমতও তাই। (বজলুল মাজহুদ ঃ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১১৩, তালিকুস সবীহ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৫৭)

আহলে জাহের এর দলীল ঃ ১.

عَنْ عائشةَ قالتْ إنَّ أمَّ حبيبةَ بنتَ جحشٍ أُسْتُحِيضَتْ فِى عهدِ رَسُولِ اللّٰهِ صلّى عليه وسلم فأمَرَهَا بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ ... الخ

অর্থাৎ .... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিনতে জাহাশ (রা) রাসূল (স) এর যুগে ইস্তিহাযাগ্রস্ত হওয়ায় রাসূল (স) তাকে প্রত্যেক নামাযের সময় গোসলের নির্দেশ দেন। (আবু দাউদ : ১/৪০, মুসলিম : ১/১৫১)

অতএব, উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করা ওয়াজিব।

দলীল ঃ ২. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُسْتُحِيضَتْ زينب بِنْتِ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اِغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلوةٍ

অর্থাৎ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যয়নব বিনতে জাহশ ইস্তিহাযাগ্রস্ত হলে নবী (স) তাঁকে বলেন, প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল কর। (আবু দাউদ)

হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) এর দলীল

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيلٍ أُسْتُحِيضَتْ فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ عِندَ كُلِّ صَلوةٍ فلمّا جَهَدَهَا ذٰلك اَمَرَهَا اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ بِغُسْلٍ والمَغْرِبِ والعِشَاءِ بِغُسْلٍ وتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ -

অর্থাৎ--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহলা বিনতে সুহায়েল (রা) ইস্তিহাযাগ্রস্ত হয়ে নবী করীম (স) এর খেদমতে আগমন করলে তিনি তাঁকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসলের নির্দেশ দেন। তার জন্য এটা কষ্টদায়ক হওয়ায় নবী করীম (স) তাকে যোহর ও আসরের জন্য একবার মাগরিব ও ইশার জন্য একবার এবং ফজরের নামাযের জন্য একবার গোসলের নির্দেশ দেন। (আবু দাউদ : ১/৪১, নাসায়ী: ১/৪৫)

হাসান বসরী (র) এর দলীল

حدّثنا القَعْنَبِيُّ ..... اَنَّ القعقاعَ وزيدَ بْنَ اسلمَ ارسلاه الى سعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ كيفَ تَغْتَسِلُ المُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ الى ظُهْرٍ وتَوَضَّأُ لِكلِّ صلوةٍ .....

অর্থাৎ আল কানাবী ...... আল কা'কা' এবং যায়েদ ইবনে আসলাম (র) উভয়ই সুমাইয়াকে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের নিকট ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলাদের গোসলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে প্রেরণ করেন। জবাবে তিনি বলেন, তাকে দৈনিক এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত একবার গোসল করতে হবে। (অর্থাৎ প্রত্যহ দুপুরের সময়) তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করতে হবে। (আবু দাউদ : ১/৪২)

জুমহুরের দলীল ঃ ১ .আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত নবী করীম (স) উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশ (রা) কে বলেন–

اِذا اَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فدَعِى الصَّلوة فَاِذا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِى وَصَلِّى -

অর্থাৎ যখন তোমার হায়েযের নির্ধারিত সময় মাস হবে তখন নামায হতে বিরত থাকবে এবং উক্ত সময় অতিবাহিত হলে গোসল করে নামায আদায় করবে। (আবু দাউদ ঃ ১/৩৮, বুখারী ঃ ১/৪৮, মুসলিম ১/১৫১)

উক্ত হাদীসে শুধুমাত্র হায়েয বন্ধের পর গোসলের হুকুম দেয়া হয়েছে। বার বার গোসল করার কথা বলা হয়নি।

দলীল ঃ ২.

عَنْ عَائِشَةَ انها قالتْ فِى المُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصلوةَ اَيَّامَ حَيْضِهَا ثم تَغْتَسِلُ غسلاً واحدًا او تَتَوَضَّأُ عندَ كلِّ صلوةٍ

অর্থাৎ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলার ব্যাপারে বলেন- সে হায়েযের দিনসমূহে নামায ছেড়ে দেবে, অতঃপর একবার গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করবে। (ত্বহাবী-১/৬৩)

হযরত আয়েশা (রা) এর ফাতওয়া সম্পূর্ণভাবে জুমহুরের মাযহাবের সাথে মিলে যায়।

দলীল ঃ ৩. হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ নবী করীম (স) এর নিকট ইস্তিহাযা সংক্রান্ত ঘটনা বিবৃত করলে নবী করীম (স) বলেন– اِغْتَسِلِى ثمّ تَوَضَّئِى لِكلِّ صلوة وصَلِّى অর্থাৎ পবিত্রতার জন্য একবার গোসল কর পরে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযূ করে নামায আদায় কর। (আবু দাউদ : ১/৪১)

দলীল ঃ ৪. عَنْ عائشةَ فِى المُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ تَعْنِى مَرَّةً واحدةً ثم تَوَضَّأُ اِلَى ايَّامِ اَقْرَائِهَا

অর্থাৎ আয়েশা (রা) হতে ইস্তিহাযা গ্রস্ত মহিলাদের গোসল সম্পর্কে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ হায়েযের পর পবিত্রতা অর্জনের জন্য একবার মাত্র গোসল করা ওয়াজিব। অতঃপর পুনঃ হায়েযকালীন নির্ধারিত সময় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযূ করবে।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

প্রতিপক্ষের বর্ণিত প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করার এবং দুই নামাযের মাঝখানে একবার গোসল করা এ সংক্রান্ত উভয় হাদীসের রাবী হল, হযরত আয়েশা (রা)। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা)-ই উল্লিখিত হাদীস দুটির বিপরীত হায়েয বন্ধ হওয়ার পর শুধু একবার গোসল করার ফাতওয়া দেন। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহ রহিত হয়ে গেছে। (ত্বহাবী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৬৩)

২. দু'হাদীসের দ্বন্দ্বের সময় সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীসটি প্রাধান্য লাভ করে। আর জুমহুরের দলীলটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে যা সনদের দিক দিয়েও শক্তিশালী। অতএব, জুমহুরের হাদীসই প্রাধান্য পাবে।

৩. যে ঋতুমতি মেয়ের হায়েযের অভ্যাস জানা থাকে, হায়েয ইস্তিহাযার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। এমন মহিলার জন্য হায়েয বন্ধ হওয়ার পর শুধু একবার গোসল করতে হবে। যদি কোন মহিলা হায়েয এবং ইস্তিহাযার মধ্যে পার্থক্য করতে না পারে এবং পূর্বে হায়েযের সময়কাল কতদিন হত তা জানা না থাকে; এমন মহিলার জন্য প্রত্যেক নামাযে গোসল করার হুকুম প্রযোজ্য হবে এবং যে মহিলার নিজের অভ্যাস জানা নেই, কিংবা যে রক্তের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারে; বরং কখনো রক্ত আসে এবং কখনো রক্ত বন্ধ হয়ে যায়; এমতাবস্থায় ঐ মহিলার জন্য হুকুম হল দুই নামাযের জন্য একবার গোসল করবে।

৪. যে হাদীসে দুই নামাযের মাঝখানে একবার গোসল করার হুকুম রয়েছে, এটা মুস্তাহাব, যা চিকিৎসা হিসেবে বলা হয়েছে। যাতে ঠাণ্ডার দরুণ রক্ত কম বের হয়। নতুবা আসল হুকুম তো হল হায়েয বন্ধ হওয়ার পর একবার গোসল করা। আর এই হুকুম হচ্ছে ওয়াজিব হিসেবে। (তানযীমুল আশতাত ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২১৬)

سوال : بَيِّنْ مَذَاهِبَ الْأَئِمَّةِ فِيْ حُصُوْلِ طَهَارَةِ الْمَعْذُوْرِ وَحُكْمَ الصَّلَاةِ لَهُ بِالدَّلَائِلِ .

প্রশ্ন ঃ মাযুর ব্যক্তির পবিত্রতার বিধান সম্পর্কে আলেমদের মতামতের বিবরণ দাও এবং তার নামাযের বিধান দলীলসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ মাযুর ব্যক্তির নামাযের বিধান ঃ মা'যুর বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যার এমন সমস্যা রয়েছে যা পবিত্রতার পরিপন্থী। যেমন- ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারী, অব্যাহত বাতকর্ম-সম্পন্ন ব্যক্তি, আরিশ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও মেহগ্রস্ত তথা যার সদা পেশাব ঝরে এমন ব্যক্তি ইত্যাদি।

এদের পবিত্রতার বিধানের ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হল–

১. ইমাম মালেক ও দাউদে জাহেরী বলেন, এদের জন্য প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুনভাবে উযূ করা মুস্তাহাব।

দলীল ঃ রাসূলের বাণী– تَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

২. ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে রক্ত প্রদর আক্রান্ত মহিলা প্রতি ফরয নামাযের জন্য উযূ করবে। অর্থাৎ প্রতি ফরয নামাযের জন্য উযূ করা ফরয। সুতরাং এক উযূতে শুধু একটি ফরয আদায় করতে পারবে, অবশ্য এর অধীনস্থ সুন্নত ও নফলসমূহ ও পড়তে পারবে। এগুলো আদায়ের পর উযূ ভেঙ্গে যাবে। কাজেই এর পর নামায পড়তে চাইলে বা কুরআন তিলাওয়াত করতে হলে পুনরায় উযূ করতে হবে।

দলীল ঃ রাসূলের হাদীস– تَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

৩. ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ (এক বর্ণনায়) যুফার, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র) এর মতে এক উযূ দ্বারা ওয়াক্তের ভিতরে যত ইচ্ছা ফরয ও নফল আদায় করতে পারবে। সময় পেরিয়ে গেলেই উযূ ভেঙ্গে যাবে।

দলীল ঃ-১. প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্যে নতুন করে উযূ করতে হবে। একই ওয়াক্তে এক উযূ দ্বারা যত ইচ্ছা নামায পড়া যাবে। যেমন রাসূলের বাণী– تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ এর অর্থ হল تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

যৌক্তিক প্রমাণ–১ ঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, রক্তপ্রদর আক্রান্ত মহিলা যখন কোন নামাযের ওয়াক্তে উযূ করবে এবং নামায না পড়বে এমতাবস্থায় ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় তা হলে উক্ত উযূ দ্বারা কোন নামায আদায় করা তার জন্য জায়েয হবে না বরং নতুন উযূ করা আবশ্যক। তাছাড়া যদি সে ওয়াক্তের ভিতর উযূ করে নামায আদায় করে অতঃপর ওয়াক্তের ভিতরেই সে উযূ দ্বারা নফল পড়তে চায়, তবে তার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে তা জায়েয। এতে প্রমাণিত হল, ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়ায় ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার পবিত্রতা ভঙ্গের কারণ, নামায থেকে অবসর হওয়া নয়। অন্যথায় প্রথম সুরতে নতুন উযূর প্রয়োজন হত না। দ্বিতীয় সুরতে ফরয নামাযের পর নফল পড়ার জন্য নতুন উযূ করতে হত।

যৌক্তিক প্রমাণ–২ ঃ আমরা আর ও দেখছি, যদি ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার কয়েক ওয়াক্তের নামায ছুটে যায় এবং সে তা কাযা করতে চায়, তবে সে একাধিক ছুটে যাওয়া নামায একই নামাযের ওয়াক্তে এক উযূতে পড়তে পারবে, যদি প্রত্যেক ফরয নামাযের জন্য উযূ করা আবশ্যক হত, নামায থেকে অবসরতা তার জন্য উযূ ভঙ্গের কারণ হত, তবে ছুটে যাওয়া প্রতিটি নামাযের জন্য আলাদা আলাদা উযূ করতে হত। অতএব, প্রমাণিত হল যে, নামায থেকে অবসর হওয়া উযূ ভঙ্গের কারণ নয়। স্মর্তব্য যে, ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলার জন্য প্রতি ফরয নামাযের জন্য উযূর প্রয়োজন। চাই ওয়াক্তিয়া নামায হোক, অথবা কাযা। অতএব, একাধিক ছুটে যাওয়া নামায একই ওয়াক্তে এক উযূতে আদায় করার যে বিষয়টি ইমাম ত্বহাবী (র) উল্লেখ করেছেন, এটি বোধ হয় ইমাম শাফেয়ী (র) ছাড়া অন্য কারো উক্তি।

যৌক্তিক প্রমাণ-৩ ঃ আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই পবিত্রতা দুই প্রকার–

১. যে পবিত্রতা অপবিত্রতার কারণে ভেঙ্গে যায়। যেমন– পায়খানা-পেশাবের কারণে ভেঙ্গে যায়।

২. যে পবিত্রতা ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে ভেঙ্গে যায়, তার উদাহরণ যেমন– একটি বিশেষ সময় শেষ হওয়ার পর মোজার উপর মাসহের পবিত্রতা খতম হয়ে যায়। (এতে ইমাম মালিক (র) এর মতবিরোধ রয়েছে) এ সব পবিত্রতা সম্পর্কে ঐক্যমত রয়েছে যে, এগুলোর একটিকেও নামায ভঙ্গ করতে পারে না, অর্থাৎ নামায থেকে অবসর হওয়া মাত্রই পবিত্রতা নষ্ট হয় না। এগুলো ভঙ্গকারী হয়তো অপবিত্রতা অথবা ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়া। একটি স্বীকৃত ও প্রমাণিত সত্য যে, ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার পবিত্রতাকে অপবিত্রতাও ভঙ্গ করে। আবার এছাড়া অন্য জিনিস ও ভঙ্গ করে। ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার পবিত্রতা ভঙ্গকরে এরূপ হদস কি? এতে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটা হল, সময় পেরিয়ে যাওয়া। কেউ বলেন, নামায থেকে অবসর হওয়া, আমরা পবিত্রতা ভঙ্গের কারণ হিসেবে নামায থেকে অবসরতার কোন নজির পাইনি, তবে ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়ার নজির রয়েছে। যেমন- মোজার উপর মাসেহ করা। অতএব, যার নজির পাওয়া যায় তথা ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়া সেটাকে উযূ ভঙ্গের কারণ সাব্যস্ত করা উচিত। সেটা নয় যার কোন নজির নেই। কাজেই বলতে হয় যে, ইস্তিহাযা গ্রস্ত মহিলা প্রতিটি ওয়াক্তের জন্য উযূ করবে, প্রতিটি নামাযের জন্য নয় আমাদের দাবীও তাই। (ইযাহুত ত্বহাবী : ১/২৯২-৩১৬, আমানিল আহবার: ২/৭৭-৭৮)

سوال : هَل تَجُوزُ المُبَاشَرَةُ عِنْدَ الِاسْتِحَاضَةِ؟ وَقَدْ أَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِالْإِعْتِزَالِ عَنِ المَحِيْضِ لِلْاَذٰى وَدَمُ المُسْتَحَاضَةِ ايضًا مِنَ الاذٰى ـ

প্রশ্ন ঃ ইস্তিহাযার সময় স্ত্রী সহবাস করা বৈধ কি না? যদিও আল্লাহ্ তাআলা হায়েয অবস্থায় এটা কষ্টদায়ক হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন আর ইস্তিহাযার রক্তও কষ্টদায়ক এবং নোংরা।

উত্তর ঃ ইস্তিহাযার সময় স্ত্রী-সহবাস বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের বক্তব্য ঃ হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনকে অবৈধ ঘোষণা করে আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন–

قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

এখন প্রশ্ন হল নোংরা অপরিচ্ছন্ন থাকার কারণে ঋতুমতি অবস্থায় স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন থেকে বিরত থাকার জন্যে আল্লাহ নির্দেশ প্রদান করেছেন। অথচ ইস্তিহাযার রক্তও অনুরূপ কষ্টদায়ক ও নোংরা। তাহলে ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলার সাথে যৌনমিলন জায়েয আছে কি?

এর জবাবে ফুকাহায়ে কিরামের অভিমত হচ্ছে, ইস্তিহাযা হল এমন রোগ যা কোনো নারীর মধ্যে একদিন ও থাকতে পারে। আবার সারা জীবনও থাকতে পারে। আর সহবাস হল স্বামী-স্ত্রী উভয়ের হক, তাই কোনো রোগের কারণে সারা জীবন তারা স্বীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া সঙ্গত নয়, আর হায়েযের সময়সীমা যেহেতু সর্বোচ্চ দশ দিন, সেহেতু উক্ত দশদিন বাদ দিয়ে বাকী দিনগুলোতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক উপভোগ করার সুযোগ রয়েছে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা ঋতুস্রাব অবস্থায় যৌন মিলন থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু ইস্তিহাযা অবস্থায় নয়। তাছাড়া ইস্তিহাযা অবস্থায় নামায রোযাসহ শরীয়তের যাবতীয় ফরয আদায় করা বাধ্যতামূলক। সুতরাং এ অবস্থায় সহবাস করাও বৈধ হবে, অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হায়েযকালে সঙ্গম নোংরা অবস্থা চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মারাত্মক ক্ষতিকারক। বিধায় সর্বোপরি কুরআনের নিষেধাজ্ঞার ফলে যৌন মিলন সম্পূর্ণ হারাম। (শরহে নাসায়ী ঃ ১/২৫৭)

[বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

২১৫. اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله في حديث اسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة ان رسول الله ﷺ قال لابي بكر مرها ان تغتسل وتهل -

অনুচ্ছেদ ঃ নিফাসের গোসল

অনুবাদ ঃ ২১৫. মুহাম্মদ ইবনে কুদামাহ্ (র)..........জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আসমা বিনতে উমায়স (রা)-এর হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন যুল হুলায়ফা নামক স্থানে নিফাসগ্রস্ত হল তখন রাসূলুল্লাহ (স) আবু বকর (রা)-কে বললেন, তাকে (আসমা বিনতে উমায়স) গোসল করে ইহরাম বাঁধতে বল।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হযরত আসমা বিনতে উমায়েস হযরত আবু বকরের বিবি ছিলেন এবং বিদায় হজ্জের সফরে তিনি সাথী ছিলেন। যুলহুলায়ফা নামক স্থানে তাঁর বিবি সন্তান প্রসব করেন। যার নাম হল মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা)। এমতাবস্থায় আবু বকর (রা) রাসূল (স) কে জিজ্ঞেস করলেন, এখন করণীয় কি? নবী (স) তাকে বলেন, مُرْهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ তুমি তোমার স্ত্রীকে গোসল করতে নির্দেশ দাও এবং ইহরাম বাঁধতে বলো। আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, নবী (স) যে গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন, তা ইহরামের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটা শরীরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করার জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে করা সুন্নত। এটা ঐ গোসল নয় যা নিফাস বন্দ হওয়ার পর করা আবশ্যক। কেননা, নিফাসগ্রস্ত অবস্থা পরিসমাপ্তির পর যে গোসল করা হয় সেটাই মূলতঃ নিফাসের গোসল। কাজেই নিফাসগ্রস্ত অবস্থার গোসল কোন ফায়দাজনক নয়। কারণ এর দ্বারা পবিত্রতা হাসেল হয় না। সুতরাং আসমা বিনতে উমায়েসকে যে গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা নিফাসের গোসল নয়। কারণ তার নিফাস তখনও বন্দ হয়নি। কাজেই আলোচ্য শিরোনামের অধীনে উক্ত হাদীস উল্লেখ করার কোন রহস্য খুঁজে পাইনি। (والله تعالى اعلم)

[পূর্বের বাকী অংশ]

হাদীস সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা

اِسْتِحَاضَة সম্পর্কে আলোচনা ঃ اِسْتِحَاضَة অভিধানে ঐ রক্তকে বলা হয় যা নির্ধারিত সময় ব্যতীত অন্য সময় নির্গত হয়। আর শরীয়তের পরিভাষায় ইস্তিহাযা ঐ রক্তকে বলা হয় যা রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে জরায়ুর সাথে সংশ্লিষ্ট রগ হতে নির্গত হয়। আর উক্ত রগকে عَاذِل বলা হয়।

আর হাদীসে ইস্তিহাযার আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য শরয়ী, অর্থ নয়।

ইস্তিহাযা চেনার উপায় ঃ যদি প্রাপ্তবয়স্কা নারীর তিন দিনের কম রক্ত আসে তাহলে তাকে استحاضة বলে। অনুরূপভাবে ১০ দিনের বেশি যে রক্ত আসে, অনুরূপভাবে বালেগা হওয়ার পূর্বে যে রক্ত আসে ও বৃদ্ধা মহিলার জরায়ু থেকে যে রক্ত নির্গত হয় এবং নিফাসের ক্ষেত্রে ৪০ দিনের পরবর্তী যে রক্ত আসে এগুলো ইস্তিহাযার আলামত। তাই এগুলোকে ইস্তিহাযা বলা হয়।

اِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ**-এর হিকমতমূলক বিশ্লেষণ ঃ** এটি একটি রক্তের রগ যা বন্দ হয় না। عانِد শব্দটি عرق এর সিফত। এর অর্থ হল বিদ্রোহ করা, অবাধ্য হওয়া, বিরোধিতা করা। মোটকথা, বিরোধী ব্যক্তি যেমন প্রতিপক্ষের সাথে বিরোধিতা করা থেকে কখনো বিরত থাকে না ঠিক তদ্রূপ অভ্যাসের পরিপন্থী যে রক্ত রগ থেকে নির্গত হয় সেটাও বন্দ হয় না। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ২৮৭)

بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ

٢١٦. اخبرنا محمدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قال حدّثنا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنْ مُحَمّدٍ وهو ابنُ عمرو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقّاصٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فاطمةَ بِنْتِ ابى حُبَيْشٍ انّها كانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَال لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذا كانَ دمُ الْحَيْضِ فَاِنّهٗ دمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاَمْسِكِىْ عَنِ الصّلٰوة واذا كانَ اٰخرُ فتَوَضّئِىْ فانّما هُو عِرقٌ -

٢١٧. اخبرنا محمدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قال حَدّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ هٰذا مِنْ كِتابه اخبرنا محمدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قال حدّثنا ابْنُ ابى عديٍّ مِّنْ حِفْظِه قال حدّثنا محمّدُ بْنُ عمرٍو عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ انّ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُبَيْشٍ كانَتْ تُسْتَحَاضُ فقال لهَا رسولُ اللّٰه ﷺ اِنّ دمَ الحَيْضِ دمٌ اسودُ يُعْرَفُ فَاِذا كانَ ذٰلكَ فَاَمْسِكِىْ عَنِ الصّلٰوة واذا كانَ الاٰخرُ فتَوَضّئِىْ وَصَلِّىْ قال ابو عبدِ الرحمٰن قد رَوٰى هٰذا الحديثَ غيرُ واحدٍ لَم يذكُر احدٌ مِنهم ما ذَكَرَ ابنُ اَبى عديٍّ واللّٰه تعالٰى اعلمُ -

٢١٨. اخبرنا يحيٰى بنِ حبيبِ بْنِ عربىٍّ قال حدّثنا حمّادٌ وهو ابنُ زيدٍ عن هِشامِ بْنِ عروةَ عن اِبيه عَنْ عَائِشة قالتْ اُسْتُحِيْضَتْ فَاطمةُ بِنْت اَبِى حُبَيْشٍ فسَاَلَتِ النّبىَّ ﷺ فقالتْ يا رسولَ اللّٰه ! اِنّى اُسْتَحَاضُ فَلا اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصّلٰوةَ قال رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اِنّما ذٰلك عرقٌ ولَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذا اَقْبلَتِ الحَيْضَةُ فدَعِى الصّلٰوةَ واذا اَدْبرَتْ فَاغْسِلِىْ عنكِ اَثَرَ الدّمِ وتَوَضّئِى فانّما ذٰلك عرقٌ وليس بِالحَيْضَةِ قِيْلَ لهٗ فَالغُسْلُ قال ذٰلك لايَشُكُّ فيْهِ احدٌ قال ابو عَبْدِ الرّحْمٰن لا اَعْلَمُ احدًا ذكرَ فِى هٰذا الحديث وتوَضّئِىْ غيرُ حمّادِ بْنِ زيدٍ وقد رَوٰى غيرُ واحدٍ عَنْ هِشامٍ ولَمْ يذكُر فيْه وَتَوَضّئِىْ -

٢١٩. اخبرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هشام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ ابيهِ عَنْ عائشةَ قالتْ قالتْ بِنْتِ اَبِى حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللّٰهِ يا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! لا اَطْهُرُ اَفَادَعُ الصّلٰوة فقال رسولُ اللّٰه ﷺ اِنّما ذٰلك عِرقٌ ولَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ فَاِذا اَقْبلَتِ الْحَيْضَةُ فدَعِى الصّلٰوةَ فاِذا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدّمَ وصَلِّىْ -

٢٢٠. اخبرنا ابو الاَشْعَثِ احمدُ بْنُ المقدام حدّثنا خالدُ بْنُ الحَارِثِ قال سَمِعْتُ هِشامَ بْنَ عروةَ عَن ابيهِ عَن عائشة اَنّ بنتَ اَبِى حُبَيْشٍ قالتْ يا رسولَ اللّٰه! اِنّى لا اَطْهرُ اَفَاتْرُكُ الصّلٰوةَ؟ قالَ لا اِنّما هُو عِرْقٌ قَالَ خالدٌ فِيما قَرَاْتُ عليه ولَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ فاذا اَقْبلَتِ الحَيْضَةُ فدَعِى الصّلٰوةَ واذا اَدْبرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدّمَ وصَلِّىْ -

অনুচ্ছেদ ঃ হায়েয ও ইস্তেহাযার রক্তের পার্থক্য

অনুবাদ ঃ ২১৬. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র).........ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর ইস্তেহাযা হলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন, হায়যের রক্ত হয় কাল, তা চেনা যায়। তখন তুমি নামায থেকে বিরত থাকবে, আর যখন অন্য রক্ত আসে তখন উযূ করে নেবে। কেননা তা শিরা বাহিত রক্ত।

২১৭. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র).........আয়েশা (রা) থেকে বণিত। ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ (রা)-এর ইস্তেহাযা হলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন, হায়েযযর রক্ত কাল বর্ণের হয়ে থাকে যা সহজে চেনা যায়। যখন এ রক্ত দেখা দেবে তখন নামায থেকে বিরত থাকবে, আর যখন অন্য রক্ত দেখা দেবে তখন উযূ করবে এবং নামায আদায় করবে।

২১৮. ইয়াহইয়া ইবনে হাবীব (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ (রা) ইস্তেহাযা হলে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইস্তেহাযা হয়, অতএব আমি পাক হই না। এমতাবস্থায় আমি কি নামায ত্যাগ করব? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এটা হায়েয নয়, বরং এটা একটি শিরা (শিরা বাহিত রক্ত) মাত্র। অতএব, যখন হায়েয দেখা দেয় তখন নামায আদায় করবে না। আর যখন হায়েয বন্ধ হবে তখন রক্তের চিহ্ন ধৌত করবে এবং উযূ করে নেবে। কারণ এটা হায়েয নয়, বরং তাঁকে প্রশ্ন করা হল, হায়েয বন্ধ হওয়ার পর কি গোসল করতে হবে? তিনি বল-লেন, এতে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না।

২১৯. কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পাক হই না, আমি কি নামায ত্যাগ করব? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এটা একটি শিরা মাত্র (যা হতে রক্ত নির্গত হয়) এটা হায়েয নয়। যখন হায়েয দেখা দেবে তখন নামায ত্যাগ করবে। আর যখন হায়েযের মুদ্দত অতিবাহিত হবে তখন গোসল করে রক্ত দূর করবে এবং নামায আদায় করবে।

২২০. আবুল আশআছ (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুবায়শের কন্যা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পাক হই না, অতএব আমি কি নামায ত্যাগ করব? তিনি বললেন, না, এটা একটি শিরা মাত্র (যা হতে রক্ত নির্গত হয়)। খালিদ বললেন, আমি তার নিকট যা পাঠ করেছি তাহল, "তা হায়েয নয়, অতএব যখন হায়েয আসে তখন নামায ছেড়ে দেবে। আর যখন শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা গোসল করে নামায আদায় করবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : اشْرَحْ وَقَدْ رَوَى هٰذَا الحديثَ غيرُ واحدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ولمْ يَذْكُرْ فيه وَتَوَضَّئِي غيرُ حَمَّادٍ

প্রশ্ন ঃ আমি হাম্মাদ ব্যতীত অন্য কারো বর্ণনায় وتوضى শব্দের উল্লেখ পাইনি অথচ এ হাদীসটি হিশাম থেকেও একাধিক বার বর্ণিত হয়েছে এর ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ وقد رَوَى هٰذا الحديثَ غيرُ الخ এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম নাসায়ী (র) এর উক্তি وَقَدْ رَوَى هٰذا الحَدِيثَ غَيْرُ الخ .... এর ব্যাখ্যা হচ্ছে অত্র হাদীসটি হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া এবং হাম্মাদ ইবনে যায়েদ দু'জন থেকেই বর্ণিত আছে। তবে হাম্মাদ এর বর্ণনায় وَتَوَضَّئِي শব্দ রয়েছে, আর হিশামের বর্ণনায় এ শব্দটি নেই। এমনকি হিশাম থেকে অনেকেই অনুরূপ রেওয়ায়াত করেছেন। এর দ্বারা ইমাম নাসায়ীর উদ্দেশ্য হচ্ছে হাম্মাদের রিওয়ায়াতের চেয়ে হিশামের রিওয়ায়াত অধিক বিশুদ্ধ কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকট উভয় বর্ণনাই বিশুদ্ধ। কেননা, زِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ তথা নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত শব্দ গ্রহণযোগ্য।

سوال : من هو ابو عبد الرحمن؟

প্রশ্ন ঃ আবু আব্দুর রহমান কে?

উত্তর ঃ আবু আব্দুর রহমানের পরিচিতি ঃ

আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত আবু আব্দুর রহমান হচ্ছে ইমাম নাসায়ী (র) এর উপনাম, তাঁর প্রকৃত নাম হল আহমদ ইবনে শুয়াইব। তিনি নাসা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন বিধায় তাকে ইমাম নাসায়ী বলা হয়।

হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

ذِكْرُ الْإِغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ এর শিরোনামের অধীনে যে আলোচনা করা হয়েছে এখানেও সেই আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু এখানকার সূত্র ভিন্ন।

আলোচ্য হাদীস দ্বারা শাফেয়ীদের দলীল ঃ শাফেয়ী মাযহাবের মাসলাক হল হায়েয শুরু হওয়া এবং শেষ হওয়ার ভিত্তি হল রক্তের রং এর উপর যদি রক্তের রং গাঢ়ো কালো বর্ণের হয় এবং লাল বর্ণের হয় তাহলে এটা হায়েয অন্যথায় নয়। হুজুর (স) ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশকে বলেন, হায়েযের রক্ত কালো হয়ে থাকে, যাকে দেখলেই চেনা যায়। যখন এ ধরণের রক্ত নির্গত হয় তখন নামায ছেড়ে দাও। এটা ভিন্ন অন্য কোন রক্ত নির্গত হলে, বুঝতে হবে এটা হায়েয নয় বরং ইস্তিহাযা। হায়েয শেষ হলে একবার গোসল করতে হবে। অতঃপর প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করবে। মোটকথা, ইমাম শাফেয়ী (র) ইস্তিহাযা ও হায়েযের মধ্যে পাথর্ক্য নির্ণয় করার জন্য মানদণ্ড বির্ধারণ করেছেন রক্তের রংকে। আর আহনাফ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের মানদণ্ড নির্ধারণ করেন, অভ্যাস ও দিনকে।

আহনাফের দলীল ঃ পূর্বে ذِكْرُ الْإِغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ এর অধীনে ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশের ব্যাখ্যায় অতিবাহিত হয়েছে।

শাফেয়ীদের দলীলের জবাব

حديث الباب দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র) প্রমাণ পেশ করেন। এর জবাব হল–

১. উরওয়া ইবনে যুবায়েরের এই হাদীস মুরসাল, কাজেই মারফূ হাদীসের মোকাবেলায় এটা প্রমাণ হতে পারে না। মুরসাল এ কারণে যে, ইমাম ত্বহাবী (র) মুশকিলুল আছার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এই হাদীসকে মুহাম্মাদ ইবনে আবী আদী থেকে রেওয়ায়াত করেন এবং হাদীসটিকে উরওয়া এর উপর মাওকুফ রেখেছেন। আয়েশা (রা) পর্যন্ত পৌছান নি।

২. এ হাদীসে ইযতিরাব রয়েছে, ইমাম বায়হাকী (র) এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে, যখন উক্ত রেওয়ায়াতকে মুহাম্মাদ ইবনে আদী পাণ্ডুলিপি থেকে শুনান তখন عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُبَيْشٍ এর সূত্রে বর্ণনা করেন। আর যখন মুখস্ত বর্ণনা করতেন তখন তাকে عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ এর সূত্রে বর্ণনা করতেন। এটা إِضْطِرَاب এর সুরত।

৩. এছাড়াও অনেক حُفَّاظ حَدِيث এ হাদীসের উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন। যেমন ইবনে কাত্তান বলেন, আমার দৃষ্টিতে হাদীসটি মুনকাতে।

ইবনে আবী হাতেম স্বীয় গ্রন্থ, ইলাল এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, আমি আমার পিতার নিকট হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হাদীসটি মুনকার। (জাওহারুন নুকা ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং৮৬)

৪. অপরদিকে স্বয়ং ইমাম নাসায়ী (র)ও হাদীসটি معلول হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন–

اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابى عدى هذا من كتابه অতঃপর বলেন–

اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابى عدى من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو ... الخ

এটাই ইযতিরাব। অনুরূপভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবনে আবী আদী (র) উক্ত হাদীসকে পাণ্ডুলিপি থেকে বর্ণনা করার সময় عن عروة عن فَاطِمَةَ এর সূত্র উল্লেখ করেন। আর মুখস্ত বর্ণনা করার সময় عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

عائشة এর সূত্র উল্লেখ করতেন। কাজেই নিশ্চিতভাবে জানা যায় না যে, হাদীসটি কি আয়েশার, নাকি ফাতেমা বিনতে কায়সের। ইবনে হযম (র) উক্ত হাদীসকে বিশুদ্ধ বলেছেন। কাজেই তার কিতাব "মুহাল্লা" এর মধ্যে উক্ত ইযতিরাবের জবাব দেয়ার জন্য বলেন, এ ধরণের ইযতিরাব দ্বারা হাদীস দ্বয়ীফ হওয়া লাযেম আসে না। কেননা, উরওয়া উক্ত হাদীসকে আয়েশা ও ফাতেমা উভয় থেকে শুনেছেন। তাই উভয় থেকে বর্ণনা করেন, সেখানে তাদের মাঝে সাক্ষাৎ প্রমাণিত আছে।

قوله إن دم الحيض دم أسود يعرف ঃ এটাকে শুধুমাত্র ইবনে আবী আদী উল্লেখ করেছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কোন রাবী তাকে উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে ইমাম ত্বহাবী মুশকিলুল আছার নামক গ্রন্থে লিখেন যে, উক্ত হাদীসকে শুধুমাত্র মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না উরওয়ার মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে উল্লেখ করেছেন এবং তার রেওয়ায়াতে রক্তের কথা উল্লেখ রয়েছে। আর অন্যান্য রাবী উরওয়া ইবনে যুবায়েরের উপর মাওকুফ রাখেন। সকলে ফাতেমা বিনতে কায়স এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার রেওয়ায়াতে রক্তের রং এর কথা উল্লেখ নেই, কাজেই دم الحيض دم أسود يعرف এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। মোটকথা ইমাম নাসায়ী ইবনে আবী হাতেম ইমাম ত্বহাবীর উল্লেখিত বক্তব্যের ফলে এ ধরণের হাদীস প্রমাণ হতে পারে না। আর যে, হাদীসের মধ্যে এ ধরণের ইল্লত বিদ্যমান তা আহকামের ক্ষেত্রে প্রমাণযোগ্য হতে পারে না। বিশেষ করে বুখারী ও মুসলিম শরীফে অভ্যাস ও দিন এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই হায়েয নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অভ্যাস ও দিনকেই মানদণ্ড নির্ধারণ করে প্রাধান্য দেয়া হবে। আর যদি হাদীসের বিশুদ্ধতাকে স্বীকার করেও নেয়া হয়, যেমন ইবনে হযম এর বক্তব্য। তাহলে তার জবাবে মোল্লা আলী ক্বারী (র) বলেন, উক্ত হাদীস আমাদের নিকট মহিলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যে রং এর মাধ্যমে হায়েয নির্ণয়ে অভ্যস্ত বা অভিজ্ঞ এবং রং দেখা মাত্রই সে তা নির্ণয় করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কোন মহিলার হায়েয কালো বর্ণের হয়ে থাকে এবং এমনটাই সর্ব সময় হয়। কাজেই যেহেতু রংটা তার অভ্যাসের অনুযায়ী হয়েছে। তাই এটাকেই তার হায়েয নির্ণয়ের মানদণ্ড ধরবে কিন্তু এটা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। আর ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) তিনি معتادة ও ছিলেন, অনুরূপভাবে مميزة ও ছিলেন। তাই কখনো তিনি সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। আবার কখনো রক্তের রং এর কথা উল্লেখ করেছেন।

এ আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, দলীলের দৃঢ় ও শক্তিশালী হওয়ার দিক দিয়ে আহনাফের মাযহাব প্রাধান্য পাবে।

তৃতীয় হাদীস সম্পর্কে আলোচনা

তৃতীয় রেওয়ায়াতে ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ এর ঘটনা উল্লেখ করার পর ইমাম নাসায়ী বলেন, قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئ غير عمار بن زيد - توضئ শব্দটি উল্লেখ করার ব্যাপারে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ متفرد কাজেই সহীহ মুসলিমে توضئ শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে। হিশামের সাগরেদের মধ্য হতে কেউ এমনটি রেওয়ায়াত করেন নি, অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম (র) বলেন, হাম্মাদ توضئ শব্দটি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে متفرد কিন্তু তার এ দাবী সঠিক নয়। কারণ এ অংশটুকু অন্য সূত্র দ্বারা প্রমাণিত। কেননা আল্লামা ইবনে তুরকুমানী (র) বলেন, শব্দটি হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ متفرد নন। বরং হিশাম থেকে আবু আওয়ানাও অনুরূপ রেওয়ায়াত করেছেন। এটাকেই ইমাম ত্বহাবী كتاب الرد على الكرابيسي। তে আবু আওয়ানার মাধ্যমসহ توضئ শব্দ রেওয়ায়াত করেছেন। অনুরূপভাবে হাম্মাদ ইবনে সালামাও এটাকে উরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দারেমী উক্ত শব্দকে হাম্মাদ ইবনে সালামার সূত্রে এনেছেন এবং ইবনে হিব্বানও উক্ত অতিরিক্ত অংশকে স্বীয় গ্রন্থে আবু হামজার সূত্রে রেওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বায়হাকী (র) বলেন توضئ শব্দটি হিশাম থেকে আবু হানীফা (র)ও রেওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তিরমিযী توضئ শব্দটিকে হিশাম ইবনে উরওয়ার থেকে রেওয়ায়াতকারী রাবী আবু মুআবিয়ার সূত্রে এনেছেন এবং সেটাকে সহীহ বলেছেন। মোটকথা, আবু হানীফা, আবু আওয়ানা, আবু হামজা (র) সকলেই আদেল ও নির্ভরযোগ্য রাবী এবং সকলেই হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। কাজেই ইমাম মুসলিমের দাবি توضئ শুধুমাত্র হাম্মাদ ইবনে যায়েদ

রেওয়ায়াত করেছেন এটা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি শুধুমাত্র হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বর্ণনা করতেন তাহলেও এটা যথেষ্ট হতো। কেননা, তিনি নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাবী। তার স্মৃতিশক্তি ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কি প্রশ্ন থাকতে পারে যার থেকে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম নাসায়ী (র) যে বলেছেন এটা হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ব্যতীত অন্য কেউ রেওয়ায়াত করেননি। আমরা উক্ত মুখালাফাতকে মানি না। কেননা, এটা নির্ভরযোগ্য রাবীই বৃদ্ধি করেছেন যা গ্রহণযোগ্য।

ইবনে রুশদ বলেন, আহলে হাদীসের একটি দলও এটাকে সহীহ বলেছেন। দ্বিতীয়ত: এ অতিরিক্ত অংশটুকু আবু দাউদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। (বায়হাকী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩২৫)

قوله وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ এখানকার এ অতিরিক্ত অংশ পূর্বের অতিরিক্ত অংশকে সমর্থন ও শক্তিশালী করে। সারকথা হল, مُسْتَحَاضَةٌ مُعْتَادَة এর জন্য শরীয়তের বিধান হল হায়েযের দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর একবার গোসল ফরয। এখন প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করবে না কি প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য উযূ করবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম আবু হানীফা, আহমদ, যুফার, আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের নিকট ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে উযূ করবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যত ইচ্ছা ফরয নফল ইত্যাদি আদায় করবে।

২. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা প্রত্যেক ফরয নামাযের জন্য উযূ করবে অতঃপর ফরজের সংশ্লিষ্ট হিসেবে নফল ও সুন্নত আদায় করবে। এই উযূ দ্বারা নফল ও সুন্নত আদায় করবে তবে অন্য ফরয নামায আদায় করা যাবে না।

৩. ইমাম মালেক, রবিয়া ও দাউদে জাহেরীর নিকট প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কেননা, তাদের নিকট ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলার রক্ত হদস (অপবিত্র) নয়।

ইমাম মালেকের দলীল ঃ তাঁর দলীল হল ফাতেমা বিনতে হুবাইশ এর হাদীসের শেষ অংশ–

فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّىْ

এর দ্বারা নিজের মাযহাবের উপর প্রমাণ পেশ করেন যে, হায়েয শেষ হওয়ার পর একবার গোসল করবে এরপর যদি রক্ত দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে তাকে শুধুমাত্র ধৌত করেই নামায আদায় করবে। এর দ্বারা বুঝা যায় এস্তেহাযার রক্ত উযূ ভঙ্গকারী নয়। কিন্তু রাসূল (স) এর এ বাণী তাদের মতের সমর্থনে প্রমাণ হতে পারে না। কেননা, তিরমিযীর রেওয়ায়াতে تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ حَتّٰى يَجِئَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ এসেছে। ফাতহুল বারীতে হাফেজ ইবনে হাজার আসাকালানী এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম শাফেয়ীর দলীল ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) তিরমিযীর রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, তা হল– تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتّٰى يَجِئَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ ইবনে মাজাহ এর রেওয়ায়াতে এসেছে– الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ

আবু হানীফা (র) এর দলীল ঃ

ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযীর এ রেওয়ায়াত تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, কোন কোন মুহাদ্দীস এ অতিরিক্ত অংশকে গরীব বলেছেন, অথচ বাস্তবতা এমনটা নয়। বরং ইবনে কুদামা বলেন, ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ এর কোন কোন সূত্রে হুবহু এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, تَوَضَّئِىْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ কাজেই এ হাদীসের উপর غرابت এর সম্বন্ধ করা বিশুদ্ধ নয়। মুখতাছারুত্ত ত্বহাবীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে আছে যে, ইমাম আবু হানীফা হিশাম থেকে তিনি তার পিতা উরওয়া থেকে তিনি আয়েশা থেকে রেওয়ায়াত করেন–

إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِىْ حُبَيْشٍ وَتَوَضَّئِىْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ.

ইমাম মুহাম্মাদ (র) اصل এ মধ্যে এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এখন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকলো না যে, হাদীসটি تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ এর তুলনায় মুহকাম, যা ইমাম শাফেয়ী (র) এর প্রমাণ। কেননা, আহনাফের

হাদীসে অন্য কিছুর সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে لِكُلِّ صَلٰوةٍ এর মধ্যে অন্য কিছুর ইহ্‌তিমাল বিদ্যমান। কেননা, صلوة শব্দ উল্লেখ করে وقت صلوة উদ্দেশ্য নেয়ার বিষয়টি উরফে বহুল প্রচলিত। যেমন হাদীসে এসেছে–

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا فَيْمَا اَدْرَكَتْنِي الصَّلٰوةُ تَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ

এখানে صلوة শব্দ দ্বারা وقت صلوة উদ্দেশ্য نفس صلوة নয়। ওরফে বলা হয় اَتَيْتُكَ لِصَلٰوةِ الظُّهْرِ اى لِوَقْتِهَا অনুরূপ বলা হয় اِنَّ لِلصَّلٰوةِ اولاً واخرًا তথা নামাযের শুরু শেষ ওয়াক্ত আছে। শরয়ী পরিভাষায় صلوة শব্দ বলে وقت صلوة উদ্দেশ্য নেয়া বৈধ। কিন্তু এটা বৈধ নয় যে, وقت উল্লেখ করে তার দ্বারা صلوة উদ্দেশ্য নেয়া হবে। কাজেই এই مُحْتَمَلٌ বিষয়টিকে مُحْكَمٌ এর উপর প্রয়োগ করা জরুরী, যাতে করে উভয় প্রকার দলীলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। অনুরূপভাবে আহনাফের মাযহাব শরয়ী বিধানের মূলনীতির অনুকূলে। কেননা, وقت কে اداء এর স্থলাভিষিক্ত করা হবে। যাতে করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপর তার আমল করা সহজ হয়। কেননা, অনেক সময় দুই বা ততোধিক ফরয আদায় করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এখন যদি وقت - اداء স্থলাভিষিক্ত না হয় তাহলে মানুষের সমস্যায় পড়তে হবে। আর এটা শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ২৯৮ -২৯০-২৯১-২৯২)

سوال : اُذْكُرْ نَبْذَةً مِّنْ حَيَاةِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ موضحًا

প্রশ্ন ঃ হামনা বিনতে জাহাশ (র) এর জীবনী লেখ।

উত্তর ঃ নাম ও পরিচিতি ঃ নাম হামনা, পিতার নাম জাহশ, মাতার নাম উমাইমা। তিনি রাসূল (স) এর ফুফু ছিলেন। তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহশ এর ভগ্নি।

বংশপরম্পরা ঃ হামনা বিনতে জাহশ (র) ইবনে রিয়াব ইবনে ইয়ামুর ইবনে সাবরাহ ইবনে মুররাহ ইবনে কবীর ইবনে গানাম ইবনে আসাদ ইবনে খুযাইমা।

দাম্পত্য জীবন : তার প্রথম বিবাহ হয় হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (র) এর সাথে। উহুদের যুদ্ধে হযরত মুসআব (রা) শাহাদাত লাভ করলে তার দ্বিতীয় বিবাহ হয় হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) এর সাথে।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ তিনি এবং তার স্বামী মুসআব একই সাথে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেন।

হিজরত ঃ মক্কায় যখন অত্যাচার ও নির্যাতনের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন অন্যান্যের ন্যায় হযরত হামনা (রা) স্বীয় স্বামীসহ মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন।

বাইআতে অংশগ্রহণ ঃ রাসূল (স) এর হাতে যে সব আনসার ও মুহাজির বাইয়াত গ্রহণ করেছেন, হযরত হামনা তাদের একজন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, তিনি বাইয়াত গ্রহনকারী নারীদের অন্তর্ভুক্ত।

জিহাদ ঃ তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। যোদ্ধাদেরকে পানি পান করানো ও আহতদের সেবা শুশ্রূষা করা তাঁর দায়িত্ব ছিল।

ইফকের ঘটনায় সংশ্লিষ্টতা ঃ ইফকের ঘটনায় তিনি ভুলবশত; হযরত আয়েশা (রা) এর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহন করেছিলেন। যার ফলে হযরত আয়েশা (রা) অত্যন্ত ব্যথিত হন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) হামনার ইফকের ঘটনায় জড়ানোর কারণ প্রসঙ্গে বলেন, হামনার উদ্দেশ্য ছিল তার বোন যয়নবকে রাসূল (স) এর কাছে আরো প্রিয় করে তোলা এবং হযরত আয়েশা থেকে খাটো করা। আশ্চর্যের ব্যাপার হল ইফকের ঘটনায় হযরত যয়নব (রা) স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা) এর পক্ষে ছিলেন।

সন্তান সন্তুতি : হযরত তালহা (রা) এর ঔরসে তাঁর গর্ভে মুহাম্মাদ ও ইরান নামক দুটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তারা মুহাম্মাদ ও সাজ্জাদ উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিল।

ওফাত ঃ তার মৃত্যু ২০/২১ সনে ওফাত লাভ করেন। (ইসাবা : ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৭৫)

بَابُ النَّهْىِ عَنْ اِغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ

٢٢١. اخبرنا سُلَيْمَانُ بنُ داود والحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ قراءةً عليه وانا اَسْمَعُ واللَّفْظُ لَه عن ابنِ وهبٍ عن عمرو بْنِ الحارِثِ عن بُكَيْرٍ انّ ابا السَّائبِ اخبره انّه سَمِعَ ابا هُرَيرة يقولُ قال رسولُ اللّهِ ﷺ لا يَغْتَسِلُ احدُكُم فِى الماءِ الدَّائمِ وهو جُنُبٌ -

بابُ النَّهْيِ عَنِ البَوْلِ فِى المَاءِ الرَّاكِدِ وَالْاِغْتِسَالُ مِنْه

٢٢٢. اخبرنا محمدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بنِ يزيدَ المُقرِئُ عَنْ سُفيانَ عَنْ اَبِى الزِّنادِ عن موسى بنِ اَبِىْ عُثمانَ عَنْ اَبِيْهِ عن ابىْ هريرةَ اَنّ رَسُوْلَ اللّه ﷺ قال لا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُم فِى المَاءِ الرَّاكدِ ثمّ يغتسِلُ مِنْه -

بابُ ذكرِ الْاِغْتِسَالِ اوّلَ اللَّيْلِ

٢٢٣. اخبرنا عمرو بْنُ هِشَامٍ قال حدَّثنا مَخْلَدٌ عَنْ سُفيانَ عَنْ اَبِى الْعَلاءِ عَنْ عُبادةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الحارِثِ انه سَالَ عائشةَ اىَّ اللَّيْلِ كانَ يَغْتَسِلُ رسولُ اللّهِ ﷺ قالتْ رُبَّما اِغْتَسَلَ اوّلَ اللَّيْلِ ورُبَّما اغتسل اٰخِرَهُ قلتُ الحمدُ لِلّهِ الّذى جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً -

---

অনুচ্ছেদ ঃ বদ্ধ পানিতে জুনুবী ব্যক্তির গোসল না করা

অনুবাদ ঃ ২২১. সুলায়মান ইবনে দাউদ ও হারিছ ইবনে মিসকীন (র).........বুকায়র (র) থেকে বর্ণিত। আবু সায়িব তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন জানাবত অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে।

অনুচ্ছেদ ঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব এবং তাতে গোসল না করা

২২২. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ফরমায়েছেন, তোমাদে কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে যাতে পরে সে তাতেই গোসল করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ রাতের প্রথমভাগে গোসল করা

২২৩. আমর ইবনে হিশাম (র)......গুযায়ফ ইবনে হারিস (র) থেকে বর্ণিত। িনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) রাতের কোন অংশে গোসল করতেন? তিনি বললেন, কোন কোন সময় তিনি রাতে প্রথম ভাগে গোসল করতেন আবার কোন কোন সময় রারে শেষ ভাগে গোসল করতেন। আমি বললাম, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি এ ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله لَايَغْسِلُ اَحَدُكُمْ ঃ কাজী আয়ায (র) বলেন, নিষিদ্ধতাকে বিশেষ অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। এর দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে পানি জুনুবী ব্যক্তির গোসলে ব্যবহার করা হয়– যদি তা স্থির ও বদ্ধ পানি হয় এবং তা পরিমানেও কম হয়। তাহলে পূর্বের অবস্থায় বহাল থাকবে না। বরং তার হুকুম পরিবর্তন হয়ে যাবে। যদি বিষয়টি এমনই না হয় তাহলে এখানে قيد বৃদ্ধি করার মধ্যে কোন ফায়দা নেই। প্রথম অবস্থার উপর বাকী না থাকার কারণ হল পবিত্রতার গুণ দূর হয়ে যাওয়া। (তথা পানি অপবিত্র হওয়া)। এটাই ইমাম আবু হানীফা (র) এর একটি রেওয়ায়াত অথবা زوال طهوريّت তথা পানি পবিত্র থাকে কিন্তু অপরকে পবিত্র করার ক্ষমতা রাখে না। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র) এর বক্তব্য। ইমাম আবু হানীফা (র) এর অপর একটি রেওয়ায়াত এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর বক্তব্য এটাই এবং এর উপরেই ফাতওয়া।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, আলোচ্য হাদীস এ কথার উপর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, مستعمل তথা ব্যবহৃত পানি غير طهور সহীহ মুসলিমে এসেছে হযরত আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করা হল যে, জুনুবী ব্যক্তিকে যখন নিষেধ করা হল এখন সে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করবে? তিনি বললেন অ লি ভরে পানি উত্তোলন করবে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জুনুবী ব্যক্তি যদি পানি নেয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় হাতকে পাত্রে প্রবেশ করায় তাহলে ঐ বদ্ধ পানির হুকুম পরিবর্তন হবে না বরং পানি পবিত্র থাকবে। শাফেয়ী ও হানাফী উভয় মাযহাবের বক্তব্য এটাই। এ হাদীস থেকে এটাও বুঝা যায় যে, যদি পানি বেশী হয় এবং প্রশস্ত জায়গায় বিস্তৃত থাকে তাহলে তাতে জানাবাতের গোসল করার দ্বারা পানি অপবিত্র হবে না।

قوله لَايَبُولَنَّ اَحَدُكُمْ فِيْ .... الخ ঃ ১. জুমহুর উলামা কিরাম বলেন, কোন স্থির এবং অল্প পানিতে নাপাক পড়ার দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যায়।

২. দাউদে জাহেরীর মতে যতক্ষণ পর্যন্ত পানির প্রবাহ ও তরলতা বাকী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পানি নাপাক হয় না। প্রমাণ হল আল্লাহ তাআলার বাণী– وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا জুমহুর উলামা বলেন, তার এ কথার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

কখন পানি নাপাক হবে

১. ইমাম মালেক (র) বলেন, পানির তিনটি গুণের কোন একটি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত পানি নাপাক হবে না। গুণগুলো হল– স্বাদ, ঘ্রাণ ও রং। চাই পানি কম হোক কিংবা বেশি হোক। দলীল হল–

اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لَايُنَجِّسُهُ شَيْئٌ

২. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, পানি যদি দু'কুল্লা বা এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে তাকে বেশি পানি বলা হবে এবং এতে নাপাক পড়লে পানি নাপাক হবে না। এর চেয়ে কম হলে তাতে নাপাক পড়লে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে।

দলীল ঃ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

৩. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, পানির কম ও বেশীর কোন পরিমাণ নির্ধারিত নয়, বরং এটাকে مُبْتَلٰى بِهٖ তথা লোকটির রায়ের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। সে যদি বেশি বলে, তাহলে তাতে নাপাক পড়লে পানি অপবিত্র হবে না বরং পবিত্র থাকবে। আর যদি কম মনে হয় তাহলে তাতে নাপাক পড়ার দ্বারা অপবিত্র হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে কোন নির্ধারিত পরিমাণ নির্ধারিত নয়। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস আমাদের মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল ও প্রতি পক্ষের দলীলের জবাব। একথা স্পষ্ট যে সামান্য পরিমাণ পেশাব বেশী পানিতে পড়লে তার রং, স্বাদ, ঘ্রাণ পরিবর্তন করে না। তা সত্ত্বেও নবী করীম (স) উক্ত কাজ থেকে বাধা প্রদান করেছেন। আর এ নিষিদ্ধতার মধ্যে কোন পরিমাণ নির্ধারণ নেই। চাই তা দুই কুল্লা হোক অথবা তার থেকে বেশি হোক কিংবা কম হোক পানির রং পরিবর্তন হোক কিংবা না হোক সকল ক্ষেত্রে পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। এই নিষেধ করাই একথার প্রমাণ যে, তাতে নাপাক পতিত হওয়ার দ্বারা পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। মোটকথা, বদ্ধ পানিতে নাপাক পতিত হওয়ার দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যায়। এ হাদীস দ্বারা হানাফী মাযহাবের সমর্থন পাওয়া যায় এবং এটা মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের বিপক্ষে প্রমাণ বহন করে।

আলোচ্য হাদীসে الرَّاكد কে الماء এর সিফত হিসাবে আনা হয়েছে। এটা হুকুমের কয়েদ নয়, কাজেই এর থেকে এই বিধান ইস্তিম্বাত করা যাবে না যে, প্রবাহমান পানিতে পেশাব করা বৈধ। বরং এই কয়েদ বৃদ্ধি করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, একথার দিকে ইঙ্গিত করা যে, বদ্ধ পানিতে পেশাব করা সীমাহীন খারাপ ও নিকৃষ্ট কাজ। কাজেই রাসূলের বাণীর মর্মার্থ হল, তোমরা কখনই পানিতে পেশাব করবে না। বিশেষ করে বদ্ধ পানিতে। কেননা, এতে পেশাব করা সব থেকে নিকৃষ্ট কাজ। কারণ এর দ্বারা পানি ব্যবহারযোগ্য থাকে না। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পেছনে بَابُ الْمَاءِ الدَّائِمِ এর শিরোনামের অধীনে অতিবাহিত হয়েছে।)

الْإِغْتِسَالُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

٢٢٤. اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن برد عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة فسألتها قلت أكان رسول الله ﷺ يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة -

রাতের প্রথমাংশে ও শেষাংশে গোসল করা

অনুবাদ ঃ ২২৪. ইয়াহইয়া ইবনে হাবীব (র)........ গুযায়ফ ইবনে হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (স) রাতের প্রথম ভাগে গোসল করতেন না শেষ ভাগে? তিনি বললেন, সব রকমই করেছেন। কোন সময় রাতের প্রথমভাগে গোসল করেছেন, আবার কোন সময় রাতের শেষভাগে গোসল করেছেন। আমি বললাম, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি এ ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন।

তাত্ত্বিক আলোচনা

প্রথম হাদীস সম্পর্কে আলোচনা ঃ আলোচ্য হাদীসের রাবী হল গুযাইফ ইবনে হারেস।

আলোচ্য হাদীসের রাবী সাহাবী ছিলেন নাকি তাবেয়ী

ইবনে আবী হাতেম বলেন, আমার পিতা এবং আবু যুরআ বলেন, তিনি সাহাবী ছিলেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী ও অন্যান্যগণও তাকে সাহাবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু ইবনে সা'দ সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাকে তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাকে নির্ভরযোগ্য রাবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

রাসূল (স) কখন গোসল করতেন

হাদীসের রাবী হযরত আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর (স) জানাবাতের গোসল তৎক্ষণাত করতেন, না রাতের শেষ ভাগ পর্যন্ত বিলম্ব করতেন? হযরত আয়েশা (রা) জবাব দিলেন, রাসূল (স) এর অবস্থা বিভিন্ন ধরণের ছিল। কখনো তিনি রাতের শুরু ভাগে গোসল করতেন, আবার কখনো রাতের শেষভাবে গোসল করতেন। প্রথম সুরতটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অধিক নিকটবর্তী। আবার কখনো উম্মতের উপর সহজ করণার্থে এবং বৈধতার বিবরণ দেয়ার জন্য রাত্রের শেষ ভাগে গোসল করেছেন। এরপর গুযাইফ ইবনে হারেস বলেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি দিনের মধ্যে এমন প্রশস্ততা দান করেছেন এবং দীনের বিধান পালন করাকে সহজ করেছেন।

কারণ তিনি আমাদের জন্য উভয় সুরতকে বৈধ করে রেখেছেন। এই বৈধতাকে রাসূল (স) আমলের মাধ্যমে উম্মতের সামনে পেশ করেছেন। এখানে কেউ বলতে পারে যে, আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে বিলম্বে গোসল করা বৈধ। এর উপর প্রমাণ পেশ করা বিশুদ্ধ নয়। কেননা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, হুজুর (স) রাতের প্রথম ভাগে গোসল তখন করতে যখন জানাবাতটা রাতের শুরু ভাগে সংঘঠিত হতো। আর যখন রাতের শেষ ভাগে জানাবাতটা সম্পৃক্ত হতো তখন তিনি রাতের শেষভাগে গোসল করতেন। তাদের একথার জবাব হল, প্রশ্নের ধরণ, প্রশ্নকারীর বক্তব্য الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً। এবং হযরত আয়েশা (রা) এর ভাষ্য দ্বারা বিলম্বে গোসল করার বৈধতা সাব্যস্ত হয়। এটা আলোচ্য হাদীস থেকেই গৃহীত।

بَابُ ذِكْرِ الْاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ

٢٢٥. اخبرنا مُجاهدُ بْنُ موسى قال حدّثنا عبدُ الرّحمٰن بْنِ مَهْدِيّ قال حدّثني يحيى بْنُ الوليدِ قال حدّثني محلُّ بْنُ خَلِيفَةَ قال حدّثني ابو السَّمْحِ قال كنتُ اَخْدِمُ رسولَ اللّٰه ﷺ فكانَ اذا ارادَ انْ يَغْتَسِلَ قال وَلِّنِي قَفَاكَ فأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَاَسْتُرُهُ بِهِ -

٢٢٦. اخبرنا يعقوبُ بْنُ ابراهيمَ عَنْ عَبْدِ الرّحمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ اَبِي طَالِبٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ اَنَّهَا ذَهَبَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَتْ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قلتُ اُمُّ هَانِئٍ فلمّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلّٰى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِيْ ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের সময় পর্দা করা

অনুবাদ ঃ ২২৫. মুজাহিদ ইবনে মূসা (র)........মুহিল ইবনে খলীফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুস সামহ্ (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমত করতাম। তিনি যখন গোসল করার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি বলতেন, তোমার পিঠটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দাও, তখন আমি আমার পিঠ তাঁর দিকে ঘুরিয়ে দিতাম। এভাবে তাঁকে পর্দা করতাম।

২২৬. ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র)........উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি গোসল করছেন আর ফাতিমা (রা) তাঁকে একখানা কাপড় দ্বারা পর্দা করে আছেন, তিনি তাঁকে সালাম করলেন, তিনি বললেন ইনি কে? আমি বললাম, আমি 'উম্মে হানী' : তিনি গোসল শেষ করলেন এবং পরে একখানা কাপড় জড়িয়ে আট রাকআত নামায আদায় করলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

যদি কারো গোসলের প্রয়োজন হয় তাহলে তার দুই সুরত- ১. একাকি গোসল করা, এক্ষেত্রে পর্দার তেমন গুরুত্ব নেই। উলঙ্গ হয়েও গোসল করা বৈধ। অবশ্য উত্তম হল পর্দাসহকারে গোসল করা। কেননা, কেউ না দেখলে তো আল্লাহ ও ফেরেশতারা দেখেন। দ্বিতীয়ত: শয়তানের কুদৃষ্টিও পড়তে পারে।

২. দ্বিতীয় সুরত হল, লোকজনের সাথে গোসল করা। এক্ষেত্রে বিধান হল, পর্দাসহকারে গোসল করা জরুরী।

[পূর্বের বাকী অংশ]

উক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা নবী করীম এর উদ্দেশ্য ঃ উক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা নবী করীম (স) এর উদ্দেশ্য হল, গোসল করার নিয়ামাবলী শিক্ষা দেয়া। নবী (স) এর আমল দ্বারা বুঝা যায় গোসল করার সময় লোকজন থাকলে পর্দা করা আবশ্যক। পর্দাহীনতার সাথে গোসল করা আকল ও শরীয়তের দৃষ্টিতে খুবই নিকৃষ্ট। দ্বিতীয় রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় গোসলকারীর জন্য কথা বলার অনুমতি আছে। এতে তার অনুমতি مَنْ هذا থেকে বুঝে আসে। কারণ যখন উম্মে হাণী নবী (স) এর নিকট পৌঁছান তখন উম্মে হানী বলেন, مَنْ هٰذا অথচ তিনি তখন গোসল করছিলেন। যা হোক এই রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যখন হুজুর (স) গোসল থেকে ফারেগ হল। তখন فَصَلّٰى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ .. الخ। নবী (স) একটি কাপড় শরীরে জড়ায়ে ৮ রাকাত নামায আদায় করলেন। উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনও মুতাআখখিরীন এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, চাশতের নামায ৮ রাকাত এবং হাফেজ ইবনে আব্দুল বার তামহীদ নামক গ্রন্থে ইকরামা ইবনে খালেদ উম্মে হানী থেকে রেওয়ায়াত করেন, তিনি বলেন নবী (স) মক্কায় তাশরীফ আনেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন ৮ রাকাত নামায আদায় করেন। নবী (স) কে জিজ্ঞেস করা হল এটা কোন নামায? তিনি বলেন, هٰذا صَلٰوةُ الضُّحٰى কাযী ইয়াযসহ কেউ কেউ বলেন, নবী (স) মক্কা বিজয়ের শুকরিয়া স্বরূপ ৮ রাকাত নামায আদায় করেন। কেউ কেউ এটাকে চাশতের নামায হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ তখন চাশতের সময় ছিল। (শরহে উর্দু নাসায়ী : ২৯৫)

بَابُ ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِى يَكْتَفِى بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

٢٢٧. اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابى زائدة عن موسى الجهنى قال اتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية ارطال فقال حدثنى عائشة ان رسول الله ﷺ كان يغتسل بمثل هذا -

٢٢٨. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن ابى بكر بن حفص سمعت ابا سلمة قال دخلت على عائشة واخوها من الرضاعة فسالها عن غسل النبى ﷺ فدعت باناء فيه ماء قدر صاع فسترت سترا فاغتسلت فافرغت على راسها ثلثا -

٢٢٩. اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت كان رسول الله ﷺ يغتسل فى القدح هو الفرق وكنت اغتسل انا وهو فى اناء واحد -

٢٣٠. اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جعفر قال سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله ﷺ يتوضا بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكى -

٢٣١. اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابى اسحق عن ابى جعفر قال تمارينا فى الغسل عند جابر بن عبد الله فقال جابر يكفى من الغسل من الجنابة صاع من ماء قلنا ما يكفى صاع ولا صاعان قال جابر قدكان يكفى من كان خيرا منكم واكثر شعرا -

---

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের গোসলের জন্য পানির পরিমাণ

অনুবাদ ঃ ২২৭. মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ (র)....... মুসা জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুজাহিদ (র)-এর নিকট একটি পেয়ালা আনা হল, আমার অনুমান তাতে আট রতল পরিমাণ পানি হবে। পরে তিনি বললেন, আমাকে আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) এ পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন।

২২৮. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)..... আবু বকর ইবনে হাফ্স (র) থেকে বর্ণিত। আমি আবু সালামাকে বলতে শুনেছি, আমি এবং আয়েশা (রা)-এর দুধ ভাই তাঁর নিকট গেলাম। তার ভাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোসল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি এমন একটি পাত্র আনলেন যাতে এক সা' পরিমাণ পানি ছিল। তারপর তিনি যথাযথ পর্দা করে গোসল করলেন এবং তাঁর মাথায় তিন বার পানি ঢাললেন।

২২৯. কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এমন এক পানির পাত্রে গোসল করতেন যার নাম হল ফারাক (যাতে ষোল রতুল পানি ধরত)। আর আমি এবং তিনি একই পাত্রে গোসল করতাম।

২৩০. সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (র)..........আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (স) এক মাক্কূক দ্বারা উযূ করতেন এবং গোসল করতেন পাঁচ মাক্কূক দ্বারা।

২৩১. কুতায়বা ইবনে সা'ঈদ (র)...... আবুজাফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহর সম্মুখে গোসলের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হলাম, তখন জাবির (রা) বললেন, জানাবাতের গোসলে এক সা পানিই যথেষ্ট। আমরা বললাম এক সা' অথবা দুই সা' কোনরূপই যথেষ্ট নয়। জাবির বললেন, তোমাদের থেকে উত্তম ও অধিক কেশযুক্ত ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহ স-এর) জন্য যথেষ্ট হতো।

তাত্ত্বিক আলোচনা

প্রথম হাদীস মূসা জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। এটা শক্তিশালী। এ রেওয়ায়াত এর দ্বারা বুঝা যায় আট রতল পরিমাপক পাত্রকে صاع বলে। ওলামায়ে আহনাফ এটারই প্রবক্তা। এটা হানাফীদের বক্তব্যের সমার্থক, صاع এর পরিমাণ নির্ধারণ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ بَابُ الْقَدْرِ الَّذِىْ يَكْتَفِىْ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوْءِ এ শিরোনামের অধীনে অতিবাহিত হয়েছে।

দ্বিতীয় রেওয়ায়াত সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এটা আবু সালমা থেকে বর্ণিত। আবু সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ হযরত উম্মে কুলসুম এর দুধ ছেলে। আর উম্মে কুলসুম হল হযরত আয়েশা (রা) এর বোন। তাই আয়েশা (রা) আবু সালামার খালা ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি যে আবু সালামার সাথে হযরত আয়েশা (রা) এর নিকট গমন করেন সে কে ছিল? এ ব্যাপারে বুখারীর রেওয়ায়াতে এসেছে সে আয়েশা (রা) এর ভাই ছিল। দাউদী বলেন, তিনি হল, আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) ফাতহুল বারীতে উক্ত কথাকে অশুদ্ধ বলেছেন। কেননা, ইমাম মুসলিম (র) মুযায়ের সূত্রে, ইমাম নাসায়ী খালেদ ইবনে হারেসের সূত্রে এবং আবু আওয়ানা ইয়াযিদ ইবনে হারুনের সূত্রে তারা সকলেই শোবা থেকে উক্ত হাদীস اَخُوْهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ শব্দ উল্লেখ করেছেন যে, সে আয়েশা (রা) এর রেযায়ী ভাই ছিল। মোটকথা, ইমাম মুসলিম, নাসায়ী ও আবু আওয়ানার রেওয়ায়াত অনুযায়ী সাব্যস্ত হয় যে, সে আয়েশা (রা) এর রেযায়ী ভাই। কাজেই বুখারীর রেওয়ায়াতে অস্পষ্টভাবে যে বলা হয়েছে اَخُوْ عَائِشَةَ এর দ্বারা আয়েশা (রা) এর দুধ ভাই-ই উদ্দেশ্য। কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় তিনি হল, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ।

সুতরাং ইমাম নববী ও কোন কোন ব্যাখ্যাকার মুসলিম শরীফের كِتَابُ الْجَنَائِزِ এর একটি রেওয়ায়াত যা بِوَاسِطَةِ اَبُوْ قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيْعُ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ এর সনদে বর্ণিত, এর উপর ভিত্তি করে বলেন- আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ হযরত আশেয়া (রা) এর দুধ ভাই। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, আমার নিশ্চিতভাবে জানা নেই যে, নবী করীম (স) এর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য যে ব্যক্তি আবু সালামার সাথে হযরত আয়েশা (রা) এর দরবারে উপস্থিত হন তার দ্বারা আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ উদ্দেশ্য। কেননা, আয়েশা (রা) এর অপর আরেকজন দুধ ভাই আছে যাকে কাছীর ইবনে উবাইদ বলা হয়। তিনিও হযরত আয়েশা (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার হাদীস বুখারী শরীফের كِتَابُ اَدَبِ الْمُفْرَدِ এর মধ্যে আছে। আর আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ বসরী আর কাছীর ইবনে উবাইদ কুফী হতে পারে তাদের কোন একজন।

যা হোক আবু সালামা এবং হযরত আয়েশা (রা) এর দুধভাই। উভয়ে হযরত আয়েশা (রা) এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং তাকে হুজুর (স) এর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। হযরত আয়েশা (রা) একটি পাত্র চান যাতে এক সা. পরিমাণ পানি ছিল। অতঃপর গোসল করেন এবং মাথায় তিনবার পানি ঢালেন কিন্তু গোসলের সময় আমাদের ও তাঁর মাঝে পর্দা ছিল। যেহেতু তারা উভয় মুহরিম ছিলেন, কাজেই মাথার অংশ পর্দামুক্ত ছিল। তারা উভয় গোসল কোথা হতে শুরু করেন তা দেখছিলেন। কাজী আয়াজ লেখেন, আলোচ্য হাদীস দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, তারা হযরত আয়েশা (রা) এর মাথা এবং শরীরের উপরের অংশ যা দেখা মুহরিমের জন্য বৈধ সে অংশটুকু গোসল করতে দেখেন। অবশ্য আভ্যান্তরিণ অংশ যা মুহরিম থেকেও পর্দাবৃত রাখা ফরয। তা পর্দাবৃত ছিল। কেননা, তারা যদি গোসল না দেখতে পারে, তাহলে তাদের সম্মুখে গোসল করা অনর্থক। আর রাবী দেখা ছাড়া فَاَفْرَغَتْ عَلٰى رَاْسِهَا ثَلَاثًا বলতেন না।

মোটকথা, হযরত আয়েশা (রা) এর উক্ত আমল দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমলের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া মুস্তাহাব। কাজেই তাদের দুই জনের জিজ্ঞেসের পর হযরত আয়েশা (রা) নবী (স) এর গোসলের পদ্ধতি তাদের সম্মুখে দেখান। আর সলফ এর মধ্যে আমলী তালীম এর প্রচলন রয়েছে। কেননা, এর দ্বারা অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ হয় এবং অন্তর সংশয় মুক্ত হয়।

তৃতীয় হাদীস সম্পর্কে আলোচনা

তৃতীয় হাদীসে এসেছে নবী করীম (স) ফরক নামক একটি পাত্রে গোসল করতেন। فرق হল ১৬ রতল পরিমাপক পাত্র। কেননা, আবু উবাইদা এ ব্যাপারে আহলে লুগাতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা নকল করেছেন। তিনি বলেন, فرق তিন সা' ও ১৬ রতল পরিমাপক পাত্রকে বলা হয়।

ফয়যুলবারীতে আছে فرق তিন সা' ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট পাত্র। কাজেই যদি পাত্রটি গোসলের সময় ভর্তি থাকে তাহলে হুজুর (স) এবং হযরত আয়েশা (রা) উভয়ের অংশে দেড় দেড় সা' করে আসে। হতে পারে কখনো নবী (স) ঐ পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করেছেন। যদিও তিনি অধিকাংশ সময় এক সা' পানি দ্বারা গোসল করতেন। আর যদি পাত্রটি ভর্তি না থাকে তাহলে প্রত্যেকের অংশে এক এক সা' করে আসে। কাজেই فرق এর পরিমাণ তিন সা' করে আসে। কাজেই فرق এর পরিমাণ তিন সা' হওয়ার দ্বারা এটা অনিবার্য হয় না যে, তাতেও এ পরিমাণ পানি ছিল, হতে পারে তিনি তার অভ্যাস অনুযায়ী এক সা' পানি দ্বারা গোসল করতেন।

চতুর্থ হাদীস সম্পর্কে আলোচনা

চতুর্থ বর্ণনায় এসেছে নবী (স) এক মুদ পানি দ্বারা উযূ করতেন এবং পাঁচ মুদ পানি দ্বারা গোসল করতেন। অথচ পূর্বের হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী (স) একপাত্র পানি দ্বারা গোসল করতেন, যাকে فرق বলা হয়, এতে তিন সা' পরিমাণ পানি ধরে। আর তার পূর্ববর্তী রেওয়ায়াতে এসেছে যে, তিনি এক সা' পানি দ্বারা গোসল করতেন। ইমাম শাফেয়ী (র) এ দ্বন্দ্বের সমাধান নিম্নরূপ প্রদান করেছেন– রেওয়ায়াতের মধ্যে যে পানি বিভিন্ন পরিমাণ বর্ণনা করা হয়েছে এটা তাঁর বিভিন্ন অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। তথা যখন নবী (স) এর নিকট অধিক পরিমান পানির ব্যবস্থা থাকত তখন তিনি বেশী পানি দ্বারা উযূ করতেন। আবার যখন কম পানির ব্যবস্থা থাকতো তখন তিনি কম পানি দ্বারা গোসল করতেন। এর দ্বারা বুঝা যায় গোসলের পানির নির্ধারিত এমন কোন পরিমাণ নেই যার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। এখন যদি তার কোন পারিমাণ নির্দিষ্ট করা হয় তাহলে উম্মতের উপর কষ্টকর হয়ে যাবে।

মোটকথা, উল্লেখিত রেওয়ায়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, এক সা' পানি দ্বারা গোসল করলে যথেষ্ট হবে। এক সা' পানিই ব্যবহার করতে হবে এটা আবশ্যক নয়। এক সা' পানি দ্বারা কেউ যদি গোসল করে তাহলে এটা যথেষ্ট হবে, অবশ্য যদি প্রয়োজনবশত: কেউ এর থেকে অধিক পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করে তাহলে এটা নিষিদ্ধ নয়। তবে অপচয় থেকে বেঁচে থাকা চাই। অনুচ্ছেদের শেষ হাদীসে হযরত যয়নুল আবেদীন (র) এর পুত্র আবু জা'ফর (র) বলেন, আমরা হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট গোসল সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। কেউ বলেন, গোসলের জন্য এ পরিমাণ পানি জরুরী। কেউ বলেন এ পরিমাণ যথেষ্ট এর কম দ্বারা গোসল করলে যথেষ্ট হবে না। হযরত জাবের বলেন, জানাবাতের গোসলের জন্য এক সা' পানি যথেষ্ট। তার এ বক্তব্যের উপর মজলিসের এক ব্যক্তি আপত্তি উত্থাপন করলো (সে হল হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবী তালেব) যে, আমার এক সা' তো দূরের কথা দুই সা' পানি দ্বারাও গোসল যথেষ্ট হয় না। এরপর হযরত জাবের (রা) কঠোরতার সাথে বলেন। قَدْ يَكْفِى مَنْ كَانَ خَيْرًا مِّنْكُمْ ... الخ গোসল করার জন্য নবী (স) এর এক সা' পানি যথেষ্ট হতো, অথচ তাঁর মাথায় তোমার থেকে বেশী চুল ছিল। তাহলে তোমাদের কেনো এক সা' পানি দ্বারা গোসল যথেষ্ট হবে না? এর দ্বারা বুঝা যায় তুমি গুরুত্ব ও যত্নসহকারে গোসল কর না। তুমি যদি অপচয় ব্যতিরেকে পানি ব্যবহার করতে তাহলে এক 'সা' পানিই তোমার গোসলের জন্য যথেষ্ট হতো।

এ রেওয়ায়াত থেকে এটাও বুঝে আসে যে, উলামায়ে সলফ নবী (স) এর কর্মের দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন এবং তাঁরই অনুসরণ করতেন। এটাও বুঝে আসে যে, কেউ যদি অজ্ঞতার সাথে বিতর্ক করে তাহলে কঠোরতার সাথে তার প্রতিত্তোর করা বৈধ। যখন সে সত্যকে প্রকাশ ও শ্রোতাদেরকে সতর্ক করার ইচ্ছা করে এর দ্বারা এটাও বুঝে আসে যে, প্রয়োজন বশত গোসলের জন্য যে পরিমাণ পানি দরকার তা ব্যবহার করার অনুমতি আছে, তবে অপচয় করা মাকরূহ। (শরহে উর্দু নাসায়ী : ২৯৭-২৯৮-২৯৯)

দ্রষ্টব্য * মাককুক অর্থ মুদ্দ। আর এক মুদ্দ ইরাকের ফকীহগণের নিকট ২ রতল বা প্রায় একলিটার এবং হিজাযের ফকীহগণের মতে ১ রতল ও ১ রতলের তিন ভাগের এক ভাগ বা পৌনে ১ লিটার প্রায়।

* ৫ মাককুক ইরাকী ফকীহগণের নিকট ১০ রতল বা পৌনে ৫লিটার প্রায়। আর হিজাযের ফকীহগণের নিকট ৩ লিটারের একটু বেশী।

* ১সা' সকলের নিকট ৪ মুদ্দ। ইরাকী হিসাব মতে তাতে হয় ৮ রতল বা পৌনে ৪ লিটার প্রায়। আর হিজাযী হিসাব মতে তাতে হয় ৫. ৩৩ রতল বা আড়াই লিটার। উল্লেখ্য, ১ রতল=৪০ তোলা। (নাসাঈ ১/ ১৫০)

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (র) এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম জাবির, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ ও আবু আব্দুর রহমান, পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এবং মাতার নাম নাসীবাহ। তিনি খাযরাজ গোত্রের সুলাম শাখায় জন্মগ্রহণ করেন, তার দাদা আমর একজন প্রভাবশালী গোত্রপতি ছিলেন।

জন্ম ঃ এ মহান সাহাবী প্রিয় নবী (স) এর মদীনায় হিজরত এর পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত জাবির (রা) এর বয়স যখন ১৮ বছর তখন তিনি তাঁর পিতার সাথে মক্কায় আগমন করে আকাবার দ্বিতীয় বায়আত গ্রহণের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার কারো কারো মতে প্রথম আকাবার ৭ জন আগন্তুক এর একজন হিসেবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ ঃ হযরত জাবির (রা) বয়সের স্বল্পতার কারণে বদর এবং উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর পিতা উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত অর্জন করার পর তিনি প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মোট ১৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু যুবাইর সূত্রে ইবনুল আসীর বর্ণনা করেন–

انَّهٗ سَمِعَ جابرًا رض يَقُوْلُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ عَشَرَةَ غَزْوَةً.

বিশেষ গুণাবলী ঃ হযরত জাবির (রা) খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূল (স) ও সাহাবীগণকে আহারের জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি হযরত আলী ও মুয়াবিয়া (রা) এর বিরোধকালে হযরত আলী (রা) এর পক্ষ সমর্থন করেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ নামায (দেরীতে পড়লে তিনি তার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। মসজিদে নববী থেকে তাঁর বাসা এক মাইল দূর হওয়া সত্ত্বেও তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতে আদায় করতেন। রাসূল (স) এর সাথে হযরত জাবির (রা) এর যথেষ্ট মিল ছিল। রাসূল (স) তার জন্য প্রাণ খুলে বিশেষভাবে দোয়া করতেন।

হাদীসের খেদমত ঃ তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম, তাঁর থেকে সর্বমোট ১৫৪০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে متفق عليه ৬০টি এবং এককভাবে বুখারী ও মুসলিম ২৬টি করে বর্ণনা করেছেন। হযরত জাবের (রা) দীর্ঘদিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে হাদীস শিক্ষাদান কার্যে লিপ্ত ছিলেন। বহু লোক তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তিকাল ঃ হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি ৯৪ বছর বয়সে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিকের আমলে ৭৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে সমাহিত করা হয়। (ইকমাল: ৫৮৯ ইসাবা ঃ ১/২১৩ ইত্যাদি)

بابُ ذِكرِ الدَّلالةِ عَلى انّهُ لاوقتَ فِيْ ذٰلِكَ

٢٣٢. اخبَرنا سُوَيْدُ بْنُ نصرٍ قال حَدَّثَنا عبدُ اللّٰهِ عَن معمرٍ عَنِ الزُّهريِّ ح واَخْبَرَنا اسحٰقُ بْنُ اِبراهيمَ قال حدثنا عبدُ الرَّزَّاقِ قال اَنْبَانَا معمرٌ وابنُ جُريجٍ عنِ الزُّهري عن عُروةَ عنْ عائشةَ قالتْ كنتُ اَغْتَسِلُ انَا ورسولُ اللّٰه ﷺ مِنْ اناءٍ واحدٍ وهو قدرُ الفَرَقِ -

بابُ ذكرِ اِغْتِسالِ الرَّجُلِ والمَراةِ مِن نِسائهِ مِن اِناءٍ واحدٍ

٢٣٣. اخبَرنا سُويدُ بْنُ نصرٍ قال اَنْبَانا عبدُ اللّٰه عن هشامِ بْنِ عُروة ح واخبرَنا قُتَيْبَةُ عنْ مالكٍ عنْ هشامِ بْنِ عُرْوةَ عَن ابيهِ عَن عائشةَ اَنّ رسولَ اللّٰهِ ﷺ كانَ يَغْتَسِلُ وانَا مِن اناءٍ واحدٍ نَغْتَرِفُ مِنه جميعًا -

٢٣٤. اخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الاَعْلٰى قال حدّثنا خالدٌ قال حدّثنا شعبةُ قال حدّثنِى عبدُ الرحمٰن ابنِ القاسمِ قال سمعتُ القاسمَ يُحدِّثُ عنْ عائشةَ قالتْ كنتُ اَغْتَسِلُ انا ورسولُ اللّٰهِ ﷺ مِن اناءٍ واحدٍ مِنَ الجَنابةِ -

٢٣٥. اخبَرنا قُتيبةُ بْنُ سعيدٍ حدّثنا عبيدةُ بْنُ حُميدٍ عَن منصورٍ عَن ابراهيمَ عَن الاَسودِ عَن عائشةَ رضى الله عَنها قالتْ لقدْ رَايْتُنِى اُنَازِعُ رسولَ اللّٰهِ ﷺ الاناءَ اَغْتَسِلُ انَا وهُو مِنْه -

٢٣٦. اخبَرنا عمرُو بْنُ علىٍّ قال حدّثنا يَحْيٰى قال حدّثنا سفيانُ قال حدّثنِى منصورٌ عَن ابراهيمَ عَنِ الاَسْودِ عَن عائشةَ قالتْ كنتُ اَغْتَسِلُ انا ورسولُ اللّٰهِ ﷺ مِن اِناءٍ واحدٍ -

٢٣٧. اخبَرنا يحيٰى بنُ موسٰى عن سفيانَ عن عمرٍو عنْ جابرِ بْنِ زيدٍ عنِ ابْنِ عبّاسٍ قال اَخْبرَتْنِىْ خالتِىْ ميمونةُ انَّها كانتْ تغتسِلُ ورسولُ اللّٰهِ ﷺ مِن اناءٍ واحدٍ -

٢٣٨. اخبَرنا سُويدُ بْنُ نصرٍ قال حدّثنا عبدُ اللّٰه عن سعيدِ بْنِ يزيدَ قال سمعتُ عبدَ الرحمٰن بنِ هُرمُزَ الاَعْرَجِ يقولُ حدّثنِى ناعمٌ مَولٰى امِّ سلَمَةَ اَنَّ امَّ سَلَمَةَ سُئِلتْ اَتَغْتَسلُ المَراةُ معَ الرَّجُلِ قالتْ نَعَمْ اذا كانتْ كَيِّسَةً رَايْتُنِىْ ورسول الله ﷺ نغتسل من مركن واحد نفيض على اَيْدِيْنا حتّٰى نُنْقِيَها حتّٰى نُفِيْضَ عليْها الماءَ قال الاَعْرَجُ لاتَذْكُر فَرْجًا ولاتُبالِهِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ না থাকার বর্ণনা

অনুবাদ ঃ ২৩২. সুওয়ায়দ ইবনে নাসর ও ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)..........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স) একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আর সে পাত্রটি ছিল ফারাক (ষোল রিতল পরিমাপের) পরিমাণ একটি পাত্র)।

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী এবং স্ত্রীর একই পাত্র থেকে গোসল করা

২৩৩. সুওয়ায়দ ইবনে নাসর ও কুতায়বা (র).......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এবং আমি একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমরা অঞ্জলিপূর্ণ করে তা থেকে একই সময় পানি নিতাম।

২৩৪. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স) একই পাত্র থেকে জানাবাতের গোসল করতাম।

২৩৫. কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্মরণ আছে, আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স) যে পাত্র থেকে গোসল করতাম। তা নিয়ে আমি ও রাসূলুল্লাহ (স) টানাটানি করতাম।

২৩৬. আমর ইবনে আলী (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স) একই পাত্র থেকে গোসল করতাম।

২৩৭. ইয়াহ্‌য়া ইবনে মূসা (র)...... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার খালা মায়মুনা (রা) জানিয়েছেন, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ (স) একই পাত্র থেকে গোসল করতেন।

২৩৮. সুওয়াদ ইবনে নাসর (র)...... আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয আল-আ'রজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উম্মে সালামার আযাদকৃত গোলাম না'য়িম বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, স্ত্রী কি পুরুষের সাথে গোসল করতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, করতে পারে যখন স্ত্রী বুদ্ধিমতী হয়। আমার স্মরণ আছে, আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স) একই টব থেকে গোসল করতাম। আমরা আমাদের উভয় হাতে পানি ঢালতাম এবং তা ধুইতাম, পরে তার উপর পানি ঢালতাম। আ'রজ (র) 'বুদ্ধিমতী'-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যে লজ্জাস্থানের উল্লেখ করে না এবং নির্বোধ মহিলার ন্যায় আচরণ করে না।'

প্রথম অন্‌চ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

৩আলোচ্য শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, গোসলের জন্য যে পানি ব্যবহার করা হয় তার নির্ধারিত কোন পরিমাণ নেই যে, তার কারণে তার থেকে কম -বেশী পানি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হবে। মুসান্নিফ (র) এটাকেই আয়েশা (রা) বাণী وهُوَ قَدْرُ الفَرَقِ থেকে ইস্তিম্বাত করেছেন। কেননা, তার কথা উরফের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথার উপর প্রমাণ বহন করে যে, এ বক্তব্যটি হল تَخْمِيْنِيْ তথা অনুমান নির্ভর তাহকীকী বা প্রকৃত নয়। যদি বাস্তবেই তার কোন নির্ধারিত পরিমাণ থাকতো তাহলে আয়েশা (রা) অস্পষ্ট বাক্যের মাধ্যমে এটা ব্যক্ত করতেন না। বরং স্পষ্টভাবে তার পরিমাণ বর্ণনা করে দিতেন যে, এর থেকে কম বেশী করার কোন অবকাশ নেই। অথবা, মুসান্নিফ (র) শিরোনামকে এ উদ্দেশ্য কায়েম করেছেন যে, পূর্বের শিরোনামের তৃতীয় রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে নবী (স) একাকি গোসল করার সময় একটি পাত্র ব্যবহার করতেন, তাকে فرق বলা হয়। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় নবী (স) ও আয়েশা (রা) উভয়ে একত্রে فرق নামক একটি পাত্র হতে গোসল করতেন। মোটকথা, উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা ইমাম নাসায়ী (র) এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, গোসলের পানির মধ্যে এমন কোন নির্ধারিত পরিমাণ নেই যার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী এবং এর থেকে কম বেশী করার কোন সুযোগ নেই। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ২৯৯)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ শিরোনামের বিস্তারিত আলোচনা بَابُ فَضْلِ الْجُنُبِ শিরোনামের অধীনে পিছে অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই এ সংশ্লিষ্ট আলোচনা সেখানে দেখুন। হাদীসটি উম্মে সালামা (র) এর আযাদকৃত গোলাম নায়েম থেকে বর্ণিত। أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ হযরত উম্মে সালামা (রা) কে জিজ্ঞেস করা হল মহিলা কি পুরুষের সাথে গোসল করতে পারবে? হযরত উম্মে সালামা জবাবে বললেন হ্যাঁ পারবে, তবে শর্ত হল মহিলা বুদ্ধিমতী হতে হবে। কোন কোন ব্যাখ্যাতা বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল পুরুষের সাথে মহিলা যদি শালীনতাবোধ রক্ষা করে সুন্দর পন্থায় গোসল করে তাহলে শরীয়তে এটা নিষিদ্ধ নয়। راقم الحروف বলে, كَيِّسَةً এর তাফসীর হল তার কওল, لاتَذْكُرُ فَرْجًا وَلاَتُبَالِهِ এটাকে মুসান্নিফ (র) হাদীসের শেষে উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল যদি স্ত্রী গুপ্তাঙ্গের আলোচনা না করে এবং বোকা ও মুর্খ ব্যক্তিদের ন্যায় কোন বোকামী কর্ম-কাণ্ড না করে তাহলে এমন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে গোসল করতে পারে। মোটকথা, উম্মে সালামার ফাতওয়া দ্বারা বুঝা যায় স্ত্রী স্বামীর সাথে গোসল করতে পারে। যখন সে আত্মরক্ষা ও সতর্কতামূলক পন্থা অবলম্বন করে। তার আমলও ফাতওয়ার মুতাবেক ছিল। কাজেই তিনি বলেন, আমি ও রাসূল (স) উভয়ে এক পাত্রে গোসল করতাম। যেমন তার বাণী– تَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ وَاحِدٍ ...... الخ

بَابُ ذِكْرِ النَّهْىِ عَنِ الْاِغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

٢٣٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الْاَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا صَحِبَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَرْبَعَ سِنِيْنَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَمْتَشِطَ اَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ اَوْ يَبُوْلَ فِىْ مُغْتَسَلِهِ اَوْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْاَةِ اَوِ الْمَرْاَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا -

---

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী ব্যক্তির উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা গোসল করার নিষেধাজ্ঞা

অনুবাদ ঃ ২৩৯. কুতায়বা (র)...... হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষাৎ লাভ করেছি এমন এক ব্যক্তির যিনি চার বৎসর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন যেরূপ আবু হুরায়রা (রা) তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের প্রতিদিন মাথা আঁচড়াতে এবং পানিতে বা গোসলের স্থানে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। আর স্ত্রীর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষের এবং পুরুষের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা স্ত্রীর গোসল করতে এবং তাদের একত্রে অঞ্জলি দিয়ে পানি নিতেও নিষেধ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে পুরুষ ও নারীর একে অপরের উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তা বিধানগতভাবে নয় বরং উত্তমতার জন্য বলেছেন। কেননা, রাসূল (স) ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে একে অপরের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা গোসল করার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর প্রতিদিন মাথায় চিরুনী করা বিলাসিতার পরিচায়ক। রাসূল (স) একদিন পর পর চিরুনী করতেন, বিলাসিতা না হলে দৈনন্দিন চিরুনী করাতে কোনো আপত্তি নেই। আর গোসলখানায় পেশাব করলে তাতে গোসলের সময় পেশাবের মিশ্রিত পানি শরীরে লাগার সম্ভাবনা থাকে যার ফলে মনে ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি হতে পারে। তাই গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। যদি এরূপ না হয় তবে তা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। (শরহে মিশকাত : ১/৩৫৫)

দুটি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল (স) স্ত্রী লোকের ব্যবহারের পর অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতেন পুরুষ লোককে নিষেধ করেছেন। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) তার জনৈক স্ত্রীর গোসল করার পর সে গামলা হতে পানি নিয়ে উযূ করেছেন। কাজেই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান নিম্নরূপ–

১. হুমাইদ হিমযালীর বর্ণিত হাদীস মাকরূহে তানযীহীর উপর প্রযোজ্য; তাহরীমীর উপর নয়।

২. অথবা, নিষেধ করাটা অপরিচিত স্ত্রীলোকের ব্যবহারের উদ্বৃত্ত পানির ব্যাপারে ছিল। সেখানে অসাবধানতা বা কামভাব জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. অথবা, এ হাদীসটির আমলযোগ্য নয়। কেননা, ইমাম বুখারী এটাকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন।

(আনওয়ারুল মিশকাত ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৫৪)

হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

قوله لقيت رجلا ... الخ ঃ আলোচ্য হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য। কিন্তু হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ঐ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি যার সাথে সাক্ষাত হয়েছিল এবং যার থেকে তিনি হাদীসটি রেওয়ায়াত করেন। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস, অথবা, হাকাম ইবনে আমর গিফারী অথবা, আব্দুল্লাহ

ইবনে মুগাফফাল মাযানী ছিলেন। বজলুল মাজহুদ গ্রন্থকার বলেন, যার নাম ত্যাগ করা হয়েছে সে নিঃসন্দেহে সাহাবী ছিলেন। আর নিঃসন্দেহে সাহাবীদের রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য যদিও রেওয়ায়াতে সাহাবীর নাম উল্লেখ করা না হয়। কেননা, সকল সাহাবা আদেল, যাবেত ও মুসলমান ছিলেন। এ ব্যাপারে কারো কোন ধরণের মতানৈক্য নেই।

আলোচ্য রেওয়ায়াতে যে সকল কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে ঃ আলোচ্য রেওয়ায়াতে কয়েকটি কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এই নিষেধাজ্ঞাটা হল তানযীহী; তাহরীমী নয়।

উপরোক্ত আলোচনার উপর আপত্তি ও তার সমাধান

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, শামায়েল কিতাবে ইমাম তিরমিযী (র) হযরত আনাস (রা) হতে রেওয়ায়াত করেন যে, হুজুর (স) মাথায় অধিক পরিমাণ তেল ব্যবহার করতেন এবং দাড়িতেও চিরুনী করতেন।

উত্তর ঃ উক্ত আপত্তির উত্তর হল, অধিক পরিমাণ চিরুনী করার দ্বারা এটা অনিবার্য হয় না যে, প্রত্যেকদিন নবী (স) চিরুনী করতেন এবং كثرت কখনো প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। মোটকথা, চিরুনী করা সুন্নত। কিন্তু এটা যেন সীমাতিরিক্ত না হয়। কতক লোকের অভ্যাস আছে যে, তারা প্রত্যেক উযূর পর চিরুনী করে। এর কোন ভিত্তি নেই।

২. গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পেছনে অতিবাহিত হয়েছে।

৩. পুরুষের জন্য মহিলার ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল করা এবং মহিলার জন্য পুরুষের অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল করতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا বলে তার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং এখন পুরুষ-মহিলা কোর ভরে ভরে একই পাত্র হতে পানি উঠাবে এবং গোসল করবে এখানে দুটি সুরত রয়েছে– ১. পুরুষ মহিলার বেঁচে যাওয়া অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল করা।

২. পুরুষের বেঁচে যাওয়া পানি দ্বারা মহিলার গোসল করা। এখানে প্রথম সুরতকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ দ্বারা যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় সুরতটি হল বৈধ। وَلْيَغْتَرِفَا جميعا দ্বারা এ সুরতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ সুরত বৈধ হওয়ার ব্যাপারে উলামাদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কারণ রেওয়ায়াতের ভিন্নতা রয়েছে। আলোচ্য হাদীস দ্বারা মহিলার ব্যবহৃত অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল করা নাজায়েয সাব্যস্ত হয় কিন্তু অন্য রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় পুরুষ মহিলার ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল সম্পাদন করতে পারবে। যেমন ইবনে আব্বাস (রা) এর রেওয়ায়াত– নবী (স) এর স্ত্রীদের কোন একজন এক পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করলেন। অতঃপর রাসূল (স) তার বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট পানি দ্বারা উযূ করলেন। তখন স্ত্রী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জুনুবী। তিনি বললেন, اَلْمَاءُ لَايُجْنِبُ। পানি অপবিত্র হয় না। ইমাম তিরমিযী এটা রেওয়ায়াত করে حسن صحيح বলেছেন। আর নাসায়ী (র) এর রেওয়ায়াতে إِنَّ الْمَاءَ لَايُنَجِّسُهُ شَيْءٌ অর্থাৎ নবী (স) বলেন, শরীয়তে যে জিনিস দ্বারা পানি নাপাক হওয়ার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে তা ব্যতীত অন্য কোন জিনিস পানিকে নাপাক করতে পারে না। আর মহিলার গোসল করা সে সব জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই মহিলারা যে পাত্র হতে উযূ-গোসল করেছে তার উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষের জন্য উযূ গোসল করা বৈধ।

মোটকথা, মহিলার উদ্ধৃতি পানি ব্যবহার করা পুরুষের জন্য বৈধ। এতদসংক্রান্ত রেওয়ায়াত দ্বারা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের বিপরীত হুকুম সাব্যস্ত হয়। কাজেই উভয় প্রকার রেওয়ায়াতের মধ্যে বৈপরত্যি দেখা যাচ্ছে, এ দ্বন্দ্বের সমাধান দিতে গিয়ে উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন জবাব প্রদান করেছেন। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, নিষেধাজ্ঞার রেওয়ায়াতের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা উদ্দেশ্য হল–

ব্যবহৃত পানি যাকে ماء مستعمل বলা হয় তা। কাজেই এটা ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু মহিলার উযূ-গোসলের উদ্বৃত্ত পানি যা পাত্রে রয়েছে তা ব্যবহার করার অনুমতি আছে। কিন্তু মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এ ব্যাখ্যাকে পছন্দ করেননি। কেননা, তখন ব্যবহৃত পানি (ماء مستعمل) ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। কাজেই এ থেকে নিষেধ করার কোন অর্থ হতে পারে না।

দ্বিতীয় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতে পাত্রের অবশিষ্ট পানি সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পাত্রে বেঁচে থাকা অতিরিক্ত পানি। রাসূল (স) তাদের এ ধারণাকে নির্মূল করার জন্য বলেন, إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ কাজেই এটাকে ماء مستعمل এর উপর প্রয়োগ করা কিভাবে সহীহ হয়?

২. কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, মহিলাদের মধ্যে বেশ কম আছে, আজনবী মহিলার উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা গোসল করা যাবে না। কেননা, যখন কোন পুরুষ জানতে পারবে যে, এ পানি থেকে অমুক মহিলা উযূ-গোসল করেছে, (হতে পারে শয়তান তাতে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করবে। ফলে ঐ মহিলার প্রতি অন্তর ধাবিত হবে এবং বিভিন্ন ধরণের জল্পনা-কল্পনা আসবে। অন্তর হতে এটা দূর করার জন্যে আজনবী মহিলার উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটাও অযৌক্তিক। রাসূলের বাণী يَغْتَرِفُ جَمِيعًا দ্বারা এটা ভুল সাব্যস্ত হয়। কেননা, রাসূলের এ বাণী এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, নিষেধাজ্ঞা স্বামী-স্ত্রীর পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য পুরুষ মহিলার মধ্যে একই সাথে একই পাত্র হতে অঞ্জলি ভরে পানি উত্তোলন করে গোসল করার অবকাশই নেই। এর দ্বারা বুঝা যায় অনুচ্ছেদের হাদীসের সাথে আজনবী মহিলার সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) এ দ্বন্দ্বের একটি সুন্দর সমাধান দিয়েছেন যে, আলোচ্য হাদীসের নিষেধাজ্ঞাটা তানযীহীর উপর প্রযোজ্য তাহরীমীর উপর নয়। এর করীণা বা আলামত হল বৈধতার হাদীসগুলো। কেননা, মাকরূহে তানযীহী বৈধতার সাথে মিলিত হতে পারে।

জুমহুর উলামার বক্তব্য এই যে, মহিলার উযূ গোসলের উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার পুরুষের জন্য বৈধ। অবশ্য ইমাম আহমদ ও দাউদ জাহেরী বলেন, মহিলা যদি একাকি উযূ-গোসল করে তাহলে তার উদ্বৃত্ত পানি পুরুষের জন্য ব্যবহারযোগ্য নয়।

মুতাআখখিরীন উলামায়ে কিরামের মধ্য হতে হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) এরও এই মত যে, এখানে মাকরূহ দ্বারা তানযীহী উদ্দেশ্য। তিনি আলোচ্য হাদীসের উদ্দেশ্য এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আলোচ্য হাদীসে উত্তম আদব ও সুন্দর আচার আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উত্তম সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে কোন প্রকার বৈরীতা সৃষ্টি না হয়। কাজেই প্রথম সুরতে নিষেধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় সুরতে একই পাত্র হতে অঞ্জলি ভরে গোসল করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ মহিলারা অভ্যাসগতভাবে নাপাক থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে খুব কম মনোযোগী। কাজেই পুরুষ তাদের উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করতে অপছন্দ করে। অনুরূপভাবে পুরুষের ব্যাপারে মহিলাদের ধারণাটা এমনই। যদিও তাদের এ ধারণা বাস্তবতার পরিপন্থী আর তা হল, পুরুষও উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে না। কাজেই তারা পুরুষের উদ্ধৃত পানি ব্যবহার করা অপছন্দ করে।

মোটকথা, উভয়ের তবিয়তের প্রতি লক্ষ্য রেখে শরীয়ত প্রণেতা নবী (স) পুরুষের জন্য মহিলার উদ্বৃত্ত পানি এবং মহিলার জন্য পুরুষের উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করার বিষয়টি উপযোগি মনে করলেন, যাতে করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোন ধরণের সংশয় সৃষ্টি না হয়। কিন্তু একত্রে গোসল করার সময় না কোন সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়, না ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয়। কাজেই যে সমস্ত লোক একে অপরের ঝুটা ব্যবহার করাকে অপছন্দ করে তারা আমভাবে একসাথে গোসল করাকে অপছন্দ করে না। দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি অপরের ঝুটা খাওয়াকে অপছন্দ করে কিন্তু একসাথে খানা খাওয়াকে অপছন্দ করে না। কেননা, সে এটাকে ঝুটা মনে করে না। এর দ্বারা বুঝা 'মাকরূহ হওয়াও না হওয়ার মূল হল ঝুটা হওয়া। কাজেই এক সাথে গোসল করলে এখানে কারো কোন সংশয় হয় না। বরং নির্দিধায় ও নিঃসংকোচে তারা পরস্পরে এক পাত্র হতে পানি ব্যবহার করে তাই শরীয়ত এ প্রকারের অনুমিত দিয়েছি। কিন্তু ভিন্ন ভিন্নভাবে গোসল করলে যেহেতু এতে বিভিন্ন ধরণের সন্দেহ সংশয় ও ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয়। কাজেই এ ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। আর এই নিষেধ হল শিষ্টাচারপূর্ণ আচার ব্যবহার শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং সন্দেহ সংশয় ও ওয়াসওয়াসাকে দূর করার জন্য। অন্যথায় পুরুষ মহিলার উদ্বৃত্ত পানি ও মহিলা পুরুষের উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করা বৈধ। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ৩০১-৩০২-৩০৩)

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

٢٤٠. اخبرنا محمدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ محمّدٍ قال حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ عاصمٍ ح واخبرنا سُوَيدُ بْنُ نَصْرٍ اخبرنا عبدُ اللّٰهِ عن عاصمٍ عَنْ مُعاذَةَ عَنْ عائشةَ قالتْ كنتُ أَغْتَسِلُ انا ورسولُ اللّٰه ﷺ مِنْ اناءٍ واحدٍ يُبادِرُنى وأُبادِرُه حتّى يقولَ دَعِىْ لِىْ واقولُ أنا دَعْ لِىْ قال سُوَيدُ يُبادِرُنِى وأُبادِرُه فاَقُولُ دَعْ لِىْ دَعْ لِىْ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ এ ব্যাপারে অনুমতি

অনুবাদ ঃ ২৪০. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার ও সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স) একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। তিনি আমার পূর্বে পানি নেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করতেন, আমি তাঁর পূর্বে নেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করতাম। এমনকি তিনি বলতেন, আমার জন্য রাখ, আর আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন। সুওয়ায়দ (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন– তিনি আমার পূর্বে ও আমি তাঁর পূর্বে পানি নেয়ার জন্য চেষ্টা করতাম। এক পর্যায়ে আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন, আমার জন্য রাখুন।

তাত্ত্বিক আলোচনা

মুসান্নিফ (র) উপরের অনুচ্ছেদে জুনুবীর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা গোসল করার নিষেধাজ্ঞার বিষয় আলোচনা করেছেন এবং উক্ত অনুচ্ছেদের অধীনে যে হাদীস আনা হয়েছে তা নিষেধাজ্ঞার উপর প্রমাণ বহন করে। উক্ত অনুচ্ছেদের পর দ্বিতীয় আরেকটি অনুচ্ছেদ কায়েম করার দ্বারা বৈধতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য এবং তার অধীনে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা বৈধতাই সাব্যস্ত হয়, যে জুনুবীর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা গোসলের অনুমতি আছে। হাদীসে গোসলের বয়ানটা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, এর দ্বারা বুঝা যায় নবী (স) ও আয়েশা (রা) উভয়ে প্রতিযোগিতার সাথে কে কার থেকে আগে পানি নিতে পারেন এ ব্যাপারে পাল্লা দিয়ে গোসল করছিলেন।

অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসে يُبَادِرُ وأُبَادِرُه শব্দ এসেছে। যদি প্রতিযোগিতা হুজুর (স) থেকে শুরু হয় তাহলে আয়েশা (রা) এরজন্য জুনুবীর উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করতে হবে, আর যদি আয়েশা (রা) হতে প্রতিযোগিতা শুরু হয় তাহলে আয়েশা (রা) এর উদ্বৃত্ত পানি (জুনুবীর পানি) ব্যবহার করতে হবে। যদি একজনের উদ্বৃত্ত পানি অপরজনের জন্য বৈধ না হতো তাহলে নবী (স) কখনো প্রতিযোগিতার সাথে গোসল করতেন না। কেননা, এর দ্বারা অপর জনের পানি নষ্ট করা অনিবার্য হয়। কিন্তু আমরা দেখি উক্ত হাদীসে مُبَادَرَتْ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয়ে একে অপরের আগে পানি আনার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতেন। নবী (স) এর এই কাজ দ্বারা জুনুবীর উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া যায় এবং পুরুষ মহিলা উভয়ে একে অপরের উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করার ও অনুমতি পাওয়া যায়। এটাই জুমহুরের মাযহাব। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ৩০৩-৩০৪)

بَابُ ذِكْرِ الاِغْتِسَالِ فِى الْقَصْعَةِ الَّتِى يُعْجَنُ فِيْهَا

٢٤١. اخبرنا محمدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ محمدٍ قال حدثنا عبدُ الرحمن قال حدثنا ابراهيمُ بْنُ نافعٍ عن ابنِ ابى نَجِيحٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَن امِّ هَانِئٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُوْنَةُ مِنْ اناءٍ واحِدٍ فِى قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ العَجِيْنِ -

بَابُ ذِكْرِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرِ رَاسِهَا عِنْدَ اِغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

٢٤٢. اخبرنا سُلَيمانُ بْنُ منصورٍ عَن سُفيانَ عَن ايوبَ بْنِ موسى عَن سعيدِ بْنِ ابى سعيدٍ عَنْ عبدِ اللّٰهِ بْنِ رافعٍ عَن امِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ ﷺ قالت قلتُ يا رسولَ اللّٰهِ اِنِّى امراةٌ شديدةُ ضفيرةِ رَاسِى اَفَاَنْقُضُهَا عندَ غُسْلِهَا مِنَ الجنابةِ قال اِنَّما يَكْفِيكَ اَنْ تَحْثِى عَلٰى رَاسِكِ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ مِن ماءٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلٰى جَسَدِكِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ আটা-খামির করার পাত্রে গোসল করা

অনুবাদ ঃ ২৪১. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার (র).........উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ও মায়মুনা (রা) একত্রে এমন পাত্রে গোসল করেছেন যাতে আটার খামিরের চিহ্ন ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ জানাবাতের গোসলে নারীর মাথার খোপা না খোলা

২৪২. সুলায়মান ইবনে মনসুর (র)..........নবী (স)-এর সহধর্মিনী উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাথার খোপা বেশ শক্ত হয়ে থাকে। আমি কি আমার জানাবাতের গোসলের সময় তা ধোয়ার জন্য খুলে ফেলবো? তিনি বললেন, তুমি তোমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিয়ে পরে তোমার শরীরে পানি ঢালবে।

প্রথম অনুচ্ছেদসংশ্লিষ্ট আলোচনা

قوله فِى قَصْعَةٍ ঃ فِىْ শব্দটি مِن اناء থেকে বদল হয়েছে। ای مِنْ قَصْعَةٍ এর অর্থে শব্দটি قصعة। কাঠের পেয়ালাকে বলে যাতে দশজন মানুষের খাদ্য ধরে। উক্ত পাত্রে আটার খামীরের চিহ্ন ছিল। কেননা, তাতে আটার খামীরা বানানো হতো এবং প্রয়োজনের সময় তাতে পানি ভরে গোসলও করা হতো। এ রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, অল্প পরিমাণ পবিত্র জিনিস যদি পানির সাথে মিশে যায় তাহলে পানিকে তার পবিত্রতার গুণ নষ্ট করে না। সুতরাং এ ধরণের পাত্রে গোসল করতে কোন সমস্যা নেই। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ৩০৪)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বিতয়ী অনুচ্ছেদের শিরোনাম যে উদ্দেশ্য কায়েম করা হয়েছে হাদীসের দালালত তার উপর স্পষ্ট। আর তা হল জুনুবী মহিলার জানাবাতের গোসলের সময় বেনীকৃত চুল খোলা জরুরী নয় বরং চুলের গোঁড়ায় পানি পৌছানই যথেষ্ট। যদিও আলোচ্য হাদীসটি এ ব্যাপারে নিশ্চুপ যে, চুলের গোঁড়ায় পানি পৌছানো শর্ত কি-না। কিন্তু সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীসের শব্দ হল- ثُمَّ تَصُبُّ عَلٰى رَاسِهَا فَتَدْلُكُهَا حَتّٰى تَبْلُغَ شُئُوْنَ رَاسِهَا চুলের গোঁড়ায় পানি পৌছানো যে ওয়াজিব তার উপর উক্ত হাদীসটি প্রমাণ বহণ করে। شئون অর্থ গোড়া/মূল। আলোচ্য হাদীসে যে ثلاث শব্দ এসেছে এটা ওয়াজিব বুঝানোর জন্য নয়। যেমন احياء السنن এর প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে। এ হাদীসের ব্যাখ্যাদানকালে আল্লামা যফর আহমদ উসামানী (র) বলেন, ثلاث এর কয়েদ ওয়াজিবমূলক নয়। অর্থাৎ এটা জরুরী নয় যে, মাথার উপর তিনবার পানি ঢালা আবশ্যক বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল চুলের গোঁড়ায় আদ্রতা পৌছে দেয়া। এখন এটা যদি এক অথবা দুইবার পানি ঢালার দ্বারা হাসিল হয় তাহলে তৃতীয়বার পানি ঢালার প্রয়োজন নেই। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ৩০৫) *[বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]*

بَابُ ذِكْرِ الْاَمْرِ بِذٰلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ لِلْاِحْرَامِ

٢٤٣. اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا اشهب عن مالك ان ابن شهاب وهشام ابن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع فاهللت بالعمرة فقدمت مكة وانا حائض فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله ﷺ فقال انقضى راسك وامتشطى واهلى بالحج ودعى العمرة ففعلت فلما قضينا الحج ارسلنى مع عبد الرحمن بن ابى بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قال ابو عبد الرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة ولم يروه احد الا اشهب -

ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهَا الْاِنَاءَ

٢٤٤. اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثنى ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتنى عائشة ان رسول الله ﷺ كان اذا اغتسل من الجنابة وضع له الاناء فيصب على يديه قبل ان يدخلهما الاناء حتى اذا غسل يديه ادخل يده اليمنى فى الاناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى اذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلثا ثم يصب على راسه ملأ كفيه ثلث مرات ثم يفيض على جسده -

---

অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামের গোসলে ঋতুমতির জন্য খোপা খোলার আদেশ

অনুবাদ ঃ ২৪৩. ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (র).. .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে বের হলাম, তারপর আমি উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলাম। আর আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হলাম। ফলে আমি কা'বা ঘরের অথবা সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করতে পারলাম না। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এ ব্যাপারে মনঃকষ্টের কথা জানালাম, তিনি বললেন, তুমি তোমার মাথার চুল খুলে ফেল এবং মাথা আঁচড়াও, আর হজ্বের ইহরাম বাঁধ উমরার নিয়ত ছাড়। আমি তাই করলাম। তারপর যখন আমরা হজ্বের কাজ সমাপ্ত করলাম, তিনি আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের সাথে তান'য়ীমে পাঠালেন। তখন আমি উমরা করলাম। তিনি বললেন, এ-ই তোমার উমরার স্থান। আবু আবদুর রহমান বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কারণ মালিক থেকে আশ্‌হাব ছাড়া কেউ এটা বর্ণনা করে নি।

[পূর্বের বাকী অংশ] **আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে শরহে বেকায়া গ্রন্থকারের বক্তব্য ঃ** মহিলাদের বেনীকৃত চুল খোলা জরুরী নয়। অনুরূপভাবে চুলখুলে ভিজানো এবং সমস্ত চুলে পানি পৌছানোও সুন্নত নয়। বরং এ পরিমাণ পানি পৌছাতে হবে যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌছে যায়। চাই বেনীকৃত চুল শুষ্ক থাকুক বা ভিজা থাকুক। এ হুকুম সকল মহিলাদের জন্য। চাই সে হায়েযা হোক বা নিফাসগ্রস্ত হোক বা জুনুবী মহিলা হোক।

দলীল ঃ নবী করীম (স) কোন এক স্ত্রীকে বলেন, তোমার চুলের গোড়ায় যদি পানি পৌছে যায় তাহলে এটাই তোমার ধৌত করার ব্যাপারে যথেষ্ট হবে। কিন্তু পুরুষদের জন্য পূর্ণ চুল খুলে তার ভেতরে পানি পৌছানো ওয়াজিব। ইমাম আবু হানীফা (র) এর দুটি قول এর মধ্যে হতে সব থেকে নির্ভরযোগ্য قول এই যে, সতর্কতামূলক তা ধৌত করা ওয়াজিব। কিছু কিছু উলামায়ে কিরাম বলেন যে, বেনীতে পানি পৌছায়ে তা নিংড়াবে; তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হল বেনীতে পানি পৌছাতে হবে না। এ হুকুম তখন যখন চুল বেনীকৃত থাকবে। আর চুল যদি খোলা থাকে তাহলে তাতে পানি পৌছানো সকলের জন্য জরুরী। (শরহে বেকায়া ঃ ৮৫)

পাত্রে হাত ঢুকাবার পূর্বে জুনুব ব্যক্তির হাত ধৌত করা প্রসঙ্গ

২৪৪. আহমদ ইবনে সুলায়মান (র)..........আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন জানাবতের গোসল করতেন, তাঁর জন্য পাত্র রাখা হত। তিনি তাঁর হাতদ্বয়কে পাত্রে ঢুকাবার পূর্বে তার উপর পানি ঢেলে নিতেন। তারপর যখন উভয় হাত ধুয়ে নিতেন তখন তিনি নিজ ডান হাত পাত্রে ঢুকাতেন, তারপর ডান হাতে পানি ঢালতেন আর বাম হাতে তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। এ কাজ শেষ করার পর তিনি ডান হাতে বাম হাতের উপর পানি ঢালতেন। এভাবে উভয় হাত ধুয়ে ফেলতেন। পরে উভয় হাতের তালু ভরে মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। তারপর দেহে পানি ঢালতেন।

তাত্ত্বিক আলোচনা

এ হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ইনশা আল্লাহ كتاب الحج এ আসবে। এখানে এতটুকু আলোচনা করাই শ্রেয় যে, নবী করীম (স) হযরত আয়েশাকে যে হুকুম দিয়েছিলেন, اُنْقُضِىْ رَاْسَكِ وَامْتَشِطِىْ মাথার চুল খুলে দাও এবং চিরুনী করে নাও, এটা হজ্জের ইহরামের গোসলের দিকে ইঙ্গিত করে। যেমন হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়াতে স্পষ্ট এসেছে যে, মুসান্নেফ (র) শিরোনামে عند الاغتسال للاحرام বলে একথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اُنْقُضِىْ رَاْسَكِ وَامْتَشِطِىْ - এর মধ্যে যে গোসলের কথা বলা হয়েছে সেই গোসল দ্বারা হজ্জের ইহরামের গোসল উদ্দেশ্য। এটা ইহরাম বাঁধার পূর্বে করা সুন্নত। এ রেওয়ায়াত দ্বারা এটাও বুঝে আসে যে, হায়েয অবস্থায় গোসল করার দ্বারা যদিও পবিত্রতা হাসিল হয় না। কিন্তু যদি হায়েযা মহিলা ইহরাম অবস্থায় গোসল করে তাহলে তার এ আমল বেকার হবে না। কেননা, ইহরামের সময় গোসল করা সুন্নত। সেটা আদায় হয়ে যায়। মোটকথা, যখন হায়েযের কারণে হযরত আয়েশা (রা) উমরা আদায় করতে পারলেন না, এবং তার সময়ও অতিক্রান্ত হয়ে গেলো তখন নবী (স) তাকে বললেন, উমরার ইহরাম ভেঙ্গে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নাও এবং তাকে নির্দেশ দেয়া হল যে, গোসল কর, মাথার চুল খুলে দাও এবং তাতে চিরুনী করে নাও। মোটকথা, হযরত আয়েশা (রা) এমনই করলেন। আলোচ্য শিরোনাম ও তার অধীনের হাদীস এবং পূর্বের শিরোনাম ও তার অধীনের হাদীস উভয়টা মিলালে বুঝে আসে যে, মহিলাদের উপর সহজ করণার্থে তাদের চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানোর যে বিধান দেয়া হয়েছে এটাই যথেষ্ট। বেনী খুলা ওয়াজিব নয়। এই সহজ বিধান জানাবাতের গোসলের ক্ষেত্রে, হায়েযের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, জানাবাত অধিকাংশ সময় সম্পৃক্ত হয়। আর হায়েয মাসে একবার আসে। কাজেই হায়েযের গোসলের ক্ষেত্রে চুল খুলতে হবে। কতক তাবেয়ী ও ইমাম আহমদের এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী বেনী খোলা ওয়াজিব। সম্ভবত মুসান্নেফ (র) এর মতও এটাই। কিন্তু জুমহুর উলামায়ে কিরামের মত হল হায়েয ও জানাবাতের গোসলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যাওয়াই যথেষ্ট। قوله قال ابو عبد الرحمن هذا حديث غريب الخ গরাবাতের কারণ এই যে, হাদীসের রাবী আশহাব উক্ত হাদীসকে মালেক থেকে তিনি হিশাম ইবনে উরওয়া এর সূত্রে বর্ণনা করেন। অথচ প্রসিদ্ধ হল مالك عن ابن شهاب (শরহে উর্দু নাসায়ী : ৩০৬-৩০৭)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ রেওয়ায়াতে এসেছে যে, فيصب على يديه الخ নবী (স) উভয় হাতকে ধৌত করে নিতেন পাত্রে প্রবেশ করার পূর্বে। কিন্তু হাত ধৌত করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়নি। অবশ্য আবু দাউদ শরীফে فاكفأ الاناء বাক্য এসেছে, এর দ্বারা বুঝা যায় পাত্র কাত করে পানি নিয়ে উভয় হাতকে ধুয়ে নিতেন, অতঃপর তাঁর ডান হাতকে পাত্রে ঢুকাতেন, অতঃপর অবশিষ্ট কাজ ঐ ক্রম অনুযায়ী করতেন, যার আলোচনা আয়েশা (রা) করেছেন, কিন্তু যদি হাত ধৌত করা ব্যতীত পানির পাত্রে হাত ঢুকানো হয় তাহলে এক্ষেত্রেও কোন সমস্যা নেই। এজন্য কোন কোন রেওয়ায়াতে এসেছে. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি ও রাসূল (স) এক পাত্রে গোসল করতাম। আমাদের হাত ঐ পাত্রে কখনো আগে কখনো পিছে পড়তো। এ হাদীস থেকে হাত ঢুকানোর বৈধতা সাব্যস্ত হয়। কারণ, জুনুবীর হাতে বাহ্যত কোন নাপাকী থাকে না। আর জানাবাতের কারণে শরীর অপবিত্র হওয়াটা হুকুমগতভাবে, তবে সুন্নত হল উভয় হাত পানিতে প্রবেশ করার পূর্বে ধৌত করে নেবে। যাতে গোসলকারীর অন্তরে কোন ধরণের সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি না হয়। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩০৮)

بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ

٢٤٥. إخبرنا احمدُ بْنُ سليمانَ قال حدّثنا يزيدُ قال حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَطاءُ بْنُ السّائِبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عائشةَ عَنْ غُسْلِ رسولِ اللّهِ ﷺ مِن الجَنابةِ فقالَتْ كَانَ رسولُ اللّهِ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلْثًا ثمّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثمّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثمّ يُفْرِغُ عَلَى رَاسِه ثلثًا ثمّ يُفِيْضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ -

إزالةُ الجُنُبِ الأذى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

٢٤٦. اخبرنا محمودُ بْنُ غَيلانَ اخبرنا النضرُ قالَ أَخبرنا شُعْبَةُ قالَ اخبرنا عطاءُ بْنُ السّائِبِ قال سَمِعْتُ ابا سلمةَ انّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشةَ فَسَالَهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِنَ الْجَنابَةِ فقالتْ كَانَ النبيّ ﷺ يُؤتى بِالْإنَاءِ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلْثًا فَيَغْسِلُهُمَا ثمّ يَصُبُّ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ ثمّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَصُبُّ عَلَى رَاسِهِ ثلاثًا ثمّ يُفِيْضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রে ঢুকাবার পূর্বে উভয় হাত কতবার ধৌত করতে হবে?

অনুবাদ ঃ ২৪৫. আহমদ ইবনে সুলায়মান (র)......আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) তিনবার হাতে পানি ঢালতেন, তারপর লজ্জাস্থান ধুতেন। তারপর উভয় হাত ধুতেন, পরে কুলি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন। তারপর মাথার উপর তিনবার পানি ঢালতেন। এরপর তাঁর সমস্ত শরীরের উপর পানি ঢালতেন।

হাত ধোয়ার পর শরীর থেকে জুনুব ব্যক্তির নাপাকী দূর করা

২৪৬. মাহমুদ ইবনে গায়লান (র) ....আতা ইবনে সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, উত্তরে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পানির পাত্র আনা হলে তিনি নিজ হাত তিনবার পানি ঢেলে ধৌত করতেন। তারপর তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন। সে পানি দ্বারা উভয় উরু ধৌত করতেন। পরে উভয় হাত ধৌত করতেন এবং কুলি করতেন ও নাসিকা পরিষ্কার করতেন। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। এরপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন।

২৪৫নং হাদীস সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ অনুচ্ছেদে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তাও আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। হাদীসটি শিরোনামের বিষয়ের উপর স্পষ্টভাবে দালালাত করছে। এতে يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, অর্থাৎ হুজুর (স) যখন জানাবাতের গোসল করার ইচ্ছা করতেন। তখন উভয় হাত পাত্রে ঢুকানোর পূর্বে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধৌত করে নিতেন। অতঃপর গুপ্তাঙ্গ ধৌত করে নিতেন, অতঃপর উভয় হাত ধৌত করতেন। অতঃপর কুলি করতেন এবং নাকে পানি ঢুকাতেন, অতঃপর তিনবার মাথায় পানি ঢালতেন। অতঃপর পূর্ণ শরীর ধৌত করতেন। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ৩০৮)

[বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

بَابُ إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الْأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

٢٤٧. اخبرنا اسحق بن ابراهيم قال حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن ابى سلمة بن عبد الرحمن قال وصفت عائشة غسل النبى ﷺ من الجنابة قالت كان يغسل يديه ثلثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما اصابه قال عمرو لا اعلمه الا قال يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلث مرات ثم يتمضمض ثلثا ويستنشق ثلثا ويغسل وجهه ويديه ثلثا ثم يفيض على راسه ثلثا ثم يصب عليه الماء -

'অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী ব্যক্তির দেহ হতে ময়লা দূর করার পর পুনরায় উভয় হাত ধৌত করা

অনুবাদ ঃ ২৪৭. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)........আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর জানাবাত গোসলের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি উভয় হাত তিনবার ধৌত করতেন। তারপর তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢালতেন। এরপরে তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করতেন এবং যে সকল স্থানে নাপাকী লেগেছে তা ধুতেন। উমর ইবনে উবায়দ বলেন, আমি তাঁকে (বর্ণনাকারী 'আতা ইবনে সায়িব (র)-কে) এ ব্যতীত আর কিছু বলতে শুনিনি। তিনি বলেছেন যে, তিনি ডান হাতে বাম হাতের উপর তিনবার পানি ঢালতেন এবং তিনবার কুলি করতেন। আর তিনবার নাকে পানি দিতেন এবং তাঁর চেহারা তিনবার ধুয়ে ফেলতেন। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। পরিশেষে তাঁর সর্বাঙ্গে পানি ঢালতেন।

তাত্ত্বিক আলোচনা

এ অনুচ্ছেদের অধীনে যে হাদীস উল্লেখ. করা হয়েছে, এখানে হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (স) এর জানাবাতের গোসল করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের বিষয়বস্তু স্পষ্ট এখানে এসেছে যে, قال عمر ولااعلمه الا قال .... الخ যমীরটি আতা ইবনে সায়েব এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। অর্থাৎ আমর ইবনে উবাইদ বলেন, আমার ইলম অনুযায়ী আতা ইবনে সায়েব এই রেওয়ায়েতে এ শব্দাবলী বলেছেন, يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ এখন এ ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই যে, বাহ্যিকভাবে উক্ত শব্দাবলী হতে বুঝা যায় যে, হুজুর (স) নাপাক দূর করার পর শুধুমাত্র বাম হাতকে দ্বিতীয়বার ধৌত করেছিলেন। উভয় হাত ধৌত করেননি। অথচ শিরোনামে উভয় হাত ধৌত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেমন যেন মুসান্নেফ (র) শিরোনামে يديه শব্দ এনে একথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, পূর্ববর্তী রেওয়ায়াতের বাচনভঙ্গি দ্বারা এ উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট যে, হুজুর (স) নাপাকী দূর করার পর উভয় হাত ধৌত করতেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ كَذَا قَالَ عَلَّامَةُ السِّنْدِيُّ (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩০৯)

পূর্বের পৃষ্ঠার ২৪৬নং হাদীস সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য অধ্যায়ের আন্ডারে যে হাদীস, আনা হয়েছে, এটাও হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, হাদীসের বিষয়বস্তু স্পষ্ট। এখানে এসেছে فَيَغْسِلُ مَا عَلٰى فَخِذَيْهِ অর্থাৎ উরুতে কিছু লাগলে তা আগে ধুতেন যাতে শরীরে পানি ঢালার পর নাপাকী চতুর্দিকে ছড়ায়ে শরীরকে নাপাক করে না দেয়। মোটকথা, পানি ডান হাত দ্বারা ঢালতে হবে এবং বাম হাত দ্বারা নাপাক দূর করতে হবে। এটাই সুন্নত তরীকা। ডান হাতের মর্যাদার দাবী এটাই যে, তাকে নাপাক দূর করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩০৯)

ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

٢٤٨. اخبرنا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اذا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّا كَمَا يَتَوَضَّاُ لِلصَّلٰوة ثُمَّ يُدْخِلُ اَصَابِعَه الْمَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا اُصُوْلَ شَعْرِه ثُمَّ يَصُبُّ عَلٰى رَاسِه ثَلٰثَ غُرَفٍ ثم يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى جَسَدِه كُلِّه -

গোসলের পূর্বে জুনুব ব্যক্তির উযূ করা

অনুবাদ ঃ ২৪৮. কুতায়বা (র) ....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) যখন জানাবতের গোসল করতেন তখন উভয় হাত ধোয়ার মাধ্যমে আরম্ভ করতেন। তারপর নামাযের উযূর মত উযূ করতেন। তারপর আঙ্গুলসমূহ পানিতে ডুবিয়ে তদ্বারা তাঁর চুলের গোড়া খিলাল করতেন। পরে মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিতেন। এরপর সর্বাঙ্গে পানি ঢালতেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله ثُمَّ تَوَضَّاُ كَمَا يَتَوَضَّاُ لِلصَّلٰوة .... الخ **:** বাহ্যিকভাবে এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, জানাবাতের গোসলের পূর্বে যে উযূ সুন্নত তাকে নবী করীম (স) নামাযের উযূর মত সম্পাদন করতেন। অর্থাৎ উভয় পা গোসলের পূর্বে ধৌত করতেন। অথচ অন্য রেওয়ায়াতে এর বিপরীত এসেছে যে, নবী (স) গোসল থেকে ফারেগ হওয়ার পর গোসলের স্থান থেকে সরে দাঁড়াতেন। অতঃপর উভয় পা ধৌত করতেন। উভয় প্রকার রেওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হল, হুজুর (স) হতে উভয় আমল বর্ণিত আছে। কখনো তিনি উভয় পা গোসলের পূর্বে উযূর সাথে ধৌত করতেন। আর কখনো গোসল শেষ করে গোসলের স্থান স্থান হতে সরে দাঁড়িয়ে ধৌত করতেন। অথবা, এ ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে যে, প্রথমে হদস দূর করার জন্য উভয় পা ধৌত করতেন। অতঃপর গোসলের পর পা হতে মাটি দূর করতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করার লক্ষ্যে দ্বিতীয়বার আবার ধৌত করতেন। এটা কোন কোন আলিমের বক্তব্য।

দ্বিতীয় মাসআলা ঃ

আলোচ্য হাদীসে অপর আরেকটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হল, আঙ্গুল দ্বারা চুলের গোড়া খেলাল করা। এ ব্যাপারে হাদীসের বাণী হল– فَيُخَلِّلُ بِهَا اُصُوْلَ شَعْرِه, ইমাম নববী (র) বলেন, চুলের গোড়া আঙ্গুল দ্বারা খেলাল করার ফায়দা হল, এই যে, এর দ্বারা চুল নরম ও আদ্র হয়ে যায়। এর পর পানি ঢালার দ্বারা সমস্ত চুলে এবং চামড়া পর্যন্ত খুব সহজেই পানি পৌঁছে যায়। কিন্তু মাথার চুল খেলাল করা সর্ব সম্মতিক্রমে ওয়াজিব নয়। অবশ্য যদি চুলে আঠা জাতীয় বস্তু অথবা অন্য কোন কারণে জট বেঁধে যায়। যা পানি চুলের গোড়ায় পৌঁছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়। তাহলে এই খাস সুরতে আঙ্গুল দ্বারা চুল খেলাল করা আবশ্যক। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ৩১০)

باب تخليل الجنب رأسه

٢٤٩. اخبرنا عمرو بن علي قال اخبرنا يحيى قال اخبرنا هشام بن عروة قال حدثني ابي قال حدثني عائشة عن غسل النبي ﷺ من الجنابة انه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل الى شعره ثم يفرغ على سائر جسده -

٢٥٠. اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان رسول الله ﷺ كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلثا -

باب ذكر مايكفي الجنب من افاضة الماء على رأسه

٢٥١. اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله ﷺ فقال بعض القوم اني لا غسل كذا وكذا فقال رسول الله ﷺ اما انا فافيض على رأسي ثلاث اكف -

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুব ব্যক্তির মাথা খেলাল করা

অনুবাদ ঃ ২৪৯. আমর ইবনে আলী (র) ....উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর জানাবতের গোসল সম্বন্ধে আমাকে বলেছেন যে, তিনি উভয় হাত ধৌত করতেন, উযূ করতেন এবং মাথায় খিলাল করতেন যেন পানি তাঁর চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন।

২৫০. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর মাথায় (খিলালের সাহায্যে) পানি দিতেন তারপর মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী ব্যক্তির মাথায় কতটুকু পানি ঢালা যথেষ্ট?

২৫১. কুতায়বা (র)....... জুবায়র ইবনে মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এর সামনে সাহাবীগণ গোসল সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হল। তাঁদের কেউ বললেন, আমি এভাবে গোসল করি, তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, কিন্তু আমি, আমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালি।

তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله ويتوضأ ويخلل رأسه ... الخ ঃ জানাবাতের গোসলের পূর্বে উযূ করার পদ্ধতি ঐটাই যা নামাযের জন্য করা হয়। বিষয়টি পূর্বের শিরোনামের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা গেছে। পূর্ণ বর্ণনা সেখানে করা হয়েছে এবং মাথার চুল খেলাল করার বিস্তারিত বিবরণও উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে, মাথার চুল খেলাল করার পর তিন অ লি পানি মাথায় ঢেলে দিবে। অতঃপর পূর্ণ শরীরে পানি ঢালতে হবে। কিন্তু তার ধরণ সেখানে নেই। কিন্তু দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে এসেছে যে, শরীরের ডান পার্শ্বে তিনবার এবং বাম পার্শ্বে তিনবার পানি ঢালবে।

দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে এসেছে যে, كان يشرب رأسه - يشرب শব্দটি تشريب থেকে গৃহীত অথবা إشراب থেকে গৃহীত, অর্থ হল পানি পান করানো, এর সারকথা ও চুল খেলাল করা যার বিবরণ পূর্বের রেওয়ায়াতে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ পাত্রে আঙ্গুল ঢুকায়ে সামান্য পানি নেবে এবং সেটা মাথার চুলের মধ্যে ও গোড়ায় পৌছাবে। অতঃপর আঙ্গুল দ্বারা চুল খেলাল করবে। যাতে করে চুলগুলো নরম আলতো হয়ে যায়। অতঃপর মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢেলে দেবে। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ৩১০-৩১১)

[বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

بابُ ذِكْرِ العَمَلِ فِى الغُسْلِ مِنَ الحَيْضِ

٢٥٢. اخبرنا عبدُ اللّٰهِ بنُ محمدِ بْنِ عبدِ الرحمٰن قال حدّثنا سفيانُ عن منصورٍ وهو بنُ صَفِيَّةَ عَن اُمِّهِ عَن عائشةَ أنّ امرأةً سَالَتِ النبيَّ ﷺ عَن غُسْلِها مِن المَحِيضِ فاَخْبَرها كيفَ تَغْتَسِلُ ثُمّ قال خُذِى فِرصَةً مِّنْ مَسْكٍ فَتطَهَّرِى بِهَا قالتْ وكيفَ اَتطَهَّرُ بها فاستَتَر كذا ثمّ قال سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِى بها قالتْ عائشةُ فجذبتُ المَراةَ وقلتُ تَتَّبِعِيْنَ بها اَثرَ الدَّمِ ۔

১৬০. অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযের গোসলে কি করতে হয়

অনুবাদ ঃ ২৫২. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (র).......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা তার হায়েযের গোসল সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো। তিনি তাকে কিভাবে গোসল করতে হবে তা বললেন, তারপর বললেন, মিশ্‌ক মিশ্রিত একখণ্ড তুলা নিয়ে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। সে বলল, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্র হবো? রাসূলুল্লাহ (স) লজ্জাবোধ করলেন এবং বললেন, সুবহানাল্লাহ! তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি ঐ মহিলাকে টেনে নিলাম এবং বললাম, এটা যেখানে রক্তের চিহ্ন আছে সেখানে লাগাবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله انّ امرأةً سَالَتْ .... الخ ঃ এই মহিলা যে হায়েযের গোসলের ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল তার নাম হল اسماء بنتِ شكل কিন্তু খতীবে বাগদাদী বলেন, তার কিতাব الاسماءُ المُبْهَمَة তে এবং অন্যান্য উলামাগণ তার নাম বলেন, اسماء بنت يزيد بن سَكن যাকে خَطِيْبَةُ النِّساء বলা হয়। واللّٰهُ اعلم, সে নবী (স) এর নিকট হায়েযা মহিলার গোসলের ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। নবী (স) তার প্রশ্নের জবাবে বলেন, যেমন মুসলিম শরীফে এসেছে- فقالَ تَاخُذُ اِحْداكُنَّ بماءٍ اوسِدْرَتها فتطَهَّرُ ... الخ

নবী (স) বলেন, তোমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকে গোসলের জন্য পানি এবং বরইপাতা আন, অর্থাৎ উত্তমরূপে পরিষ্কারের জন্য বরইপাতা মিশায়ে জ্বাল দিবে এবং তার দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। অতঃপর মাথায় পানি ঢালবে এবং ভালোভাবে ডলবে যাতে করে পানি চুলের গোড়ায় পৌছে যায়। অতঃপর মাথার চুলে পানি ঢালবে। অতঃপর বলেন, ثم تَاخُذُ فِرْصَتَهً مُمَسِكَةً فتَطَهَّرِبها الىٰ اٰخِرِ الحَدِيْث অতঃপর আতর মিশ্রিত কিছু তুলা নিবে এর দ্বারা পবিত্র হয়ে যাবে।

নাসায়ীর রেওয়ায়াতে خُذِىْ فِرْصَتَه مِنْ مِّسْكٍ শব্দ এসেছে فِرْصَتَه শব্দটির فاء বর্ণ كسره যোগে এবং راء বর্ণটি سكون যোগে, এর অর্থ তুলা অথবা, উলের টুকরা অথবা উল বিশিষ্ট চামড়ার টুকরা। আবু উবায়দা প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ এ অর্থ লিখেছেন, مَسْك শব্দের ميم বর্ণে কেউ কেউ যবর যোগে পড়েছেন। এর অর্থ হলো চামড়া।

পূর্বের পৃষ্ঠার হাদীস সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা গেলো যে, ইলমে দীন এবং শরীয়তের মাসআলা বিশ্লেষণের ব্যাপারে বিতর্ক ও পর্যালোচনা করা বৈধ। অনুরূপভাবে এটাও জানা গেছে যে, উত্তম ব্যক্তির সামনে অনুত্তম ব্যক্তির মুনাযারা বৈধ। মোটকথা, কেউ বলল গোসলের পদ্ধতি হল এটা। অন্য একজন বলল না, বরং এটা নবী (স) বললেন, আমার আমল তো এটা যে, আমি তিন অঞ্জলি পানি নিয়ে মাথায় ঢেলে দেয় যেহেতু অনুচ্ছেদের হাদীসে ثلاث اكف এসেছে। আর اكف শব্দটি كف এর বহুবচন। এর অর্থ হল প্রত্যেকবার উভয় হাত দ্বারা পানি নিয়ে তিনবার মাথায় ঢেলে দেবে। যেমন দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে এসেছে। মোটকথা, মাথায় তিনবার পানি প্রবাহিত করা জুনুবী ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। যখন সতর্কতামূলকভাবে পানি ঢালা হবে। প্রয়োজন ব্যতীত অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা অপচয়। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ৩১১)

অর্থাৎ এমন চামড়া নিবে যার উপর উল আছে এবং সেটাকে শরীরের বিশেষ অংশকে গেড়ে দেবে। এ সকল উলামায়ে কিরাম একথা এজন্য বলেন যে, তৎকালিন সময় লোক গরীব ও হস্তহস্ত ছিল। কাজেই সকল মহিলার জন্য প্রত্যেক মাসে "মেশক"এর মত চড়া মূল্য জাতীয় বস্তু ক্রয় করে তা ব্যবহার করা কষ্টকর ও অসম্ভব ছিল।

مَسْك শব্দটির ميم বর্ণে كسره নয় বরং فتح অর্থ চামড়া। এর উদ্দেশ্য হল, চামড়ার টুকরা নিবে যার উপর উল আছে, তা দ্বারা শরীরের রক্ত পরিষ্কার করবে। কিন্তু ইমাম নববী (র) كسرة . ميم কেই অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন। এর অর্থ হল মেশক। রাসূলের বাণী- خُذِىْ فِرْصَتَه ... الخ এর দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যেখানে রক্তের চিহ্ন বিদ্যমান তার উপর মেশক মিশ্রিত তুলা জড়িয়ে এবং উলের টুকরা দ্বারা মুছে তা দ্বারা রক্ত বন্ধ করে দেবে। এর দ্বারা দুর্গন্ধকে দূর করে জায়গাটিকে সুগন্ধিযুক্ত করা উদ্দেশ্য।

ইবনে কুতাইবা মেশক ব্যবহার করাকে দূরবর্তী অর্থ মনে করেন তা যথার্থ নয়। কেননা হেজাজীগণ অধিকাংশ সময় খুশবু ব্যবহার করতেন। আর মেশক চড়া মূল্যের বস্তু হওয়ায় প্রত্যেক মহিলার জন্য তা ব্যবহার করা সম্ভব নয় এ কথাও অযৌক্তিক। কেননা, হায়েযের পর প্রত্যেক মহিলার জন্য তা ব্যবহার করাকে আবশ্যক বলা হয়নি। বরং যে মহিলা উক্ত বস্তু ব্যবহার করতে সক্ষম কেবল সেই উক্ত আদেশের আওতাভুক্ত হবে, অন্যরা নয়।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, ইমাম নববী ও অন্যদের উল্লেখিত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় مِنْ ذَرِيرَةٍ শব্দ দ্বারা। এ শব্দটি আব্দুর রাজ্জাকের রেওয়ায়েতে এসেছে ذَرِيرَةٌ হল এক প্রকারের খশবু। অনুরূপভাবে মুসলিমের রেওয়ায়েতে فِرْصَةً مُمَسَّكَةً শব্দ এসেছে। যা এ কথার উপর প্রমাণ বহন করে যে, مِسْك শব্দটির ميم বর্ণ كسره বিশিষ্ট। কেননা, مُمَسَّكَةً তুলা, উল ইত্যাদির টুকরাকে বলা হয় যাকে মেশকের দ্বারা সুগন্ধিযুক্ত করা হয়েছে। যা হোক হুজুর (স) যখন মহিলাকে একথা বললেন, خُذِىْ فِرْصَةً مِّنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِىْ অর্থাৎ তুলা বা উল অথবা অন্য কোন বস্তুর টুকরা নিয়ে তাতে মেশক লাগাও অতঃপর তার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন কর। কিন্তু একথা ঐ মহিলাটির বুঝে আসে নি। তাই সে জিজ্ঞেস করল كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا এর দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়া সত্ত্বেও যখন সে তা বুঝলো না এবং পুনরায় এর ধরন সম্পর্কে রাসূল (স) কে জিজ্ঞেস করলো। তখন হুজুর (স) লজ্জায় কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে নিলেন। যেমন- রেওয়ায়াতে এসেছে। فَاسْتَتَرَ كَذَا অতঃপর তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, মহিলারা তাদের বিষয়গুলো উত্তমরূপে বোঝে। এটাতো একেবারে স্পষ্ট ও সহজ কথা যা বুঝার জন্য চিন্তা-ফিকির করার কোন প্রয়োজন নেই। হযরত আয়েশা (রা) নবী (স) এর কথা বুঝতে পারলেন। তিনি বলেন, আমি মহিলাকে নিজের দিকে টেনে এনে বললাম রক্তের চিহ্ন তালাশ করে তার উপর মেশকযুক্ত তুলা ইত্যাদি দ্বারা ঘষবে। ইমাম নববী (র) বলেন, تَتَّبِعِيْنَ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ দ্বারা উলামায়ে কেরামের নিকট গুপ্তাঙ্গ উদ্দেশ্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ বিশেষ জায়গায় মেশক ব্যবহার করবে।

মাহামিলী বলেন, বিশেষ অঙ্গ ব্যতীত শরীরের অন্যান্য যে সকল অঙ্গে রক্ত লাগে হায়েযের গোসলের পর সেখানে মেশক ব্যবহার করা মহিলার জন্য মুস্তাহাব। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, ইসমাঈলের রেওয়ায়াত দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। তার রেওয়ায়াতে فَلَمَّا رَأَيْتُهُ يَسْتَحِيْ عَلَّمْتُهَا وَقُلْتُ تَبْتَغِىْ بِهَا مَوَاضِعَ الدَّمِ দারেমীর রেওয়ায়াতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَا يُنْكِرُ অর্থাৎ নবী (স) হযরত আয়েশা (রা) কথা শুনছিলেন এবং তিনি তাঁর কথার উপর কোন আপত্তি করেননি। এটাই তার সমর্থন পাওয়ার প্রমাণ।

মোটকথা, ইসামাঈল ও অন্যান্যদের রেওয়ায়াত দ্বারা محاملى এর বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। কাজেই তার বক্তব্যই প্রাধান্য পাবে। কেউ কেউ গুপ্তাঙ্গে মেশক ব্যবহার করার এ হিকমত বর্ণনা করেছেন যে, এর ফলে গর্ভ দ্রুত স্থির হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম নববী (র) এটাকে দ্বয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, যদি এর রহস্য এটাই হয় তাহলে বিষয়টি বিবাহিত মহিলার সাথে খাস হবে। অথচ হাদীসের মুতলাক শব্দ উক্ত বক্তব্যকে খণ্ডন করে দেয়। বরং মেশক দেয়ার ফায়দা হল দুর্গন্ধ দূর করা এবং শরীরের চামড়া পরিষ্কার করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنْ بَعْدِ الْغُسْلِ

٢٥٣. اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا ابى انبانا الحسن وهو ابن صالح عن ابى اسحق ح وحدثنا عمرو بن على قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن ابى اسحق عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل -

بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ فِىْ غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِىْ يَغْتَسِلُ فِيهِ

٢٥٤. اخبرنا على بن حجر قال اخبرنا عيسى عن الاعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنى خالتى ميمونة قالت ادنيت لرسول الله ﷺ غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين او ثلثا ثم ادخل يمينه فى الاناء فافرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ثم غسله ثم توضأ وضوءه للصلوة ثم افرغ على راسه ثلث حثيات ملأ كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه قالت ثم اتيته بالمنديل فرده -

অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের পর উযূ না করা

অনুবাদ ঃ ২৫৩. আহমদ ইবনে উসমান ইবনে হাকীম ও আমর ইবনে আলী (র)..........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) গোসলের পর উযূ করতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে পা ধৌত করা

২৫৪. আলী ইবনে হুজর (র)....... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা মায়মুনা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জানাবতের গোসলের সময় তাঁর কাছে পানি এগিয়ে দিলাম। তিনি দু'বার কি তিনবার উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধুইলেন, তারপর তাঁর ডান হাত পাত্রে ঢুকালেন। ঐ হাতে তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন এবং বাম হাতে তা ধুইলেন। তারপর বাম হাত মাটিতে রেখে তা উত্তমরূপে ঘষলেন। তারপর নামাযের উযূর মত উযূ করলেন। এরপর অঞ্জলি ভরে তিন অঞ্জলি পানি মাথায় ঢাললেন। তারপর সমস্ত শরীর ধৌত করলেন। এরপর গোসলের স্থান হতে সরে উভয় পা ধৌত করলেন। পরিশেষে আমি তাঁর নিকট রুমাল নিয়ে গেলে তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন।

প্রথম অনুচ্ছেদসংশ্লিষ্ট আলোচনা

قوله لا يتوضأ بعد الغسل ঃ আল্লামা সিন্ধী (র) এর ব্যাখ্যায় লেখেন। এই রেওয়ায়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে হুজুর (স) গোসলের পর পুনরায় উযূ করতেন না, বরং গোসলের পূর্বের উযূর উপরেই ক্ষান্ত করতেন, অথবা গোসেলর সাথে যেহেতু উযূও আদায় হয়ে যায়। একারণে পুনরায় নতুনভাবে উযূ না করে তার উপরেই যথেষ্ট করতেন। ইমাম নববী (র) বলেন, গোসলে দুই উযূ মুস্তাহাব নয়। এক উযূ গোসলের পূর্বে আরেক উযূ গোসলের পরে। ইমাম নববী বলেন, এ ব্যাপারে সকল ইমামের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইবনে আবেদীন আল্লামা নূহ আফনাদীর কথা নকল করেছেন যে, তিনি বলেন, কতক রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় গোসলের পর দ্বিতীয়বার উযূ করা মাকরূহ এবং সুন্নাতের পরিপন্থী। কেননা, তাবরানী "আওসাত" নামক কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেন, যে হুজুর (স) বলেছেন, مَنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَيْسَ مِنَّا উদ্দেশ্য হল গোসল শেষ হওয়ার পর যদি হদস সম্পৃক্ত না হয় তাহলে গোসলের পর দ্বিতীয়বার গোসল করবে না। প্রয়োজন ব্যতীত গোসলের পরে দ্বিতীয়বার গোসল করাকে উলামায়ে কিরাম বিদআত বলেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদসংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত মাইমুনা (রা) জানাবাতের গোসলের ধরণ বর্ণনা করছেন। তিনি নবী করীম (স) এর নিকট গোসলের পানি রাখেন। غسل শব্দের غ বর্ণে পেশ। এটা ঐ পানিকে বলা হয় যার দ্বারা গোসল করা হয়। এজন্য مضاف উহ্য মানার কোন প্রয়োজন নেই। প্রথমে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। আর এটা ধৌত করার কারণ হল তা পবিত্রতা অর্জন করার মাধ্যম। উভয় হাত ধৌত করা জরুরী নয় বরং মুস্তাহাব। কেননা, দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে নিষেধের ইল্লত এটা বর্ণনা করেছেন যে, لِاَنَّ اَحَدَكُمْ لَا يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ এই ইল্লত বর্ণনা করার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উভয় হাত ধৌত করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব।

উভয় হাত ধোয়ার পর ডান হাতকে পাত্রে ঢুকায়ে তার মাধ্যমে গুপ্তাঙ্গের উপর পানি ঢালবে এবং বাম হাত দ্বারা তা ধৌত করবে। অতঃপর বাম হাতকে জমিনের উপর মারবে এবং তাকে মাটি দ্বারা খুব ভালোভাবে ঘষে ধৌত করবে। বাম হাতকে এ জন্য ধৌত করবে যে, যাতে করে উত্তমরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হাসিল হয়। হাদীসের বাণী– فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় বীর্য নাপাক। যদি নাপাক না হতো তাহলে এত গুরুত্বসহকারে তা ধৌত করা হতো না। হাদীস দ্বারা এটাও বুঝে আসে যে, লজ্জাস্থান ধৌত করার পর মাটি এবং সাবান ইত্যাদি দ্বারা বাম হাতকে ধৌত করবে যাতে করে দুর্গন্ধ এবং নাপাকী বাকী না থাকে। এটা করা মুস্তাহাব, অতঃপর উযূ করবে নামাযের উযূর ন্যায়। অতঃপর মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালবে। অতঃপর সমস্ত শরীর ধৌত করবে এবং গোসলের স্থান হতে সরে দাঁড়ায়ে উভয় পা ধৌত করবে। এর দ্বারা বুঝা যায়, গোসলের পর গোসলের স্থান হতে সরে দাঁড়িয়ে উভয় পা ধৌত করবে।

ফুকাহায়ে কিরাম উক্ত হাদীসকে ঐ সুরতের উপর প্রয়োগ করেন যখন গোসলকারী এমন স্থানে গোসল করে যেখানে ব্যবহৃত পানি এসে একত্রিত হয়। তাহলে এ সুরতের পরে পা ধৌত করবে। কিন্তু কেউ যদি পাথর অথবা কাঠের উপর দাঁড়িয়ে গোসল করে তাহলে গোসলের পর পা ধৌত করার প্রয়োজন নেই। নবী (স) যখন গোসল শেষ করলেন তখন হযরত মাইমুনা (রা) তার কাছে রুমাল পেশ করলেন, নবী (স) সেটাকে প্রত্যাখ্যান করলেন, অর্থাৎ তিনি রুমাল দ্বারা শরীরকে শুকাননি। এর বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যথা–

১. হযতোবা রুমাল দ্বারা শরীর না মোছাই উত্তম। কেননা, নবী (স) রুমাল ব্যবহার করেননি।

২. অথবা তিনি দ্রুত নামাযে গমন করার ইচ্ছা করেছিলেন। তাই তিনি রুমাল ব্যবহার করেননি।

৩. অথবা, সময়টি উষ্ণ ছিল এবং ঋতু ছিল গ্রীষ্মকালীন আর এ সময় শরীর ভেজা থাকাটা আরামদায়ক। কাজেই তিনি রুমাল ব্যবহার করেননি।

৪. অথবা, উযূ ও গোসল হল ইবাদতের ভূমিকা স্বরূপ। অতএব ইবাদতের মুকাদ্দমার আছর বাকী রাখার জন্য রুমাল ব্যবহার করেননি।

৫. অথবা রুমালটি ময়লাযুক্ত ছিল। তাই তিনি তা ব্যবহার করেননি।

৬. ইব্রাহীম নাখয়ী (র) বলেন, এ আশংকায় রুমাল ব্যবহার করেননি যে, লোকেরা যাতে রুমাল ব্যবহারে অভ্যস্ত না হয়ে যায়। এ সকল সম্ভাবনা বর্ণনা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল এ হাদীস রুমাল ব্যবহার তরক করা সুন্নত অথবা রুমাল ব্যবহার করা মাকরূহ হওয়ার দলীল নয়।

আল্লামা তাইমী বলেন, এ হাদীসে একথার উপর প্রমাণর রয়েছে যে, হুজুর (স) গোসলের পর শরীর মুছতেন। যদি তিনি রুমাল ব্যবহার না করতেন তাহলে হযরত মাইমুনা (রা) কেনো রাসূল (স) এর নিকট রুমাল পেশ করলেন? যদি রাসূল (স) রুমাল একেবারেই ব্যবহার না করতেন তাহলে মায়মুনা (রা) তার নিকট রুমাল পেশ করতেন না। যা হোক, গোসলের পর রুমাল ব্যবহার করা এবং না করার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের বক্তব্য একেবারে স্পষ্ট। আর তা হল নবী (স) রুমাল ব্যবহার করে রুমাল ব্যবহারের বৈধতা সাব্যস্ত করেছেন। আর রুমালকে ফেরত দিয়ে রুমাল ব্যবহার করা যে, জরুরী নয় তা বুঝিয়েছেন। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ৩১৫-৩১৬)

بَابُ تَرْكِ الْمِنْدِيْلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

٢٥٥. اخبرنا محمدُ بْنُ يحيى بْنُ ايوبَ بْنِ ابراهيم قال حَدَّثَنَا عبدُ اللّٰهِ بْنِ ادريس عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سالمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عبّاسٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ اِغْتَسَلَ فَأُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فلم يَمَسَّهُ وجَعَلَ يَقُولُ بالماء هٰكذا -

অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের পরে রুমাল ব্যবহার না করা

অনুবাদ ঃ ২৫৫. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্য়া (র) ...... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) গোসল করার পর তাঁর নিকট রুমাল আনা হল। কিন্তু তিনি তা স্পর্শ করলেন না এবং এরূপে পানি ঝেড়ে ফেলতে লাগলেন।

তাত্ত্বিক আলোচনা

গোসল করার পর গামছা বা তুয়ালে ব্যবহার না করার মাসআলা যদিও পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা সত্ত্বেও মুসান্নিফ (র) স্বতন্ত্র শিরোনাম কায়েম করে তার অধীনে ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়াত পেশ করেছেন। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী (স) গোসলের পর তুয়ালে ব্যবহার করেননি। বরং শরীরকে উভয় হাত দ্বারা মুছে নিয়েছেন وجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ অর্থাৎ يَمْسَحُهُ عَنِ الْبَدَنِ আরবের নিকট قول শব্দে অনেক ব্যাপকতা রয়েছে। কথা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। যেমন– قال بيده তখন বলা হয় যখন কেউ কাউকে হাত দ্বারা আকড়ে ধরে। অনুরূপভাবে قَالَ بِرِجْلِه তখন বলা হয় – যখন কেউ হলতে শুরু করে। এ আলোচনা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, قول শব্দ দ্বারা সব ধরণের কাজকে ব্যাখ্যা করা হয়। আলোচ্য হাদীসে يَقُولُ শব্দটি يَمْسَحُ অথবা يَنْفُضُ এর অর্থে তবে আলোচ্য হাদীস দ্বারা তোয়ালে ব্যবহার করা মাকরূহ এর উপর প্রমাণ পেশ করা সহীহ নয়। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়াতে রাসূল (স) যে গোসলের পর তোয়ালে ব্যবহার করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যেমন হযরত কায়স ইবনে সা'দ ইবনে উবাদার হাদীস। এতে এসেছে যে, হুজুর (স) আমাদের নিকট আগমন করলেন, আমরা তাঁর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি গোসল করলেন, অতঃপর আমি তাঁকে একটি কাপড় দিলাম যা যাফরান অথবা ওয়ারাছ এর রঙ্গের ছিল। তিনি তা শরীরে জড়িয়ে নেন। আর একথা স্পষ্ট যে, কাপড় শরীরে জড়ানোর দ্বারা শরীরের পানি চুষে নেয়। অনুরূপভাবে হযরত মুআয (রা) এর হাদীসে এসেছে যে, তিনি উযূ করার পর কাপড়ের একটি কিনারা দ্বারা স্বীয় চেহারাকে মুছেছেন। (তিরমিযী)। এ রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় উযূ গোসলের পর রুমাল ইত্যাদি ব্যবহার করা মাকরূহ নয়। অনুচ্ছেদের হাদীসের জবাব হল, রাসূলের তবিয়ত তখন চায়নি, তাই তিনি রুমাল ব্যবহার করেননি। আরও বিভিন্ন সুরত হতে পারে যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

মুহাককিক উলামায়ে কিরামের বক্তব্য হল হুজুর (স) গোসলের পর তোয়ালে ব্যবহার করা যে বৈধ এটা বর্ণনা করার জন্য কখনো তোয়ালে ব্যবহার করেছেন। আর কখনো এর ব্যবহার ত্যাগ করেছেন। এ কথা বুঝানোর জন্য যে তোয়ালে ব্যবহার করা আবশ্যাক নয়। ইমাম মালেক, ইমাম সাওরী প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ হযরত কায়স ইবনে সাদ প্রমূখ ব্যক্তি বর্গ উল্লেখ্য হাদীসের উপর ভিত্তি করে গোসলের পর তোয়ালে/ রুমাল ব্যবহার করাকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন এবং উলামায়ে আহনাফও বৈধতার প্রবক্তা। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩১৬-৩১৭)

আলোচ্য হাদীস দ্বারা এ কথার অনুমতি পাওয়া যায় যে, জুনুবী গোসল করা ব্যতীত খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো ইত্যাদি কাজ করতে পারে, এগুলো করার অনুমতি আছে। এবং এতে কোন দোষ নেই, অবশ্য জানাবাত অবস্থায় খাওয়া দাওয়া ও শোয়ার পূর্বে উযূ করার কথা উল্লেখ আছে। কাজেই খাওয়া ও শোয়ার পূর্বে উযূ করে নিবে। জুমহুর উলামায়ে কিরাম বলেন, উযূ করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। কেননা, ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হিব্বান তার সহীহ নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, সে নবী (সা.) কে জিজ্ঞেস করলো জানাবাত অবস্থায়, গোসল করা ব্যতীত তায়াম্মুম কারো জন্য বৈধ আছে কি? নবী (সা.) উত্তর প্রদান করলেন, نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ হ্যাঁ, তবে কেউ যদি উযূ করতে চাই তাহলে করবে, এর দ্বারা বোঝা যায় জুনুবী ব্যক্তির উপর উযূ করা ওয়াজিব নয় যদি সে করতে চাই, বরং মুস্তাহাব। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩১৭–৩১৮)

بَابُ وُضُوءِ الْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَاكُلَ

٢٥٦. اخبرنا حُمَيْدُ بْنُ مسعدةَ عن سُفيانَ بْنِ حبيبٍ عن شعبةَ ح وحدّثنا عمرُو بْنُ عليٍّ قال حدّثنا يحيى وعبدُ الرحمٰن عن شُعْبَةَ عَنِ الحَكَمِ عَن ابراهيمَ عَنِ الاسْوَدِ عَن عائشةَ قالتْ كانَ النبيُّ ﷺ وقال عمرُو كانَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ اذا ارادَ انْ ياكُلَ اوينامَ وهُو جُنُبٌ توَضَّا زادَ عمرُو في حديثِه وُضُوءَه لِلصَّلٰوةِ -

بَابُ اِقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلٰى غَسْلِ يَدَيْهِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَاكُلَ

٢٥٧. اخبرنا محمدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ محمّدٍ قال حدّثنا عبدُ اللّٰه بْنُ المُبارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهريِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وهُو جُنُبٌ تَوَضَّا وَاِذا اَرادَ اَنْ يَاكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ পানাহার করতে চাইলে জুনুবী ব্যক্তির জন্য উযূ করা

অনুবাদ ঃ ২৫৬. কুতায়বা ইবনে সা'ঈদ (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) জানাবত অবস্থায় যখন আহার করতে অথবা নিদ্রা যেতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি উযূ করতেন। আমর তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, নামাযের উযূর মত উযূ।

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী ব্যক্তি আহার করতে ইচ্ছা করলে শুধু তার উভয় হাত ধৌত করা

২৫৭. মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) জানাবত অবস্থায় নিদ্রার ইচ্ছা করলে উযূ করতেন, আর আহার করার ইচ্ছা করলে উভয় হাত ধৌত করতেন।

প্রথম অনুচ্ছেদসংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীসের রাবী হলেন মুহাম্মদ ইবনে উবায়েদ। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। এ হাদীসের ভাষ্য দ্বারা খাওয়া ও শোয়ার অবস্থার মধ্যে পার্থক্য বুঝা যায়। পূর্বের অধ্যায়ে খাওয়া ও শোয়ার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন এভাবে করা হয় যে, উভয় হাদীসকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপরে প্রয়োগ করতে হবে। তা এ ভাবে যে, কখনো বৈধতা বর্ণনা করার জন্য শুধুমাত্র উভয় হাতকে ধৌত করার উপর ক্ষান্ত করতেন, আবার কখনো খাওয়ার পূর্বে নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করতেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সুয়াইদ ইবনে নসর ব্যতীত বাকী সনদের রাবী তারাই যারা উপরের অনুচ্ছেদের হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, যেহেতু মুসান্নিফ (রা) এর উস্তাদ সুয়াইদ ইবনে নসরের রেওয়ায়াতে একটি শব্দ বেশী আছে, আর তাহলো اَوْ يَشْرَبَ এজন্য শিরোনামে اَنْ يَاكُلَ এর সাথে اَوْ يَشْرَبَ শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) এর একটি হাদীস আছে যাকে দারাকুতনী রেওয়ায়াত করেছেন। উভয় হাদীসে ধৌত করার পর কুলি করার কথাও উল্লেখ আছে, অর্থাৎ যখন হুজুর (স) জানাবাত অবস্থায় খাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন উভয় হাত ধুয়ে নিতেন এবং কুলি করে নিতেন, অতঃপর খানা খেতেন, দারাকুতনী এটাকে সহীহ বলেছেন, মোটকথা নবী (স) এর এই আমল উম্মতের উপর অত্যন্ত সহজতা সৃষ্টি করেছে।

بَابُ اِقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلٰى غَسْلِ يَدَيْهِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَشْرَبَ

٢٥٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّاَ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَاْكُلَ اَوْ يَشْرَبَ قَالَتْ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَاْكُلُ وَيَشْرَبُ.

অনুচ্ছেদ : পানাহারের ইচ্ছা করলে জুনুবী ব্যক্তির শুধু উভয় হাত ধৌত করা

অনুবাদ : ২৫৮. সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (র)..........আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) জানাবত অবস্থায় নিদ্রার ইচ্ছা করলে উযূ করতেন। আর যখন পানাহারের ইচ্ছা করতেন তখন উভয় হাত ধুইতেন, তারপর পানাহার করতেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

এ হাদীসে تَوَضَّأَ আমরের সীগা এসেছে, যা ইবনে হুবাইব মালেকী ও আহলে জাহেরদের প্রমাণ। তাদের নিকট শোয়ার পূর্বে জুনুবীর জন্য উযূ করা ওয়াজিব কিন্তু জুমহুর ইমামগণ অন্যান্য দলীলের উপর ভিত্তি করে যেখানে উযূ ওয়াজিব না হওয়ার বিষয় উল্লেখ আছে মুস্তাহাবের প্রবক্তা হয়েছেন। এখানে আমরের সীগাকে মুস্তাহাবের উপর প্রয়োগ করেন। জুমহুর এর সমর্থনে যে হাদীসগুলো পেছনে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে দ্রষ্টব্য।

ইমাম ত্বহাবী (রা.) বলেন যে, উযূ ওয়াজিব হওয়ার হুকুম যা জুনুবীর জন্য ছিল তা মানসুখ হয়েগেছে। আল্লামা সুয়ূতী (রা) লেখেন যে দাউদী এবং ইবনে আব্দুল বার মালেকী বলেন, এ হাদীসের শব্দের মধ্যে অগ-পশ্চাত ঘটেছে। নবী (স) এর বাণীর উদ্দেশ্য হলো, اِغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ অর্থাৎ তোমার বিশেষ অঙ্গ ধুয়ে নাও এবং উযূ করে নাও। কেননা, وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ এরমধ্যে واو হরফটি তারতীবের ফায়দা দেয় না। বরং তা মুতলাক جمع বুঝায়, আর আকলের তাকাযাও এটা যে, উযূ করার পূর্বে লিঙ্গ ধৌত করতে হবে, আমরা হাদীসের শব্দের মধ্যে তাকদীম তাখীর এর যে কথা বলেছি তা এ হাদীসের অন্য সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝে আসে। কেননা, সাওরী ও শো'বা আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে উক্ত হাদীসে اِغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ শব্দ রেওয়ায়াত করেছেন, এবং স্বয়ং ইমাম নাসায়ী (র) উক্ত হাদীসকে তার কিতাব সুনানে কুবরার মধ্যে ইবনে হিব্বান অন্য সূত্রে এবং এই শব্দবলীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, اِغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ ثُمَّ اُرْقُدْ রেওয়ায়েতের মধ্যে তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রথমে লিঙ্গ ধৌত করা তারপর উযূ করা, যুক্তির দাবিও এটাই।

জুনুবী ব্যক্তির জন্য নিদ্রার পূর্বে উযূ করা ও যৌনাঙ্গ ধৌত করা ওয়াজিব কি-না : (১) দাউদ জাহেরী ও ইবনে হাবীব মালেকী এর মতে গোসল ফরয অবস্থায় নিদ্রার পূর্বে উযূ করা ও যৌনাঙ্গ ধৌত করা ওয়াজিব−

(١) كَمَا فِىْ رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ رضى انّه عليه السلام قال تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.

(٢) عَنْ عائشة (رضى) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰه عليه وسلم اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ.

(২) মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমাম ও জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে জুনুবী ব্যক্তির জন্য নিদ্রার পূর্বে উযূ করা ও পুরুষাঙ্গ ধৌত করা মুস্তাহাব ওয়াজিব নয়, তাদের দলীল−

(١) كَمَا رَوَاه ابن خُزَيْمَةَ وَاَبُوْ عَوَانَةَ "انّه عليه السّلام قال اِنَّمَا اُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلٰوةِ.

(٢) وعَنْ عَائِشَةَ (رضى) قالت كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اِذَا رَجَعَ مِنَ الْمَسْجِدِ صَلّٰى مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ مَالَ اِلٰى فِرَاشِه وَاِلٰى اَهْلِه فَاِنْ كَانَتْ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثم يَنَامُ ولَايَمَسُّ الْمَاءَ

(٣) وعَنْ عائشةَ رض قالتْ كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَايَمَسُّ مَاءً حَتّٰى يَقُوْمَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَغْتَسِلُ.

بَابُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

٢٥٩. اخبرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلٰوةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ -

٢٦٠. اخبرنا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমানোর ইচ্ছা করলে জুনুবী ব্যক্তির উযূ করা

অনুবাদ ঃ ২৫৯. কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) জানাবত অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলে ঘুমানোর পূর্বে নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করতেন।

২৬০. উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)...... আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ জানাবত অবস্থায় ঘুমাবে কি? তিনি বললেন যদি উযূ করে নেয়।

হাদীস সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله عبد الله بن نُجَيّ নুজাই আব্দুল্লাহ এর পিতা এবং এই হাদীসের রাবী। نجي শব্দের نون বর্ণে পেশ এবং جيم এ তাশদীদ সহকারে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, নুজাই হাজরামী মাজহুল (অজ্ঞাত ব্যক্তি) কিন্তু আজালী তাকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন, এবং তার হাদীসকে ইবনে হিব্বান ও হাকেম সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। তিনি তাবেঈ ছিলেন। তিনি এ হাদীসটি হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। বাহ্যিকভাবে এ হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে, জুনুবী মহিলা যদি ঘুমানোর ইচ্ছা করে তাহলে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব; উযূ যথেষ্ট হবে না। কেননা, জুনুবীর উযূ তার অপবিত্র অবস্থা দূর করে না। কাজেই উযূ করলেও যে ঘরে সে থাকবে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করবে না। অথচ উম্মতের মধ্যে কেউ এমনকি আহলে জাহেরও গোসল ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা নন, তাহলে হাদীসের উদ্দেশ্য কি হবে?

(১) খাত্তাবী (র) বলেন, উক্ত ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করবে না কিন্তু যারা আমলনামা লেখেন তারাতো তাদের কাছে সর্ব সময় থাকে। কাজেই এখানে মুনকার-নাকির ও আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা উদ্দেশ্য নয়।

(২) এখানে এমন জুনুবী উদ্দেশ্য নয় যারা গোসলের প্রতি আগ্রহশীল। বরং সে জুনুবী উদ্দেশ্য যে গোসল করতে অলসতা করে। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩২১)

হাদীসের পটভূমি ঃ জাহিলিয়াতের যুগে আরবের লোকেরা তাদের পিতামাতা এবং বংশের প্রসিদ্ধ লোকদের ছবি ঘরে রাখত এবং সেগুলোর সম্মান করত। আর এ প্রথার পরিণতিতেই মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। তা ছাড়া তারা কুকুর পালনে খুবই আগ্রহী ছিল। কুকুর সাথে নিয়ে চলাফেরা এবং কুকুর দ্বারা কোনো কাজকর্ম সমাধা করা ইত্যাদির ব্যাপকতা ছিল।

[পূর্বের বাকী অংশ]

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ (১) জুমহুরের পক্ষ হতে হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর হাদীসের জবাবে বলা হয় যে, উল্লেখিত হাদীসে تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ কথাটি মুস্তাহাব হিসাবে বলা হয়েছে; ওয়াজিব হিসেবে নয়।

(২) হযরত আয়েশা এর হাদীসের জবাব হলো, এটা মুস্তাহাব হিসেবে রাসূল (স) মাঝে মাঝে করতেন, আর জুনুবী অবস্থায় উযূ করতেন تَخْفِيفُ النَّجَاسَةِ এর জন্য, كما قال شداد بن أوس بأن الوضوء نصف غسل الجنابة

প্রাচীন আরবে কুকুরের আওয়াজ দ্বারা অতিথির আহবান ও পথহারা মুসাফিরের সহযোগিতা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। তারা গোসলের ব্যাপারে ছিল অলস, অপরদিকে পানিরও অভাব ছিল। স্ত্রী সঙ্গমের পর পবিত্রতা অর্জনের কোনো প্রয়োজন তারা মনে করত না। তাদের এ সকল চাল-চলন তথা আপত্তিকর জীবন যাপন হতে সতর্ক করার জন্যই নবী করীম (স) উল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করেন। এখানে যে সকল ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে হযরত ইবনে উমর হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, যে ঘরে ছবি, কুকুর ও নাপাক ব্যক্তি থাকে, সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এতে বুঝা যায় যে, মৃত্যুর ফেরেশতা, আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয়ও গৃহে প্রবেশ করবে না, ফলে তাদের মৃত্যু হবে না ও আমলনামাও লেখা হবে না অথচ কেউ এর প্রবক্তা নন। সুতরাং এখানে ফেরেশতা দ্বারা কোন ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে তা নির্ণয় করা আবশ্যক।

বস্তুত এ হাদীসে যে সকল ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে তারা হলেন রহমতের ফেরেশতা, যারা আল্লাহর নিকট হতে রহমত ও বরকত নিয়ে মানুষের কল্যানার্থে অবতীর্ণ হন, তখন যে ঘরে উল্লিখিত বস্তুগুলো থাকে তারা সেখানে প্রবেশ করেন না। ফলে ঐ ঘরের অধিবাসীরা আল্লাহর রহমত ও বরকত হতে বঞ্চিত হয়, মৃত্যুর ফেরেশতা ও কিরামুন কাতেবীন এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয়। তারা যথা সময়েই উপস্থিত হন।

প্রাসাঙ্গিক ঘটনা ঃ এ হাদীস শুনে জনৈক খ্রিষ্টান পুরোহিত হযরত থানবী (রা.) কে বলেন, ইসলাম আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছে, আমরা কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারব। কারণ, আমরা কুকুর ও ছবি রাখি। আমাদের ঘরে মৃত্যুর ফেরেশতা প্রবেশ করবে না। আর আমরা কখনো মরব না, এর জবাবে তিনি বলেন, কুকুরের প্রাণ যে ফেরেশতা হরণ করে, তোমাদের প্রাণও সে ফেরেশতাই হরণ করবেন।

ছবির ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যে ছবির নিন্দা করা হয়েছে তা দ্বারা জীবের ছবিই বুঝানো হয়েছে। অন্য হাদীসে এ দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রাণহীন বস্তুর ছবি ঘরে রাখা দোষণীয় নয়। যেমন ঘন-গাছ, ফুল, গৃহ বা এ জাতীয় কোনো নিষ্প্রাণ আসবাব পত্রের ছবি। ছবি সম্পর্কিত সমস্ত হাদীস পর্যালোচনা করে ফকীহগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রাণহীন ছবি অথবা এত ক্ষুদ্র প্রাণীর ছবি যা সহজে চেনা যায় না বা নজরে ধরা পড়ে না অথবা প্রাণীর ছবিই বটে, তবে তা বিছানায়, বালিশে বা পদদলিত হয় এমন স্থানে রাখা হয়েছে এ ধরনের ছবি রাখা জায়েয আছে। কিন্তু যা প্রকাশ্যে ঝুলানো হয় বা মর্যাদা প্রকাশার্থে ছাদে-দেয়ালে রাখা হয় তা জায়েয নেই। স্থুল মূর্তি, ভাস্কর্য কিংবা পুতুল, যা বর্তমানে অনেকের ঘরে দেখা যায় তা রাখা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা, এতে ঘর মন্দিরে পরিণত হয়।

কুকুরের বর্ণনা ঃ সব কুকুরের ব্যাপারে এ হাদীস প্রযোজ্য নয়, বরং নিম্নের তিন শ্রেণীর কুকুর রাখা জায়েয আছে। (১) শিকারী কুকুর (২) ফসল পাহারাদার কুকুর এবং (৩) গবাদি পশুর নিরাপত্তায় নিয়োজিত কুকুর। এগুলো ব্যতীত অন্য যে কোনো কুকুর রাখা নিষিদ্ধ।

নিষিদ্ধ জুনুবী কে? উক্ত হাদীসে সেই গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে নিন্দা করা হয়েছে, যার সাধারণ অভ্যাসই হলো গোসল না করা এবং এ রকম অবস্থায় এমন সময় পর্যন্ত থাকা যে, তাতে তার নামায ছুটে যায়। যে কোনো গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তি এ হাদীসের আওতায় পড়ে না। কেননা, হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে,

اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهٖ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

অন্য হাদীসে এসেছে –

عَنْ عَائِشَةَ رضى قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلعم يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتّٰى يَقُوْمَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَيَغْتَسِلُ

তাই বুঝা গেলো যে, এখানে গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন ব্যক্তি যারা অলসতা করে নাপাক অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকে এবং নামায কাযা করে। (শরহে মিশকাত ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৪৯-৩৫০)

সারকথা ঃ

(১) হাদীস শরীফ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, নবী (সা) জানাবত অবস্থায় শয়ন করতেন এবং বিবিদের সাথে সহবাস করতেন। কয়েকবার সহবাস করে একবার গোসল করতেন।

(২) জুনুবী ব্যক্তির ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না কিন্তু যদি সে উযূ করে তাহলে ফেরেশতা তাতে প্রবেশ করবে। এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩২২)

بَابُ وُضُوْءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

٢٦١. اخبرنا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ -

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী ব্যক্তি ঘুমাতে ইচ্ছা করলে উযূ করা এবং লজ্জাস্থান ধৌত করা

অনুবাদ ঃ ২৬১. কুতায়বা (র).......ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, রাতে তিনি জানাবতগ্রস্ত হন। (এরূপর ঘুমাতে চাইলে কি করবেন?) তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এরূপ হলে তুমি উযূ করবে এবং লজ্জাস্থান ধৌত করবে, তারপর ঘুমাবে।

হাদীস সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

দু'বার স্ত্রী সঙ্গমের মাঝখানে উযূ করা ওয়াজিব কি না?

(১) দাউদে জাহেরী ও ইবনে হাবীব মালেকী (রা) এর মতে দু'সঙ্গমের মাঝখানে উযূ করা ওয়াজিব। তাদের দলীল হলো- إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ....ثمّ اراد أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءًا -

(২) চারো মাযহাবের ইমাম সহ সকল ইমামের মতে দু'সঙ্গমের মধ্যখানে উযূ করা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। অন্য হাদীসে এসেছে যে, فَانَّهُ اَنْشَطُ إِلَى الْعَوْدِ অর্থাৎ দ্বিতীয়বার উযূ করা সঙ্গম করার পক্ষে তৃপ্তিদায়ক। সে হিসেবে উযূ করার কথা বলা হয়েছে; ওয়াজিব হিসেবে নয়।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

তাঁদের দলীলের জবাবে বলা যায় যে, যদি উভয় সঙ্গমের মাঝে উযূ ওয়াজিবই হতো তবে রাসূল (স) তা কখনো ছাড়তেন না, আর فَانَّهُ اَنْشَطُ إِلَى الْعَوْدِ দ্বারা বুঝা যায় যে, উযূ তৃপ্তিদায়ক হিসেবে বলা হয়েছে। ওয়াজিব হিসেবে নয় বরং মুস্তাহাব হিসেবে। (শরহে মিশকাত ঃ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং-৩৪৬)

হাদীসের উদ্দেশ্য

হাদীসের উদ্দেশ্য হলো যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে একবার সহবাস করে- অতঃপর দ্বিতীয়বার আবার সহবাস করতে চাই তাহলে দ্বিতীয়বার সহবাস করার পূর্বে উযূ করে নিবে। অতঃপর সহবাস করবে। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩২২)

উযূ ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে জুমহুরের দলীল

একবার সহবাস করার পর দ্বিতীয়বার সহবাস করার পূর্বে যে উযূ করা ওয়াজিব নয় এর প্রমাণ হলো হযরত আয়েশা (রা.) এর হাদীস যা ইমাম ত্বহাবী বর্ণনা করেছেন। কেননা, হাদীসে এসেছে নবী (স) একবার সহবাস করতেন, অতঃপর পুনরায় দ্বিতীয়বার সহবাস করতেন কিন্তু وَلَا يَتَوَضَّأُ মধ্যবর্তী সময়ে উযূ করতেন না। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩২৩)

بَابٌ فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

٢٦٢. اخبرنا إِسْحٰقُ بْنُ ابراهيم قال حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قال أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سعيدٍ قال حدثنا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ ولا جُنُبٌ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী ব্যক্তি যদি উযূ না করে

অনুবাদ ঃ ২৬২. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ও উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'ঈদ (র).........আলী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ঘরে ছবি, কুকুর বা জুনুবী ব্যক্তি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

হাদীস সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসের মূল বক্তব্য ঃ প্রথম হাদীসে এসেছে بِغُسْلٍ وَاحِدٍ আর দ্বিতীয় হাদীসে এসেছে فِىْ غُسْلٍ وَاحِدٍ উভয়টা সমার্থ বোধক। নবী (স) এক রাতে একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাস করতেন। পরিশেষে একবার গোসল করতেন। এতে বুঝা যায় একবার সহবাসের পর দ্বিতীয়বার সহবাস করতে চাইলে মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করা ওয়াজিব নয়। বরং সর্বশেষ একবার গোসল করবে।

দ'হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমধান

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল (স) একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর সর্বশেষ একবার গোসল করেছেন। আর আবু দাউদ, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদ এর রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসুল (স) প্রত্যেক স্ত্রীর সহবাসের পর গোসল করেছেন। যেমন–

يَغْتَسِلُ عِنْدَ هٰذِهٖ وَعِنْدَ هٰذِهٖ هٰذَا اَزْكٰى وَاَطْيَبُ وَاَطْهَرُ

এবং এর পর তিনি (স) বলেছেন, প্রত্যেক বারে গোসল করা অধিক পবিত্রকর, এটা অধিক উৎফুল্লতা ও পরিচ্ছন্নদায়ক। এখন উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান নিম্নরূপ–

(১) ইমাম আবু দাউদ (রা.) বলেছেন, আনাসের হাদীস আবু রাফের হাদীস হতে অধিক সহীহ ও নির্ভুল।

(২) অথবা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মতে, সহবাসের পর গোসল করলে সহবাস জনিত স্নায়ুবিক ক্লান্তি দূর হয় এবং ঘামের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়ে মনে উদ্যমতা ও উৎফুল্লতা ফিরে আসে। তাই রাসূল (স) বারবার গোসল করেছেন।

(৩) অথবা, গোসল ব্যতীত দ্বিতীয় স্ত্রীর সহবাস করলে স্ত্রী ঘাম বা নাপাকীর গন্ধে অস্বস্তি বোধ করতে পারে বা যৌন উত্তেজনা স্তিমিত থাকতে পারে বলে বারবার গোসল করেছেন, তবে আবশ্যক হিসেবে নয়।

(৪) অথবা, পূর্ববর্তী সঙ্গমের স্খলিত বীর্য পরবর্তী সঙ্গমে মৃত বীর্যে পরিণত হয়ে নানাবিধ যৌন ব্যাধি সৃষ্টি করতে পারে, তাই বারবার গোসল করেছেন।

(৫) অথবা, উত্তম হিসেবে করেছেন, আবশ্যিক হিসেবে নয়। তবে একবার সহবাসের পর গোসল না করে শুধু উযূ বা যৌনাঙ্গ ধৌত করে দ্বিতীয়বার সহবাস করাও জায়েয। (শরহে মিশকাত ঃ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৫৪)

নবী (স) এর উপর স্ত্রীদের মাঝে পালা বণ্টন করা ওয়াজিব কি-না?

একাধিক স্ত্রী থাকলে সে ক্ষেত্রে পালাক্রমে প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে ন্যূনতম একরাত করে অবস্থান করা ওয়াজিব। কিন্তু নবী (স) পালা নির্ধারণ না করে কিভাবে একই রাতে একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাস করলেন। মহানবী (স) এর জন্য পালা নির্ধারণ করা বা তা রক্ষা করা আদৌ ওয়াজিব ছিল কি-না? এর ব্যাপারে মতভেদ আছে।

(১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, পালা নির্ধারণ করা হুজুর (স) এর উপর ওয়াজিব ছিল না। তবে তিনি অনুগ্রহ পূর্বক স্বেচ্ছায় নিজের তরফ হতে তাদের মধ্যে সমান ব্যবহার করতেন।

(২) অধিকাংশ আলিমের মতে, তাঁর উপরেও পালা নির্ধারণ করা ওয়াজিব ছিল বটে, তবে তিনি তাদের অনুমতি ক্রমেই এরূপ করতেন।

(৩) আল্লামা শাওকানী (রা) বলেন, সম্ভবত হুজুর (স) কোনো সফরে যাওয়ার আগে বা সফর হতে আগমন করে কারো জন্য পালা বা দিন তারিখ নির্ধারণ করার পূর্বেই একরাতে সকলের নিকট করেছেন।

(৪) ইবনুল আরাবী বলেন, আল্লাহ তাআলা রাসূল (স) এর জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন সে সময়ে তাঁর বিবিদের মধ্য হতে কারো জন্য কোনো পালা নির্ধারিত ছিল না। মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, সে সময়টি ছিল আসরের পরের সময়।

(৫) অথবা সে দিন যার পালা ছিল তার থেকে অনুমতি নিয়েই এরূপ করেছিলেন, শায়খ উসমানী বলেন, তা ছিল বিদায় হজ্জের ইহরাম বাধার পূর্বেকার সময়। (শরহে মিশকাত ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৪৬)

মহানবী (স) এর পবিত্রতমা স্ত্রীগণের মুবারক নাম

উলামায়ে কিরাম এ কথার উপর একমত যে, রাসূল (স) এর স্ত্রীর সংখ্যা ছিল মোট ১১ জন। তারা হলেন-

১. হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) ২. আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ৩. হাফসা (রা) ৪. উম্মুল হাবীবা (রা) ৫. উম্মুস সালামা (রা) ৬. সাওদা (রা) ৭. যয়নব (রা) ৮. মায়মূনা (রা) ৯. উম্মুল মাসাকিন (রা) ১০. জুওয়ায়রিয়া (রা) ১১. সাফিয়্যা (রা)। (শরহে মিশকাত ১/৩৪৬)

একাধিক গোসল সমৃদ্ধ ঘটনার ব্যাপারে আল্লামা কাশ্মীরীর বক্তব্য

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন, হাদীসদ্বয়ের মধ্যে যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে তা বিদায় হজে সংঘটিত হয়েছিল, এ সফরে হুজুর (স) এর সাথে তার সকল স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। নবী (স) ইহরাম বাধার পূর্বে সকল স্ত্রীর হক আদায় করাকে মুনাসেব মনে করলেন। তাই ইহরাম বাধার পূর্বেই সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পন্থা অবলম্বন করলেন, যাতে করে সমস্ত স্ত্রীগণ প্রশান্ত চিত্তে হজের বিধান আদায় করতে পারে- (ফয়যুল বারী ১/৩৫৫)

একটি প্রশ্ন নিরসন

রাবীর শব্দ يطوف দ্বারা একটি সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, নবী (স) এর এ বিষয়ের উপর সবসময়ের আমল ছিল। ব্যাখ্যাকার বলেন, যদিও রাবীর শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, সহবাসের এ সুরত রাসূলের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা এমনটি নয়। কেননা, উক্ত ঘটনা ছাড়া আর কোন ঘটনা এমন পাওয়া যায় না। কাজেই ঘটনাটি তার মাওরিদ তথা উক্ত সময় ও জরুরতের উপরই সীমাবদ্ধ থাকবে। ইবনে হাজেব (র) বলেন, كان শব্দটি استمرار এর উপর দালালত করে না। কেননা, এটা كون থেকে গৃহীত ,কিন্তু ওরফের এতেবারে استمرار মনে করা হয়, বিশেষ করে যখন তার খবর مضارع হয়। ব্যাখ্যাকার বলেন, ইবনে হাজেবের এ কথা সঠিক কিন্তু আমার বিশ্লেষণ এই যে, ঘটনাটি শুধুমাত্র বিদায় হজ্জের সময়ই একবার সংঘটিত হয়েছিল। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩২৪-৩২৫)

بَابُ حَجْبِ الْجُنُبِ مِنْ قِرَاةِ الْقُرَانِ

٢٦٦. اخبرنا عليُّ بْنُ حُجْرٍ قال اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عمرو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عبدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ قال اَتَيْتُ عليًّا انا ورَجُلانِ فقال كان رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ الخَلاء فَيَقْرَأُ القُرْاٰنَ ويَاْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ ولم يَكُنْ يَحْجُبُه عَنِ القُرانِ شيئٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ -

٢٦٧. اخبرنا محمَّدُ بْنُ احمدَ اَبُو يُوْسُفَ الصَّيْدَلانِى الرَّقِّيُّ قال حدَّثنا عِيْسٰى بْنُ يونسَ قال حدَّثنا الْاَعْمَشُ عَنْ عمرو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اِلاَّ الْجَنَابَةَ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুব ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকা

অনুবাদ ঃ ২৬৬. আলী ইবনে হুজর (র)........আবদুল্লাহ ইবনে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং অন্য দু'ব্যক্তি আলী (রা)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) শৌচাগার হতে বের হয়ে কুরআন পড়তেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। জানাবত অবস্থা ব্যতীত তাঁকে কোন কিছুই কুরআন পাঠ হতে বিরত রাখত না।

২৬৭. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ (র).......আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) জানাবতের অবস্থা ব্যতীত সর্বাবস্থায়ই কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

জুনুবীর জন্য কুরআন তেলাওয়াতের বিধান

মনীবের হওয়ার কারণে অপবিত্রতার জন্য কুরআন তেলাওয়াত বৈধ কি-না? এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে–

(১) ইমাম বুখারী ইমাম তাবারানী, ইবনলু মুনযির ও দাউদে জাহেরী (র) বলেন, জানাবাত অবস্থায় কুরআন তেলোয়াত করা জায়েয আছে।

দলীল ঃ তারা সহীহ মুসলিমের একটি রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যা হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তা হলো, كَانَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهِ এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলেন, যখন হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে, হুজুর (স) সর্বসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ তালার যিকির করতেন, আর কুরআন তেলোয়াতও যেহেতু যিকির, যা সর্বসময় তিনি করতেন, এতে বুঝা যায় জুনুবী অবস্থায় কুরআন তেলোয়াত করা বৈধ।

(২) **জুমহুর উলামার মতে,** জুনুবী অবস্থায় কুরআন তেলোয়াত করা হারাম।

দলীলঃ তাদের দলীল হলো–

(١) حديث الباب

(٢) و حديثُ عَلِيٍّ (رضى) انه عليه السلام لَمْ يكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ القُرانِ شيئٌ لَيْسَ الجَنَابَةَ

(৩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضی) لَاتَقْرَءُ الْحَائِضُ وَلَاالْجُنُبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ (ترمذى)

যৌক্তিক প্রমাণ

কুরআনের মহত্ত্বের দাবী হলো জুনুবী ব্যক্তির কুরআন তেলোয়াত নিষিদ্ধ হওয়া। কেননা, জুনুবী অবস্থাটা হলো, অত্যন্ত ঘৃণিত অবস্থা। কাজেই এ অবস্থায় মহামহিম প্রভূর বাণী তেলোয়াত করা নিষিদ্ধ হওয়াটাই যুক্তির দাবী। এর সমর্থন পাওয়া যায় অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা। অনুচ্ছেদে উল্লেখিত রেওয়ায়াত ব্যতীত আরো রেওয়ায়াত আছে যা থেকে কুরআন তেলোয়াত নিষিদ্ধ হওয়া বুঝে আসে। যদিও হাদীসগুলো দূর্বল কিন্তু একাধিক সূত্র বিদ্যমান থাকার কারণে তার মধ্যে শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে حسن لغيره এর স্তরে উপনীত হয়েছে। আর এ ধরনের হাদীস আহকামের ক্ষেত্রে প্রমাণ হতে পারে।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

(১) জুমহুরের পক্ষ হতে উক্ত প্রমাণের জবাব নিম্নরূপ–

জুমহুর এর পক্ষ হতে পেশকৃত হাদীস হলো خاص আর الخ.....كَانَ يَذْكُرُ اللّٰه আয়েশা (রা) এর এ হাদীস হলো عام আর কায়দা হলো خاص হাদীসের বর্তমানে عام হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়, কাজেই غير ذكر কে قران এর সাথে খাস করতে হবে, যাতে করে উভয় প্রকার– হাদীসের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি হয়। ইমাম বুখারী (র) জুনুবী অবস্থায় কুরআন তেলোয়াতের যে অনুমতি দিয়েছেন, তার স্বপক্ষে তিনি সরীহ কোন নছ পেশ করেননি।

(২) হালাল ও হারামের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে হারামের হাদীস হালালের হাদীসের উপর প্রাধান্য পায়। কাজেই এখানে জুনুবী অবস্থায় কুরআন তেলোয়াত করা সম্পর্কীত হাদীস প্রাধান্য পাবে।

(শরহে মিশকাত ঃ শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩২৬)

عبد الله بن سلمه সম্পর্কে আলোচনা ঃ

তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, পিতার নাম সালমা। তিনি কুফার বনী মুরাদ এর লোক ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী তাকে সা;দুক তথা সত্যবাদী বলেছেন, কিন্তু তার স্মৃতিশক্তির মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল। তার সাথে আরো দুই ব্যক্তি যারা আলী (রা) এর নিকট গিয়েছিল তাদের পরিচয় কি? নাসায়ীর রেওয়ায়াতে– অস্পষ্ট ভাবে তাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। আবু দাউদে আছে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামা বলেন, তাদের মধ্য হতে একজন হলাম আমি, আর বনী মুরাদের অপর এক ব্যক্তি। তার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হলো লোকটি বনী আসাদের অন্তর্গত।

قوله وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُه.......الخ ঃ আল্লামা সুয়ুতী লেখেন, আল্লামা যারকাশী আলোচ্য হাদীসের তাখরীজে লেখেন, এখানে ليس শব্দটি غير এর অর্থে, আর বাজ্জার বলেন, ليس শব্দটি لا। এর অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে হিব্বানের রেওয়ায়াত দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন– তাতে لا لجنابة এসেছে। আর ইবনে হিব্বানের এক রেওয়ায়াতে مَاخَلَا الْجَنَابَةَ এসেছে। আল্লামা সিন্ধী (রা) বলেন, الخ.....وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُه হাদীসে যে বলা হয়েছে জানাবাত ছাড়া অন্য কোন জিনিস তাকে কুরআন পাক তেলোয়াত করা হতে বিরত রাখত না। কিন্তু جنابت এখানে عام - এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল অবস্থা যে সকল অবস্থায় আকল কুরআন তেলাওয়াতকে বৈধ মনে করে। কেননা, পেশাব-পায়খানার অবস্থাটাও জানাবাতের ন্যায় কিন্তু যেহেতু আকলের এতেবারে উক্ত দুই অবস্থা عموم থেকে বের হয়ে যায় এজন্য তাকে استثناء। দ্বারা বের করার প্রয়োজন নেই। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩২৫)

بَابُ مُمَاسَّةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِه

٢٦٨. اخبرنا اسحق بن ابراهيم اخبرنا جرير عن الشيباني عن ابي بردة عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله ﷺ اذا لقي الرجل من اصحابه صافحه ودعا له قال فرايته يوما بكرة فحدت عنه اتيته حين ارتفع النهار فقال اني رايتك فحدت عني فقلت اني كنت جنبا فخشيت ان تمسني فقال رسول الله ﷺ ان المسلم لا ينجس -

٢٦٩. اخبرنا اسحق بن منصور قال اخبرنا يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا واصل عن ابي وائل عن حذيفة ان النبي ﷺ لقيه وهو جنب فاهوى الي فقلت اني جنب فقال ان المسلم لا ينجس -

٢٧٠. اخبرنا حميد بن سعيد قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة ان النبي ﷺ لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل عنه فاغتسل ففقده النبي ﷺ فلما جاء قال اين كنت يا ابا هريرة قال يا رسول الله انك لقيتني وانا جنب فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس -

---

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী ব্যক্তিকে স্পর্শ করা ও তার সাথে বসা

অনুবাদ ঃ ২৬৮. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র).......হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখনই তাঁর সাহাবীগণের কারো সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তাঁর সাথে মুসাফাহা করতেন এবং তার জন্য দোয়া করতেন। হুযায়ফা বলেন, একদিন ভোরে আমি তাঁর দেখা পেলাম। তাঁকে দেখে আমি দূরে সরে গেলাম। তারপর যখন কিছু বেলা হলো আমি তাঁর নিকট এলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে দেখলাম। তারপর তুমি আমার থেকে দূরে সরে গেলে। আমি বললাম, আমি জুনুব অবস্থায় ছিলাম। আমার ভয় হলো, এমতাবস্থায় আপনি আমাকে স্পর্শ করে না বসেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, মুসলমান নাপাক হয় না।

২৬৯. ইসহাক ইবনে মনসুর (র).........হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর জানাবত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেখা হলো। (হুযায়ফা বলেন) রাসূলুল্লাহ (স) আমার দিকে আসছেন দেখে আমি বললাম, আমি জানাবত অবস্থায় আছি, তিনি বললেন, মুসলমান নাপাক হয় না।

২৭০. কুতায়বা ইবনে সা'য়ীদ (র)......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর সাথে মদীনার কোন এক রাস্তায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত হলো, তখন তিনি ছিলেন জানাবত অবস্থায়। সেজন্য তিনি সন্তর্পণে সরে পড়লেন এবং গোসল করলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে আর দেখতে পেলেন না। যখন পুনরায় আসলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সাথে যখন আপনার সাক্ষাত হয়েছিল তখন আমি জানাবত অবস্থায় ছিলাম। আমি গোসল করার পূর্বে আপনার সাথে বসাকে খারাপ মনে করলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সুবহানাল্লাহ! মুমিন নাপাক হয় না।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ/اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ **এর অর্থ ঃ** গোসল ফরয হওয়ার কারণে মু'মিনের শরীর অপবিত্র হয় না। কেননা, এ অপবিত্রতা حكمى তথা বিধানগত; মৌলিক নয়। কাজেই যদি অপবিত্র ব্যক্তি কোনো কূপের বা

চৌবাচ্চার পানিতে হাত প্রবেশ করায়, তবে তাতে পানি অপবিত্র হবে না। যদি তার হাতে ভিন্ন কোনো অপবিত্র বস্তু না থাকে। এমনিভাবে অপবিত্র ব্যক্তির ঘামও পবিত্র। অতএব, অপবিত্র ব্যক্তির সাথে করমর্দন ও কোলাকুলি করা জায়েয আছে। যেমন- এক হাদীসে আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) গোসল করে এসে আমাকে আলিঙ্গন করতেন। অথচ তখনও আমি গোসল করে পবিত্র হইনি।

শরীরের পবিত্রতা মুমিনের জন্য নির্দিষ্ট না কাফিরও এর অন্তর্ভূক্ত

আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত বিধানটি শুধু মুমিন বান্দার জন্য নির্দিষ্ট নয়। এতে কাফিররাও অন্তর্ভূক্ত। আর আল্লাহর বাণী إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কাফিররা নিজেদের খারাপ আকীদা ও মন্দ বিশ্বাসের কারণে বিধানগতভাবে অপবিত্র। কুফরির দরুন তাদের শরীর অপবিত্র নয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, সুমাম ইবনে উসাল ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূল (স) তাঁর সাথে মসজিদে নববীতে কথাবার্তা বলেছেন।

বনী সাকীফ গোত্রের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেই মসজিদে বসে রাসূল (স) এর সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন। কুফরির কারণে কাফিররা আত্মিকভাবে অপবিত্র হলেও দৈহিকভাবে অপবিত্র নয়, তবে হাদীসের মধ্যে মুসলিম শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্বের কারণে। মুমিনা ঋতুমতি নারীর হুকুম ও জুনুবী পুরুষের মতো। এতদভিন্ন মু'মিনের শরীর অধিকাংশ সময় পবিত্র থাকে। আর কাফির পাক-নাপাকের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। তাই তারা অধিকাংশ সময় নাপাক থাকে। কুরআনে তাই তাদেরকে নাজাস বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদা (রা) বলেন, কাফিররা নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জন করে না বা করতে জানে না। তাই তারা নাজাস। এছাড়া তাদের শরীর নাপাক জিনিসে গঠিত। কেননা, তাদের অধিকাংশ খাদ্যই নাপাক। এ জন্য হযরত হাসান বসরী (রা) বলেছেন, মুশরিকের সাথে করমর্দন করার পর উযূ করা উচিত তবে অধিকাংশ আলিমের মত হলো উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা মুমিনদেরকে কাফিরদের সাথে অধিক সখ্যতা ও মাখামাখি না করার জন্য বলা হয়েছে, বরং তাদের সংসর্গ হতে দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (শরহে মিশকাত ঃ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৪৪)

দ্বিতীয় রেওয়ায়াত সম্পর্কে আলোচনা

قول فَأَهْوَى إِلَيْهِ অর্থাৎ যখন নবী (স) এর সাথে হুযাইফার জুনুব অবস্থায় সাক্ষাত হয় তখন হুজুর (স) তার প্রতি মননিবেশ করেন এবং তার দিকে হাত বাড়ায়ে দেন মুসাফাহ করার উদ্দেশ্যে। হুযাইয়া (রা) বলেন আমি জুনুবী। তখন নবী (স) তাকে জবাব দেন মুসলমান নাপাক হয় না, অর্থাৎ হদস হওয়ার কারণে মুসলমানকে অপবিত্র বলা যায় না। যদি মুসলমান জুনুবীও হয় তাহলেও বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিণ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে নাপাক বলা যায় না। কেননা, তার সাথে কথাবার্তা বলা ও মুসাফাহ করার অনুমতি আছে। জানাবত একটি হুকমী বা বিধানগত বিষয় যার সম্পর্ক হলো খাস জিনিসের সাথে।

হাদীস দ্বয়ের মধ্য দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান ঃ বাহ্যত প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়াতের মধ্যে বৈপরীত্ব দেখা যাচ্ছে। কেননা, প্রথম হাদীসের অগ্র-পশ্চাৎ দ্বারা বুঝা যায় হুযাইফা (রা) গোসল থেকে ফারেগ হয়ে হুজুরের দরবারে উপস্থিত হলে তখন তিনি তাঁর সাথে কথা বলেন, আর দ্বিতীয় রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় জুনুবী অবস্থায় তিনি তার সাথে সাক্ষাত করেন এবং হুজুরের সাথে কথা বলেন। কিন্তু বাহ্যত উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা, হতে পারে নবী (স) এর দৃষ্টি যখন হুযাইফা (রা) এর উপর পড়ে, তখন তিনি পাশ কেটে হুজুর এর সাথে কোন ধরনের কথা না বলেই পালিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর হুজুর (রা) এর নিকট উপস্থিত হলে নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন কি খবর! আমি তোমাকে দেখলাম, আর তুমি গোপনে সরে পড়লে।

হযরত হুযাইফা (রা) উত্তর দিলেন إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا আমি জুনুবী ছিলাম। এটাকেই রাবী সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন নি। এর দ্বারা বুঝা গেলো দুটি ঘটনা ভিন্ন কোন ঘটনা নয় বরং একই ঘটনা। কাজেই দুটি রেওয়ায়াতকে ভিন্ন মনে করা ঠিক নয়।

আলোচ্য হাদীসের শিক্ষা ঃ এই হাদীসের উপর দৃষ্টি রেখে উলামায়ে কিরাম বলেন, ছাত্ররা শিক্ষকের দরবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও খুশবু ব্যবহার করে বসবে। কেননা, এর দ্বারা ইলম ও আহলে ইলম এর সম্মান হয়। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩২৭-৩২৮)

بَابُ اِسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

٢٧١. اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثنى ابو حازم قال قال ابو هريرة رضي الله عنه بينما رسول الله ﷺ فى المسجد اذ قال يا عائشة ناولينى الثوب فقالت انى لا اصلى قال انه ليس فى يدك فناولته -

٢٧٢. اخبرنا قتيبة بن سعيد عن عبيدة عن الاعمش ح واخبرنا اسحق بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ ناولينى الخمرة من المسجد قالت انى حائض فقال رسول الله ﷺ ليس حيضتك فى يدك -

٢٧٣. اخبرنا اسحق بن ابراهيم قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش بهذا الاسناد مثله -

---

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতি স্ত্রীর খেদমত নেয়া

অনুবাদ ঃ ২৭১. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র)...........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে ছিলেন, হঠাৎ তিনি বললেন, হে আয়েশা আমাকে কাপড়টি দাও। আয়েশা বললেন, আমি তো নামায হতে বিরত আছি। তিনি বললেন, তা তো তোমার হাতে নয়, পরে আয়েশা (রা) তাঁকে কাপড় দিলেন।

২৭২. কুতায়বা ইবনে সা'ঈদ ও ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)...........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, মসজিদ হতে আমাকে জায়নামাযটি এনে দাও। তিনি বললেন, আমি তো হায়েয অবস্থায় আছি। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমার হায়েয তোমার হাতে নয়।

২৭৩. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)..........আবু মুআবিয়া (রা) থেকে তিনি আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

অনুচ্ছেদের হাদীসে যে সুরত উল্লেখ করা হয়েছে, সকল ইমামের নিকট এ সুরত জায়েয। এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। প্রথম হাদীসে এসেছে যে, যখন নবী করীম (স) মসজিদে এতেকাফরত অবস্থায় আয়েশা (রা) কে বললেন, হে আয়েশা! আমাকে কাপড় দাও অর্থাৎ হুজরার থেকে খিড়কির দরজা দিয়ে দাও। কিন্তু যেহেতু আয়েশা (রা) তখন হায়েযা ছিলেন, কাজেই তিনি নিজ থেকে বলেন, اِنِّى لَا اُصَلِّى আমি নামায পড়ি না, এর দ্বারা তিনি হায়েযের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি হায়েযা। অতএব আমি কিভাবে হাত বাড়ায়ে মসজিদে আপনাকে কাপড় দেব। হুজুর (স) বললেন, اِنَّهُ لَيْسَ فِىْ يَدِكِ তোমার হাতে তো হায়েয নেই। انه এর যমীরের مرجع হলো হায়েয অথবা রক্ত। অতঃপর আয়েশা (রা) জানালা দিয়ে নবী (স) কে কাপড় দিলেন।

দ্বিতীয় হাদীসে এসেছে– الخ.......نَاوِلِيْنِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ তাবারানী বলেন, خمرة ছোট জায়নামাজকে বলে যা খেজুরের পাতা দ্বারা তৈরি। তাকে خمرة এ কারণে বলা হয় যে, নামাযী ব্যক্তি তার মাধ্যমে

সাজদা অবস্থায় স্বীয় হাত ও কপালকে জমিনের ঠাণ্ডা ও উত্তাপ থেকে রক্ষা করতে পারে। আর যদি চাটায় বড় হয় যার উপর নামাযী দাড়াতে পারে এবং সাজদাও করতে পারে তাকে حصير বলা হয়। ইমাম জুহরী তাহযীর নামক গ্রন্থে এবং আবু উবায়দা হারুবীও এমন মত প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয় আলোচনা ঃ مِنَ الْمَسْجِد এর সম্পর্ক কার সাথে? কাযী আয়ায এর বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় এটা قال এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হবে হুজুর (স) একথা মসজিদ থেকে বলেছিলেন যে, হে আয়েশা! হুজরা থেকে কাপড় দাও৫১২৫১১৫১২ ।নকল করার পর আল্লামা সিন্ধী (রা) বলেন, এ ব্যাখ্যার ভিত্তি হলো কাযী ইয়াজ এর اتحاد واقعة এর উপর অথচ স্পষ্ট এটাই যে, ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন, এক নয়। আর مِنَ الْمَسْجِد এর সম্পর্ক ناوليني এর সাথে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হবে হুজুর (স) হুজরায় থাকা অবস্থায় বলেন, হে আয়েশা! মসজিদ হতে জায়নামাযটা দাও। হযরত আয়েশা (রা) এর নিকট মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে খিড়কি দিয়ে কাপড় দেয়ার থেকে মসজিদ হতে জায়নামায নিয়ে দেওয়াটা অধিক অপন্দনীয় ছিল, কাজেই তিনি হায়েযা হওয়ার ওযর পেশ করেন।

যেমন– আয়েশা (রা)এর উক্তি তিনি বলেন, انى حائض হতে পারে যে, তিনি ইজতিহাদের মাধ্যমে বুঝে নিয়ে ছিলেন যে, হায়েযা মহিলার যেমন মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঠিক অদ্রূপ হায়েযা মহিলার হাত মসজিদে প্রবেশ করানো ও নিষিদ্ধ। তার ওযর পেশের পর হুজুর (স) বলেন, لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِىْ يَدِكِ তোমার হাতে হায়েয নেই। অর্থাৎ, যে হায়েযের রক্ত হতে মসজিদকে হিফাজত করতে হয় তা তোমার হাতে নেই। কেননা, শুধুমাত্র হাতকে হায়েযা বলা হয় না। বরং যে হায়েয থেকে মসজিদ হিফাজত করার হুকুম দেয়া হয়েছে। তার সম্পর্ক শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে অর্থাৎ পূর্ণ শরীরসহ মহিলার মসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। কোন একটি অঙ্গ নয়। আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে মসজিদ হতে জায়নামায ইত্যাদি উঠানো জায়েয।

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান

পূর্বোক্ত আলোচনার উপর উলামায়ে কিরাম একটি প্রশ্ন উথাপন করেন, তা হলো হাতে যেহেতু হায়েযার নাপাক থাকে না। তাহলে কুরআন স্পর্শ করা কেনো নাজায়েয হবে? অথচ মসজিদে হাত বাড়িয়ে জায়নামায উঠানো বৈধ।

উত্তর ঃ উক্ত প্রশ্নের উত্তর হলো, ওরফের মধ্যে প্রবেশ বলা হয় যা পা দ্বারা হয়, মাথা ও হাত দ্বারা নয়। কাজেই মসজিদে হায়েযগ্রস্থ মহিলার প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর হাত ঢুকালে যেহেতু دخول (প্রশে) হয়না, তাই ঢুকানো জায়েয। হাত দ্বারা কুরআন স্পর্শ করা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ আর কুরআন স্পর্শ করা হাত দ্বারাই হয়ে থাকে পূর্ণ শরীর দ্বারা নয়। তাই হায়েযা মহিলার কুরআন স্পর্শ নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এক্ষেত্রে ওরফই ধর্তব্য। আর ওরফে হাত দ্বারা ধরাকে স্পর্শ বলা হয়।

بَابُ بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ

٢٧٤. اخبرنا محمدُ بْنُ مَنْصورٍ عَنْ سُفيانَ عَنْ مَنْبُوذٍ عن اُمِّهِ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ قالتْ كانَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ رَاسَهُ فِى حَجْرِ اِحْدانَا فَيَتْلُوا الْقُرانَ وهِىَ حائضٌ وتقومُ اِحْدانَا بالخُمْرةِ الَى المَسْجِدِ فتَبْسُطُها وهىَ حَائِضٌ -

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে ঋতুমতির চাটাই বিছানো

অনুবাদ ঃ ২৭৪. মুহাম্মদ ইবনে মনসুর.............মান্‌বূয (র)-এর মা থেকে বর্ণিত। মায়মুনা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আপন মস্তক মুবারক আমাদের কারো ক্রোড়ে রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন অথচ (যার ক্রোড়ে মাথা রাখতেন) তিনি তখন ঋতুমতি। আর আমাদের কেউ ঋতু অবস্থায় মসজিদে চাটাই বিছিয়ে দিতেন।

সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله يَضَعُ رَاْسَهُ فِى حَجْرِ اِحْدَانَا الخ ঃ নবী (স) এর এই আমল যা হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে তার দ্বারা বুঝা যায় যদি স্বামী তার হায়েযা স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলোয়াত করে তাহলে তার এ কাজ শরীয়ত পরিপন্থী নয় বরং মাকরূহহীনভাবে বৈধ। কেননা, হায়েযার কাপড় ও শরীরের নাপাক লাগার আগ পর্যন্ত নাপাক হয় না, বরং পাক থাকে। কাজেই তার কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করা বৈধ। এখান থেকে এটাও বুঝা যায় যে, নাজাসাতের নিকটবর্তী স্থানে কুরআন তেলোয়াত করা নিষিদ্ধ নয়। কেননা, হায়েযা মহিলার ঐ বিশেষ অঙ্গ যেখান থেকে হায়েয নির্গত হয় তা নাপাক; অন্য জায়গা নাপাক নয়। তাই হায়েযা মহিলার কোলে মাথা রেখে কুরআন পড়ার ইজাযত দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, যদি হায়েযা মহিলা মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে জায়নামায বিছায়ে দেয় তাহলে এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কি? تقومُ اِحْدَانَا ....الخ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নিঃসন্দেহে এ সুরত বৈধ। বিস্তারিত আলোচনা পেছনে অতিবাহিত হয়েছে।

জুনুবী ঋতুমতি মহিলার মসজিদে প্রবেশের বিধান

(১) দাউদে জাহেরী ও ইমাম মুযানী (রা) এর মতে গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তি ও ঋতুমতি মহিলার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নয়। তাদের দলীল–

عن عائشة (رضى) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَجِّهُوا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَاِنِّى لَا اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ ولاجُنُبٍ .

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা)– হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন তোমাদের এ সমস্ত ঘরগুলো মসজিদের দিক হতে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দাও, যাতে মসজিদের ভেতর দিয়ে তোমাদের চলাফেরার পথ না হয়। কেননা, আমি ঋতুমতি মহিলাকে এবং গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তির জন্য মসজিদে আসা জায়েয মনে করি না।

(২) ইমাম আহমদ ও ইসহাকের মতে, গোসল ফরয হওয়া পুরুষ ও মহিলার জন্য মসজিদে প্রবেশ জায়েয যখন তারা উযূ অবস্থায় হবে। কেননা, সাহাবীদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে–

اِنَّهُم يَجْلِسُوْن فِى الْمَسْجِدِ وهُم مُجْنِبُوْن اِذا تَوَضَّأُوا وُضُوْءَ الصَّلوة .

(৩) ইমাম আবু হানীফা, মালেক, সুফিয়ান সাওরী প্রমূখ ইমামের মতে জুনুবী ও ঋতুবতী মহিলার অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ ও তাতে অবস্থান করা নাজায়েয। তারা আয়েশা (রা) এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন

عن عائشة قالت ....لَا اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ ولاجُنُبٍ (শরহে মিশকাত ঃ১–৩৪৯)

بَابُ فِى الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرَانَ وَرَاْسُهُ فِى حَجْرِ امْرَاَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ

٢٧٥. اخبرنا اسحٰقُ بْنُ ابراهيمَ وعلىُّ بْنُ حُجْرٍ واللفظُ له اخبرنا سفيانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَاْسُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجْرِ اِحْدَانَا وهى حائضٌ وهو يَتْلُوْ الْقُرَانَ -

بَابُ غَسْلِ الْحَائِضِ رَاسَ زَوْجِهَا

٢٧٦. اخبرنا عمرُو بْنُ عَلِىٍّ قالَ حدّثنا يَحْيٰى قال حدّثنا سفيانُ قال حَدّثنى منصورٌ عَنْ ابراهيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قالتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْمِئُ اِلَىَّ رَاْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وهو مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وأنا حائِضٌ -

٢٧٧. اخبرنا محمدُ بْنُ سلمةَ قال حدّثنا ابنُ وَهْبٍ عَنْ عمرِو بْنِ الْحَارِثِ وذكر اٰخرَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قالتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخْرِجُ اِلَىَّ رَاْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وهُوَ مُجَاوِرٌ فَاَغْسِلُهُ وأنا حائِضٌ -

٢٧٨. اخبرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَاسَ رسولِ اللّٰهِ ﷺ وأنا حائِضٌ -

٢٧٩. اخبرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيدٍ عَنْ مالكٍ ح واخبرنا عَلِىُّ بْنُ شُعَيْبٍ قال حدّثنا مَعْنٌ حدّثنا مالكٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতি স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা

অনুবাদ ঃ ২৭৫. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ও আলী ইবনে হুজর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ঋতুমতি কারো কোলে রাসূলুল্লাহ (স) মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতি স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথা ধৌত করা

২৭৬. আমর ইবনে আলী (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইতিকাফ অবস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা বের করে দিতেন। আর আমি তা ধুয়ে দিতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি।

২৭৭. মুহাম্মদ ইবনে সালামা (র).......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদ হতে তাঁর মাথা আমার দিকে বের করে দিতেন, আর আমি তা ধুয়ে দিতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি।

২৭৮. কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) এর মাথা আঁচড়ে দিতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি।

২৭৯. কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) এর মাথা আঁচড়ে দিতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি।

بابُ مُواكَلَةِ الحَائِضِ وَالشُّرْبُ مِنَ سأرِهَا

٢٨٠. اخبرَنا قُتَيبَةُ قال حَدَّثَنا يزيدُ وهُو ابنُ المِقْدامِ بْنِ شُرَيحِ بْنِ هَانِي عَنْ اَبِيهِ عَنْ شُرَيحٍ عَنْ عَائِشةَ سَألتُهَا هَل تَأكُلُ المَراةُ معَ زَوْجِهَا وهِى طَامِثٌ قالتْ نَعَمْ كانَ رسولُ اللّهِ ﷺ يَدْعُونِى فَاكُلُ مَعَهُ وأنا عارِكٌ وكانَ يأخُذُ العَرْقَ فيُقْسِمُ عَلَىَّ فِيهِ فَاَعْتَرِقُ مِنه ثُمَّ اَضَعُهُ فَيَاخُذُهُ فيَعْتَرِقُ مِنه ويَضَعُ فَمَهُ حَيثُ وَضَعْتُ فَمِى مِنَ العَرْقِ وَيَدْعُو بِالشَّرابِ فيُقْسِمُ عَلىَّ فِيه قَبلَ اَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ اُخُذُهُ فَاَشْرَبُ مِنه ثم اَضَعُه فيَاخُذُه فيَشْرَبُ مِنه ويَضَعُ فَمَه حَيثُ وَضَعْتُ فَمِى مِنَ القَدَحِ -

٢٨١. اخبرَنا ايوبُ بْنُ محمدٍ الوَزَّانِ قال حدَّثنا عبدُ اللّهِ بنُ جَعْفرٍ قال حدَّثنا عُبَيدُ اللّهِ بْنُ عمرٍو عَنِ الْاَعْمَشِ عنِ المِقدامِ بْنِ شُرَيحٍ عَنْ اَبِيهِ عَن عائشةَ قالتْ كانَ رسولُ اللّهِ ﷺ يَضَعُ فَاهُ عَلَى المَوْضِعِ الَّذى اَشْرَبُ مِنه فيَشْرَبُ مِن فَضْلِ سُؤْرِى وأنا حائضٌ -

---

ঋতুমতির সঙ্গে খাওয়া এবং তার পানাবশেষ পানীয় পান করা

২৮০. কুতায়বা (র) ....শুরায়হ (র) থেকে বর্ণিত। আমি আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, হায়েয অবস্থায় স্ত্রী কি তার স্বামীর সঙ্গে খেতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে ডাকতেন, আমি তাঁর সঙ্গে খেতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি। আর তিনি হাড় নিতেন এবং বলতেন, আল্লাহর কসম, তুমি আগে আহার কর। তারপর আমি তার কিছু অংশ চিবাতাম এবং রেখে দিতাম। পরে তিনি তা নিয়ে চিবাতেন।

প্রথম অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য অনুচ্ছেদ যে উদ্দেশ্যে কায়েম করা হয়েছে হাদীসের দালালত তার উপর স্পষ্ট যে,, স্বামী তার হায়েযা স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে। শরীয়তে এটা কোন দোষণীয় নয়। যদি এতে কোন খারাবী থাকতো তাহলে রাসূল (স) স্বীয় বিবির কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করতেন না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, হযরত আয়েশা (রা) হায়েযকালে তাঁর হুজরায় অবস্থান করতেন। হায়েয অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করতেন না। তাই নবী (স) এতেকাফরত অবস্থায় ইতেকাফের দিনগুলিতে জানালা দিয়ে তাঁর মাথা বের করে দিতেন। আর হযরত আয়েশা (রা) তাঁর মাথা ধুয়ে দিতেন ও তেল লাগায়ে দিতেন অথচ তিনি তখন হায়েযা ছিলেন। এই হাদীস থেকে বুঝা যায় কোন স্বামী যদি তার হায়েযা স্ত্রীর থেকে খেদমত নিতে চায় তাহলে নিতে পারে। শরীয়তে এ ব্যাপারে কোন বাধা নেই।

দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে এসেছে যে, مجاور مُعْتَكِفٌ وهُوَ مُجَاوِرٌ এগুলোর অর্থ ইতিকাফরত। বাকী হাদীসের বিষয়বস্তু একই যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় রেওয়ায়াতে এসেছে যে, مجاور শব্দটি معتكف থেকে গৃহীত। এর অর্থ হলো চিরুনী করা অবস্থায় হুজুর (স) এর চুল আঁচড়ায়ে দিতাম। এর দ্বারা বুঝা গেলো হায়েযা অবস্থায় মহিলা হতে খেদমত নেয়া বৈধ। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩৩২)

হাড়টির ঐখানেই মুখ দিতেন যেখানে আমি মুখ দিয়েছিলাম। আর তিনি পানীয় আনতে বলতেন, আমি পানি আনলে তিনি বলতেন, আল্লাহর কসম! তুমি আগে পান কর। তখন আমি পাত্রটি নিয়ে তা থেকে পান করতাম এবং আমি রেখে দিলে তিনি উঠিয়ে তা থেকে পান করতেন। আর আমি পেয়ালার যেখানে মুখ দিয়েছিলাম তিনি সেখানেই মুখ দিতেন।

২৮১. আইয়ুব ইবনে মুহাম্মদ ওয়ায্‌যান (র)...........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে মুখ রাখতেন যেখানে মুখ রেখে আমি পান করতাম। তিনি আমার পানাবশেষ থেকে পান করতেন অথচ তখন আমি ঋতুমতি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

ইয়াহুদীরা স্বীয় হায়েযা স্ত্রীর কাছে বসত না এবং তার সাথে খানা খেত না। পানি পান করত না। ইসলাম এসে তাদের এ রীতিকে ভুল সাব্যস্ত করেছে। তাদের ধারণা হলো হায়েযা মহিলার শরীর হায়েযের কারণে নাপাক হয়ে যায়। এ বিষয়টি ইসলামের দৃষ্টিতে সহীহ নয়। কেননা, হাদীসে এসেছে فَاعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمَّ اَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ ....الخ অনুরূপভাবে الخ.... تَرَجَّلُ يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِى এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় হায়েযা মহিলার হাত, মুখ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হায়েযের কারণে নাপাক হয় না, এবং তার সাথে খানা-পিনা উঠা-বসা সব বৈধ। সুতরাং ইসলাম হায়েযা মহিলার সাথে সুন্দর উত্তম ও উপযোগী পন্থা নির্ধারণ করেছে যে, সহবাস ব্যতীত তার সাথে সব ধরনের কাজ করা বৈধ আছে। হায়েযা মহিলার দিকে এ কথার নিসবত করা সঠিক নয়। " তিনি বলেন, হায়েযা মহিলার শরীর অপবিত্র" উদ্দেশ্যে হলো নবী (স) এর ঐ কাজ যা আয়েশা (রা) আলোচনা করেছেন كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ.... يَضَعُ فَاهُ এতে হায়েযা মহিলার উচ্ছিষ্ট যে পাক এবং তাদের সাথে খানা পিনা করা বৈধ। এ বৈধতার বিধানের বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েযা অবস্থায় পাত্রের যে অংশ দিয়ে পানি পান করতাম রাসূল (স) ঐ স্থানে মুখ রেখে পাত্রের অবশিষ্ট পানি পান করতেন। এটা হৃদ্যতা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্যই করেছেন। এর দ্বারা একথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, হায়েয অবস্থায় মহিলাদের সাথে এক বারে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি তার হায়েযা স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করবে, ইয়াহুদী ও অন্যান্য বিধর্মীদের আচরণ অবলম্বন করবে না। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩৩)

بَابُ الْاِنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

٢٨٢. اخبَرنا محمدُ بْنُ مَنْصورٍ قال حَدّثنا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعرٍ عَنِ المِقدامِ بْنِ شُرَيحٍ عَنْ اَبِيْه قالَ سَمِعتُ عائِشةَ رضى اللّٰهُ عَنْها تَقُولُ كانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُناوِلُنِى الاِناءَ فَاَشْرَبُ مِنْه وانا حائِضٌ ثمّ اُعْطِيْه فيَتَحرّى موضِعَ فَمِى فيَضَعُه عَلَى فِيْه -

٢٨٣. اخبَرنا محمدُ بْنُ غيلانَ قال حدّثنا وكيعٌ قال حدّثنا مِسعرٌ وسفيانُ عَنِ المِقْدامِ بْنِ شُريحٍ عنْ اَبِيْه عَنْ عائشةَ رضى اللّٰهُ تعالى عَنْها قالتْ كنتُ اَشْرَبُ وانا حائضٌ واُناوِلُه النبىَّ ﷺ فيضَعُ فاهُ على موضِعِ فِىَّ فيَشْرَبُ واَتَعَرَّقُ العَرْقَ وانا حائضٌ واُناوِلُه النبىَّ ﷺ فيَضَعُ فاه عَلَى مَوْضِعِ فِىَّ -

بابُ مُضاجَعَةِ الحَائِضِ

٢٨٤. اخبَرنا اِسْماعيلُ بْنُ مسعودٍ قال حدّثنا خالدٌ قال حدّثنا هِشامٌ ح وانبَانا عبيدُ اللّٰهِ ابْنِ سعيدٍ واسحٰقُ بْنُ ابراهيمَ قالا حَدّثنا معاذُ بْنُ هِشامٍ واللّفظُ لَه قال حدّثنى اَبِىْ عَن يحيٰى قال حَدّثنا ابُو سلمةَ انّ زَيْنَبَ بنتِ اَبِىْ سَلَمَةَ حَدّثتْه انّ امّ سلمةَ حدّثتْها قالتْ بينَما اَنا مُضْطجعةٌ معَ رسولِ اللّٰهِ ﷺ فِى الخَمِيْلةِ اِذ حِضتُ فَانْسَلَلْتُ فَاَخَذْتُ ثِيابَ حَيْضَتِى فقال رسولُ اللّٰهِ ﷺ اَنَفِسْتِ؟ قلتُ نَعَمْ! فدَعانِى فَاضْطجَعْتُ معَه فِى الخمِيْلةِ -

٢٨٥. اخبَرنا محمد بنُ المُثنّٰى قال حدّثنا يحيٰى بنُ سعيدٍ عن جابرِ بْنِ صبحٍ قال سمعتُ خِلاسًا يُحَدّثُ عنْ عائشةَ قالتْ كنتُ اَنا ورسولُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْتُ فِى الشِّعارِ الواحِدِ وانا طامثٌ او حائضٌ فانْ اَصابَه مِنّى شيئٌ غَسَلَ مَكانَه ولمْ يُعْدُه وصَلّى فِيْه ثم يعودُ فان اصابَه مِنّى شيئٌ فَعَلَ مِثلَ ذٰلكَ ولمْ يُعِدْه وصَلّى فِيْه -

---

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতির ভুক্তাবশেষ আহার করা

অনুবাদ ঃ ২৮২. মুহাম্মদ ইবনে মনসুর (র)..........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে পাত্র দিতেন আমি তা থেকে পান করতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি। তারপর আমি তাঁকে সে পাত্র দিতাম আর তিনি আমার পান করার জায়গা তালাশ করে সে জায়গায় তার মুখ রাখতেন।

২৮৩. মাহমুদ ইবনে গায়লান (র).......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় পাত্র থেকে পান করতাম এবং তা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দিতাম। আমি যেখানে মুখ রেখে পান করতাম তিনি সেখানে মুখ রাখতেন। আমি হায়েয অবস্থায় হাঁড় চিবাতাম তারপর তা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দিতাম। আর তিনি আমার মুখ রাখার স্থানে মুখ রাখতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতির সাথে শয়ন করা

২৮৪. ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র), উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ ও ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)........উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে একই চাদরে শায়িত ছিলাম হঠাৎ আমার হায়েয দেখা দিল, এরপর আমি সরে পড়লাম এবং আমার হায়যের কাপড়

পরিধান করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি কি ঋতুমতি হয়েছ? আমি বললাম হ্যাঁ। এরপর তিনি আমাকে ডাকলেন আর আমি তাঁর সঙ্গে একই চাদরে শয়ন করলাম।

২৮৫. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স) একই চাদরে রাত্রি যাপন করতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি। যদি আমার কোন কিছু তাঁর শরীরে লাগত, তখন তিনি ঐ স্থানই ধুয়ে নিতেন এর বেশি ধুইতেন না। আর এ অবস্থাতেই তিনি নামায আদায় করতেন, আবার তিনি বিছানায় ফিরে আসতেন। যদি আমার কোন কিছু তাঁর শরীরে লাগত, তবে তিনি শরীরের ঐ অংশটুকু ধুয়ে নিতেন, এর বেশি ধুইতেন না। আর এ অবস্থাতেই তিনি নামায আদায় করতেন।

প্রথম অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عرق ঐ হাড়কে বলা হয় যার অধিকাংশ গোশত খুলে নেওয়া হয়েছে। এবং সামান্য কিছু পরিমাণ গোশত তার উপর লেগে আছে। হযরত আয়েশা (রা) সর্বপ্রথম ঐ গোশত খেতেন। অতঃপর নবী (স) তা নিয়ে ঐ স্থান হতেই খাওয়া শুরু করতেন যেখান থেকে আয়েশা (রা) খেয়েছেন। অথচ আয়েশা (রা) তখন ঋতুমতি। এর দ্বারা বুঝা যায় হায়েযার উচ্ছিষ্ট পবিত্র। কাজেই তা খাওয়া ও পান করা বৈধ। ইবনে সাইয়্যিদুন নাস হায়েযা স্ত্রীর সাথে খাওয়া ও পান করার উপর উম্মতের ইজমার দাবী করেছেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রথম হাদীস হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। এতে তিনি বলেন, যখন আমার হায়েয শুরু হলো فَانْسَلَلْتُ فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي আমি গোপনে চাদর হতে বের হয়ে গেলাম। কারণ হায়েয রত অবস্থায় হুজুর (স) এর সাথে একই চাদরে শোয়াটাকে অপছন্দ করলাম। কেননা, হায়েযের রক্ত তাঁর শরীরে অথবা কাপড়ে লেগে যেতে পারে। মোটকথা, তিনি গোপনে চলে গিয়ে ঐ কাপড় নিলেন যা হায়েযের দিনে পরার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন এ সুরতে বর্ণটি كسره এর সাথে। আল্লামা খাত্তাবী ও আল্লামা এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কোন কোন ব্যাখ্যাকার যবরের সাথে পড়েন এবং এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়াতে "ة" ব্যতীত حيضى শব্দ এসেছে। এক্ষেত্রে তাকদীরী ইবারত হবে।

اَخَذْتُ ثِيَابِىَ الَّتِىْ اَلْبِسُهَا زَمَنَ الْحَيْضِ আমি ঐ কাপড় নিলাম যা হায়েযের সময় ব্যবহার করতাম। যাহোক যখন উম্মে সালামা (রা) হায়েযের কাপড় পরে নিলেন। তখন হুজুর (স) বললেন, اَنُفِسْتِ اى اَحِضْتِ তোমার কি হায়েয আসা শুরু হয়েছে। আমি বললাম হ্যাঁ, হায়েয শুরু হয়েছে। এখানে যে نفاس শব্দ ব্যবহার করেছেন এর দ্বারা হায়েয উদ্দেশ্য। হাদীসের কোথাও نفاس এর ক্ষেত্রে حيض শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আবার কোথাও نفاس শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা একথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হায়েয ও নেফাস উভয় অবস্থায় সহবাসের বিধান এক, তথা সহবাস করা হারাম। (والله تعالى اعلم بالصواب)

আল্লামা খাত্তাবী (রা) বলেন انفست। শব্দটির نون বর্ণে যবর এবং فا. এর উপর كسره অর্থ احضت। সুতরাং যখন কোন মহিলা হায়েযা হবে তখন বলা হয় نفست المراة; نون. বর্ণটি পেশের সাথে ولادة; এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এটাই অধিকাংশ উলামার বক্তব্য কিন্তু আবু হাতেম আসমায়ী হতে নকল করেন যে, حيض ও ولادة উভয়ের জন্য نون বর্ণটি যম্মার সাথে نفست المراة; ব্যবহার করা শুদ্ধ।

মোটকথা, উক্ত হাদীসে নবী (স) এর বাণী انفست। এর অর্থ احضت। নবী (স) উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হায়েয এসেগেছে? তিনি জবাব দিলেন জী হ্যাঁ হায়েয জারী হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, হুজুর (স) আমাকে ডাকলেন এবং আমি তাঁর সাথে চাদরের মধ্যে শুয়ে গেলাম। এর দ্বারা বুঝা যায় কুরআনের বাণী فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ এর অর্থ কখনই এই নয় যে, হায়েযা মহিলা হতে পরিপূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করবে এটাতো ইয়াহুদীদের অভ্যাস বা অত্যাচারমূলক পদ্ধতি। কাজেই এখানে এ উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো সহবাস থেকে বিরত থাকা। বাকী হায়েযা স্ত্রীর সাথে খাওয়া-দাওয়া উঠা-বসা ও শোয়া সব বৈধ। দ্বিতীয় হাদীস যা আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত এ হাদীসের সংশ্লিষ্ট আলোচনা পূর্বে চলে গেছে। (শরহে নাসায়ী ঃ ৩৩৬)

بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

٢٨٦. اخبرنا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو الأحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰق عَنْ عَمرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ عَنْ عائشةَ قالتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامُرُ احدانا اِذا كانتْ حَائِضًا اَنْ تَشُدَّ اِزارَها ثمّ يُبَاشِرُها -

٢٨٧. اخبرنا اسحٰقُ بنُ ابراهيمَ قال اَنْبَانَا جريرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبراهيمَ عَنِ الأسْوَدِ عَن عائشةَ قالتْ كانتْ احدانا اِذا حاضتْ اَمَرَها رسولُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَتَّزِرَ ثمّ يُبَاشِرُها -

٢٨٨. اخبرنا الحارثُ بْنُ مِسكينٍ قِراءةً عليه وانا اسمعُ عَن ابنِ وهبٍ عَنْ يُونسَ واللَّيثُ عَن ابنِ شِهابٍ عن حبيبٍ مَولٰى عُروةَ عَن بُدَيَّةَ وكانَ اللَّيثُ يقولُ بُدَيَّةُ مَولاةُ مَيْمُونَةَ عَن مَيْمُونَةَ رضى اللّٰهُ عَنها قالتْ كانَ رسولُ اللّٰه ﷺ يُباشِرُ المرأةَ مِنْ نِسائِه وهِى حائضٌ اذا كانَ عليها اِزارٌ يَبْلُغُ اَنْصافَ الفَخِذَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ فِى حديثِ اللَّيثِ مُحْتَجِزَةً بِه -

---

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতির শরীরের সাথে শরীর মিলানো

২৮৬. কুতায়বা (র)...........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ ঋতুমতি অবস্থা থাকলে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে ইযার পরার আদেশ দিতেন। তারপর তিনি তার শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন।

২৮৭. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ ঋতুমতি থাকলে তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাকে তার ইযার পরিধান করতে বলতেন। তারপর তিনি তার শরীরে শরীর লাগাতেন।

২৮৮. হারিস ইবনে মিসকীন (র).........মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর কোন সহধর্মিণীর হায়েয অবস্থায়, যখন তার পরনে ইযার থাকত যা হাঁটু ও রানের মধ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছে তখন তিনি তার শরীরে শরীর মিলাতেন। লায়সের হাদীসে আছে, তিনি (সহধর্মিণী) ঐ ইযার দ্বারা (বিশেষ অঙ্গ) আবৃত করতেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سؤال : هَل يجوزُ اِتيانُ الحَائِضِ بالوطْىِ امْ لَا و مَا هُوَ كَفَّارَتُهُ؟

প্রশ্ন ঃ হায়েয অবস্থায় কি যৌন মিলন জায়েয হবে? এ অবস্থায় যৌন মিলন করলে তার কাফফারা কী?

উত্তর ঃ ঋতুমতি মহিলার সাথে সহবাস ঃ ঋতুমতি স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশার অবস্থা তিনটি।

(ক) اِسْتِمْتَاعٌ بِالْجِمَاعِ বা সঙ্গমের মাধ্যমে ফায়দা নেয়া।

(খ) المُبَاشرةُ فِى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وتَحْتَ الرُّكْبَةِ বা নাভীর উপরে ও হাঁটুর নিচে মেলা-মেশার দ্বারা ফায়দা নেয়া–

(গ) المُبَاشرةُ فيما بَيْنَ السُّرَّةِ الى الرُّكْبَةِ فى غيرِ القُبُلِ والدُّبُرِ অর্থাৎ নাভির নিচ থেকে নিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত যৌনাঙ্গ এবং গুহ্যদার ব্যতীত মেলা-মেশা করা।

প্রথম প্রকারের বিধান

প্রথম প্রকার সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ـ (بقرة ٢٢)

অর্থাৎ আর তারা তোমার কাছে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগণ থেকে বিরত থাক, তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবেনা, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়।

(২) وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

তোমরা হায়েযা মহিলাদের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়।

(৩) عن انس (رضى) قال قال النبىُّ صلى اللّٰهُ عليه وسلم اِصْنَعُوْا كُلَّ شَئٍ اِلَّا النِّكَاحَ ـ

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে (হায়েযা অবস্থায়) সহবাস ব্যতীত সব কিছু কর। ইমাম নববী (স) বলেন, হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন হারাম। এটাকে যে হালাল মনে করবে, সে কাফির, তবে হানাফীরা কুফরীর দিকে নিসবত করেন না।

দ্বিতীয় সুরতের বিধান

দ্বতীয় প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে হালাল এই মেলা-মেশা চাই পুরুষাঙ্গ দ্বারা হোক কিংবা চুমুর দ্বারা হোক অথবা, স্পর্শ-আলিঙ্গনের দ্বারা হোক এবং চাই কাপড়ের উপর দিয়ে হোক কিংবা কাপড় ছাড়া হোক সর্বাবস্থায় জায়েয আছে। সঙ্গম ছাড়া কাপড়ের উপর দিয়ে উপভোগ জায়েয।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ قالتْ كانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ نِسَائَهُ فَوْقَ الْاِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ (مسلم)

হযরত মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) হায়েযা অবস্থায় তার স্ত্রীদের সাথে কাপড়ের উপর দিয়ে উপভোগ করতেন। কাপড়ের উপর দিয়ে উপভোগ করতে গেলে চরম মুহূর্তে সহবাসের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকা আছে বিধায় তা থেকে দূরে থাকাই উত্তম। যেমন–

عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قال يا رَسولَ اللّٰه صلى الله عليه وسلم مَا يَحِلُّ لِىْ مِنِ امْرَأَتِىْ وهى حَائِضَةٌ قال مافَوْقَ الْاِزَارِ والتَّعَفُّفُ عَنْ ذٰلكَ اَفْضَلُ ـ

এর দ্বারা বুঝা যায় কাপড়ের উপর দিয়ে উপভোগ করা বৈধ। কিন্তু যেহেতু এর দ্বারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই এ থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

তৃতীয় অবস্থার বিধান

তৃতীয় প্রকারটি হালাল কি-না এ নিয়ে ইমামদের মতানৈক্য রয়েছে।

(১) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক, আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী ও মুজাহিদ এর মতে কোন প্রকার কাপড় ছাড়াই নাভির নিচ থেকে নিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত যৌনাঙ্গ ও গুহ্যদ্বার ব্যতীত ফায়দা নেয়া জায়েয আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রা) থেকেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত আছে।

(২) ইমাম আবু হানীফা (রা) মালিক, শাফেয়ী, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আউস, আতা ও কাতাদা (রা) প্রমুখের মতে, কোন প্রকার কাপড়ের অন্তরাল ছাড়া নাভির নিচ থেকে নিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত কোন স্থান থেকেই কোন প্রকার ফায়দা নেয়া জায়েয নেই। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর একটি অভিমতও অনুরূপ।

ইমাম আহমদ (র) এর দলীল- ১ঃ

عَن انسِ بْنِ مالِكٍ قال اِنَّ الْيَهُوْدَ كَانَتْ اِذا حَاضَتْ مِنْهُمُ المرأةُ اَخْرَجُوْها مِنَ الْبَيْتِ .....فَقَالَ رَسُولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم جَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شيئٍ غَيْرَ النِّكَاحِ ....الخ ـ

অর্থাৎ ..... আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহুদীদের অবস্থা এই যে, তারা হায়েযা মহিলাদেরও হায়েযের সময় ঘর থেকে বের করে দেয়। নবী করীম (স) বলেন, ঋতুমতি স্ত্রীদের সাথে ঋতুকালীন

সময়ে একত্রে এক ঘরে বসবাস কর এবং সঙ্গম ছাড়া সব কিছু করতে পার। (আবু দাউদ ঃ ১/৩৪, মুসলিম ঃ ১/১৪৩, নাসায়ী ঃ ১/৫৫, ইবনে মাজাহ ঃ ৪৮) উক্ত হাদীসে অন্যভাবে বলা হয়েছে যে, শুধু সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই জায়েয। সুতরাং কাপড় দ্বারা অন্তরাল থাকতে হবে এমন কোন শর্তারোপ করা হয়নি। অতএব, কাপড় না থাকা অবস্থায়ও রান থেকে ফায়দা নেয়া জায়েয হবে।

দলীল- ২ ঃ উমারা ইবনে গুরাব এর ফুফু হযরত আয়েশা (রা) এর নিকট হায়েয অবস্থায় স্বামীর সাথে সহবাসের সঠিক পদ্ধতি কি তা জানতে চাইলে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—

......دَخَلَ لَيلاً وانا حائضٌ فَمَضى الى مَسْجِدِه تَعْنِي مسجِدَ بَيْتِه فلَمْ يَنْصَرِفْ حتّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي واوْجَعَه البَرْدُ فقال اُدْنِي مِنّي فقلتُ اِنّي حائضٌ فقال واَنِ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ فكَشَفْتُ فَخِذِيْ ووَضَعَ خَدَّهُ وصَدْرَه عَلَى فَخِذِيْ وحَنَيْتُ عليه حَتّى دَفِئَ ونَامَ.

অর্থাৎ একদা রাতে নবী করীম (রা) আমার ঘরে প্রবেশ করেন, তখন আমি ঋতুমতি ছিলাম। তিনি মসজিদে নববীতে যান। অতঃপর আমি ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তিনি শীতে কাতর অবস্থায় ফিরে আসেন। তিনি আমাকে বলেন, আমার নিকটে এসো (আমার শরীরের সাথে মিশে যাও)। আমি বললাম আমি তো ঋতুমতি। নবী (স) বলেন, তুমি তোমার উরুদেশ উন্মুক্ত কর। তখন আমার উরুদেশ উন্মুক্ত করি। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও বক্ষস্থল (গরম হওয়ার জন্য) আমার উরুদেশে স্থাপন করেন এবং আমিও তার প্রতি ঝুকে পড়ি। অতঃপর তিনি শীতের তীব্রতা হতে মুক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। (আবু দাউদ ঃ ১/৩)

উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, নবী করীম (স) নাভিও হাঁটুর মাঝখানে কাপড়ের অন্তরাল ছাড়াই উন্মুক্ত অবস্থায় ফায়দা নিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তা জায়েয আছে।

দলীল-৩ ঃ পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে যে হুকুম এসেছে। তাতেও শুধুমাত্র উপভোগ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জুমহুরের দলীল- ১ ঃ

عن حَرامِ بْنِ حكيمٍ عَنْ عَمِّه انّه سألَ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم مَا يَحِلُّ لِيْ مِنْ اِمْرأتِي وهى حائضٌ قال لكَ مافَوْقَ الإزارِ و ذكرَ مُواكَلَةَ الحَائِضِ ايضًا.

অর্থাৎ হারাম ইবনে হাকীম থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত, তিনি (চাচা) রাসূলুল্লাহ (স) কে জিজ্ঞাসা করেন, আমার স্ত্রী যখন ঋতুমতি হয় তখন সে আমার জন্য কতটুকু হালাল? তিনি বলেন, তুমি কাপড়ের উপর দিয়ে যা কিছু করতে পার এবং ঋতুমতি স্ত্রীলোকের সাথে খানা-পিনার বৈধতা সম্পর্কেও আলোচনা করলেন।

দলীল ঃ ২

....عن مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قال سألتُ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم عمّا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مِنْ اِمْرأتِه وهي حائِضٌ فقال مَافوْقَ الإزارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذلك اَفْضَلُ.

অর্থাৎ মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে জিজ্ঞাসা করি যে, ঋতুমতি অবস্থায় স্ত্রীলোক পুরুষের জন্য কতটুকু হালাল? তিনি বলেন, কাপড়ের উপর যতটুকু সম্ভব, তবে এটা থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম। (আবুদাউদ ঃ ১/২৮)

দলীল ঃ ৩

....عَنْ عائشة قالتْ كانَ رَسُوْلُ اللّه صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ احدَانا اذا كانتْ حائضًا اَنْ تَتَّزِرَ ثمّ يُضاجِعُها زَوْجُها وقالتْ مَرّةً يُباشِرُها.

অর্থাৎ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাদের কেউ ঋতুমতি হলে তাকে পাজামা

পরিধানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে একত্রে শয়ন করতেন, অন্য এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তিনি কখনো কখনো তার সাথে রাতযাপন করতেন। (আবুদাউদ ১/৩৫, বুখারী ১/৪৪, মুসলিম ঃ ১/১৪১, তিরমিযী ঃ ১/৩২, নাসায়ী ঃ ১/৫৪)

এ সকল হাদীসসহ আরো এমন অনেক হাদীস রয়েছে যাতে তিনি পাজামা পরার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি পাজামার নিচ দিয়ে ফায়দা উঠানো জায়েয হতো, তাহলে কাপড় বাঁধার নির্দেশ দিতেন না। এতে বুঝা যায় যে, পাজামার নিচ দিয়ে ফায়দা উঠানো জায়েয নয়।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের দলীলের একটি সার্বিক জবাব প্রতিপক্ষের দলীলসমূহ হালাল বা জায়েয সংক্রান্ত, আর আমাদের দলীলসমূহ হারাম সংক্রান্ত। আর ফিক্‌হের একটি মূলনীতি হল, যখন একই বিষয়ে হালাল ও হারাম নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন হারাম সংক্রান্ত দলীল সমূহ প্রাধান্য পাবে।

প্রথম দলীলের জবাব ঃ হযরত আনাস (রা) এর হাদীসে যে نكاح শব্দটি বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা শুধু সহবাস উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা সহবাস ও সহবাসের দিকে আকৃষ্টকারী বিষয় ও (دواعى وطى) উদ্দেশ্য। প্রকৃত যে জিনিস হারাম তার আনুষঙ্গিক বিষয়ও হারাম।

(২) নবী করীম (স) নিকাহ্ বলে ইঙ্গিতে পাজামার নিচের কার্যাদিকে বুঝিয়েছেন।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব ঃ (১) উক্ত হাদীসে আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ নামক একজন রাবী রয়েছেন, যাকে ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, ইমাম আহমদ, আবু যুরআ ও ইমাম তিরমিযী সহ অনেকেই দয়ীফ বলেছেন। সুতরাং তার বর্ণিত হাদীস দলীলযোগ্য হতে পারে না। (বজলুল মাজহুদ ঃ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৬১)

(২) অথবা, এটি ছিল নবী করীম (স) এর জন্য খাস যা অন্যের জন্য জায়েয নয়। কারণ নবী করীম (স) এর স্বীয় নফস পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে ছিল যা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। হযরত আয়েশা (রা) নিজেই বলেন,

....وَاَيُّكُمْ يَمْلِكُ اِرْبَهُ كَمَا كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ اِرْبَهُ .

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কামোম্মাদনা নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা আছে কি? যেরূপ রাসূল (স) এর ছিল। (আবু দাউদ ১/৩৬, মুসলিম ঃ ১/১৪১)

তৃতীয় দলীলের জবাব ঃ উক্ত আয়াতে فاعتزلوا বলে সঙ্গম নিষেধ করা হয়েছে, আর وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ (তাদের নিকটবর্তী হয়ো না) বলে পাজামার নিচে যে সহবাসের কামোদ্দীপক উপকরণ রয়েছে; তা থেকে পরহেয করতে বলা হয়েছে। (তানযীমুল আশতাত ঃ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২১২-২১৩)

হায়েয অবস্থায় সঙ্গম করলে তার কাফফারা

ঋতু অবস্থায় সহবাসে লিপ্ত হওয়া হারাম। পবিত্র কুরআনে এমন মহিলার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তাই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে যদি কেউ সঙ্গম করে তাহলে সাঈদ ইবনে যুবাইর, হাসান বসরী, আওযায়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক (রা) এর মতে এর কাফফারা স্বরূপ এক দিনার বা অর্ধ দিনার সদকা করা ওয়াজিব নয় বরং এ কবীরা গুণাহের জন্য আল্লাহর কাছে খাঁটি মনে তওবা ও ইস্তেগফার করতে হবে। (হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ঃ ১০৬)

হাদীস সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা

অধ্যায়ের হাদীস হতে বুঝা যায় যে, হায়েযা মহিলার সাথে সহবাস বৈধ যখন হাঁটু ও নাভির মধ্যে কাপড় বাঁধা হবে। হযরত মায়মুনা (রা) এর হাদীসে এসম্পর্কে স্পষ্ট আলোচনা এসেছে। তিনি বলেন, নবী (স) তার পুত-পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য হতে হায়েযা স্ত্রীর সাথেও মিলামিশা করতেন। যখন তার বিশেষ অঙ্গের উপরে কাপড় বাধা থাকতো।

এখানে খাস অংশ দ্বারা নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে শিহাব থেকে রেওয়ায়াত কারী রাবী লাইসের হাদীসে مُحْتَجِزَةً بِهِ অতিরিক্ত আছে অর্থ এমতাবস্থায় যে হায়েযা স্ত্রী তার কাপড়কে নাভি থেকে শুরু করে হাঁটু পর্যন্ত মজবুত করে বেঁধে নিতেন। এরপর নবী (স) তার সাথে শরীর মিলিত করে শয়ন করতেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, مباشرة দ্বারা এখানে সহবাস উদ্দেশ্য নয়। কেননা, হায়েযা মহিলার সাথে সহবাস করা যে হারাম এ ব্যাপারে সমস্ত উম্মতের ইজমা রয়েছে এবং হাদীস ও কুরআনের বাণী তাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। এখানে مباشرة বা মিলামিশা দ্বারা সহবাস ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা উপকৃত হওয়া উদ্দেশ্য। যেমন– শরীরে শরীর মিলায়ে এক কাপড়ের নিচে শোয়া, চুমু খাওয়া, কোলাকুলি করা ইত্যাদি। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩৩৭)

আল্লামা শা'রানীর অভিমত

আল্লামা শা'রানী লেখেন আল্লাহ তাআলার বাণী وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ দ্বারা বাহ্যিক ভাবে জুমহুরের মতটি সমর্থিত হয়। আর قربان শব্দের ব্যবহার নাভি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী অংশে ব্যবহৃত হয়। আর যে ব্যক্তি চরণ ভূমির নিকটবর্তী হবে। আশংকা আছে সে উক্ত ভূমিতে চলে যাবে। আর শরীয়ত مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ থেকে উপকৃত হওয়াকে নিষিদ্ধ করেছে। এখন যদি কেউ এ পথে পা রাখে তাহলে সম্ভাবনা আছে হারাম সহবাসে পতিত হওয়ার। কাজেই এ থেকে বিরত থাকাটাই শ্রেয়।

কুরআনের বাণী فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ এর ব্যাখ্যা

জুমহুর উলামা ...... فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, অর্থাৎ তোমার হায়েযের দিনগুলোতে স্বীয় স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাক। এই পৃথক থাকাটা হায়েযের দিনগুলোর সকল স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই محل دم তথা সহবাস থেকে পৃথক থাকো অনুরূপ ভাবে مَا تَحْتَ الْإِزَارِ তথা নাভির নিচ থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী স্থান হতে উপকৃত হওয়া থেকেও বিরত থাক। কিন্তু مَحَلِّ دم তথা সহবাস থেকে বিরত থাকার হুকুমটি বেশী শক্তিশালী। আয়াতে দৃষ্টিপাত করলে বুঝে আসবে যে, اعتزال শুধুমাত্র সহবাস কে অন্তর্ভুক্ত করে না বরং তার আশে পাশের স্থানগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই যৌনাঙ্গ ও ماتحتَ الازار কোন অংশ হতে উপকার লাভ করা বৈধ হবে না।

কতিপয় আলিমের দলীল ও يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ এর প্রেক্ষাপট

ইয়াহুদীরা হায়েযা মহিলার সাথেখানা-পিনা উঠা-বসা মিলা-মিশা কিছুই করতো না। তাই সাহাবায়ে কিরাম নবী (স) এর নিকট এ অবস্থায় করণীয় কি সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

দলীল ঃ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ তারা আপনার নিকট হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আপনি বলে দিন نكاح ব্যতীত সব কিছু কর। আর অভিধানে نكاح শব্দটি সহবাসের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান ও অন্যান্যগণ اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, এর দ্বারা বুঝা যায় যৌনাঙ্গ ব্যতীত শরীরের অন্যসকল অঙ্গ হতে উপকার লাভ করা বৈধ আছে।

উত্তর ঃ উক্ত প্রমাণের জবাবে জুমহুর বলেন, আপনারা যে اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য নেন তা ঠিক নয়, কেননা এটা ফে'লী হাদীস, আর কাওলী হাদীস হলো لَكَ مَافَوْقَ الْإِزَارِ এটাকে পূর্বের হুকুম থেকে খাস করা হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেলো مَاتَحْتَ الْإِزَارِ ব্যতীত শরীরে অন্যান অঙ্গ থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ। অথবা, اِصْنَعُوا এরপরে যে لا النكاح এসেছে এর দ্বারা مَاتَحْتَ الْإِزَارِ এর দিকে কিনারা করা হয়েছে। যদিও نكاح শব্দটি সহবাস এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এখন অর্থ হবে- তোমরা তোমাদের স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ব্যতীত সব করতে পার। অর্থাৎ مَاتَحْتَ الْإِزَارِ হতে উপকৃত হওয়া থেকে বিরত থাক। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩৩৮–৩৩৯)

بَابُ تَاوِيْلِ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ

٢٨٩. اخبرنا اسحٰقُ بْنُ ابراهيمَ قال حَدَّثنا سليمانُ بْنُ حربٍ قال حَدَّثنا حمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثابتٍ عَنْ انسٍ قال كانتِ اليهودُ اذا حاضتِ المرأةُ مِنهُم لم يُؤاكِلُوهنَّ ولم يُشارِبُوهنَّ ولمْ يُجامِعُوهنَّ فِى البُيُوتِ فَسَالُوا نبىَّ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذلك فانزلَ عزَّ وجلَّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اذًى الاية فأمَرَهُم رسولُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُؤاكِلُوهنَّ ويُشارِبُوهنَّ ويُجامِعُوهنَّ فِى البُيوتِ وانْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شيئٍ مَاخَلاَ الجِمَاعِ فقالتِ اليَهُودُ مايَدَعُ رسولُ اللّٰه ﷺ شيئًا مِنْ اَمْرِنا اِلاَّ خَالَفَنَا فقامَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فاَخْبَرا رسولَ اللّٰه ﷺ وقَالا اَنُجامِعُهنَّ فِى الحَيْضِ فتَمَعَّرَ وجهُ رسولِ اللّٰهِ ﷺ تَمَعُّرًا شديدًا حتّى ظَنَنَّا اَنَّهُ قدغَضِبَ عَلَيْهِما فقَامَا فاسْتَقْبَلَ رسولُ اللّٰه ﷺ هديةَ لَبَنٍ فبَعَثَ فِى اٰثارِهِما فرَدَّهُما فسَقاهُما فعَرَفَا انّه لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِما -

---

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী, وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ-এর ব্যাখ্যা

অনুবাদ ঃ ২৮৯. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীদের স্ত্রীরা যখন ঋতুমতি হত তখন তারা তাদের সাথে একত্রে পানাহার করত না এবং তারা ঘরে তাদের সাথে একত্রে অবস্থানও করত না। অতএব সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى আয়াতটি নাযিল করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) তাদের আদেশ করলেন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের সাথে পানাহার ও ঘরে একত্রে অবস্থান করে এবং তাদের সাথে সঙ্গম ব্যতীত আর সব কিছু করা বৈধ মনে করে। এতে ইয়াহুদীরা বলল, আমাদের রীতিনীতির কোনটিরই রাসূলুল্লাহ (স) বিরোধিতা না করে ছাড়বেন না। উসায়দ ইবনে হুযায়র ও আব্বাস ইবনে বিশ্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করে একথাটি জানালেন এবং প্রশ্ন করলেন, আমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করব কি? এতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা বেশ রক্তিম হয়ে গেল, তখন আমরা ধরে নিলাম যে, তিনি রাগান্বিত হয়েছেন এবং উভয়েই সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (স) কিছু হাদিয়ার দুধ গ্রহণ করলেন। তখন তিনি সাহাবীদ্বয়ের অনুসন্ধানে লোক পাঠালেন। তাদের ডেকে আনা হলো এবং উভয়কে তিনি দুধ পান করালেন, এর দরুণ বুঝা গেল যে, তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) রাগ করেননি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

ইয়াহুদ একটি সম্প্রদায়ের নাম, তাদের পিতামহের নাম হলো ইয়াহুদা। তিনি ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ) এর ভাই তার দিক সম্বন্ধ করে তাদেরকে ইয়াহুদী বলা হয়। ইয়াহুদীদের আচার ব্যবহার হায়েযা মহিলাদের সাথে ভালো ছিল না। যেমন হযরত আনাস (রা) বলেন, তারা তাদের হায়েযা স্ত্রীদের সাথে খানা-পিনা করত না, একসাথে উঠা বসা করত না। একত্রে এক ঘরে থাকতো না বরং হায়েযা মহিলাকে ঘর হতে বের করে দিতো। ইসলাম এটাকে

অপছন্দ করে এবং এর সমর্থন করে না। কাজেই ইসলাম হায়েযা মহিলার সাথে উত্তম আচরণ ও যুগ-উপযোগী একটি পন্থার দিকে দিকনির্দেশনা দান করেছে।

সুতরাং যখন সাহাবায়ে কিরাম হায়েযা মহিলার সাথে কি ধরনের ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন হুযুর (স) এর উপর يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ আয়াত অবতীর্ণ হয়। হুজুর (স) বলেন, তোমরা হায়েযা মহিলার সাথে কথা বলো, খানা খাও, একত্রে শয়ন কর। মোটকথা, সহবাস ব্যতীত সকল ধরনের কাজ তার সাথে করতে পার। এগুলো করা বৈধ। রাসূলের বাণী- فَأَمَرَهُم رسولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ يُؤَا كِلُوْهُنَّ ...الخ হলো আয়াতের তাফসীর এবং فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ এর বয়ান। কেননা, اعتزال শব্দ দ্বারা মুতলাক পৃথক থাকা উদ্দেশ্য না, বরং তার দ্বারা مجا بة مخصوصة উদ্দেশ্য অর্থাৎ যৌনাঙ্গ ও তারা আশ-পাশ থেকে দূরে থাকবে এবং তার থেকে ফায়দাও উঠাবে না। বাকী তার সাথে খানা-পিনা, উঠা-বসা এবং শোয়া সব কিছুর অনুমতি আছে।

এ হাদীস দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান এবং ইমাম আহমদ নিজের মাযহাবের উপর প্রমাণ পেশ করেন। তার নিকট সহবাস ব্যতীত হায়েযা মহিলার সাথে অন্য সকল কাজ করা বৈধ। কেননা, নাসায়ীর রেওয়ায়াতে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। وَاَنْ يَصْنَعُوْا بِهِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَاخَلَا الْجِمَاعِ ইমাম মুসলিম (রা) তার সহীহ মুসলিম গ্রন্থে রেওয়ায়াত করেছেন। اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ আর نكاح এর আভিধানিক অর্থ হলো সহবাস কাজেই كل شئ এর ব্যাপকতার প্রমাণ পেশ করেন যে, সহবাস ব্যতীত অন্য সকল কাজ করা বৈধ। তাদের প্রমাণ পেশের জবাব পেছনের অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে। ঐ জবাব ব্যতীত ব্যাখ্যাকারগণ ভিন্ন আরেকটি জবাব প্রদান করেছেন। তা হলো মুসলিম ও নাসায়ীর হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। কেননা, আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ রেওয়ায়াত করেন- আমি নবী (স) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম হায়েয অবস্থায় আমার স্ত্রীর কতটুকু অংশ আমার জন্য বৈধ। হুজুর (স) জবাব দিয়েছেন مافَوْقَ الْإِزَارِ অর্থাৎ পাজামার উপরাংশ হতে উপকৃত হওয়া তোমার জন্য বৈধ। একথা বর্ণনা করার পর আবু দাউদ নিরবতা অবলম্বন করেছেন। কাজেই এ হাদীস হুজ্জত হবে। কেউ কেউ উক্ত হাদীসকে হাসান বলেছেন। কাজেই এটা মুসলিমের হাদীসের বিপরীত হয়ে গেল। যা ইমাম মুহাম্মদ ও অন্যদের নিকট হুজ্জত। এর উপর ভিত্তি করে তারা مافَوْقَ الْإِزَارِ থেকে ফায়দা উঠানোকে বৈধ বলেন। যা হোক যদি হাদীসদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ধরা হয় তাহলে আবু দাউদের হাদীসই প্রাধান্য পাবে। কেননা, এটা منع এর বিধান আরোপ করে। আর মুসলিমের হাদীস اباحت সাব্যস্ত করে। আর মতানৈক্যের ক্ষেত্রে منع তথা নিষেধের হাদীসই প্রাধান্য পায়। কাজেই এক্ষেত্রেও এটা প্রাধান্য পাবে।

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ اَتَى حَلِيْلَتَهُ فِى حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ عَنْ وَطْئِهَا

٢٩٠. اخبرنا عمرو بْنُ عليّ قال حدّثنا يحيى عَنْ شُعْبَةَ عن الحكم عَنْ عبد الحميد عَنْ مقسم عَنِ ابْنِ عبّاس عن النبيّ ﷺ فِى الرَّجُل يَاتِى اِمْرَاَتَهُ وهى حائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ -

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা জানা সত্ত্বেও সঙ্গম করে তার উপর কি ওয়াজিব হবে?

অনুবাদ ঃ ২৯০. আমর ইবনে আলী (র).........ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) হতে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম সে এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার সদকা করবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীর সাথে হায়েয অবস্থায় সহবাস করা হারাম জানে তা সত্ত্বেও ঘটনাক্রমে যদি সহবাস করে ফেলে তাহলে তার হুকুম কি হবে?

এক্ষেত্রে মুসান্নিফ (রা) যে শিরোনাম কায়েম করেছেন এবং তার অধীনে যে হাদীস এনেছেন এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ ব্যক্তির উপরে কাফফারা ওয়াজিব হবে। তথা তার এক দিনার অথবা অর্ধ দিনার সদকা করতে হবে। এটাই ইমাম আহমদ, ইসহাক। আওযায়ী এর ভাষ্য ও ইমাম শাফেয়ী (রা) এর প্রথম দিকের বক্তব্যও এমন। তারা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। কেননা, এই হাদীসে এসেছে যে, যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে সে এক দিনার অথবা অর্ধ দিনার সদকা করবে। او অব্যয়টি সন্দেহের জন্য নয় বরং তাকসীম এর জন্য। তথা কেউ যদি হায়েযের শুরুতে সহবাস করে তাহলে এক দিনার এবং কেউ যদি হায়েযের শেষে সহবাস করে তাহলে অর্ধ দিনার সদকা করবে, অথবা, সামর্থ থাকা অবস্থায় এক দিনার প্রদান করবে এবং সামর্থ না থাকলে অর্ধ দিনার প্রদান করবে।

হিলাল আবু দাউদ থেকে নকল করেন যে, ইমাম আহমদ এই হাদীস সম্পর্কে বলেন, مَا احسنَ حديثِ عبدِ الحميدِ هٰذا الحديثَ اَتَذْهَبُ اِلَيْهِ قال نَعَمْ انّما هُوَ كَفَّارَةٌ অর্থাৎ তাকে জিজ্ঞেস করা হলো– তিনি বলেন, নিশ্চয় হায়েযা স্ত্রীর সাথে সহবাসের কারণে তার উপর কাফফারা স্বরূপ দীনার আবশ্যক হবে। অন্যান্য ইমামগণ বলেন, যদি কেউ ঘটনাক্রমে হায়েযা মহিলার সাথে সহবাস করে অথচ তার জানা থাকে যে হায়েযা অবস্থায় সহবাস করা হারাম তাহলে সে কবীরা গোনাহ করলো, তার উপর তওবা করা আবশ্যক এবং তওবা ও এস্তেগফারের দ্বারা গোনাহ ক্ষমা হওয়ার আশা করা যায়। এটাই ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী (রা) এর পরবর্তী কওল এক রেওয়ায়াত অনুপাতে ইমাম আহমদ (র.) এর কওল ও এটা।

আল্লামা খাত্তাবী (রা) লেখেন এটাই অধিকাংশ উলামার বক্তব্য। তাই তাদের উপর কাফফার ওয়াজিব নয়। অবশ্য তওবা ও এস্তেগফার আবশ্যক, আর অনুচ্ছেদের যে হাদীসে কাফফারার কথা উল্লেখ আছে। এ ব্যাপারে মুনযিরী বলেন, এ হাদীসটা কি مرفوع না موقوف না مرسل না منقطع না معضل ? এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান।

যদি দুই রাবী পরপর একত্রে হযফ হয়ে যায় তাহলে তাকে معضل বলে, অনুরূপ ভাবে সনদ ও মতনের মধ্যে ও اضطراب রয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ বায়হাকীতে আছে।

মতনের اضطراب নিম্নরূপ এখানে সন্দেহ মূলকভাবে এক দিনার ও অর্ধ দিনারের কথা এসেছে। কোথাও এসেছে يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ فَانْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ এবং কোথাও بِنِصْفِ دينار কোন কোন রেওয়ায়াতে يَتَصَدَّقُ بِخُمُسِ دِيْنَارٍ এসেছে। কাজেই আহকামের ক্ষেত্রে এধরণের হাদীস হুজ্জত হতে পারে না। এর উপর ভিত্তি করে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করা সহীহ না। তাই জুমহুরের মাযহাব অনুপাতে কাফফারা ওয়াজিব নয়। বরং তওবা ও এস্তেগফার করবে, অবশ্য কেউ যদি মুস্তাহাব হিসেবে এক অথবা অর্ধ দীনার সদকা করে তাহলে তার জায়েয আছে। জুমহুর উলামায়ে কিরাম একথারই প্রবক্তা। কাজেই জুমহুরের উপরে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, তারা অনুচ্ছেদের হাদীসের উপর আমল ত্যাগ করেছেন। অবশ্য এটা বাস্তব যে, তারা ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্ত নন। কেননা, এধরনের দূর্বল হাদীস দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হতে পারে না, কাজেই হাদীস সহীহ ও শক্তিশালী হওয়া জরুরী। আর মুস্তাহাবের দলীল হলো, এক দিনার ও অর্ধ দিনার প্রদানের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার প্রদান।

অথচ একই বস্তু কম-বেশী প্রদানের মধ্যে ইখতিয়ার হতে পারে না। মোটকথা, মুস্তাহাব হিসাবে সদকা দিতে চাই তাহলে দিতে পারে। কেননা, সদকা আল্লাহ তায়ালার রাগকে ঠাণ্ডা করে দেয়। আর সদকা মালকে পবিত্র করে। কুরআনে এসেছে وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ...الخ এরপর দুটি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। শুধুমাত্র তওবার উপর ক্ষান্ত করা হয়নি, বরং اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ বলেছেন, যে ব্যক্তি অসতর্কতামূলক হায়েয অবস্থায় তার বিবির সাথে সহবাস করে তার তওবা করা উচিত। مُتَطَهِّرِيْنَ দ্বারা হয়তবা এটা উদ্দেশ্য যে, যে ব্যক্তি তওবার পূর্বে ও পবিত্র ছিল তাকে আল্লাহ মাহবুব রাখেন।

আল্লামা শাকীর আহমদ উসমানী (রা) এ ব্যাপারে বলেন, মানুষের রুচি এর বিপরীত বলে। কেননা, তাহলে تَوَّابِيْن কে শেষে রাখা উচিত ছিল। কেননা, এক্ষেত্রে مُتَطَهِّرِيْنَ দ্বারা مُتَنَزِّهِيْنَ উদ্দেশ্য, তো যে مُتَنَزِّهِيْنَ এর অন্তর্গত হবে সে অবশ্যই تَوَّابِيْن এর দরজা থেকে উর্ধ্বে হবে। সুতরাং প্রথমে তার আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। আমার ধারণা متطهرين দ্বারা مُتَصَدِّقِيْنَ উদ্দেশ্য। কেননা কুরআন পাকে আছে সদকা পবিত্রকারী। মোটকথা, এ খারাপ কর্মসম্পাদনকারী তওবা করবে এবং সদকাও দিবে। এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, উপরে যে দুই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে– এক দিনার বা অর্ধ দিনার সদকা করা। এখন কথা হলো এ পরিমাণ নির্ধারণের রহস্য কি? এক্ষেত্রে স্পষ্ট কথা এই যে, এটা শুধুমাত্র اَمرِ تَعَبُّدِيْ। স্বরূপ। এক্ষেত্রে আমলের কোন দখল নেই। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ৩৪১-৩৪২)

بَابُ مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

٢٩١. اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَانَرٰى اِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كَانَ بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ مَالَكِ اَنَفِسْتِ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِىْ مَا يَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لَّا تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ وَضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম মহিলা ঋতুমতি হলে কি করবে?

অনুবাদ ঃ ২৯১. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে হজ্জের নিয়তে বের হলাম। যখন আমরা সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার হায়েয আসল, যখন রাসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট আসলেন তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে? তোমার কি হায়েয হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ এমন একটি ব্যাপার যা আল্লাহ তাআলা আদম কন্যাদের জন্য অবধারিত করেছেন। অতএব তুমি হজ্বের সকল আহ্‌কাম আদায় কর তবে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না। আর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সহধর্মিণীদের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী দিলেন।

সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন সেটা বিদায় হজের ঘটনা ছিল। তাঁর বক্তব্য অনুপাতে উক্ত সফরে সকল সাহাবায়ে কিরাম স্বয়ং তার ও আসল উদ্দেশ্য হজ্ব করা ছিল যেমন তিনি বলেছেন– لَانَرٰى اِلَّا الْحَجَّ অন্যথায় সাহাবা কিরামের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা প্রথমে ওমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। স্বয়ং আয়েশা (রা)ও শুরুতে ওমরার ইহরাম বাঁধেন। মোটকথা, যখন তিনি সরফ নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তাঁর হায়েয শুরু হয়। সরফ একটি স্থানের নাম যা মক্কার নিকটে অবস্থিত। সরফ ও মক্কার মধ্যে দুরত্ব হলো ১০ মাইল। যখন হুজুর (স) আয়েশার নিকট গমন করেন তখন তিনি কাঁদছিলেন। কেননা, হায়েযের কারণে উমরা পালন করা তার জন্য দুষ্কর ভাবছিলেন। হুজুর (স) বললেন, তোমার হায়েয কি শুরু হয়েছে। তিনি জবাব দিলেন জ্বি হ্যাঁ, তখন হুজুর (স) হযরত আয়েশা (রা) কে সান্ত্বনা প্রদান করতঃ বলেন, هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ হায়েয এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের মেয়েদের উপর অবধারিত করে দিয়েছেন।

হাকেম ও ইবনুলু মুনযির সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এটা বর্ণনা করেছেন যে, হায়েযের অবতারণা তখন থেকেই শুরু হয়েছে যখন হাওয়া (আঃ) কে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। মোটকথা, হুজুর (স) হযরত আয়েশা (রা) কে সান্ত্বনা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, হায়েয একটি সুনির্ধারিত বিষয় যা তার নির্ধারিত সময়ে আসে। এতে তোমার কোন দোষ নেই। কাজেই কান্নাকাটি করা ও পেরেশান হওয়ার কি প্রয়োজন? তুমি যে উদ্দেশ্যে সফর করেছ তা নষ্ট হবে না এবং তোমার ও অন্যান্য হাজিদের হজ্ব পালনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে হ্যাঁ, তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না। এক রেওয়ায়াতে حَتّٰى تَطْهُرِىْ এসেছে অর্থাৎ হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারত থেকে বিরত থাকবে। এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা হতেও বিরত থাকবে। কেননা, غَيْرَ اَنْ لَّا تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওয়াফ করা এবং ঐ জিনিস যা তাওয়াফের সাথে সংশ্লিষ্ট আর তা হলো সায়ী। কাজেই তওয়াফকে সায়ীর উপর মুকাদ্দাম করা জায়েয নেই। আর যেহেতু সায়ী তওয়াফের সংশ্লিষ্ট বিষয় এজন্য তার কথা উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং তাওয়াফে যিয়ারত ও সায়ীর কাজ পালন করা হতে বিরত থাকবে।

[বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

بَابُ مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

٢٩٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى اِذَا اَتٰى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اِغْتَسِلِىْ وَاسْتَثْفِرِىْ ثُمَّ اَهِلِّىْ -

অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামের সময় নিফাসগ্রস্তদের গোসল করা প্রসঙ্গে

অনুবাদ ঃ ২৯২. আমর ইবনে আলী (র).......জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা বলেছেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গমন করে তাঁকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিদায় হজ্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) যুলক্বা'দা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হলেন। আমরাও তাঁর সাথে বের হলাম, যখন তিনি যুল হুলায়ফা পৌঁছলেন, তখন আস্‌মা বিনতে উমায়স (রা) মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে প্রসব করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন য, আমি এখন কি করব? তিনি বললেন, তুমি গোসল কর তারপর পট্টি পরে নাও এবং ইহ্‌রাম বাঁধ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

যদি কোন মহিলা ইহরাম অবস্থায় বাচ্চা প্রসব করে তাহলে কি সে ইহরাম বাঁধবে না কি বাঁধবে না? আলোচ্য হাদীসে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নবী (স) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে যখন যুল হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন আসমা বিনতে উমাইস বাচ্চা প্রসব করেন। তার নাম রাখা হয় মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর।

মদীনাবাসীর মিকাত হলো যুল হুলায়ফা। তারা এখান থেকে ইহরাম বাঁধেন। ইহরাম ব্যতীত ঐস্থান অতিক্রম করা জায়েয নেই। এখানে একটি গাছ ছিল, এখন আর নেই। এখন সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। সেটা মদীনা হতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্ব যুগের হিসাব অনুযায়ী মক্কা পর্যন্ত দশ দিনের রাস্তা। এখানে পৌঁছলে হযরত আসমা (রা) বাচ্চা প্রসব করেন। ফলে তিনি নিফাসগ্রস্থ হয়ে যান। এখন তার করণীয় বিধান কি? সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য হযরত আবু বকর (রা) কে রাসূল (স) এর নিকট পাঠান। হুজুর (স) বলেন, اغتسلى। তুমি গোসল কর এবং নেংটি বেঁধ যাতে করে রক্তের প্রবাহতা থেমে যায় অতঃপর ইহরাম বাঁধ। আসমা বিনতে উমাইসকে যে গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এটা ওয়াজিব গোসল নয় যা নিফাস শেষে করতে হয় বরং এটা হলো ইহরামের গোসল যা সুন্নত। যেহেতু এ গোসল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও দূর্গন্ধ দূর করার জন্য; পবিত্রতা অর্জনের জন্য নয়। তাই হায়েয ও নিফাস উভয়ের একই হুকুম হবে যা উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়। এটাকে ফরয গোসল সাব্যস্ত করা সহীহ নয়। বরং এটা হলো ইহরামের জন্য। এ জন্যই আসমা বিনতে উমাইসকে নিফাস অবস্থায় গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এটাও বুঝা গেলো যে, ইহামের ওযর ইহরাম বাঁধার জন্য প্রতিবন্ধক নয়।

[পূর্বের বাকী অংশ]

পবিত্রতা অর্জন করার পূর্ব পর্যন্ত হজ্বের বাকী কাজগুলো অন্যান্য হাজীদের ন্যায় তুমিও পালন করবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ হজ্বের অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। আলোচ্য হাদীস হতে এ মাসআলা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যদি ইহরামের পর কোন মহিলার হায়েয আসে তাহলে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা ও সায়ী করা ব্যতীত অন্যান্য হাজীদের ন্যায় হজ্বের বাকী কার্যাবলী আদায় করবে, অতঃপর পবিত্র হওয়ার পর এই রোকনদ্বয় পালন করবে।

আকলী দলীল ঃ এ ক্ষেত্রে যৌক্তিক দলীল হলো তাওয়াফ মসজিদে করা হয়, আর হায়েযা মহিলা মসজিদে দাখিল হতে পারে না। কাজেই এদুটি কাজ পবিত্রতা অর্জন পর্যন্ত বিলম্ব করতে হবে এবং পবিত্রতা অর্জনের পর আদায় করতে হবে। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩৪৩-৩৪৪)

بابُ دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٢٩٣. اخبرَنا عُبَيْدُ اللّٰهِ بنُ سعيدٍ قال حدَّثنا يحيٰى بنُ سعيدٍ عَنْ سفيانَ قال حدَّثنِى ابُو المِقْدام ثابتٌ الحَدَّادِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينارٍ قالَ سَمِعْتُ امّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ اَنَّها سَالَتْ رَسُولَ اللّٰه ﷺ عَنْ دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوبَ قالَ حُكِّيهِ بِضلعٍ واغْسِلِيهِ بماءٍ وسِدْرٍ

٢٩٤. اَخْبَرنا يحيٰى بنُ حبيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ عَن حَمَّادِ بْنِ زيدٍ عَن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ عَن فاطِمَةَ بِنْتِ المُنذرِ عَن اسماءَ بنتِ ابى بكرٍ وكانَتْ تكونُ فِى حَجْرِها اَنّ امراةً اسْتَفْتَتِ النبىَّ ﷺ عَن دمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوبَ فقال حُتِّيهِ ثمّ اقْرُصِيهِ بالماءِ ثمّ انضِحِيهِ وصَلِّى فِيهِ -

অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযের রক্ত কাপড়ে লাগলে করণীয়

অনুবাদ ঃ ২৯৩. উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)........ আদী ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে কায়স বিনতে মিহসান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হায়েযের রক্ত কাপড়ে লাগার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি, তিনি বললেন, কাঠি দ্বারা তা ঘষে নেবে এবং কুলপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলবে।

২৯৪. ইয়াহয়া ইবনে হাবীব (র).......আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কাপড়ে লাগা হায়েযের রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তা ডলবে এবং পানি দ্বারা ধুয়ে নেবে। আর তাতেই নামায আদায় করবে।

সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীসে কাপড়ে রক্ত লাগলে সেক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কি সে সম্পর্কে হযরত উম্মে কায়স বিনতে মিহসান রাসূল (স) কে জিজ্ঞেস করেন। কেউ কেউ তার নাম আমেনা বলেছেন, রাসূল (স) তার দীর্ঘ হায়াতের জন্য দোয়া করেন, যার ফলে তিনি অনেক দীর্ঘ হায়াত লাভ করেন।

যখন তিনি হুযুর (স) কে মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন নবী (স) বলেন حُكِّيهِ بِضِلَعٍ ......الخ প্রথমে সেটাকে কাঠি দ্বারা খুঁচিয়ে উঠাবে, অতঃপর সেটাকে বরইপাতা ও পানি দ্বারা ধৌত করবে। এমন করলেই কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। পবিত্রতা অর্জনের এ পদ্ধতি দ্বারা জানা যায় যে, প্রথমে কাঠি দ্বারা খুঁচিয়ে উঠাতে হবে যাতে করে কাপড়ের সাথে লেগে থাকা রক্ত উঠে যায়। অতঃপর পানি ও বরইপাতা দ্বারা কাপড়টিতে ধৌত করতে হবে যাতে করে রক্তের চিহ্ন নিঃশেষ হয়ে যায়। বরইপাতা দ্বারা ধোয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে অতিরঞ্জন বুঝানোর জন্যে। যাতে করে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। আর এটা যে, বরইপাতাকে পানির সাথে মিশিয়ে জাল করে তার দ্বারা যদি রক্তযুক্ত কাপড়কে ধৌত করা হয় তাহলে তার দ্বারা ভালোরূপে পবিত্রতা অর্জন হয়, অন্যথায় শুধুমাত্র পানি পবিত্রতা অর্জনের জন্যে যথেষ্ট।

দ্বিতীয় মাসআলা ঃ পানি ব্যতীত অন্যান্য তরল বস্তু দ্বারা নাপাক দূর করা জায়েয আছে কি-না?

(১) আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন, উম্মে কায়স বিনতে মিহসান এর হাদীস এ মাসআলার ব্যাপারে প্রমাণ যে, নাপাক দূর করার জন্য পানি নির্দিষ্ট। কেননা, নবী (স) উম্মে কায়স বিনতে মিহসানকে পানি দ্বারা হায়েযের রক্ত ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর হায়েযের রক্তের নাপাক ও অন্যান্য নাপাকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং সর্বসম্মতিক্রমে সবগুলোই নাপাক। কাজেই আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন, নাপাক পানি দ্বারাই দূর করতে হবে, অন্য কিছু দ্বারা নয়। কারণ নাপাক দূর করা পানির সাথেই সীমাবদ্ধ।

(২) হানাফীগণ বলেন, নাপাক দূর করার জন্য পানি হওয়া জরুরী নয় বরং অন্যান্য তরল বস্তুদ্বারা ও নাপাক দূর করা যেতে পারে। তাই হাদীস দ্বারা একথা বুঝে আসে না যে, শুধুমাত্র পানি দ্বারাই নাপাক দূর করা যায়, অন্যান্য তরল

প্রবাহমান বস্তু দ্বারা নাপাক দূরা করা যায় না, বরং হাদীসে পানি দ্বারা হায়েযের রক্ত ধৌত করার যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, সাধারণত পানি দ্বারাই নাপাক দূর করা হয়ে থাকে। কাজেই হাদীসে পানির কথা উল্লেখ করার দ্বারা এটা অনিবার্য নয় যে, অন্যান্য তরল ও প্রবাহমান বস্তু দ্বারা নাপাক দূর করা যাবে না।

وَاغْسِلِيْهِ بِمَاءٍ দ্বারা এ বিষয়ের উপর প্রমাণ পেশ করা যে নাপাক দূর করার জন্য পানি হওয়া আবশ্যক, পানি ব্যতীত অন্যান্য তরল বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ নয়। তাদের একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কোন শাফেয়ী মাযহাব অবলম্বনকারী বলতে পারেন যে, পানির কথা উল্লেখ করে একটি আবশ্যক বিষয় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, যে পানি দ্বারাই নাপাক দূর করা চাই। আমরা বলবো পানির কথা উল্লেখকে যদি আবশ্যকতার উপর প্রয়োগ করা হয় তাহলে বরইপাতা দ্বারা ধৌত করাকেও আবশ্যক বলুন, কেননা হাদীসে بِمَاءٍ শব্দের পর بِسِدْرٍ শব্দ এসেছে, অথচ কেউ বরইপাতা দ্বারা ধৌত করার প্রবক্তা নন। কাজেই বুঝা গেলো হাদীসে وَاغْسِلِيْهِ এরপর مَاءٍ শব্দের উল্লেখ শুধুমাত্র পানি দ্বারাই ধৌত করতে হবে এজন্য নয় বরং এটা অধিকাংশের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে। তাই হানাফীগণ সমস্ত রেওয়ায়াতকে সামনে রেখে বলেন, পানি ব্যতীত অন্যান্য বস্তুও পবিত্রকারী এবং নাপাক দূরকারী তার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ। অবশ্য তরল প্রবাহমান বস্তুর মধ্যে দুটিগুণ বাকী থাকতে হবে।

(১) স্বত্বাগতভাবে বস্তুটি পাক হতে হবে।

(২) এবং নাপাক দূর করাও সম্ভব হতে হবে। যেমন– সিরকা গোলাপ পানি, ইত্যাদি।

কেননা, পানির অন্যান্য তরল বস্তুর মাঝেও বিদ্যমান। কারণেই ইমাম আবু হানীফা ইমাম আবু ইউসুফ (রা.) এর মতে পানি ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক এমন বস্তু দ্বারা নাপাককে দূর করা বৈধ, যা প্রবাহমান তবে শর্ত হলো তার মধ্যে উভয়গুণ বিদ্যমান থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীস ফাতিমা বিনতে মুনযির হযরত আসমা বিনতে আবু বকর হতে রেওয়ায়াত করেন। এই ফাতিমা মুনযির ইবনে যুবাইয়র ইবনে আওয়াম এর মেয়ে এবং আসমা বিনতে আবু বকর, হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম এর বিবি। তার লালন পালনে থাকা অবস্থায় তিনি আসমা বিনতে আবু বকর থেকে রেওয়ায়াত করেন যে, এক মহিলা ঐ মাসআলা জিজ্ঞেস করেন যা পূর্বের হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে। এই ফাতওয়া জিজ্ঞেসকারী কে ছিল তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। এ রেওয়ায়াতে তা অস্পষ্টভাবে এসেছে। কিন্তু কতক রেওয়ায়াত দ্বারা বোঝা যায় ঐ মহিলা ছিলেন স্বয়ং হযরত আসমা (রা)। যেমন ইমাম শাফেয়ী (র) সেটাকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি উক্ত রেওয়ায়াতকে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার মাধ্যমে হিশাম থেকে বর্ণনা করেন। এতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে সে মহিলা হলো হযরত আসমা বিনতে আবী বকর তিনি মাসআলা জিজ্ঞেস করেন। আর রাবীর জন্য তার নাম অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা কোন প্রশ্নের বিষয় নয় এবং সেটা রেওয়ায়াত বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রেও ক্ষতিকারক নয়। যেমন– আবু সাঈদ খুদরীর হাদীস যাতে ঝাড়-ফুঁকের ফযীলত সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, সূরা ফাতেহা পড়ে ঝাড়-ফুঁক করলে এই ফল হয়। কিন্তু তিনি সেখানে নিজের নামে অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল রাবী ১/২৩০)

মোটকথা, যখন হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) হায়েযের রক্ত কাপড়ে লাগলে তা পবিত্রতা করার পদ্ধতি কি হবে সে সম্পর্কে নবী (স) কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, قرص-حُتِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ الخ বলা হয় লাকড়ী ইত্যাদি দ্বারা খুঁচিয়ে ময়লা উঠানোকে, আর حَتّ বলা হয় নখ ইত্যাদি দ্বারা কিছু উঠানো এবং পানি ঢেলে ধৌত করাকে। আল্লামা খাত্তাবী (রা) বলেন, قَرْص হলো অল্প অল্প করে পানি ঢেলে ভালো করে চটকিয়ে এবং খুব ঘষে ধৌত করা। আর نَضْح শব্দটি কখনো ছিটানো ও কখনো ধোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে এটাই উদ্দেশ্য। কেননা, অনুচ্ছেদের হাদীস রক্ত নাজাসাত হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। আর হায়েযের রক্ত নাপাক হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানের ঐক্যমত রয়েছে। তা সত্ত্বেও এখানে نَضْح শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই সমস্ত ইমামদের নিকট হাদীসে نَضْح শব্দটি গোসলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হানাফীগণও একথার প্রবক্তা। আলোচ্য হাদীস একথার উপরও প্রমাণ যে, পাক করার ব্যাপারে নির্ধারিত কোন সংখ্যা শর্ত নয় বরং মূল পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা উদ্দেশ্য। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩৪৭–৩৪৮)

بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٢٩٥. اَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِي سُفْيَانَ اَنَّهُ سَاَلَ اُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ اِذَا لَمْ يَرَى فِيهِ اَذًى -

অনুচ্ছেদ : কাপড়ে যদি বীর্য লাগে

অনুবাদ : ২৯৫. ঈসা ইবনে হাম্মাদ (র)........মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা)-কে প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যে কাপড়ে সহবাস করতেন তাতে কি তিনি নামায আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি তিনি তাতে কোন নাপাকী না দেখতেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سؤال : اكتب حُكْمَ الْمَنِيِّ هل هُوَ طَاهِرٌ ام لَا وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيهِ بَيِّنْ مُوَضِّحًا .

প্রশ্ন : মনীর বিধান লেখ, সেটা পবিত্র কি না? এ ব্যাপারে মতানৈক্য কি? স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর : বীর্য পবিত্র না অপবিত্র এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মাতনৈক্য রয়েছে–

(১) ইমাম শাফেয়ী আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক (রা.) এর মতে বীর্য অপবিত্র নয়।

(২) ইমাম আবু হানীফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী ও আওযায়ী (রা.) এর মতে বীর্য নাপাক। (শরহে মুসলিম ১/১৪০)

ইমাম শাফেয়ী (রা.) এর দলীল : (১)

عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلِّي فِيهِ .

অর্থাৎ আসওয়াদ (রহ.) হতে বর্ণিত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূল (স) এর কাপড় হতে মনী ঘষে উঠিয়ে ফেলতাম। অতঃপর তিনি ঐ কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করতেন। (মুসলিম : ১/১৪০ তিরমিযী : ১/৩১, নাসায়ী : ১/৫৬, ইবনেমাজাহ : ৪১)

দলীল: ২

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَاحْتَلَمَ فَاَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ اَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ اَوْيَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَاَخْبَرَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِي وَاَنَا اَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ صلي الله عليه وسلم .

অর্থাৎ হাম্মাম ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা.) এর মেহমান ছিলেন। তাঁর স্বপ্নদোষ হওয়ার পর তিনি কাপড় হতে বীর্য ধৌত করছিলেন, তা আয়েশা (রা) এর বাদী দেখে তাঁকে (আয়েশা রা. কে) অবহিত করেন। তখন আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) এর কাপড় হতে তা খুটে তুলে ফেলে দিতাম। (আবু দাউদ : ১/৫৩, মুসলিম : ১/১৪০) উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে বীর্য খুঁচিয়ে বা ঘষে তোলার বিবরণ রয়েছে। অতএব, বীর্য যদি নাপাকই হতো, তাহলে খুঁচিয়ে তোলা বা ঘষে তোলা যথেষ্ট হতো না; বরং রক্তের ন্যায় ধোয়া জরুরী হতো।

দলীল : ৩

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ اِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ .....الخ .

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে মারফু আকারে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল বীর্য যদি কাপড়ে লেগে যায় (তাহলে কি করবে?)

উত্তর ঃ তিনি বললেন, এটা তো শ্লেষ্মার মত। ইমাম শাফেয়ী (রা) বলেন, উক্ত হাদীসে বীর্যকে নাকের শ্লেষ্মার ন্যায় বলে পবিত্র সাব্যস্ত করেছেন, অতএব, তা অপবিত্র নয়।

আকলী দলীল ঃ ইমাম শাফেয়ী (রা) বলেন, অসংখ্য আম্বিয়ায়ে কিরামের জন্মের উৎস হলো বীর্য। অতএব, পবিত্র এই মানুষগুলোর মূল উৎস বীর্যকে কিভাবে নাপাক বলতে পারি? (কিতাবুল উম্ম)

আবু হানীফা (রা) এর দলীল

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفيانَ اَنَّهُ سَال اُخْتَهُ ام حَبِيْبَةَ زَوجَ النبىّ صلى الله عليه وسلم هَل كانَ رسولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم يُصَلِّىْ فِى الثَّوبِ الّذى يُجامِعُها فيْه فقالتْ نَعَمْ اذا لمْ يَرفيْه اذًى ـ

অর্থাৎ মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর বোন রাসূলুল্লাহ (স) এর পত্নী উম্মে হাবীবা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, স্ত্রী সঙ্গমকালে পরিহিত বস্ত্রে নবী করীম (সাঃ) কি নামায পড়তেন, তিনি বলেন হ্যাঁ পড়তেন, যদি তাতে নাপাক কিছু না দেখতেন। উক্ত হাদীসে বীর্যকে নাপাক বলা হয়েছে।

দলীল ঃ ২

عَنْ سُليمانَ بْنَ يَسارٍ يقولُ سَمِعْتُ عائشة تقولُ اِنّها كانتْ تَغْتَسِلُ المنيّ مِن ثوبِ رَسولِ اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وسلم اراه فيْه بقعةً او بقعًا ـ

অর্থাৎ সুলায়মান ইবনে ইয়াসার এর সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে বলতে শুনেছি, যে তিনি (আয়েশা (রা) রাসূল (স) এর কাপড় হতে মনী ধৌত করতেন, তারপরও বস্ত্রের উপর ভিজা দাগ পরিলক্ষিত হতো। (আবু দাউদ ঃ ১/৫৩, বুখারী ১/৩৬, মুসলিম ঃ ১/১৪০, নাসায়ী ঃ ১/৫৬, ইবনেমাজাহ ঃ ৪১)

অতএব, মনী যদি পবিত্রই হত তাহলে ধোয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

দলীল ঃ ৩

হানাফীদের প্রমাণ যেসব রেওয়ায়াতে ও যাতে বীর্য খুটিয়ে, ঘষে বা ডলে তোলা কিংবা ধুয়ে তা পরিষ্কার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলো। এই সমস্ত রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বীর্য কাপড়ে রেখে দেয়া তিনি বরদাশত করতেন না। যদি এটা নাপাক না হত তাহলে তো কোথাও না কোথাও বৈধতার বিবরণের জন্য এটা প্রমাণিত হত যে, বীর্য কাপড় বা দেহে রেখে দেয়া হয়েছে অথবা তা নিয়ে নামায পড়েছেন এবং ন্যূনতম পক্ষে বৈধতা বিবরণের জন্য এটাকে বাচনিক বা ক্রিয়াগতভাবে পবিত্র সাব্যস্ত করা হতো। অথচ গোটা হাদীস ভান্ডারে কোথাও এর নযীর নেই। অতএব, বীর্য পবিত্র নয়।

দলীল ঃ ৪

পবিত্র কুরআনে বীর্যকে তুচ্ছ পানি বলা হয়েছে, এটাও অপবিত্র হওয়ার সহায়ক।

আকলী দলীল ঃ পেশাব, মনী, অদী সবই সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। এগুলো বের হওয়ার ক্ষেত্রে অযু করা ওয়াজিব। অতএব, বীর্য আরো অধিক নিশ্চিতরূপে নাপাক হওয়া উচিত। কেননা, এর ফলে গোসল ওয়াজিব হয়। (দরসে তিরমিযী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৪৯)

প্রতিপক্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় দলীলের জবাব

নাপাক জিনিস পাক করার পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কখনো পাক করার জন্য ধৌত করার প্রয়োজন হয় না। যেমন– মাটি বা জমি শুষ্ক হওয়ার সাথে সাথেই পাক হয়ে যায়। ধৌত করার কোন প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে তুলা পাক করার পদ্ধতি হলো সেটাকে ধুয়ে ফেলা। আর বীর্য মিশ্রিত কাপড় বা স্থান পাক করার একটি পন্থা হলো,

বীর্যকে খুঁচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলা। কিন্তু শর্ত হলো বীর্য শুষ্ক ও ঘন হতে হবে। যদি ভিজা এবং পাতলা হয় তাহলে অবশ্যই ধুতে হবে যা আয়েশা (রা) এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

قالتْ كنتُ افرُكُ المَنِيَّ مِن ثوبِ رَسُوْلِ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم اذا كانَ يَابِسًا واَغْسِلُه اذا كانَ رَاطبًا ـ

অর্থাৎ আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) এর কাপড় থেকে বীর্য ঘষে তুলে ফেলতাম, যখন সেটি শুষ্ক থাকত। আর ধুয়ে ফেলতাম যখন ভিজা হত। সুতরাং শাফেয়ীদের পক্ষে প্রদত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসে যে বীর্য ঘষে তোলার কথা বর্ণিত হয়েছে, এটি ছিল পাক করার একটি পদ্ধতি যা এইমাত্র বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সহ বর্তমানে সারা বিশ্বের মানুষের বীর্য যেহেতু পাতলা। সে মতে কাপড়ে বা শরীরে লাগলে তা ধৌত করা ছাড়া পাক করার জন্য কোন বিকল্প পন্থা নেই।

তৃতীয় দলীলের জবাব

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেই বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে–

قال اذا اَجْنَبَ الرجلُ فِى ثَوْبِهِ فرَاى فيه اَثرًا فَلْيَغْسِلْهُ وَاِن لَّمْ يَرَى اَثرًا فَلْيَنْضَحْهُ

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, যখন কেউ কাপড় পরা অবস্থায় অপবিত্র হয়, অতঃপর তাতে নাপাকের নিদর্শন দেখে, তবে সে যেন অবশ্যই তা ধৌত করে। আর যদি তাতে নিদর্শন না দেখে তাহলে যেন হালকা ভাবে ধৌত করে। এরদ্বারা বোঝা যায় যে, তার নিকটও বীর্য নাপাক। অতএব, এই বৈপরীত্য অবসানের জন্য المني بمنزلة المخاط বাক্যটি অবশ্যই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। যথা (ক) কেউ কেউ এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য বীর্যের পবিত্রতা বর্ণনা করা নয় বরং উপমা তথা বীর্য শ্লেষ্মার মত আঠালো বা পিচ্ছিল হওয়া।

(খ) আবার কেউ কেউ বলেছেন, তুলনা দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, নাকের শ্লেষ্মা যেমন সুস্থ তবিয়তে ঘৃণা জন্মায় তেমনি ভাবে বীর্যতেও ঘৃণার উদ্রেক করে।

(গ) কেউ কেউ বলেন, নাকের শ্লেষ্মা ঘন ও শুষ্ক হলে যেমন ঘষে বা খুঁচিয়ে দূর করা যায় তেমনিভাবে গাঢ় ও শুষ্ক বীর্যকেও ঘষে বা খুঁচিয়ে দূর করা সম্ভব।

আকলী দলীলের জবাব

ইমাম শাফেয়ী (রা) এর কিয়াসটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বীর্য দ্বারা যেরূপ ভাবে আম্বিয়ায়ে কিরাম সৃজিত হয়েছেন অনুরূপ আল্লাহর অনেক দুশমন যেমন ফেরাউন, হামান, নমরুদ, আবু জাহল, প্রমুখ বড় বড় জঘন্য কাফির মুশরিকও সৃজিত হয়েছে। অতএব, এমন খোড়া যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হলো, অনেক সময় মূল বস্তু পরিবর্তন হয়ে নাপাক জিনিসও পাক হয়ে যায়। অতএব, বীর্য যখন গোশতে রূপান্তরিত হয়ে গর্ভজাত শিশু হয়ে যায় তখন মূল পরিবর্তিত হওয়ার কারণে তা আর নাপাক থাকে না। তাই ইমাম নববী (র.) এই কিয়াসটি দ্বারা বীর্য পাক প্রমাণ করাকে একেবারেই অবৈধ মনে করেন এবং কঠোর সমালোচনা করেছেন। (শরহুল মুহাজ্জাব দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৫৫৪)

তাত্ত্বিক আলোচনা

قوله إِذَا لَمْ يَرفِيهِ اَذًى এখানে اذى দ্বারা নাপাক উদ্দেশ্য।

(১) আল্লামা আইনী বলেন, এর দ্বারা মনী নাপাক হওয়া সাবেত হয়।

(২) মাআরিফুস সুনানে এ বিষয়ের উপর পাঁচটি মারফু এবং পাঁচটি মাওকুফ হাদীস একত্রিত করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়তে মনী নাপাক– (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩৪৮)

بابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

٢٩٦. اخبرنا سُوَيْدُ بْنُ نصرٍ قال اَخْبَرَنا عبدُ اللّٰهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنَ يَسارٍ عَنْ عَائِشَةَ قالتْ كُنتُ اَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رسولِ اللّٰه ﷺ فيَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ لَفِى ثَوْبِه -

অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় থেকে বীর্য ধৌত করা

অনুবাদ ঃ ২৯৬. সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)..........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাপড় হতে জানাবতের নাপাকী ধুইতাম, তারপর তিনি নামাযের জন্য বের হতেন অথচ পানির চিহ্ন তাঁর কাপড়ে বিদ্যমান থাকত।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

এ হাদীসটাও জুমহুর ইমামগণের দলীল। এর দ্বারাও মনী নাপাক হওয়া সাব্যস্ত হয়। কেননা, যদি মনী নাপাক না হতো তাহলে তিনি তা কেন ধৌত করলেন? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি হুজুর (স) এর কাপড় হতে মনী ধৌত করতাম। এ ধৌত করাটাই মনী নাপাক হওয়ার প্রমাণ। হযরত আয়েশা (রা) এর উক্তি। كُنْتُ اَغْسِلُ থেকে বুঝে আসে যে, হুজুর (স) এর কাপড় হতে মনী ধুয়ে কাপড় পবিত্র করার কাজ এক দু'বার হয়নি। বরং এটা হযরত আয়েশা (রা) এর সর্বসময়ের আমল ছিল।

শাফেয়ীদের পক্ষ থেকে বলা হয়, এখানে হযরত আয়েশা (রা) এর কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হতে পারে না। কাজেই উক্ত হাদীস দ্বারা মনী নাপাক হওয়া সাব্যস্ত হয় না। ইমাম শাফেয়ী (রা) এর বক্তব্যের জবাবে হানাফীগণ বলেন, প্রথমত অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত আয়েশা (রা) যা কিছু করতেন তা রাসূলের অবগতিতেই করতেন এবং নবী (স) সেটা বহাল রাখতেন। এছাড়াও সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীস রয়েছে যার মাফহুম নিম্নরূপ−

হুজুর (স) মনী ধুইতেন, অতঃপর ঐ কাপড় পরিহিত অবস্থায়ই নামায পড়তেন। আর আমি কাপড় ধৌত করার নিশানা দেখতাম। আলোচ্য হাদীসে যদি স্বয়ং রাসূল (স) এর ধৌত করার অর্থ নেয়া হয়। তাহলে একথা স্পষ্ট যে, মনী নাপাক। যার কারণে তিনি তা ধুয়েছেন। আর যদি তাঁর নির্দেশে কাপড় ধোয়া হয় তাহলেও একথা স্পষ্ট যে, মনী নাপাক, নামায আদায়কারীর কাপড় হতে যা দূর করা ফরয আর এর দূর করার পদ্ধতি অনুচ্ছেদের হাদীস ও অন্যান্য হাদীসে উল্লেখ আছে। (শরহে উর্দূ নাসায়ী নং−৩৪৯)

بَابُ فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

٢٩٧. اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ابي هاشم عن ابي مجلز عن الحارث بن نوفل عن عائشة قالت كنت افرك الجنابة وقالت مرة اخرى المني من ثوب رسول الله ﷺ -

٢٩٨. اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال الحكم اخبرني عن ابراهيم عن همام بن الحارث ان عائشة قالت لقد رايتني وما ازيد على ان افركه من ثوب رسول الله ﷺ -

٢٩٩. اخبرنا الحسين بن حريث انبانا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عائشة قالت كنت افركه من ثوب النبي ﷺ -

٣٠٠. اخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن عائشة قالت كنت اراه في ثوب رسول الله ﷺ فاحكه -

٣٠١. اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لقد رايتني افرك الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ -

٣٠٢. اخبرنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لقد رايتني اجده في ثوب رسول الله ﷺ فاحته عنه -

---

অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় থেকে বীর্য রগড়িয়ে ফেলা

অনুবাদ ঃ ২৯৭. কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)............আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাপড় থেকে জানাবতের নাপাকী রগড়িয়ে ফেলতাম। আর এক সময় বলেছেন, কাপড় থেকে বীর্য রগড়িয়ে ফেলতাম।

২৯৮. আমর ইবনে ইয়াযীদ (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার মনে আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাপড় থেকে জানাবতের নাপাকী রগড়িয়ে ফেলার অতিরিক্ত কিছু করতাম না।

২৯৯. হুসায়ন ইবনে হুরায়স (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাপড় থেকে তা রগড়িয়ে ফেলতাম।

৩০০. শুআয়ব ইবনে ইউসুফ (র).......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাপড়ে তা দেখলে তা রগড়িয়ে ফেলতাম।

৩০১. কুতায়বা (র)...........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার মনে পড়ে, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাপড় থেকে জানাবতের চি[illegible] রগড়িয়ে ফেলতাম।

৩০২. মুহাম্মদ ইবনে কামিল মারও[illegible] (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনে পড়ে, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাপড় থেকে জানাবতের চিহ্ন রগড়িয়ে পরিচ্ছন্ন করতাম।

সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

মুসান্নিফ (র) হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীস ছয় সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যা মনী রগড়ানোর ব্যাপারে বর্ণিত ইমাম শাফেয়ী (রা) এ সকল হাদীস দ্বারা মনী পবিত্রতার উপর প্রমাণ পেশ করেন। তিনি বলেন, যদি মনী নাপাক হতো তাহলে রগড়ানোই তার জন্য যথেষ্ট হতো না। মনী রগড়ানোর দ্বারা কাপড় পবিত্র থাকাই একথার প্রমাণ যে, মনী পবিত্র। এখন কথা হলো তাহলে ধৌত করার কথা বলা হলো কেনো? এর উত্তরে তিনি বলেন, তিনি যে ধৌত করেছেন এটা অপবিত্রতার কারণে নয় বরং পরিচ্ছন্নতার জন্য।

আমরা বলি মনী রগড়ানো সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা শাফেয়ী (রা) এর দাবী সাব্যস্ত হয় না, বরং এর দ্বারা হানাফীদের মতের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা, হানাফী ফকীহদের নিকট নাপাক থেকে পবিত্রতা অর্জন করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন, ধোয়ার দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয়। অনুরূপভাবে রগড়ানো, ঘষা, খুঁচিয়ে তোলা, শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে নাপাক পবিত্র হয়। মোটকথা, রগড়ানোও পবিত্র করার একটি পদ্ধতি। কাজেই যখন মনী শুষ্ক হয়ে যাবে তখন মনী রগড়ানোই পবিত্রতা হাসিলের জন্য যথেষ্ট। কেননা, আমাদের নিকট নাজাসাত তথা শুষ্ক মনী রগড়ানোর দ্বারাই দূর হয়ে যায়। কাজেই আমরা বলি রগড়ানোই মনী নাপাক হওয়ার প্রমাণ। যেমন, তা ধৌত করা তা নাপাক হওয়ার উপর প্রমাণ। এজন্যেই মুসলিমের রেওয়াতে হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীসে এসছে–

لَقَدْ رَأَيْتُنِي اَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عليه وسلّم فَرْكًا .

এরপর فَيُصَلِّىْ فِيْهِ উল্লেখ করেছেন, সুতরাং এটা শাফেয়ীদের স্বপক্ষে প্রমাণ হতে পারে না। বরং এটা হানাফীদের পক্ষে প্রমাণ যে, নাপাক পানি ব্যতীত অন্যান্য তরল বস্তু দ্বারাও দূরীভূত হয়। কেননা, হানাফী ফকীহদের নিকট নাজাসাত দূর করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্য হতে একটি হলো রগড়ানো। এর দ্বারা যে মনী কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায় তা দূর হয়ে যায়। শাফেয়ী উলামায়ে কিরাম হযরত ইবনে আব্বাসের আছার দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন, যা বায়হাকী, মারেফাতুস সুনান গ্রন্থে এ নকল করেছেন এবং ইবনে আব্বাস (রা) এর এই মাওকুফ রেওয়ায়াতকে সহীহ বলেছেন। তার মাফহুম হলো ইবনে আব্বাস (রা) মনী যুক্ত কাপড় সম্পর্কে বলেন–

.......فَاِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ اَوِ الْبُصَاقِ اِذْخِرْ

অর্থাৎ খুশবুদার ঘাস দ্বারা তাকে দূর করে দাও। কেননা, মনী শ্লেষ্মা ও থুথুর ন্যায়। এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) এর ফাতওয়া, এটা মারফু হাদীস নয়। কিন্তু ইবনে জাওযী তার তাহকীকে লেখেন যে, ইসহাক আযরুক ইবনে আব্বাস থেকে এটাকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এর রাবী নির্ভরযোগ্য। তার থেকে বুখারী ও মুসলিম রেওয়ায়াত এনেছেন। কাজেই তার অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য হবে। এর জবাব হলো, ইবনে আব্বাসের নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব প্রদান করেন। সুতরাং এখানে زيادتى তথা অতিরিক্ত করা হয়নি বরং পরিবর্তন করা হয়েছে। কাজেই এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা হলো হাদীসটি ইবনে আব্বাসের উপর মাওকুফ। সুতরাং ইবনুল জাওযীর কথার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাবে না। মোটকথা, ইমাম শাফেয়ী (রা) মাওকুফ রেওয়ায়েত দ্বারা মনী পবিত্র হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেন। কেননা, ইবনে আব্বাস মনীকে শ্লেষ্মা ও থুথুর সাথে তাশবীহ দিয়েছেন আর তা পবিত্র। সুতরাং এটাও (মনী) পবিত্র হবে। হানাফীরা তাদের বক্তব্যের জবাবে বলেন, আমাদের দেখতে হবে ইবনে আব্বাস (রা) এর হাদীসের ওযন কতটুকু। ঐ সকল মারফু হাদীস যা মনী নাপাক হওয়াকে প্রমাণ করে তার মুকাবেলায় প্রমাণ হতে পারে কি-না।

আমরা দেখি ইবনে আব্বাস (রা) এর ইজতেহাদ হযরত আয়েশা, ওমর ইবনুল খাত্তাব, মুয়াবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সহীহ মারফু হাদীসের মোকাবেলায় প্রমাণ হতে পারে না। কেননা, তাদের সকলের বক্তব্য দ্বারা মনী নাপাক সাব্যস্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ ইবনে আব্বাস (রা) মনীকে যে শ্লেষ্মার সাথে তাশবীহ দিয়েছেন। হতে পারে তিনি নাপাক দূর করার দিক দিয়ে তাশবীহ দিয়েছেন। স্বত্ত্বাগত ভাবে বস্তুটি যে পাক সে হিসেবে নয়। কেননা, মনী আঠালো ও পিচ্ছিলতার দিক দিয়ে শ্লেষ্মার ন্যায়। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হবে যেভাবে কাঠি ইত্যাদির মাধ্যমে রগড়ানো ও খুঁচিয়ে উঠানোর দ্বারা তা পরিষ্কার হয়ে যায় ঠিক তদ্রূপ শুষ্ক মনী দূর করাও সহজ। ইজখির ঘাসের মাধ্যমেও তা দূর

করা যায়। তার আলামত হলো ইবনে আব্বাস এর উল্লেখিত আছার ছাড়াও অন্যান্য রেওয়ায়াতে মনী দূর করার ব্যাপারে আমরের সীগা ব্যবহার করা। আর এর কোন مشبه به উল্লেখ করা হয়নি, এটাও সম্ভব যে, তারা উক্ত কথা সামান্য পরিমণ/ক্ষমাযোগ্য পরিমাণের ব্যাপারে বলেছেন অধিক পরিমাণের ব্যাপারে নয়। কেননা, সাধারণত সহবাসের সময় যে মনী কাপড়ে লাগে তার পরিমাণ কমই হয়ে থাকে। আর কায়দা আছে–

اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال কাজেই ইবনে আব্বাস (রা) হতে যে মাওকুফ রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে তা মনী পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণ হতে পারে না। সুতরাং তার দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সহীহ নয়।

শাফেয়ীদের তৃতীয় দলীল ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীস যে, আমি রাসূল (স) এর কাপড় হতে মনীকে রগড়াতাম তাঁর নামাযরত অবস্থায়। ইবনে খুযাইমা (রা) উক্ত হাদীসকে তার সহীহ গ্রন্থে রেওয়ায়াত করেছেন এবং বায়হাকী (র) বলেন, যদি মনী নাপাক হতো তাহলে তা সহকারে নামায আদায় করা সহীহ হতো না।

শাফেয়ীদের দলীলের জবাব

আয়েশা (রা) এর উক্ত রেওয়ায়াতের জবাব হলো, স্বয়ং তিনি মনীর ব্যাপারে বলেন, যদি কাপড়ে মনী লাগা দেখো তাহলে তাকে ধুয়ে নেবে। আর যদি দৃষ্টিতে না পড়ে তাহলে তার উপর পানির ছিটা দিয়ে দিবে (ত্বহাবী)।

এ হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। যদি বলা হয় نضح তো বলা হয় পানি ছিটিয়ে দেয়াকে। যদি নাপাক হতো তাহলে পূর্ণ কাপড় ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হতো। তাদের এ কথার জবাব হলো نضح শব্দটি ধৌত করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এর দৃষ্টান্ত সহীহ হাদীসে বিদ্যমান। সুতরাং মনী না দেখার ক্ষেত্রে সমস্ত কাপড় ধৌত করার হুকুম দেয়ার দ্বারা বোঝা যায় যে, মনী নাপাক। কেননা, পবিত্র বস্তু লাগার পর তা ধৌত করার কোন অর্থ হতে পারে না। এবং তা ধৌত করার জন্য নির্দেশও দেওয়া হতো না।

আয়েশা (রা) এর হাদীস যা ইবনে খুযাইমা বর্ণনা করেছেন সেটা منقطع কেননা উক্ত হাদীসের একজন রাবী محارب بن دثار রয়েছেন, যিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। আয়েশা (রা) হতে তার শ্রবণ প্রমানিত নেই। স্বয়ং বায়হাকী (র) আয়েশা (রা) এর রেওয়ায়াত নকল করার পর সেটা মুরসাল হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। সুতরাং বুঝা গেলো সেটা তার নিকট হুজ্জত নয়। কাজেই উক্ত হাদীস দ্বারা মনী পবিত্র হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করাও সহীহ নয়। যদি তার প্রমাণ পেশকে সহীহ বলে মেনেও নেয়া হয়, তারপরেও হানাফী মাযহাবের বক্তব্যের উপর কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হয় না। কেননা, আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত নাপাকীটি হানাফীদের নিকট এক দেরহাম থেকে কমের উপর প্রযোজ্য যা ক্ষম্যাযোগ্য। কাজেই সহীহ ইবনে হিব্বানের রেওয়ায়াত আমাদের মাযহাবের পরিপন্থী নয়।

যৌক্তিক প্রমাণ ঃ শাফেয়ীগণ একটি যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করেন যে, মনী হলো মানব সৃষ্টির উৎস। এখন যদি এটাকে নাপাক ধরা হয় তাহলে মানুষের ভিত্তিমূল উৎস নাপাক বলতে হবে।

যৌক্তিক প্রমাণের জবাব ঃ আমরা তাদের এ বক্তব্যকে মানিনা। কেননা, মানব সৃষ্টির সূচনায় মনী রক্তে পরিণত হয়, সেটা মাংস খণ্ডে পরিণত হয় ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবর্তনের পরেই মানুষ সৃষ্টি হয়। তুমি কি দেখনা যে, মনী রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। সেটা কি পবিত্র? মানব সৃষ্টির পদার্থ হলো রক্তপিণ্ড। আর সেটাকে সকলেই নাপাক বলে, অথচ এটা মনী থেকেই সৃষ্ট। তাহলে তাদের প্রমাণ কিভাবে সহীহ হলো? সারকথা হলো, মনী অপবিত্র হওয়ার বিষয়টি আকলী ও নকলী দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং উভয় প্রকার দলীল অধিক শক্তিশালী। নাপাক হওয়ার ব্যাপার হানাফী ও মালেকী সকলে একমত। অবশ্য হানাফীদের নিকট এর ব্যাখ্যা রয়েছে। যদি মনী আদ্র বা পাতলা হয় তাহলে তা ধৌত করা ওয়াজিব। আর যদি শুষ্ক হয় তাহলে রগড়ানোই যথেষ্ট। হানাফীরা উভয় প্রকারের সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে তাফসীল তথা পার্থক্য করণের প্রবক্তা। কেননা, হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স) এর কাপড় থেকে মনী রগড়ায়ে দিতাম যখন তা শুষ্ক থাকত। আর যদি তা ভেজা থাকতো তাহলে তা ধৌত করে দিতাম। এটাকে দারাকুতনী, ত্বাহাবী, আবু আওয়ানা নিজ নিজ সহীহ গ্রন্থে রেওয়ায়াত করেছেন এবং তার সনদও সহীহ। (নসবুর রায়াহ ঃ ১/২০৯, শারহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩৫২)

بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِىْ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

٣٠٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ انَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَاكُلِ الطَّعَامَ الٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجْرِهِ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ -

٣٠٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَبِىٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَتْبَعَهُ اِيَّاهُ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যগ্রহণ করেনি এমন শিশুর পেশাব

অনুবাদ ঃ ৩০৩. কুতায়বা (র)........উম্মে কায়স বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খাদ্যগ্রহণ করেনি তাঁর এমন একটি ছোট শিশুকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে তাঁর কোলে বসালেন, সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি কিছু পানি আনিয়ে তা কাপড়ে ঢেলে দিলেন, তা ধুলেন না।

৩০৪. কুতায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একটি শিশুকে আনা হলো। সে তাঁর কোলে পেশাব করে দিল, তিনি কিছু পানি আনালেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سؤال : مَاالاختلافُ بَيْنَ الائمّةِ الكِرام فِىْ نَجاسَةِ بَوْلِ الغُلام وكَيْفِيَّةِ طَهَارَتِهِ .

প্রশ্ন ঃ শিশুদের পেশাব নাপাক হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য এবং তা পবিত্র করার পদ্ধতি কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ শিশুদের পেশাবের বিধান ঃ (১) দাউদে জাহেরীর মতে, দুগ্ধপোষ্য ছেলে শিশুর পেশাব পাক এবং মেয়েদের পেশাব নাপাক।

(২) তবে অন্য সকল উলামার মতে ছোট শিশু চাই ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক তাদের পেশাব নাপাক।

পবিত্র করার পদ্ধতি নিয়ে ইমামদের অভিমত

ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর পেশাব পবিত্র করার পদ্ধতি নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

(১) ইমাম শাফেয়ী আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক, হাসান বসরী ও আতা (রা) এর মতে ছেলে শিশুর পেশাব ধোয়ার পরিবর্তে তার উপর পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট। তবে দুগ্ধপোষ্য কন্যা শিশুর পেশাব ধৌত করা জরুরী।

(২) ইমাম আবু হানীফা, মালেক, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ইবরাহীম নাখয়ী ও সুফিয়ান সাওরী (রা) এর মতে কন্যা শিশুর পেশাবের ন্যায় ছেলে শিশুর পেশাবও ধৌত করা জরুরী। শুধু পানি ছিটালেই পাক হবে না। অবশ্য দুগ্ধপোষ্য ছেলে শিশুর পেশাব অধিক ধোয়া জরুরী নয় বরং সামান্য ধোয়াই যথেষ্ট। (আইনী ঃ ১/ ৮৮৯)

ইমাম শাফেয়ী (রা) এর দলীল ঃ

عن أم قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله .

অর্থাৎ উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান (রা) এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স) এর খিদমতে আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) শিশুটিকে কোলে নেয়ার পর সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেয়। অতঃপর তিনি পানি আনিয়ে কাপড়ের উক্ত স্থানে ছিটিয়ে দেন, তিনি তা ধৌত করেন নি। (বুখারী ঃ ১/৩৫, মুসলিম ঃ ১/৩১)

দলীল ঃ ২

عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ قَالَ إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ ذَكَرٍ ـ

অর্থাৎ লুবাবা বিনতে হারেস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসাইন ইবনে আলী (রা) রাসূল (স) এর কোলে ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাঁর (স) কোলে পেশাব করেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি অন্য একটি কাপড় পরিধান করুন এবং এই কাপড় দুটি আমাকে ধৌত করতে দিন। রাসূল (স) বলেন, মেয়ে শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে তা ধৌত করতে হয় এবং ছেলে শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে তাতে পানি ছিটালেই চলে। উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে দুগ্ধপোষ্য ছেলে শিশুর পেশাব থেকে কাপড় পাক করার জন্য হাদীসে শুধু نضح শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আর এর অর্থ হলো ছিটানো।

দলীল ঃ ৩

....عن عليٍّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ فِي الرَّضِيعِ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بولُ الغُلامِ ـ

অর্থাৎ আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেন, মেয়ে শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে তো ধৌত করতে হয়, আর ছেলে শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে তাতে পানি ছিটানই যথেষ্ট।

আবু হানীফা (রা) এর দলীল ঃ ১

নবী করীম (স) ইরশাদ করেন– اِسْتَنْزِهُوا عَنِ الْبَوْلِ فَانَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

তোমরা পেশাব থেকে সতর্ক থাক, কেননা, কবরের অধিকাংশ আযাব এ কারণে হয়ে থাকে। (মুসতাদরাক ১/১৮৩)

দলীল ঃ ২ হযরত আম্মার এর প্রসিদ্ধ হাদীস, এতে উল্লেখ রয়েছে– اِنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الْبَوْلِ অর্থাৎ পেশাব লাগলে তোমরা কাপড় ধৌত করবে।

দলীল ঃ ৩

عَنْ اَبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجِيءَ بِالْحَسَنِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَارَادَ الْقَوْمُ اَنْ يُعَجِّلُوهُ فَقَالَ اِبْنِي اِبْنِي فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ـ

এ হাদীসে পেশাবের উপর পানি ঢালার কথা বলা হয়েছে। কাজেই বুঝা যায় ছেলেদের পেশাব ও নাপাক। যদি তা না হতো তাহলে পানি ঢালা হলো কেনো?

দলীল ঃ 8

عن أُمِّ الفَضْلِ قَالَتْ لَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ قلتُ يا رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطِنِيهِ أو ادْفَعْهُ إِلَيَّ لأكفلَه او أُرْضِعَه بِلَبَنِي. فَفَعَلَ فَأَتَيْتُه بِهِ فَوَضَعْتُه عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَصَابَ إِزَارَه فقلتُ لَهُ يارسولَ اللّه أَعْطِنِي إِزَارَكَ أَغْسِلْه قالَ إِنَّمَا يُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلامِ وَيُغْسَلُ مِن بَوْلِ الْجَارِيَةِ ـ

দলীল ঃ ৫

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ اَمَّا تَغْتَسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الْبَوْلِ مِن غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلامِ وَالْجَارِيَةِ ـ

উল্লেখিত হাদীসে সাধারণভাবে পেশাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। ছেলে শিশুর পেশাব হোক বা কন্যা শিশুর পেশাব হোক, মানুষের পেশাব হোক বা অন্যান্য জীব জন্তুর পেশাব হোক, বালেগার পেশাব হোক কিংবা নাবালেগের পেশাব হোক আমভাবে বলা হয়েছে। অতএব, হাদীসের এ ব্যাপকতার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, ছেলে শিশুর পেশাব এবং কন্যা শিশুর পেশাবের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না বরং উভয়ের পেশাবই ধৌত করা জরুরী।

দলীল ঃ ৬

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ مرةً فَبَالَ عليه فقال صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا

অর্থাৎ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) এর নিকট শিশুদেরকে আনা হতো। একবার এক শিশুকে আনার পর শিশুটি তাঁর গায়ে পেশাব করে দেয়। তিনি বললেন এর উপর ভালো করে পানি ঢেলে দাও। (ইলাউস সুনান ১/৪৭৩, আছারুস সুনান ঃ ১/১৭, বুখারী ঃ ১/৩৫)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

رش و نضح শব্দটি শুধুমাত্র ছিটানোর অর্থেই ব্যবহৃত হয় না বরং গোসল করা ও ধৌত করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অতএব نضح অর্থ হবে হালকাভাবে ধৌত করা। আর لم يغسل এর অর্থ হলো لم يغسله غسلا مبالغا অর্থাৎ খুব ভালোভাবে ধৌত করেন নি। আর হানাফীর তো একথা স্বীকার করেন যে, ছেলে শিশুর পেশাব হালকা ভাবে ধুলেই পাক হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, نضح শব্দটি যে ধৌত করার অর্থে ব্যবহৃত হয় এর উদাহরণ হাদীসেই পাওয়া যায়। হযরত আলী (রা) বলেন–

اَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذِيِّ يَخْرُجُ مِنَ الْاِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ .

অর্থাৎ আমরা মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) কে বী করীম (স) এর নিকট প্রেরণ করলাম, তিনি নবী করীম (স) কে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের মযী বের হলে করণীয় কি? জবাবে নবী করীম (স) বললেন, তুমি উযূ করবে এবং তোমার লজ্জাস্থান ধৌত করবে। উক্ত হাদীসে মযী বের হলে লজ্জাস্থান ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। এবং শাফেয়ী মাযহাবের অভিমতও এই যে, মযী বের হলে লজ্জাস্থান ধৌত করতে হবে। শুধু পানি ছিটানো যথেষ্ট নয়। অথচ স্বয়ং শাফেয়ী (রা) উক্ত হাদীসে نضح শব্দটির অর্থ করেছেন ধৌত করা, ছিটানো অর্থগ্রহণ করেন নি। (তানযীমুল আশতাত ঃ ১/১৯৩, দরসে মিশকাত ঃ ১/১৯৪ মাআরিফুস সুনান ১/২৭৫)

দ্বিতীয়তঃ শিশু ছেলের পেশাবের ব্যাপারে রেওয়ায়াতসমূহে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন যদি আমরা প্রাধান্যতা অবলম্বন করি তাহলে আহনাফের রেওয়ায়াতগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেহেতু এগুলো কিয়াসের মুওয়াফেক। আর তা হচ্ছে– শিশু ছেলের পেশাব নাপাক হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত, তেমনিভাবে এ বিষয়েও সকলে একমত যে, কাপড় থেকে তা ধৌত করার দ্বারা তা পবিত্র হয়ে যায়। অথবা এটাকে দূর করার দ্বারা বা এটার উপর পানি ছিটায়ে দেয়ার দ্বারাও পাক হয়, তবে পানি ছিটানোর দ্বারা নাপাক দূর হয় না বরং বৃদ্ধি পায়। তাই এ পন্থা অবলম্বন করা যাবে না। আর যুক্তিরও দাবী হলো ছেলে শিশুর পেশাব নাপাক হওয়ার এবং তা পবিত্র করার পদ্ধতি হলো ধৌত করা। ইমাম তৃহাবী বলেন, আমরা যদি তাদের উভয়ের পেশাবের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে, তাদের পেশাবের হুকুম খাদ্যগ্রহণের পর একই রকম। সুতরাং এটার উপর কিয়াস করে বলা যায় খাবারের পূর্বে ধোয়ার হুকুমও একই রকম হওয়া যুক্তির দাবী। (শরহে তৃহাবী)

سؤال : بَيِّنْ وُجُوْهَ الْفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ .

প্রশ্ন ঃ ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর পেশাবের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ উলামায়ে কিরাম ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর পেশাবের মাঝে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য করেন। যথা

(১) শিশু ছেলের পেশাব একই স্থানে পতিত হয়, তার পেশাবের জায়গা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে কিন্তু মেয়ের পেশাব ছড়িয়ে পড়ে তার পেশাবের রাস্তা প্রশস্ত হওয়ার কারণে। সুতরাং ছেলে শিশুর পেশাবের তুলনায়স তার পেশাব অধিক নাপাক হবে।

(২) ছেলে শিশুর পেশাবের হুকুমটা শরীয়তে সহজতর করা হয়েছে। কেননা, লোকেরা ছেলে শিশুকে মেয়ে শিশুর তুলনায় অধিক। মসজিদে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে যায়। সুতরাং তাদের পেশাব থেকে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। আর এর দাবী হলো তাদের হুকুমের ক্ষেত্রে সহজ হওয়া।

(৩) মেয়ে শিশুর পেশাবের থলি পেটের অধিক নিকটে। এজন্য এটা খুব দুর্গন্ধযুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ছেলে শিশুর পেশাব এরূপ নয়।

(৪) মেয়ে শিশুর তবিয়াতে শীতলতা রয়েছে। তাই তার পেশাবের মধ্যে তৈলাক্ততা থাকে। আর ছেলে শিশুর তবিয়তে উষ্ণতা রয়েছে। তাই তার পেশাবে তৈলাক্ত নেই।

(৫) ছেলে শিশুর পেশাব পানি ও মাটি থেকে সৃষ্টি হয়। আর মেয়ে শিশুর পেশাব গোশত ও রক্ত হতে সৃষ্টি হয় সুতরাং এর পেশাব ছেলের পেশাবের তুলনায় অধিক নাপাক হবে। (শরহে তৃহাবী ঃ ৭৩৬)

بَابُ بَوْلِ الْجَارِيَةِ

٣٠٥. اخبرنا مُجاهدُ بْنُ موسى قال حدّثنا عبدُ الرّحمٰنِ بنُ مَهْدِيّ قال حدّثنا يحيى بنُ الوليدِ قال حَدّثني محلُّ بنُ خليفةَ قال حَدّثني ابُو السَّمْحِ قال قال النبيُّ ﷺ يُغسلُ مِن بَوْلِ الجَارِيَةِ ويُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلامِ -

অনুচ্ছেদ ঃ কন্যা শিশুর পেশাব

অনুবাদ ঃ ৩০৫. মুজাহিদ ইবনে মূসা (র).........আবুস সামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ছোট মেয়ের পেশাব ধুয়ে ফেলতে হয়, আর ছোট ছেলের পেশাবের উপর পানি ছিটাতে হয়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

আবুস সামাহ আযাদকৃত গোলাম ও নবী করীম (স) এর খাদেম ছিলেন। আবু যুরআ রাযী সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বলেন, আবুস সামাহ এর মূল নাম আমার জানা নেই। এবং এটা ব্যতীত তার অন্য কোন হাদীস আছে বলেও আমার জানা নেই। আর এই হাদীসের সনদ এটাই যা কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে। বাজ্জার গ্রন্থকারও এমন বর্ণনা করেছেন। মুসান্নিফ (র) আবুস সামাহ এর এই হাদীসকে অল্প অল্প করে দুই জায়গাই উল্লেখ করেছেন। পূর্ণ হাদীসটি তিনি একটি শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেননি। আলোচ্য হাদীসের শুরু অংশ بابُ ذكرِ الْاِسْتِتَارِ عندَ الْاِغْتِسَالِ এর আন্ডারে আসবে, আর শেষাংশ হলো–

فَأُتِيَ أو حُسَيْنٌ فَبَالَ عَلَىٰ صَدْرِيْ فَجِئْتُ اَغْسِلُه فقالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ ....الخ

অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। তথা ছেলের পেশাবকে হালকা ভাবে ধৌত করতে হবে আর মেয়ের পেশাবকে ভালভাবে ধৌত করতে হবে। এটাই সুন্দর ব্যাখ্যা। কারণ এ স্তরের ভিন্নতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وقِتَالُهُ كُفْرٌ ব্যাখ্যাতাগণ বলেন মূলত উভয়ে ফাসেক কিন্তু ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় একটি অপরটি হতে বড়। কেননা, ফিসকের শাখা-প্রশাখার মধ্যে পার্থক্য আছে। ঠিক তদ্রূপ এখানেও বাচ্চা ছেলে ও মেয়ের পেশাবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কাজেই ছেলের পেশাবকে হালকাভাবে ধৌত করতে হবে। এর জন্য رَشٌّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর মেয়ের পেশাবকে ভালোভাবে ধৌত করতে হবে তাহলেই পবিত্র হবে। তাই এর জন্য غَسْل শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এটাই উভয়টার মধ্যে পার্থক্যের কারণ

(শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩৫৬)

بَابُ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

٣٠٦. اخبرنا محمدُ بْنُ عبدِ الْاَعْلٰى قال حَدَّثنا يزيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قالَ حدّثنا سعيدٌ قال حدّثنا قتادةُ اَنّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثهُم انّ أناسًا او رجالًا مِّنْ عُكْلٍ قَدِمُوا على رسولِ اللّٰهِ ﷺ فتكلّموا بِالْإِسْلامِ فقالوا يا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّا اَهْلُ ضَرْعٍ ولَمْ تكُنْ اَهْلَ رِيفٍ وَاسْتَوْخَمُوا المَدِيْنَةَ فَاَمَرَ لَهُم رسولُ اللّٰه ﷺ بِذَوْدٍ وراعٍ وأمَرَهُم انْ يَخْرُجوا فيها فيشربوا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوالِهَا فلمّا صَحُّوا وكانُوا بِناحِيَةِ الحَرَّة كَفَرُوا بعدَ اسلامِهِم وقَتَلُوا راعِىَ النبىّ ﷺ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فبلَغَ النبىَّ ﷺ فبعَثَ الطَّلَبَ فِى دِيارِهِم فأُتِىَ بِهِم فسَمَرُوا اَعْيُنَهُم وقَطَعُوا اَيْدِيَهُم واَرْجُلَهُم ثمّ تَرَكُوا فِى الحَرَّة عَلٰى حَالِهِم حَتّٰى مَاتُوا -

٣٠٧. اخبرنا محمّدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثنا بنُ سلمةَ عَنْ اَبِىْ عبدِ الرَّحِيْم قال حَدَّثَنِى زيدُ بْنُ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُطرفٍ عن يحيى بن سعيدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قالَ قَدِمَ اَعْرَابٌ مِّنْ عُرَيْنَةَ اِلى النبىّ ﷺ فَاَسْلَمُوا فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ حتّى اصْفَرَّتْ اَلْوَانُهُمْ وعَظُمَتْ بُطُونُهم فبَعَثَ بِهِم رَسولُ اللّٰه ﷺ اِلى لِقاحٍ لَهُ وامَرَهُم اَنْ يَشْرَبُوا مِنْ اَلْبانِها واَبْوالِها حتّى صَحُّوا فقَتَلُوا رَاعِيَها وَاسْتَاقُوا الْاِبِلَ فبعَثَ النبىُّ ﷺ فِى طَلَبِهِم فَاُتِىَ بِهِم فَقَطَعَ اَيْدِيَهُم وأَرْجُلَهُم وسَمَرَ اَعْيُنَهُم قال اميرُ المُؤمنينَ عبدُ المَلِكِ لِاَنَسٍ وهُوَ يُحَدِّثُه هٰذا الحديثَ بِكُفْرٍ اَمْ بِذَنْبٍ؟ قال بِكُفْرٍ-

قال ابو عبدِ الرحمٰن لَانَعْلَمُ اَحَدًا قال عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَنَسٍ فِى هٰذا الحديثِ غيرَ طَلْحَةَ والصَّوابُ عِنْدِى واللّٰه تعالىٰ اَعْلَمُ يَحْيٰى عَنْ سعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ مُرْسَلًا -

---

অনুচ্ছেদ ঃ হালাল পশুর পেশাব প্রসঙ্গে

অনুবাদ ঃ ৩০৬. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)........আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। উকল গোত্রের কিছু লোক রাসূলাল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিল। তারপর তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দুগ্ধবতী পশু পালন করি; আমরা কৃষি কাজের লোক নই। মদীনার আবহাওয়া তাদের উপযোগী হলো না। রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে কিছু উট ও একজন রাখাল প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তাদের উটের প্রতিপালনের কাজে মদীনার বাইরে যেতে এবং উটের দুধ ও এর পেশাব পান করার নির্দেশ দিলেন। যখন তারা সুস্থ হয়ে গেল এবং হাররা নামক স্থানে অবস্থান করল তখন তারা ইসলাম ত্যাগ করল। তারা রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক নিযুক্ত রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে গেল। এ খবর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌছলে তিনি তাদের পেছনে অনুসন্ধানকারী দল পাঠালেন। তাদের গ্রেফতার করে আনা হলো। তাদের চোখে লৌহ শলাকা গরম করে লাগান হলো এবং হাত পা কেটে ফেলা হলো। পরে তাদের হাররার জমিতে ঐ অবস্থায় ফেলে রাখা হলো। এভাবে তারা প্রাণ ত্যাগ করল।

৩০৭. মুহাম্মদ ইবনে ওহাব (র).........আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরাইনা নামক স্থান হতে কয়েকজন বেদুইন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করল। মদীনায় বসবাস তাদের উপযোগী হলো না। এমনকি তাদের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবং পেট স্ফীত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের আপন দুগ্ধবতী উষ্ট্রের পালের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। আর তাদেরকে দুধ ও পেশাব পান করার আদেশ দিলেন। এদে তারা সুস্থ হয়ে পড়ল এবং উটের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) তাদের খুঁজে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তাদের ধরে আনা হলে তাদের হাত পা কেটে দেওয়া হলো এবং তাদের চোখে গরম শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালিক আনাস (রা)-এর নিকট এ হাদীস শুনে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, এ শাস্তি কি কুফরের জন্য, না গুনাহের জন্য? তিনি বললেন, কুফরের জন্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

প্রথম হাদীস সম্পর্কে আলোচনা

سؤال : أَوْضِحْ قَوْلَهُ عليه السلام وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) এর বাণী وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ এর ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ اِسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ এর বিশ্লেষণ ঃ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ অর্থ কোন জায়গার আবহাওয়া প্রতিকূল হওয়া। অতএব, اِسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ এর অর্থ হচ্ছে মদীনার আবহাওয়া তাদের প্রতিকূল হলো, এ উক্তি দ্বারা এখানে উকলও উরাইনা গোত্রের লোকদের মদীনায় আগমনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উকল ও উরাইনা গোত্রের লোকেরা মদীনায় এলে তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে যা খায় তা হজম হয় না, ফলে পেট ফুলে গেল এবং চেহারা হলুদ বর্ণ হয়ে গেল। এজন্যে রাসূল (স) ঔষুধ হিসেবে তাদেরকে উটের পেশাব ও দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন। (শরহে নাসায়ী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং-২৬৬)

سؤال : ما الاختلافُ بَيْنَ الائمةِ الكِرام فِى بَوْلِ مَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ حَرِّرْ مُدَلَّلاً ومُرَجِّحًا .

প্রশ্ন ঃ হালাল প্রাণীর পেশাবের ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে মতানৈক্য কি? দলীল প্রমাণ সহকারে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ হালাল প্রাণীর পেশাবের বিধান ঃ যে সব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল তাদের পেশাব পবিত্র না অপবিত্র, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো–

(১) ইমাম মালেক, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম বুখারী (রা) এর মতে, হালাল প্রাণীর পেশাব পবিত্র। তাদের দলীলগুলো নিম্নরূপ–

(١) انَّه صلى الله عليه وسلم قالَ لَابَأْسَ بِبَوْلِ مَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ

(٢) قال صَلَّى الله عليه وسلَّم اشْرَبُوْا مِنْ اَبْوالِهَا وَاَلْبَانِهَا .

অতএব, যদি উটের পেশাব পাক না হতো, তাহলে নবী (স) তাদেরকে পান করার নির্দেশ দিতেন না।

(২) আহলে জাহেরের মতে গোশত হালাল হোক বা হারাম হোক সকল প্রাণীর পেশাব পবিত্র। তবে মানুষ, কুকুর ও শূকরের পেশাব সর্বাবস্থায় অপবিত্র।

(৩) ইমাম শাফেয়ী ও আবু হানীফা (রা) এর মতে সকল প্রাণীর পেশাব অপবিত্র। চাই গোশত হালাল হোক বা হারাম হোক। তাদের দলীলগুলো হচ্ছে– হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীস (١) اِسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عامةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ তোমরা পেশাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, অধিকাংশ কবরের আযাব এর কারণেই হয়। এ হাদীসের থেকে প্রমাণিত হয় যে, সকল প্রকার পেশাব নাপাক।

দ্বিতীয় দলীল ঃ হযরত সাআদ (রা) এর ঘটনা যাতে রয়েছে যে, দাফনের পর তাকে কবর খুব জোরে চাপ দিয়েছিল। এক রেওয়ায়াতে এটা বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) এই সংবাদ শুনার পর বলেছেন এ শাস্তি ছিল তার পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে–

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَتَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ

এ হাদীস দ্বয়ে بول কে আম রাখা হয়েছে। তাই সকল প্রাণীর পেশাব অপবিত্র। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও প্রাণীর পেশাব যে অপবিত্র তা বুঝা যায়–

اِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِيْنَ (سورة النحل)

কেননা, এ আয়াতে নাপাকের মধ্য থেকে দুধ বের করার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বুঝা গেল মলের ন্যায় মূত্রও নাপাক।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু হানীফা (রা) এর পক্ষ থেকে জবাব ঃ

প্রতিপক্ষের দলীলগুলোর উত্তরে বলা যায়– (১) রাসূল (স) উকল ও উরাইনা গোত্রকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে উটের পেশাব পান করার অনুমতি দিয়েছেন। সাধারণ ভাবে অনুমতি দেননি।

(২) اِشْرَبُوا مِنْ اَبْوَالِهَا হাদীসটি মানসুখ হয়ে গেছে।

(৩) তাহারাত ও নাজাসাত এর মধ্যে বেপরীত্য দেখা দিলে অপবিত্রতার দিক প্রাধান্য লাভ করবে।

(৪) অথবা, বলা যায় তাদেরকে দুধ পান করার আর উটের পেশাব প্রলেপ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই মূল ইবারত হবে ঃ اِشْرَبُوا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاضْمِدُوا مِنْ اَبْوَالِهَا

(৫) ইবনে হাযম বলেন, তাদের দ্বিতীয় হাদীসটি দুর্বল। কেননা, বর্ণনাকারী مِسْوَار بنُ مُصْعَبْ একজন খ্যাতনামা রাবী নন। মূলত ماكول اللحم প্রাণীর পেশাব অপবিত্র।

(৬) রাসূল (স) ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছিলেন যে, উটের পেশাব পান করা ব্যতীত তাদের আরোগ্য এবং বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আর তারা মাযূরের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। মাযূর ব্যক্তির জন্যে নাপাক ব্যবহার করা বৈধ এবং পান করা জায়েয।

(৭) উল্লেখিত হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। মানসুখ হওয়ার দলীল হলো এই হাদীস সংশ্লিষ্ট অনেক হুকুমকে ইমাম মালেক ও হাম্বলীগণ মানুসুখ মানেন। যেমন এই হাদীসে মোসলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সবার মতে এই হুকুম মানসুখ হয়ে গেছে।

(৮) মূলত ঃ রাসূল (স) তাদেরকে দুধ পান করার আদেশ দিয়েছিলেন। পেশাব পান করতে বলেননি কিন্তু তারা পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী দুধের সাথে পেশাবও পান করেছে। অনেক রেওয়ায়াতে শুধু দুধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– اِشْرَبُوا مِنْ اَلْبَانِهَا

এ রেওয়ায়াতে ابوال এর কথা উল্লেখ নেই কিন্তু কোন রাবী ধারণার বশবর্তী হয়ে البان এর সাথে ابوال কেও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এটা দলীলের উপযুক্ত নয়।

(৯) এটা প্রয়োজনের কারণে বৈধ করা হয়েছে। সুতরাং এটাকে তার স্থানে সীমাবদ্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত অতএব এই সকল উত্তর থেকে বুঝা যায় যে, হালাল প্রাণীর পেশাব অপবিত্র। তাছাড়া আমাদের বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এটা নাপাক। তাছাড়া যুক্তির দাবী হলো হালাল প্রাণীর পেশাব তার রক্তের تابع। সুতরাং রক্ত যেহেতু নাপাক, এজন্য এর পেশাবও নাপাক হবে। এটা গোশতের হুকুমে হবে না। (শরহে ত্বহাবী ঃ ৭৩৩, শরহে নাসায়ীঃ ১/১৬৭)

سؤال : ماحُكْمُ التَّدَاوِى بِالحَرامِ

প্রশ্ন ঃ হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণের বিধান বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ যদি কোন ব্যক্তির হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করার একান্ত প্রয়োজন হয় যে, টা ব্যতীত তার জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে তার জন্য হারাম বস্তু দ্বারা প্রয়োজন মোতাবেক চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েয। এটা সকলের অভিমত। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আর যদি নিরুপায় না হয় তবে এ ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে–

(১) ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেন, চিকিৎসার জন্য হারাম বস্তু ব্যবহার করা সর্বাবস্থায় জায়েয।

(২) ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, যদি কোন বিজ্ঞ ডাক্তার বলে থাকেন যে, এটা ব্যতীত তার কোন ঔষধ নেই তাহলে জায়েয অন্যথায় জায়েয নেই।

(৩) ইমাম ত্বাহাবী (র) বলেন, মদ ব্যতীত সকল প্রকার হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয।

(৪) ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র) এর মতে মুতলাকভাবে জায়েয।

ইমাম মালেক (র) এর দলীল ঃ তার দলীল হলো অধ্যায়ের আলোচ্য হাদীস। যদি এটা নাজায়েয হত তাহলে রাসূল (স) এর দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশ দিতেন না।

ইমাম আবু হানীফা (রা) এর দলীল ঃ ১

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلّى الله عليه وسلم اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا لَاتَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ـ

অর্থাৎ হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা রোগ ও ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। আর প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর এবং হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ কর না।

দলীল ঃ ২ عن امّ سلمة قالت قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم انّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَائَكُمْ فِىْ حَرَامٍ

অর্থাৎ হযরত উম্মে সালামা (রা) এর বর্ণনা, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য আরোগ্য রাখেন নি।

দলীল ঃ ৩ عَنْ ابْنِ مسعودٍ رضى الله عنه قال مَا كَانَ اللّٰهُ يَجْعَلُ فِىْ رِجْسٍ او فِيْمَا حَرَّمَ شِفَاءً.

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর বর্ণনা, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা নাপাকী অথবা হারাম জিনিসের মধ্যে আরোগ্য রাখেন নি।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ তাদের বর্ণিত হাদীসে উরাইনিয়্যিন এর উত্তর হলো এ হাদীসে বর্ণনাকারীগণের মধ্যে প্রত্যেকেই শুধু দুধের কথা বর্ণনা করেছেন। হযরত কাতাদা ব্যতীত কোন বর্ণনাকারী পেশাবের কথা বর্ণনা করেননি। সুতরাং এখানে বিশ্লেষণ রয়েছে। হতে পারে এটা হযরত কাতাদার পক্ষ হতে ভ্রম হয়েছে। অতএব, এটা দলীল হওয়ার যোগ্য নয়। আর যদি আমরা এটাকে সহীহ মেনে নিই, তাহলে আমরা বলব এটা আল্লাহ তায়ালার এই আয়াত يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ দ্বারা মানসূখ হয়েগেছে। অথবা, এটা রাসূল (স) এর বাণী اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ দ্বারা রহিত হয়েগেছে। যেমনিভাবে এর অন্যান্য অংশ রহিত হয়েগেছে। কেননা, এই হাদীসে মুসলা ও আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়ার কথাও উল্লেখিত রয়েছে। অথচ এগুলো সকলের নিকটেই মানসূখ হয়েগেছে। এছাড়াও তাদের দলীল আর আমাদের দলীলের মধ্যে তায়ারুজ হচ্ছে। আমাদের দলীলটি হারাম বর্ণনা করছে। আর তাদের দলীলটি হালাল বর্ণনা করছে। আর এরূপ তায়ারুজের ক্ষেত্রে হারাম প্রাধান্য পায়। (শরহে ত্বহাবী ঃ ৭৩৪)

سؤال : قوله انّ رجالاً مِّن عُكْلٍ معَارِضٌ لِرِوَايَةٍ أُخرى أنّهم مِنْ عُرَيْنَةَ فكيف التّوفيقُ بينهما ـ

প্রশ্ন ঃ এক বর্ণনা মতে লোকটি উকল গোত্রের অন্য মতে উরাইনা গোত্রের উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য কি?

উত্তর ঃ প্রশ্নে উল্লিখিত দ্বন্দ্বের সমাধান–

এক হাদীসে বলা হয়েছে اِنّ رِجَالاً مِّن عُكْلٍ قَدِمُوا المَدِيْنَةَ এ অংশ দ্বারা বুঝা যায় আগত লোকজন উকল গোত্রের তবে অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় সকলেই উরাইনা গোত্রের লোক, যেমন– اِنَّهُمْ مِنْ عُرَيْنَةَ অতএব, বর্ণনাদ্বয়ে বৈপরীত্য বিরাজমান। এ বৈপরীত্যের সমাধান বলা যায়–

(১) আগত লোকজন উভয় গোত্রের ছিল। তাই একেক স্থানে একেক গোত্রের কথা বলা হয়েছে।

(২) ইবনে ইসহাক (র) বলেন, একই গোত্রের দুটি নাম ছিল। আগের নাম হচ্ছে উকল, আর নতুন নাম হচ্ছে উরাইনা। তাই বর্ণনাকারী কোন স্থানে পূর্বের নাম, কোন স্থানে নতুন নাম, আবার কোন স্থানে উভয় নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন–

(١) عن أنسٍ (ص) قال قَدِمَ أُناسٌ مِّنْ عُكْلٍ او عُرَيْنَةَ

(٢) عن انسٍ (رض) أنّ رجلاً مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلم ـ

(٣) عن انسٍ (رض) قال قَدِمَ اعرابٌ مِّن عُرينَةَ اِلى النبىّ فَاَسْلَمُوا ـ

(৩) ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উকল হচ্ছে উরাইনা গোত্রের শাখা। তাই কোন স্থানে اصل এর নাম, কোন স্থানে فرع আবার কোন স্থানে فرع ও اصل উল্লেখ করা হয়েছে। (শরহে নাসায়ী ঃ ১/২৬৮)

سؤال : كيفَ فَعَلَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ مَافَعَلَ وهُوَ رحمةٌ لِلعَالَمِيْنَ؟ ثم اكتُب كَم قِسمًا لِلْحُدودِ الشّرعيّةِ التى ذُكِرَتْ فِى القُرآنِ الكريمِ؟ بيِّن موضحًا ـ

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) তাদের সাথে এমনটা কিভাবে করেছেন, অথচ তিনি ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন?

উত্তর ঃ রাসূল (স) কর্তৃক শাস্তিদানের সঙ্গত কারণ

রাসূল (স) হলেন رحمةً لِلعَالَمِين বা বিশ্ববাসীর জন্যে কল্যাণের আধার। যেমন আল্লাহর বাণী রয়েছে– وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ তাহলে কিভাবে তিনি উকল ও উরাইনাদেরকে এমন শাস্তি দিলেন, এর জবাব হচ্ছে–

(১) কিসাস হিসেবে তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছেন। কেননা, কুরআনে বলা হয়েছে–

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .....الخ

(২) অথবা, বলা যায় جَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا হিসেবে অর্থাৎ মন্দের প্রতিদান মন্দ দ্বারাই হবে। এ হিসেবে শাস্তি দিয়েছেন।

(৩) যেহেতু তারা মুরতাদ হয়ে গেছে, সেহেতু এ দন্ড আরোপ করা হয়েছে। مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

(৪) যাদের কুফর চূড়ান্ত তাদেরকে এ ধরনের শাস্তি দেয়া رحمة للعالمين হওয়ার পরিপন্থী নয়।

(৫) অথবা, তা পরোক্ষভাবে মুসলমানদের সাহস যোগানোর উদ্দেশ্যে ছিল।

মোটকথা, রাসূল (স) যা কিছু করতেন, আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ মোতাবেক করতেন। অতএব এটাও তিনি আল্লাহর নির্দেশ মতেই করেছিলেন, এক্ষেত্রে তার স্বেচ্ছাচারিতার কোন অবকাশ ছিল না। (শরহে নাসায়ী ঃ ১/২৬৮)

শরয়ী দন্ডবিধির প্রকারভেদ

حُدُوْدٌ শব্দটি حَدٌّ এর বহুবচন। এর অর্থ দন্ড ও শাস্তি। حُدود شَرعِيَّة অথবা শরয়ী দন্ডবিধি বলতে, পবিত্র

কুরআনে যেসব অপরাধের জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। সেগুলোকে حُدود شرعيّة বলা হয়। শরয়ী দণ্ডবিধি মোট পাঁচ প্রকার। যেমন–

(১) حدّ قِصاص তথা মৃত্যুদণ্ড ঃ ইচ্ছা করে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। যেমন, কুরআনের ভাষায়– وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ

(২) حدّ السَّرِقَة তথা চুরির শাস্তি। এর শাস্তি হচ্ছে, হাত কাটা তবে শর্ত হচ্ছে চুরির মাল কমপক্ষে ১০ দিরহাম পরিমাণ হতে হবে। আল কুরআনের ভাষায়– السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ

(৩) حدّ الزِنَا তথা ব্যভিচারের শাস্তি ঃ এর শাস্তি হচ্ছে, যদি ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিনী অবিবাহিত হয়। তাহলে একশ বেত্রাঘাত, আর বিবাহিত হলে রজম বা পাথর মেরে হত্যা করা। যেমন আল্লাহর বাণী–

(١) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ

(٢) الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ

(৪) حد قذف তথা মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ঃ এর শাস্তি হচ্ছে, ৮০টি বেত্রাঘাত। আলকুর আনে ইরশাদ হচ্ছে– اَلَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً

(৫) حدّ قَطْعِ الطَّرِيْق তথা ডাকাতির শাস্তি ঃ এর শাস্তি অবস্থাভেদে কয়েক রকমের হতে পারে। যেমন– (ক) হত্যা করা, (খ) শূলি দেয়া, (গ) হাত কাটা, (ঘ) নির্বাসন দেয়া। যেমন সূরা আল মায়িদায় ইরশাদ হচ্ছে–

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ -

سؤال : متى قدم رجالٌ مِّنْ عُكْلٍ اوعُرَيْنَةَ على رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم؟ وكَمْ كَانَ عَدَدُهُمْ؟ ومَا اسْمُ رَاعِى رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم؟ وَمَاكَانَ سَبَبُ قَتْلِهٖ؟

প্রশ্ন ঃ উকল ও উরাইনা গোত্র থেকে কখন লোকগুলো রাসূল (স) এর কাছে এসেছিল, তাদের সংখ্যা কত? এবং রাসূল (স) এর রাখালের নাম কী ছিল? তাকে হত্যার কারণ কি?

উত্তর ঃ অত্র ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময়কাল

উকল ও উরাইনাদের ঘটনা কবে ঘটেছে, এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো–

(১) ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক (র) এর মতে, ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে ذى قرد যুদ্ধের পর উরাইনাদের ঘটনা ঘটেছে।

(২) কেউ কেউ বলেন, ৭ম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে।

(৩) কারো কারো মতে ৮ম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে।

আগত লোকদের সংখ্যা ঃ উরাইনা ও উকল গোত্রের আগত লোক সংখ্যা কত ছিল এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত অভিমত পাওয়া যায়– (১) আল্লামা সুয়ূতী (র) এর মতে তারা মোট ৪ জন ছিল।

(২) আল্লামা শাওকানী (র) বলেন, তার ছিল ৩ জন।

(৩) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) এর মতে তারা মোট ৭ জন ছিল। চারজন ছিল উরাইনা গোত্রের তিনজন উকল গোত্রের। আরেক বর্ণনা মতে অন্য গোত্রের (ও একজন ছিল)।

(৪) ইবনে হযম (রা) এর মতে, তাদের সংখ্যা ছিল ১০ জন। (শরহে নাসায়ী ঃ ১/২৭০-২৭১)

سؤال : نَهَي النبيّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُثْلَةِ فما هو جَوابُكَ عن هذا الحديثِ؟ ثم بَيِّنْ مَا مَعْنَى الْمُثْلَةِ؟ بَيِّنْ مَذاهِبَ الائمّة فِي حُكمِ الْمُثْلَةِ.

প্রশ্ন ঃ রাসূল (স) অঙ্গবিকৃতি করতে নিষেধ করেছেন, তাহলে এ হাদীসের বর্ণনা সম্পর্কে তোমার মতামত কি? এর অর্থ কী ঃ আলেমদের মতামতসহ মুছলার বিধান বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ مُثْلَة এর বিধান ঃ ফিকহে ইসলামির পরিভাষায় ঃ مثلة হচ্ছে جَدْعُ الْاَنْفِ وَالْاُذُنِ وشيئًا مِّن اَطرافِ الْاِنْسانِ অর্থাৎ মানুষের হাত পা বা অন্য কোন অঙ্গ কর্তন করা। রাসূল (স) শত্রুকে মুছলা করা থেকে নিষেধ করেছেন। যেমন কিতাবুল মাগাযীতে উল্লেখ আছে–

قال قتادة (رض) بَلَغَنا انّ النبيّ صلعم بعدَ ذلِكَ كانَ يَحُثُّ عَلى الصَّدَقَةِ وَيَنْهى عَنِ الْمُثْلَةِ .

এজন্যে আলেম ও ফকীহগণ একথার উপর একমত হয়েছেন যে, مثلة করা জায়েয নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মুছলা নিষিদ্ধ হলে উরাইনা ও উকলের লোকজনকে কেন মুছলা করা হলো? এর জবাব হচ্ছে,

(১) حديث النهى এর আগে উরাইনাদেরকে মুছলা করা হয়েছে। তাই বলা যায় مشروعيّة مُثْلَة মানসূখ হয়েগেছে।

(২) ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন– كَانَ قِصاصًا لِانّهم سَمَرُوا عَيْنَ الرَّاعِى وَقَطَعُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ অর্থাৎ এটা কিসাস হিসেবে জায়েয হয়েছে। কেননা, তারা প্রথমে রাখালের চোখ উপড়ে ফেলেছে এবং হাত ও পা কেটে ফেলেছে।

(৩) অথবা, বলা যায়, তাদের মুছলা سِياسَةً তথা শাসনস্বরূপ করা হয়েছে, قَضاءً বা বিচারস্বরূপ করা হয়নি।

(৪) কেউ কেউ বলেন, نَهْىُ الْمُثْلَةِ لِلتَّنْزِيْهِ আর উরাইনাদের অপরাধের সংখ্যাধিক্যের কারণে শাস্তিও কয়েক ধরনের হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ .

مُثْلَةٌ এর আভিধানিক অর্থ ঃ مُثْلَةٌ শব্দটি فُعْلَةٌ এর ওযনে বাবে نَصَرَ . يَنْصُرُ এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে اَلْجَدْعُ . وَالْقَطْعُ তথা অঙ্গ ছেদন করা, কাটা, ছিন্নভিন্ন করা।

مُثْلَة এর পারিভাষিক অর্থ ঃ পরিভাষায় মুছলা হলো جَدْعُ الْاَنْفِ وَالْاُذُنِ وشيئًا مِنْ اَطرافِ الْاِنْسانِ অর্থাৎ মানুষের নাক, কান, অথবা অন্য কোন অঙ্গ কর্তন করা।

مُثْلَة এর বিধান ঃ মূলত সকল ফিকহ বিশারদ এ কথার উপর একমত হয়েছেন যে, শত্রুকে মুছলা করা জায়েয নেই। কেননা, (১) হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন–

بَلَغَنا اَنّ النبيّ صلعم بعدَ ذلك كانَ يحث على الصدقة وينهى عن المثلة .

(২) জুমহুর আলেমদের মতে মুছলা আদৌ জায়েয নেই। কেননা, এতে تبديل خلق এর অপরাধ সংঘটিত হয়। আর রাসূল (স) মুছলা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন কাতাদাহ বলেন–

ان النبيّ صلى الله عليه وسلم يَنْهانا عَنِ الْمُثْلَة

(৩) ইমাম শাফেয়ী (রা) বলেন, সাধারণত মুছলা জায়েয নেই তবে قِصاص بالْمُثْلَة হিসেবে জায়েয আছে। যেমনটি রাসূল (স) উরাইনা ও উকল গোত্রের একদল লোকের ক্ষেত্রে করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এটাও জায়েয নয়। حديث نهى এর আগে তাদেরকে মুছলা করা হয়েছে, অথবা, শাসনস্বরূপ এমন করা হয়েছে। বর্তমানে এ হুকুম মানসূখ হয়েগেছে। (শরহে নাসায়ী ঃ ১/২৭–১–২৭২)

দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে আলোচনা

سؤال : فِيْ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم اِلٰى لِقَاحٍ لَهُ وفى رواية فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَأْتُوْا اِبِلَ الصَّدَقَةِ فَمَا هُوَ التَّطْبِيْقُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ؟

প্রশ্ন ঃ অত্র বর্ণনানুযায়ী রাসূল (স) তাদেরকে উটের নিকট পাঠিয়েছিলেন, অন্য বর্ণনা মতে তাদেরকে সদকার উটের নিকট পাঠিয়েছিলেন। উভয় বর্ণনায় বৈপরীত্যের সামঞ্জস্য বিধান কর?

উত্তর ঃ দু বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধান

আলোচ্য হাদীসের বর্ণনায় পাওয়া যায়, উকল এবং উরাইনা গোত্রের কতিপয় লোক হুজুর (স) এর নিকট এসেছিল দ্বীন সম্পর্কে জানার জন্যে কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। বিধায় তারা রাসূল (স) এর কাছে অভিযোগ করলো, রাসূল (স) তাদেরকে সদকার উটের কাছে পাঠালেন এবং উটের পেশাব ও দুধ পান করার জন্যে আদেশ করলেন, অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে– রাসূল (স) তাদেরকে বললেন, অমুক জায়গায় উটের কাছে যাও এবং তার পেশাব ও দুধ পান কর। উভয় বর্ণনার শব্দানৈক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এর সমাধানে বলা যায় মূলত বর্ণনাদ্বয়ে কোন প্রকার বৈপরীত্য নেই। কারণ, রাসূল (স) এক উক্তিতে সদকার উটের কথা বলেছেন, অন্য উক্তিতে সদকার কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু উভয় বর্ণনাতেই উটের কথা উল্লেখ আছে। অতএব, উটগুলো রাসূল (স) এর ব্যক্তিগত উট না হয়ে সদকার উট হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব, উভয় হাদীসে কোন বৈপরীত্য নেই। অথবা, বলা যায়, ঘটনাটি আলাদা আলাদাভাবে সংঘটিত হয়েছিল। মোটকথা, রাসূল (স) তাদেরকে উটের পেশাব ও দুধ পান করার আদেশ দিয়েছিলেন চাই তা সদকার উট হোক বা অন্য উটই হোক।

سؤال : بَيِّنْ اَقْوَالَ الائمة فِى مَعْنَى فَاجْتَوُوا الْمَدِيْنَةَ مُفَصَّلًا .

প্রশ্ন ঃ فَاجْتَوُوا الْمَدِيْنَةَ **এর অর্থ সম্পর্কে আলেমদের মতামত বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ فَاجْتَوُوا الْمَدِيْنَةَ **এর বিশ্লেষণ ঃ** اِجْتَوُوا অর্থ কেজায়গার আবহাওয়া প্রতিকূল হওয়া। এ উক্তি দ্বারা এখানে উকল ও উরাইনা গোত্রীয় কতিপয় মীনায় আগমনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উকল ও উরাইনা গোত্রের লোকজন মদীনায় এলে তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। যা খায় তা হজম হয় না। ফলে পেট ফুলে যায় এবং চেহারা হলুদ বর্ণ হয়ে যায়। এজন্যে রাসূল (স) ঔষধ হিসেবে তাদেরকে উটের পেশাব ও দুধ পান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (শরহে নাসায়ী ঃ ১/২৭৭)

سؤال : حَقِّقِ اللِّقَاحَ ثم بيّن كَمْ كَانَ لِقَاحًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَمَتٰى وَقَعَتْ وَاقِعَةُ الْعُرَنِيِّيْنَ؟ اذكر قِصَّتَهُمْ بِالْاِيْجَازِ .

প্রশ্ন ঃ لقاح **শব্দের বিশ্লেষণ কি? অতঃপর বর্ণনা কর রাসূল (স) এর কয়টি** لقاح **ছিল এবং উরাইনাদের ঘটনা কখন সংঘটিত হয়েছিল ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ কর।**

উত্তর ঃ لِقاح **এর আভিধানিক অর্থ ঃ** لقاح শব্দটির لام বর্ণে যের যোগে বহুবচনের শব্দ। একবচন لَقُوْحٌ আভিধানিক অর্থ হলো অধিক দুধ দানকারীনী উটনী।

لقاح **এর পারিভাষিক অর্থ ঃ** لقاح (১) এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মু'জামুল ওয়াসিত ও লিসানুল আরব গ্রন্থকার বলেন– هُوَ مَاءُ الْفَحْلِ مِنَ الْاِبِلِ وَالْخَيْلِ وَغَيْرِهَا

উরাইনাদের ঘটনার সময়কাল ঃ উরাইনাদের ঘটনা কখন সংঘটিত হয়েছিল এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন–

(১) ইবনে ইসহাক (রা) এর মতে ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে ذى قرد যুদ্ধের পরে ওরাইনাদের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

(২) কারো মতে ৭ম হিজরী কারো মতে ৮ম হিজরীতে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।

মীনায় আগমন ঃ পবিত্র ইসলামের আদর্শে বিমুগ্ধ আরববাসীদের ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণের এক পর্যায়ে আরবের উকল ও উরাইনা গোত্রের কতিপয় লোক ৬ষ্ঠ হিজরীতে মদীনায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদীনায় বসবাস শুরু করে।

চারণভূমিতে গমন ও পেশাব পান ঃ মদীনার নতুন আবহাওয়া ওরাইনাদের স্বাস্থ্যের অনুকূলে ছিল না। ফলে তারা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ এ দলটি রাসূল (স) এর নিকট তাদের অবস্থা জানালে রাসূল (স) তাদেরকে মদীনার দক্ষিণে সদকার উটের চারণভূমিতে গমন করে উটের দুধ ও পেশাব পান করার পরামর্শ দেন। ফলে তারা সেখানে চলে যায় এবং নির্দেশানুসারে পেশাব পান করে।

রোগমুক্তির প্রতিদানে বিশ্বাসঘাতকতা ঃ রাসূল (স) এর পরামর্শ অনুসারে উটের দুধ ও পেশাব পান করে তারা সুস্থ হয়ে উঠল। এ দিকে তাদের মাথায় শয়তানি বুদ্ধির উদয় হয়। তাদের শরীরে পুনরায় শক্তি ফিরে আসলে ধর্মদ্রোহীতার বশবর্তী হয়ে তারা পরিকল্পিতভাবে রাসূল (স) এর সদকার উটের রাখাল ইয়াসারকে নির্মমভাবে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঝটিকা বাহিনী প্রেরণ ও গ্রেপ্তার ঃ উরাইনা গোত্রের এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পেয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্যে রাসূল (স) বিশ জনের একটি ঝটিকা বাহিনী পাঠান। এ বাহিনীর সদস্যরা উট লুণ্ঠনকারী বিশ্বাসঘাতকদেরকে গ্রেফতার করে রাসূল (স) এর হাতে তুলে দেন।

শাস্তি প্রদান ঃ বিচারে রাসূল (স) বিশ্বাসঘাতকদের ব্যাপারে রায় দেন যে, রাখাল ইয়াসারকে তারা যেভাবে হত্যা করেছে তাদেরকে ও ঠিক সেভাবেই হত্যা করা হবে। অতঃপর হাত পা কেটে চক্ষু উৎপাটন করে তপ্ত বালুর উপরে তাদেরকে আমৃত্যু ফেলে রাখা হয়। ফলে তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করে। (শরহে নাসায়ী ঃ ১/২৭৭-৭৮-৭৯)

তাত্ত্বিক আলোচনা

মুসান্নিফ (র) পূর্বের অনুচ্ছেদে শিশু ছেলে-মেয়ের পেশাবের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করেছেন, অতঃপর আলোচ্য শিরোনাম কায়েম করে যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল নয় তাদের পেশাবের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।

একটি আপত্তি ও তার অবসান

প্রশ্ন ঃ সকল উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কাউকে হত্যা করা হয় এবং সে হত্যা হওয়ার পূর্বে পানি চায় তাহলে তাকে পানি দেয়া চাই, বাধা দেয়া উচিত নয়। তাহলে উরাইনার লোকদেরকে কেনো পানি দেয়া হলো না?

উত্তর ঃ ১. আল্লামা নববী (র) বলেন, তারা ছিল ধর্মদ্রোহী, আর ধর্মদ্রোহীদের প্রতি সহনশীল হওয়ার কোন অবকাশ নেই। কাজেই তাদেরকে পানি প্রদান করা হয়নি।

২. কোন কোন ব্যাখ্যাতা বলেন, তাদের ডাকাতির কারণে হুজুর (স) এর পরিবার সে দিন দুধ পায়নি। ফলে তারা তৃষ্ণার্ত থাকে। তখন নবী (স) তাদের উপর বদ দুআ করেন যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তৃষ্ণার্ত রাখুন যেভাবে তারা (নবী) পরিবারকে তৃষ্ণার্ত রেখেছে। কাজেই তারা পানি থেকে বঞ্চিত হয়। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ

بَابُ فَرْثِ مَا يُوكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٣٠٨. اخبرنا احمدُ بْنُ عُثمانَ بْنِ حكيمٍ قال حَدَّثَنا خالدٌ يَعْنِي ابنُ مَخْلدٍ قال حَدَّثَنا عَلِيٌّ وهو ابنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي اسحٰقَ عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونٍ قال عَبْدُ اللّٰهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ قَال كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ عِنْدَ الْبَيْتِ وَمَلَأٌ مِّنْ قُرَيْشٍ جلوسٌ وقَدْ نَحَرُوا جُزُوْرًا فَقَال بَعْضُهُمْ أَيُّكم يَأْخُذُ هٰذا الْفَرْثَ بِدَمِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتّٰى يَضَعَ وَجْهَهُ سَاجِدًا فَيَضَعُه يَعْنِي عَلٰى ظَهْرِه قال عبدُ اللّٰه فَانْبَعَثَ اَشْقَاهَا فَاَخَذَ الْفَرْثَ فَذَهَبَ بِه ثُمَّ أَمْهَلَهُ فَلَمَّا خَرَّ سَاجِدًا وَضَعَهُ عَلٰى ظَهْرِه فَاُخْبِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ وَهِيَ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ تَسْعٰى فَاَخَذَتْه مِنْ ظَهْرِه فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ قَالَ اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلٰثًا اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِاَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وشيبةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَة وعُقْبَة بْنِ اَبِيْ مُعَيْطٍ حَتّٰى عدَّ سَبْعَةً مِّنْ قُرَيْشٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰه فَوَالَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتابَ لَقَدْ رَاَيْتُهُمْ صَرْعٰى يَوْمَ بَدْرٍ فِي قُلَيْبٍ وَاحِدٍ -

অনুচ্ছেদ ঃ হালাল পশুর গোবর বা মল কাপড়ে লাগা প্রসঙ্গে

অনুবাদ ঃ ৩০৮. আহমদ ইবনে উসমান ইবনে হাকীম (র)........আমর ইবনে মায়মুন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আমাদের নিকট বায়তুলমাল সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বায়তুল্লাহর নিকট নামায আদায় করছিলেন। তখন একদল কুরায়শ তথায় উপবিষ্ট ছিল। তারা একটি উট যবেহ করেছিল। তাদের একজন বলল, তোমাদের মধ্যে কে এর রক্ত মাথা উদরস্থিত গোবর (নাড়ি-ভূড়িসহ) নিয়ে তার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারবে, তারপর যখন সে সিজদায় কপাল ঠেকাবে তখন তা পিঠের উপর স্থাপন করবে? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এরপর তাদের সবচাইতে নিকৃষ্ট প্রস্তুত হলো এবং গোবরযুক্ত নাড়ি-ভুড়ি হাতে নিয়ে অপেক্ষায় রইল, যখন তিনি সাজদায় গেলেন, তখন তা তাঁর পিঠের উপর রাখল। তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা ফাতিমা (রা)-এ খবর প্রাপ্ত হলেন– এ সময় তিনি ছিলেন অল্প বয়স্কা। তিনি দৌড়ে এলেন এবং তাঁর পিঠ হতে তা সরিয়ে ফেললেন। যখন তিনি নামায শেষ করলেন তখন তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! কুরায়শকে ধর। হে আল্লাহ! আবু জাহল ইবনে হিশাম, শায়বা ইবনে রবীআ, উৎবা ইবনে রবীআ, উকবা ইবনে আবু মুয়িত প্রমুখকে পাকড়াও কর। এভাবে তিনি কুরায়শদের সাতজনের নাম উল্লেখ করলেন। আবদুল্লাহ বলেন, সে আল্লাহর কসম যিনি তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাদের সকলকে বদরের দিন একই গর্তে মৃত অবস্থায় পতিত দেখেছি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

পূর্বের অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কিত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম মালেক (র) যেমনিভাবে হালাল প্রাণীর পেশাবকে পাক বলেন ঠিক তদ্রূপ তার গোবরকেও পাক বলেন, দাউদে জাহেরীও একথার প্রবক্তা। মুসান্নিফ (র)ও একথার প্রবক্তা। তিনি তার মতের উপর অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

প্রমাণ ঃ যখন হুজুর (স) সাজদায় গেলেন তখন সব থেকে হতভাগা উকবা ইবনে আবী মুয়িত। গোবর যুক্ত নাড়ি ভূঁড়ি হুজুর (স) এর পিঠের উপর রেখে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবী (স) নামায ছেড়ে দেননি। বরং নামায বহাল

রেখেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, গোবর অপবিত্র নয়। কাজেই কাপড়ে লাগার দ্বারা তা অপবিত্র হবে না। যদি নাপাকই হতো তাহলে হুজুর (স) কখনই তা সহকারে নামায আদায় করতেন না। ইমাম নাসায়ী (র) হালাল প্রাণীর পেশাব পাক বললেও এক্ষেত্রে জুমহুরের বক্তব্য হলো গোবর ইত্যাদি নাপাক। তাদের বক্তব্য হলো নামাযের শুরুতে যেমনি পবিত্রতা অর্জন করা শর্ত ঠিক তদ্রূপ নামাযের মধ্যখানেও পবিত্র থাকা শর্ত। কেননা, নামাযের কোন অংশ পবিত্রতা ছাড়া বৈধ নয়। জুমহুরের পক্ষ হতে অনুচ্ছেদের হাদীসের অর্থ হলো রুকন পূর্ণ হওয়ার আগেই তার উপর হতে নাড়ি ভুঁড়িকে সরিয়ে দেয়া হয়। অথবা, নামাযের মধ্যে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকার কারণে তার উপর যে ভূড়ি চাপা দেয়া হয়েছে তা উপলব্ধি করতে পারেন নি বা তাঁর গায়ে যে নাপাক লেগেছে এটা জানা ছিল না। বা হতে পারে যে, নবী (স) নামাযকে পুনরায় আদায় করে নিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ কেউ প্রশ্ন করতে পারে যদি নবী (স) নামাযকে পুনরায় পড়ে থাকেন তাহলে তা এখানে উল্লেখ থাকার দরকার ছিল।

উত্তর ঃ রাবীর উল্লেখ না করার দ্বারা নবী (স) এর পুনরায় নামায আদায় না করার প্রবক্তা হওয়া ঠিক নয়। কেননা, হতে পারে নবী (স) স্বীয় গৃহে গিয়ে উক্ত নামায পুনরায় আদায় করেছেন। কিন্তু হাদীসের রাবী উক্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারেননি। তাই তিনি উল্লেখ করেননি।

দ্বিতীয়ত: হালাল প্রাণীর গোবর পাক। এ কথার উপর প্রমাণ পেশ করা আলোচ্য হাদীস দ্বারা এ জন্য সহীহ নেই যে, উক্ত নাড়ি ভুঁড়ির সাথে রক্তও লেগেছিল। যেমন কোন কোন রেওয়ায়াতে রক্তের কথা উল্লেখ আছে। আর সর্ব সম্মতিক্রমে রক্ত নাপাক। তাই এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সহীহ নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বোত্তম জবাব হলো, এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কাপড় পবিত্র করার বিধান অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সহীহ নয়। কেননা, হাফেজ ইবনে হাজার কিতাবুত তাফসীরে ইবনে মুনযিরের বরাতে যায়েদ ইবনে মারছাদ এর রেওয়ায়াত নকল করা হয়েছে। উক্ত ঘটনায় সূরা মুদ্দাসিরের আয়াত وثيابك فطهر অবতীর্ণ হয়েছে। যদি বাস্তবেই বিষয়টি এমন হয়ে থাকে যে, কাপড় পবিত্র করার বিধান উক্ত ঘটনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়নি এবং নামাযে কাপড় পবিত্র রাখার শর্তও ছিল না। তাহলে উক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সহীহ নয়। যেমন– ইমাম নাসায়ী (র) পেশ করেছেন। অনুচ্ছেদের হাদীসে নামায শেষে বদ দুআ করার কথা এসেছে, যখন হুজুর (স) ঐ সকল হতভাগাদের জন্য বদ দুআ করলেন তখন তারা নিজেদের উপর অনেক বড় বিপদ আসার আশংকা করল। যেমন বুখারীতে এসেছে– فَشَقَّ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ

১. কেননা, তাদের আক্বিদা ছিল মক্কা শহরে দুআ কবুল হয়।

২. তিনি মাজলুম ছিলেন, আর মাজলুমের দুআ অতি দ্রুত কবুল হয়ে থাকে। ঐতিহাসিকগণ লেখেন নবী (স) এ ধরনের বদদুআ আর কখনো করেন নি। তিনি কঠিন থেকে কঠিন অবস্থার সম্মুখিন হওয়া সত্ত্বেও বদ দুআ করেন নি। কিন্তু যেহেতু ঐ সময় নবী (স) আল্লাহর ধ্যানে মশগুল ছিলেন। আর এই কুরাইশ মুশরিকগণ যেহেতু আল্লাহ তাআলার সাথে নবী (স) এর সে তায়াল্লুককে পণ্ড করার ইচ্ছা করেছে। তাই তিনি বদদুআ করেছেন।

হাদীসের রাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বদরের ময়দানে ঐ সকল ব্যক্তিকে মৃত পড়ে থাকতে দেখেছি। হাদীসের রাবী আবু জেহেলসহ চার জনের নাম উল্লেখ করেছেন। বাকী তিন জন হলো–

১. অলীদ ইবনে উতবা ইবনে রবীআ,

২. উমাইয়া ইবনে খলফ ও

৩. আম্মারা ইবনে অলীদ

(শরহে উর্দূ নাসায়ী) ঃ ৩৬২-৩৬৩)

بَابُ الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٣٠٩. اخبرنا علىّ بْنُ حُجْرٍ قال حَدَّثَنا إِسْمٰعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ طَرفَ رِدائهٖ فَبَصَقَ فِيْهِ فَرَدَّ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ -

٣١٠. أَخْبَرَنَا محمّدُ بْنُ بشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قال حدّثنا شعبةُ قالَ سَمِعْتُ القاسِمَ بْنَ مِهرانَ يُحَدِّثُ عَن أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيرةَ عَنِ النبىِّ ﷺ قَالَ إِذا صَلّٰى اَحَدُكُم فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ولاَ عَنْ يَمِيْنِهٖ ولٰكِنْ عَنْ يَسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهٖ والاّ فَبَزَقَ النبىُّ ﷺ هٰكذا فِى ثَوْبِهٖ وَدَلَكَهٗ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ে থুথু লাগলে

অনুবাদ ঃ ৩০৯. আলী ইবনে হুজর (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর চাদরের এক পার্শ্ব ধরে তাতে থুথু ফেললেন, এরপর এক অংশের উপর অন্য অংশ ডললেন।

৩১০. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার (র)..........আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামায আদায় করে তখন সে যেন তার সামনে অথবা তার ডানে থুথু না ফেলে। বরং বাম দিকে কিংবা পায়ের নিচে ফেলে। নবী (স) এভাবে তাঁর কাপড়ে থুথু ফেলেন ও তা ঘষেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

এ রেওয়ায়াত দ্বারা থুথু পবিত্র হওয়া সাব্যস্ত হয়। কেননা, হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযরত অবস্থায় চাদরের এক কিনারায় থুথু রাখেন। অতঃপর তাকে যদি থুথু পাক না হতো তাহলে রাসূল (স) এমনটা কখনই করতেন না। কেননা, কাপড়ে নাপাক থাকা অবস্থায় নামাযী ব্যক্তি কখনো নামায আদায় করতে পারে না।

দ্বিতীয় হাদীসে দুটি জিনিস থেকে নিষেধ করা হয়েছে–

১. সম্মুখ দিকে থুথু নিক্ষেপ করা হয়েছে। এর কারণ হলো এটা কেবলার মর্যাদার পরিপন্থী।

২. দ্বিতীয়টি হলো ডান দিকে থুথু ফেলা। কেননা, এটা ডান দিকের যে ফেরেশতা পূণ্য লেখে তার মর্যাদা পরিপন্থী। তাই এটা করতে নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষত নামাযরত অবস্থায়। কেননা, নামায হলো সব থেকে বড় ধরণের পূণ্যের কাজ। কিন্তু বাম দিকে এবং পায়ের নিচে থুথু ফেলাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, এখানে সে ধরণের কোন প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান নেই। কাজেই এ দুটি কাজের কোন একটি গ্রহণ করতে পারে অথবা নবী (স) এর ন্যায় কাপড়ের এক কোনায় থুথু রেখে সেটাকে ঘষে ফেলতে পারে। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ৩৬৪)

بَابُ بَدْءِ التَّيَمُّمِ

٣١١. اخبرنا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رسولِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِه حَتّٰى اِذا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ او ذَاتِ الْجَيْشِ اِنْقَطَعَ عِقْدٌ لِّىْ فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى الْتِمَاسِه واقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ولَيْسُوْا عَلٰى ماءٍ وليس مَعَهُم ماءٌ فَاَتَى النَّاسُ ابابكرٍ رضى اللّٰه عنه فقَالُوْا اَلاَ تَرٰى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اقامتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ ولَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ ولَيْسَ مَعَهُم ماءٌ فَجَاءَ ابُو بكرٍ رضى اللّٰهُ عنه ورسولُ اللّٰه ﷺ وَاضِعٌ رَاسَه عَلٰى فَخِذِىْ وقد نَامَ فَقَال حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلٰى ماءٍ ولَيْسَ مَعَهُم مَاءٌ قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِىْ ابُو بكرٍ وقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ وجَعَل يَطْعَنُ بِيَدِه فِى خَاصِرَتِىْ فَمَا مَنَعَنِىْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانُ رَسولِ اللّٰه ﷺ عَلٰى فَخِذِىْ فَنَامَ رسولُ اللّٰه ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ عَلٰى غيرِ مَاءٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فقال اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَاهِىَ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُم يَا اٰلَ اَبِىْ بكرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِىْ كُنتُ عَلَيْهِ فوَجَدْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম আরম্ভ করা

অনুবাদ ঃ ৩১১. কুতায়বা (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে কোন এক সফরে বের হলাম। আমরা যখন বাইদা অথবা যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমার হার হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর সংগীগণ তার তালাশে সেখানে অবস্থান করলেন, তাদের অবস্থান পানির নিকটে ছিল না এবং তাদের সাথেও পানি ছিল না। লোকজন আবুবকর (রা) এর নিকট এসে বলল, আপনি কি দেখছেন না আয়েশা (রা) কি করলেন? তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এবং অন্যান্য লোকদের এমন স্থানে অবস্থানে বাধ্য করেছেন যার ধারে কাছে কোন পানি নেই এবং লোকদের সাথেও কোন পানি নেই। তখন আবু বকর (রা) আমার নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

আবু বকর (রা) বললেন– তুমি রাসূলুল্লাহ (স) এবং অন্যান্য। লোকদের এমন স্থানে আটকিয়ে রেখেছ যেখানে পানির কোন ব্যবস্থা নেই, আর তাদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি আমাকে খুব তিরস্কার করলেন, আর আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই বললেন এবং তাঁর হাত দিয়ে আমার কোমরে খোঁচা দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর শরীর আমার উরুর উপর থাকার কারণে আমি নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। রাসূলুল্লাহ (স) নিদ্রায় রইলেন এমনকি পানির কোন ব্যবস্থা ছাড়াই ভোর হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। এতে উসায়দ ইবনে হুযায়র (রা) বললেন, হে আবু বকরের পরিজন! এ তোমাদের প্রথম বরকতই নয়। আয়েশা (রা) বলেন, আমি যে উটের উপর ছিলাম তা উঠালে তার পায়ের নিচে আমার হারটি পেলাম।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : ما معنى التيمم لغةً واصطلاحًا ؛ وما هو أركانه وشرائطه؟

প্রশ্ন ঃ تَيَمُّم **এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর শর্তাবলী ও রুকনসমূহ বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ تَيَمُّم **এর আভিধানিক অর্থ ঃ** تيمم শব্দটি باب تفعّل এর মাসদার, يَمٌّ মূল ধাতু হতে নির্গত হয়েছে। অর্থ হচ্ছে القصد والارادة ইচ্ছা ও সংকল্প করা। পবিত্র কুরআনে শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে এভাবে–

ولاتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

تيمم **-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ** ১. আল্লামা কিরমানী (র) এর মতে هُوَ الْقَصْدُ اِلَى الصَّعِيْدِ لِلتَّطَهُّرِ

অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জনের জন্যে মাটির ইচ্ছা পোষনকে তায়াম্মুম বলা হয়।

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন–

هُوَ الْقَصْدُ اِلَى الصَّعِيْدِ لِمَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِنِيَّةِ اِسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ وَنَحْوِهَا

৩. কতিপয় আলেমের মতে– هُوَ قصدُ الصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ عندَ تَعَذُّرِ الْمَاءِ

তায়াম্মুম এর রোকন ঃ مَا يَقُوْمُ بِهِ الشَّئُ তথা যে উপাদান দ্বারা বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে তাকে সে বস্তুর রোকন বলা হয়, এ মূলনীতি হিসেবে তায়াম্মুমের রোকন তিনটি–

১. النية তথা তায়াম্মুমের নিয়ত করা। নিয়ত হচ্ছে عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى الْفِعْلِ

যেহেতু تيمم শব্দের মধ্যে ইচ্ছার অর্থ রয়েছে। সেহেতু নিয়্যাত ফরয।

২. উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

৩. মুখমণ্ডল মাসেহ করা, যেমন, ইরশাদ হচ্ছে– فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ

তায়াম্মুমের শর্তাবলী

১. মুসলমান হওয়া, যেহেতু এটি ইসলামী বিধান।

২. হায়েয ও নিফাস থেকে মহিলার পবিত্র থাকা।

৩. পানি না পাওয়া যেমন আল্লাহর বাণী–فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا

৪. রোগাক্রান্ত হওয়া তথা পানি ব্যবহার করলে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকা। যেমন–وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى

৫. পানি ব্যবহার করতে গেলে শত্রুর হামলার ভয় থাকা।

৬. পানি দ্বারা উযূ করলে খাওয়ার পানির সংকট দেখা দেয়।

৭. অযু করতে গেলে নামায ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকা।

৮. পানি ব্যবহার করলে জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকা উপরে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে উযূ ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা শুদ্ধ। (শরহে নাসায়ী ঃ ১/২ ২৮৪-২৮৫)

হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

তায়াম্মুম কি এ উম্মতের সাথে খাস?

তায়াম্মুম করাটা শুধুমাত্র এই উম্মতের সাথে খাস, তায়াম্মুমকে শুধুমাত্র এ উম্মতের জন্য শরীয়তে অনুমোদিত হয়েছে। পূর্ববর্তী কোন উম্মতের জন্য এটা বৈধ ছিল না। আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার মহা অনুগ্রহ যে, তিনি

পবিত্রতা অর্জন করার ক্ষেত্রে পানির স্থলাভিষিক্ত এমন বস্তুকে করেছেন যা পানি থেকে বেশী সহজে পাওয়া যায়। কেননা, মাটি সর্বত্রই আছে। তাই সকল স্থানে পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ তাআলা এ শিথিলতা শুধুমাত্র শেষ উম্মতের জন্য করেছেন। (শরহের উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩১৫)

فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ بَعْضِ اَسْفَار যাতে হযরত আয়েশা (রা) নবী (স) এর সাথে ছিলেন, এ সফর দ্বারা কোন সফর উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে হাফেজ আবদুলবার মালেকী বলেন, এর দ্বারা গাযওয়ায়ে বনী মুস্তালেক উদ্দেশ্য। এটাকে গাযাওয়ায়ে মুরায়সিও বলা হয়। ইবনে সা'দ ও ইবনে হিব্বানও গাযওয়ায়ে বনী মুস্তালেকের সফরের কথা বলেছেন।

البداء কোথায় অবস্থিত ঃ ইমাম নববী লেখেন, بيداء খায়বারের রাস্তায় অবস্থিত কিন্তু এটা ভুল। এটা মক্কার রাস্তায় অবস্থিত যা যুলহুলায়ফার নিকটবর্তী।

ذَاتُ الْجَيْش এর অবস্থানাস্থল ও তায়াম্মুম এর প্রেক্ষাপট

এটাও একটি স্থানের নাম। মদীনা থেকে ১২ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। স্থানটি নির্ধারণ করার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়াতে সংশয়হীনভাবে বলা হয়েছে। আর কোন রেওয়ায়াতে সংশয় এর সাথে বলা হয়েছে। হযরত আম্মারের হাদীসে নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে, সে জায়গাটি হলো ذات الجيش এ স্থানে পৌছার পর হযরত আয়েশা (রা) এর হার হারিয়ে যায়। সেটা তালাশ করার জন্য হুজুর (স) সেখানে অবস্থান করলেন এবং হারটি খোঁজ করার জন্য লোক প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেলো অথচ ঐ স্থানটির আশে পাশে পানি ছিল না এবং কাফেলার লোকদের কাছেও পানি ছিল না। ফলে লোকেরা হযরত আবু বকর (রা) এর নিকট এসে কঠিনভাবে শিকায়েত করতে লাগল, তখন আবু বকর (রা) স্বীয় কন্যা হযরত আয়েশা (রা) কে অত্যন্ত শক্ত ভাষায় বলেন যে, তুমি রাসূল (স) এবং মুসলমানদিগকে এমন স্থানে আটকে রেখেছো যেখানে পানি নেই। তখন আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। এ ব্যাপারে হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর বলেন, হে আহলে আবু বকর! তোমাদের পূর্বে কেউ এর বরকত অর্জন করতে পারেনি এবং হে উম্মুল মুমিনীন! তোমার উপর আল্লাহ তাআলা পূর্ণাঙ্গ রহমত বর্ষণ করুন, যখনই এমন অবস্থা সম্মুখে আসে তখন আল্লাহ তাআলা সহজ বিধান দেন। যার মাধ্যমে বান্দা সহজতা অর্জন করতে পারে।

এ ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় গাযওয়ায়ে মুয়াইসিতে তায়াম্মুম শুরীয়তে অনুমোদিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো তায়াম্মুমের আয়াত কোনটি? সূরা মায়েদাহ এর আয়াত না কি সূরা নিসার আয়াত? ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, সূরা নিসার আয়াত। কেননা, মায়েদার আয়াত উযূর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। আর সূরা নিসার আয়াতে উযূর কথা উল্লেখ নেই। কাজেই তিনি সূরাই নিসার আয়াতকে তায়াম্মুমের আয়াত বলেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (র) সংশয়হীনভাবে মায়েদার আয়াতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে সূরা মায়েদাহ এর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, আমর ইবনে হারেছ এর রেওয়ায়াতে স্পষ্ট এসেছে যে, فَنَزَلَتْ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ ... الخ এর দ্বারা বুঝা যায় ইমাম বুখারী (র) যে দলীলের উপর ভিত্তি করে তায়াম্মুমের আয়াত দ্বারা সূরা মায়েদার আয়াত উদ্দেশ্য নিয়েছেন হতে পারে এর উপর ইমাম কুরতুবীর দৃষ্টি পড়েনি। কারণ তিনি দলীলহীনভাবে কথা বলেননি। (শরহে উর্দু নাসায়ী ঃ ৩৬৫-৩৬৬)

بَابُ التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ

٣١٢. اخبرنا الربيع بْنُ سليمان قال حدثنا شعيبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جعفر بْنِ ربيعة عَنْ عبد الرحمن بن هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سَمِعَه يقولُ اَقْبَلْتُ انا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى ابى جُهَيْمِ بْنِ الحٰرِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الانصارىِّ فقال ابو جُهَيْمٍ اقبلَ رسولُ اللّٰه ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ الجَمَلِ ولَقِيَهُ رجلٌ فسلّم عليه فلم يَرُدَّ رسولُ اللّٰه ﷺ حتّٰى اَقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ فمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثم رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ -

অনুচ্ছেদ ঃ মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুম

৩১২. রবী ইবনে সুলায়মান (র)......ইবেন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত দাস উমায়র থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি এবং মায়মুনা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার আবু জুহায়ম ইবনে সিম্মা আনসারী (রা)-এর নিকট গেলাম। আবু জুহায়ম বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) 'বি'রে জামাল'-এর দিক থেকে আসছিলেন, তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হল, সে তাঁকে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ (স) তার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি একটি দেয়ালের নিকট আসলেন এবং তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মাসেহ করলেন, এরপর সালামের জবাব দিলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

مِنْ نَحْوِ এর অর্থ হলো (مِنْ جِهَةِ) بئر جَمَلٍ এটা মদীনার একটি জায়গার নাম।এ নামেই কূপটি প্রসিদ্ধ।

رجل দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ رجل দ্বারা উদ্দেশ্য আবু জুহাইম আনসারী যিনি এ হাদীসের রাবী। নবী (স) মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুম করে সালামের জবাব দেন।

অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা মুসান্নিফ (র) এর প্রমাণ পেশ ঃ যখন নবী (স) মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুম করে সালামের জবাব দিয়েছেন। অথচ পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত সালামের জবাব দেয়া বৈধ। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় মুকীম অবস্থায় যে ব্যক্তির নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা হয় তার জন্য তায়াম্মুম করা উত্তমরূপে বৈধ। কেননা, পানির উপর সামর্থ থাকা সত্ত্বে পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত নামায বৈধ নয়। আমাদের কতক উলামায়ে কিরাম এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেন, বাহর গ্রন্থকার বলেন, পানির উপর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও মুস্তাহাব উযূতে তায়াম্মুম করা বৈধ। কিন্তু ওয়াজিব অযুতে পানির উপর সামর্থ থাকলে তায়াম্মুম করা সহীহ নয়। অবশ্য যদি পানির উপর সামর্থ না থাকে এবং নামায ফউত হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে এ সুরতে মুকীম অবস্থায়ও তায়াম্মুম বৈধ। কেননা, তায়াম্মুম এর জন্য عَجزَ عَنِ الْمَاءِ পানি ব্যবহারে অক্ষম তা থাকতে হবে। এটা তার জন্য শর্ত এবং এটাই তায়াম্মুম এর মূল ভিত্তি। কাজেই কেউ যদি সফরে পানি ব্যবহারে অক্ষম হয় তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম এর অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় পানি ব্যবহারে অক্ষম হয় তার জন্যও তায়াম্মুম করা বৈধ।

এ মাসআলায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) ফাতহুল বারীতে কিছু মতানৈক্য উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালেক (র) এর নিকট উক্ত নামায দোহরান জরুরী নয়, যা সে মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুম করে আদায় করেছে। কারণ তায়াম্মুম মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য শরীয়ত অনুমোদিত হয়েছে। সুতরাং মুকীম ব্যক্তিও যদি পানি ব্যবহারে সক্ষম না হয় তথাপি তাকে তাদের দুজনের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাই মুকীম তায়াম্মুম করে যে নামায আদায় করেছে তা পুনরায় আদায় করা জরুরী নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) থেকে এ কওল নকল করা হয়েছে যে, মুকীম অবস্থায় পানি না পাওয়া খুবই বিরল। কাজেই পানি না পাওয়ার সূরতে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নেবে। কিন্তু পানি পাওয়ার পর নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র) বলেন, মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পানি ব্যবহারে সক্ষম হয়। যদিও সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর দ্বিতীয় মত বা আল্লামা আইনী (র) شرح اقطع থেকে নকল করেন তা এমনই। [বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

التَّيَمُّمُ فِي الْحَضَرِ

٣١٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلًا اَتٰى عُمَرَ رضى اللّٰهُ عنه فَقَالَ اِنِّىْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ قَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَمَا تَذْكُرُ اِذْ اَنَا وَاَنْتَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ فَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَسَلَمَةُ شَكَّ لَا يَدْرِىْ فِيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اَوْ اِلَى الْكَفَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيْكَ مَا تَوَلَّيْتَ -

٣١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ خِفَافٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ اَجْنَبْتُ وَاَنَا فِى الْاِبِلِ فَلَمْ اَجِدْ مَاءً فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يُجْزِيْكَ مِنْ ذٰلِكَ التَّيَمُّمُ -

মুকীমের তায়াম্মুম

অনুবাদ ঃ ৩১৩. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার (র).......আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমি জানাবত অবস্থায় আছি কিন্তু পানি পাচ্ছি না। উমর (রা) বললেন, তুমি নামায আদায় করো না। এ কথা শুনে আম্মার ইবনে ইয়াসির বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি স্মরণ নেই যে, এক সময় আমি এবং আপনি এক যুদ্ধে ছিলাম, আমরা উভয়ে জানাবতগ্রস্ত হলাম। আমরা পানি পেলাম না। তখন আপনি নামায আদায় করলেন না কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম, তারপর নামায আদায় করলাম। তারপর আমরা রাসূলাল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। এ বলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর হস্তদ্বয় মাটিতে মারলেন, এরপর তাতে ফুঁক দিলেন এবং তা দ্বারা তাঁর চেহারা এবং উভয় হাত মাসেহ করলেন। বর্ণনাকারী সালামা সন্দেহ করলেন, এ ব্যাপারে তাঁর মনে নেই যে, কনুই পর্যন্ত বলেছেন, না কব্জি পর্যন্ত।

[পূর্বের বাকী অংশ]

ইমাম আবু হানীফা (র) এর একটি মত এমন যে, যে ব্যক্তি পানি পাচ্ছে না কিন্তু তার প্রবল ধারণা হলো সে নামাযের শেষ ওয়াক্তে পানি পাবে, তার জন্য শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত পানির অপেক্ষা করা ওয়াজিব। অতঃপর সে যদি পানি পায় তাহলে উযূ করে নামায আদায় করে নেবে। আর যদি পানি না পায় তাহলে ওয়াক্তের ভিতরেই তায়াম্মুম করে নামায আদায় করেনিবে। এ মতের ভিত্তি হলো ঐ হাদীস যা দারাকুতনী আবু ইসহাকের সূত্রেই হযরত আলী (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। তার শব্দ নিম্নরূপ–

اِذَا اَجْنَبَ الرَّجُلُ فِى السَّفَرِ تَلُوْمُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ اٰخِرِ الْوَقْتِ فَاِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ ثُمَّ صَلّٰى

আল্লামা আইনী (র) কিতাবুল আহকামে ইবনে বাজিজার বরাতেই ইমাম আবু হানীফা (র) এর অপর আরেকটি কওল নকল করেছেন যে, মুকীম ব্যক্তি পানি না পাওয়া সত্ত্বেও যদি পানি পাওয়ার আশা রাখে তাহলে তার জন্য শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরী করা মুস্তাহাব। যাতে করে নামায দুই প্রকারের পবিত্রতার মধ্য হতে উত্তম পবিত্রতার দ্বারা আদায় হয়। আলোচ্য মাসআলাটি জামাত পাওয়ার আশাবাদির ন্যায়। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ৩৬৭-৩৬৮)

একথা শুনে উমর (রা) বললেন, তুমি যে রেওয়ায়াত বর্ণনা করলে তার দায়-দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করলাম।

৩১৪. মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ (র)......... আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি জুনুবী হলাম, তখন আমি ছিলাম উট পালের সাথে। সেখানে আমি পানি পেলাম না। তাই চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ সংবাদ জানালাম। তিনি বললেন, এ রকম না করে বরং তায়াম্মুম করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসে এসেছে এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা) এর নিকট বলল আমি জুনুবী এসে আমি পবিত্রতা অর্জন করার জন্য পানি পাচ্ছি না। হযরত উমর (রা) জবাবে বলেন, তুমি এখন নামায পড়বে না। সেখানে আমর ইবনে ইয়াসার উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত উমর (রা) এর জবাবে একমত হতে পারলেন না। ফলে তিনি পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন এবং হযরত ওমর (রা) কে ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেন যা পূর্বে ঘটেছিল। سرية সৈন্য বাহিনীর একটি দলকে বলে।

বৈপরিত্ব ও তার সমাধান

অনুচ্ছেদের প্রথম রেওয়ায়াতে فِىْ سَرِيَّةٍ এবং দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে فِى الْإِبِلِ এসেছে। অনুরূপভাবে বুখারীর রেওয়ায়াতে إِنَّا كُنَّا فِىْ سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ শব্দ এসেছে। কাজেই বাহ্যত রেওয়ায়াতগুলোতে বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে এ রেওয়ায়াতগুলোর মধ্যে নিম্নরূপভাবে সমন্বয় সাধন হতে পারে।

হযরত উমর ও হযরত আম্মার উভয়ে ছোট একটি দলে সফরে বের হন। উট চরানোর দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হয়, তারা উট চরানোর জন্যে ময়দানে বের হন। ঘটনাক্রমে উভয়েই জুনুবী হয়ে যান। তখন হযরত উমর (রা) নামায আদায় না করে পানির প্রতিক্ষায় থাকেন। কারণ নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বে পানি পাওয়া তার আশা ছিল অথবা তিনি তায়াম্মুমের আয়াতকে حديث اصغر এর সাথে খাস মনে করেছেন। কাজেই তিনি তায়াম্মুম করে নামায আদায় করেননি। আর হযরত আম্মার (রা) তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে, তার বক্তব্য وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ

কোন কোন রেওয়ায়াতে فَتَمَرَّغْتُ এসেছে। তথা আমি মাটির উপর গড়াগড়ি করি, অতঃপর আমি নামায আদায় করি। তিনি জানাবাতের তায়াম্মুমকে জানাবাতের গোসলের উপর কিয়াস করেন। যেমনিভাবে জানাবাতের গোসলে পূর্ণ শরীরে পানি পৌছানো ফরজ ঠিক তদ্রুপ জানাবাতের তায়াম্মুমে পূর্ণ শরীরে মাটি মিশানো জরুরী মনে করেন। কিন্তু তার এ কিয়াস সঠিক ছিল না এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, إِنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ

মোটকথা, হযরত আম্মার (রা) উল্লেখিত পদ্ধতিতে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করেন। অতঃপর হুজুরের দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনা উল্লেখ করেন, তখন নবী (স) বলেন, হে আম্মার! তোমার কিয়াস সঠিক নয়। জমিনে গড়াগড়ি করার প্রয়োজন ছিল না। বরং তোমাদের জন্য এতটুকু কাজই যথেষ্ট ছিল। অতঃপর নবী (স) উভয় হাতকে জমিনের উপর মারেন। অতঃপর হাতকে ঝাড়াদেন যাতে করে হাতে লেগে থাকা ময়লা দূর হয়ে যায় এবং চেহারা ময়লাক্ত না হয়ে যায়।

হযরত আম্মার (রা) যে ধারণা করেছিলেন জানাবাতের তায়াম্মুমে তো ভালোভাবে মাটি ব্যবহার করা চায় অন্যথায় জানাবাতের তায়াম্মুম সহীহ হবে না। এটা বুঝতে পেরে নবী (স) তার চিন্তা-চেতনাকে নির্মূল করেছেন এবং বলেছেন উযূ ও গোসলের তায়াম্মুম এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তুমি যে পার্থক্য বুঝে জমিনে গড়াগড়ি করেছ তার প্রয়োজন ছিল না। অতঃপর তাকে তায়াম্মুম শরীয়ত অনুমোদিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন إِنَّمَا يَكْفِيْكَ الخ তোমার তো এমন কাজই যথেষ্ট ছিল।

অতঃপর নবী (স) জমিনে হাত মেরে ফু দিয়ে উভয় হাত থেকে ধূলা সরিয়ে দেন। অতঃপর উভয় হাত চেহারা ও হস্তদ্বয়ের উপর মাসাহ করেন, ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় হুজুর (স) মাটিতে একবার হাত মারেন, অবশ্য যদি উহ্য ইবারত ধরে বলা হয় যে, ثُمَّ ضَرَبَ وَمَسَحَ كَفَّيْهِ তাহলে যারা দু'বার হাত মারার প্রবক্তা তাদের দাবী সাব্যাস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এ ব্যাখ্যাকে অন্য একটি রেওয়ায়াত খণ্ডন করে দেয় অথবা, এ জবাব দেয়া হবে যে, উল্লেখিত হাদীসে জানাবাতের তায়াম্মুম উযূর তায়াম্মুম এর মত। তায়াম্মুমে কয়বার হাত মারতে হবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে। মোটকথা, যখন হযরত আম্মার (রা) উমর (রা) কে পূর্ণ ঘটনা শুনালেন। তখন ওমর (রা) বলেন, نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ হে আম্মার! আমি নিঃসন্দেহে তোমার সাথে সফরে ছিলাম। কিন্তু তুমি যে ঘটনা বর্ণনা করেছো এটা আমার স্মরণ ছিল না।

উক্ত কথার দ্বারা ঘটনাটি বাস্তবে সঠিক না হওয়া অনিবার্য হয় না। কাজেই আমি তোমাকে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করা হতে বাধা প্রদান করিনি। বরং এ ব্যাপারে তোমার ইখতিয়ার রয়েছে। তুমি তোমার ইলমও ই'তেকাদ অনুপাতে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করবে। এ ব্যাপারে কোন বাঁধা নেই। কিন্তু উক্ত ঘটনা বর্ণনাকালে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। মোটকথা, হযরত উমর (রা) উল্লেখিত বক্তব্য দ্বারা এ ইচ্ছা করেছেন যে, যেহেতু ঘটনাটি আমার স্মরণ নেই। এজন্য এর উপর আমিতো দাওয়াত প্রদান করতে পারি না। তবে এ অনুযায়ী তুমি ফতওয়া দিতে পার।

দ্বিতীয় রেওয়ায়াত সম্পর্কে আলোচনা

দ্বিতীয় রেওয়ায়াতেও উপরোল্লিখিত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পূর্বের রেওয়ায়াতে এর বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। আর আলোচ্য রেওয়ায়াতে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে এসেছে–

إِنَّمَا كَانَ يُجْزِيكَ مِنْ ذَالِكَ التَّيَمُّمُ

আম্মার! তোমার জানাবাতের তায়াম্মুম এর জন্য ঐ তায়াম্মুমই যথেষ্ট হবে হদসে আসগার তথা উযূর ক্ষেত্রে করা হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় হদসে আসগার তথা উযূর তায়াম্মুম সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন।

من ذالك التيمم দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ তোমার জানাবাতের তায়াম্মুম এর জন্য ঐ তায়াম্মুমই যথেষ্ট যা তুমি হদসে আসগরের জন্য করেছিলে। তা ছেড়ে তুমি জানাবাতের গোসলের উপর কিয়াস করে পূর্ণ শরীরে মাটি মেখেছ এটা সঠিক নয়। নবী (স)-এর এই ইরশাদ হলো قولى যা আম্মারের ভুলের উপর সতর্ক করা হয়েছে।

শিরোনাম সম্পর্কে আলোচনা

হাদীসের ধারা বর্ণনা অনুপাতে শিরোনাম দেয়া উচিত ছিল التَّيَمُّمُ لِلْجَنَابَةِ। কিন্তু মুসান্নিফ (র) التَّيَمُّمُ فِى الْحَضَرِ। এর শিরোনাম কায়েম করেছেন অথচ এ শিরোনাম উপরে উল্লেখিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ শিরোনামের প্রয়োজন কি? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা সিন্দী (র) বলেন, বাহ্যত হাদীসের সাথে শিরোনামের কোন যোগসূত্র নেই। কিন্তু মুসান্নিফ (র) উক্ত শিরোনাম কায়েম করে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যখন আম্মার নবী (স) কে উক্ত বিষয়টি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন নবী (স) মদীনায় (তথা মুকীম) ছিলেন, মুসাফির নন।

(শরহে উর্দু নাসায়ী : ১৬৯–১৭০)

بَابُ التَّيَمُّمِ فِى السَّفَرِ

٣١٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بنِ عبدِ اللّٰه قال حَدَّثَنَا يعقوبُ بْنُ ابراهيمَ قال حَدَّثَنا ابِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال حَدَّثَنِى عُبَيدُ اللّٰهِ بْنُ عبدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارٍ قال عَرَّسَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ بِأُوْلَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُه فَانْقَطَعَ عِقْدُهَا مِنْ جَزْعِ ظِفَارٍ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذٰلِكَ حَتّٰى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ رُخْصَةَ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيْدِ قال فَقَامَ الْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَضَرَبُوْا بِأَيْدِيْهِمُ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوْا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَنْفُضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ اِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُوْنِ أَيْدِيْهِمْ اِلَى الْاٰبَاطِ -

অনুচ্ছেদ ঃ সফরে তায়াম্মুম

অনুবাদ ঃ ৩১৫. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহয়া (রা)........আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) শেষ রাতে উলাতুল জায়শ নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)। তাঁর ইয়ামানী মোতির হারটি হারিয়ে গেলে এর তালাশে সমস্ত লোক আটকা পড়ল। অবশেষে ভোর হয়ে গেল অথচ লোকদের নিকট পানি ছিল না। যদ্দরুন আবু বকর (রা) তাঁর উপর রাগান্বিত হয়ে বললেন, তুমি লোকদের আটকে রেখেছ অথচ তাদের নিকট পানি নেই। তখন আল্লাহ তাআলা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুমিনগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে উঠে মাটিতে নিজেদের হাত মেরে হাত উঠালেন এবং হাত থেকে মাটি একটুও ঝাড়লেন না বরং তা দ্বারা তাদের চেহারা ও হাত কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করলেন এবং হাতের তালু দ্বারা বগল পর্যন্ত মাসেহ করলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : هلِ التَّيَمُّم طهارةٌ مُطْلَقَةٌ ام طهارةٌ ضروريَّةٌ؟ هلْ تَجُوْزُ الصلوةُ المَفْرُوْضَةُ المُتَعَدِّدَةُ فِى أوقاتِها ام لابُدَّ لِكُلِّ صَلٰوةٍ تيمُّمًا مُسْتَقِلًّا .

প্রশ্ন ঃ তায়াম্মুম জরুরী না সাধারণ পবিত্রতা? একই তায়াম্মুম দ্বারা বিভিন্ন ফরয নামায নির্দিষ্ট সময় আদায় করা জায়েয হবে, না-কি প্রতি নামাযের জন্যে নতুন করে তায়াম্মুম করতে হবে?

উত্তর ঃ তায়াম্মুম طهارة مُطْلَقَة **বা** طهارة ضَرورِيَّة ঃ এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো–

১. ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র) এর মতে তায়াম্মুম طهارة ضرورية অতএব এক তায়াম্মুম দ্বারা এক ওয়াক্তের ফরয নামায সহীহ হবে তবে সে ওয়াক্তের নফল পড়া যাবে। কারণ নফল হচ্ছে ফরজের অনুবর্তী। ওয়াক্ত চলে গেলে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে, প্রতি ওয়াক্তের জন্য নতুন করে উযূ করতে হবে। তারা দলীল হিসেবে বলেন– الضرورةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ

২. ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে, তায়াম্মুম উযূর মত طهارة اصليَّة তথা মৌলিক পবিত্রতা, তবে মর্যাদাগতভাবে উযূর স্তর প্রথমে একই তায়াম্মুম দ্বারা অনেক ফরয আদায় করা জায়েয। সুতরাং প্রত্যেক ওয়াক্তে নতুন নতুন উযূ করার প্রয়োজন নেই। তিনি স্বীয় অভিমতের সমর্থনে নিম্নের দলীলগুলো পেশ করেন–

قال النبىُّ صلعم وجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مسجدًا وجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا اِذا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ

٢. اَلصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ (ترمذى)

জনৈক মহিলা জানাবাতের কারণে নামায না পড়লে রাসূল (স) তাকে লক্ষ্য করে বলেন, عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فانه يكفيك এখানে يكفيك দ্বারা বুঝা যায় যে, তায়াম্মুম হচ্ছে طهارة مطلقة তথা طهارة اصلية

ইমাম ত্রয়ের দলীলের জবাব ঃ ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে বলা যায় نص এর বিপরীতে কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের হুকুম اطلاق এর সাথে বলেছেন। (শরহে নাসায়ী ১/ ২৮৩-২৮৪)

سوال : اِنَّ التَّيَمُّمَ خَلَفٌ عَنِ الْوُضُوْءِ فِى الْوُضُوْءِ غَسْلُ الْاَعْضَاءِ الثَّلٰثَةِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ فَكَيْفَ تُرِكَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَمَسْحُ الرِّجْلَيْنِ .

প্রশ্ন ঃ তায়াম্মুম উযূর স্থলাভিষিক্ত তা সত্ত্বেও তাতে মাথা ও পা মাসেহ করাকে বাদ দেয়া হলো কেন?

উত্তর ঃ তায়াম্মুম উযূর স্থালাভিষিক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাতে মাথা ও পদদ্বয় মাসাহ বাদ দেয়ার কারণ ঃ একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তায়াম্মুম হচ্ছে উযূর স্থলাভিষিক্ত, উযূর মধ্যে পা ধৌত করতে হয় এবং মাথা মাসাহ করতে হয়। কিন্তু তায়াম্মুম এর মধ্যে এ দুটি অঙ্গ মাসেহ করার বিধান দেয়া হয়নি। উলামায়ে কিরাম এর কয়েকটি জবাব দিয়েছেন। যথা–

১. আল্লামা শাওকানী (র) এর মতে, আরববাসীদের পা ও মাথা প্রায় সব সময় আবৃত থাকে, তাই সেগুলোতে নাপাক লাগার সম্ভাবনা ছিল না। এজন্যে তায়াম্মুমের মধ্যে এ দুটি অঙ্গকে মাসাহ করার বিধান দেয়া হয়নি।

২. কিছু সংখ্যক আলিমের মতে, উযূতে সর্বাবস্থায় দুটি অঙ্গ ধৌত করতে হয় মুখ ও হাত। আর মাথা সব সময় মাসেহ করতে হয়। মোযা পরিহিত অবস্থায় পা মাসেহ করতে হয়। আর وَالْمَسْحُ لَا يَكُوْنُ خَلَفًا لِلْمَسْحِ এ কারণেই তায়াম্মুম এর মধ্যে মাথা ও পা মাসেহ করার আদেশ দেয়া হয়নি।

৩. কতিপয় আলিমের মতে, সংক্ষিপ্ত করণের উদ্দেশ্যে পা ও মাথা মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়নি।

৪. আবু উবাইদার (রা) এর মতে, যে অসুবিধার কারণে উযূতে মাথা ধৌত করার হুকুম দেয়া হয়নি। অনুরূপ একই অসুবিধার কারণে তায়াম্মুমের মধ্যে ও মাথা মাসেহ করার আদেশ দেয়া হয়নি। কারণ মাথায় ধুলাবালি লাগলে অসুবিধা হবে। আর পা যেহেতু সব সময় ধুলাবালিতেই থাকে, সেহেতু পা ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়নি।

৫. কেউ কেউ বলেন, হাত ও মুখ বিশেষ অঙ্গ বিধায় সেগুলো মাসেহ করার আদেশ দেয়া হয়। নামাযের মূল্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সেজদা, তা হাত ও মুখের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

৬. কারো কারো মতে نيابة তথা স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য تَشَابُهٌ بِالْكُلِّيَّةِ শর্ত নয়। তাই তায়াম্মুম উযূর স্থলাভিষিক্ত হতে কোন অসুবিধা নেই।

৭. লাতায়িফুস সুলূক "গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সহজকরণের উদ্দেশ্যে তায়াম্মু বৈধ হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ বান্দার আশিক সেহেতু মাশুক এর প্রিয়তম উযূর প্রতি লক্ষ্য করে হাত ও মুখ মাসাহ করার কথা বলা হয়েছে , পা মাসাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। (শরহে উর্দূ নাসায়ী ১/২৮৭-২৮৮)

سوال فى اٰيَةِ غَزْوَةٍ نَزَلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ؟ ما الْمُرَادُ بِاٰيَةِ التَّيَمُّمِ اٰيَةُ سُوْرَةِ النِّسَاءِ ام اٰيَةُ الْمَائِدَةِ؟

প্রশ্ন ঃ কোন যুদ্ধে তায়াম্মুমের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়? প্রথম অবতীর্ণ তায়াম্মুমের আয়াত কি সূরা আল মায়িদার না সূরা আন-নিসার?

উত্তর ঃ যে যুদ্ধে তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয় : তায়াম্মুমের আয়াত কোন যুদ্ধে নাযিল হয়েছিল। এ ব্যাপারে একাধিক অভিমত রয়েছে। যেমন–

১. আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, তায়াম্মুমের আয়াত غزوة بنى مصطلق থেকে ফেরার পথে নাযিল হয়েছে। এ যুদ্ধটি ৫ম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল।

২. জুমহুর মুহাদ্দিসের মতে, ৭ম হিজরীতে غزوة ذاتِ الرِّقَاع থেকে ফেরার পথে তায়াম্মুম এর আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন,

مرّةً فَقَدَ عِقْدِىْ فِى سَفَرٍ وقَالَ أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالَ ثُمَّ فِىْ سَفَرٍ أُخَرَ فَقَدَ عِقْدِى وفيه نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ

তায়াম্মুমের দুটি সহযোগী আয়াত ঃ তায়াম্মুমে বৈধতার ব্যাপারে দুটি আয়াত পাওয়া যায়। যেমন–

১. সূরা আন- নিসায় ঘোষিত হয়েছে–

إِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ (النساء)

২. সূরা আল-মায়িদায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ.

এ আয়াত দুটির মধ্যে কোনটি প্রথমে এসেছে এটা নির্ণয়ে ইমাম ও মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

১. ইবনে বাত্তাল (র) ও ইমাম কুরতুবী (র) এর মতে সূরা নিসার আয়াত হচ্ছে তায়াম্মুমের আয়াত। কেননা, সূরা মায়িদার আয়াতকে উযূর আয়াত বলা হয়। ইবনে কাসীর ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রা) এ মতকে সমর্থন করেন।

২. ইমাম বুখারী (র) ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) এর মতে তায়াম্মুমের আয়াত হচ্ছে সূরা মায়িদায়। এ আয়াতের প্রথমাংশে উযূর কথা এবং শেষাংশে তায়াম্মুমের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী দৃঢ়তার জন্যে সূরা নিসার এ আয়াত পুনরায় নাযিল হয়েছে।

৩. মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রা) এর মতে কোনটি তায়াম্মুমের আয়াত এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু বলা যায় না।

৪. কতিপয় মুহাদ্দিস উভয় আয়াতকে তায়াম্মুমের আয়াত হিসেবে গণ্য করেছেন। হদসে আসগর থেকে পবিত্রতার জন্যে আন-নিসার আয়াত নাযিল হয়েছে। আর হদসে আকবর থেকে পবিত্রতার জন্যে সূরা আল মায়িদার আয়াত নাযিল হয়েছে। (শরহে নাসায়ী ঃ ১/২৮৮-২৮৯)

سوال : كَمْ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ؟ بَيِّنْ مفصّلاً.

প্রশ্ন ঃ হাত ও মুখ মাসেহ এর জন্যে মাটিতে কতবার হাত মারতে হবে বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ তায়াম্মুমে মাটিতে কয়বার হাত মারতে হবে ঃ তায়াম্মুমে মাটিতে কয়বার হাত মারতে হবে এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১. ইমাম আহমদ, ইসহাক, আতা, মাকহুল ও আওযায়ী (র) এর মতে মুখ এবং উভয় হাতের জন্য শুধু একবারই মাটিতে হাত লাগানো যথেষ্ট, দুইবার প্রয়োজন নেই।

২. ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে মুবারক, ইবরাহীম নাখয়ী ও হাসান বসরী (র) এর মতে মুখ ও উভয় হাত মাসেহ করার জন্য একবার মাটিতে হাত লাগানো যথেষ্ট নয়। বরং একেকটির জন্য আলাদাভাবে হাত লাগাতে হবে। অর্থাৎ মোট দুইবার হাত লাগাতে হবে।

ইমাম আহমদের দলীল ঃ ১

عن عمّار بنِ يَسارٍ قال سألتُ النبيَّ صلعم عَنِ التَّيَمُّمِ فأمَرَنِى بِضَرْبَةٍ واحدةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

অর্থাৎ আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (স)–এর নিকট তায়াম্মুমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাকে নির্দেশ দেন যে, মাটিতে একবার হাতের হাত মেরে উভয় হাত ও মুখমণ্ডল মাসেহ করবে। (আবু দাউদ : ১/৪৮, বুখারী ১/৫০, মুসলিম: ১/১৬১, তিরমিযী ১/৩৮)

দলীল- ২ঃ হযরত আম্মার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) আম্মার (রা) কে বলেন–

اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ صلعم بِيَدِهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ الخ

অর্থাৎ ... তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল এ বলে তিনি নিজেই মাটিতে হাত মারেন, অতঃপর হাতে ফুঁ দিয়ে মুখমণ্ডল এবং দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করেন। (আবু দাউদ ১/৪৬, বুখারী: ১/৪৮, ইবনেমাজাহ)

এ হাদীসেও দেখা যাচ্ছে নবী করীম (স) মাটিতে একবার হাত মেরে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করেছেন।

জুমহুরের দলীল-১ ঃ

عن جابر رض عن النبىّ صلعم قالَ التيمّم ضربةٌ لِلْوَجْهِ وضربةٌ للذراعين اِلَى الْمِرفقين -

অর্থাৎ .... জাবের (র) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তায়াম্মুমে একবার চেহারার জন্য হাত মারবে এবং আরেক বার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য হাত মারতে হবে। (দারাকুতনী ঃ ১/১৮১)

দলীল- ২ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত,

قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم التيمّم ضَرْبَتَانِ ضربةٌ لِلْوَجْهِ وضربةٌ لِلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

অর্থাৎ..... নবী করীম (স) ইরশাদ করেন তায়াম্মুম হলো দু'বার মাটিতে হাত মারা, একবার চেহারার জন্য, আর একবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য। (মুস্তাদরাকে হাকেম ১/১৭৯, দারাকুতনী–১/১৮০)

عن ابْنِ عُمَرَ قال كانَ تيمّم رسول اللّه صلعم ضَرْبَتَيْنِ ضربةٌ لِلْوَجْهِ وضَرْبَةٌ لِلْيَدِ الى الْمِرْفَقَيْنِ -

দলীল-৩ ঃ অর্থাৎ ইবনে উমর (রা) বলেছেন, রাসূল (স) এর তায়াম্মুম ছিল দু'বার হাত মারা। একবার চেহারার জন্য, আর একবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য। (উফুদুল জাওয়া– হারুন নুকা: ৪০)

দলীল ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী– فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ

অর্থাৎ পাক পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। (এর পদ্ধতি হল) তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়কে মাসেহ কর। (নিসা: ৪৪) এ আয়াতে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়কে আলাদাভাবে মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর উযূতে একই পানি দিয়ে উভয় অঙ্গকে ধৌত করা জায়েয নয়। তেমনিভাবে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেও একই মাটি দ্বারা উভয় অঙ্গ মাসেহ করা জায়েয নয়। কেননা, তায়াম্মুম হলো উযূর স্থলাভিষিক্ত। (তানযীমুল আশতাত ঃ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২০৪)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ

দলীল হিসেবে বর্ণিত হযরত আম্মার (রা) এর হাদীসদ্বয় সংক্ষিপ্ত, এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীসের কিতাবসমূহে হযরত আম্মার (রা) এর বাণী দ্বারাই জানতে পারি–

... قال عمّارٌ يا اميرَ الْمُؤمِنِيْنَ امَا تَذْكُرُ اِذْ كنتُ انا وانتَ فِى الْاِبِلِ فَاَصَابَنَا جنابةٌ فاما اَنَا فتَمَعَّكْتُ .... الخ

অর্থাৎ .... আম্মার (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি ঐ ঘটনার কথা স্মরণ নেই, যখন আমি এবং আপনি উটের চারণ ভূমিতে ছিলাম। তখন আমরা উভয়েই অপবিত্র হই। এ সময় (পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম দ্বারা) পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে মাটির মধ্যে গড়াগড়ি দেই।

(আবু দাউদ : ১/৪৬, বুখারী ১/৪৮, মুসলিম ১/১৬১, ইবনেমাজাহ : ৪৩)

আর এ সংবাদ যখন নবী করীম (স)-এর নিকট বললেন, তখন নবী করীম (স) সংক্ষেপে উক্ত বাণী ইরশাদ করেন, যা প্রতিপক্ষ দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এর দ্বারা তায়াম্মুমের পূর্ণ পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং তায়াম্মুমের প্রসিদ্ধ পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল। আর তাহলো এই যে, গোসল ফরয অবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুমের জন্য এভাবে মাটির উপর গড়াগড়ি করার প্রয়োজন নেই, যদি একবারই হাত লাগানো যথেষ্ট হত,

তাহলে হযরত আম্মার (রা) থেকেই দু'বার হাত মারার অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হত না। এমনই একটি উদাহরণ অন্য একটি হাদীসে পাওয়া যায়–

.... عن جُبير بن مُطعم انهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما انا فافيض على رأسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما .

অর্থাৎ .... যুবায়ের ইবনে মুতঈম (রা) হতে বর্ণিত। একদা তারা রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট অপবিত্রতার গোসলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। (কেননা, তাঁরা ফরয গোসলে ভীষণ কঠোরতা অবলম্বন করতেন) তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি তো আমার মাথার উপর তিনবার পানি ঢেলে থাকি। এই বলে তিনি নিজের দুই হাতের দিকে ইশারা করেন। (আবু দাউদ : ১/৩২ বুখারী ১/৩৯, ইবনেমাজাহ: ৪৪)

প্রকাশ থাকে যে, এর অর্থ এ নয় যে, ফরয গোসলেও শুধু মাথা ধোয়া যথেষ্ট; অবশিষ্ট শরীর ধোয়া জরুরী নয়। এরূপভাবে হযরত আম্মার (রা) এর হাদীসেও এই উদ্দেশ্য নয় যে, একবার হাত মারা অথবা দু'হাতের তালু মাসেহ করা যথেষ্ট বরং এর দ্বারা প্রসিদ্ধ পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। (দরসে তিরমিযী: ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৮৮)

২. হযরত আম্মার (রা) এর সহযোগী হযরত ওমর (রা) এ হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৩. এখানে তায়াম্মুমের অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় বরং হাত মারার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য। (শরহে নাসায়ী : ১/২৮৭)

سوال : هل تمسح اليدان الى الرسغين او الى المرافق او الى المناكب والآباط؟ بين المذاهب مع الدلائل .

প্রশ্ন ঃ হাত মাসেহ করার সীমা কতটুকু? কনুই, কব্জি, বগল, না বাহুমূল পর্যন্ত দলীলসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে উভয় হাত কতটুকু মাসেহ করতে হবে। এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে– ১. ইবনে শিহাব যুহরীর মতে, উভয় হাত বগল পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

২. ইমাম আহমদ, ইসহাক, আতা, আওযায়ী ও ইবনে মুনযির (র) এর মতে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

৩. ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, সুফিয়ান সাওরী, হাসান, শা'বী (র) প্রমূখের মতে, তায়াম্মুমের ক্ষেত্র হলো উভয় হাতের কনুইয়ের উপরিভাগ পর্যন্ত মাসেহ করা।

ইবনে শিহাব যুহরীর দলীল- ১ ঃ

আল্লাহ তাআলার বাণী– فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم (النساء - ٤٤)

উল্লেখ্য যে, উযূর আয়াতে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়ার কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অত্র আয়াতে মাসেহের ক্ষেত্রে শুধু হস্তদ্বয়ের কথাই উল্লেখ রয়েছে। কনুই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়নি, অতএব পূর্ণ হাত মাসেহ করতে হবে।

দলীল- ২ ঃ عن عمار بن ياسر .... فمسحوا بايديهم كلها الى المناكب والآباط

অর্থাৎ .... আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত..... অতঃপর তারা তাদের উভয় হাত বগল পর্যন্ত মাসেহ করেন। (আবু দাউদ: ১/৪৫)

ইমাম আহমদ (র) এর দলীল-১ ঃ হযরত আম্মার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) আম্মার (রা) কে বলেন–

انما كان يكفيك وضرب النبي صلعم بيده الى الارض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه الخ.

অর্থাৎ .... তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল, এই বলে তিনি স্বীয় হাত মাটিতে মারেন, অতঃপর হাতে ফুঁ দিয়ে মুখমণ্ডল এবং দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করেন। (আবু দাউদ : ১/৪৬, বুখারী ১/৪৮, মাজাহ : ৪৩)

এখানে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করার কথা উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং এ পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

যৌক্তিক দলীলঃ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা চুরির শাস্তির বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا .

অর্থাৎ পুরুষ চোর ও মহিলা চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও (মায়েদাহ : ৩৮)

চোরের শাস্তি হিসেবে হাত কাটার কথা বলা হয়েছে, আর পরিমাণ হলো দুই কব্জি। তদ্রূপ মাসেহ এর ক্ষেত্রে ও শুধু হাত মাসেহের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর পরিমাণও হবে দুই কব্জি পর্যন্ত।

জুমহূরের দলীল- ১ ঃ

عَنْ جَابِرٍ رض عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

অর্থাৎ ... জাবের (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন তায়াম্মুম একবার চেহারার জন্য হাত লাগাবে এবং আরেকবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য হাত লাগাতে হবে। (দ্বারা কুতনী ১/১৮১)

দলীল- ২ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত–

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

অর্থাৎ ..... নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, তায়াম্মুম হলো দুবার মাটিতে হাত লাগানো। একবার চেহারার জন্য আর একবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য। (মুস্তাদরাকে হাকেম ১/১৭৯, দারাকুতনী ১/১৮০)

দলীল- ৩ ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ تَيَمُّمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

অর্থাৎ .... নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, তায়াম্মুম হলো দু'বার মাটিতে হাত লাগানো। একবার চেহারার জন্য আর একবার কুনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য। (মুস্তাদরাকে হাকেম ১/১৭৯, দারাকুতনী: ১/১৮০)

দলীল : ৩

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ تَيَمُّمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم ضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ –

অর্থাৎ .... ইবনে উমর (রা) বলেছেন, রাসূল (স) এর তায়াম্মুম ছিল দু'বার হাত লাগানো, একবার চেহারার জন্য। আর একবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য। (উকুদয যাওহারী : ৪০)

.... عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

অর্থাৎ .. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দু হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। (আবু দাউদ : ১/৪৮)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

ইবনে শিহাব যুহরী দলীল হিসেবে যে আয়াত পেশ করেছেন, এর জবাব হলো আল্লাহ তাআলা উযুর ক্ষেত্রে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়ার বিধান বর্ণনা করে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ উল্লেখ্য করেছেন। আর এটা তো সুস্পষ্ট যে, তায়াম্মুম হলো উযূর স্থলাভিষিক্ত। যেহেতু উযূর ক্ষেত্রে হাত ধোয়ার পরিমাণ কনুই পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব ঃ উক্ত হাদীসটি সাহাবাগণের আমল। যেখানে পাঁচটিরও অধিক হাদীস দ্বারা কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার প্রমাণ রয়েছে সেক্ষেত্রে সাহাবাগণের আমল ব্যতীত অন্যদের আমল দলীলযোগ্য নয়। তাছাড়া আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকেও কনুই পর্যন্ত মাসেহের হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) এর দলীলের জবাব ঃ দলীল হিসেবে বর্ণিত হযরত আম্মার (রা) এর হাদীসদ্বয় সংক্ষিপ্ত এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীসের কিতাবসমূহে হযরত আম্মার (রা) এর বাণী দ্বারাই জানতে পারি–

قَالَ عَمَّارٌ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْنَا جَنَابَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ الخ

অর্থাৎ ... আম্মার (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন? আপনার কি ঐ ঘটনার কথা স্মরণ নেই? যখন আমি এবং আপনি উটের চারণভূমিতে ছিলাম। তখন আমরা উভয়েই অপবিত্র হই। এ সময় (পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম দ্বারা) পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে মাটির মধ্যে গড়াগড়ি দেই। (আবু দাউদ : ১/৪৬, বুখারী : ১/৪৮, মুসলিম: ১/১৬১)

আর এ সংবাদ যখন নবী করীম (স) এর নিকট বললেন, তখন নবী করীম (স) সংক্ষেপে উক্ত বাণী ইরশাদ করেন যা প্রতিপক্ষ দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এর দ্বারা তায়াম্মুমের পূর্ণ পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তায়াম্মুমের প্রসিদ্ধ পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল। আর তাহলো এই যে, গোসল ফরয অবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুমের জন্য এভাবে মাটির উপর গড়াগড়ি খাওয়ার প্রয়োজন নেই, যদি একবার হাত লাগানোই যথেষ্ট হত তাহলে হযরত আম্মার (রা) থেকে দু'বার হাত মারার অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হত না। (দরসে তিরমিযী : ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৮৮)

২. হযরত আম্মার (রা) এর সহযোগী হযরত ওমর (রা) এ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৩. অথবা,এখানে তায়াম্মুমের অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় বরং হাত মারার পদ্ধতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

৪. হাদীসগুলো দ্বারা রাসূল (স) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, উযূ এবং গোসলের تيمم একই রকম একথা বুঝানো। (শরহে নাসায়ী: ১/২৮৭)

কিয়াসী দলীলের জবাব ঃ ইমাম আহমদ ও অন্যান্য ইমামগণ যে কিয়াস করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তাঁরা শব্দের উপর শব্দকে কিয়াস করেছেন। আর তিন ইমাম তায়াম্মুমকে উযূর উপর কিয়াস করেছেন। আর এটা হলো অর্থের উপর অর্থের কিয়াস। এই কিয়াসটি এজন্য প্রাধান্যযোগ্য যে, তায়াম্মুম হলো উযূর স্থলাভিষিক্ত। তাছাড়া তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে কনুইয়ের সীমা হলো অধিক সতর্কতামূলক। (দরসে তিরমিযী : ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৮৯)

سوال : مَنْ هُوَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ؟ اذكر مَنَاقِبَهُ.

প্রশ্ন ঃ আম্মার ইবনে ইয়াসার কে? তাঁর জীবনী সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর ঃ হযরত আম্মার (রা) এর জীবনচরিত

পরিচিতি : নাম আম্মার, উপনাম ابو اليقظان উপাধি الطيب ও المطيب। পিতার নাম ইয়াসার, মায়ের নাম সুমাইয়া। তিনি বনী মাখযূম এর আযাদকৃত দাস ছিলেন।

জন্মভূমি ও মক্কায় আগমন ঃ হযরত আম্মার (রা) এর মূল বাসস্থান ছিল ইয়েমেনে তারা মোট চার ভাই ছিলেন, চার ভাই এর মধ্যে একজন হারিয়ে গেলে তাঁরা তিন ভাই ও পিতা ইয়াসার তার খোঁজে মক্কায় আগমন করেন, দু'ভাই ইয়ামেনে ফিরে যান এবং তিনি মক্কা থেকে যান।

ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত আম্মার (রা) পিতা ইয়াসার ও মাতা সুমাইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পরে কুরাইশরা তাঁদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল। কুরাইশ কর্তৃক নির্যাতিত অবস্থায় একদিন তাঁদের পাশ দিয়ে গমন করা অবস্থায় রাসূল (স) বললেন, صَبْرًا يَا آلَ يَاسِرٍ فَانَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ

কথিত আছে, হযরত আম্মার (রা) কে আগুনে দগ্ধ করে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। রাসূল (স) তা দেখে বললেন,

يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَسَلَامًا كَمَا كُنْتَ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ.

যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ঃ হযরত আম্মার (রা) বদরসহ অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল (স) থেকে সর্বমোট ৬২টি হাদীস বর্ণনা করেন।

ইন্তিকাল ঃ তিনি ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত সিফফীনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। হযরত আলী (রা) এর গায়ের জামা দ্বারা তাকে কূফাতে দাফন করা হয়।

اَلْاِخْتِلَافُ فِى كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

٣١٦. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالتُّرَابِ فَمَسَحْنَا بِوُجُوْهِنَا وَاَيْدِيْنَا اِلَى الْمَنَاكِبِ -

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخُ فِى الْيَدَيْنِ

٣١٧. اخبرنا محمدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرحمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ عَبْدِ الرحمٰنِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فقال يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ رُبَّمَا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ ولَا نَجِدُ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ اَمَّا اَنَا اِذَا لَمْ اَجِدِ الْمَاءَ لَمْ اَكُنْ لِاُصَلِّىْ حَتّٰى اَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رضى الله عنه اَتَذْكُرُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَيْثُ كُنْتُ بِمَكَانِ كَذا وكَذَا وَنَحْنُ نَرْعَى الْاِبِلَ فَتَعْلَمُ اَنَّا اَجْنَبْنَا قَالَ نَعَمْ فَاَمَّا اَنَا فَتَمَرَّغْتُ فِى التُّرَابِ فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ اِنْ كَانَ الصَّعِيْدُ لَكَافِيْكَ وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ فَقَالَ اِتَّقِ اللّٰهَ يَا عَمَّارُ فقال يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ شِئْتَ لَمْ اَذْكُرْهُ قَالَ لَا وَلٰكِنْ نُوَلِّيْكَ مِنْ ذٰلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ -

---

তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ

অনুবাদ ঃ ৩১৬. আব্বাস ইবনে আবদুল আযীম আম্বরী (র).........আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলাম। এতে আমরা আমাদের চেহারা এবং কাঁধ পর্যন্ত আমাদের হাত মাসেহ করেছিলাম।

আরেক প্রকারের তায়াম্মুম এবং উভয় হাতে ফুঁক দেওয়া

৩১৭. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (র).........আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমর (রা)-এর নিকট ছিলাম। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! অনেক সময় আমরা এক মাস বা দুই মাস পর্যন্ত কোথাও অবস্থান করি অথচ কখনো কখনো আমরা পানি পেতাম না। উমর (রা) বললেন, আমি পানি না পেলে পানি পাওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করতাম না। তখন আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার মনে আছে কি যখন আমরা অমুক অমুক স্থানে ছিলাম ও উট চরাতাম? আপনি জানেন যে, আমরা জানাবতগ্রস্ত হতাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি করলাম। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলে তিনি হেসে বললেন, মাটিই

তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল, আর তিনি উভয় হাত মাটিতে মারলেন এবং তাতে ফুঁক দিলেন। তারপর তিনি তাঁর চেহারা এবং তাঁর উভয় হাতের কিয়দংশ মাসেহ করলেন। উমর (রা) বললেন, হে আম্মার! আল্লাহকে ভয় কর। আম্মার বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! যদি আপনি চান তাহলে আমি এ হাদীস বর্ণনা করব না। উমর (রা) বললেন, না। কিন্তু আমার নিকট যে রেওয়ায়াত বর্ণনা করলে এর দায়িত্বভার তোমার উপর অর্পণ করলাম।

প্রথম শিরোনাম সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পূর্বের অনুচ্ছেদে চলে গেছে।

১. আল্লামা সিন্ধী (র) বলেন, তায়াম্মুম বগল পর্যন্ত ইসলামের শুরু যুগে শরীয়ত অনুমদিত ছিল পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে যায়।

২. অথবা, এটা সাহাবাদের ইজতিহাদ ছিল। তাঁরা নবী (স) কে জিজ্ঞেস করেননি যে, কোন পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। ইজতিহাদের ভিত্তিতে আমল করেছেন। আর তাদের এ ইজতিহাদ ভুল ছিল।

৩. অথবা, এটা নবী (স) এর সাক্ষাতে হয়নি। পরন্তু তিনি উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন না। পরে এর উপর নবী (স) আপত্তিও করেননি। والله اعلم بالصواب (শরহে উর্দূ নাসায়ী ঃ ৩৮৭)

দ্বিতীয় শিরোনাম সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কোন এক প্রশ্নকারী হযরত ওমর (রা) কে জিজ্ঞেস করল আমরা কখনো কোথাও এক দুই মাস অবস্থান করে ইত্যসর সময়ে আমরা জুনুবী হয়। কিন্তু পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি পায় না তাহলে কি সুরতে তায়াম্মুম করব?

উমর (রা) উত্তর করলেন, أَمَّا أَنَا فَإِذَا لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ... الخ

অর্থাৎ যদি আমি জুনুবী অবস্থায় পানি না পাই তাহলে আমি নামায দেরী করে পড়ে থাকি। তার এ বক্তব্যের ভিত্তি হলো ইজতিহাদ তথা জুনুবী অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ না।

প্রশ্নোস্থলে আম্মার ছিলেন। তিনি ওমর (রা) এর নিকট একটি ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বলেন, اتق الله يا عمار! কোন জিনিস ভালভাবে স্মরণে না থাকলে সেটা বর্ণনা কর না। তখন আম্মার বলেন আপনি যদি এটা ভালো মনে না করেন তাহলে আমি এটা বর্ণনা করা বন্ধ করে দেব। ওমর (রা) বলেন, তুমি যা বুঝেছো তা আমার বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং আমার উদ্দেশ্য হলো তোমার যদি ভালোভাবে বিষয়টি স্মরণ থাকে তাহলে তুমি তা বর্ণনা কর এবং ফাতওয়া দাও। তবে উক্ত ঘটনায় আমাকে শামেল করবে না কারণ আমার ঘটনাটি মনে নেই।

বাকী ঘটনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে এবং সামনে ও আসবে। (শরহে/ নাসায়ী, ৩৭৫)

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّيَمُّمِ

٣١٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ التَّيَمُّمِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ فَقَالَ عَمَّارٌ اَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِىْ سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ هٰكَذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَخَ فِىْ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً -

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّيَمُّمِ

٣١٩. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَسَمِعَهُ الْحَكَمُ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَجْنَبَ رَجُلٌ فَاَتٰى عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنِّىْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدْ مَاءً قَالَ لَا تُصَلِّ قَالَ لَهُ عَمَّارٌ اَمَا تَذْكُرُ اِنَّا كُنَّا فِىْ سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْنَا فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَاِنِّىْ تَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً وَنَفَخَ فِيْهَا ثُمَّ دَلَكَ اَحَدَهُمَا بِالْاُخْرٰى ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ قَالَ عُمَرُ شَيْئًا لَا اَدْرِىْ مَا هُوَ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ لَا حَدَّثْتُهُ وَذَكَرَ شَيْئًا سَلَمَةُ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ وَزَادَ سَلَمَةُ قَالَ بَلْ نُوَلِّيْكَ مِنْ ذٰلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ -

---

আরেক প্রকারের তায়াম্মুম

অনুবাদ ঃ ৩১৮. আমর ইবনে ইয়াযীদ (র).........আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) অে ।ভথথধ:থকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এ প্রশ্নের তিনি কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। তখন আম্মার বললেন, আপনার কি স্মরণ আছে? যখন আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম, আমি জানাবতগ্রস্ত হলাম তখন আমি মাটিতে গ৯ড়াগড়ি দিলাম। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন, তোমার এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল, এ বলে শো'বা হাঁটুর উপর তাঁর উভয় হাত মেরে তাঁর হস্তদ্বয়ে ফুঁক দিলেন আর উভয় হাত দ্বারা তার মুখ ও হস্তদ্বয় একবার করে মাসেহ করলেন।

আরেক প্রকারের তায়াম্মুম

৩১৯. ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)........ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জানাবতগ্রস্ত হলে উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমি জানাবত অবস্থায় উপনীত হয়েছি কিন্তু পানি পাই না। তিনি বললেন, তুমি নামায আদায় করবে না। তখন আম্মার বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম, আমরা জানাবত অবস্থায় পতিত হলাম, তখন আমরা পানি পাইনি, এতে আপনি নামায

আদায় করলেন না কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং নামায আদায় করলাম। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। এ বলে শো'বা (র) একবার মাটিতে হাত মারলেন আর তাতে ফুঁক দিলেন আর তা দিয়ে এক হাত অন্য হাতের সাথে ঘষলেন এবং উভয় হাত দ্বারা তার মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন। তখন উমর (রা) বললেন, এ বিষয়টি আমার বোধগম্য নয়। আম্মার বললেন যদি আপনি চান তাহলে আমি তা বর্ণনা করব না।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হযরত জাফর (রা) এর পরিচিতি

এখানে যে ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে তার নাম হলো যাররা ذَرّ এ উপর যবর এবং ر, তাশদীদ বিশিষ্ট তার পিতার নাম হলো আব্দুল্লাহ মারহুবী, হামদানী কুফী। মারহুবাহ হামদানের একটি অংশ এটা বড় একটি সম্প্রদায়ের নাম, তার দিকে নিসবত করে মারহুবী বলা হয়। ইবনে মাঈন নাসায়ী ইবনে খিরাশ ও ইবনে নুমাইর তাকে সিকা সাব্যস্ত করেছেন। আবু হাতেম ও বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী ছিলেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, তিনি মুরজিয়্যাহ ছিলেন। ১ ইব্রাহীম নাখয়ী ও সাঈদ ইবনে যুবাইয়ের তার রেওয়ায়াতকে ছেড়ে দিয়েছেন। মুরজিয়্যাদের আকীদা হলো নাজাতের জন্য ঈমানই যথেষ্ট।

আব্দুর রহমান ইবনে আবযার উক্ত রেওয়ায়াত চার সনদে বর্ণনা করেছেন। যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সামনেও বিস্তারিত আলোচনা হবে। এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَضَرَبَ شُعْبَةُ ... الخ ঃ শোবা যে এ হাদীসের রাবী তিনি বর্ণনায় هٰكَذَا বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তায়াম্মুমের সুরত বর্ণনা করা। আর তা হলো উভয় হাতকে হাঁটুর উপর মারবে। অতঃপর উভয় হাতে ফুঁ দিবে অতঃপর উভয় হাত দ্বারা তার চিহারা ও হস্তদ্বয়কে মাসাহ করবে। এর দ্বারা শো'বা তায়াম্মুম এর ঐ কাইফিয়্যাত এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন যা রাসূল (স) হযরত আম্মারকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, এ সম্পর্কিত বিবরণ পেছনে গেছে। (শরহে উর্দু নাসায়ী-৩৭৭)

প্রশ্ন করে বলেন, أَوَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ هرزًا

হযরত ইবনে মাউদ তার জবাবে বলেন, أَوَلَمْ تَرعُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ আপনার কি জানা নেই? যে ওমর (রা) এর আম্মারের কথার দ্বারা এতমিনান হতে পারেননি, বরং অস্বীকার করে বলেন, اِتَّقِ اللّٰهَ يَاعَمَّارُ

হযরত ওমর (রা) হযরত আম্মারের এ সংবাদকে অস্বীকার করেন যে, আম্মার যে এ ধরনের হাদীস ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন, এটা তাঁর স্মরণে নেই, তিনিও নবী (স) এর উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন যেখানে হুজুর (স) আমাদের কথার প্রেক্ষিতে বলেছিলেন, اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ اَنْ تَقُوْلَ هٰكَذَا

نَوْعٌ اٰخَرُ

٣٢٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ اِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنِّىْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ اَمَا تَذْكُرُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا اَنَا وَاَنْتَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَلَمَّا اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ وَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِمَا فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ شَكَّ سَلَمَةُ وَقَالَ لَا اَدْرِىْ قَالَ فِيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اَوْ اِلَى الْكَفَّيْنِ قَالَ عُمَرُ نُوَلِّيْكَ مِنْ ذٰلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ قَالَ شُعْبَةُ كَانَ يَقُوْلُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَنْصُوْرٌ مَا تَقُوْلُ فَاِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ اَحَدٌ غَيْرُكَ فَشَكَّ سَلَمَةُ ذَكَرَ الذِّرَاعَيْنِ اَمْ لَا -

---

তায়াম্মুম-এর এক অন্য প্রকার

অনুবাদ ঃ ৩২০. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তামীম (র)...........আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমি জানাবতগ্রস্ত হয়েছি কিন্তু পানি পেলাম না। উমর (রা) বললেন, তুমি নামায আদায় করো না। তখন আম্মার (রা) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার স্মরণ আছে কি? একবার আমি এবং আপনি এক যুদ্ধে ছিলাম আর আমরা জানাবতগ্রস্ত হলাম কিন্তু পানি পাচ্ছিলাম না। তখন আপনি নামায আদায় করলেন না। কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং নামায আদায় করলাম। পরবর্তীতে যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তা ব্যক্ত করলাম, তিনি বললেন, তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট ছিল– এ বলে রাসূলুল্লাহ (স) মাটিতে হাত রাখলেন এবং উভয় হাতে ফুঁ দিলেন। তারপর উভয় হাত দ্বারা আপন মুখমণ্ডল ও উভয় কব্জি মাসেহ করলেন। সালামা সন্দেহ করে বলেন, আমার জানা নেই (তিনি এতে উভয় কনুই বলেছেন না উভয় কব্জি)। উমর (রা) বললেন, তুমি যে রেওয়ায়ত করলে তার দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করলাম। শো'বা (র) বলেন, তিনি উভয় হাত, মুখ মণ্ডল এবং বাহুদ্বয়ের কথা বলতেন। এজন্য মানসুর তাঁকে বললেন, আপনি কি বলছেন? আপনি ব্যতীত কেউই বাহুর কথা উল্লেখ করেন নি। এজন্য সালামার সন্দেহ হলো, তিনি বললেন, আমার স্মরণ নেই তিনি বাহুর কথা উল্লেখ করেছেন কি না।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

হযরত আনসার ইবনে ইয়াসির এর এই হাদীস মুসান্নিফ (র) বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন, কোথাও সংক্ষিপ্তাকারে আবার কোথাও বিস্তারিতভাবে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেমনিভাবে মুহদিস ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয ঠিক তদ্রূপভাবে পানির বর্তমানে জুনুবী ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম এর অনুমতি আছে। এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। এখানে ২টি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে–

১. তায়াম্মুমে দুইবার হাত মারতে হবে না কি একবার?

২. মাসাহ এর সীমা কতটুকু পর্যন্ত? এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেছনে গেছে। (শরহে উর্দু, নাসায়ী– ৩৭৮)

بَابُ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

৩২১. اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابى موسى فقال ابو موسى او لم تسمع قول قال كنت جالسا مع عبد الله وابى موسى فقال ابو موسى اولم تسمع قول عمار لعمر بعثنى رسول الله ﷺ فى حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت بالصعيد ثم اتيت النبى ﷺ فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه على الارض ضربة فمسح كفيه ووجهه فقال عبد الله اولم تر عمر لم يقنع بقول عمار.

জুনুবী ব্যক্তির তায়াম্মুম

অনুবাদ ঃ ৩২১. মুহাম্মদ ইবনে আ'লা (র).......শকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ এবং আবূ মূসা (রা)-এর সঙ্গে বসাছিলাম, তখন আবূ মূসা বললেন, তুমি কি আম্মারের কথা শুননি যা তিনি উমর (রা)-কে বলেছেন, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এক কাজে পাঠালেন, আমি জানাবতগ্রস্ত হলে পানি পেলাম না। অতএব আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তাঁর হস্তদ্বয় একবার মাটিতে মারলেন। তারপর উভয় হাত মাসেহ করলেন এবং উভয় হাত ঝেড়ে ফেললেন ও তাঁর বাম হাত ডান হাতের উপর মারলেন। আর ডান হাত বাম হাতের উপর এবং মুখমণ্ডল ও কব্জির উপর। আবদুল্লাহ বললেন, তুমি কি দেখছ না যে, উমর (রা) আম্মারের কথায় তৃপ্ত হননি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

শাকীক ইবনে সালমা আলোচ্য রেওয়ায়াতে জুনুবীর জন্য তায়াম্মুম বৈধ কিনা এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) এর মধ্যকার বিতর্ক উল্লেখ করেছেন। রাবী বলেন, হযরত ওমর (রা) এর ন্যায় হযরত ইবনে মাসউদ ও জুনুবীর তায়াম্মুমের অনুমতি দেননা। এ ব্যাপারে হযরত আবু মুসা আশয়ারীর সাথে তার বিতর্ক হয়– যেহেতু হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) মুহদিস ও জুনুবী উভয়ের জন্য ব্যাপকভাবে তায়াম্মুমের প্রবক্ত ছিলেন। এজন্য হযরত ইবনে মাসউদ এর উপর প্রশ্ন করে বলেন–

اَوَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ رض ... الخ হযরত ইবনে মাসউদ তার জবাবে বলেন, اَوَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ আপনার কি জানা নেই? যে হযরত ওমর (রা) আম্মারের কথার দ্বারা এতমিনান হতে পারেননি। বরং অস্বীকার করে বলেন, اِتَّقِ اللّٰهَ يَا عَمَّارُ হযরত ওমর (রা) হযরত আম্মারের এ সংবাদকে অস্বীকার করেন যে, আম্মার যে, এ ধরণের হাদীস ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন, এটা তাঁর স্মরনে নেই। অথচ সেও নবী (স) এর উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। যেখানে হুজুর (স) আম্মারের কথার প্রেক্ষিতে বলেছিলেন–

اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ اَنْ تَقُوْلَ هٰكَذَا

মোটকথা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) জবাবের সারসংক্ষেপ হলো হে আবু মূসা! যখন স্বয়ং ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই অস্বীকারকারী তাহলে এর উপর ভিত্তি করে আমার উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা কিভাবে ঠিক হলো? এর

পরবর্তী ঘটনা কি সে সম্পর্কে নাসায়ীর এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় উল্লেখ নেই। বুখারী ও মুসলিমে তা উল্লেখ আছে। হযরত আবু মূসা (রা) প্রমাণ পেশের পদ্ধতি পরিবর্তন করে বলেন, আবু আব্দুর রহমান আম্মার বিন ইয়াসির এর উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

সূরা মায়েদার তায়াম্মুমের জবাব কি? যখন হযরত আবু মূসা আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন তখন হযরত ইবনে মাসউদ (র) উক্ত ব্যাপকতাকে মেনে নেন। উক্ত হুকুম হদসে আসগর ও হদসে আকবর উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যদি এটা অস্বীকার কর তাহলে জরুরী আয়াতের জবাব দাও। কিন্তু তিনি কোন জবাব দেননি। বরং এ ব্যাপারে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) নিরব থাকেন পরে কথার ভঙ্গিমা পরিবর্তন করে ইহতিয়াতের সাথে শুধুমাত্র একথা বলেন, আমি যদি জুনুবীকে তায়াম্মুমের অনুমতি দেই তাহলে আমার তো মনে হয় অনেকে সামান্য ঠাণ্ডা পড়লেও গোসল ছেড়ে তায়াম্মুম করবে। এর দ্বারা বুঝা যায় হযরত ইবনে মাসউদ (রা) জুনুবীর জন্য তায়াম্মুম করার প্রবক্তা ছিলেন, কিন্তু সতর্কতার জন্য তার উপর ফাতওয়া প্রদান করতেন না। এটা তার ইজতিহাদী বিষয় ছিল। কেননা, আবু মূসা আশআরী বলেন, আমি শাকীক ইবনে সালামাকে বললাম, হযরত ইবনে মাসউদ এ কারণে এর উপর ফাতওয়া প্রদান করেননি যে, এর উপর ফতওয়া দিলে লোকেরা সামান্য সমস্যার সম্মুখিন হলে গোসল ত্যাগ করে তায়াম্মুম করবে। কিন্তু বলা হয় তিনি পরবর্তীতে তার কথা থেকে রুজু করেন এবং জুনুবীর তায়াম্মুমের প্রবক্তা হন।

এর দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হযরত আবু মূসা (রা) যে তায়াম্মুমের আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, তাতে أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ আছে যার দ্বারা বোঝা যায় ইবনে মাসউদ (রা) এর নিকট مُلَامَسَة দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য এজন্য আবু মূসা আশআরী (রা) এর দলীলের কোন জবাব দেননি। অন্যথায় যদি مُلَامَسَة দ্বারা হাত এর মাধ্যমে স্পর্শ করা উদ্দেশ্য হত। তাহলে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলতে পারতেন যে, হে আবু মূসা! তুমি যে আয়াত দ্বারা জুনুবী ব্যক্তির তায়াম্মুমের উপর প্রমাণ পেশ করছ তার সাথে জানাবাতের কোন সম্পর্ক নেই বরং এটা হদসে আসগরের কথা। আর مُلَامَسَة দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা হাতের মাধ্যমে স্পর্শ করা উদ্দেশ্য। কিন্তু হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এমন কোন কথা বলেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় লোকেরা لَامَسْتُمْ এর অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে لَمْس بِالْيَد এর সম্বন্ধ তার দিকে করে এটা সঠিক নয়। (শরহে উর্দু নাসায়ী: ৩৮৩-৩৮৪)

بَابُ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

٣٢٢. اخبرنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ -

অনুচ্ছেদ ঃ মাটি দ্বারা তায়াম্মুম

অনুবাদ ঃ ৩২২. সুয়ায়দ ইবনে নাসর (র).......আবু রাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে লোকদের সঙ্গে নামায আদায় না করে আলাদা থাকতে দেখলেন। তিনি বললেন, হে অমুক! লোকদের সঙ্গে নামায আদায় করতে কোন বস্তুটি তোমাকে বাধা দিল? সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জানাবতগ্রস্ত হয়েছি অথচ পানি নেই। তিনি বললেন, তুমি মাটি ব্যবহার কর, তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ

১. ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও দাউদ যাহেরীর মতে মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না। তাঁদের দলীল–

حديث حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صلّى الله عليه وسلم قَالَ جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا

অর্থাৎ .... হযরত হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেন, যখন আমরা পানি না পাই মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রকারী করা হয়েছে।

২. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র) এর মতে, মাটি ও মাটি জাতিয় পদার্থ দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয আছে। যেমন পাথর, বালি, খড়িমাটি, চুনা পাথর ইত্যাদি। তাদের দলীল–

١. قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। এখানে صعيد দ্বারা মাটি ও মাটি জাতীয় বস্তুকে বুঝানো হয়েছে।

٢. وفي رواية انه عليه السلام تَيَمَّمَ مِنَ الْحَائِطِ

রাসূল (স) প্রাচীরে তায়াম্মুম করেছেন (আহমদ)।

٣. وفي رواية انه عليه السلام قَالَ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وطَهُورًا এখানে الارض শব্দটি عام যা সব রকম মাটি ও মাটি জাতীয় বস্তুকে বুঝায়।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

তাঁদের দলীলের উত্তরে বলা যায় যে, تُرْبَتُهَا طَهُورًا এর হাদীসটি আমাদের খেলাফ নয়। কেননা, অত্র হাদীস দ্বারা মাটি দিয়ে তায়াম্মুম সাব্যস্ত হয়। আর অন্যান্য হাদীস দ্বারা মাটি জাতীয় বস্তু দিয়েও তায়াম্মুম করা জায়েয সাব্যস্ত হয়।

صَعِيْد সম্পর্কে আলোচনা ঃ

ইমাম বায়যাবী (র) শাফেয়ী মাযহাব অবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও صَعِيْد এর তাফসীর মাটি দ্বারা করেননি। আর কামূসে صعيد বলা হয়েছে মাটি ও ভূপৃষ্ঠকে। এখন কেউ বলতে পারে কামূসের বক্তব্য অনুসারে صَعِيْد এর দুই অর্থ ১. মাটি ২. ভূপৃষ্ঠ। এখানে কিভাবে বুঝা গেলো যে, صَعِيْد দ্বারা ভূপৃষ্ঠ উদ্দেশ্য? এর জবাবে তাফসীরে মাযহারী গ্রন্থকার বলেন, এখানে صَعِيْد দ্বারা ভূপৃষ্ঠ উদ্দেশ্য; মাটি নয়। এর করীনা বা আলামত হলো আল্লাহর বাণী- مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ এখানে صعيد দ্বারা উৎপাদন স্থল ধরলে সমস্যায় পড়তে হয়। কেননা, যাঁরা পাহাড় ও অনুৎপাদনযোগ্য ভূমিতে বসবাস করে তাদের জন্য উৎপাদনস্থল পাওয়া কষ্টকর। আর শরীয়ত কষ্টকে উঠায়ে দিয়েছে। তাই এখানে صَعِيْد দ্বারা تُرَاب مُنْبِتْ উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে মুতলাক মাটি উদ্দেশ্য। মোটকথা, আল্লাহ তাআলার বাণী দ্বারা বুঝা গেলো এখানে صعيد শব্দটি ভূপৃষ্ঠের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দলীল ঃ ২ আবু হানীফা (র) হাদীসে মারফু দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, جُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا নবী (স) বলেন, আমার জন্য জমিনকে مسجد ও مُطَهِّر করে দেয়া হয়েছে। আর الارض এর অর্থ হলো جنس زمين কাজেই মাটি জাতিয় জিনিস طهور হবে। অনুরূপভাবে এক হাদীসে এসেছে-

اَيُّمَا رَجُلٍ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ فَلْيُصَلِّ

মানুষের যেথায় নামাযের সময় হয়ে যায় সেথায় নামায আদায় করে নেবে। এটা তায়াম্মুমের ব্যাপারে বর্ণিত, ইবনে কাত্তান বলেন, এই হাদীস ارض দ্বারা ভূপৃষ্ঠ বা মাটি জাতীয় জিনিস উদ্দেশ্য হওয়ার প্রমাণ। কেননা, কখনো বালুকা ময়দানে, কখন অনুৎপাদনশীল ভূমিতে, কখন পাহাড়ে নামাযের সময় হয়। সুতরাং ইমাম আহমদ (র) এর বর্ণনা অনুযায়ী- فَعِنْدَهُ طَهُوْرُهُ وَمَسْجِدُهُ

সে সেখানে নামায আদায় করে নেবে যেখানে নামাযের সময় হয়। কারণ পবিত্রতা অর্জন করার বস্তু ও মসজিদ তার নিকটেই বিদ্যমান। অনুরূপভাবে আনাস (রা) এর রেওয়ায়াত-

جُعِلَتْ لِيْ كُلُّ اَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا

এ সকল হাদীস দ্বারা বুঝা যায় জমিনের সকল অংশ পবিত্র/ পবিত্রকারী। সুতরাং যেমনিভাবে জমিনের সকল অংশে নামায আদায় করা জায়েয আছে ঠিক তদ্রূপ জমিনের সকল অংশ দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ।

(শরহে উর্দূ নাসায়ী : ৩৮৬)

بَابُ الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

٣٢٣. اخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن ايوب عن ابى قلابة عن عمرو بن بجدان عن ابى ذر قال قال رسول الله ﷺ الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين -

অনুচ্ছেদ ঃ এক তায়াম্মুমে কয়েক নামায আদায় করা

অনুবাদ ঃ ৩২৩. আমর ইবনে হিশাম (র).........আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পবিত্র মাটি মুমিনের উযূর উপকরণ, যদিও সে দশ বৎসর পানি না পায়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে শরীরে পানি লাগানোর অর্থ হলো গোসল করা। আর উত্তম শব্দটি এখানে ফরজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই হাদীসের উপর ভিত্তি করেই ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এক তায়াম্মুমে যত ইচ্ছা নামায আদায় করতে পারবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, প্রতি ওয়াক্তে নামাযের জন্য নতুন করে তায়াম্মুম করা আবশ্যক। এই হাদীস দ্বারা দশ বছর উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যত দিন পানি না পাওয়া যাবে ততদিন পাক মাটি যা মাটি জাতিয় বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ এবং সেই পবিত্রতা দ্বারা সব রকম ইবাদত করা যাবে, তবে পানি পাওয়ার সাথে সাথেই তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (শরহে মিশকাত ১/৩৯৫)

سوال : هل التيمم طهارة مطلقة ام طهارة ضرورية هل تجوز الصلوة المفروضة المتعددة فى اوقاتها ام لابد لكل صلوة تيمما مستقلا .

প্রশ্ন ঃ তায়াম্মুম জরুরত সাপেক্ষ পবিত্রতা না কি স্বাভাবিক পবিত্রতা? একই তায়াম্মুম দ্বারা বিভিন্ন ফরয নামায নির্দিষ্ট সময় আদায় করা জায়েয? না কি প্রতি নামাযের জন্যে নতুন করে তায়াম্মুম করতে হবে?

উত্তর ঃ তায়াম্মুম طهارة مطلقة ঃ طهارة ضرورة بقدر এ বিষয়ে ইমাম চুতষ্ঠয়ের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে, নিম্নে তা প্রদত্ত হলো–

১. ইমাম মালেক (র); ইমাম শাফেয়ী (র) ও ইমাম আহমদ (র) এর মতে, তায়াম্মুম طهارة ضرورية অতএব, এক তায়াম্মুম দ্বারা একটি ফরয নামায সহীহ হবে। তবে সেই ওয়াক্তের নফলও পড়া যাবে। কারণ নফল হচ্ছে ফরজের অনুবর্তী। আর ওয়াক্ত চলে গেলে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। প্রতি ওয়াক্তের জন্যে নতুনভাবে অযূ করতে হবে। তারা দলীল হিসেবে বলেন, الضرورة تتقدر بالضرورة

২. ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তায়াম্মুম উযূর মতো طهارة اصلية তথা মৌলিক পবিত্রতা তবে মর্যাদাগতভাবে উযূর একই তায়াম্মুম দ্বারা অনেক ফরয আদায় করা জায়েয। তাই প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্যে নতুনভাবে উযূ করার প্রয়োজন নেই। তিনি স্বীয় অভিমতের সমর্থনে নিম্নের দলীলগুলো পেশ করেন।

ক. মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে– الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين

গ. জনৈক সাহাবী জানাবাতের কারণে নামায না পড়লে রাসূল (স) তাকে লক্ষ্য করে বলেন–

عليك بالصعيد فانه يكفيك

এখানে রাসূল (স) يكفيك বলেছেন এতেই বুঝা যায়। তায়াম্মুম হচ্ছে طهارة اصلية তথা طهارة مطلقة

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব ঃ ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে বলা যায় যে, نص এর বিপরীতে কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ পাক তায়াম্মুমের হুকুম স্বাভাবিকভাবে কয়েদ ছাড়া বলেছেন, (শরহে নাসায়ী ১/২৮৩-২৮৪)

بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلاَ الصَّعِيْدَ

٣٢٤. اخبرنا اسحق بْنُ ابراهيمَ حَدَّثَنَا ابو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى اللّٰه عنه قَالَتْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَنَاسًا يَطْلُبُوْنَ قِلاَدَةً كَانَتْ لِعَائِشَةَ رضى اللّٰه عنها نَسِيَتْهَا فِى مَنْزِلٍ نَزَلَتْهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَوةُ وَلَيْسُوا عَلَى وَضُوْءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلُّوا بِغَيْرِ وَضُوْءٍ فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّيَمُّمِ قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَ اللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ خَيْرًا -

٣٢٥. اخبرنا محمدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ مُخَارِقًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ طَارِقٍ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَبْتَ فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحْوَ مَا قَالَ لِلْآخَرِ يَعْنِى أَصَبْتَ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পানি এবং মাটি কোনটাই না পায়

অনুবাদ ঃ ৩২৪. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) উসায়দ ইবনে হুযায়র (রা) এবং আরও কয়েক ব্যক্তিকে হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি হার তালাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন, যা তিনি যে মন্‌যিলে অবতরণ করেছিলেন তথায় হারিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হল, অথচ লোকদের উযূ ছিল না, আর তারা পানিও পাচ্ছিলেন না। তখন তাঁরা উযূ ব্যতীতই নামায আদায় করলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তা উল্লেখ করলেন, এমন সময় আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। উসায়দ ইবনে হুযায়র (রা) বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন, যখনই আপনার নিকট এমন কোন বিপদ আপতিত হয় যা আপনি অপছন্দ করেন, তার মধ্যেই আল্লাহ তাআলা আপনার ও মুসলমানদের জন্য কোন কল্যাণ নিহিত রাখেন।

পূর্বের বাকী অংশ/ তাত্ত্বিক আলোচনা ঃ এই হাদীস হযরত আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, কেউ বলেন, তার নাম ছিল– جندب بن جنادة قيس ছিল। কেউ কেউ বলেন, بربر , তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তার অসংখ্য গুণাগুণ রয়েছে। তিনি দুনিয়া বিমূখ ছিলেন। ৩২ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। হযরত উসমান (রা) এর খেলাফত আমলে হযরত আবু যর (রা) সফর করে স্ত্রীর কাছে জানাবাত সংশ্লিষ্ট হওয়ার পর পবিত্রতা অর্জন করার জন্য পানি পান নি, মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়াত–

فَاَصَابَتْنِى جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمْتُ بِالصَّعِيْدِ وَصَلَّيْتُ اَنَا فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ ذَالِكَ حَتّٰى ظَنَنْتُ ...الخ

তিরি হুজুরকে সংবাদ দিলে হুজুর (স) বলেন, الخ ... اَلصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ পবিত্র মাটিই মুসলমানের উযূ। যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না যায়। وضوء শব্দের واو বর্ণটি যবর বিশিষ্ট। এটা طهور এর অর্থে, আর طهور অর্থ হলো পবিত্রকারী। উদ্দেশ্য হবে পবিত্র মাটি মুসলমানের পবিত্রকারী যদিও ১০ বছর পানি পাওয়া না যায়। কেউ কেউ বলেন, وضوء শব্দটির واو বর্ণটি হলো পেশ বিশিষ্ট, উদ্দেশ্য হবে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করারা বিধান শুধুমাত্র মুসলমানদের দেয়া হয়েছে। মোটকথা, তায়াম্মুম طهارة ناقصة নয় বরং উযূর ন্যায় طهارة كاملة আর হাদীসে দশ বছর দ্বারা দীর্ঘ সময়কে বুঝানো হয়েছে। নির্ধারিত সময় বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো যদিও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পানি না পাওয়া যায় মুসলমানগণ মাটি দ্বারা পবিত্র অর্জন করবে। মোটকথা, হাদীস থেকে বুঝা যায় নামাযের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার দ্বারা তায়াম্মুম নষ্ট হয় না। কারণ এটা উযূর ন্যায় طهارة مطلقة পানি না পাওয়া পর্যন্ত তা বাকী থাকবে। (শরহে উর্দু নাসায়ী : ৩৮৭)

২৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)........তারিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জানাবতগ্রস্ত হলো সেজন্য সে নামায আদায় করল না। এরপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তা বর্ণনা করল, তিনি বললেন, তুমি ঠিক করেছ। এরপর অন্য একটি লোক জানাবতগ্রস্ত হয়ে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করল; পরে ঐ ব্যক্তি তাঁর নিকট এলে তিনি অন্য ব্যক্তিকে যা বলেছিলেন তাকেও তা বললেন। অর্থাৎ "তুমি ঠিকই করেছ।"

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : اكتُبْ مَسْئَلَةَ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ مَنْ هُو ومَا المَذاهِبُ فِى صَلوتِه

প্রশ্ন ঃ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ এর মাসআলা কি? এ ব্যাপারে কতটি মাযহাব আছে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ অর্থাৎ যার নিকট না পানি আছে না মাটি। অথবা যে পানি ও মাটি ব্যবহারে অক্ষম। তার নামায আদায়ের ব্যাপারে ইমামদের মতপার্থক্য রয়েছে।

১. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এমতাবস্থায় নামায পড়বে না। পরবর্তীতে কাযা আদায় করে নিবে, দলীল হল- قوله عليه السلام لَاتُقْبَلُ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ

এছাড়া রাসূলে করীম (স) বলেছেন, পবিত্রতা নামাযের চাবি।

২. ইমাম আহমদ (র) এর মত হলো ঐ অবস্থায় তুহারাত ব্যতীত নামায আদায় করবে কাযা করবে না।

৩. ইমাম মালেক (র) এর মত হলো এরূপ ব্যক্তি হতে নামায রহিত হয়ে যায়। তার উপর তখন নামায পড়া বা তার কাযা আদায় করা জরুরী নয়। কারণ পবিত্রতা হাসিলে অক্ষম হওয়ায় তার উপর নামায আদায় ওয়াজিব নয়। এবং কাযা করাও জরুরী নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) থেকে এ ব্যাপারে পাঁচটি উক্তি বর্ণিত আছে।

ক. ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত।

খ. ইমাম আহমদ (র) এর মত।

গ. ইমাম মালেক (র) এর মত।

ঘ. মুস্তাহাব হিসেবে নামায আদায় করে নিবে, পরে ওয়াজিব হিসেবে কাযা করে নিবে।

ঙ. নামায পড়া ও কাযা আদায় করা উভয়টি ওয়াজিব। এটার উপরই ফতোয়া।

চ. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ ব্যক্তি তখন শুধু মুসল্লীদের সাথে সামঞ্জস্য অবলম্বন করবে। পরবর্তীতে তার কাযা করা আবশ্যক। শরীয়তে তার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন- কোন শিশু যদি রমযানের দিনে বালেগ হয় অথবা কাফির মুসলমান হয় অথবা ঋতুবর্তী মহিলা পবিত্র হয়, তাহলে অবশিষ্ট দিনে খানা-পিনা সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে এবং রোযাদারদের সাথে সামঞ্জস্য অবলম্বন করতে হবে। অতঃপর তার কাযা আদায় করতে হবে। তদ্রূপ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ ইমাম আবু হানীফা (র) এই মতের দিকে রুজু করা প্রমাণিত আছে। হানাফীদের নিকট এর উপর ফাতওয়া। (শরহে তিরমিযী ৩০৩)

বিস্তারিত বিরবণ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

كتاب المياه

قال الله تعالى : وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

٣٢٦. اخبرنا سُويد بنُ نصرٍ قال حَدَّثنا عبدُ اللّٰهِ بنُ المُبارك عَنْ سُفيانَ عَن سماكٍ عَنْ عِكرمةَ عَنِ ابنِ عبّاسٍ رضى اللّٰه عنهما اَنَّ بَعْضَ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اِغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنابةِ فتوضّا النبىُّ ﷺ بِفَضْلِها فذكرتْ ذٰلك لَهُ فَقَال اِنَّ الماءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ﷺ

অধ্যায় ঃ পানির বিবরণ

অনুবাদ ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন– "এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। (২৫ ঃ ৪৮)
এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন তদ্বারা তোমাদের পবিত্র করার জন্য। (৮ ঃ ১১)
এবং যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে।" (৪ ঃ ৪৩)

৩২৬. সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (র)........ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে একজন জানাবতের গোসল করলে তাঁর গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স) উযূ করলেন, পরে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তা উল্লেখ করলে তিনি বললেন, পানিকে কোন বস্তুই নাপাক করে না।"

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

কিতাবের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত হুকুম আহকাম, মাসআলা মাসায়িল আলোচনা করা হয়েছে তা ছিল আল্লাহ তাআলার বাণী– يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ এর তাফসীর সংশ্লিষ্ট। কেননা, পবিত্র আয়াতে উযূ গোসলের হুকুম আহকাম এবং তায়াম্মুম পানি না পাওয়া বা পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়ার সুরতে উযূ গোসলের স্থলাভিষিক্ত বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই যত হাদীস পূর্ববর্তী বাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে সবকটিই উক্ত আয়াতের তাফসীর।

এখান থেকে মুসান্নিফ (র) ঐ সকল হাদীস বর্ণনা করছেন যেগুলো পানির আহকাম সংক্রান্ত। যদিও এতদসংক্রান্ত বহু আহকাম পিছে অতিবাহিত হয়েছে। তবে পূর্বে আলোচনাটা অনুবর্তী বা প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। আর এখানে মূল উদ্দেশ্যগতভাবে করেছেন। শিরোনামের শুরুতেই কুরআনের একটি আয়াত আনা হয়েছে এ উদ্দেশ্য যে, এ অধ্যায়ে যত হাদীস উল্লেখ করা হবে সব উক্ত আয়াতের তাফসীর। শিরোনামের হাদীস হলো–

(١) اِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ . (٢) اِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (ترمذى . ابوداود . ابن ماجة)

এ হাদীস দু'টি এনে মুসান্নিফ (র) কতক নবী পন্থির চিন্তাধারাকে খণ্ডন করেছেন। তাদের ধারণা ছিলো জুনুবীর উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করা হতে বিরত থাকা চাই, তাদের এহেন ধারণা রদ করার জন্যে নবী (স) বলেন, اِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ কোন কিছুতে পানি অপবিত্র করতে পারে না। সুতরাং জুনুবীর উদ্বৃত্ত পানি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও অমূলক। কেননা, উযূ গোসলের পর জুনুবীর যে উদ্বৃত্ত পানি থাকে তা অপবিত্র নয়। (শরহে উর্দু নাসায়ী ৩৯১–৩৯২)

بَابُ ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

٣٢٧. اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا الوليد بن كثير حدثنا محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن ابى سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله ﷺ اتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شئ -

٣٢٨. اخبرنا العباس بن عبد العظيم حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف بن طريف عن خالد بن ابى نوف عن سليط عن ابن ابى سعيد الخدري عن ابيه قال مررت بالنبى ﷺ وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت اتتوضأ منها وهى يطرح فيها ما يكره من النتن فقال الماء لا ينجسه شئ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ বুযাআ নামক কূপ প্রসঙ্গে আলোচনা

অনুবাদ ঃ ৩২৭. হারুন ইবনে আবদুল্লাহ (র)........আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করা হলো– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি বুযাআ কূপে উযূ করব? তা তো এমন কূপ যাতে কুকুরের মাংস, হায়েযের ন্যাকড়া ও আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়? তিনি বললেন, পানি পবিত্র, তাকে কোন বস্তুই নাপাক করে না।

অনুবাদ ঃ ৩২৮. আব্বাস ইবনে আবদুল আযীম (র).........আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাশ দিয়ে গমন করলাম, তখন তিনি বুযাআ কূপের পানি দ্বারা উযূ করছিলেন। আমি বললাম, আপনি কি এই কূপের পানি দ্বারা উযূ করছেন? অথচ তাতে ঘৃণিত আবর্জনাদি নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। তখন তিনি বললেন, পানিকে কোন বস্তুই নাপাক করে না।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

بِئْرِ بُضَاعَةَ এটি মদীনা মুনাওয়ায়ার একটি প্রসিদ্ধ কুয়ার নাম। এতে হায়েযের ন্যাকড়া এবং দুর্গন্ধ জাতীয় বস্তু ফেলা হত। জায়গাটি নিচু হওয়ার কারণে ঢল ও স্রোতে বিভিন্ন ময়লা তথায় নিক্ষিপ্ত হত। এটাকেই রাবী এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যদ্বারা বুঝা যায় পার্শ্ববর্তী লোকজনই এগুলো ফেলতো।

بَابُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَآءِ

٣٢٩. اخبرنا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِىُّ حدّثنا ابُو اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ اذا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ -

٣٣٠. اخبرنا قُتَيْبَةُ قَالَ حدّثنا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَامَ اِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُزْرِمُوْهُ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ -

٣٣١. اخبرنا عَبْدُ الرحمٰن بنِ ابراهيم عَنْ محمدِ بْنِ عبدِ الوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيْدِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عبدِ اللّٰهِ عَنْ ابى هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ اَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فقال لهم رسولُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ وَاَهْرِيْقُوا على بَوْلِه دلوًا من ماءٍ فانَّما بُعِثْتُم مُيَسِّرِيْنَ ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ পানির পরিমাণ নির্ণয়

অনুবাদ ঃ ৩২৯. হুসায়ন ইবনে হুরায়ছ মারওয়াযী (র)..........আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল। আর যে পানিতে কোন কোন সময় চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র পশু অবতরণ করে, সে সম্পর্কেও। তিনি বললেন, যখন পানি দুই "কুল্লা" পরিমাণ হয় তখন তা নাপাক হয় না।

৩৩০. কুতায়বা (র)..........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুইন মসজিদে পেশাব করলে উপস্থিত লোকদের মধ্য কেউ কেউ তাকে তিরস্কার করতে উদ্যত হল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাকে বাধা দিও না। যখন ঐ ব্যক্তি পেশাব করা শেষ করল তখন তিনি এক বালতি পানি আনিয়ে তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।

৩৩১. আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম (র).........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন লোক মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করল। উপস্থিত লোকজন তাকে পাকড়াও করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ (স) তাদের বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে নরম ব্যবহার করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারের জন্য নয়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

আলোচ্য অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত বিবরণ পেছনে بَابُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَاءِ তে অতিবাহিত হয়েছে এবং তৃতীয় হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত বিবরণ تركُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَاءِ এর অধীনে আলোচিত হয়েছে।

النَّهْىُ عَنْ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِى الْمَآءِ الدَّائِمِ

۳۳۲. اخبرنا الحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وانا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو وهُوَ ابْنُ الحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ انّ اَبَا السَّائِبِ حَدَّثه اَنّه سَمِعَ اباهُرَيرةَ يقولُ قال رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لا يَغْتَسِلُ اَحَدُكُم فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وهُو جُنُبٌ -

الْوُضُوْءُ بِمَاءِ الْبَحْرِ

۳۳۳. اخبرنا قُتَيْبَةُ عَن مالِكٍ عَنْ صَفْوانَ بْنَ سُلَيْمٍ عَن سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ اَنّ الْمُغِيرةَ ابْنَ اَبِى بُرْدَةَ اخبره اَنّه سَمِعَ اَبَا هريرةَ يقولُ سالَ رجلٌ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ فقال يا رسولَ اللّٰه ﷺ انا نركبُ البَحْرَ ونَحمِلُ مَعَنا القليْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّاْنَابِهِ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فقالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ الحِلُّ مَيْتَتُه -

---

বদ্ধ পানিতে জুনুবী ব্যক্তির গোসল করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

অনুবাদ ঃ ৩৩২. হারিস ইবনে মিসকীন (র)........বুকায়র (র) থেকে বর্ণিত। আবু সাইব তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন জানাবত অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে।

সমুদ্রের পানি দ্বারা উযূ করা

৩৩৩. কুতায়বা (র)...........সাঈদ ইবনে আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। মুগীরা ইবনে আবু বুরদা (র) তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি এবং আমাদের সাথে করে স্বল্প পানি নিয়ে যাই। আমরা যদি ঐ পানি দ্বারা উযূ করি তবে আমরা পিপাসায় কষ্ট পাব, এমতাবস্থায় আমরা সমুদ্রের পানি দ্বারা উযূ করব কি? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এর পানি পবিত্র, আর এর মৃত জীব হালাল।

প্রথম অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেছনে- بابُ النَّهْىِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ অনুচ্ছেদে আলোচি ত হয়েছে। প্রয়োজনে সেখানে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য بابُ مَاءِ الْبَحْرِ এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

٣٣٤. اخبرنا اسحٰقُ بْنُ ابراهيم قال حدثنا جريرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قالت كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يقولُ اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خطاياىَ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ونَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ -

٣٣٥. اخبرنا علىُّ بْنُ حُجْرٍ قال اخبرنا جريرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عمرِو بْنِ جريرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قالَ كانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يقولُ اللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ -

بَابُ سُؤْرِ الْكَلْبِ

٣٣٦. اخبرنا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ابى رَزِيْنٍ وَاَبِى صالحٍ عَنْ ابى هريرةَ قالَ قالَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ اذا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ বরফ ও বৃষ্টির পানি দ্বারা উযূ করা

অনুবাদ ঃ ৩৩৪. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলতেন–اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ "হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ বরফ ও মেঘের পানি দ্বারা ধৌত কর, আর আমার অন্তঃকরণকে গুনাহ থেকে পরিষ্কার কর, যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করে থাক।"

৩৩৫. আলী ইবনে হুজর (র)......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলতেন –اللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ "হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ বরফ, পানি এবং মেঘের পানি দ্বারা ধুয়ে ফেল।"

অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের উচ্ছিষ্ট

৩৩৬. আলী ইবনে হুজর (র).........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যখন কুকুর তোমাদের কারো কোন পাত্রে মুখ দেয়, তখন তাতে যা ছিল তা ফেলে দেবে, আর তা সাতবার ধুয়ে ফেলবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের বিস্তারিত আলোচনা পূর্বের– الوُضُوْءُ بِمَاءِ الثَّلْجِ - بَابُ الْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ ও بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبِئْرِ অনুচ্ছেদে করা হয়েছে। কাজেই এ সম্পর্কে সেখানে দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেছনে করা হয়েছে। কাজেই এতদ সম্পর্কিত মাসআলা জানার জন্য। باب سُور الكلب অনুচ্ছেদে দেখতে পাবে।

بَابُ تَعْفِيرِ الْاِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيْهِ

٣٣٧. اخبرنا محمدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قال حدّثنا خالدٌ يعنِى ابْنِ الحارث عَنْ شُعْبة عن ابِى التَّيَّاحِ قال سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبدِ اللّٰه بْنِ مُغَفَّل انّ رسولَ اللّٰه ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ وَرَخَّصَ فِيْ كَلْبِ الصَّيْدِ والغَنَمِ وقال اِذا وَلَغَ الكلبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوه سَبْعَ مَرَّاتٍ وعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ -

٣٣٨. اخبرنا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قال حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اسدٍ قال حدّثنا شعبةُ عَنْ ابى التَّيَّاحِ يزيدُ ابْنُ حميدٍ قال سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَن عبدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قال اَمَرَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الكِلابِ قالَ مَابَالُهم وبَالُ الكِلابِ قالَ وَرَخَّصَ فِى كلبِ الصَّيْدِ وكَلْبِ الغَنَمِ وقال اِذا وَلَغَ الكلبُ فِى الاِنَاءِ فَاغْسِلُوه سبعَ مَرَّاتٍ وعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ خَالَفَه ابُو هريرةَ فقال اِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ -

٣٣٩. اخبرنا اسحٰقُ بْنُ ابراهيمَ حَدَّثَنَا مُعاذ بنُ هِشَامٍ قال حَدَّثَنَا ابِىْ عَن قَتَادةَ عَن خِلاَسٍ عَنْ ابى رَافِعٍ عَنْ ابِىْ هُرَيرةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قال اذا وَلَغَ الكلبُ فِى اِنَاءِ اَحَدِكُم فَلْيَغْسِلْه سَبْعَ مَرَّاتٍ اُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ -

٣٤٠. اخبرنا اسحٰقُ بْنُ اِبراهيمَ قال حَدَّثَنَا عبدةُ بْنُ سليمانَ عَنِ ابنِ ابى عَرُوبةَ عن قتادةَ عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ عَنْ ابى هُرَيرةَ عَنِ النبىِّ ﷺ قال اِذا وَلَغَ الكلبُ فِى اناءِ اَحَدِكُم فَلْيَغْسِلْه سبعَ مَرَّاتٍ اُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ কোন পাত্রে কুকুরের মুখ দেয়ার দরুন তা মাটি দ্বারা মাজা

অনুবাদ ঃ ৩৩৭. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)........আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) কুকুরকে হত্যা করতে আদেশ করেছেন এবং বকরী পালের ও শিকারের কুকুরের বিষয়ে অনুমতি দান করেছেন। তিনি বলেছেন, যখন কুকুর কোন পাত্রে মুখ দেয় তখন তা সাতবার ধুয়ে নেবে, আর অষ্টমবারে তা মাটি দ্বারা ঘষে ধুয়ে ফেলবে।

৩৩৮. আমর ইবনে ইয়াযীদ (র)........ আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কুকুর হত্যার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, তাদের সঙ্গে কুকুরের কি সম্পর্ক? আবদুল্লাহ বলেন, আর রাসূলুল্লাহ (স) শিকারের কুকুর ও বকরী পালের কুকুর পোষার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, যখন কুকুর পাত্রে মুখ দেয় তখন তা সাতবার ধুয়ে নেবে আর অষ্টম বার মাটি দ্বারা ঘষে নেবে। আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা)-এর বর্ণনা হতে ভিন্নরূপ। তিনি বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তন্মধ্যে একবার মাটি দ্বারা।

৩৩৯. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র).......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যখন কুকুর তোমাদের কারো পাত্রে মুখ দেয় তখন তা সাতবার ধুয়ে ফেলবে তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দ্বারা।

৩৪০. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন কুকুর তোমাদের কারো পাত্রে মুখ দেয় তখন ঐ পাত্র সাতবার ধুয়ে ফেলবে যার প্রথমবার হবে মাটি দ্বারা।

(এ অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ

٣٤١. اخبرنا قتيبة عن مالك عن اسحق بن عبد الله بن طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك ان ابا قتادة دخل عليها ثم ذكر كلمة معناها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة فرانى انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخى قلت نعم قال ان رسول الله ﷺ قال انها ليست بنجس انما هى من الطوافين عليكم والطوافات -

بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ

٣٤٢. اخبرنا عمرو بن على قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة قالت كنت اتعرق العرق فيضع رسول الله ﷺ فاه حيث وضعته وانا حائض وكنت اشرب من الماء فيضع فاه حيث وضعت وانا حائض -

---

অনুচ্ছেদ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

অনুবাদ ঃ ৩৪১. কুতায়বা (র)........কাব্‌শা বিনতে কা'ব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু কাতাদা তাঁর নিকট আগমন করলেন, তারপর বর্ণনাকারী কিছু কথা বললেন, যার অর্থ এই, আমি তার জন্য পানি ভর্তি একটি উযুর পাত্র উপস্থিত করলাম। এমন সময় একটি বিড়াল তা হতে পান করল। তারপর তিনি ঐ বিড়ালটির জন্য পাত্রটি কাত করে দিলেন যাতে সে পান করতে পারে। কাব্‌শা বলেন, তখন আবু কাতাদা দেখলেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি বললেন, হে ভাতিজী! তুমি কি আশ্চর্যবোধ করছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এরা (বিড়াল) অপবিত্র নয়, এরা তোমাদের আশে-পাশে বিচরণকারী এবং বিচরণকারিণী।

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতি নারীর ঝুটা (ভুক্তাবিশেষ)

৩৪২. আমর ইবনে আলী (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গোশ্‌তযুক্ত হাড় হহতে গোশত আল্‌গা করতাম, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর মুখ সে স্থানেই রাখতেন যেখানে আমি মুখ রাখতাম। আর আমি পাত্র হতে পানি পান করতাম এবং তিনি এ স্থানেই মুখ রাখতেন যেখানে আমি রাখতাম অথচ আমি তখন ঋতুমতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ প্রথম অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা পূর্বের بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ অনুচ্ছেদের অধীনে এবংদ্বিতয়ি অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ অনুচ্ছেদের অধীনে করা হয়েছে।

পূর্বের পৃষ্ঠার সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

এ মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ بَابُ تَعْفِيرِ الْاِنَاءِ الَّذِى وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ অনুচ্ছেদে করা হয়েছে। কাজেই এ বিষয়ে জানার জন্য সেখানে দ্রষ্টব্য। অবশ্য এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসে একটি বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে, তা হলো– قَالَ مَابَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ তিনি বলেন, কুকুরের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? উদ্দেশ্য হলো প্রথমে কুকুর হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। অতঃপর উক্ত হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে। مَابَالُ النَّاسِ وَبَالُ الْكِلَابِ মানুষ ও কুকুরের মধ্যে এমন কোন জিনিস নেই যা কুকুর হত্যার দাবী করে।

بابُ الرُّخْصَةِ فِىْ فَضْلِ الْمَرْأَةِ

٣٤٣. اخبرَنا هارونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قال حدَّثنا مَعْنٌ قال حدَّثنا مالكٌ عَنْ نافعٍ عَنِ ابْنِ عمرَ قال كانَ الرِّجالُ والنِّساءُ يَتَوَضَّؤُنَ فِىْ زَمانِ رَسُولِ اللّٰه ﷺ جميعًا -

بابُ النَّهْىِ عَنْ فَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ

٣٤٤. اخبرَنا عمرُو بْنُ عَلِيٍّ قال حدَّثنا ابو داوُدَ قال حدَّثنا شعبةُ عَنْ عاصمٍ الْأَحْوَلِ قالَ سَمِعْتُ اَبَا حاجِبٍ قال ابو عبدِ الرَّحمٰن واسمُه سَوادَةُ بْنُ عاصمٍ عَنِ الحَكَمِ بْنِ عمرٍو اَنَّ رسولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَن يَّتَوَضَّا الرَّجُلُ بِفَضْلِ وضوءِ المراة -

الرُّخْصَةُ فِى فَضْلِ الْجُنُبِ

٣٤٥. اخبرَنا قُتَيْبَةُ قالَ حدَّثنا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَن عائِشَةَ اَنَّها كانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاِناءِ الْواحِدِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারের অনুমতি

অনুবাদ ঃ ৪৪৩. হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)......ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে নারী-পুরুষ সকলে একত্রে উযূ করত

অনুচ্ছেদ ঃ নারীর উযুর উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

৩৪৪. আমর ইবনে আলী (র).........হাকাম ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) নারীর উদ্বৃত্ত উযুর পানি দ্বারা পুরুষের উযূ করতে নিষেধ করেছেন।

জানাবাতগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারের অনুমতি

৩৪৫. কুতায়বা (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে একত্রে একই পাত্র হতে গোসল করতেন।

প্রথম অনুচ্ছেদসংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত বিস্তারিত আরোচনা بابُ وُضُوءِ الرِّجالِ وَالنِّساءِ جميعًا এর অধীনে অতিবাহিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুসান্নিফ (র) উপরের হাদীস দ্বারা একথা সাব্যস্ত করেছেন যে, পুরুষ মহিলার ব্যবহারের উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করতে বাধা নেই। বরং হাদীস দ্বারা তার অনুমতি বুঝে আসে যে, পুরুষ মহিলার উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা অযূ করতে পারবে। অতঃপর এখানে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। এর অধীনে হযরত হাকাম ইবনে আমর গিফারীর হাদীস নকল করেছেন। যার দ্বারা বুঝা যায় মহিলার উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষের অযূ করা জায়েয নেই, বাহ্যিকভাবে উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) উক্ত দ্বন্দ্বের সমাধান করে বলেন, যে সকল হাদীসে উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা এসেছে, উক্ত নাহী দ্বারা মাকরূহে তানযিহী উদ্দেশ্য। এর কারণ হলো যাতে করে উভয় অনুচ্ছেদের মধ্যে কোন ধরণের দ্বন্দ্ব না থাকে, এ ব্যাপারে পিছনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তথায় দেখুন।

বিঃ দ্রঃ- তৃতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিশ্লেষণ পিছনে بابُ فَضْلُ الْجُنُبُ অনুচ্ছেদে করা হয়েছে,

باب القدر الذي يكتفي به الانسان من الماء للوضوء والغسل

٣٤٦. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حدثنا عبد الله ابن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله ﷺ يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي -

٣٤٧. اخبرنا هارون بن اسحق الكوفي قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن سعيد عن صفية بنت شيبة عن عائشة ان رسول الله ﷺ كان يتوضأ بمد ويغتسل بنحو الصاع -

٣٤٨. اخبرنا ابو بكر بن اسحق قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن امه عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع -

অনুচ্ছেদ ঃ একজন লোকের উযূ এবং গোসলের জন্য কতটুকু পানি যথেষ্ট

অনুবাদ ঃ ৩৪৬. আমর ইবনে আলী (র)......আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাবর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (স) এক মাক্কুক পানি দ্বারা উযূ করতেন এবং পাঁচ মাক্কুক পানি দ্বারা গোসল করতেন।

৩৪৭. হারূন ইবনে ইসহাক কুফী (র)..........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এক মুদ পরিমাণ পানি দ্বারা উযূ করতেন, আর গোসল করতেন এক সা পানি দ্বারা।

৩৪৮. আবু বকর ইবনে ইসহাক (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) উযূ করতেন এক মুদ পানি দ্বারা এবং গোসল করতেন এক সা' পানি দ্বারা।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পিছনে- باب قدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء অনুচ্ছেদে করা হয়েছে। কাজেই এ সম্পর্কে জানার জন্য সেখানে দেখুন।

كتاب الحيض والاستحاضة

بَابُ بَدْءِ الْحَيْضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحَيْضُ نِفَاسًا

٣٤٩. اخبرَنا اسحٰقُ بْنُ ابراهيمَ قال اخبرَنا سُفيانُ عَنْ عَبدِ الرَّحمٰنِ بْنِ القاسمِ بْنِ محمدِ ابْنِ ابى بكرِ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه عَنْ اَبِيهِ عَن عائشةَ قالتْ خَرَجْنَا معَ رسولِ اللّٰهِ ﷺ وانا اَبْكِى فقالَ ما لكِ اَنَفِسْتِ قلتُ نعمْ قال هٰذا امرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عزّوجلّ عَلٰى بَنَاتِ آدمَ فَاقْضِى مَا يَقْضِى الحَاجُّ غيرَ اَن لَّا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ -

অধ্যায় ঃ হায়েয ও ইস্তিহাযা

অনুচ্ছেদ ঃ হায়েয আরম্ভ হওয়া এবং হায়েযকে নিফাস বলা যায় কি না?

অনুবাদ ঃ ৩৪৯. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম, হজ্জ করা ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যখন আমরা সারিফ নামক স্থানে উপনীত হলাম তখন আমি ঋতুমতি হলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট আসলেন তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, তোমার কি হলো? তোমার কি নিফাস (হায়য) আরম্ভ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তাআলা আদম কন্যাদের জন্য অবধারিত করেছেন। অতএব, বায়তুল্লাহর তওয়াফ ব্যতীত হাজীগণ যে সব কাজ করে থাকেন, তুমিও তা কর।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

এখানে শুধুমাত্র শিরোনাম পরিবর্তন করে আনা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ بَابُ مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ اِذَا حَاضَتْ অনুচ্ছেদে পেছনে করা হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার বাণী– هٰذا امرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عزّ وجلّ على بَنَاتِ آدمَ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হবে, আয়াত দ্বারা বুঝা যায় হায়েয এমন একটি জিনিস যা আল্লাহ তাআলা আদম (আ) এর কন্যাদের উপর অবধারিত করে দিয়েছেন। আদম কন্যাদের মধ্যে হযরত হাওয়া (আ)ও অন্তর্ভুক্ত। তিনি সকল মহিলার পূর্বে জন্মলাভ করেন। যখন তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয় তখন হায়েযের অভিষেক ঘটে। কিন্তু আব্দুর রাজ্জাক সহীহ সনদে হযরত ইবনে মাসউদ থেকে রেওয়ায়াত করেন যে, বনী ইসরাইলের নারী-পুরুষ এক সাথে নামায আদায় করত এবং মহিলারা পুরুষদিগকে নামাযরত অবস্থায় উঁকি মেরে ঝুকে দেখত। ফলে মহিলাদের উপর হায়েয চাপিয়ে দিয়ে মসজিদে আসতে তাদেরকে বাধা দেয়া হয়। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা দুটি জিনিস বুঝা গেলো- ১. হযরত হাওয়া (আ) থেকেই হায়েযের সূচনা ২. আর আব্দুর রাজ্জাকের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় বনী-ইসরাইলের মহিলাদের থেকেই হায়েযের সূচনা হয়। অনুচ্ছেদের হাদীস ও মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের রেওয়ায়াতের মধ্যে বাহ্যিকভাবে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে,

বনী ইসরাঈলের মহিলাদের থেকে হায়েযের সূচনা হয়নি, বরং হযরত হাওয়া (আ) থেকেই এর সূচনা হয়েছে। কিন্তু তাঁর সময় এটা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হত না। অতঃপর বনী ইসলাইলের যুগে তাদের নাফারমানীর কারণে শাস্তি স্বরূপ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হায়েয চাপিয়ে দেন।

بابُ ذِكرِ الاِسْتِحاضَةِ وإقْبالِ الدَّمِ وإدْبارِه

٣٥٠. اخبرنا عِمرانُ بْنُ يزيدَ قال حدّثنا إسْمعيلُ بْنُ عبدِ اللّٰهِ وهو ابنُ سَماعةَ قال حدّثنا الأوزاعِيُّ قال حدّثنا يحيى بْنُ سعيدٍ قال أخْبرني هِشامُ بْنُ عُروةَ عَنْ عُروةَ أنّ فاطمةَ بنتَ قَيْسٍ مِنْ بَنِي أسَدِ قريشٍ انّها اتتْ رسُولَ اللّٰه ﷺ فذكرتْ أنّها تُسْتَحاضُ فزعمتْ أنّه قالَ لها إنّما ذلك عِرْقٌ فاذا أقْبلَتِ الحَيْضَةُ فدَعِي الصّلٰوةَ واذا أدْبرتْ فاغْتَسِلي وَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ ثمّ صَلِّي -

٣٥١. اخبرنا هِشامُ بْنُ عمّارٍ قالَ حَدّثنا سَهْل بْنُ هاشمٍ قالَ حَدّثنا الأَوْزاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائشةَ انّ النبيَّ ﷺ قالَ إذا أقْبلَتِ الحَيْضَةُ فدَعِي الصّلٰوةَ واذا أدْبرتْ فاغْتَسِلِي -

٣٥٢. اخبرنا قُتَيْبَةُ قال حدّثنا اللّيْثُ عَنِ ابنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائشَةَ قالَتْ إسْتَفْتَتْ أمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فقالتْ يا رسولَ اللّٰهِ إنّي أُسْتَحاضُ فقال إنّ ذٰلكِ عِرْقٌ فاغْتَسِلِي ثمّ صَلِّي فكانت تَغْتَسِلُ عندَ كُلِّ صَلٰوةٍ -

---

অনুচ্ছেদ- ইস্তিহাযার বর্ণনা ঃ রক্ত আরম্ভ হওয়া এবং তা বন্ধ হওয়া

অনুবাদ ঃ ৩৫০. ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)........উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরায়শ বংশের আসাদ গোত্রের ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, তার ইস্তিহাযা হয়। তিনি মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এ একটি শিরা (শিরার রক্ত) বিশেষ। অতএব, যখন হায়েয আরম্ভ হবে তখন নামায আদায় করবে না। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন গোসল করবে এবং তোমার ঐ রক্ত ধুয়ে ফেলবে তারপর নামায আদায় করবে।

৩৫১. হিশাম ইবনে আম্মার (র)..........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন হায়েয আসে তখন নামায আদায় করবে না। আর যখন তা বন্ধ হয়ে যায় তখন গোসল করবে।

৩৫২. কুতায়বা (র)...........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্শ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফতওয়া চাইলেন; ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আমার ইস্তিহাযা হয়। তিনি বললেন, এ একটি শিরা (শিরার রক্ত) বিশেষ। অতএব, তুমি গোসল কর এবং নামায আদায় কর। এরপর তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

অনুচ্ছেদের হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেছনে ذِكْرُ الاِغْتِسَالِ مِنَ الحَيْضِ এর অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য সেখানে দেখুন।

الْمَرْأَةُ تَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

٣٥٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِى حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلآنُ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اُمْكُثِى قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى واخبرنا به قتيبة مَرَّةً اُخْرٰى ولم يَذْكُرْ فيه جعفر بْنَ ربيعة -

٣٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنِى عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ اِنِّى اُسْتَحَاضُ فَلَا اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ لَا وَلٰكِنْ دَعِى قَدْرَ الْاَيَّامِ وَاللَّيَالِى الَّتِى كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِى وَاسْتَثْفِرِى وَصَلِّى -

٣٥٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَفْتَتْ لَهَا اُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِى وَالْاَيَّامِ الَّتِى كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ اَنْ يُصِيبَهَا الَّذِى اَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ قَدْرَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَاِذَا خَلَّفَتْ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِالثَّوْبِ ثُمَّ لِتُصَلِّى -

---

যে নারীর প্রতি মাসে হায়যের দিন নির্দিষ্ট থাকে

অনুবাদ ঃ ৩৫৩. কুতায়বা (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন আয়েশা (রা) বললেন, আমি তার গামলাটি রক্তে পরিপূর্ণ দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন, যতদিন তোমার হায়েয তোমাকে বিরত রাখে ততদিন তুমি বিরত থাক। তারপর তুমি গোসল করবে। ইমাম নাসাঈ বলেন, কুতায়বা (র) উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেখানে হাদীসের অন্যতম রাবী জা'ফর ইবনে রাবীআ-এর উল্লেখ নেই।

৩৫৪. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (র).........উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূল (স)-কে প্রশ্ন করল, আমার ইস্তিহাযা হয়, আমি পাক হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দেব? তিনি বললেন, না, বরং যে কয় দিবা-রাত্র তোমার হায়েয থাকত ততদিন তুমি নামায আদায় করো না। তারপর তুমি গোসল করবে এবং পট্টি বাঁধবে, পরে নামায আদায় করবে।

৩৫৫. কুতায়বা (র) ....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সমাধান চাইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে অপেক্ষা করবে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে মাসের যতদিন যত রাত তার হায়েয আসত প্রতি মাসের ততদিন সময় সে নামায আদায় করবে না। এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হলে সে গোসল করবে, পরে কাপড় দ্বারা পট্টি বাঁধবে, তারপর নামায আদায় করবে।

দ্রষ্টব্যঃ এখানেও শিরোনাম পরিবর্তন করে হাদীস আনা হয়েছে। অন্যথায় এ হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ذِكْرُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ অনুচ্ছেদে করা হয়েছে। এ সম্পর্কে জানার জন্য সেখানে দেখুন।

بابُ ذِكْرِ الْاَقْرَاءِ

٣٥٦. اخبرنا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ داوُدَ بْنِ ابراهيمَ قالَ حدّثنا اسحٰقُ وهُوَ ابْنُ بكرِ بْنِ مُضَرَ قالَ حدّثني اَبِىْ عَنْ يَزِيْدَ هُوَ ابنُ عبدِ اللّٰهِ وهُوَ ابنُ اُسامةَ بْنِ الهادِ عَنْ ابى بكرٍ وهو ابنُ محمّدِ بْنِ عمرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائشةَ قالتْ اِنَّ اُمَّ حبيبةَ بِنْتَ جَحْشٍ ن الّتى كانتْ تحتَ عبدِ الرّحمٰن بْنِ عوفٍ وانّها اُسْتُحِيْضَتْ لا تطهُرُ فذُكِرَ شأنُها لِرسولِ اللّٰه ﷺ قال ليْسَ بِالحَيْضَةِ ولٰكنّها رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ لِتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئِها الّتى كانتْ تَحِيْضُ لَها فَلْتَتْرُكِ الصّلٰوةَ ثمّ تَنْظُرُ ما بعدَ ذٰلك فَلْتَغْتَسِلْ عندَ كُلِّ صَلٰوةٍ –

٣٥٧. اخبرنا موسٰى قال حدّثنا سفيانُ عَنِ الزّهريِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائشةَ انّ ابنةَ جَحْشٍ كانتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِيْنَ فسالتِ النبيَّ ﷺ فقال النبيُّ ﷺ لَيْسَتْ بالحَيْضَةِ انّما هو عِرْقٌ فأمَرَها اَنْ تَتْرُكَ الصلٰوةَ قدرَ اَقْرائِها وحَيْضَتِها وتَغْتَسِلُ وتُصَلِّى وكانتْ تغتسِلُ عندَ كُلِّ صَلٰوةٍ –

٣٥٨. اخبرنا عيسٰى بنُ حَمّادٍ قال اخبرنا اللّيْثُ عَنْ يزيدَ بْنَ ابى حبيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ المُنْذِرِ ابْنِ المُغِيرةِ عَنْ عُروةَ اَنّ فاطمةَ بِنْتَ ابى حُبَيْشٍ حَدّثَتْهُ انّها اَتَتْ رسولَ اللّٰهِ ﷺ فشَكَتْ اِلَيْهِ الدّمَ فقال لَها رسولُ اللّٰهِ ﷺ اِنّما ذٰلكَ عِرْقٌ فَانْظُرِى اِذا اَتَاكِ قَرْءُكِ فلا تُصَلِّىْ واذا مَرَّ قَرْءُكِ فَلْتَطَهَّرِىْ ثمّ صَلِّىْ ما بَيْنَ القَرْءِ الى القَرْءِ –

٣٥٩. اخبرنا اسحٰقُ بْنُ ابراهيمَ حدّثنا عبدةُ ووكيعٌ وابُو مُعاويةَ قالوا حدّثنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عائشةَ قالتْ جاءَتْ فاطمةُ بنتُ اَبِى حُبَيْشٍ الى رَسُولِ اللّٰه ﷺ فقالتْ اِنّى امرأةٌ اُسْتَحاضُ فلا اَطْهُرُ اَفَادَعُ الصّلٰوةَ قال لا اِنّما ذٰلك عرقٌ وليْس بالحَيْضَةِ فاذا اقبلتِ الحَيْضَةُ فدَعِى الصّلٰوةَ واذا اَدْبَرَتْ فاغْسِلِى عَنْكِ الدّمَ وصَلِّى –

جمعُ المُسْتَحاضَةِ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ وغُسْلِها اِذا اجْتَمَعَتْ

٣٦٠. اخبرنا محمّدُ بْنُ بَشّارٍ قالَ حدّثنا محمّدٌ قال حدّثنا شعبةُ عَنْ عبدِ الرحمٰنِ بْنِ القاسمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عائشةَ اَنّ امرأةً مُسْتَحاضَةً علٰى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰه ﷺ قِيلَ لَها اِنّهُ عِرْقٌ عانِدٌ واُمِرَتْ اَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وتُعَجِّلَ العَصْرَ وتَغْتَسِلَ لهُما غسلًا واحدًا تُؤَخِّرُ المَغْرِبَ وتُعَجِّلُ العِشاءَ وتَغْتَسِلُ لهُما غُسْلًا واحدًا وتَغْتَسِلُ لِصلوةِ الصُّبْحِ غُسْلًا واحدًا –

٣٦١. اخبرنا سُوَيْدُ بْنُ نصرٍ قالَ حدّثنا عبدُ اللّٰه عَنْ سُفْيانَ عَنْ عَبْدِ الرحمٰنِ بْنِ القاسمِ عَنِ القاسمِ عَنْ زَيْنَبَ بنتِ جَحْشٍ قالَ قالتْ لِلنّبيّ ﷺ اِنّها مُسْتَحاضَةٌ فقال تَجْلِسُ ايّامَ اَقْرائِها ثمّ تَغْتَسِلُ وتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وتُعَجِّلُ العَصْرَ وتَغْتَسِلُ وتُصَلِّى وتُؤَخِّرُ المَغْرِبَ وتُعَجِّلُ العِشاءَ وتَغْتَسِلُ وتُصَلِّيهِما جميعًا وتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ –

অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযের সময় সীমার বর্ণনা

অনুবাদ ঃ ৩৫৬. রবী সুলায়মান (র)..........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশ (রা) অনির্দিষ্টকাল ধরে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বর্ণনা করা হলো। তিনি বললেন, তা হায়েয নয়। বরং জরায়ু আঘাতজনিত একটি রোগ। সে লক্ষ্য রাখবে ইতিপূর্বে যতদিন তার হায়েয থাকত ততদিন সে নামায আদায় করবে না। তারপর তার পরবর্তী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। পরে সে প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করবে।

৩৫৭. মূসা (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহশের কন্যা সাত বছর যাবৎ ইস্তিহাযায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ বললেন, এটা হায়েয নয়। বরং এটা শিরার রক্ত। তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি হায়েযের সমপরিমাণ সময়ে নামায আদায় করবেন না। তারপর তিনি গোসল করবেন এবং নামায আদায় করবেন। তিনি প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করতেন।

৩৫৮. ঈসা ইবনে হাম্মাদ (র)..........উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার রক্ত নির্গত হওয়ার অভিযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন, এটা শিরার রক্ত মাত্র। তাই তুমি লক্ষ্য রাখবে যখন তোমার ঋতু আরম্ভ হবে তখন নামায আদায় করবে না। আর যখন ঋতুর সময় অতিবাহিত হবে তখন তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। পরে এক ঋতুর সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হতে আর এক ঋতুর সময় আসা পর্যন্ত নামায আদায় করবে।

৩৫৯. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি ইস্তিহাযায় আক্রান্ত। সে কারণে আমি পবিত্র হই না। এ অবস্থায় আমি নামায ছেড়ে দিব কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না। এটা শিরার রক্ত মাত্র; হায়েয নয়। অতএব যখন তোমার ঋতু আরম্ভ হবে তখন নামায আদায় করবে না। আর যখন ঋতুর সময় অতিবাহিত হবে তখন তুমি রক্ত ধৌত করবে এবং নামায আদায় করবে।

ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর দু নামায একত্রিত করন ও এ সময় গোসল করা প্রসঙ্গে

৩৬০. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (র)...........আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত কোন মহিলাকে বলা হল, এটা একটা শিরা মাত্র (যা হতে ক্রমাগত রক্ত নির্গত হয়) তাকে আদেশ করা হল, সে যেন যুহরের নামায শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং আসরের নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে আর উভয় নামাযের জন্য একবার গোসল করে। এভাবে মাগরিবের নামায বিলম্বে আদায় করে ও ইশার নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে, আর উভয় নামাযের জন্য যেন একবার গোসল করে এবং ফজর নামাযের জন্য একবার গোসল করে।

৩৬১. সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (র).........যায়নাব বিনতে জাহশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললাম যে, আমি ইস্তিহাযাগ্রস্ত, তিনি বললেন, সে তার হায়েযের দিনগুলোতে নামায আদায় করা হতে বিরত থাকবে, পরে গোসল করবে। জোহরের নামায দেরীতে এবং আসরের নামায প্রথম ওয়াক্তে গোসল করে আদায় করবে এবং পুনরায় গোসল করে মাগরিবকে পিছিয়ে আর ঈশাকে প্রথমভাগে আদায় করবে, এবং ফজরের জন্য একবার গোসল করবে।

দ্রষ্টব্য ঃ প্রথম অনুচ্ছেদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ . ذِكْرُ الْأَقْرَا অধীনে এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ এর অধীনে অতিবহিত হয়েছে। প্রয়োজনে সেখানে দেখেনিন।

بابُ الفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالْاِسْتِحَاضَةِ

٣٦٢. اخبرنا محمدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قال حدّثنا ابنُ ابى عَدِيٍّ عن مُحمّدِ بْنِ عمرٍو وهو ابنُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقّاصٍ عنْ ابنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ انّها كانَتْ تُسْتَحاضُ فقالَ لَها رسولُ اللّٰهِ ﷺ اِذا كانَ دَمُ الحَيْضِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَامْسِكِىْ عَنِ الصَّلوةِ وَاِذا كانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ فانّما هُوَ عِرْقٌ -

قال محمدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدّثنا ابنُ اَبِىْ عَدِيٍّ هٰذا مِنْ كِتابِه -

٣٦٣. اخبرنا محمدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قال حَدّثنا ابنُ عَدِيٍّ مِن حِفْظِه قال حدّثنا محمدُ ابنُ عمرٍو عَنِ ابْنِ شهابٍ عَن عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رض انّ فاطمةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ كانَتْ تُسْتَحاضُ فقالَ لهَا رسولُ اللّٰهِ ﷺ اِنّ دمَ الحيْضِ دمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فاذا كانَ ذلك فَامْسِكِىْ عَنِ الصَّلوةِ واذا كانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وصَلِّىْ - قال ابو عبدِ الرّحمٰن قد رَوٰى هٰذا الحديثَ غيرُ واحدٍ ولم يذكُر احدٌ مِنْهم ماذكرَ ابنُ اَبِىْ عَدِيٍّ واللّٰهُ تعالٰى اَعْلَمُ -

٣٦٤. اخبرنا يحيٰى بْنُ حبيبِ بْنِ عَرَبِىٍّ عن حمّادٍ عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ عَن اَبِيْهِ عَنْ عائشةَ قالَتْ اُسْتُحِيْضَتْ فاطمةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ فسالتِ النبىَّ ﷺ فقالتْ يا رسولَ اللّٰه اِنِّىْ اُسْتَحاضُ فَلا اَطْهُر اَفَادَعُ الصَّلٰوةَ قالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنّما ذٰلكَ عِرقٌ وليْسَتْ بالحَيْضَةِ فاذا اَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ واذا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدّمَ وتَوَضَّئِى وصَلِّى فانّما ذلك عِرْقٌ ولَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ قِيلَ لهُ فَالغُسْلُ قالَ ذٰلك لايَشُكُّ فيْه احدٌ - قال ابو عَبْدِ الرّحمٰن قدْ روٰى هٰذا الحديثَ غَيْرُ واحدٍ عَنْ هِشامِ بْنِ عُروةَ ولَمْ يَذْكُر فيْه وتَوَضَّئِىْ غيرَ حمّادٍ واللّٰهُ تعالٰى اَعْلَمُ -

٣٦٥. اخبرنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قالَ حدّثنا عبدُ اللّٰهِ عَنْ هشامِ بْنِ عُرْوَةَ عَن اَبيهِ عَن عائِشَةَ انّ فاطمَة بنتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ فقالَ يَا رسولَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُسْتَحاضُ فلاَ اَطْهُرُ فقالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنّما ذٰلكَ عِرقٌ ولَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فاذَا اَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَامْسِكِى عَنِ الصّلوة واذا اَدْبرتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدّمَ وصَلِّىْ -

٣٦٦. اخبرنا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالكٍ عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ قالَتْ فاطمةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللّٰه ﷺ لا اطهُر افَادَعُ الصلوةَ فقالَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ اِنّما ذٰلكَ عِرْقٌ ولَيْسَتْ بالحَيْضَةِ فاذا اَقْبَلتِ الحَيْضَةُ فَدَعِى الصلوةَ واذا ذَهَبَ قدرُها فَاغْسِلِى عَنْكِ الدّم وصَلِّى -

٣٦٧. اخبرنا ابوُ الاَشْعَثِ قالَ حدّثنا خالدُ بْنُ الحارثِ قالَ سَمِعْتُ هشامًا يُحَدِّثُ عَن اَبِيْه عَنْ عائِشَةَ انّ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ قالَتْ يا رسولَ اللّٰه ﷺ اِنِّى لا اطهُرُ افَاتْرُكُ الصلوةَ قالَ لاَ اِنّما هُو عِرْقٌ قال خالدٌ وفيْما قَرَأْتُ عليْه ولَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ فاذا اَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِى الصّلوةَ واذا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ ثمّ صَلِّى -

অনুচ্ছেদ ঃ হায়েয ও ইস্তিহাযার রক্তের পার্থক্য

অনুবাদ ঃ ৩৬২. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র).........ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইস্তিহাযাগ্রস্ত হলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন, হায়যের রক্ত হয় কালো বর্ণের যা চিনা যায়। এ সময় তুমি নামায হতে বিরত থাকবে। আর যদি হায়েযের রক্ত না হয় তবে উযূ করে নেবে। কেননা তা হচ্ছে শিরা থেকে নির্গত রক্ত বিশেষ।

৩৬৩. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র)..........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ (রা) ইস্তিহাযাগ্রস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন, হায়েযের রক্ত কালো বর্ণের যা সহজেই চেনা যায়। এমতাবস্থায় তুমি নামায আদায় হতে বিরত থাকবে, আর যখন অন্য রক্ত বের হবে তখন উযূ করবে এবং নামায আদায় করবে।

৩৬৪. ইয়াহয়া ইবনে হাবীব (র)..........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ (রা) ইস্তিহাযাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইস্তিহাযাগ্রস্ত। ফলে আমি পাক হই না– এমতাবস্থায় আমি কি নামায ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এটা শিরা হতে নির্গত রক্ত, হায়েয নয়। অতএব যখন হায়েয দেখা দেবে তখন নামায আদায় করবে না, আর যখন ঐ সময় অতিবাহিত হবে তখন তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে নেবে এবং উযূ করে নামায আদায় করবে। এটা শিরা হতে নির্গত রক্ত, হায়েয নয়। সনদের জনৈক বর্ণনাকারীকে প্রশ্ন করা হলো তাহলে গোসল? তিনি বললেন, এ বিষয়ে কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না। আবু আবদির রহমান (র) বলেন, হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে এ হাদীসখানা একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্মাদ (র) ব্যতীত আর কেউ 'উযূ করে নামায আদায় করবে' একথাটি উল্লেখ করেননি।

৩৬৫. সুয়ায়দ ইবনে নাসর (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইস্তহাযায় আক্রান্ত। আমি পবিত্র হই না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটা শিরা হতে নির্গত রক্ত, হায়েয নয়। অতএব যখন হায়য আসবে তখন তুমি নামায হতে বিরত থাকবে, আর যখন ঐ সময় অতিবাহিত হবে তখন তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে নামায আদায় করবে।

৩৬৬. কুতায়বা (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি পবিত্র হই না। আমি কি নামায আদায় করা ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এটা শিরা থেকে নির্গত রক্ত, হায়েয নয়। অতএব যখন হায়েয আরম্ভ হয় তখন নামায আদায় হতে বিরত থাকবে, আর যখন তার নির্দিষ্ট পরিমান সময় অতিবাহিত হবে তখন তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে নিয়ে নামায আদায় করবে।

৩৬৭. আবুল আশ'আছ (র)...........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পাক হই না, আমি কি নামায আদায় ছেড়ে দেব? তিনি বললেন, না, এটা শিরা হতে নির্গত রক্তবিশেষ। খালিদ বলেন, আমি যা তার নিকট পাঠ করেছি, তাতে রয়েছে যে. তা হায়েয নয়। যখন হায়েয দেখা দেয় তখন তুমি নামায ত্যাগ করবে, আর যখন তা শেষ হয় তখন তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে ফেলে নামায আদায় করবে।

দ্রষ্টব্যঃ এ হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেছনে بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالْاِسْتِحَاضَةِ অনুচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে । কাজেই জানার জন্য সেখানে দেখেনিন।

بابُ الصُّفْرَةِ والكُدْرَةِ

٣٦٨. اخبرنا عمرو بْنُ زُرارَةَ قال اخبرنا اسمعيلُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُحمَّدٍ قال قالتْ أمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ والكُدْرَةَ شيئًا -

بابُ مايَنالُ مِنَ الحائِضِ وتاويلُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعالىٰ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّساۤءَ فِى الْمَحِيْضِ

٣٦٩. اخبرنا اسحٰقُ بْنُ إبراهيمَ حَدَّثنا سُليمانُ بْنُ حَرْبٍ قال حَدَّثنا حمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قال كانَتِ اليَهُوْدُ اِذا حاضَتِ المَرْاَةُ مِنْهُم لَمْ يُواكِلُوْهُنَّ ولا يُشارِبُوْهُنَّ ولا يُجامِعُوْهُنَّ فِى البُيُوْتِ فَسَاَلُوا النبىَّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عزَّ وجلّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ المَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى الأيةَ فَاَمَرَهُم رسولُ اللّٰه ﷺ اَنْ يُواكِلُوْهُنَّ ويُشارِبُوْهُنَّ ويُجامِعُوْهُنَّ فِى البُيُوْتِ واَنْ يَصْنَعُوْ بِهِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلا الجِمَاعِ . فقالتِ اليَهُود مايَدَعُ رسولُ اللّٰه ﷺ شيئًا مِّنْ اَمْرِنا اِلاَّ خالَفَنا فقامَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيرٍ وعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَاَخْبَرا رسولَ اللّٰه ﷺ قالا اَنُجامِعُهُنَّ فِى المَحِيْضِ فتَمَعَّرَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ تَمَعُّرًا شَديدًا حتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ قد غَضِبَ فَقامَا فَاسْتَقْبَلَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ هديةُ لَبَنٍ فَبَعَثَ فِى اٰثارِهِما فَرَدَّهُما فَسَقاهُما فَعُرِفَ اَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا -

---

অনুচ্ছেদ ঃ হলদে রং এবং মেটে রং

অনুবাদ ঃ ৩৬৮. আমর ইবনে যুরারাহ (র)............মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেছেন, আমরা হলদে রং এবং মেটে রংয়ের রক্তকে হায়েযের কোন বস্তু বলে মনে করতাম না।

অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্ত নারীর সাথে যা করা বৈধ এবং আল্লাহ তাআলার বাণী وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّساۤءَ এর ব্যাখ্যা

"লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সঙ্গ বর্জন করবে।" (২ ঃ ২২২)

৩৬৯. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র).........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদী নারীদের যখন হায়েয আসত তখন তারা তাদের সাথে একত্রে পানাহার করত না, তাদের সাথে ঘরে একত্রে অবস্থানও করত না। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে আল্লাহ তা'আলা وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى الأية আয়াত নাযিল করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে আদেশ করলেন, তারা যেন তাদের সাথে একত্রে পানাহার করে এবং তাদের সাথে একই ঘরে বসবাস করে, আর যেন [illegible] সাথে সংগম ব্যতীত অন্য সব কিছু করে। এরপর ইয়াহুদীরা বলতে লাগল, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কোন

ব্যাপারেই বিরোধিতা না করে ছাড়েন না। তখন উসায়দ ইবনে হুযায়র (রা) এবং আব্বাদ ইবনে বিশ্র (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ সংবাদ দিয়ে বললেন, তাহলে আমরা কি স্ত্রীদের সাথে হায়যের সময় সংগম করব? তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারার রং বেশ পরিবর্তন হয়ে গেল। এমনকি আমরা ধারণা করলাম, তিনি তাদের প্রতি খুবই রাগান্বিত হয়েছেন। তখন তারা উঠে চলে গেলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হাদিয়ার দুধ আসল। তিনি উক্ত দু'জনের খোঁজে লোক পাঠালেন। সে উভয়কে ফিরিয়ে আনল, তিনি তাঁদের পান করালেন তখন বুঝা গেল যে, তিনি তাঁদের উপর রাগান্বিত হননি।

প্রথম অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা .

বাহ্যিকভাবে এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, হলুদ ও মেটে রঙের হায়েযকে হায়েয হিসেবে গণ্য করা হয় না। মুসান্নিফ (র) যে শিরোনাম কায়েম করেছেন তার দ্বারা বুঝা যায় তার মতও এটাই। আলোচ্য হাদীস পূর্বে উল্লেখিত بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالْإِسْتِحَاضَةِ এর অধ্যীনে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ। কাজেই এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সেখানে দেখে নিন।

হাদীসে এসেছে فانه دم اسود يعرف কিন্তু জুমহুর ইমামগণ হযরত উম্মে আতিয়্যার হাদীসকে তুহুরের পর নির্গত হলুদ ও মেটে রঙের রক্তের উপরে প্রয়োগ করেছেন ইমাম আবু দাউদের বক্তব্যও এটা যেমন তিনি বলেন,

كُنَّا لَانَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْأً

আমরা তুহুরের পরে হলুদ ও মেটে রঙের রক্তের কোন এতেবার করতাম না। এতে বুঝা যায় তুহুরের পূর্বে হায়েযের দিনগুলোতে যদি ঐ ধরণের রক্ত দেখা যায় তাহলে সেটাকে হায়েয হিসেবে গণ্য করা হবে। এ মাসআলার ব্যাপারে ইমাম বুখারীও জুমহুরের সাথে একমত রয়েছেন। কেননা, তিনি بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِى غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ শিরোনাম কায়েম করেছেন। এই শিরোনাম কায়েম করে তিনি এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যদি কোন মহিলা হায়েযের দিনগুলোতে হলুদ এবং মেটে রঙের রক্ত দেখে তাহলে সেটা হায়েয হিসাবে গণ্য হবে এবং এটাই জুমহুর ও ইমাম বুখারীর মত। উম্মে আতিয়ার হাদীসকে এর উপরেই প্রয়োগ করেন। (শরহে উর্দু নাসায়ী : ৩৯৯)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইয়াহুদিরা হায়েযা মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিতো এবং তাদের সাথে খানা-পিনা ও করত না, উঠা বসাও করত না। সাহাবায়ে কিরাম এ সম্পর্কে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়-

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى ... الخ

"লোকেরা আপনার নিকট হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসহবাস ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন হায়েয হলো ঘৃণিত বস্তু। তোমরা হায়েয অবস্থায় মহিলাদের থেকে পৃথক থাকো এবং ঐ অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস কর না পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত।" যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন নবী করীম (সা) বলেন, হায়েযের দিনগুলোতে স্ত্রী থেকে পৃথক থাকা এবং তার নিকট না যাওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সহবাস না করা। এ ছাড়া বাকী সকল কাজ করা. অর্থাৎ হায়েযা স্ত্রীর সাথে খানা-পিনা, উঠা-বসা, চুমু দেয়া, শোয়া সব বৈধ।

مَا خَلَا الْجِمَاعِ থেকে বুঝা যায় সহবাস ব্যতীত বাকী সকল অঙ্গ থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয আছে। ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম আহমদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ একথারই প্রবক্তা, কিন্তু জুমহুরের বক্তব্য হলো নাভী থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত অংশ হতে উপকার হাসিল করা জায়েয নেই। প্রথম মতটাই দলীলের দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক শক্তিশালী কিন্তু সতর্কতা বেশী হলো জুমহুরের বক্তব্যে এবং নবী (সা) এর অনুসরণের ক্ষেত্রে এটাই অধিক উপযুক্ত। বিস্তারিত বিবরণ পেছনে উল্লিখিত হয়েছে। (শরহে উর্দু নাসায়ী: ৪০০-৪০১)

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللَّهِ تَعَالَى

٣٧٠. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار -

مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ فِي ثِيَابِ حَيْضَتِهَا

٣٧١. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام ح واخبرنا اسحق بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ح واخبرنا اسمعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن كثير قال حدثني ابو سلمة ان زينب بنت ابي سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت بينما انا مضطجعة مع رسول الله ﷺ اذا حضت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله ﷺ انفست؟ قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة واللفظ لعبيد الله بن سعيد -

আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে হায়েয অবস্থায় সঙ্গম করে তার উপর আরোপিত শাস্তির বর্ণনা

অনুবাদ ঃ ৩৭০. আমর ইবনে আলী (র)....... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে তার ব্যাপারে হুকুম এই যে, সে এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার সাদকা করবে।

হায়েযগ্রস্ত নারীর সাথে তার হায়েযের বস্ত্রে একত্রে শয়ন

৩৭১. উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ও ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)...... যয়নব বিনতে আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। উম্মে সালামা (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে শায়িত ছিলাম। এমতাবস্থায় আমার হায়েয দেখা দিলে আমি উঠে গিয়ে আমার হায়েযের বস্ত্র পরিধান করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, তুমি কি হায়েযগ্রস্ত হয়েছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন, আর আমি তাঁর সঙ্গে একই চাদরের নিচে শয়ন করলাম।

প্রথম অনুচ্ছেদসংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে بَابُ مَا يُوجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَطْئِهَا অনুচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে সেখানে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদসংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

এ অনুচ্ছেদে যে হাদীস রেওয়ায়াত করা হয়েছে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে بَابُ مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। কাজেই এ সম্পর্কে জানার জন্য সেখানে দ্রষ্টব্য।

بابُ نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيْلَتِهِ فِى الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِىَ حَائِضٌ

٣٧٢. اخبرنا محمّدُ بْنُ المُثَنّى قال حَدَّثنا يحيى عَنْ جابِرِ بْنِ صُبْحٍ قال سَمِعْتُ خِلَاسًا يُحَدِّثُ عَن عَائشةَ قالتْ كنتُ انا ورسولُ اللّٰه ﷺ نَبِيْتُ فِى الشِّعارِ الْوَاحِدِ وانا طامِثٌ حائضٌ فإنْ اصابَه مِنّىْ شىءٌ غَسَلَ مَكانَه لم يَعْدُه وصَلّى فِيْه -

بابُ مُبَاشَرةِ الحَائِضِ

٣٧٣. اخبرنا قُتَيْبَةُ قالَ حدّثنا اَبُو الْاَحْوَصِ عَن ابى اسحٰقَ عَن عمرِو بْنِ شُرَحْبِيْلٍ عَن عائشةَ قالتْ كانَ رَسولُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ اِحْدانا اِذا كانتْ حائضًا اَنْ تَشُدَّ اِزارَها ثمّ يُبَاشِرُها -

٣٧٤. اخبرنا اسحٰقُ بْنُ ابراهيمَ قال اخبرنا جريرٌ عَنْ مَنْصورٍ عَن ابراهيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشةَ قالتْ كانتْ اِحْدانا حاضتْ اَمَرَها رسولُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَتَّزِرَ ثم يُبَاشِرُها -

---

অনুচ্ছেদ ঃ একই কাপড়ের নিচে ঋতুমতি স্ত্রীর সাথে পুরুষের শয্যা গ্রহণ

অনুবাদ ঃ ৩৭২. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স) একই চাদরে রাত্রি যাপন করতাম অথচ আমি ছিলাম ঋতুমতি। আমার কোন কিছু তাঁর শরীরে লাগলে তিনি শুধু ঐ স্থান ধুয়ে নিতেন। এর অধিক ধুতেন না, আর তাতেই তিনি নামায আদায় করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতি স্ত্রীর শরীরের সাথে শরীর মিলানো

৩৭৩. কুতায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাদের কেউ ঋতুমতি হলে তাকে আদেশ করতেন যেন সে তার ইযার শক্ত করে বাঁধে। পরে তিনি তার শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন।

৩৭৪. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ ঋতমতি হলে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে কাপড় বাঁধার নির্দেশ দিতেন। তারপর তিনি তার দেহের সাথে দেহ মিলাতেন।

প্রথম অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে ইতিপূর্বে بابُ مُضَاجَعَةِ الحَائِضِ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, এখানে ভিন্ন শিরোনামে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এ সম্পর্কে অবগতির জন্য সেখানে দেখুন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য শিরোনামের অধীনে যে হাদীস আনা হয়েছে এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে باب مُبَاشَرةِ الحَائِض অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এ সম্পর্কে জানার জন্য সেখানে দেখুন।

ذِكْرُ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَصْنَعُه إذا حَاضَتْ إحدٰى نِسَائِه

٣٧٥. اخبرنا هنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ وهُو ابو بكرٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سعيدٍ ثُمَّ ذكر كلمةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنا عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ قال دخلتُ على عائشةَ مع أُمِّي وخَالَتِي فَسَالتَاهَا كيف كَانَ النبيُّ ﷺ يَصْنَعُ إذا حاضَتْ إحداكُنَّ قالتْ كانَ يَأمُرُنا إذا حاضتْ إحْدَانا أنْ تَتَّزِرَ بِإزارٍ واسعٍ ثمّ يَلْتَزِم صَدْرَهَا وثَدْيَيْهَا -

٣٧٦. اخبرنا الحارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِراءةً عليه وأنا اسمَعُ عَن ابنِ وَهْبٍ عَنْ يونسَ والليثُ عَنِ ابْنِ شهابٍ عَنْ حَبِيْبٍ مَوْلٰى عُرْوَةَ عَن بُدَيَّةَ وكانَ اللَّيْثُ يقولُ نَدْبَةَ مَوْلاةِ مَيْمُوْنَةَ عَنْ مَيْمُونةَ قالتْ كانَ رَسُول اللّٰه ﷺ يُباشِرُ المَرأةَ مِن نِسائِه وهِي حائضٌ اذا كانَ عليها ازارٌ يَبْلُغ أنْصَافَ الفَخِذَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ فِيْ حديثِ اللَّيْثِ تَحْتَ حِجْرِه -

---

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন স্ত্রী ঋতুমতি হতেন তখন তিনি তার সাথে কি করতেন?

অনুবাদ ঃ ৩৭৫. হান্নাদ ইবনে সারী (র)...... জুমাই' ইবনে উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। আমি আমার আম্মা ও আমার খালার সাথে আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁরা উভয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের কেউ ঋতুমতি হলে তখন রাসূলুল্লাহ (স) কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, তখন তিনি আমাদের আদেশ করতেন আমরা যেন প্রশস্ত ইযার পরিধান করি। তারপর তিনি তার স্তনসহ বক্ষদেশ জড়িয়ে ধরতেন।

৩৭৬. হারিস ইবনে মিসকীন (র)........... মায়মুনা (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সহধর্মিণীদের কারো সাথে হায়েয অবস্থায় শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন, যখন তিনি (ঋতুমতি সহধর্মিণী) ইযার পরিহিতা থাকতেন। আর তা তাঁর উরু ও হাঁটুদ্বয়ের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছতো।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

আলোচ্য রেওয়ায়াতে بِإزارٍ واسعٍ এসেছে।এর দ্বারা আয়েশা (রা) এর এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, আমাদের মধ্য হতে যে হায়েযা হতো সে এমন বস্ত্র পরিধান করত যা নাভির নিচ থেকে শুরু করে হাঁটু পর্যন্ত হত। অতঃপর নবী (স) বস্ত্রের উপরাংশের সাথে স্বীয় শরীর মিলাতেন। এর দ্বারা বুঝা যায় হায়েযা স্ত্রীর নাভি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত অংশ থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ নয়, এটাই ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর মত।

অনুচ্ছেদে উল্লেখিত দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে ইতিপূর্বে بابُ مُباشرة الحائض অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এ সম্পর্কে জানার জন্য সেখানে দ্রষ্টব্য।

بَابُ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبُ مِنْ سُؤْرِهَا

٣٧٧. اخبرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد بْنِ جميل بْنِ طَرِيفٍ اخبرنا يزيدُ بْنُ المقدام بْنِ شُرَيحِ بْنِ هانيءٍ عَنْ اَبِيه عَنْ شُرَيحٍ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ هَل تَأْكُلُ الْمَرأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وهى طامثٌ قالتْ نعَمْ كانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنِى فَاٰكُلُ مَعَهُ وَانَا عارِكٌ كانَ يَاخُذُ العِرْقَ فيُقسِمُ علىَّ فيه فَاَعْتَرِقُ مِنْهُ ثم اَضَعُهُ فيَاخُذُه فيَعْتَرِقُ مِنه ويَضَعُ فَمَهُ حيثُ وضعتُ فَمِى مِنَ العِرْقِ وَيَدْعُو بالشَّرابِ فيُقسِمُ علىَّ فيه مِن قَبْلِ اَن يَشْرَبَ مِنْهُ فَاٰخُذُه فاَشْرَبُ منه ثم اَضَعُه فيَاخُذُه فيَشْرَبُ مِنه وَيَضَعُ فَمَه حيثُ وَضَعْتُ فَمِى مِنَ القَدَحِ -

٣٧٨. اَخْبَرَنِى اَيُّوب بنُ محمَّدٍ الوَزَّانِ قالَ حدَّثنا عبدُ اللّٰه بنُ جعفرٍ قال حدَّثنا عبيدُ اللّٰهِ بنُ عمرو عَنِ الاَعْمَشِ عَنِ المِقدامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيه عَنْ عَائِشَةَ قالتْ كانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوضِعِ الَّذِى اَشْرَبُ مِنْه وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ شَرابِى وَاَنا حائضٌ -

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতির সঙ্গে একত্রে খাদ্যগ্রহণ ও তার উচ্ছিষ্ট হতে পান করা

অনুবাদ ঃ ৩৭৭. কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)........ শুরায়হ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করেন স্ত্রী কি তার স্বামীর সঙ্গে হায়েয অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে ডাকতেন, আর আমি তাঁর সঙ্গে একত্রে খাদ্যগ্রহণ করতাম; অথচ তখন আমি ঋতুমতি থাকতাম। কখনোবা তিনি একটি গোশতযুক্ত হাড় নিতেন, আর তা খাওয়ার ব্যাপারে আমাকে বাধ্য করতেন, আমি তা থেকে গোশত চিবাতাম, পরে তা রেখে দিতাম। তিনি তা হাতে নিয়ে নিজেও চিবাতেন আর আমি হাড়ের যেখানে আমার মুখ রাখতাম তিনি সেখানেই তাঁর মুখ রাখতেন। আর তিনি পানীয় আনতে বলতেন, তিনি নিজে তা হতে পান করার পূর্বে আমাকে পান করার জন্য বাধ্য করতেন, তখন আমি সে পাত্র থেকে পান করতাম তারপর তা রেখে দিতাম, আর তিনি তা হাতে নিয়ে তা থেকে পান করতেন, তিনি তাঁর মুখ পেয়ালার ঐ স্থানেই রাখতেন যেখানে আমি আমার মুখ রাখতাম।

৩৭৮. আইয়ুব ইবনে মুহাম্মদ ওয়ায্যান (র).......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর মুখ ঐ স্থানে রাখতেন যে স্থান থেকে আমি পান করতাম, আর তিনি আমার পান করার পর উদ্বৃত্ত পানি পান করতেন অথচ আমি তখন ঋতুমতি থাকতাম।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

আলোচ্য শিরোনামের অধীনে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে بَابُ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبُ مِن سُؤْرِهَا অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে দেখে নিন।

الِا نْتِفَاعُ بِفَضْلِ الحَائِضِ

٣٧٩. اخبَرَنا محمدُ بْنُ مَنْصُورٍ قال حدَّثَنا سفيانُ عَنْ مِسْعرٍ عَنِ المِقدامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْه قال سمعتُ عائشةَ تقولُ كانَ رسولُ اللّٰه ﷺ يُناوِلُنِى الانَاءَ فَاَشْرَبُ مِنْه وانَا حائضٌ ثمَّ اُعْطِيْه فيَتَحَرّى مَوضِعَ فَمِىْ فيَضَعُه عَلىٰ فِيْه -

٣٨٠. اخبَرَنا محمودُ بْنُ غَيْلانَ قال حدّثنا وكيعٌ قال حدّثنا مسعودٌ وسفيانُ عَنِ الْمِقْدامِ بْنِ شُرَيحٍ عَنْ اَبِيْه عَنْ عَائِشةَ قالتْ كنتُ اَشْرَبُ مِنَ القَدَحِ وانَا حائضٌ فانَاوِلُه النبىَّ ﷺ فيَضَعُ فَاهُ عَلىٰ مَوضِعِ فِىَّ فيَشْرَبُ مِنه واَتعَرَّقُ مِن العِرقِ وانَا حائضٌ واُنَاوِلُه النبى ﷺ فيضع فاه على موضع فى -

باب الرجل يقرا القران وراسه فى حجر امرءاته وهى حائض

٣٨١. اخبرنا اسحق بن ابراهيم وعلى بن حجرو اللفظ له قالا حدثنا سفيان عن منصور عن امه عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ فى حجر احدانا وهى حائض وهو يقرا القران -

---

ঋতুমতির ভুক্তাবশেষ ব্যবহার

অনুবাদ ঃ ৩৭৯. মুহাম্মদ ইবনে মনসুর (র)....... শুরায়হ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে পানপাত্র দিতেন, আমি তা থেকে পান করতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি থাকতাম। পরে আমি ঐ পাত্র তাঁকে প্রদান করতাম, তখন তিনি আমার মুখ রাখার স্থানটি তালাশ করে সেখানেই মুখ রাখতেন।

৩৮০. মাহমুদ ইবনে গায়লান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পানপাত্র থেকে পান করতাম তখন আমি ঋতুমতি থাকতাম। তারপর আমি তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তা প্রদান করতাম, তিনি আমার মুখের স্থানে তাঁর মুখ রেখে পান করতেন। ঋতুমতি অবস্থায় আমি গোশতযুক্ত হাড় হতে গোশ্‌ত চিবাতাম, আর তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে প্রদান করতাম, তিনি আমার মুখ রাখার স্থানে নিজের মুখ রাখতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতি স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে পুরুষের কুরআন মজীদ তিলাওয়াত

৩৮১. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ও আলী ইবনে হুজর (র).......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাথা আমাদের কারো কোলে থাকত অথচ সে তখন ঋতুমতি থাকত। আর এ অবস্থায় তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

দ্রষ্টব্যঃ প্রথম শিরোনামের অধীনে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ باب الانتفاع بفضل الحائض এর অধীনে পূর্বে গত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় শিরোনামের হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্বে باب الذى يقرء القران ورأسه فى حجر امرأته وهى حائض অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই সেখানে দেখুন।

بَابُ سُقُوطِ الصَّلٰوةِ عَنِ الحَائِضِ

٣٨٢. اخبرنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن ابى قلابة عن معاذة العدوية قالت سالت امراة عائشة اتقضى الحائض الصلوة فقالت احرورية انت قد كنا نحيض عند رسول الله ﷺ فلا نقضى ولا نؤمر بقضاء -

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতি নারী থেকে নামায রহিত হওয়া

অনুবাদ ঃ ৩৮২. আমর ইবনে যুরারাহ (র)........মু'আযা আদাবিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, ঋতুমতি নারী কি নামায আদায় করবে? তিনি বললেন, তুমি কি খারিজী মহিলা? আমরা তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপস্থিতিতে ঋতুমতি হতাম, তখন আমরা নামায আদায় করতাম না এবং আমাদের তা কাযা করতেও বলা হতো না।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

ইবনে মাঈন বলেন, معاذة بنت عبد الله العدويه নির্ভরযোগ্য রাবী। ইবনে হিব্বানও তাকে সিকা রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বড় ইবাদত গোজার লোক ছিলেন, আল্লামা জাহাবী বলেন, আমার শুনেছি যে, তিনি সারা রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন, যার কারণে বলা হয় তিনি রাতকে জীবিত রাখতেন। তিনি বলতেন-

عَجِبْتُ لِعَيْنٍ تَنَامُ وقد عَلِمَتْ طولَ الرُّقَادِ فِى القُبُوْرِ

তিনি ৮২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। রাবী বলেন, একদা এক মহিলা হযরত আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন, হায়েযা মহিলা পবিত্রতা অর্জন করার পর হায়েযের দিনসমূহের নামাযগুলোর কি কাযা আদায় করতে হবে? হযরত আয়েশা (রা) জবাবে বলেন, তুমি কি حرورية অর্থাৎ খারেজিয়্যাহ? حروية খাওয়ারেজ সম্প্রদায়ের একটি ফেরকা। حروراءএকটি জায়গার নাম যা কুফার নিকটবর্তীতে অবস্থিত। খাওয়ারেজরা এখানে একত্রিত হয়ে পরস্পর অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়েছিল। কাজেই এ স্থানের দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে حرورية বলা হয়। হায়েযাদের ব্যাপারে তাদের বিধান অত্যন্ত কঠিন। তারা বলে হায়েযা মহিলাদের জন্য হায়েযের দিনগুলোর নামাযের কাযা আদায় করা ওয়াজিব, অথচ এটা ইজমার পরিপন্থী বক্তব্য। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) উক্ত মহিলাকে জবাব দেন রাসূলের যুগে আমরা হায়েযা হতাম এবং পবিত্রতা অর্জনের পর হায়েযের দিনগুলোর নামাযের কাযা আদায় করতার না। কিন্তু খারেজীদের মতে তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব। বস্তুত এটা ইজমার পরিপন্থী। এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা গেলো যে, হায়েযের দিনগুলোর নামাযের কাযা আদায় করতে হবে না। যদি কাযা আদায় করা ওয়াজিব হত তাহলে হুজুর (স) অবশ্যই এর নির্দেশ দিতেন। অথচ কোন রেওয়ায়াত দ্বারা হায়েযের দিনগুলোর নামাযের কাযা আদায় করার বিষয়টি সাব্যস্ত নয়।

আল্লামা কাযী শাওকানী (র) লেখেন যে, ইবনে মুনযির ও ইমাম নববী (র) এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমার দাবী করেছেন যে, হায়েযা মহিলার উপর হায়েযের দিনগুলোর নামায আদায় করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু রোযার কাযা আদায় করা ওয়াজিব। এর কারণ হলো, নামাযের কাযা আদায় করতে হলে কষ্ট বা সমস্যায় পড়তে হয়। আর কুরআন পাকে ঘোষনা করা হয়েছে- مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ... الخ এর দ্বারা বুঝা যায় বিধাতা বান্দার উপর থেকে সমস্যা ও কষ্টকে দূর করে দিয়েছেন। কাজেই নামাযের কাযা আদায় করতে হবে না। তবে রোযার বিধানটি এরূপ নয়। কেননা তার কাযা আদায় করতে গেলে কষ্ট বা সমস্যায় পড়তে হয় না। কেননা, রোযা হলো সারা বছরে মাত্র এক মাস। তাই তার কাযা আদায় করা কষ্টকর হবে না। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ৪০৪)

بَابُ اِسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

٣٨٣. اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني ابو حازم قال قال ابو هريرة رضى الله عنه بينا رسول الله ﷺ فى المسجد اذ قال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت انى لا أصلى فقال انه ليس فى يدك فناولته -

٣٨٤. اخبرنا قتيبة عن عبيدة عن الاعمش ح واخبرنا اسحق بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ثابت بن عبيد الله عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة قال لى رسول الله ﷺ ناوليني الخمرة من المسجد فقالت انى حائض فقال رسول الله ليست حيضتك فى يدك -

بَسْطُ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ

٣٨٥. اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن امه ان عن ميمونة قالت كان رسول الله ﷺ يضع رأسه فى حجر احدنا فيتلو القران وهى حائض وتقوم احدانا بخمرته الى المسجد فتبسطها وهى حائض -

---

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতি নারীর খেদমত গ্রহণ

অনুবাদ ঃ ৩৮৩. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র).......আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে ছিলেন, তিনি বললেন, আয়েশা! আমাকে কাপড়টা দাও। তখন আয়েশা (রা) বললেন, আমি নামায আদায়ের যোগ্য নই। তিনি বললেন, হায়েয তো তোমার হাতে নয়। তখন আয়েশা (রা) তাঁকে তা প্রদান করলেন।

৩৮৪. কুতায়বা (র) অন্য সূত্রে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র).........কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, আমাকে মসজিদ হতে চাদরখানা এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো ঋতুমতি, তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হায়েয তো তামার হাতে নয়।

ঋতুমতি নারীর মসজিদে চাদর বিছানো

৩৮৫. মুহাম্মদ ইবনে মানসুর (র)....... মানবূয (র) তার মাতা থেকে বর্ণনা করেন যে, মায়মুনা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের কারো কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন অথচ সে থাকত তখন ঋতুমতি। আর আমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে হায়েয অবস্থায় তাঁর চাদর বিছিয়ে আসত।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

দ্রষ্টব্য ঃ প্রথম অনুচ্ছেদের অধীনে যে হাদীস আনা হয়েছে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্বে بَابُ اِسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ অধীনে উপস্থাপিত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় শিরোনামের অধীনে যে রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে পূর্বে بَابُ مَا تَفْعَلُ النِّسَاءُ عند الاحرام অনুচ্ছেদে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই তা সেখানে দ্রষ্টব্য।

بابُ تَرْجِيلِ الحَائِضِ راسَ زَوْجِهَا وهُوَ مُعْتَكِفٌ فِى المَسْجِدِ

٣٨٦. اخبرنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قال حدّثنا عبدُ الأَعْلَى قالَ حدّثنا معمرٌ عَنِ الزُّهريِّ عَن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ انّها كانتْ تُرَجِّلُ راسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وهى حائضٌ وهو مُعْتَكِفٌ فيُناوِلُها رَاسَهُ وهِىَ فِى حُجْرَتِهَا -

غَسْلُ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

٣٨٧. اخبرنا عمرُو بْنُ عليٍّ قال حَدّثنا يحيٰى قال حَدّثنا سفيانُ قال حَدّثنى منصورٌ عَنْ ابراهيمَ عَنِ الأَسْوَدِ. عَنْ عَائِشَةَ قالتْ كانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْنِى اِلَىَّ رَاسَهُ وهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وانَا حَائِضٌ -

٣٨٨. اخبرنا قُتَيْبَةُ قال حَدّثنا الفُضَيْلُ وهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَن تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ رَاسَهُ مِنَ المَسْجِدِ وهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وانا حائِضٌ -

٣٨٩. اخبرنا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَن اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قالتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَاْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وانا حائِضٌ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতি স্ত্রীর মসজিদে ইতিকাফরত স্বামীর মাথা আঁচড়ানো

অনুবাদ ঃ ৩৮৬. নাসর ইবনে আলী (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি ঋতুমতি অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাথায় চিরুণী করতেন আর রাসূলুল্লাহ (স) তখন ইতিকাফে থাকতেন। তিনি সেখান থেকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন, আর (আয়েশা (রা)) থাকতেন হুজরায়।

ঋতুমতি স্ত্রীর স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া

৩৮৭. আমর ইবনে আলী (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইতিকাফ অবস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা বাড়িয়ে দিতেন, আর আমি ঋতুমতি অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

৩৮৮. কুতায়বা ....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে আমার দিকে তাঁর মাথা বের করে দিতেন, আর আমি ঋতুমতি অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

৩৮৯. কুতায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুমতি অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাথায় চিরুণী করে দিতাম।

সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

হযরত আয়েশা (রা) এর বর্ণনা অনুযায়ী আলোচ্য রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় স্বামী স্বীয় স্ত্রীর থেকে সহবাস ব্যতীত অন্য সকল ফায়দা নিতে চাইলে নিতে পারবে। যেমন– হায়েয অবস্থায় তার স্বামীর মাথা আঁচড়ানো, মাথা ধুয়ে দেয়া ইত্যাদি। এ সকল খেদমত স্ত্রীও করতে পারবে এবং স্বামীও নিতে চাইলে নিতে পারবে। হযরত আয়েশা (রা) হায়েযা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করেন নি। এর দ্বারা বুঝা যায় মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নয়। হযরত আয়েশা (রা) হায়েয অবস্থায় মসজিদের বাহিরে থেকে নবী (স) এর মাথা আঁচড়ায়ে দিতেন, এ সময় নবী করীম (স) এতেকাফ অবস্থায় দরজা বা জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিতেন। এর দ্বারা বুঝা যায় এতেকাফ অবস্থায় শরীরের কিছু অংশ মসজিদের বাহিরে বের করার দ্বারা এতেকাফ নষ্ট হয় না। (শরহের উর্দু নাসায়ী : ৪০৫)

দ্রষ্টব্য ঃ দ্বিতীয় শিরোনামের আলোচনা পূর্বে بَابُ غَسْلِ الحائِضِ رأسَ زَوْجِها এর অধীনে অতিবাহিত হয়েছে।

بَابُ شُهُوْدِ الْحُيَّضِ الْعِيْدَيْنِ وَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ

٣٩٠. اخبرنا عمرو بن زرارة حدثنا اسمعيل عن ايوب عن حفصة قالت كانت ام عطية لاتذكر رسول الله ﷺ الا قالت بابا فقلت سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا وكذا قالت نعم بابا قال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى .

الْمَرْأَةُ تَحِيْضُ بَعْدَ الْاِفَاضَةِ

٣٩١. اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال اخبرني مالك عن عبد الله بن ابى بكر عن ابيه عن عمرة عن عائشة انها قالت لرسول الله ﷺ ان صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله ﷺ لعلها تحبسنا الم تكن طافت معكن بالبيت قالت بلى قال فاخرجن -

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতি নারীদের ঈদে ও মুসলমানদের দাওয়াতে উপস্থিত হওয়া

অনুবাদ ঃ ৩৯০. আমর ইবনে যুরারাহ (র)........ হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে আতীয়া (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম উচ্চারণ করলেই বলতেন, 'আমার পিতা উৎসর্গ হোক'। একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার পিতা উৎসর্গ হোক। তিনি বলেছেন, বালেগা হওয়ার নিকটবর্তী বয়সের বালিকা, অন্তপুরবাসিনী ও ঋতুমতি মহিলাগণ নেক কাজে এবং মুসলমানদের দোয়ার মজলিসে উপস্থিত হতে পারে তবে ঋতুমতি মহিলাগণ নামাযের স্থান থেকে দূরে থাকবে।

যে নারী তাওয়াফে ইফাদার পরে ঋতুমতি হয়

৩৯১. মুহাম্মদ ইবনে সালামা (র)..........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, সফিয়্যা বিনতে হুয়াই ঋতুমতি হয়েছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হয়তো সে আমাদের আটকে রাখবে, সে কি তোমাদের সঙ্গে কা'বা শরীফের তাওয়াফ করেনি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তিনি (স) বললেন, তাহলে তোমরা বের হয়ে পড়।

প্রথম অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্টআলোচনা

قال لتخرج العواتق الخ **ঃ** ইমাম ত্বহাবী (র) এর ব্যাখ্যা এভাবে প্রদান করেছেন যে, ইসলামের শুরু যুগে উভয় ঈদ ও মুসলমানদের দোয়ায় নারীদেরকেও শরিক হওয়ার নির্দেশ দিতেন। কারণ তখন মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তাই হুজুর (স) শত্রুর সম্মুখে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য প্রকাশ করার জন্য ঈদে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। যাতে করে শত্রুবাহিনী ভয় পায়। কিন্তু পরবর্তীতে মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়ার আর প্রায়োজন অবশিষ্ট থাকেনি, কারণ মুসলিম পুরুষের সংখ্যা বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত: বর্তমান যুগে মহিলারা ঈদগাহে গমন করলে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, কাজেই মহিলাদের ঈদগাহে গমন করার অনুমতি নেই। এটাই ফুকাহায়ে কিরামের ফয়সালা। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ৪০৬)

[দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা পঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

مَاتَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

٣٩٢. اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن ابيه . عن جابر بن عبد الله في حديث اسماء بنت عميس حين نفست بذى الحليفة ان رسول الله ﷺ قال لابى بكر مرها ان تغتسل وتهل -

بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

٣٩٣. اخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث عن حسين يعنى المعلم عن ابن بريدة عن سمرة قال صليت مع رسول الله ﷺ على ام كعب ماتت فى نفاسها فقام رسول الله ﷺ فى الصلوة فى وسطها-

নিফাসগ্রস্ত মহিলা ইহরামের সময় কি করবে?

অনুবাদ ঃ ৩৯২. ইবনে কুদামা (র).........জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে উমায়স নিফাসগ্রস্ত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) আবু বকর (রা)-কে বললেন, তাকে বল, সে যেন গোসল করে নেয় এবং ইহরাম বাঁধে।

অনুচ্ছেদ ঃ নিফাসওয়ালী মহিলার জানাযার নামায

৩৯৩. হুমায়দ ইবনে মাস'আদাহ (র).........সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে উম্মে কা'বের জানাযার নামায আদায় করেছি। তিনি নিফাস অবস্থায় ইন্তেকাল করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) নামাযে তাঁর লাশের মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন।

দ্রষ্টব্য ঃ প্রথম অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পূর্বে بَابُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ এর অধীনে অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই এ সম্পর্কে জানার জন্য সেখানে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় নিফাস অবস্থায় কোন মহিলা মারা গেলে তার জানাযার নামায আদায় করতে হবে কারণ নিফাস জানাযার নামায আদায়ের প্রতিবন্ধক নয়। অনুরূপভাবে আলোচ্য হাদীস থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, নিফাসগ্রস্ত মহিলা পবিত্র। কারণ মুমিন নাপাক হয় না। তবে কথা হলো নিফাসের অপবিত্রতা হলো امر تعبدى যা মৃত্যুর কারণে শেষ হয়ে যায়। আর حسى বা দৈহিক নাপাক গোসলের মাধ্যমে ধুয়ে যায়। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ৪০৭)

পূর্বের পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

এ রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় নবী (স) হায়েযা মহিলাদেরকে طواف الوداع ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে সকল ইমামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদি তওয়াফে যিয়ারতের পর হায়েয শুরু হয় তাহলে طواف الوداع করার জন্য হায়েয থেকে পাক হওয়া জরুরী নয়। বরং স্বদেশে ফিরে আসবে। কেননা, উক্ত রেওয়ায়েতে এসেছে যখন হযরত সফিয়্যা এর হায়েয শুরু হয়, তখন আয়েশা (রা) নবী (স) কে সে সম্পর্কে অবগত করেন। তখন নবী করীম (স) বলেন, সফিয়্যা কি তাওয়াফে যিয়ারত করেছে? হযরত আয়েশা (রা) জবাব দিলেন, জি- হ্যাঁ সে আমার সাথে তাওয়াফে যিয়ারত করেছে। তখন হুজুর (স) বললেন, فاخرجن তাকে বলে দাও সে যেন মক্কা থেকে প্রস্থান করে। এর দ্বারা বুঝা গেলো তাওয়াফে যিয়ারত করার পর যদি হায়েয শুরু হয় তাহলে طواف الوداع করার উদ্দেশ্যে মক্কায় অবস্থান করার বিধান নেই। বরং মক্কা থেকে প্রস্থান করাই তার হুকুম। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ৪০৭)

بابُ دمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٣٩٤. اخبرنا يَحْيى بنُ حبيبِ بْنِ عربيٍّ قال حدّثنا حمّادٌ عَنْ هِشامِ بْنِ عُروةَ عَنْ فاطمةَ بنتِ المُنذرِ عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ أَبِي بكرٍ وكانتْ تَكُونُ فِي حَجْرِها أنّ امرأةً اِسْتَفْتَتِ النبيَّ ﷺ عَنْ دمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فقال حُتِّيهِ واقْرُصِيهِ وانْضَحِيهِ وصَلِّي فيه -

٣٩٥. اخبرنا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سعيدٍ قالَ حدّثنا يحيى عَنْ سُفيانَ قال حدّثني أبو المِقدامِ ثابتُ الحَدّادُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينارٍ قالَ سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ انها سَألَتْ رسولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ دَمِ الحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قال حُكِّيهِ بِضَلَعٍ واغْسِلِيهِ بماءٍ وسِدْرٍ -

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুর রক্ত কাপড়ে লাগলে

অনুবাদ ঃ ৩৯৪. ইয়াহয়া ইবনে হাবীব (র)........আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকি মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঋতুর রক্ত কাপড়ে লাগলে কি করতে হবে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তা দূর করবে পরে তা হাত দ্বারা ঘষে ফেলবে। তারপর পানি ঢেলে ধুয়ে তাতেই নামায আদায় করবে।

৩৯৫. উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'ঈদ (র)........আদী ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, উম্মে কায়স বিনতে মিহসান (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ঋতুর রক্ত কাপড়ে লাগলে কি করতে হবে? তিনি বললেন, কাঠ বা হাড্ডি দ্বারা ঘষে ফেলবে। তারপর পানি ও কুলপাতা দ্বারা ধুয়ে ফেলবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্বে بابُ دمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ এর অধীনে অতিবাহিত হয়েছে, প্রয়োজনে সেখানে দ্রষ্টব্য।

كِتَابُ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ

بَابُ ذِكْرِ نَهْيِ الْجُنُبِ عَنِ الْاِغْتِسَالِ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ

٣٩٦. اخبَرَنا سليمانُ بْنُ داودَ الحارثُ بْنِ مِسكينٍ قِراءةً عليه وانا اسمعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عمروِ بْنِ الحَارِثِ انّ اَبَا السَّائِبِ حدَّثه اَنّه سمع ابا هريرةَ يقولُ قال رسولُ اللّٰهِ ﷺ لاَيغْتَسِلُ احدُكم فِى المَاءِ الدَّائِمِ وهُو جُنُبٌ -

٣٩٧. اخبَرَنا محمدُ بْنُ حاتِمٍ قال حدَّثنا حبّانُ قال حدَّثنا عبدُ اللّٰهِ عَن معمرٍ عَن همّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَن ابى هريرةَ عَنِ النبىِّ ﷺ قال لا يَبُولَنَّ الرَّجُلُ فِى المَاءِ الدَّائِمِ ثمّ يَغْتَسِلُ فِيه او يَتَوضَّأُ -

٣٩٨. اخبَرَنا احمدُ بْنُ صالحٍ البَغْدادِىُّ قال حَدَّثنا يَحْيىٰ بْنُ محمدٍ قال حدَّثنِى ابنُ عَجلانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَن ابى هريرةَ اَنّ رسولَ اللّٰه ﷺ نهى اَنْ يُبالَ فِى المَاءِ الدَّائِمِ ثمّ يُغْتَسَلُ فيه مِنَ الجَنابةِ

٣٩٩. اخبَرَنا محمدُ بنُ عبدُ الله بنِ يزيدَ عن سفيانَ عَن ابى الزِّنادِ عَن موسٰى بْنِ ابى عثمانَ عَن ابيهِ عَن ابى هريرةَ اَنَّ رسولَ اللّٰه ﷺ نهٰى ان يُّبالَ فِى الماء الراكِد ثم يُغْتَسلُ مِنه -

٤٠٠. اخبَرَنا قُتَيْبَةُ قال حَدَّثَنا سفيانُ عَن اَيّوبَ عَن ابْنِ سِيْرِينَ عَنْ اَبِى هُريرةَ قَالَ لايَبُولَنَّ اَحَدُكم فِى المَاءِ الدَّائِمِ الّذى لايَجْرِى ثم يَغْتَسِلُ مِنْه

قال سفيانُ قالُوا لِهشامٍ يَعْنِى ابنَ حَسَّانَ اَنّ ايوبَ اِنّما يَنْتَهِى بِهٰذا الحديثِ الىٰ اَبِى هريرةَ فَقَالَ اِنّ ايُّوبَ لَواسْتطاعَ ان لاَيَرْفَعَ حديثًا لم يَرْفَعْهُ -

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ دُخُولِ الحَمَّامِ

٤٠١. اخبَرَنا اسحٰقُ بْنُ ابراهيمَ قال حَدَّثَنا معاذُ بْنُ هِشامٍ قال حدَّثَنِى اَبِىْ عَن عَطاءٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيرِ عَن جابرٍ رضى الله عنه عَنِ النبىِّ ﷺ قال مَنْ كانَ يُؤمِنُ بِاللّٰهِ واليَوْمِ الاٰخِرِ فَلا يَدْخُلُ الحَمَّامَ اِلّا بِمِيْزَرٍ -

---

অধ্যায় ঃ গোসল ও তায়াম্মুম

অনুচ্ছেদ ঃ বদ্ধ পানিতে জুনুব ব্যক্তির গোসলের নিষেধাজ্ঞা

অনুবাদ ঃ ৩৯৬. সুলায়মান ইবনে দাউদ ও হারিস ইবনে মিসকীন (র).......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে জানাবতের গোসল না করে।

৩৯৭. মুহাম্মদ ইবনে হাতিম (র).....আবু হুরায়রা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব করে তাতে গোসল অথবা উযু না করে।

---

৩৯৮. আহমদ ইবনে সালিহ বাগদাদী (র)..........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বদ্ধ পানিতে পেশাব করে তাতে জানাবতের গোসল করতে নিষেধ করেছেন।

৩৯৯. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বদ্ধ পানিতে পেশাব করে তাতে গোসল করতে নিষেধ করেছেন।

৪০০. কুতায়বা (র).........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন প্রবাহিত হয় না এরূপ বদ্ধ পানিতে পেশাব করে তাতে গোসল না করে।

অনুচ্ছেদ ঃ হাম্মামে প্রবেশের অনুমতি

৪০১. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র).... জাবির (রা) সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতে এবং কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে, সে যেন ইযার পরিধান ব্যতীত হাম্মামে প্রবেশ না করে।

প্রথম অনুচ্ছেদসংশ্লিষ্ট আলোচনা

অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীস সম্পর্কে পূর্বে بَابُ النَّهْىِ عَنْ اِغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ এর অধীনে এবং দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে بَابُ النهى عَنِ البَول فِى المَاءِ الراكِدِ وَالْاِغْتِسَالُ مِنْه এর অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর শেষ হাদীস সম্পর্কে সুফিয়ান বলেন, قَالُوا لِهِشَامٍ يعنى اِبْنَ حَسَّانٍ الخ অর্থাৎ লোকেরা হিশাম ইবনে হাসসানকে জিজ্ঞেস করেন হাদীসের রাবী আইয়্যুব উক্ত হাদীসকে শুধুমাত্র আবু হুরায়রা পর্যন্ত পৌছান। অথচ হাদীসটি অন্য সনদে মারফরূপে উল্লেখ রয়েছে। এর কারণ কি?

হিশাম ইবনে হাসসান জবাবে বলেন, اَنَّ ايّوب لَواسْتَطَاعَ اَن لَايَرْفَعَ حديثًا لَمْ يَرْفَعه

আবু আইউব (রা) হাদীসটিকে মারফু হিসেবে বর্ণনা না করার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যথা-

১. রাসূল (স) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তিনি এমন করেছেন। তথা রাসূলের নাম উল্লেখ করেননি।

২. অথবা, হাদীসের শব্দ চয়নে তার ভুল হতে পারে, এখন যদি হাদীসের নিসবত তাঁর দিকে করা হয় তাহলে তাঁর দিকে মিথ্যা জিনিসের নিসবত করা হবে। আর এ ব্যাপারে রাসূলের ভাষ্য অত্যান্ত কঠোর-مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ এ আশংকাই তিনি হাদীসের নিসবত রাসূলের দিকে করেননি। মোটকথা, হিশামের সূত্রে হাদীসটি মাওকুফভাবে বর্ণিত হওয়াতে কোন সমস্যা নেই। কারণ অন্য সূত্রে হাদীসটি মারফু।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ইযার তথা বস্ত্র পরিধান ব্যতীত গোসলখানাই প্রবেশ করা উচিত নয়। কারণ, নবী (স) ইযার বিহীন অবস্থায় হাম্মামে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এতে একজনের দৃষ্টি অপরজনের সতরের উপর পড়ে। তবে ইযার সহকারে প্রবেশ করার অনুমতি আছে। কেননা, নাভি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ইযার পরিধান করে গোসল করার সুরতে সতর প্রকাশিত হওয়ার কোন আশংকা থাকে না এবং এতে একের দৃষ্টি অপরের সতেরর উপরেও পড়বে না।এর দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয় না যে, নবী (স) এর যুগে হাম্মাম বিদ্যমান ছিল। কাজেই হাদীসটি ঐ হাদীসের বিপরীত হবে না যাতে এ শব্দ এসেছে–

سَتُفْتَحُ لَكُمْ اَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُوْنَ فِيْهَا بُيُوْتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتِ الخ

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তখন মুসলিম শহরে হাম্মাম ছিল না। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, কোন কোন কিতাবে এসেছ যে, নবী (স) হাম্মামে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণের নিকট এটা সহীহ নয়। সুতরাং এতসংক্রান্ত যে হাদীস বর্ণিত আছে তা মাউযূ বা জাল। বিশুদ্ধ কথা এই যে, নবী (স) কখনোই হাম্মামে প্রবেশ করেননি। প্রবেশ করা তো দূরের কথা তিনি চোখেও দেখেননি। মক্কায় নবী (স) এর হাম্মাম হিসেবে যেটা প্রসিদ্ধ রয়েছে হতে পারে নবী (স) দু'একবার সেখানে গোসল করেছিলেন, পরবর্তীতে সেখানে হাম্মাম তৈরী করা হয়েছে। (শরহে উর্দু নাসায়ী : ৪০১)

بَابُ الْاِغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

٤٠٢. اخبرنا محمّدُ بْنُ ابراهيم حدّثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قال حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَاةَ بْنِ زاهِرٍ انّهُ سمِعَ عبدَ اللّٰهِ بْنَ ابِى اَوْفى يُحَدِّثُ عَنِ النبىِّ ﷺ انّه كان يَدْعو : اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ -

٤٠٣. اخبرنا محمّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنُ محمدٍ حَدّثنا محمّدُ بْنُ موسى حدّثنا ابرهيمُ بْنُ يزيدَ عَنْ رُقَبَةَ عَنْ مَجْزَاةَ الْاَسْلَمِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِى اَوْفى قال كانَ النبىُّ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ مِنَ الذُّنُوْبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ বরফ এবং মেঘের পানিতে গোসল করা

অনুবাদ ৪০২. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম (র).........মাজযাআ ইবনে যাহির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি দুআ করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে পাপ এবং ভুল-ত্রুটি হতে পবিত্র করুন, হে আল্লাহ! আমাকে তা থেকে পাক পবিত্র করুন যে রূপ সাদা বস্ত্র ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়। হে আল্লাহ! আমাকে বরফ, মেঘের পানি এবং ঠাণ্ডা পানি দ্বারা পবিত্র করুন।"

৪০৩. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহয়া (র).....ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলতেন–

اللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ مِنَ الذُّنُوْبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

"হে আল্লাহ! আমাকে বরফ, মেঘের পানি এবং ঠাণ্ডা পানি দ্বারা পবিত্র করুন। হে আল্লাহ! আমাকে পাপ থেকে এরূপ পবিত্র করুন যেরূপ সাদা কাপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়।"

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

মুহাককিক উলামায়ে কিরামের ভাষ্য হলো আম্বিয়া (আ) সকল প্রকার গোণাহ থেকে মুক্ত তথা মাসুম। অবশ্য কখনো কখনো মুআমালার ক্ষেত্রে তাদের থেকে পদস্খলন সংঘটিত হয়েছে। যেহেতু তাদের মাকাম বহু উর্ধ্বে এবং আল্লাহ তাআলার সব থেকে প্রিয় বান্দাও তারা, আর প্রিয় ব্যক্তির সামান্য ত্রুটিও অনেক বড় মনে হয়, এ জন্য এ সামান্য ত্রুটি ও পদস্খলন তাদের থেকে প্রকাশ না পাওয়া বাঞ্ছণীয় ছিল। কাজেই তাদের উক্ত ত্রুটির উপর সতর্ক করা হয়েছে। আর এ সতর্ক করাটাই পরবর্তীতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়েছে। তাদেরকে সতর্ক করার পর তাঁরা আল্লাহ তাআলার নিকট ইস্তিগফার করেছেন। হাদীসের শেষাংশে الثلج ও البارد । الماء শব্দ এসেছে। এর দ্বারা পবিত্রতার মধ্যে মুবালাগা বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সামান্য সামান্য গোনাহ থেকেও পাক-সাফ করে দিন। (শরহে নাসায়ী: ৪১০)

بابُ الْاِغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

٤٠٤. اخبرنا شعيبُ بْنُ يوسفَ قال حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ قال سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ نَوْمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنَابَةِ اَيَغْتَسِلُ قَبْلَ اَنْ يَّنَامَ اَوْ يَنَامُ قَبْلَ اَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَمَا اِغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَمَا تَوَضَّاَ فَنَامَ -

بابُ الْاِغْتِسَالِ اَوَّلَ اللَّيْلِ

٤٠٥. اخبرنا يَحْيىٰ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُرْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الحَارِثِ قال دخلتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا فقلتُ اَكَانَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ او مِنْ اٰخِرِه قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ رُبَمَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَوَّلِهِ وَرُبَمَا اِغْتَسَلَ مِنْ اٰخِرِهِ قلتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً -

---

অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমানোর পূর্বে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করা

অনুবাদ ৪০৪. শুআয়ব ইবনে ইউসুফ (র)..........আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, জানাবত আবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিদ্রা কিরূপ ছিল? তিনি কি নিদ্রার পূর্বে গোসল করতেন অথবা গোসল করার পূর্বে নিদ্রা যেতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) সবটাই করতেন, অনেক সময় তিনি গোসল করে নিদ্রা যেতেন আবার কোন কোন সময় উযু করে নিদ্রা যেতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ রাতের প্রথমভাগে গোসল করা

৪০৫. ইয়াহয়া ইবনে হাবীব (র).........গুযায়ফ ইবনে হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (স) কি রাতের প্রথম ভাগে গোসল করতেন? না শেষ রাতে গোসল করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) এর সবটাই করতেন। অনেক সময় তিনি রাতের প্রথম ভাগে গোসল করতেন। আবার কখনও শেষ রাতে গোসল করতেন। আমি বললাম, আল্লাহরই সকল প্রশংসা যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন।

প্রথম অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ অনুচ্ছেদে যে রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে তা পূর্বের অনুচ্ছেদে উল্লেখিত রেওয়ায়াতই। পূর্বের রেওয়ায়াতটি মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তার উপর পূর্বের শিরোনাম কায়েম করেছেন। পুনরায় এ রেওয়ায়াতটাই সামান্য পরিবর্তনের সাথে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এ রেওয়ায়াতটি তিনি মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মাদ থেকে শুনেছেন ফলে এর জন্য স্বতন্ত্র আরেকটি শিরোনাম কায়েম করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেছনের باب الوضوء بالثلج অনুচ্ছেদে দেখে নিন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় জানাবাতের গোসল তৎক্ষণাত ওয়াজিব নয়। যদি জানাবাতের গোসল তৎক্ষণাত ওয়াজিব হত তাহলে রাসূল (স) কখনই এমন আমল করতেন না যা আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, জানাবাতের গোসল সম্পর্কে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ايغتسل قبل ان ينام ... الخ।

[বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

بَابُ الْاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

٤٠٦. اخبرنا ابراهيمُ بْنُ يعقوبَ قال حَدَّثَنِي النُّفَيْلِيُّ قال حَدَّثَنا زُهَيْرٌ قال حدَّثنا عبدُ المَلِكِ عَنْ عَطاءٍ عَنْ يَعْلى اَنّ رسولَ اللّهِ ﷺ رَاى رجلاً يَغْتَسِلُ بالبَرازِ فصَعِدَ المِنْبَرَ فحَمِدَ اللّهَ واَثْنى عَلَيْهِ وقال اِنّ اللّهَ عزّ وجلّ حليمٌ حَيِيٌّ سَتِيْرٌ يُحِبُّ الحَيَاءَ والسِّتْرَ فاِذا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ -

٤٠٧. اخبرنا اَبُو بكرِ بْنِ اِسْحٰق قال حَدَّثَنا الْاَسْوَدُ بْنُ عامِرٍ قال حَدَّثَنا ابو بكرِ بْنُ عَيّاشٍ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطاءٍ عَنْ صَفوانَ بْنِ يَعْلى عَنْ اَبِيْهِ قالَ قالَ رسولُ اللّهِ ﷺ اِنّ اللّهَ عَزّ وَجَلّ سَتِيْرٌ فاِذا اَرادَ اَحَدُكُم اَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوارَ بِشَيْءٍ -

٤٠٨. اخبرنا قُتَيْبَةُ قال حَدَّثنا عَبِيْدَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سالمٍ عَن كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قالتْ وَضَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّهِ ﷺ مَاءً قالتْ فسَتَرْتُه فذكرتُ الغُسْلَ قالتْ ثُمّ اَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فلَمْ يُرِدْهَا -

٤٠٩. اخبرنا احمدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عبدِ اللّهِ قال حَدَّثَنِي اَبِيْ قال حَدَّثَنا ابراهيمُ عَنْ مُوْسٰى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفوانَ بْنِ سُلَيمٍ عَنْ عطاءِ بْنِ يَسارٍ عَن اَبِيْ هُرَيرةَ قالَ قالَ رسولُ اللّه ﷺ بَيْنَمَا ايوبُ عليه السلام يَغْتَسِلُ عُرْيانًا خرّ عليه جَرادٌ مِنْ ذَهَبٍ فجَعَلَ يَحْثِي فى ثَوْبِهِ قالَ فناداهُ رَبُّهُ عزّ وجلّ يَا ايوبُ لَمْ اكُنْ اَغْنَيْتُكَ قال بَلٰى يارَبِّ ولٰكِن لاَغِنٰى بِيْ عَن بَرَكَاتِكَ -

بَابُ الدَّلالةِ على اَن لاّ تَوْقِيْتَ فِى المَاءِ الّذى يُغْتَسَلُ فيهِ

٤١٠. اخبرنا القاسمُ بنُ زكريّا بنِ دِينارٍ قال حدّثنا اسحٰقُ بْنُ منصورٍ عَن ابراهيمَ بْنِ سعدٍ عَنِ الزُّهريِّ عَنِ القاسمِ بْنِ محمدٍ عَن عائشةَ قالت كانَ رَسُولُ اللّه ﷺ يَغْتَسِلُ فِى الْاِناءِ وهُوَ الفَرَقُ وكنتُ اَغْتَسِلُ اَنا وهُوَ مِنْ اِناءٍ واحِدٍ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ গোসল করার সময় আড়াল করা

অনুবাদ ৪০৬. ইবরাহীম ইবনে ইয়া'কুব (র).......ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) দেখলেন, এক ব্যক্তি খোলা ময়দানে গোসল করছে, তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, আল্লহ্ তাআলা ধৈর্যশীল, লজ্জাশীল (মানুষের পাপ) ঢেকে রাখেন। তিনি লজ্জাশীলতাকে এবং পর্দা করাকে পছন্দ করেন। অতএব, তোমাদের কেউ যখন গোসল করবে সে যেন পর্দা করে।

[পূর্বের বাকী অংশ] নবী করীম (স) কি জানাবাতের পর দ্রুত গোসল করতেন? নাকি জানাবাতের পর আরাম করতেন অতঃপর গোসল করতেন, হযরত আয়েশা (রা) জবাবে বলেন, রাসূল (স) উভয় প্রকার আমল করতেন। কখনো গোসল করে আরাম করতেন, আবার কখনো উযূ করে শুয়ে যেতেন। অতঃপর রাত্রের শেষাংশে গোসল করতেন।এর দ্বারা বুঝা যায় জানাবাতের পর তৎক্ষণাৎ গোসল করা জরুরী নয়। কাজেই কেউ যদি জানাবাত অবস্থায় ঘুমায়ে আরাম করতে চাই তাহলে সে এটা করতে পারবে তবে মুস্তাহাব হলো শোয়ার পূর্বে উযূ করবে অতঃপর আরাম করবে। এটাই জুমহূরের বক্তব্য। তাদের প্রমাণ হলো হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীস-

اِنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ ولاَيَمَسُّ مَاءً

অরূপভাবে ইবনে আব্বাস (রা) এর মারফু হাদীসে এসেছে- اِنّمَا اُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلٰوةِ

এর দ্বারা জুমহূরের মাযহাবে প্রমাণিত হয়। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ৪১১)

৪০৭. আবু বকর ইবনে ইসহাক (র) ....ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা মানুষের দোষ ঢেকে রাখেন। কেউ যখন গোসল করে তখন সে যেন কোন কিছু দ্বারা পর্দা করে নেয়।

৪০৮. কুতায়বা (র)...........মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য (গোসলের) পানি রাখলাম, তিনি বলেন, আমি তাঁকে আড়াল করলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোসলের অবস্থা বর্ণনা করার পর বললেন, আমি তাঁর জন্য একটি বস্ত্র আনলাম (গোসলের পানি মুছে ফেলার জন্য) তিনি তা গ্রহণ করেননি।

৪০৯. আহমদ ইবনে হাফস (র)..........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এক সময় হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর উপর একটি স্বর্ণের পতঙ্গ পতিত হল, তিনি তা তাঁর কাপড়ে ভরতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তখন তাঁর প্রভু তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইয়ুব! আমি কি তোমাকে ধনবান করিনি? তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! অবশ্যই, আপনি আমাকে ধনবান করেছেন। কিন্তু আমি আপনার বরকত থেকে বিমুখ হতে পারি না।

অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের পানির কোন পরিমাণ নেই

৪১০. কাসিম ইবনে যাকারিয়্যা (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ফরক নামক পাত্রে গোসল করতেন। আর আমি এবং তিনি একই পাত্র থেকে গোসল করতাম

দ্রষ্টব্য ঃ প্রথম অনুচ্ছেদের হাদীসের আলোচনা بَابُ ذِكْرِ الْاِغْتِسَالِ اَوَّلَ اللَّيْلِ এর অধীনে চলে গেছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাসূলুল্লাহ (স) এর অভ্যাস ছিল যে, যখন কোন গরুত্বপূর্ণ বিষয় লোকদেরকে জানানোর ইচ্ছা করতেন। তখন তিনি মেম্বরে গিয়ে বসতেন, অতঃপর আল্লাহ তাআলার হামদ ছানা বর্ণনা করার পর উক্ত কথা বলতেন। এখানেও তাঁর সে অভ্যাসের ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি এক ব্যক্তিকে ময়দানে উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করতে দেখলেন। এটাকে তিনি খুব অপছন্দ করলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে এসে মেম্বরে বসলেন এবং আল্লাহ তাআলার হামদ বর্ণনা করার পর বলেন, إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَلِيْمٌ الخ এর দ্বারা বুঝা যায় খোলা ময়দানে সতর ঢেকে গোসল করা উত্তম। অবশ্য কেউ যদি এমন স্থানে উলঙ্গ হয়ে গোসল করে যেখানে লোকজনের কোন চলাহলো নেই। তাহলে এতে সে গোণাহগার হবে না, যদি গুণাহ হতো তাহলে হযরত আইয়্যুব (আ) কখনও উলঙ্গ হয়ে গোসল করতেন না। যার বিবরণ চতুর্থ হাদীসে এসেছে। তার উলঙ্গ গোসল করার দ্বারা বুঝা যায় কেউ যদি এমন খোলা ময়দানে উলঙ্গ হয়ে গোসল করে যেখানে কোন লোকজন নেই। তাহলে তার এরূপ গোসল করা জায়েয আছে। এ গোসল তিনি ঐ সময় করেন যখন তিনি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন।

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, হযরত আইয়্যুব (আ) এর উক্ত আমল তাঁর শরীয়তে বৈধ ছিল, তার এ কর্ম দ্বারা কিভাবে সাব্যস্ত হলো যে, তার এ আমল এ উম্মতের জন্যে বৈধ?

এর জবাবে আমরা বলব নবী করীম (স) হযরত আইয়্যুব (আ) এর উক্ত আমল উল্লেখ করে তার উপর কোন ধরনের আপত্তি করেননি, এর দ্বারা বুঝা যায় আমাদের শরীয়তেও উক্ত আমল বৈধ আছে এবং খোলা ময়দানে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার অনুমতি আছে যাদও তা অনুচিৎ। রাসূল (স) এর শরীয়তে যদি তার অনুমোদ না থাকতো তাহলে অবশ্যই তিনি উক্ত আমল বর্ণনা করে সতর্ক করতেন।

মোটকথা, খোলা ময়দানে যেখানে লোকজনের কোন চলা-ফেরা নেই সেখানে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা বৈধ। তবে সতর ঢেকে গোসল করা উত্তম। বাথরুমে উলঙ্গ হয়ে গোসল করাতে কোন দোষ নেই। (শরহে উর্দু নাসায়ী: ৪১৩)

بَابُ اِغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةِ مِنْ نِسَآئِهِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ

٤١١. اخبرنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قال حَدَّثَنَا عبدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامٍ ح وأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ واَنَا مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا وقَالَ سُوَيْدٌ قالتْ كُنْتُ اَنَا -

٤١٢. اخبرنا محمدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى عبدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ واحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ -

٤١٣. اخبرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حميدٍ عَنْ مَنْصورٍ عَنْ اِبراهيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِى اُنَازِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْاِنَاءَ اَغْتَسِلُ اَنَا وَهُوَ مِنْهُ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্র থেকে গোসল করা

অনুবাদ ঃ ৪১১. সুওয়ায়দ ইবনে নাসর ও কুতায়বা (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এবং আমি একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমরা উভয়ে তা থেকে একত্রে পানি নিতাম।ঃ

৪১২. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স) একই পাত্র থেকে জানাবতের গোসল করতাম।

৪১৩. কুতায়বা ইবনে সা'ঈদ (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স) যে পাত্রে গোসল করতাম এবং সে পাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে যে প্রতিযোগিতা করতাম তা আমার এখনো স্মরণ আছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

দ্রষ্টব্য ঃ প্রথম অনুচ্ছেদের হাদীসের আলোচনা باب فضل الجنب এর অধীনে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

٤١٤. اخبرنا محمد بن بشار عن محمد حدثنا شعبة عن عاصم ح واخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله ﷺ من اناء واحد أبادره ويبادرنى حتى يقول دعى واقول انا دع لى قال سويد يبادرنى وأبادره فاقول دع لى دع لى -

بَابُ الْاِغْتِسَالِ فِىْ قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ

٤١٥. اخبرنا محمد بن يحيى بن محمد حدثنا محمد بن موسى بن اعين حدثنا ابى عن عبد الملك بن ابى سليمان عن عطاء قال حدثتنى ام هانئ انها دخلت على النبى ﷺ يوم فتح مكة وهو يغتسل قد سترته بثوب دونه فى قصعة فيها اثر العجين قالت فصلى الضحى فما ادرى كم صلى حين قضى غسله -

بَابُ تَرْكِ الْمَرْاَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ

٤١٦. اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن ابراهيم بن طهمان عن ابى الزبير عن عبيد بن عمر ان عائشة قالت لقد رأيتنى اغتسل انا ورسول الله ﷺ من هذا فاذا تور موضوع مثل الصاع او دونه فنشرع فيه جميعا فافيض على رأسى بيدى ثلاث مرات وما انقض لى شعرا -

---

অনুচ্ছেদ ঃ এ ব্যাপারে অনুমতি

অনুবাদ ঃ ৪১৪. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (র).......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স) একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমি তাঁর আগে পানি নিতে চেষ্টা করতাম, আর তিনি আমার আগে নিতে চাইতেন। তিনি বলতেন আমাকে সুযোগ দাও, আর আমি বলতাম আমাকে সুযোগ দিন। সুওয়ায়দ-এর রেওয়ায়তে রয়েছে, তিনি আমার আগে নিতে চাইতেন, আর আমি তাঁর আগে নিতে চাইতাম। আর বলতাম, আমাকে সুযোগ দিন, আমাকে সুযোগ দিন।

অনুচ্ছেদ ঃ এমন পাত্রে গোসল করা যাতে আটার চিহ্ন বিদ্যমান

৪১৫. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহয়া (র)..........আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হানী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি গোসল করছিলেন। তাঁর জন্য বস্ত্র দ্বারা পর্দার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি এমন পাত্রে গোসল করছিলেন যাতে আটার চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (স) চাশতের নামায আদায় করলেন। আমার স্মরণ নেই তিনি গোসলের পর কত রাকআত নামায আদায় করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের সময় মহিলাদের মাথার চুলের বাঁধন না খোলা

৪১৬. সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (র)........উবায়দ ইবনে উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন, আমার স্মরণ আছে, আমি এ পাত্র হতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে একত্রে গোসল করতাম। দেখা

গেল, তিনি যে পাত্রের প্রতি ইংগিত করেছেন তা এমন একটি পাত্র যাতে এক সা' বা আরও কম পানি ধরে। তিনি বলেন, আমরা উভয়ে তা থেকে গোসল করতে আরম্ভ করতাম। আমি হাত দ্বারা মাথায় তিনবার পানি দিতাম এ সময় মাথার চুল খুলতাম না।

প্রথম অনুচ্ছেদসংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ অনুচ্ছেদে এটা বলা উদ্দেশ্য যে, উপরের অনুচ্ছেদে পুরুষ মহিলা একত্রে এক পাত্র হতে গোসল করার যে আমল বর্ণনা করা হয়েছে এটা رخصت এর পর্যায়ভুক্ত এবং এ সুরত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি পাত্র হতে পানি নেয়ার ক্ষেত্রে অতিক্রমন করছিলাম এবং তিনিও আমার থেকে অতিক্রম করছিলেন।

এখন যদি হযরত আয়েশা (রা) পাত্রে আগে হাত ঢুকান তাহলে বাকী পানি হুজুর (স) এর জন্য মহিলার উদ্বৃত্ত পানি হবে। আর যদি প্রথমে নবী (স) উক্ত পাত্রে হাত ঢুকান তাহলে বাকী পানি হযরত আয়েশা (রা) এর জন্য উদ্বৃত পানি হবে। এখন যদি একজনের ব্যবহৃত পানি ব্যবহার করা অপরের জন্য বৈধ না হতো তাহলে নবী (স) কখনো এমন করতেন না। তাঁদের আমল-ই এটার বৈধতা প্রমাণ করে।

এ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে পেছনে- بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذَالِكَ এর অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এ সম্পর্কে জানার জন্য সেখানে দেখুন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

যে পাত্রে আটার খামিরা তৈরী করা হয়েছে এবং তাতে আটার চিহ্নও বিদ্যমান রয়েছে, কেউ যদি উক্ত পাত্রের পানির দ্বারা গোসল করতে চায় তাহলে এটা বৈধ হবে কি-না। আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায় বৈধ হবে। কেননা, হযরত উম্মে হানী বিনতে আবী তালেব বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (স) একটি বড় পিয়ালার পানি দ্বারা গোসল করেছিলেন, তাতে খামিরার আটা লেগে ছিল। এতে বুঝা যায় পানিতে সামান্য পবিত্র জিনিস লেগে থাকলে পানির পবিত্র করার গুণ নষ্ট হয় না। কাজেই আটা পানির পবিত্র করার গুনের মধ্যে কোন বিঘ্ন ঘটাবে না। পেছনে بَابُ ذِكْرِ الْإِسْتِتَارِ عِنْدَ الْإِغْتِسَالِ অনুচ্ছেদে এ সর্ম্পকিত আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বের হাদীসে উম্মে হানী (রা) আস্থার সাথে বলেন, فَصَلَّى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ আর এখানে তিনি বলেছেন যে, আমার জানা নেই, হুজুর (স) গোসলের পরে চাশতের কয় রাকাত নামায আদায় করেছেন। এর জবাব হলো, হয়তো বা তিনি ভুলে গেয়েছিলেন, অথবা, তিনি প্রথমে ভুলে গিয়েছিলে, পরবর্তীতে রাকাতের সংখ্যার কথা স্মরণ এসেছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় জানাবাতের গোসলের ক্ষেত্রে মহিলাদের চুলের বেঁনী/ খোপা খোলা জরুরী নয় বরং চুলের গোড়ায় আদ্রতা পৌছানই যথেষ্ট এবং এ আদ্রতা পৌছানোর ক্ষেত্রেও কোন নির্ধারিত সংখ্যা নেই। বরং প্রবল ধারণা অনুপাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌছার বিষয়টি যখন নিশ্চিত হবে তখন তা যথেষ্ট হবে। আর যদি চুলের গোড়ায় তিনবার পানি ঢালার দ্বারা ও চুলের গোড়ায় পানি পৌছার ব্যাপারে প্রবল ধারণা সৃষ্টি না হয়, তাহলে তিনের অধিকবার চুলের গোড়ায় পানি ঢালতে হবে। আর যদি একবার ঢালার দ্বারাই সকল চুলেরর গোড়ায় পানি পৌছে যায় তাহলে এটাই যথেষ্ট হবে। তিনবার ঢালার প্রয়োজন নেই। তবে সুন্নত হলো তিনবার ঢালা। যেমন হযরত আয়েশা (রা) এর উক্তি রয়েছে- فَاُفِيْضُ عَلٰى رَأْسِىْ بِيَدِىْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

بابٌ اذا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَ بَقِىَ اثَرُ الطِّيْبِ

٤١٧. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ ابراهيم بْنِ محمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضى اللّٰهُ عَنْهُما يَقُوْلُ لَاَنْ اُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُصْبِحَ مُحْرِمًا اَنْضَخُ طِيْبًا قَالَ محمَّدُ بْنُ الْمُنْتَشِرِ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَاَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رسولَ اللّٰه ﷺ فَطَافَ عَلٰى نِسَائِهِ ثُمَّ اَصْبَحَ مُحْرِمًا -

---

অনুচ্ছেদ ঃ সুগন্ধি ব্যবহার করে গোসল করলে এবং সুগন্ধির চিহ্ন অবশিষ্ট থাকলে

অনুবাদ ঃ ৪১৭. হান্নাদ ইবনে সায়রী (র) ....মুহাম্মদ ইবনে মুনতাশির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, মুহরিম অবস্থায় সুগন্ধি ছড়িয়ে সকালে বের হওয়ার চেয়ে আমার নিকট উটের গায়ে ঔষধরূপে যে আলকাতরা ব্যবহার করা হয় তা গায়ে মেখে বের হওয়া অধিক পছন্দনীয়। আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর এ উক্তি শুনালে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গায়ে সুগন্ধি মাখিয়েছিলাম। তারপর তিনি তাঁর সকল বিবির কাছে গমন করলেন এবং ইহরাম অবস্থায় ভোর করলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

এ হাদীসের রাবী হলেন মুহাম্মাদ ইবনে মুনতাশির তাবেয়ী। তিনি ইবনে উমর ও আয়েশার (রা) থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনতাশির হযরত ইবনে উমর এর বক্তব্য শ্রবণ করে বলেন, গোসলের সময় চুলের খোপা খুলে দেওয়াটাই উত্তম। আমি মুহরিম অবস্থায় খুশবু ব্যবহার করব। যেহেতু মুহাম্মাদ ইবনে মুনতাশির ইবনে উমরের কথা দ্বারা পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারেননি, এ জন্য উক্ত কথার ব্যাখ্যার জন্য আয়েশা (রা) এর নিকট গমন করেন এবং ইবনে উমরের উক্ত কথার সংবাদ দেন। ইবনে উমর সম্পর্কে আয়েশা (রা) বলেন, তিনি যা কিছু বলেন তার সবটাই সঠিক নয়। তিনি স্বীয় উক্তি طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্বারা ইবনে উমরের কথাকে খণ্ডন করলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে খুশবু লাগিয়েছি। অতঃপর নবী (স) স্ত্রীদের নিকট গমন করেছেন। অতঃপর গোসলের পরেই সকালে ইহরাম বেঁধেছেন। এর আলামত হলো فَطَافَ عَلٰى نِسَائِهِ অথচ গোসলের পরেও খুশবুর আছর বাকী থাকে। যেমন– হযরত আয়েশা (রা) এর ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায়।

মুসান্নিফ (র) এখান থেকে এ কথার উপর প্রমাণ পেশ করেন যে, গোসলের পরেও খুশবুর আছর শরীরে বাকী থাকা গোসল শুদ্ধ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। এ গোসল শরীয়তে গ্রহণযোগ্য। আর এ হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন তা হলো বিদায় হজ্জের ঘটনা। (শরহে উর্দূ নাসায়ী: ৪১৬)

بابُ إزالةِ الجُنُبِ الأذى عنه قبلَ إفاضةِ الماءِ عليه

٤١٨. اخبرنا محمدُ بنُ عليٍّ قال حدّثنا محمدُ بنُ يوسف حدّثنا سفيانُ عن الأعمشِ عن سالمٍ عن كريبٍ عن ابنِ عباسٍ عن ميمونةَ قالت توضّأ رسولُ اللهِ ﷺ وضوءَه للصلوةِ غيرَ رجليهِ وغسلَ فرجَه وما أصابه ثمّ أفاضَ عليه الماءَ ثمّ نحّى رجليهِ فغسلَهما قالت هذه غسلةٌ للجنابةِ -

بابُ مسحِ اليدِ بالأرضِ بعدَ غسلِ الفرجِ

٤١٩. اخبرنا محمدُ بنُ العلاءِ قال حدّثنا ابو معاويةَ عن الأعمشِ عن سالمِ بنِ أبي الجعدِ عن كريبٍ عن ابنِ عباسٍ عن ميمونةَ بنتِ الحارثِ زوجِ النبيّ ﷺ قالت كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا اغتسلَ من الجنابةِ يبدأُ فيغسلُ يديهِ ثم يفرغُ بيمينِه على شمالِه فيغسلُ فرجَه ثمّ يضربُ بيدِه على الأرضِ ثمّ يمسحُها ثم يغسلُها ثم يتوضّأُ وضوءَه للصلوةِ ثمّ يفرغُ على رأسِه وعلى سائرِ جسدِه ثم يتنحّى فيغسلُ رجليهِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী ব্যক্তির শরীরে পানি ঢালার আগে নাপাকী দূর করা

অনুবাদ ঃ ৪১৮. মুহাম্মদ ইবনে আলী (র)........মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নামাযের উযুর ন্যায় উযু করলেন কিন্তু তিনি পা দু'খানা ধুলেন না; বরং গুপ্তাঙ্গ এবং গায়ে যে নাপাকী লেগেছিল তা ধুলেন। পরে তাঁর শরীরে পানি ঢাললেন, তারপর একটু সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করলেন। মায়মুনা (রা) বলেন, এরূপই ছিল তাঁর জানাবতের গোসল।

অনুচ্ছেদ ঃ গুপ্ত অঙ্গ ধৌত করার পর হাত মাটিতে মুছে ফেলা

৪১৯. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)....... রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহধর্মিণী মায়মুনা বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন গোসল করতেন তখন উভয় হাত ধৌত করার মাধ্যমে গোসল আরম্ভ করতেন। অতঃপর তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢেলে গুপ্তাঙ্গ ধুতেন, পরে মাটিতে হাত মেরে ঘষে নিয়ে ধুয়ে নিতেন। তারপর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন এবং মাথায় পানি ঢালতেন, পরে সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন। তারপর গোসলের স্থান থেকে সরে গিয়ে উভয় পা ধুতেন।

সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

রাসূল (স) এর জানাবাতের গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে রেওয়ায়াতটি সংক্ষিপ্ত। এতে লজ্জাস্থান এবং তা ব্যতীত অন্যান্য যে সকল স্থানে নাপাক লেগেছিল উযুর পরে তা ধৌত করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ হযরত মায়মুনা (রা) এর জানাবাতের গোসল সংক্রান্ত বিস্তারিত রেওয়ায়াত পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে জানাবাতের গোসলের পদ্ধতি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- সর্ব প্রথম উভয় হাত তিনবার ধৌত করবে। অতঃপর লজ্জাস্থানকে বাম হাত দ্বারা ধৌত করবে। অতঃপর বাম হাত মাটিতে ঘষবে। অতঃপর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করার কথা উল্লেখ আছে। অতঃপর মাথায় তিনবার পানি ঢালবে ইত্যাদি। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জানাবাতের গোসলে লজ্জাস্থান শরীরের অন্যান্য স্থানে যে নাপাকী লাগে তা প্রথমে ধৌত করবে। অতঃপর উযু করবে। এটাই সুন্নত তরিকা। বুঝা গেলো এখানে উযূ করার পর وَغَسَلَ فَرْجَهُ বলে যে লজ্জা স্থান ধৌত করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এর واو টি তারতীবের জন্য নয়। বরং মুতলাক جمع এর জন্য এসেছে। কাজেই এর উপর আর কোন প্রশ্ন থাকে না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পূর্বে بابُ غسلِ الرجلينِ في غيرِ المكانِ الذي يغتسلُ فيه অনুচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ সেখানে দেখে নিন। (শরহে উর্দু নাসায়ী: ৪১৭) *[বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]*

بَابُ الْإِبْتِدَاءِ بِالْوُضُوْءِ فِىْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

٤٢٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ حَتّٰى اِذَا ظَنَّ اَنَّهُ قَدْ اَرْوٰى بَشَرَتَهُ اَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ -

অনুচ্ছেদ ঃ উযু দ্বারা জা বাতের গোসল আরম্ভ করা

অনুবাদ ঃ ৪২০. সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে হস্তদ্বয় ধুয়ে নিতেন, তারপর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন এবং পরে গোসল করতেন এবং হাত দ্বারা মাথার চুল খেলাল করতেন। যখন তিনি মনে করতেন যে, মাথার চামড়া ভিজে গেছে তখন সর্ব শরীরে তিনবার পানি ঢালতেন এবং সর্ব শরীর ধুয়ে নিতেন।

সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

হাদীসের ইবারত اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ এর অর্থ হলো, اِذَا اَرَادَ الْاِغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ যখন রাসূল (সা।) জানাবাতের গোসলের ইচ্ছা করতেন তখন প্রথমে উভয় হাত ধৌত করতেন। অতঃপর নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করতেন, অতঃপর গোসল করতেন। বাহ্যিকভাবে এই রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, হুজুর (স) শরীর ধৌত করার পূর্বে উভয় পা ধুতেন। অথচ দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে এসেছে নবী (স) গোসল থেকে ফারেগ হওয়ার পর গোসলের স্থান হতে সরে দাঁড়িয়ে অন্য স্থানে উভয় পা ধৌত করতেন। উভয় প্রকার রেওয়ায়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি নিম্নরূপ–

নবী (স) কখনো কখনো পূর্ণ শরীর ধৌত করার পূর্বে অন্যান্য অঙ্গের সাথে উভয় পা ধৌত করতেন। আবার কখনো পূর্ণ শরীর ধৌত করার পর উক্ত স্থান হতে সরে দাঁড়িয়ে অন্যস্থানে গিয়ে উভয় পা ধৌত করতেন। উক্ত দ্বন্দ্ব এভাবেও নিরসন করা যেতে পারে যে, হুজুর (স) হদস দূর করার লক্ষে প্রথমে উভয় পা ধৌত করে নিতেন। অতঃপর পূর্ণ শরীর ধৌত করতেন। আর মাটি ও কাদা দূর করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য দ্বিতীয়বার আবার উভয় পা ধৌত করতেন। দ্বিতীয় কথা হলো, আলোচ্য রেওয়ায়াতে তারতীবের পরিবর্তন ঘটেছে। উযূর পরে গোসলের বয়ান এসেছে, অতঃপর মাথার চুল খেলাল করার বয়ান এসেছে। অথচ তারতীবটা ছিল এমন- উযূর পরে প্রথম কাজ হলো খেলাল করা, তারপর গোসল করা। কেননা, সামনে بَابُ اِسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ .... الخ এর অধীনে যে রেওয়ায়াত আসছে তাতে রাবী এ ক্রমধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ৪১৯)

পূর্বের পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত মায়মুনা (রা) এর পূর্বের রেওয়ায়াতকেই সামান্য পরিবর্তনের সাথে এখানে ভিন্ন শিরোনামে ও ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। এ রেওয়ায়াতটি প্রথমে স্বীয় শায়খ মুম্মামদ ইবনে আলী থেকে সংক্ষিপ্তরূপে শুনেছিলেন, তাই তার জন্য পূর্বের শিরোনাম কায়েম করে সেখানে বর্ণনা করেছেন। আর আলোচ্য রেওয়ায়াতটি শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আ'লা থেকে বিস্তারিতভাবে শুনেছেন। তাই এর জন্য স্বতন্ত্র আরেকটি শিরোনাম কায়েম করে এর অধীনে বর্ণনা করেছেন এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেছনে بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِىْ غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِىْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ এর অধীনে আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই বিস্তারিত জানার জন্য সেখানে দেখুন।

بَابُ التَّيَمُّنِ فِى الطُّهُوْرِ

٤٢١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى اللّٰه عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِىْ طُهُوْرِهٖ وَتَنَعُّلِهٖ وَتَرَجُّلِهٖ وقال بواسطٍ فِىْ شَاْنِهٖ كُلِّهٖ -

بَابُ تَرْكِ مَسْحِ الرَّاْسِ فِى الْوُضُوْءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

٤٢٢. اخبرنا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدٍ قال حدَّثنا اسماعيلُ بْنُ عبدِ اللّٰه هُو ابنُ سَمَاعَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يحيى بْنِ اَبِى كثيرٍ عَنْ ابِىْ سَلَمَةَ عَن عائشة وعَن عُمَرَبْنِ سعدٍ عَن نافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ عُمَرَ سَاَلَ رسولَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَاتَّسَقَتِ الْاَحَادِيثُ علٰى يَبْدَاُ فَيُفْرِغُ عَلٰى يَدِهِ الْيُمْنٰى مَرَّتَيْنِ او ثَلٰثًا ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنٰى فِى الْاِنَاءِ فَيَصُبُّ بِهَا عَلٰى فَرْجِهٖ وَيَدِهِ الْيُسْرٰى علٰى فَرْجِهٖ فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتّٰى يُنَقِّيَهُ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلَى التُّرَابِ اِنْ شَاءَ ثُمَّ يَصُبُّ عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى حَتّٰى يُنَقِّيَهَا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلٰثًا وَيَسْتَنْشِقُ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَغْسِلُ وَجْهَهٗ وَذِرَاعَيْهِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا حَتّٰى اِذَا بَلَغَ رَاْسَهٗ لَمْ يَمْسَحْ وَاَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَهٰكَذَا كَانَ غُسْلُ رسولِ اللّٰه ﷺ فِىْ مَا ذُكِرَ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্রতা অর্জনের কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা

অনুবাদ ঃ ৪২১. সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) পবিত্রতা অর্জনে, জুতা পরিধানে ও মাথায় চিরুনী করতে যথাসম্ভব ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। তিনি (মাসরূক (র) ওয়াসিত নামক স্থানে বলেছেন, তাঁর সকল কাজ যথাসম্ভব ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ জানাবতের উযুতে মাথা মাসেহ না করা

৪২২. ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)...........ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (স) কে জানাবতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, আয়েশা (রা) ও ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। বিভিন্ন হাদীসে একইরূপ বর্ণনা এসেছে যে, তিনি গোসল আরম্ভ করতে গিয়ে দু'বার অথবা তিনবার তাঁর ডান হাতে পানি ঢালতেন। তারপর ডান হাত পাত্রে প্রবিষ্ট করতেন এবং তাঁর লজ্জাস্থানের উপর ডান হাতে পানি ঢালতেন, এ সময় তাঁর বাম হাত থাকত তাঁর লজ্জাস্থানে। সেখানে যা থাকত তা ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। তারপর তাঁর বাম হাত মাটিতে স্থাপন করতেন। তারপর বাম হাতের উপর পানি ঢেলে তা পরিষ্কার করতেন। পরে উভয় হাত তিনবার করে ধুয়ে নিতেন, নাক পরিষ্কার করতেন ও কুলি করতেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিতেন। যখন মাথা মাসেহ করার সময় আসত তখন তিনি মাথা মাসেহ করতেন না। বরং তাতে পানি ঢালতেন। উপরে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোসল তদ্রূপই ছিল ।

প্রথম অনুচ্ছেদসংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ অনুচ্ছেদের অধীনে যে হাদীস আনা হয়েছে ইতিপূর্বে بَابُ بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْغُسْلِ অনুচ্ছেদে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গত হয়েছে।

قوله وقال بِوَاسِطٍ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ : واسط হলো একটি স্থানের নাম। ইরাম বা আরবের একটি শহরের নাম। যা বাগদাদ ও বসরার মধ্যবর্তী অবস্থিত। হাদীসের রাবী শোবা বলেন, আমার উস্তাদ اشعث بن ابى الشَّعْثَاء ওয়াসেত নামক স্থানে উক্ত হাদীস রেওয়ায়াতে করেন এবং বর্ণনাকালে فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ বৃদ্ধি করেছেন। নবী করীম(স) পবিত্রতা অর্জন করা, চুল আঁচড়ানো, জুতা পরিধান করা মোটকথা, তাঁর সকল কাজ-কর্ম ডান দিক থেকে শুরু করতেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীসে ثم يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى التُّرَابِ এর পরে اِنْ شَاءَ এর কয়েদ রয়েছে। অর্থাৎ হুজুর (স) বাম হাত এর মাধ্যমে পরিস্কার করার পর ইচ্ছা হলে বাম হাতকে মাটির সাথে ঘষতেন। এটা এ কথার দিকে ইঙ্গিত যে, হুজুর (স) সর্বসময় এমন কাজ করতেন না। বরং কখনো কখনো বাম হাতকে মাটির সাথে ঘষতেন, কখনো আবার তা পরিত্যাগ করতেন। কেমন যেন এটা সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ছিল। অর্থাৎ সময় বুঝে কখনো এটা করতেন আবার কখনো তা ত্যাগ করতেন। অথবা, বৈধতা বর্ণনা করার জন্য কখনো এমন করেছেন, আবার কখনো ত্যাগ করেছেন।

দ্বিতীয় কথা হলো, রেওয়ায়াতে لَمْ يَمْسَحْ এসেছে। অথচ পূর্বে যত রেওয়ায়াত অতিবাহিত হয়েছে তাতে এসেছে নবী (স) জানাবাতের গোসলের শুরুতে নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করতেন। এর দ্বারা মাথা মাসেহ করাটাও প্রমাণিত হয়।

উক্ত আপত্তির উত্তর হলো, জানাবাতের গোসলের শুরুতে যে উযূ করতেন তাতে হুজুর (স) সর্ব সময় স্বীয় মাথা মাসেহ করতেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এটা تصحيف (কাতেব এর ভুল) ভুলক্রমে حِلَاب লিখে ফেলেছে, মূলত: শব্দটি ছিল جِلَاب আর جِلَاب হলো গোলাবের আরবী রূপান্তরিতরূপ। মোটকথা, حِلَاب থেকে যদি সুগন্ধিযুক্ত বস্তু উদ্দেশ্য হয় তাহলে গোসলের পূর্বে তার ব্যবহার প্রমাণিত আছে এবং গোসলের পরেও। কিন্তু আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন, حِلَاب ঐ পাত্রকে বলা হয় যাতে উটের এক সময়ের দুধ দোহন করা যায়। উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী (র) স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি حِلَاب শব্দ দ্বারা গোসলের সময়ে খুশবু ব্যবহার করা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমার ধরণা ইমাম বুখারী (র) حِلَاب থেকে مَحْلَب উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যা হাত ধৌত করার সময় ব্যবহার করা হয়। অথচ حِلَاب কোন খুশবু নয়। বরং حِلَاب হলো সে পাত্র উদ্দেশ্য যাতে উটের এক বারের দুধ ধরে। কবির কাব্য দ্বারাও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন-

صَاحِ هَل رَأَيْتَ او سَمِعْتَ بِرَاعٍ رَدَّ فِى الضَّرْعِ مَاقَرَى فِى الْحلاب

অর্থ : হে লোক সকল! তোমরা কখনো কি এমন উটচালককে দেখেছো অথবা শুনেছ যে পাত্রের দুধ উটের স্তনে ফিরিয়ে দিয়েছে?

আল্লামা খাত্তাবীসহ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ বলেন, حلاب বলা হয় এমন পাত্রকে যাতে উটের এক সময়ের দুধ দোহন করা যায়। অভিধানবেত্তাদের বিশ্লেষণ ও অগ্র-পশ্চাৎ দ্বারা এ অর্থটাই রাজেহ বা অগ্রগণ্য মনে হয়।

আলোচ্য রেওয়ায়াতে صَبَّ এবং اَفَاضَ এর স্থানে فقال بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু قال শব্দটি এখানে বলার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং কখনো قول শব্দটি فعل এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এখন অর্থ হবে- উভয় হাত দ্বারা স্বীয় মাথায় পানি প্রবাহিত করেছে। (শরহে উর্দূ নাসায়ী : ৪২২)

بَابُ اِسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

٤٢٣. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ رَاْسَهُ بِاَصَابِعِهِ حَتّٰى اِذَا خُيِّلَ اِلَيْهِ اَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَاَ الْبَشَرَةَ غَرَفَ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ -

٤٢٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَئٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَاَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَاَ بِشِقِّ رَاْسِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ الْاَيْسَرِ ثُمَّ اَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلٰى رَاْسِهِ -

بَابُ مَا يَكْفِى الْجُنُبَ مِنْ اِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلٰى رَاْسِهِ

٤٢٥. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ ح وَاَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ ابْنَ صُرَدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاُفْرِغُ عَلٰى رَاْسِى ثَلٰثًا -

٤٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مِخْوَلٍ عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ اَفْرَغَ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلٰثًا -

---

অনুচ্ছেদ ঃ জানাবতের গোসলে সর্বশরীরে পানি পৌঁছানো

অনুবাদ ঃ ৪২৩ আলী ইবনে হুজ্‌র (র)..........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন জানাবতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে উভয় হাত ধুয়ে নিতেন, পরে তিনি নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন তারপর আঙুল দ্বারা মাথার চুল খেলাল করতেন এবং যখন তিনি মনে করতেন যে, মাথার সকল স্থান ভিজে গেছে তখন তিনি মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিতেন, তারপর সর্বশরীর ধৌত করতেন।

৪২৪. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন জানাবতের গোসল করতেন তখন তিনি দুধ দোহনের পাত্রের ন্যায় কোন পাত্র খুঁজে নিতেন এবং তা থেকে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মাথার ডান পার্শ্ব থেকে আরম্ভ করতেন পরে বাম পার্শ্বে পানি ঢালতেন। তারপর দু'হাত দ্বারা পানি নিতেন এবং তা দ্বারা মাথায় পানি ঢালতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবীর জন্য কতটুকু পানি মাথায় ঢালা যথেষ্ট?

৪২৫. উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ ও সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (র)........বুজায়ের ইবনে মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা)-এর নিকট গোসলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হলে তিনি বলেন, আমি আমার মাথায় তিনবার পানি ঢালি।

৪২৬. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র).........জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন গোসল করতেন, তখন তিনি তাঁর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন।

দ্রষ্টব্য ঃ উপরের উভয় অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের আলোচনা পূর্বে بَابُ ذِكْرِ مَا يَكْفِى الْجُنُبَ مِنْ اِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلٰى رَاْسِهِ অনুচ্ছেদের অধীনে অতিক্রান্ত হয়েছে।

بَابُ الْعَمَلِ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

٤٢٧. اخبرنا الحسين بن محمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن امه صفية بنت شيبة عن عائشة ان امرأة سالت النبى ﷺ قالت يا رسول الله ﷺ كيف اغتسل عند الطهور قال خذى فرصة ممسكة فتوضئى بها قالت كيف اتوضأ بها قال توضئى بها قالت كيف اتوضأ بها قال توضئى بها قالت كيف اتوضأ بها قالت ثم ان رسول الله ﷺ سبح واعرض عنها ففطنت عائشة لما يريد رسول الله ﷺ قالت فاخذتها وجبذتها الى فاخبرتها بما يريد رسول الله ﷺ

بَابُ الْغُسْلِ مَرَّةً واحدًا

٤٢٨. اخبرنا اسحق بن ابراهيم حدثنا جرير عن الاعمش عن سالم بن ابى الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبى ﷺ قالت اغتسل النبى ﷺ من الجنابة فغسل فرجه ودلك يده بالارض او الحائط ثم توضأ وضوءه للصلوة ثم افاض على راسه وسائر جسده -

---

অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযের গোসলে করণীয়

অনুবাদ ঃ ৪২৭. হুসায়ন ইবনে মুহাম্মদ (র)..........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পবিত্রতা অর্জনের জন্য কিভাবে গোসল করব? তিনি বললেন, একখানা মিশ্‌ক মিশ্রিত কাপড় ব্যবহার করবে, তারপর তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। ঐ মহিলা বলল, তা দ্বারা কিরূপে পবিত্রতা অর্জন করব? তিনি বললেন, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। ঐ মহিলা আবার বলল, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ (স) সুবহানাল্লাহ বললেন এবং উক্ত মহিলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন আয়েশা (রা) বুঝতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদ্দেশ্য কি ছিল। তিনি বলেন, পরে আমি তাকে আমার দিকে টেনে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদ্দেশ্য তাকে বুঝিয়ে কললেন।

অনুচ্ছেদ ঃ একবার ধৌত করা

৪২৮. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)...... রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) জানাবতের গোসলে তাঁর গুপ্তাঙ্গ ধৌত করলেন এবং হাত মাটিতে ঘষলেন অথবা বলেছেন দেয়ালে ঘষলেন। তারপর তিনি নামাযের উযুর ন্যায় উযু করলেন। পরে তাঁর মাথায় এবং সমস্ত শরীরে পানি ঢাললেন।

জ্ঞাতব্য ঃ প্রথম অনুচ্ছেদে যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পূর্বে بَابُ ذِكْرِ الْعَمَلِ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুসান্নিফ (র) আলোচ্য হাদীস দ্বারা শিরোনামকে এভাবে সাব্যস্ত করেছেন যে, হযরত মায়মুনা (রা) শুধুমাত্র মাথা ও শরীরে পানি ঢালার বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তার সংখ্যা উল্লেখ করেননি যে, নবী (স) কতবার পানি ঢেলেছেন। যদি নবী (স) বারংবার শরীর ও মাথায় পানি ঢালতেন তাহলে অবশ্যই হযরত মায়মুনা (রা) তা বর্ণনা করতেন। সুতরাং পানি প্রবাহিত করার সংখ্যা উল্লেখ না করা এ কথার প্রমাণ যে, নবী করীম (স) শরীর ও মাথায় একবার পানি ঢেলেছেন;একাধিকবার নয়। এর দ্বারা একবার পানি ঢেলে সমস্ত শরীর ধৌত করা প্রতীয়মান হয়।

[বাকী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

بَابُ اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

٤٢٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ محمد بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اغْتَسِلِي ثُمَّ اسْتَثْفِرِي ثُمَّ أَهِلِّي -

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

٤٣٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ح وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামের সময় নিফাসগ্রস্ত মহিলার গোসল করা

অনুবাদ ঃ ৪২৯. আমর ইবনে আলী (র), মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না ও ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র).........মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিদায় হজ্জ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বর্ণনা করলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যীকা'দা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে বের হলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বের হলাম। এরপর তিনি যুলহুলায়ফায় আগমন করলে আস্‌মা বিনতে উমায়স (রা) মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে প্রসব করলেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এখন আমি কি করব? তিনি জবাবে বললেন, তুমি গোসল করবে এবং ন্যাকড়া পরিধান করবে, তারপরে ইহ্‌রাম বাঁধবে।

অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের পর উযু না করা

৪৩০. আহমদ ইবনে উসমান (র) ও আমর ইবনে আলী (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) গোসলের পর উযু করতেন না।

জ্ঞতব্য ঃ প্রথম অনুচ্ছেদের হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পূর্বে بَابُ الْاغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ অনুচ্ছেদে এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ بَعْدِ الْغُسْلِ অনুচ্ছেদে করা হয়েছে। কাজেই প্রয়োজনে উক্ত স্থানে দেখে নিন।

[পূর্বের বাকী অংশ]

মোটকথা, অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা বুঝা যায় একবার সমস্ত শরীর ও মাথায় পানি ঢালার দ্বারা গোসলের ফরয আদায় হয়ে যায়। অবশ্য যে সকল হাদীসে তিনবারের কথা এসেছে, তার দ্বারা তাকরার তথা বারংবার পানি ঢালা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো গোসলকে পূর্ণাঙ্গ করা। কাজেই আলোচ্য হাদীস দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিদের প্রমাণ পেশ করা সহীহ নয় যারা গোসলে বারংবার পানি ঢালার প্রবক্তা এবং তিনবার পানি প্রবাহিত করাকে আবশ্যক মনে করেন। (শরহে উর্দূ নাসায়ী: ৪২৩)

بَابُ الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

٤٣١. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا -

بَابُ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

٤٣٢. اخبرنا الحَسَنُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قال حَدَّثَنا هُشَيْمٌ حَدَّثَنا سَيَّارٌ عَنْ يَزِيدَ الفَقِيرِ عَنْ جابرِ بْنِ عبدِ اللّٰه قالَ قالَ رسولُ اللّٰه ﷺ أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي الصَّلٰوةُ يُصَلِّي وأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ ولَمْ يُعْطَ نَبِيٌّ قَبْلِي وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وكَانَ النبِيُّ يُبْعَثُ إِلٰى قَوْمِهِ خَاصَّةً -

অনুচ্ছেদ ঃ এক গোসলে সকল স্ত্রীর নিকট গমন

অনুবাদ ঃ ৪৩১. হুমায়দ ইবনে মাসআদা (র)........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দেহে সুগন্ধি লাগাতাম, তারপর তিনি তাঁর সকল বিবির নিকট গমন করতেন এবং ভোরে মুহরিম অবস্থায় বের হতেন। তখনও সুগন্ধির চিহ্ন বিদ্যমান থাকত।

অনুচ্ছেদ ঃ মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা

৪৩২. হাসান ইবনে ইসমাঈল (র)........জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। আমাকে এক মাস পথ চলার দূরত্ব থেকে শত্রুর মাঝে ভীতি সঞ্চার করার ক্ষমতা প্রদান করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে। অতএব আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির সামনে যেখানেই নামাযের সময় উপস্থিত হয় সে সেখানেই নামায আদায় করতে পারে। আর আমাকে শাফাআত দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দান করা হয়নি, আর আমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আমার পূর্বের প্রত্যেক নবী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন।

প্রথম অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুসান্নিফ (র) يَنْضَحُ طِيبًا থেকে শিরোনাম কায়েম করেছেন। কারণ প্রত্যেক সহবাসের পর ভিন্ন স্ত্রীর নিকট গমনকালে গোসল করা বিবিকের নিকট কষ্টসাধ্য মনে হয়। আর বারবার গোসল করলে তো খুশবুর আছর বাকী থাকে না। অথচ বলা হয়েছে গোসলের পর খুশবুর আছর বাকী থাকতো। এটাই এ কথার প্রমাণ যে, প্রত্যেক সহবাসের পর গোসল করতেন না, বরং সকল সহবাসের পরে একবার গোসল করতেন।

মোটকথা, এর দ্বারা ইমাম নাসায়ী (র) এর দাবী সাব্যস্ত হয় যে, একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর একবার গোসল করাই যথেষ্ট হবে। বিস্তারিত বিবরণ পেছনে অতিবাহিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

اُعْطِيْتُ خَمْسًا الخ বাক্যটি কখন বলা হয় : এ ব্যাপারে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেন, হযরত ইবনে উমর (রা) এর রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম (স) এটা গাযওয়ায়ে তাবুকে বলেছিলেন। এখানে পাঁচটি জিনিসের আলোচনা করা হয়েছে।এটা বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। উক্ত পাঁচটি বিষয় নিম্নে দ্রষ্টব্য।

وَاُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِيٍّ قَبْلِىْ ... ঃ আমার জন্য গণীমতের মালকে হালাল করা হয়েছে। পূর্ববর্তী কোন নবীদের জন্য এটা হালাল ছিল না।

এগুলো কি পাঁচটি জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ঃ এখানে যে পাঁচটি জিনিসের আলোচনা করা হয়েছে, এটা সীমাবদ্ধতা বুঝানোর জন্যে নয়। অর্থাৎ এর দ্বারা কখনই এটা উদ্দেশ্য নয় যে, শুধুমাত্র পাঁচটা জিনিসই দেয়া হয়েছে অন্য কিছু দেয়া হয়নি। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তায়ালা হুজুর (স) কে যে সকল খাস খাস ইনআম ও কামালাত দ্বারা বৈশিষ্ট মণ্ডিত করেছেন সেগুলোর মধ্য হতে সে সময় ওহীর মাধ্যমে পাঁচটি জিনিস জানান হয়েছিল। আর তিনি (স) নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সেগুলো সাহাবাদের সামনে পেশ করেছিলেন।

পাঁচটি জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ ঃ ১. এক মাসের দুরত্ব পর্যন্ত শত্রুদের অন্তরে আমার প্রভাব ঢেলে দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হবে। এতে বেশীর নফী করা হয়নি, বরং বেশীও হতে পারে। কিন্তু যেহেতু মদীনা ও তাবুকের হুজুর (স) এর শত্রুদের মাঝে এক মাস থেকে বেশী দূরত্ব ছিল না। তাই এ দুরত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এ বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ শত্রুর অন্তরে হুজুরের প্রভাব ঢেলে দিয়ে যে বিজয় অনুগ্রহ করা হয়েছিল) তা এক মাসের দূরত্বের সাথে খাস নয়।

২. দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হলো সমগ্র পৃথিবীর সকল স্থানের সকল মাটিকে আমার জন্য ইবাদতের স্থান ও পবিত্রকারী করে দিয়েছেন। আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য ইবাদত করার স্থান নির্ধারিত ছিল। ঐ নির্ধারিত স্থানে নামায আদায় করা ছাড়া অন্যত্র নামায আদায় করলে নামায সহীহ হতো না।

হযরত আমর ইবনে শোয়াইব (র) এর রেওয়ায়েত দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়-

وَكَانَ مِنْ قَبْلِىْ اِنَّمَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِىْ كَنَائِسِهِمْ

কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বরং আমাদের জন্য বড় সুযোগ রয়েছে। আমরা মসজিদেও নামায আদায় করতে পারি, আবার মসজিদ ব্যতীত অন্যত্রও নামায আদায় করতে পারি। যেখানেই নামায আদায় করি না কেনো তা আদায় হয়ে যাবে; তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো উক্ত স্থান নিশ্চিত নাপাক মুক্ত হতে হবে।

অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য পানি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তাহারাত হাসিল হতো না। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য পূর্ণ জমিনকেই পবিত্রকারী বানিয়ে দিয়েছেন। যেমন এরশাদ হয়েছে- جُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ طَهُوْرًا এ বাক্য পূর্বের বক্তব্যের প্রমাণ, তবে এক্ষেত্রে লক্ষনীয় হলো পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা এবং মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার মধ্যে পাথর্ক্য রয়েছে। আর তা হলো পানি সত্ত্বাগতভাবেই পবিত্রকারী। কাজেই সকল ব্যক্তি এর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে কিন্তু মাটি সত্ত্বাগতভাবে পবিত্রকারী নয়। বরং জমিন طَهُوْرِيَّتِ عَارِضِى তথা বিশেষ প্রয়েজন সাপেক্ষে পবিত্রকারী। সুতরাং পানির অবর্তমানে বা পানি ব্যবহারের অক্ষমতা কালে মাটি পবিত্রকারী হবে। তখন তার দ্বারা তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে মাটির আসল সুরতও বাকী থাকা জরুরী। আর যদি মাটি নাজাসাতের কারণে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাহলে তার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ হবে না।

৩. শাফাআত : এখানে শাফাআত দ্বারা শাফাআতে কুবরা বা উযমা উদ্দেশ্য যা সমস্ত সৃষ্টজীব ব্যাপৃত। এটাও হুজুর (স) এর বৈশিষ্ট এবং এটা তার সাথেই খাস। এতে কেউ শরীক নেই। আর সুফারিশ হবে হাশরের ময়দানে

দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান হতে মুক্তি কামনার ব্যাপারে এবং কষ্ট-ক্লেশ ও দূরাবস্থা হতে নিষ্কৃতি দিয়ে শান্তি দেয়ার লক্ষে ইমাম নববী (র) শাফাআত দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এটা ছাড়াও আরো অনেক শাফাআত হুজুরের সাথে খাস আছে । সেগুলোর কতিপয় নিম্নরূপ-

ক. রাসূলের উম্মতের মধ্য হতে চার লক্ষ লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হুজুরের সুফারিশের কারণেই তারা জান্নাতে যাবে।

খ. নবী (স) ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্যেও সুফারিশ করবেন যাদের পাপ-পুণ্য বরাবর হয়ে যাবে। তারা সুফারিশের মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

গ. দোযখে যাত্রীদের জন্য তিনি সুফারিশ করবেন, ফলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ঘ. উম্মতের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যও তিনি সুফারিশ করবেন।

শফাআত খাছ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ সকল সুফারিশ নবী (স) এর সাথে খাস। আর কিছু কিছু সুফারিশ যৌথ হবে তথা সমস্ত পয়গম্বর এতে শরীক থাকবেন। উদাহরণস্বরূপ যে সকল উম্মতের ব্যাপারে দোযখের ফায়সালা হয়েছে তাদেরকে তা থেকে মুক্তকরে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য সকল পয়গম্বর সুফারিশ করবেন।

এখানে উদ্দেশ্য হলো শাফাআতে কুবরা, বাকী সকল শাফাআত হলো তার অনুগত। কেননা, উক্ত সুফারিশ কবুল হওয়ার পরেই বাকীগুলো ঘটবে।

৪. নবী করীম (স) বলেন, অন্যান্য নবীদিগকে কোন একটি সম্প্রদায় বা কোন শহর ও দেশে পাঠানো হতো, আর আমাকে বিশ্বনবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আর এটা আমার সাথেই খাস। এ রেওয়ায়াত থেকে বুঝা যায় হুজুর (স) সকল লোকদের জন্য হিতাকাংখি ছিলেন; চাই আরবী হোক কিংবা আজমী, বর্তমানে হোক কিংবা ভবিষ্যতে, সকলের জন্যই তাঁকে পাঠানো হয়েছে। মুসলিমের রেওয়ায়াতে আরেকটু বেশী এসেছে—

وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً

৫. পঞ্চম হলো, আমার জন্য গণীমতের মালকে হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কোন উম্মতের জন্য এটা হালাল ছিল না। কোন কোন উম্মতের উপর তো জিহাদ-ই ফরয ছিল না। তাহলে গণীমতের সম্পদ তারা কিভাবে অর্জন করবে? আর কতক উম্মতের উপর জিহাদ ফরয ছিল। কিন্তু গণীমতের মাল তাদের জন্য হালাল ছিল না। বরং তারা জিহাদ করে যে সম্পদ প্রাপ্ত হতো তা একস্থানে একত্রিত করা হতো। তারপর আসমান থেকে আগুন এসে উক্ত সম্পদকে পুড়িয়ে দিত। এটাই জিহাদ কবুল হওয়ার আলামত ছিল। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তার উম্মতের জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। (শরহে উর্দু নাসায়ী ৪২৫-৪২৬)

بَابُ التَّيَمُّمِ لِمَنْ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلوٰةِ

٤٣٣. اَخْبَرَنَا مُسْلِمُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِي الْوَقْتِ فَتَوَضَّأَ اَحَدُهُمَا وَعَادَ لِصَلوٰتِهِ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يُعِدِ الْاٰخَرُ فَسَأَلَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَاَتْكَ صَلوٰتُكَ وَقَالَ لِلْاٰخَرِ اَمَّا اَنْتَ فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ -

٤٣٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرَةُ وَغَيْرُهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ -

٤٣٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنَّ مُخَارِقًا اَخْبَرَهُمْ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ اَنَّ رَجُلًا اَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَصَبْتَ فَاَجْنَبَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَتَيَمَّمَ وَصَلّٰى فَقَالَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِلْاٰخَرِ يَعْنِي اَصَبْتَ -

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নামাযের পর পানি পায় তার তায়াম্মুম

অনুবাদ ঃ ৪৩৩. মুসলিম ইবনে আমর ইবনে মুসলিম (র)..........আবু সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। দু'ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায আদায় করল। পরবর্তীতে নামাযের সময় থাকতেই তারা পানি পেল। তাদের একজন উযু করে সময়ের মধ্যেই নামায দোহরায়ে নিল। অপর ব্যক্তি নামায দোহরাল না। তারা উভয়েই এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করল। যে ব্যক্তি নামায পুনরায় আদায় করেনি তিনি তাকে বললেন, তুমি শরীয়তের বিধান মতে কাজ করেছ। তোমার নামায তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। অন্য ব্যক্তিকে বললেন, তোমার জন্য উভয় কাজের সওয়াব রয়েছে।

৪৩৪. সুয়ায়দ ইবনে নাসর (র)...... আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকেও এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৪৩৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)...........তাবিক ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি জুনুবী হওয়ায় নামায আদায় করল না, সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে তার নিকট তা ব্যক্ত করল, তিনি বললেন, তুমি ঠিকই করেছ। অন্য এক ব্যক্তি জুনুবী হয়ে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করল। তাকেও তিনি ঐ কথাই বললেন যা অন্য ব্যক্তিকে বলেছিলেন অর্থাৎ তুমি ঠিকই করেছ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

سوال : اكتب حكم المتيمم الذى وجد الماء وهو فى الصلوة

প্রশ্ন ঃ তায়াম্মুমকারী নামাযে থাকা অবস্থায় পানি পেলে তার বিধান কি হবে লেখ।

উত্তর ঃ তায়াম্মুমকারী নামযে থাকা অবস্থায় পানি পেলে তার বিধান ঃ

১. তায়াম্মুম করে নামায শুরু করার পর যদি নামাযে থাকতেই পানি পাওয়া যায় তবে দাউদ যাহেরীর মতে নামায ছাড়বে না, বরং এমতাবস্থায় নামায শেষ করবে। তাঁর মতে এমতাবস্থায় নামায ভেঙ্গে দেয়া হারাম। কেননা আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন- لَاتُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ "তোমরা তোমাদের আমল বিনষ্ট কর না"।

২. ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী ও আওযাঈ (র) এর মতে, এমতাবস্থায় নামায ভঙ্গ করে উযু করা তার উপর আবশ্যক। কেননা, পানি পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الاية এ নির্দেশ পালন করা তায়াম্মুমকারীর উপর আবশ্যক হয়ে পড়বে।

জবাব: দাউদে যাহেরী যে আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, তার উত্তর হলো, এমতাবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া বাহ্যিকভাবে যদিও আমল বাতিল হওয়া বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই আমলের পরিপূর্ণতা বিধান।

سوال : ما هو حُكْمُ التَّيَمُّمِ فِى حَالَةِ الحَضَرِ ثُمَّ بَيِّنْ قِصَّةَ نُزولِ التَّيَمُّمِ؟

প্রশ্ন ঃ মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুমের বিধান কি? তায়াম্মুমের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা লিখ ?

উত্তর ঃ মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুমের বিধান ঃ মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয হবে কি না, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে মুকীম থাকাকালে বা সফরে স্বাভাবিক অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয নেই। তবে পানি ব্যবহারে ক্ষতি বা মৃত্যুর আশংকা বা ওজর থাকলে তখন তায়াম্মুম জায়েয।

২. ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে তায়াম্মুম জায়েয নেই, মুসাফিরের জন্য য়েজ আছে। তবে পানি ব্যবহারে ক্ষতি বা মৃত্যুর আশংকা থাকলে মুকীমের জন্যেও তায়াম্মুম জায়েয। মোটকথা মুকীম ও মুসাফির উভয়ের জন্য তায়াম্মুম বৈধ। (শরহে নাসায়ী: ১/৩০৯)

তায়াম্মুমের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা ঃ তায়াম্মুমের হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) এর হার হারানোর সাথে সংশ্লিষ্ট। যেহেতু তার হার দু'বার দু' যুদ্ধে হারিয়েছে। সেহেতু তায়াম্মুমের বিধান অবতীর্ণের ঘটনা নির্ণয়ে দু'ধরনের মন্তব্য পাওয়া যায়।

১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী ও আল্লামা আইনী (র) এর মতে, ৫ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত غزوة بني مصطلق এর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তায়াম্মুমের হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি নিম্নরূপ–

উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বণী মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে আমরা এক জায়গায় রাতে অবস্থান করলাম। কিছুক্ষণ পর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে আমি সেনা ছাউনির দূরে গেলাম। এ দিকে আমি গলার হার হারিয়ে ফেলি। পুনরায় হার অনুসন্ধানের জন্যে বের হলাম। হার পাওয়ার পর এসে দেখি, কাফেলা চলে গেছে। অবশেষে আমি শুয়ে পড়লাম। হযরত সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল আমাকে উঠিয়ে কাফেলার নিকট পৌছিয়ে দেন। তখন মুনাফিকরা আমার উপর অপবাদ দেয়। উক্ত সফরে তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়–

وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ ...... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا الخ

২. জুমহুর আলেমগণ বলেন, ৭ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত غزوة ذات الرقاع থেকে ফেরার পথে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। এ যুদ্ধে আয়েশা (রা) এর হার হারিয়ে গিয়েছিল। সে সময় আল্লাহর রাসূল ও সাহাবায়ে কিরাম ذات الجيش। নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন।হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সেখানে আমি আমার হার হারিয়ে ফেলি, হার অনুসন্ধানের জন্যে আমরা তথায় অবস্থান করলাম, সেখানে উযূ করার মত কোন পানি ছিল না, সুবহে সাদিক হওয়ার পর সবাই ঘুম থেকে উঠলেন। তখন উযু করার মত কোন পানি ছিল না। তখন তায়াম্মুমের এ আয়াত নাযিল হয়–

وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ...... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا الخ

سوال : ما الحُكْمُ فِى وِجْدانِ المَاءِ فِى الوَقْتِ بعدَ أداءِ الصَّلوةِ بِالتَّيَمُّمِ

প্রশ্ন ঃ তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পর ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়া গেলে তার বিধান কি ?

উত্তর ঃ তায়াম্মুম করে নামায আদাযের পর পানি পাওয়া গেলে তার বিধান ঃ তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পর যদি পানি পাওয়া যায়, আর নামাযের সময়ও তখন অবশিষ্ট থাকে, তখন এর হুকুম কি হবে? এ নিয়ে ইমামদের মাঝে দুটি মত রয়েছে।

১. তাউস, আতা, ইবনে সীরীন ও যুহরী (র) প্রমুখের মতে নামায পুণরায় আদায় করা ওয়াজিব। কেননা, এখনো যেহেতু সময় বাকী আছে। অতএব নামায আদায়কারী ব্যক্তি এখনো আল্লাহ তাআলার বাণী فَاغْسِلُوْا এর সম্বোধনের আওতায় রয়েছে। আর উক্ত শব্দটি আদেশসূচক যা পালন করা ওয়াজিব।

খ. যেহেতু ওয়াক্ত বাকী আছে, সেহেতু আবার নামায পড়তে হবে। কেননা, হাদীসে আছে-

قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَيَمَسَّهُ بَشَرَتَهُ

তাঁদের আকলী দলীল হলো, নামাযের জন্য উযূ করা শর্ত। আর এখনো যেহেতু উযূ করা সম্ভব, তাই তার নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

২. ইমাম চুতষ্ঠয় ও জুমহুর উলামায়ে কিরামের মতে, পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব নয়।

দলীল-

عَنْ اَبِىْ سعيدِ الخُدرِيِّ قال خَرَجَ رَجُلانِ فِى سَفَرٍ حَضَرَتِ الصَّلوةُ وليس مَعَهُمَا ماءٌ فَتَيَمَّمَا صعيدًا طَيِّبًا فصَلَّيَا ثم وَجَدَا المَاءَ فِى الوقتِ فَاَعَادَ احدُهُمَا الصلوةَ والوُضُوْءَ ولم يُعِدِ الاٰخَرُ ثم اَتَيَا رَسولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَا ذٰلك فقَالَ لِلَّذِىْ لَمْ يُعِدْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ واَجْزَاتْكَ صَلوتُكَ وقَالَ لِلَّذِى تَوَضَّأَ وَاَعَادَ لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ.

অর্থাৎ আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা দু'ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে যায়। তারা পানি না পাওয়ায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে। অতঃপর উক্ত নামাযের সময়ের মধ্যে পানি পাওয়ায় তাদের একজন উযূ করে পুনরায় নামায আদায় করল এবং অপর ব্যক্তি নামায আদায় করা হতে বিরত থাকল। অতঃপর উভয়েই রাসূল (স) এর খেদমতে হাজির হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি (স) বলেন, তোমাদের যে ব্যক্তি নামায পুনরায় আদায় করেনি সে সুন্নত মোতাবেক কাজ করেছে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি উযূ করে নামায আদায় করেছে তার সম্পর্কে বলেন, তুমি দ্বিগুন সওয়াবের অধিকারী হয়েছো।

আলোচ্য হাদীসে দেখা যায়। যে ব্যক্তি পানি পাওয়া সত্ত্বেও নামায আদায় করেনি, তাকে পুনরায় নামায পড়ার হুকুম দেয়া হয়নি, বরং তার সম্পর্কে নবী করীম (স) বলেন, তোমাদের যে ব্যক্তি নামায পুনরায় আদায় করেনি সে সুন্নত মোতাবেক কাজ করেছে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট।

٢. قوله صلى الله عليه وسلم لَا تُصَلُّوا صَلٰوةً فِىْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

দ্বিতীয়বার অপর নামায পড়ার দ্বারা একই নামায দুইবার আদায় করা হয়। আর রাসূল এমন করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং বুঝা গেলো নামায পুনরায় আদায় করতে হবে না।

দলীলের জবাব ঃ

১. উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তখন হাত মুখ ইত্যাদি ধৌত করবে। অতএব, যেহেতু নামায পড়ে ফেলেছে তখন আর এ অবকাশ নেই।

২. তাদের যৌক্তিক দলীলের উত্তরে বলা যায় যে, প্রকাশ্য হাদীসের বিপরীত قياس গ্রহণযোগ্য নয়।

(শরহে মিশকাত : ১/৩৯৭, শরহে নাসায়ী ১/২৯৯)

হাদীস সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা

لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ **এর অর্থ ঃ** তোমাকে দ্বিগুন সওয়াব দেয়া হবে" এর অর্থ হলো উভয় নামাযের জন্যে পৃথক পৃথক সওয়াব দেয়া হবে। প্রথম বারে "ফরয" আদায় হয়ে গিয়েছে তজ্জন্য ফরজের সওয়াব এবং দ্বিতীয়বারে "নফল" গণ্য হয়েছে, এ জন্য নফলের সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়েনি, সে শরীয়ত সম্মত কাজ করেছে । ফলে কেবলমাত্র ফরয নামাযের সওয়াবই লাভ করবে। (শরহে মিশকাত : ১/৩৯৭)

فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ **এর অর্থ ঃ** যে লোকটি পানি পাওয়ার পর উযূ করে পুনরায় নামায পড়েছে, তাঁকে রাসূল (স) বললেন, فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جمعٍ অর্থাৎ তুমি দু'ধরণের পুরস্কার পাবে। কেননা, সুন্নাত তরিকা হচ্ছে, তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর পুনরায় নামায পড়তে হয় না। কিন্তু তার পরেও সে ইজতিহাদ করে নামায পড়েছে। তবে ইজতিহাদ ভুল হয়েছে। ইজতিহাদ ভুল হলে এক সওয়াব পাওয়া যায়। অতএব, তার মোট দুটি সওয়াব হলো, ১. নামাযের সওয়াব, ২. ইজতিহাদের সওয়াব। এজন্যে রাসূল (স) বললেন, فَلَكَ مِثْلُ جَمْعٍ (শরহে নাসায়ী : ১/৩০২)

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْمَذِيِّ

٤٣٦. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَذَاكَرَ عَلِيٌّ وَالْمِقْدَادُ وَعَمَّارٌ فَقَالَ عَلِيٌّ اِنِّي امْرُؤٌ مَذَّاءٌ وَاِنِّي اَسْتَحْيِي اَنْ اَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِمَكَانِ اِبْنَتِهِ مِنِّيْ فَيَسْاَلُهُ اَحَدُكُمَا فَذَكَرَلِي اَنَّ اَحَدَهُمَا وَنَسِيْتُهُ سَاَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذٰلِكَ الْمَذِيُّ اِذَا وَجَدَهُ اَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذٰلِكَ مِنْهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ اَوْ كَوُضُوْءِ الصَّلٰوةِ -

٤٣٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ -

٤٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَذِيِّ مِنْ اَجْلِ فَاطِمَةَ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ -

٤٣٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا اَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ اَرْسَلْتُ الْمِقْدَادَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَسْاَلُهُ عَنِ الْمَذِيِّ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَانْضِحْ فَرْجَكَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَخْرَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْهِ شَيْئًا -

٤٤٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ اَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ الْمِقْدَادَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَسْاَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذِيَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ -

٤٤١. اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُرِئَ عَلٰى مَالِكٍ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَمَرَهُ اَنْ يَسْئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ اِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْاَةِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذِيُ فَاِنَّ عِنْدِيْ اِبْنَتَهُ وَاَنَا اَسْتَحْيِيْ اَنْ اَسْاَلَهُ فَسَئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ মযী নির্গত হলে উযু করা

অনুবাদ ঃ ৪৩৬. আলী ইবনে মায়মুন (র)......ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আলী, মিকদাদ এবং আম্মার (রা) আলাপ করছিলেন, আলী (রা) বললেন, আমি অতি মযী সম্পন্ন ছিলাম, কিন্তু এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করি। যেহেতু তাঁর কন্যা হলো আমার সহধর্মিণী। অতএব, তোমাদের একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁদের একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। কে জিজ্ঞাসা করেছিল তা ভুলে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তা হলো মযী। আর যখন কারও তা নির্গত হয় তখন সে তার ঐ

স্থান ধুয়ে ফেলবে এবং নামাযের জন্য যেভাবে উযূ করে তদরূপ উযূ করবে, অথবা তিনি বলেছেন, নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করবে।

৪৩৭. মুহাম্মদ ইবনে হাতিম (র)......... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তি ছিলাম যার প্রায়ই মযী নির্গত হত। আমি এক ব্যক্তিকে অনুরোধ করলে সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, এতে উযূ করতে হবে।

৪৩৮. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা)-এর কারণে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করতাম। অতএব আমি মিকদাদ (রা)-কে অনুরোধ করলে তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন, তিনি বললেন, এতে উযূ করতে হবে।

৪৩৯. আহমদ ইবনে ঈসা (রা)...... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি মিকদাদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মযী সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য পাঠালাম। তিনি বললেন, সে উযূ করবে এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। ইমাম আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, মাখরামা (র) তাঁর পিতা থেকে কোন হাদীস শুনেননি।

৪৪০. সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (র)..... সুলায়মান ইবনে ইয়াসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) মিকদাদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পাঠালেন যেন তিনি তাঁকে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন, যার মযী নির্গত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং উযূ করবে।

৪৪১. উতবা ইবনে আবদুল্লাহ (র)..... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁকে (মিক্‌দাদকে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার অনুরোধ করেন যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে গেলে তার মযী নির্গত হয়। কেননা তাঁর কন্যা আমার বিবাহে থাকায় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করি। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিন বললেন, সে যেন তার লজ্জাস্থান ধৌত করে এবং নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

এ অনুচ্ছেদের হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্বে بَاب مَا يَنْقُضُ الوُضُوْءَ ومَا لاَيَنْقُضُ الوُضُوْ مِنَ। لمَذِى এর অধীনে আলোচনা করা হয়েছে।

৪৪০ নং হাদীস সংক্রান্ত আলোচনা

এ হাদীস মযী সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কি সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এবং তার সমাধানও প্রদত্ত হয়েছে। এ হাদীসকে অনেক রাবী রেওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু স্বীয় উস্তাদ হতে বর্ণনা করার ব্যাপারে কিছু মতানৈক্য পাওয়া যায়। এ শিরোনামের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র) যে মতানৈক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন তা হলো, উক্ত হাদীস উবায়দা এবং শো'বা উভয়ে তাদের উস্তাদ سليمان الأعمش হতে রেওয়ায়াত করেন। কিন্তু উবায়দার রেওয়ায়াতে প্রশ্নকারীর নাম নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং অস্পষ্টভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- فَأمَرْتُ رَجُلاً আর শো'বার রেওয়ায়াতে প্রশ্নকারীর নাম নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে,- اَمَرْتُ المِقْدادَ فَسَالَهٗ .... الخ

অথবা, তাদের এ মতানৈক্য হলো তাদের উস্তাদের শায়খের নাম উল্লেখ করার ব্যাপারে। উবায়দার রেওয়ায়াতে এসেছে - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ سُلَيْمَان الاَعْمَشِ عَنِ المُنْذِرِ

এর দ্বারা মুসান্নিফ (র) এর উদ্দেশ্য হাদীসের ইল্লত বা দুর্বলতা বর্ণনা করা নয়। বরং سليمان اعمش এর শাগরেদদের মধ্যকার মতানৈক্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এ ধরণের মতানৈক্যের দ্বারা হাদীসের বিশুদ্ধতার মধ্যে কোন ধরণের বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না। (শরহে উর্দূ নাসায়ী: ৪২৮)

بَابُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

٤٤٢. اخبرنا عِمرانُ بْنُ يزيدَ قال حدّثنا اسمٰعيلُ بْنُ عبدِ اللّٰهِ قال حدّثنا الاوزاعيُّ قال حدّثنا محمّدُ بْنُ مسلمٍ الزُّهريُّ قال حدّثني سعيدُ بْنُ المُسَيِّبِ قال حدّثني ابو هريرةَ قالَ قالَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ اِذا قامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حتّٰى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ او ثَلٰثًا فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَايَدْرِى اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ -

٤٤٣. اخبرنا قُتَيْبَةُ حدّثنا داؤدُ عَنْ عَمرٍو عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عبّاسٍ رضى اللّٰه عنهما قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ذاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسارِهِ فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِيْنِهِ فصلّى ثُمَّ اضْطَجَعَ ورَقَدَ فجاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فصَلّى ولم يَتَوَضَّأْ، مختصَرٌ -

٤٤٤. اخبرنا يعقوبُ بنُ ابراهيمَ قال حدّثنا محمّدُ بْنُ عبدِ الرحمٰنِ الطُّفاوِيُّ قالَ حَدّثنا ايوبُ عَنْ اَبِىْ قِلابةَ عَنْ انسٍ رضى اللّٰهُ عنه انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قالَ اِذا نَعَسَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ ولْيَرْقُدْ -

অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রার দরুণ উযু করার নির্দেশ

অনুবাদ ঃ ৪৪২. ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাতের পর বিছানা ত্যাগ করে তখন সে যেন দু'বার অথবা তিনবার হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবিষ্ট না করে। কেননা তোমাদের কারো জানা নেই যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল।

৪৪৩. কুতায়বা (র)........ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে একরাতে নামায আদায় করলাম। আমি তাঁর বামদিকে দাঁড়ালাম কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর ডানদিকে করে দিলেন। তারপর নামায আদায় করে তিনি শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। পরে তাঁর কাছে মুয়ায্যিন আসলেন, তিনি উঠে নামায আদায় করলেন কিন্তু তিনি উযূ করলেন না।

৪৪৪. ইয়া'কুব ইবনে ইবরাহীম (র).......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতে তন্দ্রাভিভূত হয় তখন সে যেন নামায হতে বিরত থাকে এবং শুইয়ে পড়ে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা

বুকাইরের ক্ষেত্রে মতানৈক্যের সারসংক্ষেপ ঃ বুকাইরের দুই সাগরেদের মধ্যে কেউ نضح فرج এর কথা উল্লেখ করেছেন, কেউ غسل ذكر এর কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা, প্রথম রেওয়ায়াতে মাখরামা তার পিতা বুকাইর হতে وَانْضَحْ فَرْجَكَ শব্দ রেওয়ায়েত করেছেন। অন্য রেওয়ায়েতে লায়েস বিন সাদ বুকায়ের ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আশাজ্জ হতে يَغْسِلُ ذَكَرَهُ শব্দ রেওয়ায়াত করেছেন। এছাড়াও মাখরামা ধারাবাহিকতার খেলাফ বর্ণনা করেছেন। তথা نَضَحَ يَعْنِى غَسَلَ অর্থাৎ আগে লজ্জাস্থান ধৌত করবে, অতঃপর উযূ করবে। কিন্তু তিনি আগে উযূর কথা এবং পরবর্তীতে লিঙ্গ ধোয়ার কথা বলেছেন। আর লাইস ইবনে সা'দ তারতীব অনুযায়ী يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ শব্দ রেওয়ায়াত করেছেন।

মোটকথা, মুসান্নিফ (র) এর الاختلافُ وعلى بكير এর শিরোনাম কায়েম করে এ ইখতিলাফের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যা বুকাইর হতে রেওয়ায়াতকারী দু'শাগরেদ তথা মাখরামা এবং লাইস এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। আর এ ইখতিলাফটা শব্দ ও তারতীব সংক্রান্ত।

আর যেহেতু শিরোনামের অধীনে প্রথম রেওয়ায়েত যা মাখরামা তার পিতা হতে রেওয়ায়াত করেছেন তা منقطع কেননা, মুসান্নিফ (র) বলেন, قال ابو عبد الرحمن مخرمة لم يسمع من ابيه شيئا "মাখরামা তার পিতা হতে কিছুই শোনেনি" হতে পারে এর সমর্থন বুঝানোর জন্যে তৃতীয় রেওয়ায়াতকে موصولا উল্লেখ করেছেন। এতে فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ এসেছে। কিন্তু এখানে نضح শব্দের অর্থ গুপ্তাঙ্গের উপর পানি ছিটানো নয়। বরং ইমাম নববীসহ প্রমূখ ব্যক্তিগণ বলেন, نضح শব্দটির অর্থ غسل আর غسل অর্থ নেয়ার কারণ হলো, অন্য রেওয়ায়াতে স্পভাবে يغسل ذكره এসেছে। কাজেই সকলের নিকট এখানে نضح দ্বারা غسل উদ্দেশ্য হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ باب ماينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذى অনুচ্ছেদে দেখুন।

سوال : هَلِ النَّوْمُ نَاقِضٌ لِلْوُضُوْءِ؟ بَيِّنْ مَذَاهِبَ الْاَئِمَّةِ مَعَ الدَّلَائِلِ وَدَفْعِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْاَحَادِيْثِ.

প্রশ্ন ঃ নিদ্রা উযূ ভঙ্গকারী কি না এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য কি? দলীল প্রমাণসহকারে বর্ণনা কর এবং হাদীসগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন কর?

উত্তর : সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ নিদ্রায় উযূ ভঙ্গকারী হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ ঃ

ঘুম উযূ ভঙ্গকারী তবে কোন অবস্থায় ঘুম উযূ ভঙ্গ করে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. ইমাম মালেক (র) বলেন, চীৎ হয়ে কিংবা সাজদা অবস্থায় ঘুমালে তার উযূ ভঙ্গ হযে যায়। তখন নতুনভাবে উযূ করতে হবে। চাই ঘুম কম হোক কিংবা বেশী হোক। সুতরাং বসা অবস্থায় অধিক ঘুমে বিভোর হলেও উযূ ওয়াজিব হবে না। তবে নিদ্রা যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয় তবে উযূ ওয়াজিব হবে।

২. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বসা অবস্থায় যদি নিতম্ব মাটির সাথে লাগা থাকে, যদিও ঘুম বেশী হয় তবু উযূ ভাঙবে না। এটা ব্যতীত যেভাবেই ঘুমাক না কেন তাতে উযূ ভেঙ্গে যাবে।

৩. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, চীৎ হয়ে নিদ্রা যাওয়া ব্যতীত কোনোভাবে নিদ্রা গেলে উযূ ওয়াজিব হবে না।

ফিকহের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে, চীৎ হয়ে ঘুমালে, ঠেস লাগিয়ে ঘুমালে, অথবা, এমন বস্তুর সাথে হেলান দিয়ে ঘুমালে যা সরালে ঘুমন্ত ব্যক্তি পড়ে যাওয়ার তিব্য আশংকা থাকে তবে এমন ঘুমে উযূ ভেঙ্গে যাবে। আর যদি নামাযের মধ্যে এমনভাবে ঘুমায় যে, নামাযের কোনো সুন্নত তরক হয় না। বরং যথাযথভাবে পালিত হয় তাহলে তাতে নামায কিংবা উযূ কিছুই নষ্ট হবে না। কাজেই দাঁড়ানো অবস্থায় হোক বা বসা অবস্থায় হোক, কোনো কিছুর সাথে হেলান দেওয়া ব্যতীত ঘুমালে অথবা রুকু সাজদাগুলো যথা নিয়মে পালন করা অবস্থায় ঘুমালেও উযূ নষ্ট হবে না, যদিও ঘুম দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

হানাফীদের দলীল ঃ নবী করীম (স) বলেছেন-

لَايَجِبُ الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ جَالِسًا او قَائِمًا او قَاعِدًا حَتّٰى يَضَعَ جَنْبَهُ فَاِنَّهُ اِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ وفِى رِوَايَةٍ اِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا .

যে ব্যক্তি দাঁড়ানো বা বসাবস্থায় কিংবা রুকু বা সাজদা অবস্থায় ঘুমায় তার জন্য উযূ করা বাধ্যতামুলক নয় বরং বাধ্যতামূলক হলো ঐ ব্যক্তির জন্য যে চীৎ হয়ে শুয়ে ঘুমায়। এমনিভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর হাদীস দ্বারাও এটা পরিস্কার বুঝা যায় (শরহে মিশকাত : ১/২৬৭-২৬৮)

হাদীস সম্পর্কে তথ্যবহুল বিস্তারিত আলোচনা

নিদ্র উযূ ভঙ্গের কারণ কি না ঃ নিদ্রার কারণে উযূ ভঙ্গ হয় কি না এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এ মাসআলাতে আল্লামা নববী (র) আটটি এবং আল্লামা আইনী (র) দশটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মূলত এ উক্তিগুলোর সারনির্যাস হলো তিনটি-

১. নিদ্রা সাধারনভাবে উযূ ভঙ্গকারী নয়। এ মাযহাবটি হযরত ইবনে উমর আবু মূসা আশয়ারী (র), আবু মিজলাস, হুমাইদ আল আয়াজ্জ এবং শো'বা (রা) হতে বর্ণিত।

২, নিদ্রা সাধারণভাবে উযূ ভঙ্গকারী। চাই অল্প হোক বা বেশী হোক। এ উক্তিটি হযরত হাসান বসরী, ইমাম যুহরী ও ইমাম আওযাঈ (র) থেকে বর্ণিত।

৩. প্রবল নিদ্রা উযূ ভঙ্গকারী। হালকা নিদ্রা উযূ ভঙ্গকারী নয়। এ মাযহাবটি হলো ইমাম চতুষ্টয় ও সংখ্যাগরিষ্ঠের উলামায়ে কেরামের। এ তৃতীয় উক্তির প্রবক্তাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নিদ্রা সত্তাগতভাবে উযূ ভঙ্গকারী নয়। বরং বায়ু বের হওয়ার সম্ভাব্য কারণ হওয়ার ফলে উযূ ভঙ্গকারী হয়। যেহেতু এ সম্ভাব্য কারণ মামুলি ঘুমের ফলে সৃষ্টি হয় না। সেহেতু এ মত অবলম্বন করা হয়েছে যে, হালকা ঘুম উযূ ভঙ্গকারী নয়। অবশ্য এতন প্রবল ঘুম যার ফলে মানুষ বে-খবর হয়ে যায় এবং শরীরের জোড়াগুলো ঢিলা হয়ে যায় তা উযূ ভঙ্গকারী। যেহেতু নিদ্রা অবস্থায় শরীরের জোড়াগুলো ঢিলা হয়ে বায়ু বের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এ জন্য নিদ্রাকেই শরীয়তে বায়ু বের হওয়ার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। যেমন– তিরমিযীর হাদীসে বর্ণিত আছে- اِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ

এর দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, হুকুমটি নির্ভর করে জোড়া ঢিলা হওয়ার উপর। অতএব, যদি জোড়া ঢিলে হওয়া সত্ত্বেও কারো বায়ু বের না হওয়ার ইয়াকীন হয় তবুও উযূ ভেঙ্গে যাবে। যেমন সফরকে (কষ্টের স্থলাভিষিক্ত করে সফরকেই) কসরের কারণ বলা হয়েছে।

প্রবল নিদ্রার সীমা ঃ তৃতীয় উক্তিকারীদের মধ্যে জোড়া ঢিলা হওয়া এবং প্রবল নিদ্রার সীমা নির্ধারনে মতবিরোধ ঘটেছে।

১. ইমাম শাফেয়ী (র) জমিন থেকে নিতম্ব উঠে যাওয়াকে জোড়া ঢিলে হওয়ার নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, তাঁর মতে যে সব নিদ্রায় নিতম্ব জমিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে নিদ্রা উযূ ভঙ্গকারী হবে।

২. হানাফীদের পছন্দসই মাযহাব হলো, ঘুম যদি নামাযের অবস্থায় হয় তাহলে জোড়া ঢিলে হয় না। অতএব, এরূপ নিদ্রা উযূ ভঙ্গকারী নয়। আর যদি নামাযের অবস্থা ভিন্ন অন্য পদ্ধতিতে ঘুম হয়, তাহলে যদি জমিনের উপর নিতম্ব নির্ভরশীল থাকে, তাহলে উযূ ভঙ্গকারী নয়। আর যদি মজবুতভাবে জমিনের উপর স্থিতি বিনষ্ট হয়ে যায় তবে উযূভঙ্গকারী হবে। যেমন– কাত হয়ে অথবা, চীৎ হয়ে শুইলে, এরূপভাবে যদি কোনো ব্যক্তি কিছুতে হেলান দিয়ে বসে এবং এ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে তবে যদি নিদ্রা এ পরিমাণ প্রবল হয় যে, উক্ত বস্তু সরিয়ে ফেললে লোকটি পড়ে যাবে তাহলে জমিনের উপর তার স্থিতি বিনষ্ট হয়ে যাবে।

আলোচ্য বিষয়ে হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র) এর অভিমত

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র) বলেন, ঘুম উযূ ভঙ্গকারী হওয়া মূলত: নির্ভর করে এ অনুচ্ছেদের হাদীসের সুস্পষ্ট বিবরণ মোতাবেক জোড়া ঢিলা হওয়ার উপর। এ কারণেই ফুকাহায়ে কিরাম বিভিন্ন আলামত নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী নয়। অতএব, হানাফীদেরও আজকাল স্বীয় মাযহাবের উপর জেদ না ধরা উচিত যে, নামাযের অবস্থায় ঘুমালে উযূ ভাঙবে না। কারণ এ যুগে নামাযের অবস্থায়ও জোড়া ঢিলে হয়ে যায়। এ কারণে অনেক সময় দেখা যায় নামাযের অবস্থায় নিদ্রাকালে উযূ ভেঙ্গেও যায় এবং নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির এ সম্পর্কে অনুভূতি থাকে না। মোটকথা, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম উক্ত হাদীসটির এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, যে ঘুম প্রবল নয় তথা যাতে জোড়া ঢিলে হয় না, তা উযূ ভঙ্গকারী নয়। এটাকে প্রিয় নবী (স) কাত হয়ে শোয়ার দ্বারা এজন্য ব্যক্ত করেছেন যে. সাধারণত এ প্রকারের নিদ্রা এ অবস্থাতেই হয়ে থাকে। (শরহে আবু দাউদ: ১৭২-১৭৩)

নিদ্রা উযূ ভঙ্গকারী না হবার প্রমাণ ঃ যারা নিদ্রাকে সাধারণভাবে উযূ ভঙ্গকারী বলেন না তাদের প্রমাণ হলো হযরত আনাস (রা) এর এ শক্তিশালী হাদীসটি–

قال كَانَ اَصْحَابُ رسولِ اللّٰهِ صلّى اللّٰه عليه وسلم يَنَامُوْنَ ثم يَقُوْمُوْنَ فَيُصَلُّوْنَ ولَا يَتَوَضَّئُوْنَ ـ

রাসূল (স) এর সাহাবাগণ ঘুমাতেন, অতঃপর উযূ না করেই নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে পড়তেন।

জুমহুরের পক্ষ হতে উক্ত হাদীসের জবাব ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ হতে এর উত্তর হলো এখানে ঘুম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হালকা ঘুম; প্রবল নয়। এর প্রমাণ হলো, এ হাদীসটির কোন কোন সূত্রে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের এ ঘুম ছিল এশার নামাযের অপেক্ষায়। প্রকাশ থাকে যে, নামাযের অবস্থায় ঘুম প্রবল ... ছিল।

হওয়া মুশাক..

রেওয়াতের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান

এ রেওয়ায়াতের কোন কোন সূত্রে এ শব্দও حَتّٰى تَخْفِقُ رُؤُسُهُمْ كَمَا عِنْدَ ابى دَاوُد (এমনকি তাদের মাথা ঝিমুতে থাকত) এবং ইবনে আবু শায়বা, মুসনাদে আবু ইয়ালা ইত্যাদিতে حتى انى لاسمع لاحدهم غطيطا (এমনকি আমি তাদের কারো কারো নাক ডাকার আওয়াজও শুনতাম।) আর কোনটিতে يوقظون للصلوة (তারা নামাযের জন্য জাগাতেন, তা: হা: ১/১১৯) এবং কোনটিতে فَيَضَعُوْنَ جُنُوْبَهُمْ (কাৎ হয়ে শুয়ে আরাম করতেন) শব্দ এসেছে (তা: ২১/১১৯) যদ্বারা বোঝা যায় তারা কাৎ হয়ে শুয়ে নাক ডেকে ঘুমাতেন। ফলে তাদেরকে ঘুম হতে জাগানো হত। বস্তুত এটাকে হালকা ঘুমের উপর প্রযোজ্য করা মুশকিল।

সমাধান ঃ হযরত আনাস (রা) এর এ রেওয়ায়াতের সবগুলো সূত্র সামনে রাখার পর বুঝা যায় কোন কোন সাহাবী তো বসে বসে ঘুমাতেন। এরূপ সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে- تَخْفِقُ رُؤُسُهُمْ (তাদের মাথা দুলতে থাকতো।) আর কারো কারো এ সময় নাক ডাকার অবস্থাও হয়ে যেত, তাদেরকে নামাযের জন্য জাগানোর প্রয়োজন হত, কিন্তু যেহেতু এগুলো সব বসা অবস্থায় হত এজন্য উযূর প্রয়োজন হত না। অন্য কোন কোন সাহাবী কাৎ হয়ে শুয়ে পড়তেন। তবে তাদের মধ্যে কারো কারো ঘুম প্রবল হত না, এজন্য তাদের উযূর প্রয়োজন হত না। আর কারো কারো ঘুম হত প্রবল। আর এ অবস্থায় নাক ডাকার আওয়াজও শোনা যেত, কিন্তু এরূপ সাহাবীগণ উযূ ছাড়া নামায পড়তেন না। যেমন মুসনাদে বাযযারে হযরত আনাসের রেওয়ায়াতএসেছে যে, তাঁরা কাৎ হয়ে শুয়ে পড়তেন। অতঃপর তাদের কেউ উযূ করতেন, আবার কেউ করতেন না। অনুরূপভাবে মুসনাদে আবু ইয়া'লাতেও হযরত আনাসের একটি রেওয়ায়াত রয়েছে। হযরত আনাস সহ অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা তাদের কাৎ হয়ে শুয়ে পড়তেন। পরে তাদের কেউ উযূ করতেন, আর কেউ করতেন না। (মাযমাউয যাওয়াইদ ১/৩৪৮)

ইবনে আব্বাস (রা) এর বিস্তারিত রেওয়ায়াত

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একবার আমি আমার খালাজান হযরত মায়মুনা (রা) এর নিকট একরাত ছিলাম। সে দিন হুজুর তার হুজরায় ছিলেন। কেননা, সেদিন তার পালা ছিল। হুজুর (স) হযরত মায়মুনার সাথে কিছু সময় খোশ-আলাপ করেন, অতঃপর কিছু সময়ের জন্য শুয়ে যান, অতঃপর যখন রাতের একতৃতীয়াংশ বাকী থাকে তখন ঘুম থেকে জাগ্রত হন এবং আসমানের দিকে তাকান। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করেন–

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ـ

এভাবে পূর্ণ সূরা তেলাওয়াত করেন, অতঃপর মশক এর নিকট গমন করে তার মুখ খোলেন এবং পিয়ালায় পানি ভর্তি করে উযূ করেন। অতঃপর নামাযের জন্য দাঁড়ান। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি উঠে গিয়ে উযূ করে হুজুরের বামপার্শ্বে নামাযের জন্য দাঁড়ালাম। তিনি আমার কান ধরে বাম দিক হতে ডান দিকে আনেন। যখন তাঁর ১৩ রাকাত নামায পূর্ণ হলো। তখন তিনি শুয়ে পড়লেন, অতঃপর যখন ফজরের নামাযের সময় হলো, তখন হযরত বেলাল রাসূল (সা)-কে ডাকার জন্য আসেন। অতঃপর তিনি উযূ করা ছাড়াই ফজরের দু'রাকাত সুন্নত নামায আদায় করলেন। এ রেওয়ায়েতে এটাও এসেছে যে, তিনি ফজরের সুন্নত ও ফরজ নামাযের মাঝে এ দুআ পাঠ করেন- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا ... الخ

উক্ত ঘটনা হতে যা বুঝে আসে

১. উক্ত রেওয়ায়াত হতে বুঝে আসে যে, হুজুর (স) ও ইবনে আব্বাস (রা) উভয়ে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেন।

২. এ রেওয়ায়াত দ্বারা এটাও বুঝে আসে যে, মুকতাদী যদি একজন হয় তাহলে সে ইমাম সাহেবের ডান পার্শ্বে দাঁড়াবে। আর যদি বেশী হয় তাহলে পেছনে দাঁড়াবে।

৩. কাযী আয়ায বলেন, উক্ত রেওয়ায়াত হতে এটাও বোধগম্য হয় যে, প্রয়োজনবশত এক দু'বার নামাযে হাত নাড়লে নামায নষ্ট হয় না। والله اعلم بالصواب (শরহে উর্দু নাসায়ী : পৃষ্ঠা নং ৪৩০)

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

٤٤٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ اَبِي بَكْرٍ قَالَ عَلِي اَثَرِه قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَلَمْ اُتْقِنْهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ -

٤٤٦. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ ابْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَفْضٰى اَحَدُكُمْ بِيَدِهِ اِلٰى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ -

٤٤٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّهُ قَالَ الْوُضُوْءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ مَرْوَانُ اَخْبَرَتْنِيْهِ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ فَاَرْسَلَ عُرْوَةُ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ -

٤٤٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبِيْ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتّٰى يَتَوَضَّأَ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْهِ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ -

---

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার দরুণ উযূ করা

অনুবাদ ঃ ৪৪৫. কুতায়বা (র)........ বুসরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে নিজের গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করবে সে যেন উযূ করে।

৪৪৬. ইমরান ইবনে মূসা (র)........ বুসরা বিনতে সফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে নিজের গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করে সে যেন উযূ করে।

৪৪৭. কুতায়বা (র).......মারওয়ান ইবনে হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযূ করতে হবে। মারওয়ান বলেন, বুসরা বিনতে সফওয়ান আমাকে এটা বর্ণনা করেছেন। একথা শুনে উরওয়া (রা) তার নিকট লোক পাঠালে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) কি কি কাজে উযূ করতে হবে তা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলেও।

৪৪৮. ইসহাক ইবনে মানসুর (র)........ বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যে ব্যক্তি নিজ গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করে সে যেন উযূ করা ব্যতীত নামায আদায় না করে।

সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা

আলোচ্য অনুচ্ছেদে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন, প্রশ্নোত্তর ও তাত্ত্বিক আলোচনা পূর্বে الوضوء من مس الذكر অনুচ্ছেদে করা হয়েছে। সুতরাং এ সম্পর্কে অবগতির জন্য সেখানে দ্রষ্টব্য।

الحمد لله وحده نحمد الله عزوجل على انه قد تم المجلد الاول من شرح النسائي ونرجوالرحمة الواسعة والفضل ان يتم المجلد الثاني ويكمل في الايام المعدودة والامد الاقل ان شاء الله تعالى.

১ম খণ্ড সমাপ্ত